বুদ্ধদেব গুহ-র

ছয়টি উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ-র

ছয়টি উপন্যাস

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী—১৯৫৭

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮-এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ
সুব্রত চৌধুরী

মুদ্রণে ঃ
প্রিণ্টেক্স
কলিকাতা-৭০০০০৪
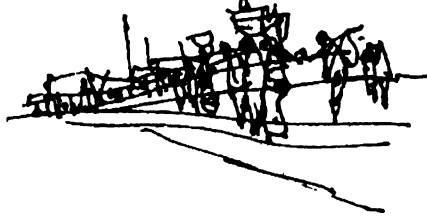
কি গো অর্পণ? বুঝছটা কি?

কম্পার্টমেন্টের জানালা দিয়ে মুখ বের করে ট্রেনটা কেন দাঁড়িয়ে আছে তা দেখার নিষ্ফল চেষ্টা করে বললাম, কিছুই তো বুঝছি না গামাদা।

বর্ধমান হাওড়া লোকালের এই নিত্যযাত্রীদের মধ্যে তরুণতর অনেকেই আছে যারা উঁচু ই. এম. উ. কোচ-এর সিঁড়ি থেকেও জমিতে ফটাফট নিচে নেমে গার্ড অথবা এঞ্জিনম্যান-এর কাছ থেকে ট্রেনের খাল-খরিয়ৎ পুছ-পাছ করে ফিরে এসে আমাদের মতন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের তরতাজা খবর জানায়।

অপু আর মদন গেছিল, মুড়িওয়ালা জীবন, তরমুজওয়ালা ঘন্টেশ্বরের সঙ্গে।

তারা সকালেই আগে পরে ফিরে এসে বলল, আগের গাড়ি মোষ মেরেছে সামনের লেভেল ক্রসিং-এ। সেই মোষ, লাইনের ওপর থেকে যতক্ষণ সরানো না হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের লোকাল কখন যাবে তার কোনই ঠিক নেই।

গামাদা, ওরফে যতীনবাবু পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে তাঁর জামাই-এর উপহার দেওয়া নতুন টাইমেক্স ভিসটা ঘড়িটার সঙ্গে শুভদৃষ্টি করে বললেন, হল্লো। আপিসে আজও লেট। নতুন এক কুলোপানা চক্কর ডি সি এয়েচে। লাইপ হেল করে দিলে র‍্যা। তার মুখটা মনে করলেই আমার...দুসস...।

যতীনবাবুর কোলের ওপরেই 'সংবাদ প্রতিদিন' কাগজটা মাঝখান দিয়ে ভাঁজ করা অবস্থাতে রাখা ছিল। আমি 'বঙ্গলোক' পড়ি। নতুন কাগজ কিন্তু ভালো কাগজ। অন্য কাগজ একটু-আধটু দেখি, চোখ বুলিয়ে।

যতীনবাবু বাড়িতে 'গণশক্তি' নেন। পার্টির সদস্য তিনি। কিন্তু স্টেশনে এসে রোজই এক কপি 'প্রতিদিন' কিনে ট্রেনে পড়তে পড়তে যান। উনি বলেন, দামে শস্তা, খবরে ভারী। আমরাও নেড়েচেড়ে দেখি একটু আধটু। আদ্যোপান্ত পড়ার পর দুপুরে কাগজটি টেবলের ওপরে পেতে নিয়ে যতীনবাবু টিফিনও করেন যাতে তাঁর আদ্দির পাঞ্জাবি নষ্ট না হয়। অফিস থেকে ফেরার সময়ে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেতেও ভোলেন না। গিন্নি, মাসকাবারে, কাগজ বিক্রিঅলার কাছে অন্য কাগজের সঙ্গে বেচে দেন।

খবরেব কাগজ ইদানীং পড়ে অথবা না-পড়ে ওজন দরে বিক্রি করলেও একই দাম পাওয়া যায়।

'খবরের' দাম বা 'মূল্যর' চেয়ে 'কাগজের মূল্য'ই বেশি হয়ে গেছে আজকাল।

কাগজটাকে একটা খবর দেখেই, যতীনবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিলাম আমি কাগজটা।

ইন্টারেস্টিং কোনো খবর? কই? চোখে তো পড়ল না তেমন কিছুই।

উনি বললেন।

ওঁর অবিরত কথার উত্তর না দিয়ে কাগজটা চোখের সামনে তুলে, মেলে ধরলাম।

"অচানকমার। মধ্যপ্রদেশ। নিজস্ব সংবাদদাতার খবর" :

"মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ের অচানকমার থেকে লামনি যাবার পথে এক আদিবাসী যুবক কুড়ি তারিখে বড়ো বাঘের দ্বারা দিনদুপুরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বাঘটি প্রায়ই মানুষ আক্রমণ করছে এবং এপর্যন্ত পাঁচজনকে মেরেওছে। কিন্তু যেহেতু অচানকমারে একটি অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয়েছে, বনবিভাগ ন্যায্যতই সেই বাঘকে মানুষখেকো ঘোষণা করে শিকারিদের আমন্ত্রণ জানাতে একেবারেই রাজি নন। অথচ আদিবাসীদের বিপদটাও সত্যি।

লামনির পঞ্চায়েতও এ নিয়ে মিটিং করেছে। করে, অনির্দিষ্টকালের জন্যে অমরকন্টকের পথ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকরীও করেছে। ফলে, একদিকে কেঁওচি, পেন্ড্রারোড, অমকণ্টক এবং অন্যদিকে বিলাসপুর শহরও অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে তিনদিন হল। সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের হেড-কোয়ার্টার্স বিলাসপুর এবং তার অধীনে যে অগণ্য কয়লাখনিগুলি আছে তাদের কাজ তো বিঘ্নিত হচ্ছেই তাছাড়া বিভিন্ন রেল স্টেশান এবং কারখানাতে এবং কোল -ওয়াশারি প্ল্যান্টেও কয়লা পরিবহনে বিস্তর অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু বাঘটি মারা অথবা ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে বন্দি না করা পর্যন্ত অবরোধ তুলবেন না এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই অঞ্চলের আদিবাসীরা। তাদের মধ্যে গোন্দ, বাইগা, এবং পানকারাই প্রধান।'

কাগজটি নামিয়ে রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার।

গামাদা বললেন, কী নাম রে বাবা! অচানকমার।

হুঁ।

আমি বললাম, স্বগতোক্তির মতন।

তারপরেই চুপ করে গেলাম।

চকিতে অনেকই পুরোনো কথা মনে ফিরে এল, পরিযায়ী পাখিদেরই মতন। ফেলে আসা জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ের কথা। যে-অধ্যায়ে শত ইচ্ছা থাকলেও কোনোদিনও ফিরে যাওয়া হবে না।

আমার ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে বর্ধমান শহরের সচ্ছল প্রাচীন বাসিন্দা এবং সর্বজ্ঞ যতীন চাটুজ্জে বললেন, ছত্তিশগড়িয়া মেয়েচেলেগুলোর, চেহারা-ছবি বেশ। বুয়েচো। কামিনের কাজ করতে আসে দলে দলে তারা দিল্লি, দিল্লির আশেপাশে এবং মধ্যপ্রদেশের বড়ো বড়ো শহরেও। আমি যকন আমার ছোটো বোনাই এর আর আমার মেজকার কাচে রেগুলার যেতুম, তকন দেকেচিলুম। পোশাকও পরে তারা ভারী রং-চঙে। ঘাগরা। পায়ে মল। আজকালকার ছেলে-ছোকরারা যাকে বলে ঝিং-চ্যাক, তাই আর কী ! খাসা দেকতে ছুঁড়িগুলো। একেবারে টই-টম্বুর, ডবকা, যৌবন যেন চলকে চলকে হাঁটে হে!

হুঁ।

আমি স্বগতোক্তি করলাম।

তারপরেই ওঁর কাগজটা ফিরিয়ে দিলাম ওঁকে।

সুসাহিত্যিক পরলোকগত বিমল মিত্রের একটা লেখা পড়েছিলাম ওই অঞ্চলে উপরে।

মলিনা দত্ত বললেন।

উনি বসেছিলেন আজ একেবারের আমার পাশেই। একটি সাদা ব্লাউজ আর ঘন নীল পাড় আর হালকা নীল জমির শাড়ি পরে। বাংলা সাহিত্য ওঁর প্রাণ।

মলিনা, ইনকামট্যাক্সের ইউ ডি সি। তিনি শ্রীরামপুর থেকে যাওয়া আসা করেন সপ্তাহে পাঁচদিন। প্রতি শনিবারই বন্ধ থাকে ওঁদের অফিস। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিস তো!

কী লেখা?

আমি জিজ্ঞেস করলুম।

'সরসতীয়া'। পড়েছেন?

বললাম, বিমল মিত্রর ওই গল্পটি পড়েননি এমন সাহিত্য-পাঠক বাঙালিদের মধ্যে আমাদের প্রজন্মে কমই ছিলেন।

বলেই, চুপ করে গেলাম।

গল্পটি পড়েছিলাম অবশ্যই। কিন্তু ওসব নিয়ে আলোচনা করার কোনও ইচ্ছা সেই মুহূর্তে আমার ছিল না। টগবগে প্রথম যৌবনের প্রায় ভুলে যাওয়া মস্ত একথাবা সময় হামাগুড়ি দিয়ে সব রং-রূপ-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে হঠাৎই ফিরে এল ক্লান্ত শ্লথ মস্তিষ্কে 'সংবাদ প্রতিদিন' কাগজের ছোট্ট খবরটুকুর মাধ্যমে, যেন গুঁড়ি-মারা বাঘিনীরই মতন।

এখন দুটি স্টেশানের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটি। ট্রেন-লাইনের ডান পাশেই ছোট একটি ছাইগাদা। তারই মধ্যে কয়লা কুড়োচ্ছে কয়েকটি কালো-কালো ন্যাংটো শিশু।

টেলিগ্রাফের তারে দাঁড়কাকেরা সার দিয়ে বসে কা-কা-খা-খ্বা করে ডাকছে। একটা কালো কুকুর একটা সাদা বেড়ালকে তাড়া করে পাটকিলে রঙা তৃণশূন্য রুখু মাঠের মধ্যে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে একটি কানাগলির দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

'মর! মর! মর! মরতে পারিস না'?

বলে, হাড় জিরজিরে শিশুর মুখে, আধন্যাংটো যুবতী ভিখিরি মা তার নোংরা ও ছেঁড়া শাড়ি সরিয়ে অস্নাত কিন্তু সুডৌল স্তনের কালো রঙা বোঁটা গুঁজে দিচ্ছে ঘেন্নার সঙ্গে। সেই ঘেন্নাটা তার নির্লজ্জ কাম-এরই প্রতি না তার অপার অসহায়তার প্রতি, তা সে নিজেও বোধহয় জানে না।

খবরের কাগজের ওই সংক্ষিপ্ত খবরটুকু, ট্রেনের কামরার ভিতরে গাদা হয়ে বসা-দাঁড়ানো, "সময়ে" অফিসে পৌঁছোনোর চিন্তাতে উদ্বিগ্ন কিন্তু কাজ না করে প্রত্যহই অবহেলায় সময় এবং চরিত্র খুন করা আমাদের এবং কামরার বাইরে এই 'খাই-খাবো' 'ময়লা-কুচলা' প্রতিবেশ এবং পটভূমি থেকে আমাকে উৎক্ষিপ্ত করে, যেন বহুবছর আগের পেছনে ফেলে-আসা সেইসব সুন্দর ঘোরের দিনগুলির মধ্যে হঠাৎই নিয়ে গেল।

দিনগত পাপক্ষয়ের থোড়-বড়ি-খাড়া-খাড়া বড়ি-থোড়ের একঘেয়ে প্রাত্যহিকতার মধ্যে বসেই আমি যেন সেই বিন্ধ্য পর্বতমালার পাদদেশের গহন অরণ্যানিবেষ্টিত ছত্তিশগড়ে ফিরে গেলাম। ফিরে গেলাম, মাইকাল পর্বতমালায়, যা বিন্ধ্য আর সাতপুরা পর্বতমালার মিলন ঘটিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ফিরে গেলাম, অচানকমার, লামনি, কেঁওচি, পেন্ড্রারোড, করোঞ্জিয়া, দিনদৌরি, ধুতিপাহাড় আর অমরকণ্টকের কাছে। কত নারী-পুরুষের মুখ মুহূর্তের মধ্যে ভেসে উঠল সার সার, মনের চোখের সামনে।

কে জানে।

আজ তারা কে কেমন আছে! এবং আদৌ আছে কি না। বাইগাদের গ্রামের মুখিয়া গণিয়া বস্তির চৈতুরাম পোর্তে, ছিরহট গ্রামের সুন্দরী ডাগর রাজকুমারী মুলারি বাই, গামহারগাঁও গ্রামের মুকাদ্দাম রতি বাইগা এবং তার ছেলে প্রেম সিং? মনে পড়ল গামহারগাঁও বস্তির চায়ের দোকানের বুড়ো দশরথ নানাকে, তার স্বামী ছেড়ে আসা কামাতুরা কবুতরের মতন মেয়ে কৌশল্যাকে, লামনির ফরেস্টার রাজপুত সিং, ফরেস্ট গার্ড সাগেলা আর নর্মদকে, মারুতি পানকাকে, গভীর বনের মধ্যে বিষধর দুধরঙা সাপের মতন এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া পাহাড় আর জঙ্গলের বুকের আর্দ্রতা নিংড়োনো পাহাড়ি নদী, মাট্রিনালা আর মনিয়ারি কৈরাহাকেও মনে পড়ল, গোন্দ আর বাইগাদের দেবতা, প্রাচীন, সুউচ্চ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক শালগাছ মেট্রিসেরাইকেও, গভীর জঙ্গলের মধ্যে। দিনদৌরির সেই ছিপছিপে সুগন্ধী চরিত্রবতী যুবতী অহল্যাবাই, অমরকণ্টকে যার তরিতরকারি, রেউড়ির আর হরজাই জিনিসের ছোট্ট দোকান ছিল একটি।

সেদিন কখন ট্রেন ছাড়ল, কখন-ই তা 'ইন' করল হাওড়াতে অফিসে পৌঁছে অভ্যেসের দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে কখন যে পার করে দিলাম আরেকটি মসৃণ, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন. তৃপ্তিহীন দিন তা টেরই পেলাম না।

৫

আমি একটি বিবেকহীন আনপ্রডাক্টিভ মস্ত বড়ো সরকারি যন্ত্রর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সামান্য অংশ মাত্র। না আছে আমার কিছু গড়ার ক্ষমতা, না ভাঙার। কাজের 'বাহানাতে'' দিনভর খেলা, রাজনীতি, নাটক, শিল্প দুরদর্শন এবং আকাশবাণীর এফ. এম চ্যানেলের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করি, তারপর বাদুড়ঝোলা হয়ে 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারি' করে বাড়িতে ফিরি। ছেলেকে পড়াই।

আমার ছেলে আমারই মতন, আরেকটি উদ্দেশ্যহীন আনপ্রডাক্টিভ যন্ত্র তৈরি হবে। ভাতকাপড়ের সংস্থান করবে। বিয়ে করবে। সন্তান উৎপাদন করবে, যা নাকি অবশ্যই করণীয়। এবং একদিন আমার সেই ছেলে আমারই মতন সম্পূর্ণ অহেতুক এবং উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করে তার নিজের ছেলেকেও অফিস থেকে ফিরে আমারই মতন পড়াতে বসবে তাকে ''মানুষ'' করবার জন্যে।

এমনি করেই চাকা ঘুরে এসেছে চিরদিন তথাকথিত 'মধ্যবিত্ত' বাঙালির জীবনে। এবং ভবিষ্যতেও ঘুরবে।

মধ্যবিত্ত বলে কোনো শ্রেণী কি আজ আছে? আমরা নিম্নবিত্তই। 'মধ্যবিত্ত' বলে নিজেদের ডেকে নিজেদেরই কাছে গৌরবান্বিত হই মাত্র।

এই উদ্দেশ্যহীন, তৃপ্তিহীন, চ্যালেঞ্জহীন, প্রশ্নহীন, এমনকী পরিশ্রমহীন অন্নোপার্জনের গ্লানি যে আমাকে কী ভীষণভাবে গ্রাস করে মানসিকভাবে পুরোপুরি পঙ্গু করে ফেলেছে, তা আজ সকালে বেজায়গাতে ট্রেনটা না থেমে থাকলে এবং খবরের কাগজে খবরটা না চোখে পড়লে এমন করে বুঝতে পর্যন্ত পারতাম না। এই কলকাতার গর্তের বাইরে যে এক বিরাট পৃথিবী আছে যার একটি ছোট্ট টুকরোর নাম ভারতবর্ষ সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই নেই।

ফেরার সময় বর্ধমান লোকালের জানালার পাশের সিটে বসে ভাবছিলাম; কেন যে মরতে সেদিন কলকাতাতে ফিরেছিলাম, এই ধুলো, ধোঁয়া, ঈর্ষা, অসূয়া, ক্ষুদ্রতা এবং বিবেকহীনতার মধ্যে? সেই স্বর্গরাজ্য ছেড়ে?

সেই রাতে খটাখট করে শ্লেষ্মারোগী বৃদ্ধের কাশির মতন আওয়াজ তোলা দ্রুতগামী লোকাল ট্রেনে বর্ধমান ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, এখন আর কিছুই প্রায় মনে নেই। মানুষের নাম ভুলে গেছি, জায়গার নামও ভুলে গেছি। পরম্পরাও সবই গুলিয়ে গেছে। তবে এখনও যা আছে, তা এক গভীর আচ্ছন্নতা, অনভিজ্ঞ এক শহরবাসী যুবকের গহন ও নির্জন প্রকৃতির এবং সেই প্রকৃতিরই ক্রোড়ে লালিত-পালিত একশোভাগ দিশি মানুষদের সংস্পর্শে আসার তীব্র অভিঘাত, প্রকৃতিহত অসাড়তা, কোনো অজ্ঞাত দুরারোগ্য রোগেরই মতন।

বড়োমামা বিধুভূষণ কাজ করতেন রেলে। কী কাজ, তা আমি জানতাম না।

বি.কম পরীক্ষাতে টায়ে টায়ে পাস করে যখন ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার কলকাতাতে চাকরি বাকরির কোনো আশাই নেই, তখন বিধবা মায়ের তাগিদে এবং বেশ কিছু চিঠি চালাচালির পরে বড়মামা বিলাসপুর যেতে লিখলেন, 'নাই মামার চেয়ে কানামামা' ভালো। পাঠিয়েই দে টৌটাকে, পরের ট্রেনেই।

আমার মামাবাড়ির ডাক নাম ছিল টোটা।

মায়ের লক্ষ্মী ঝাঁপি থেকে বের করে দেওয়া টাকা নিয়ে থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে মার্চ মাসের গোড়ার এক সকালে বিলাসপুর জাংশানে গিয়ে নামলাম বম্বে মেল থেকে।

তখন ট্রেনে থার্ড ক্লাস ছিল।

বিরাট স্টেশান। বড়োমামা নিজেই নিতে এসেছিলেন। তাঁর পদাধিকার বলে এন. ডি. সি-র অনেক অফিসারের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। তাছাড়া কাঠ, বিড়িপাতা, খয়ের বাঁশ ইত্যাদি বনজাত নানা দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও জানাশোনা ছিল। বিলাসপুরে আসার আগে পেন্ড্রা না গেন্ড্রা রোড কোথায় যেন ওঁর পোস্টিং ছিল জঙ্গুলে জায়গাতে। তখন থেকেই জানাশোনা। মায়ের কাছেই এসব শুনেছিলাম। মা গত বছর পুজোর সময়ে এসে একমাস কাটিয়েও গেছিলেন বিলাসপুরে। অমরকণ্টকেও গেছিলেন তীর্থ করতে বেশ অনেকটা পথ হেঁটে। তখন হেঁটে যেতে হত।

বড়োমামার কোয়ার্টার ছিল বিলাসপুরের হেমুনগরের রেল-কলোনিতে। বাঙালিটোলা সারখান্দাতে থাকতেন তাঁর এক বন্ধু, মাখনলাল সেন। এন. সি. ডি. সি-র বড়ো অফিসার ছিলেন। তাঁরই সুপারিশে জঙ্গলের এক ঠিকাদারের ফার্মে অ্যাকাউন্ট্যান্টের চাকরি হয়েছে নাকি আমার। শুনলাম বড়োমামারই কাছে।

বড়োমামিমা ও আমার মামাতো বোন ললিতা কদিন বিলাসপুরেই থেকে যেতে বললেন বারে বারে। কারণ, ওঁদের সঙ্গে আমার শেষবার দেখা হয়েছিল বড়োমামার মেয়ে কবিতাদির বিয়ের সময়ে কলকাতার বাগবাজারে, বড়োদাদুর বাড়িতে। তাও দুবছর আগে।

বড়োমামা বললেন, ছগনভাই বলেছে তোকে কালই জয়েন করতে।

ছগনভাই কে?

বড়োমামিমা শুধোলেন।

গুজরাটি ঠিকাদার। আরে যার কাছে কাজ করবে টোটা। দিনকাল যা পড়েছে, একদিনও দেরি করাটা ঠিক হবে না। বুঝলে না, পরশুই যদি মন পালটায়? কে বলতে পারে।

আমি চুপ করেই রইলাম। ভাবলাম, ঠিকই তো!

ছগনভাই যে কে তা আমি জানতাম না। জিজ্ঞেসও করলাম না।

বড়োমামা বললেন, না না। চাকরি নিয়ে একদমই ছেলেখেলা নয়। জয়েন তো কালই করে যাক। তারপরে চাকরি পাকা হলে ছুটিছাটাতে চলে তো আসবেই টোটা বিলাসপুরে। ক-ঘন্টারই বা পথ।

আমার কিছুই বলার ছিল না। 'হ্যাঁ' অথবা 'না'। ফেল করতে করতে পাস করে যাওয়া ছেলে। কোনোক্রমে পায়ে দাঁড়াবার একটা সুযোগ বড়োমামা মাধ্যমেই যে পেয়েছি এই তো ঢের।

তখন আমার আমোদ স্ফূর্তি করার সময়ও ছিল না, মনও ছিল না আদৌ। বাবা মারা গেছেন ছ-মাস। পরীক্ষা খারাপ হওয়ার সে-ও একটা কারণ। ছোটো বোন আর মায়ের দায়িত্ব তখন আমারই। কিছু সঞ্চয় ছিল বাবার। কিন্তু টাকার দাম যেভাবে কমে যাচ্ছে তাতে তার উপরে ভরসা করা আদৌ যাবে না।

রাতে বড়োমামিরা আর ললিতা খুব যত্ন করে ষোড়শোপচারে রান্না করে খাওয়ালেন। যেন ফাঁসির আসামির খাওয়া। বিলাসপুরের লিংক রোডের বিখ্যাত মিষ্টির দোকন 'বেঙ্গল সুইটস' থেকে তিন-চার রকমের মিষ্টিও আনিয়েছিলেন।

ললিতা বলল, মেজো পিসি এইসব মিষ্টি খেয়ে ধন্য ধন্য করতেন। তাই তোমার জন্যও বাবা আনিয়েছেন।

আমি বললাম, শুনেছিলাম মায়ের কাছে। ঠিকই শুনেছিলাম।

পরদিন ভোরে তাঁর ডিউটি আরম্ভর সময়ের অনেকই আগে বেরিয়ে একটা সাইকেল রিকশা ধরে আমাকে নিয়ে বড়োমামা বাসস্ট্যান্ড এলেন। ছগনলাল পোপটলাল অ্যান্ড কোং-এর নামে একটি মুখবন্ধ করা চিঠি আমার হাতে দিয়ে সাবধানে রাখতে বলে আমাকে বাসে চড়িয়ে দিয়ে কনডাক্টর এবং ড্রাইভারকেও বারবার বলে দিলেন অচানকমার আর লমনির মধ্যে গামহারগাঁওতে যেন তারা আমাকে নামিয়ে দেয়।

অতি সবাধানি উনি, ওদের বারবার বুঝিয়ে বললেন, যে আমি কলকাতার মানুষ, এদিকের কিছুই চিনি না। ভালো হিন্দিও বলতে পারি না। তাই গামহারগাঁওতে নেমেই দশরথ-এর চা-এর দোকানে যেন আমাকে জিম্মা করে দেয় তারা।

আমাকে বললেন যে, আগামীকাল এই জয়সোয়াল বাসই যখন গিয়ে পৌঁছোবে গামহারগাঁওতে সেই সময়ে যেন ওই দশরথের চায়ের দোকানের সামনেই আমি দাঁড়িয়ে থাকি এবং ড্রাইভার ও কনডাক্টরকে জানিয়ে দিই সব ঠিকঠাক আছে কিনা। কোথায় থাকছি, কী খাচ্ছি কাজ কেমন লাগছে ইত্যাদি। এই সমস্ত তথ্য জানিয়ে তো দেবই আর কোনোরকম অসুবিধা হলে অবশ্যই যেন ড্রাইভারের হাতে একটা চিঠিও দিয়ে দিই ওঁর নামে। উনি বাড়ির কাজের লোককে পাঠিয়ে আনিয়ে নেবেন।

বড়োমামার পায়ের ধুলো নিয়ে তো জয়সোয়ালের বাসে চেপে পড়লাম। ছেড়ে দিল বাস।

মার্চের প্রথম। হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা। মনে হল সকাল সন্ধেতে এখানে এখনও রীতিমতো শীতের আমেজ থাকে। থাকবে আরও কিছুদিন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে ফাঁকায় চলে এল বাস। পনেরো মিনিটও লাগল না। পথের দুধারেই দিগন্তব্যাপী উন্মুক্ত মাঠ। দু-একটি খামারবাড়ি। তুঁতে-নীল আকাশ। ভালোই লাগছিল। সকালে পেট ভরে ফুলকো লুচি, আলু কালোজিরে-কাঁচালংকার ফোড়ন দেওয়া ঝাল-ঝাল লোত-লোত তরকারি আর পায়েস দিয়ে পেট পুরে খাইয়ে দিয়েছিলেন বড়োমামিমা। পথে কী পাওয়া যায় না যায়।

আগেকার মা-মাসিমা-পিসিমারা সব অমনই ছিলেন।

বাসের যাত্রীরা অধিকাংশই দেহাতি। কেউ চলেছে অমরকণ্টকে তীর্থ করতে। পুরো পথ বাসে যাবে না। বাস নাকি যায়ও না অমরকণ্টক পর্যন্ত। অনেকটাই হেঁটে যেতে হবে অত্যন্ত দুর্গম ও অরণ্যসংকুল পাহাড়ি চড়াই-এর পথে।

বিলাসপুরের পরেই বড়ো জায়গা পড়বে কোটা। সহযাত্রীদের মুখে শুনলাম বিলাসপুর থেকে কোটা কুড়ি মাইল মতন পথ। তখনও কিলোমিটারের দিন তো আসেনি। কোটাতে নাকি রেললাইনও আছে। সেখান থেকে একদিকে গেছে লাইন ঘুটুতে। আর অন্য একটি লাইন চলে গেছে বেলখানা হয়ে খঙ্গসোরাতে।

কোটা, নামটা চেনা চেনা লাগছিল। আমদের পাড়ার প্যানাদা (মানে, প্রণব রায়) নাম করতন প্রায়ই। এই কোটা নিশ্চয়ই সেই কোটা নয়।

যাত্রীদের নানা সুখ-দুঃখের গল্প শুনতে শুনতে নতুন দেশের অদেখা পথ বেয়ে যেতে বেশ ভালোই লাগছিল। যদিও হিন্দি বলতে তেমন পারতাম না তখন কিন্তু শুনে বুঝতে পারতাম কিছুকিছু। আমার সামনে শুধু নতুন অদেখা পথই নয়, নতুন জীবন, নতুন মানুষজন, নতুন পরিবেশ। সেখানে খাপ খাওয়াতে পারব তো? নতুন ভাষা, নতুন, রীতিনিতি। কী জানি, কি হবে!

নানা চিন্তাতে ঝিম মেরে বসেছিলাম।

নানা কথার টুকরো টাকরো ছিটকে আসছে কানে। বিচিত্র বেশভূষার আদিবাসী ও ছত্তিশগড়িয়া মানুষজন। কিছু বিভিন্ন জাতের অনাদিবাসী ব্যবসায়ীও আছে বাসে। ব্যবসায়ীদের চেহারাগুলি ধূর্ত ধূর্ত।

সাধারণেরা আলোচনা করছে কার খেত-জমিতে কী ফসল হয়েছে? কেমন ফসল? কার জামাই কার মেয়েকে নেয় না? কাকে হাটে গোরুওলা ঠকিয়ে দিয়েছি জব্বর? পনেরো সের করে দুধ দেবে বলেছিল বেইমান, গোরু বেচবার সময়ে, আর দেখা যাচ্ছে, সেই গোরুই বাছুর বিয়োনোর পরেই মোটে সাত-আট সেরের বেশি দিচ্ছে না দুধ। কারও দুধেল গোরুকে আবার মেরে দিয়েছে বড়ো চিতাবাঘ। কারও গ্রামের পথে ভালুকের নাকি বড়োই উপদ্রব। কারও চিনোবাদাম খেয়ে যাচ্ছে খরগোশে, আর মেঠো ইঁদুরে। কারও ভুট্টা টিয়া আর শম্বরে।

ছেলেমেয়ে হত না, অমরকণ্টকে নর্মদা উদগম-এ গতবছর গিয়ে মানত করেছিল, এ বছরে তার বউ-এর কোলজোড়া ছেলে হয়েছে, তাই মানত পূর্ণ করতে চলেছে সেই মাঝবয়সি মানুষটি। নতুন হওয়া বাবা। তার মাথাতে মুরেঠা, মোটা ধুতি মালকোঁচা করে পরা, গায়ে রঙিন কাপড়ের ফতুয়া, পায়ে নাল-লাগানো নাগরা জুতো, হাতে বাঁশের তেলপাকানো লাঠি। ছত্তিশগড়িয়া পুরুষ।

ভাবছিলাম, এ কোন রাজ্যে এসে পড়লাম আমি!

এখানে কলকাত্তাইয়া আমাকে কি এরা গ্রহণ করবে আদৌ?

বেশ অনেকক্ষণ লাগল 'কোটা'তে পৌঁছোতে। পথ ভালো নয়! বাসও সেকরমই। ঘন ঘন দাঁড়াতে দাঁড়াতে মালপত্র-বকরী-মুরগি-বৃদ্ধ-শিশু ওঠাতে-নামাতে চলেছে জয়সোয়াল কোম্পানির বাস।

একজন মাছ নিয়ে চলেছে, বিলাসপুর থেকে কিনে। এখানে কলকাতা থেকে নাকি বিলাসপুরে মাছ ব্যবসায়ীরা চারাপোনা নিয়ে আসে। এনে, ছোটো ছোটো পুকুরে সেই পোনা ফেলে বড়ো বড়ো মাছ করে। রুই-কাতলা। তবে তেমন বড়ো হতে পারে না। এক বছরের মাথাতেই জাল ফেললে তার বেশি বড়ো হবে কোত্থেকে! সেই সব মাছই নাকি বড়ো হবার পরে আবার কলকাতাতেই ফেরত চালান যায়।

অবাক হলাম শুনে।

কোটার মাইল দশেক পরে শেওতারাস নামের একটি জায়গা পড়ল। ছোটো জনপদ। বাংলোও আছে একাধিক। জানি না, সবই বনবিভাগেরই কি না।

তারও বেশ কিছুক্ষণ পরে বাস গিয়ে পৌঁছোল অচানকমার-এ। ছবির মতন জায়গাটা। পথের পাশে ডানদিকে অল্প ক-টি দোকান। বনবাংলোটি বাঁয়ে, অনেক ভিতরে। পথের কাছাকাছি,যাবার সময়ে বাঁ দিকে পড়ে আশ্চর্যরকম দেখতে একটি বাংলো। সেটিও বনবাংলোই। কাঠের বাংলো। পাটাতনের উপরে তোলা, এক বুক সমান উঁচু। গড়নটি অদ্ভুত।

বড়ো মেসোমশাই যে চা-বাগানে কাজ করতেন ভুটানের সীমান্তে, সেই তুরতুরি চা-বাগানের কাছের দু-একটি বনবাংলো দেখেছিলাম যদিও, কিন্তু সেসব জায়গাতে হাতির ভয়ে অনেকই উঁচু করে দোতলা বাংলো বানানো হয়। মনে আছে, স্কুলে পড়বার সময়ে একবার হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার পরে গেছিলাম। বড়ো মেসো তুরতুরি চা বাগানের ক্যাশিয়ার ছিলেন। উত্তরবঙ্গের বক্সা বনাঞ্চলের ভুটান ঘাটের জঙ্গলও ভয়াবহ। নিশ্ছিদ্র। এখানের জঙ্গল তেমন নিশ্ছিদ্র নয়, কিন্তু ভয়াবহ কিছু কম নয়।

এই দিকের জঙ্গলের চেহারা ছবিই আলাদা। শুনেছিলাম, এদিকে জন্তু-জানোয়ারও বক্সার জঙ্গলের তুলনাতে অনেকই বেশি।

অচানকমারে সব যাত্রীরা নেমে চা-শিঙাড়া-মিষ্টি খেয়ে নিলেন। আমার খিদে ছিল না। আর যখন তখন চা খাওয়ার বাজে বাঙালি অভ্যেসে তখনও রপ্ত হইনি। পয়সাও ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই ছেড়ে দিল বাস। এবারে চম্পাকাওয়ার দিকে। সেটিও ছোট্টই জায়গা।

লক্ষ করেছিলাম যে, কোটার পর থেকেই পথের দুপাশে গভীর জঙ্গল শুরু হয়ে গেছিল। কত যে গাছ, ফুল, লতা-পাতা এবং বাঁশঝাড়। ছোটো ছোটো বাঁশ। তুরতুরি চা-বাগানের আশপাশে

আর ভুটানঘাটের বনে যেমন গোদা গোদা বাঁশ দেখেছিলাম, তেমন নয়। কোনো গাছেরই নাম জানি না। কত পাখি, প্রজাপতি। তাদেরও কারোই নাম জানি না।

একঝাঁক টিয়া উড়ে গেল রাস্তার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। এতরকম পাখির মধ্যে শুধু টিয়াপাখিই চিনলাম। ভালো লাগল চেনা পাখি দেখে।

চম্পাকাওয়া থেকে লমনি তেরো-চোদ্দো মাইল। কিন্তু কয়েক মাইল গিয়েই, ঘন বনের মধ্যে বড়ো বড়ো নাম-না জানা গাছ যেখানে পথের উপরে প্রায় চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছে, সেখানে খাপরার চালের কয়েকটি মলিন এবং জরাজীর্ণ কুঁড়েঘরের সামনে বাসটি দাঁড়াল।

কনডাক্টর গলা তুলে আমাকেই বলল, অব আপ পৌঁছে গ্যায়ে হ্যায় বাবু। উতারিয়ে।

ছোট্ট ব্যাগটি কোলের উপরেই ছিল। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নেমে পড়লাম। কনডাক্টরও নেমে দশরথ নামের পেঁজা তুলোর মতন সাদা চুল-এর এক বুড়োর হাতে এই অর্পণকে অর্পণ করে দিয়ে বড়োমামার নাম বলল তাকে। বলল, বিলাসপুর টিশানকা বিধুবাবুকি বহিনকি লড়কা হ্যায় ই বাবু। জারা ছগনলাল-পোপটলাল কোম্পানিকো আদমিসে ইনকা ভেট করা দেনা। হুঁইয়েই কাম করেগা ই বাবু।

দশরথ নামক দাঁত-ফোকলা বৃদ্ধ কিছু একটা বলে আশ্বস্ত করল কনডাক্টরকে।

তবে কী যে বলল, তা আমি বুঝলাম না। তার আলতো কথাগুলি বাসন্তী হাওয়ার মুখে ফসস ফসস করে উড়ে গেল।

ড্রাইভার তার সিটে বসেই একবার হর্ন বাজাল।

ওই নিস্তব্ধ পরিবেশে ঘন বনের মধ্যে এঞ্জিনের ইলেকট্রিক হর্ন-এর আওয়াজ যেন প্রলয় উপস্থিত করল। গাছ-পালারাও যেন ভয়ে কেঁপে উঠল সেই দুপুর বেলাতেই থরথর করে। পথ পাশের ঘাসেরা নুয়ে গেল। লজ্জাবতীর ঝাড়ে দোলন উঠল। বিস্ময়ে ও ভয়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি।

ভাবলাম, এই বন, এই দুপুরবেলাতেই যদি এমন নির্জন, গহন, গা-ছমছম আধো অন্ধকার হয়, তবে রাতের বেলাতে না জানি কেমন হবে!

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল আমার।

ভাবছিলাম, আমার বাল্য-বন্ধু ফটকেটার খপ্পরে পড়ে যদি আমাদেরই প্রসবিত লিটল ম্যাগ 'নেতিবাচক'-এর পেছনে আমার জীবন-যৌবন না 'লড়াতাম' তাহলে বি.কম-এ অনেকই ভালো রেজাল্ট করতে পারতাম। গোদা গাঙ্গুলির লিটল থিয়েটার-এর দলেও যদি না ভিড়তাম তবেও অনেকই সময় বাঁচত। তা নয়, গরিবের ঘোড়া রোগ হল। নিজে তো কচ্ছপের মতন থপথপিয়ে বেড়াত গোদা, স্টেজময়। আর সাঁটুলি চরাতো দুপুরবেলা তমোময় চৌধুরীর ফ্ল্যাটে। গোদা লোকটা আমারই মতন অনেকই আনসাসপেক্টিং ছেলের কেরিয়ার তার নিজের নাম-যশের জন্যে যবের ছাতুরই মতন অবলীলায় এবং বিনা নুনে গুলে খেয়ে গেল।

টেস্ট পরীক্ষার ঠিক মাসখানেক আগে ফটকে এবং আমরা সকলেই ব্যাপারটা রিয়্যালাইজ করি। কিন্তু রিয়্যালাইজ করলে কী হয়! ইট ওজ টু লেট ইন দ্য ডে। তখন ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। ফটকে বলেছিল, 'এই লিটল থ্যাটার আর লিটল ম্যাগ-ই আমাদের মাগি অথবা MARSH MUGGER-এর মতন গিলে খেল র‍্যা। ভবিষ্যৎ ইক্কেরে ফরসা। জয়দেব ড্রপ দেবে এবারে। পরের বার ফার্স্ট ক্লাস পেলেও পেতে পারে। সে ড্রপ দিতে পারে। কারণ, তার বাপের পয়সার জোর আছে। কিন্তু আমাদের কোনো উপায়ই নেই। দাঁড়া, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, গোদাকে কি করে বোদা করতে হয় আমি দেখব।

বলেছিল, ফটকে।

সেই সব কথা এই অকুস্থলে এসে মনে পড়ে, হাসি পেল। মধ্যপ্রদেশের এই সাংঘাতিক ঘন বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে অভিসম্পাত দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই আমার ছিল না। তবু তো আমার বড়মামা ছিলেন বলেই এই চাকরিটা পেলাম। ফটকের মতন অন্য অনেকের তো তাও পাবার উপায় নেই।

জয়সোয়াল কোম্পানির বাস-এর ড্রাইভার, বুড়ো দশরথকে ড্রাইভিং সিট-এর কাছে ডেকে কনডাক্টরের ইনস্ট্রাকশন তার কাছে আবারও রিপিট করল। বিনয়ী বুড়ো, দুহাত জড়ো করে উচ্চাসনে বসে থাকা ঈশ্বরপ্রতিম ড্রাইভারকে ভক্তিভরে প্রণাম জানাল।

তারপর কনডাক্টর গোটা পাঁচ-ছয় চাঁটি মারল বাসের গায়ে। এই অন্ধবনের মধ্যে সেই চাঁটির শব্দেও ভরদুপুরের নিস্তব্ধতা মথিত হল আরেকবার।

বাস ছেড়ে দিল। শালপাতার দোনা, ফেলে দেওয়া কাগজের ঠোঙা, তার সঙ্গে নাম-না জানা হলুদ-লাল-ফুল এবং নানারঙা শুকনো পাতারা কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করতে করতে যেন বকবে বলেই দৌড়ে গেল বাসটার পেছনে পেছনে। তারপরই, হেরে গিয়ে, মাটিতে পড়ে কিছুটা লালমাটি পথে এলোমেলোভাবে ঘষটে এগিয়ে গিয়ে, থেমে গেল। নিস্তব্ধতা আবারও জাঁকিয়ে বসল বনপাহাড়ের দুপুরময়। কার্ফুরই মতন। বন এমনই ঘন যে এই আলো-ঝলমল চৈত্রের ভর দুপুরেও, পথের চাঁদোয়ার নিচের পথের উপরে যতটুকু আলো এসে পড়েছিল ফালি ফালি অন্ধকারের অলিগলিতে, তাতেও যেন ন্যাবা ধরল।

এই নির্জনতা, এই গভীর নিস্তব্ধতা এই মিশ্র গন্ধবাহী ঠান্ডা হাওয়া এবং দূরে গাঢ় সবুজ মেঘমেঘ পাহাড়শ্রেণি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল। মনে মনে বললাম, একেই বোধহয় বলে, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। তারপর বললাম, এ শুধু প্রেমই তো নয়, প্রগাঢ় ভয় এবং কৌতূহল মিশ্রিত এক অননুভূত অনুভূতিও।

বুড়ো দশরথ কিছুটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে আমকে একটি বড়ো খাপরার চালওয়ালা একতলা, লম্বাটে, চওড়া বারান্দাওয়ালা মাটির বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করাল। একটি সাদা পাঁঠা চরছিল বাড়িটার সামনে। একটি যুবক বসে বসে কী একরকমের লাল লাল ফুল জড়ো করছিল। মস্ত একটা গাছ বাড়িটার সামনে। গাছটাতে অসংখ্য লাল ফুল এসেছে। ঝরেও পড়েছে নিচে অনেক। ঠিক, লাল নয়, কমলারঙা।

বুড়ো দশরথ বলল, আররে এ মারুতি! সন্তু পানকা কাঁহা গ্যায়ে?

উনোনে তো কেঁওচি গ্যায়ে।

নিজের কাজ থেকে মুখ না তুলেই ছেলেটি বলল।

ওয়াহ! দিখ, ই বাবু কলকাত্তাসে আয়া। তুমহারা কম্পানিমে কাম করেগা। কামরা খোলকর বইঠা ইনকো। পানি-উনি পিলা।

তারপর বেঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে কোমরের পেছনে বাঁ হাত রেখে দম নিয়ে বলল, কবতক লওটেগা সন্তুরাম?

দশরথের হাঁপ-ধরা দেখে আমার মনে হল যে বুড়োর নিশ্চয়ই হাঁপানি আছে।

ম্যায় ক্যা জানু। হামকো বোলকর গ্যায়া থোড়ি। কাল সামকো পহেলেহি আ যানা চাহিয়ে থা। মগর আয়া কাঁহা? উও পেণ্ড্রাভি তো বড়া তংক কর রহা হ্যায়। কালহি রাতমে ই বকরাকো সাচমুচ উঠাকেই লে যাতা থা। জিগারি নেহি হোনেসে।

পেণ্ড্রা আবার কী বস্তুরে বাবা। জিগারিই বা কোন জন্তু?

মনে মনে বললাম, আমি।

জিগারি গ্যায়ী কাঁহা?

দশরথ আবার জিজ্ঞেস করল।

'গ্যায়ী'তে বুঝলাম যে জানোয়ার যাই হোক, স্ত্রী লিঙ্গের।

জঙ্গলমে গ্যয়ী হোগী। আ যায়েগী।

বলেই, মারুতি নামক আমারই সমবয়সি যুবকটি আমাকে বলল, আইয়ে বাবু। পাধারীয়ে।

বুড়ো দশরথ নমস্কার করে চলে গেল। বলল, কোনো চিন্তা নেই। সন্তুরাম পানকাই ছগনলাল পোপোটলাল কোম্পানির ম্যানেজার। কাল ফেরেনি তো কি হয়েছে। আজ অবশ্যই এসে পড়বে একটু পরেই।

আমি বুকপকেটে রাখা বড়োমামার চিঠিটার উপরে একবার হাত বুলোলাম। বড়োই ভয় করতে ও দুশ্চিন্তা হতে লাগল আমার।

গত রাতে সন্তুরাম পানকা ফিরে আসেননি এবং আজ রাতেও এলেন না। মানুষটা কেমন, দেখতে কেমন, তার বয়স কত, কিছুই জানি না। অথচ তিনিই আমার উপরঅলা। আর এই পানকা শব্দটা কি পদবি না উপাধি তাও বুঝতে পারলাম না।

এখন সকাল দশটা। রাতে তো আসেনইনি। এখনও পর্যন্ত আসেননি। সন্তুরামবাবু না-ফেরাতে বড়োই অস্বস্তিতে ছিলাম। বড়োমামার দেওয়া চিঠিখানি বুকপকেটে বোঝার মতন ঠেকছিল। নানারকম চিন্তা হচ্ছিল। তবে বুঝলাম যে, চিন্তা করেই বা কি হবে। আমার চিন্তার কথা ভুলে বড়োমামাকে কি জানাব জয়সোয়াল বাসের ড্রাইভারে মাধ্যমে, সেই চিন্তাতেই অমার মাথা গরম হয়ে গেল।

ভাবছিলাম, দিনের এই সময়টিতে মা আমার দু টুকরো পাঁউরুটি এবং এক কাপ চা খেয়ে কলতলাতে কাপড় কাচতে বসেছেন। পুঁটি স্কুলে গেছে। দাঁ-বাড়িতে দাঁড়কাক ডাকছে উঁচু পাঁচিলে বসে। মা বলছেন, যা! যা! পালা! হুস-স-স।

মা জানেন যে, ওরা যাবে না, যায় না, গরিবের ঘরের নিত্য অভাবের মতনই। কিন্তু তবু রোজই বলেন।

অভ্যেস। মায়ের যা অভ্যেস মা তা করেন এবং কাকেদের যা অভ্যেস তারাও তাই।

মায়ের কথা বড়ো মনে পড়তে লাগল। আমার বিধবা মা। অনেক দুঃখ আর অভাবের মধ্যেও ভালোবাসা দিয়ে বাবা আমার মাকে সব সময়েই আড়াল করে রাখতেন। সেই আড়াল চলে গিয়ে মায়ের জীবন, আমাদের জীবন, অভাবের উগ্র-আলোতে হঠাৎই বড়োই অসহায়, বে-আবরু হয়ে গেছে। যত কষ্টই বা অসুবিধেই হোক না কেন, এই গামহারগাঁও নামক আরণ্যক জায়গাটিতে আমাকে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতেই হবে। ফিরে গেলে, চলবে না। পুঁটি আর মায়ের সব দায়িত্ব তো আমারই।

গতকাল সন্তুরাম পানকা ফিরে আসেননি, কিন্তু জিগারি ফিরে এসেছিল।

সে আবির্ভূত হবার আগে আমি ভেবেছিলাম জিগারি হয়তো কোনো বিকট-দর্শন কুকুরি বা কোনো জাঁহাবাজ মহিলা হবে। কিন্তু সন্ধে নামার ঠিক আগে আগেই একরাশ বেগনি-রঙা বুনো

ফুল বুকের আঁচলে বেঁধে জিগারি নামক যে জীবটি নাচতে নাচতে এসে পৌঁছেছিল সে একটি কচি বয়সের ছিপছিপে যুবতী। বিদায়ী সূর্যের কমলা-আভা এসে পড়েছিল তার কালো মুখে, কাঁধ-ছাপানো চুলে। একটি হলুদ-রঙা ছেঁড়া শাড়ি পরেছিল সে, কালো-রঙা আদুর গায়ে, আদুড়চুলী মেয়ে।

গেছিলি কোথায়?

ধমক দিয়ে বলেছিল সমবয়সি মারুতি। যেন, সেই তার গার্জেন।

নাচতে নাচতেই জিগারি উলটো ধমক দিয়ে বলেছিল, ফুল কুড়োতে। কী সুন্দর গন্ধ দ্যাখ। দ্যাখ না!

বলেই, মারুতির নাকের কাছে তুলে ধরেছিল দু হাত জড়ো করে একমুঠো ফুল।

ইঃ! কী বদবু!

ইচ্ছে করেই মুখ বিকৃত করে জিগারি নামের মেয়েটিকে রাগাবার জন্যে বলেছিল মারুতি।

তোর নাক থাকলে তো তুই খুশবু পাবি? তোর বাবার নাক খুবলে নিয়েছিল মাট্রিনালাতে বড়কা ভালু আর তোর নাক খাবলে নিয়েছে তোরই মালিক। তুই জানতে পর্যন্ত পারিসনি।

আমার কোনো মালিক নেই। বড়হা দেওই আমার মালিক।

হুঁ। নেই আবার। সন্তুরামজি তোর মালিক নয়? খনা পাকাস না তুই? পা টিপে দিস না?

সে, তাকে ভক্তি করি বলে। বড়ে ভাইয়া বলে মানি বলে। তাও তো দু একদিনই, যখন ফাগগু থাকে না।

এ বাবুটো কে রে?

বলেই, জিগারি মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল।

বিলাসপুর থেকে এসেছেন। কোম্পানিতে কাজ করবেন। হিসেবপত্র, লাভ-লোকসান। ইনিই হবেন ছোটাবাবু এখন থেকে।

আর তুই? যেমন গোড় দাবাচ্ছিলি তেমন দাবাতেই থাকবি? আগে এক বাবুর দাবাতি এখন দুজনের। চারখানা পায়ের মালিক হলি তুই। বল?

বলেই, হি হি করে ঝরনার মতন হেসে উঠল জিগারি।

তা নামটা কি? তা তো বলবি বাবুটোর?

বলো বাবু, তোমার নাম বলো।

মারুতি বলেছিল।

আমার নাম অর্পণ।

আমি বলেছিলাম, নিজের চাকরির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে।

কী নাম রে বাবা! ডাকতে গিয়ে দাঁত ভেঙে যাবে যে! তা তোমার কি ভালো নাম নেই কোনো? কি বাবু?

এটাই তো ভালো নাম।

বোকার মতন বলেছিলাম আমি।

আহা! ভালো মানে, ছোটো নাম। ছোটো নাম নেই কোনো? অত বড়ো নামে কি রোজ রোজ কারোকে ডাকা যায়? তার উপর যে মানুষ কাছে থাকবে।

বলব না ভেবেও, বলে ফেললাম আমি, আছে একটা।

কি সেটা?

টোটা।

জেরবার হয়েই বলেছিলাম।

টোটা?

বলেই, খিলখিল করে হেসে উঠল জিগারি।

মারুতি বলল, হাসছিস কেন বদতমিজ-এর মতন?

হাসছি কেন? এই ভেবে যে, টোটাটা ফুটবে ত? না ফুট্টুস হবে?

কথাটার মানে না বুঝে আমি জিগারির দিকে বোকার মতন চেয়ে থেকেছিলাম।

তাতে জিগারির হাসির ঝরনা আরও জোরে বইতে লেগেছিল।

এতক্ষণ তো ফুল কুড়িয়ে বেড়ালি। রাতে খাবিই বা কি আর খাওয়াবিই বা কি?

কেন? আজ আমাদের ভোজ হবে।

ভোজ? কিসের ভোজ?

উত্তরে কিছু ভেবে না পেয়েই সম্ভবত জিগারি বলেছিল, এই বাবু এসেছে। তারই খাতিরে ভোজ। ভোজ-এর জন্যে কারণ খোঁজে শুধুমাত্র ছোটোমনের মানুষেরাই।

বলেই আবার হিহি করে হাসতে লাগল।

আমি ভাবছিলাম, একেই বোধহয় ইংরেজিতে বলে : 'FOR THE DROPPING OF A HAT....'

হাসি থামিয়ে এখন বল খাওয়াবি কি আজ রাতে? বাবু আজই প্রথম এলেন।

বন্যা জিগারি তার ফুলগন্ধী যুবতী শরীরে এক মোচড় দিয়ে বলল, আহা! এমন জ্যোৎস্না আজ রাতে। আজ তুই আমাকে খাবি আর আমি তোকে খাব।

মারুতি লজ্জা পেয়ে বলল, আমার দিকে ফিরে, 'ঘোটুলে' থাকলে এমনই বাঁদরি তৈরি হয়।

''ঘোটুল''টা কি জিনিস আমি বুঝলাম না।

জিগারি আরও জোরে হাসতে লাগল।

হাসি থামলে বলল, ঘোটুল তোদের টোটা ফোটাবার জায়গা নয়।

বলেই, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে আবারও হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, ঘোটুলে সেঁধোবার সখ তো তোর কম ছিল না। নেহাত মুকাদ্দম 'না' করে দিল তাই। তুই কি গোন্দ না মারিয়া, না বাইগা?

হাসি থামলে বলল, আজ শুখা মহুয়া ভেজে দেব তোদের তিল তেলে। জ্যোৎস্না দিয়ে মেখে খাবি তুই আর তোর নতুন টোটাবাবু।

বলেই, আবারও হেসে গড়িয়ে পড়েছিল জিগারি।

আমার মনে হল, হাসি বোধহয় এখানকার এক দুরারোগ্য রোগ। একবার ধরলে আর সারে না।

শুখা মহুয়া ভাজা, লংকা আর পেঁয়াজের সঙ্গে খেতে ভালোই লেগেছিল রাতে, কোনোদিনও খাইনি আগে। তেলের গন্ধের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে আরও। লাগবে অনেক সময় এই জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হতেও।

খাওয়াদাওয়ার পরে সাদা পাঁঠাটাকে নিয়ে জিগারি শুয়েছিল নানারকম বীজ ও ফলে ভরা আমাদের ঘরেরই লাগোয়া একটা গুদাম ঘরে। আমি আর মারুতি শুয়েছিলাম পাশাপাশি দুটি চৌপাইতে। চৌপাইতে ছারপোকা ছিল বিস্তর। ঘুম আসছিল না। মারুতি নামক সমবয়সি ছেলেটি কিন্তু অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। ছারপোকারা কোনোই ব্যাঘাত ঘটাতে পারছিল না সেই গাঢ় ঘুমে। মধ্যের দরজাটা ভেজানোই ছিল। একটি রেড়ির পিদিম জ্বলছিল দু ঘরের মাঝে। দরজার সামনে। বাইরে ঘোলাটে জ্যোৎস্না। যদিও চৈত্র মাস। হাওয়া বইছিল নানা বনফুল আর পাতা ঘাস-এর গন্ধ বয়ে। কত নাম-না-জানা পাখি চমকে চমকে ডাকছিল জঙ্গলের ভেতর থেকে। কাছেই বোধহয় কোনো নদী আছে। মন বলল আমার। বারান্দায় বসে মনে হচ্ছিল ওই নিবিড় জঙ্গলের চন্দ্রাতপ কিছুদূরে গিয়ে হঠাৎই যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। আকাশের মাটি-ছোঁওয়ার আভাস দেখা যাচ্ছে

সেখানে। নদীর উপরে যে পাখি ডাকছে তাদের স্বরের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যের পাখির স্বরের অমিল আছে। কী যেন একটা প্রাণী বা পাখি ডাকছে থেকে থেমে কাছেরই কোনো গাছের মাঝখান থেকে, টাকটু-উ। টাকটু-উ। অশ্রুতপূর্ব স্বরে।

গা-ছমছম করছিল আমার।

ঘুম এসেছিল সে রাতে অনেকই সাধনার পরে। কিন্তু মাঝরাতে করাতে কাঠ চেরাই করলে যেমন আওয়াজ হয়, তেমন আওয়াজে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল আমার। ভয় পেয়ে উঠে বসলাম চৌপাই-এর উপরে। আওয়াজটা জঙ্গলের গভীর থেকে উঠে আস্তে আস্তে ছগনলাল পোপোটলাল-এর এই গুদাম আর সেরেস্তার দিকেই যেন ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। আওয়াজটা যখন আরও কাছে এল এবং অনেকই জোর হল তখনই মারুতি উঠে বসে আমার দিকে চেয়ে বলল, শো যাও বাবু। আরামসে শো যাও। পেন্ড্রা শালে রাতভর এইসেহি ঘুমতে রহে গা।

বলেই, গলা তুলে ও ঘরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, এ জিগারি। বকরাকো ঠিকসে সামহালকে রাখখা না?

জিগারি কি জেগে ছিল? কে জানে? সে বোধহয় ঘুমের মধ্যেই বলল, হাঁ হাঁ। কুম্ভকর্ণ কি নিদ টুট্টা? আভভি আভভি?

তারপর বলল, আকর দিখকে যানা মেরি দিওয়ানা। মেরী দোনো টেংরিকি বিচমে কেয়সী দাবকে রাখখা উও বকরাকো। ক্যা কহুঁ! ইয়ে বকরা নেহি হো কর মর্দ আদমী হোতাথা, ইয়া তু হোতাথা, তো অবতক এইসেহি মর যাতা থা।

বলেই, আবারও খিলখিল করে হাসতে লাগল।

কী একটা অজানা ভাষাতে জিগারিকে একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে মারুতি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

বলল, শো যাইয়ে বাবু। ইয়ে মাদীন সাচমুচ ডাকিন হ্যায়। শো যাইয়ে। কাল জঙ্গলমে আপকি বহতই চলনা পড়ে গা। হামলোগোঁকি পুরা ইলাকা আপকি দিখানা হ্যায় না ঘুমাকে। পেণ্ড্রা রোডসে আকর ম্যানেজার সাব সব বাতাকে গ্যায়া মুঝে। চুন্নুবাবু ভেজিন থা উনকো।

চুন্নুবাবু কে?

মালিক। আবার কে? পোপটলাল ছগনলাল কোম্পানির বড়ো শরিক হচ্ছেন তো উনিই।

তারপরই চিন্তান্বিত গলাতে বলল, ক্যা জানে, ক্যা হো গ্যয়া সন্তুরামজিকো! কাহে আয়া নেহি আজ ভি লওটকে? কভভীতো এইসা কিয়া নেহি উনোনে ই পাঁচসালমে। ওয়াক্ত দেনেসে উনকি মুর্দাভি ওয়াক্ত রাখেঙ্গে। অ্যায়সা আদমী হ্যায় উনোনে।

সাতসকালে উঠে জিগারি ইয়া মোটা মোটা রুটি বানিয়েছিল জওয়ারের। আর সঙ্গে আলুর চোকা। কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লংকা। এসব কোনোদিন খাইনি বলেই মুখে খুব সুস্বাদু লাগল। তবে জানি না, হজম হবে কি না! মনে হল পেটের ভেতরে গিয়ে থান ইটের মতন থিতু হল।

আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে জিগারি বলল, ভাগলাম আমি।

কোথায়? ভাগবি কোথায়?

মারুতি জিজ্ঞেস করল।

আরে আজ লমনিতে যাব যে!

কেন? লমনিতে কি?

মুলারী দিদি দাওয়াত দিয়েছে। গাঁ থেকে এসেছে সে লমনিতে। কদিন পরেই ফিরে যাবে।

কোন মুলারী? ছিরহুট-এর?

হাঁ হাঁ। কটা মুলারী আছে আর এ তল্লাটে?

পরক্ষণেই মারুতির দিকে চেয়ে দু কোমরে দু হাত রেখে বলল, আর রে! বাত ক্যা? বড়ি লম্বা শ্বাস গিড়া তুমহারা। বিচ্চারী!

বলেই, খিলখিলিয়ে, হাওয়ার দোলা লাগা লতার মতন কেঁপে উঠল। হেসে উঠল।

এই খবরদার। তোকে মারব আমি। মারুতি কপট রাগ এবং খুশির সঙ্গে বলল, ওকে।

আমাকে কেন মারবি? আমি কি তোর বউ? মেরেই একবার দেখ না। দুচোখ একেবারে গেলে দেব।

বউ হলেই তাকে মারবার হক্ক আছে এখানে সকলেরই। এমনই মনে হল আমার।

জিগারি বলল, কাল সকালে আসব। বেরোবার আগে কৌশল্যাদিদিকে বলে যাস, আজকের খাওয়ার-দাওয়ার বানিয়ে রাখবে। তারপর ডেরায় ঢোকার আগে, দশরথ নানার দোকানেই খেয়ে নিয়ে ঢুকিস। খাবার জল এনেই রেখেছি। কলসিতে আছে।

তারপর আমার দিকে ফিরে কোমর ঝুঁকিয়ে দু হাত জড়ো করে বলল, আচ্ছা বাবু, টৌটা বাবু অব ম্যায় চলে। কোই কসুর কিয়া হোগা তো মাফ কর দিজিয়ে গা।

আমি কিছু বলার আগেই বাঁ হাতে তার শাড়ির আঁচল এক ঝটকাতে টেনে, সুডৌল সফেদার মতন খয়েরি স্তনযুগল ঢেকে, সাদা বকরীটার বাঁ কান ডান হাতে ধরে তাকে হিড়হিড় করে পাশে পাশে হাঁটিয়ে নিয়ে বড়ো বড়ো গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায় পায়ে চলা পথে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই ডানদিকেই একটা বাঁকে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু রেখে গেল তার শরীরের গন্ধ, বুনোফুলের গন্ধেরই মতন।

আমি ভাবছিলাম, এই মেয়ের যৌবন যখন সুপূর্ণা হবে, শ্রাবণী হবে, তখন কী হবে!

হবে আবার কী?

আমাদের পাড়ার রক-এর নান্টাদাই যেন কানের কাছে বলে উঠল, 'কেলো হবে র‍্যা টৌটা! পরম কেলো।'

গুদামের আর সেরেস্তার সব দরজাতে তালা মেরে এবার বেরিয়ে পড়বে মারুতি আমাকে সঙ্গে নিয়ে। বেরোবার সময়ে সেরেস্তার এক কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি ঝকঝকে টাঙ্গি তুলে কাঁধে ফেলে বলল, চালিয়ে টৌটাবাবু, অব চলা যায়।

আমরা তো চলব কিন্তু সন্তুরাম বাবু ফিরলে উনি ঘর খুলবেন কি করে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মারুতি বলল, ডুপ্লিকেট চাবি আছে। তাছাড়া তেমন হলে বড়ো রাস্তার উপরের কোনো দোকানে থেকে যাবেন। নইলে, বস্তিতে থেকে যাবেন।

বস্তি মানে?

মানে গামহারগাঁও।

সেটা কোথায়?

বড়ো রাস্তার ওপারে।

কত লোক থাকে সেখানে?

তা পঁচিশ ঘর মানুষ হবে।

সাঁওতাল?

এদিকে সাঁওতাল তো নেই। ছত্তিশগড়ে আদিবাসী বলতে গোন্দ, বাইগা, পানকা, ভিমা। গামহার বস্তিতে গোন্দরা থাকে।

সন্তুরামবাবুর খাওয়া-দাওয়া?

দশরথ নানার দোকানেই খাওয়া দাওয়া করে নেবেন। আমাদের গামহারগাঁও, জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট জায়গা। এখানে সকলেই সকলের আপন। নিজের ডেরা ছেড়ে একটা দিন আর রাত কাটানো কোনো ব্যাপারই নয়।

রাত কাটানো মানে? আমরা কি রাতেও ফিরব না?

নাও ফিরতে পারি, কে বলতে পারে?

সে কি?

আশ্চর্য হয়ে বললাম আমি।

হাঁ বাবু। যেইসি দিল করেগা ওইসেহি করেগা। জঙ্গলকি ইনার-কিনারমে ঘুমনাহি তো হ্যায় হামলোগোঁকো কাম। এহি তো নোকরী হমালোগোঁকি বাবু।

এখানে আসা ইস্তক এই প্রথমবার কথাটা পাড়বার সুযোগ পেয়েই বললাম, সেই তো হচ্ছে কথা। কাজটা কি? যদি একটু বুঝিয়ে দিতে ভাই।

হবে। হবে। আপনিও পালাচ্ছেন না, কাজও পালাচ্ছে না। আর আমি তো পালাচ্ছি না-ই।

তক্ষুনি আমার মনে পড়ে গেল বড়োমামা বলেছিলেন, জয়সোয়াল বাস-এর ড্রাইভার বা কনডাক্টর-এর হাতে ওঁকে চিঠি পাঠাতে।

একটু কাগজ হবে?

লজ্জা পাওয়া গলায় বললাম আমি।

নিশ্চয়ই।

বলেই, মারুতি নানা বস্তুতে ভরপুর উঁচু হয়ে থাকা তার নীল রঙা হাফশার্ট-এর বুক পকেটের গভীরে বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল চালান করে দিয়ে অনেক গ্রহণ বর্জন করার পর এক টুকরো লালচে কাগজ বের করে দিল।

কলম?

হাঃ সেরেস্তার মুহুরি হয়ে এলেন, সঙ্গে না একটুকরো কাগজ, না কলম। যেইসী মেরে বড়াবাবু ওই সেহি ছোটাবাবু আয়া। হায়! হায়!

কলম মারুতিরও ছিল না। তবে তার পকেট থেকে একটি হলুদ-রঙা পেনসিল উঁকি মারছিল। সেটিই বার করে এগিয়ে দিল। তারই উপরে লিখব মনে করে একটি মস্ত সাদাটে গাছের মোটা গুড়িতে কাগজটা ঠেকিয়ে দিতেই কাগজটা ফুটো হয়ে গেল।

হাহা করে হেসে উঠল মারুতি।

বলল, এটা সিমাল গাছ। এর গা-ময় কাঁটা। অন্য গাছে লাগিয়ে লিখুন। পাশের গাছটাতেই লাগান না।

পাশেই একটা অতবড়ো না হলেও ফ্যাকাশে হলদেটে-সাদা বেশ বড়ো একটি গাছ ছিল।

মারুতি বলল, হাঁ। এবারে লিখুন। এটা গামহার। এই ইলাকা গামহারো ছাওয়া, তাই তো এই বস্তির নামও গামহারগাঁও।

গামহার। গাছের নাম?

তাই তো।

কাগজে লিখতে লিখতে বললাম, গ্রামটা দেখতে হবে তো।

জরুর। সবই দেখবেন আস্তে আস্তে। দেখাব আপনাকে। দেখবেন। গ্রাম দেখবেন, নদী দেখবেন। গামহারগাঁও থেকে আধমাইলটাক দূরে নদীর পাশে আছে অন্য এক গাঁও। ছোট। বাইগাদের। দশ ঘর মতো মানুষের বাস। হোলি তো এসেই গেল। নিয়ে যাব আপনাকে।

বড়োমামাকে সত্যি কথা লিখতে হলে সেটা তাঁর পক্ষে সুখের তো হতই না, হয়তো অপমানজনকও হত। তাই লিখলাম :

শ্রীচরণেষু বড়োমামা,

চমৎকার আছি। খুবই ভালো লাগছে। কাজও ভালো লাগছে। খাওয়া থাকার কোনো অসুবিধাই নেই। পরে বড়ো করে চিঠি দেব। প্রণাম জানবেন।

ইতি—টোটা।

তারপর?

এটা জয়সোয়ালের বাসের ড্রাইভার বা কনডাক্টরকে দিতে হবে বিলাসপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

বলে, আমি মারুতির দিকে এগিয়ে দিলাম চিঠিটা।

ও। তা চলুন। বড়ো রাস্তা দিয়ে গিয়েই জঙ্গলে ঢুকব এখন। দশরথ নানাকেই তো চিঠিটা হবে দিতে। ভালোই হল। দশরথ নানাকে বলেও যাওয়া হবে যে, বিকেল বিকেল ফিরে আমরা সেখানে খেতেও পারি।

রাতের খাবার?

হ্যাঁ। কিন্তু এইসব জঙ্গল পাহাড়ের ঠাকুর দেবতা ভূত প্রেতের এলাকাতে সূর্যদেবের সঙ্গেই আমাদের প্রত্যেকের নাড়ি বাঁধা। তিনি উঠলেই আমরা উঠি, তিনি শুলেই আমরা শুই। কত্তরকমের বিপদ এখানে। দিনের বেলাই সামাল দেওয়া যায় না, আর রাতে তো কথাই নেই। গত রাতে তো বিছানা ছেড়ে চোখ বড়ো বড়ো করে উঠেই বসেছিলেন খিল-আঁটা ঘরের মধ্যে। আর রাতের বেলা কি আপনি এখানে থাকতে চান বাইরে?

ভয় তো করছিলই তার উপরে এইরকম খাওয়া চলতে থাকলে তো কথাই নেই। দু মুঠো ভাত অন্তত একবেলা না পেলে সেই দুঃখেই পালাতে হবে। চাকরির যতই প্রয়োজন থাক।

মুখে বললাম, কিন্তু ওই পেণ্ড্রা ওটা কী জানোয়ার?

দুখু বাইগা, বড়ো শিকারি, বলে শোনচিতোয়া। সাহেবরা বলে, লেপার্ড।

তাই?

জি হাঁ।

দশরথ নানা মানুষটা ভারি ভালো। বুক পিঠ এক হয়ে গেছে। খালি গা। কুচকুচে কালো রং। নিম্নাঙ্গে সাদা ধুতি। নাভির ঠিক উপরে বাঁধা ধুতির কসি। সামনে কোঁচা ঝোলানো, মাথা ভর্তি ধবধবে সাদা চুল। পেঁজা তুলোর মতন। তার দোকানে আজ দেখলাম একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী। শ্যামা, সুন্দর গড়নের। জাম-রঙা শাড়ি এবং সাদা ছোটো হাতা ব্লাউজ পরে, মাথাতে জাম-রঙা বনফুল গুঁজে মনোযোগ দিয়ে শিঙাড়া গড়ছে। আর তার পেছনে একটি বছর তিনেকের শিশু একমুঠো ধুলো বাঁ হাতে মনোযোগ সহকারে মুখে পুরছে।

শালপাতার পাতা দিয়ে বানানো বারকোশ-এ রাখা শিঙাড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে মারুতি আমাকে বলল বুঝিয়ে, বাস এসে পড়বে তো এখুনি কেঁওচির দিক থেকে এবং কোটার দিক থেকেও, সকালের বাস! তাই তো এখন দশরথ নানার দোকানে মহা ব্যস্ততার সময়।

যে মেয়েটি শিঙাড়া গড়ছিল সে মুখ তুলে বলল, যতটুকু ভিড় এই সকালে বিকেলেই। নাস্তার সময়ে। দুপুরের খানা আর কে খায়?

তা বটে। ওই দ্যাখো দ্যাখো কৌশল্যা, তোমার ছেলে ধুলো খাচ্ছে।

যার বাপ ধোঁকা খায় তার ছেলে ধুলো ছাড়া আর কি খাবে?

কৌশল্যা নামের মেয়েটির মধ্যে খুব বিরক্তি আর রাগ রয়েছে দেখলাম। কারণ জানি না। জিগারির কথা মনে হল। তার মধ্যে শুধুই হাসি। তার মস্তিষ্কের হাসি, পেটে হাসি, মুখে হাসি,

চোখে হাসি। এত হাসি যে একজন বইতে আদৌ পারে তা জিগারিকে চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করতাম না।

মারুতিকে বললাম, কেঁওচি নামটা ভারি অদ্ভুত তো!

হাঃ। এই ভূতের রাজ্যে সবই অদ্ভুত।

কেঁওচিটা কোথায়?

এই পথেই সোজা এগিয়ে গেলেই কেঁওচি, পথে লমনি পড়বে।

কেঁওচি থেকে বাঁদিকে এগিয়ে কিছুদূর গিয়েই আবারও বাঁদিকে গেলে পেন্ড্রা রোড। রেল স্টেশান। সেখান থেকেই আমাদের সব মাল রেক-এ লাদাই হয়। বস্তীর নাম অবশ্য পেন্ড্রা। যাঁরা অমরকণ্টকে তীর্থ করতে যান তাঁরা ট্রেনে পেন্ড্রা রোড স্টেশানেই নামেন। ওই বস্তির নামেই স্টেশানের নাম। বিলাসপুর থেকেও আসেন অনেকে।

'রেক' মানে কি?

আরে! 'রেক' মানেই জানেন না বাবু আর টিশানবাবুর সুপারিশে চাকরি হল আপনার! মালগাড়ির অনেকগুলো ওয়াগন পরপর জুড়ে একটা 'রেক' হয়। দেখাব আপনাকে।

দশরথ উনুনের আঁচটা ঠিক করতে করতে বলল স্বগতোক্তির মতন, সন্তরাম পানকার কি হল?

জানি না। তাই তো ভাবছি।

বাঘে নিল না তো?

কী করে বলি বলো নানা?

কৌশল্যা বলল, ডাইনও নিতে পারে। যে মানুষ গাছ বোঝে না কাঠ বোঝে, ফুল বোঝে না ফল বোঝে, চাঁদ বোঝে না রোদ বোঝে, তাকে শুয়োরে কেন ফেড়ে দেয়নি এতদিন, ভালুতে কেন নাক চোখ খুবলে নিল না তার তাই ভেবে পাই না। এমন একটা বেরসিক মানুষ, যার কাছে ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক, আওরাত-এর ভালোবাসা সবই 'বে-কাম-কি' সে বেঁচে থাকল কি মরে গেল তাতে কীই-বা যায় আসে।

পেন্ড্রা রোডে খবর পাঠাব একটা?

দশরথ বলল।

পাঠাও না। জয়সোয়ালের যে বাস পেণ্ড্রা রোড-এ যাচ্ছে তার ড্রাইভারকে বলে দিও তো চুন্নুবাবুকে খবরটা দেবে যে, সন্তরাম পানকা ফেরেনি রাতে।

ঠিক হ্যায়।

বলল, দশরথ।

কৌশল্যা শিঙাড়া গড়তে গড়তে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল কিন্তু মুখে কিছুই বলছিল না। মেয়েটির চোখের দৃষ্টি ভালো নয়। চোখ দিয়ে চাটছে যেন সর্বাঙ্গ। অস্বস্তি লাগছিল।

আমরা দোকান ছেড়ে এগোতেই পেছন থেকে মারুতিকে বলল কৌশল্যা, এই রাঙাবাবুটো কে রে?

পানকা বলল, কোম্পানির লোক। এখন থেকে এখানেই থাকবেন। কাজ দেখাশুনো করবেন, হিসেব রাখবেন। একাউন্টো বাবু।

একাউন্টো বাবু। তোকে টাইট করার জন্যে পাঠিয়েছে যে চুন্নুবাবু, তা বুঝেছি। কিন্তু তোর সেই বড়োবাবুর খবর কি?

বাবুর খবর দিয়ে আমার কি দরকার? তোমারই বা কি দরকার কালু? শিঙাড়া গড়ছ তাই গড়ো না।

কৌশল্যা হঠাৎ রেগে উঠে বলল, কান খুলে শোনো। আমার দরকার অবশ্যই আছে।

দশরথ নিচু স্বরে কী একটা বলল কৌশল্যাকে। আমাকে দেখিয়ে, হয়তো নিরস্ত হতে বলল।

কিন্তু কৌশল্যা বা মারুতির "কালু" চিলচিৎকারে বলে উঠল, যবতক সামোসামে আলু রহেগা তবতক গামহারগাঁওমে ইয়ে কালু ভি রহেগী! হাঁ।

একটু এগিয়ে যাওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম ওই মেয়েটি মাথাতে যে ফুল গুঁজেছিল বেগনি রঙা সেটা কি ফুল?

আরে। তাও জানেন না? ওর নাম জারুল। যে গাছে ওই ফুল ফোটে তার গাছ খুব শক্ত হয়। পারুল বলেও একরকম গাছ আছে। তাদের ফুলও ভারি সুন্দর।

কি রং এর?

আশ্চর্য এক কমলা-রঙা।

তাই?

আমি বললাম।

আজও দশরথ নানার দোকানে পুরি, আলুর চোকা এবং কাঁঠালের আচার খেয়ে এসে রাতে আমরা দুজনে ভাণ্ডারের বারান্দাতেই বসেছিলাম। জিগারি আসেনি আর। গামহারগাঁওতে যে খিদমতগার থাকে, ফাগগু, সেও। সন্তুরামবাবুরও কোনোই খোঁজ নেই এখনও।

কী ব্যাপার কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

বাংলাতে আমরা যাকে গুদাম অথবা অনেক সময়ে খামারও বলি ওরা তাকেই বলে ভাণ্ডার। পায়ের সামনে আগুন করেছে মারুতি, ফিকে হলুদ রঙা জংলী কাঠের একটি বড়ো গুঁড়িতে। আগের দুদিনও ওতেই আগুন করেছিল। সারা দিনমান অদৃশ্য আগুন জ্বলেছে, ছাই চাপা হয়ে। রাতের অন্ধকারে এখন সেই আগুন দৃশ্যমান তো বটেই, জোরও হয়েছে। তবে দুজনের গা গরম করার জন্যে এবং বন্যপ্রাণীদের ভয় পাওয়ানোর জন্যে যতটুকু জোরের দরকার ততটুকুই জোর করেছে আগুনটাকে মারুতি। ফুটফাট শব্দ উঠছে এখন সেই আগুন থেকে। মারুতির কালো মুখটি আগুনের আভাতে বেগনি দেখাচ্ছে।

বেশ মানুষটি। আজ নিয়ে এখানে তিনদিন হল আমার। সহকর্মীর সঙ্গে এই তিনটি দিন 'কর্মক্ষেত্রে' ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে তাকে বেশ ভালো লেগে গেছে। নতুন জায়গাতে এটা একটা ঘটনার মতন ঘটনা। আর কর্মক্ষেত্র তো ভালো লেগেছেই। কেবলি মনে হচ্ছে, এ এক নতুন দেশে এলাম। এ দেশ আমাদের দেশের মধ্যেই ছিল সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না আমার।

গাছপালা থেকে এখনও রাতে শিশির ঝরছে। তবে আর কিছুদিন গরম পড়বে এবারে আস্তে আস্তে। গত রাতেও টুপটাপ করে শিশির পড়ার শব্দ শুনেছি। ছোটো বড়ো হাতির মতন নানা আকারের বড়ো বড়ো কালো পাথরের যে স্তূপ ও টিলা মতন আছে ভাণ্ডারের সামনেই তার উপরে। নানা গাছ-পালাতে সেই টিলা সমাচ্ছন্ন। মারুতি বলে, ভালু-টুং। সেই টিলাটার সামনেটাতে একটা চাতাল মতন আছে। রেকটাংগুলার। তাতে পঞ্চাশজন মানুষ একসঙ্গে শুয়ে-বসে থাকতে পারে স্বচ্ছন্দে। সেই চাতাল পেরুলেই একটি গুহা। কে জানে! এই 'ভাণ্ডার' বানানোর আগে সেই গুহাটিতে হয়তো ভাল্লুকই থাকত। মোটে তিন বছর বয়স হয়েছে নাকি গামহারগাঁও-এর এই ভান্ডারের। ভালু-টিলার পাশেই যে মস্ত গাছটা, যার লাল লাল ফুল

কুড়োচ্ছিল মারুতি পানকা, তার নামই শিমুল। আমাদের উত্তর কলকাতায় সে গাছ হয়তো আছেও দু' একটি। জানি না। কিন্তু কেউ তো চিনিয়ে দেয়নি আগে। শিমুলকেই ওরা বলে 'সিমাল'।

কলকাতার মানুষ রাজপথ চেনে। অট্টালিকা, হর্ম্য চেনে, ট্রাম-বাস-এর নম্বর জানে, গাছ বা পাখির খোঁজ তো কেউই রাখে না সেখানে।

মারুতি বলছিল, ফুল এখন সবে এসেছে। আর কদিন বাদেই চারদিক লালে লাল হয়ে যাবে। এই ফুল, কোটরা হরিণেরা ভারি ভালোবেসে খায়।

কোটরা কি?

ও আমার অপার অজ্ঞতাতে, আমার মুখে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে ক্ষমাময় হাসি হেসেছিল। বলেছিল, কোটরাও জানো না? এক রকমের ছোটো হরিণ। লালচে-রঙা হয়। বাঘ বা অন্য কোনো খতরনাক জানোয়ার দেখলে তুমুল ডাক ডাকে। তার ডাক যারা চেনে না, তোমার মতন আনপড় যারা, সন্ধের মুখে, মাঝরাতে বা প্রথম ভোরে সেই ডাক শুনলে তাদের বুকের মধ্যে তখন লোহারের হাপর চলে।

লোহার শব্দটির মানেও জানি না আমি কিন্তু হাপরের উল্লেখে বুঝলাম যে, লোহার মানে কামার।

তুমি কি হাতি দেখেছ কখনও এইসব জঙ্গলে?

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

আমাদের বনে-পাহাড়ে হাতি নেই।

কেন নেই? এমন জঙ্গল।

বুড়হা দেও-এর ইচ্ছা। সব পশু-পাখিই তো তাঁরই সৃষ্টি করা। কে কোন বাগানে খেলবে তা ঠিক করে দেওয়ার মালিক তো তিনিই। হাতি নেই বলেই হাতি নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষদের এত কাব্যি, হাতির নামে পাহাড়ের নাম, নদীর নাম, ডুংরীর নাম।

বলেই, মারুতি বলেছিল, যাই বলো আর তাই বলো, মানুষ বড়ো আদেখলা জীব।

শিমুল গাছেদের হাতগুলি দুধারে ছড়ানো, সমান্তরালে। জ্যোৎস্নাতে সপ সপ করছে শিশিরে-ভেজা শিমুল গাছটা। আর সেই গাছের একেবারে মগডালে কী একটা কালো বড়ো পাখি বসে আছে রাতের অতন্দ্র প্রহরীর মতন। পাখিটার বুকটা সাদা। পিঠটা কালো। দেখে মনে হয়, শিক্‌রে বাজ-এরই কোনো প্রজাতি।

শিকড়ে বাজ-এর কথা মনে হতেই আমার খগেন্দ্রনাথ মিত্রর "ভোম্বল সর্দারের" কথা মনে পড়ে গেল। আহা! কী একখানা বই।

কলকাতার আকাশেও হয়তো এসব পাখি ওড়ে, কিন্তু দেখবার মতন অবকাশ সেখানে আমাদের কোথায়? কোন পাখিটা যে কি, তাই-বা বলে দেবে কে? পাখির নাম জানার দরকারই বা আছে কার?

কি পাখি ওটা?

মারুতিকে জিজ্ঞেস করলাম।

মারুতি গাছটার দিকে পেছন ফিরে বসেছিল। মুখ না ফিরিয়েই বলল, মোরাঙ্গি।

মোরাঙ্গি? সেটা আবার কি পাখি?

বাবা! শিকারি পাখি। খরগোশ, সাপ, হাঁস মুরগি, বক, কাক, চিল পোকামাকড়ও খাবার একেবারে যম। এখন ভালো মানুষটির মতন বসে আছে। যেন ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানে না। এর জুড়িটাও আছে। দুজনে এসেও বসে মাঝে মাঝে।

ইংরেজি নাম জানো না?

নাঃ। আমি কি ইংরেজি জানি? সে সব বলতে পারেন লেবিন সাহেব।

তিনি কে?

সাহেব। সাদা চামড়ার সাহেব।

কোথায় থাকেন?

আবার কোথায়। তাঁর বাংলোতে।

কোথায় সেটা?

ইসিবিসির কাছে।

করেন কি?

উনি কিরিস্তান। গ্রামের লোকদের নিয়েই থাকেন। অসুখ করলে চিকিৎসা করেন। ইংরেজি শেখান। গ্রামে ঝগড়া বিবাদ হলে সালিশির কাজ করেন। সকলেই ভালোবাসেন তাঁকে।

উনি বলতে পারবেন এই পাখির ইংরেজি নাম?

নিশ্চয়ই বলতে পারবেন। কত বই আছে ওঁর কাছে। মাঝে মাঝে বম্বে ও কলকাতাও চলে যান।

কি করে যান ?

কেন? রেলগাড়ি করে। পেন্ড্রা রোড স্টেশান থেকে যান অথবা সোজা বিলাসপুর থেকেই।

একবার নিয়ে যেয়ো তো আমাকে তোমার লেবিন সাহেবের কাছে।

যাব। আগে সন্তরাম পানকার একটা হদিস হোক। তারপর সব হবে।

পানকা কাদের বলে? তুমিও তো তোমার নাম বলেছিলে পানকা।

হ্যাঁ। আমরা তো পানকাই। পানকারা ছোটো জাত টোটাবাবু।

ওসব জাতফাত আমি মানি না। সব মানুষই সমান।

তা কী করে হয়। সমানই যদি হবে তবে এত জাতের দরকার কি ছিল?

তা আমি জানি না। আমি কোনো জাত মানি না। সত্যিই সব মানুষই আমার চোখে সমান।

এমন সময় সেই প্রকাণ্ড শিমুল গাছটার মগডাল থেকে সেই পাখিটা হঠাৎই ডেকে উঠল আচমকা। অদ্ভুত ডাক। ডাকটা এমন, যেন পাখিটা বলল, কীরে? কীরে? কিকিকি?

চমকে উঠলাম আমি।

মারুতি আমাকে চমকাতে দেখে হেসে উঠল।

বলল, তোমাদের বাংলা ভাষার সঙ্গে এই ভাষার বেশ মিল আছে। না?

তুমি বাংলা জানো না কি?

আমি জানি না। তবে শুনেছি। অমরকণ্টকে অনেক বাঙালি সাধুসন্ত আছেন তো! তাঁদের মুখেই শুনেছি।

জায়গাটা কেমন? অমরকণ্টক?

ভালো জায়গা। সেখান থেকেই তো 'নর্মদা' আর 'শোন' আর 'কেন' নদীও বেরিয়েছে। অমরকণ্টকে ঢোকবার পথে কবির চবুতরা পড়ে। মস্ত মেলা বসে। তোমাদের হিন্দুদের দেবদেবী আছে। নর্মদাদেবীর মূর্তি আছে। আর উলটোদিকে আছে দেবতা নর্মদেশ্বর অমরনাথ। শংকর ও নর্মদার যুগল মূর্তিও আছে। তাছাড়াও আছে বহত দেবদেবী। তোমাদের সব দেবদেবীর নাম তো আমি জানি না। গাদাগুচ্ছের দেবদেবী যাহোক তোমাদের।

হুঁ।

আমি বললাম।

তুমি গেছ কখনও নিজে? জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

না গেলে, এত জানলাম কি করে? বহতইবার গেছি। আমার মা খুব ভালোবাসতেন হিন্দুদের মন্দিরে যেতে। মাকে সঙ্গে নিয়ে গেছি।

এখন যাও না?

নাঃ। মা তো নেই।

নেই? শুনে খারাপ লাগল।

চিরদিন আর কে থাকে বলো? যায় সকলেই। আগে আর পরে। মৃত্যুকে মুখে করেই তো উড়ে আসা সুগার মতন প্রতিটি জন্ম জন্ম আসে।

সুগা কি?

পাখি।

কেমন দেখতে?

সবুজ। খুব সুন্দর। লাল ঠোঁট।

তাই? বুঝেছি। টিয়া। টিয়াকে তোমরা সুগা বলো?

আমি বললাম।

তারপর বললাম, আর কি কি দেবতা আছে বললে না তো অমরকণ্টকে?

মনসা, কার্তিক, গোরক্ষনাথ, রোহিণী, পার্বতী, বালাসুন্দরী, শ্রীদুর্গা সবাই আছেন যে যার মন্দিরে। এদেরই মাঝ দিয়ে তো ধাপে ধাপে নেমে গেছে এক পোকরা।

পোকরা মানে?

আরে কুণ্ড, কুণ্ড। ছোট্ট কুণ্ড। তোমরা বলো কুণ্ড। আমরা বলি পোকরা। সেই কুণ্ডের নাম মার্কণ্ডেয় কুণ্ড। এগারোকোনা সেই কুণ্ড। তারই একটু পাশে আছে নর্মদা উদগম। ছোট্ট চারকোনা একটু জায়গা, আমাদের সামনের আগুনটারই মতন, তারই নিচ দিয় কুলকুল করে নর্মদাজি বেরোচ্ছেন। মানে, উঠছেন আর কী। হাঁড়িতে জল উবলালে জল যেমন উথাল পাথাল করে হাঁড়িতে মধ্যে, তেমন করে।

জলপ্রপাত নেই বুঝি?

জলপ্রপাত? মানে উপর থেকে যেখানে জল পড়ে? না না। নর্মদা উদগম-এ সেসব নেই।

বুঝলাম যে, আমার প্রশ্নটির বোকার মতন হয়েছে। উদগম যখন নাম তখন প্রপাত না থাকারই কথা।

মারুতি বলল, অমরকণ্টকে নর্মদাজি তো অন্তঃসলিলা। নদীর খাত একটা আছে বটে। কিন্তু মাটির উপরে সেই খাত বছরের অধিকাংশ সময়ে শুকনোই থাকে। দূরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মেকলে পাহাড়ের উপর থেকে গায়ে কাঁটা দেওয়া গভীর, ভারী গম্ভীর নিচের বনের মধ্যে। অনেকই নীচে। অমরকন্টক জায়গাটা একটা মালভূমি, পাঁচমারী যেমন। পাঁচমারী অবশ্য শুনেছি অনেকই বড়ো। এ দেশে অতবড়ো মালভূমি নাকি আর নেই।

তাই?

হ্যাঁ।

তো তোমরা কোন দেবতাদের পুজো করো?

করি। তোমাদের মতন অত না হলেও আমাদের দেবতা আছেন বইকী। বুড়হা দেও হচ্ছেন প্রধান। জঙ্গলের মধ্যে আমাদের মেড্রিসেরাইও আছেন।

তিনি কোন দেবতা?

ওঃ। তিনি মস্ত ভারী এক প্রাচীন শালগাছ। আমাদের এইসব এলাকার মানুষদের রক্ষয়িত্রী তিনি। তাঁর মাথার দিকে তাকাতে গেলে তোমার মাথা আর ঘাড় এক হয়ে যাবে। আমরা তাঁকে পুজো করি হোলি হরিয়ালিতে।

'হোলি' তো জানি। কিন্তু ''হরিয়ালি''টার কি ব্যাপার?

'হরিয়ালিতে আমরা চাস বাস শুরু করি, বৃষ্টি পড়লে। আগে আগে তো শুধুমাত্র জঙ্গল

পুড়িয়েই আমরা তাতে বীজ বুনতাম। মাটি যে আমাদের মা! মাটির গায়ে আমদের আঁচড় কাটা একেবারেই মানা। শুধু আমরাই নয়, গোন্দ বাইগারাও এই নিষেধ মেলে চলি। মানে, মেনে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু এখন আর সেসব মানতে পারে কই মানুষ? পেট মানে না। জমিতে লাঙল লাগিয়ে, সার দিয়ে চাষ করলে ফলন বাড়ে। লেবিন সাহেব চাষবাসও শেখান আমাদের।

তাই?

হাঁতো। অর্থাৎ তাই তো!

মারুতি গোন্দ মাঝে মাঝেই এই শব্দটি উচ্চারণ করে। 'তাই তো' বলে না একবারও। বলে হাঁতো। তিনটি কথাতে একটি করে 'হাঁতো'।

সামনের আগুনটা যেমন ফুট ফাট করে স্বগতোক্তি করছিল তেমনই মারুতিও সেই নিস্তব্ধ রাতে স্বগতোক্তি করে যাচ্ছিল। সময় বয়ে যাচ্ছিল সময়ের মনে।

অমরকণ্টকে কপিলধারা প্রপাতও আছে। শোনমুড়া। পঞ্চমুখী গায়ত্রী মন্দির। ওখানে বলে মার্কণ্ডেয়াশ্রম। অমরকণ্টক কিন্তু বিন্ধ্যপাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়ো। জানো কি?

আমি আর কী জানি।

আমি বললাম।

লেবিন সাহেব বলেন, তার নাম, আসলে মেকলে পাহাড়। বহতই উঁচু। সবসময়েই শীত সেখানে। প্রতিবছরই মস্ত মেলা বসে।

কবে?

এই তো কিছুদিন মাত্র হল সে মেলা হয়ে গেল। তোমাদের বসন্তপঞ্চমীর দিকে কী তারই অগলবগল। ঠিক মনে নেই।

তাই?

হাঁতো।

বলেই, মস্ত হাই তুলল একটা মারুতি। বলল, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি শুতে যাচ্ছি।

তবে তো আমাকেও যেতে হবে।

কেন?

সেই চিতাবাঘটা, মানে, পেন্ড্রা না কি বলো তোমরা, যদি চলে আসে?

আর নাঃ। ও মানুষ খায় থোড়ি। তোমার মাংস কি বকবার মাংসর মতন সুস্বাদু? বকরাটার লোভেই দু-রাত ঘুরঘুর করেছিল। তা সে পেন্ড্রা আসলে সবচেয়ে ভালোবেসে খায় বস্তির কুকুরদের। বাঘ যেমন খায়, ঘোড়া। কিন্তু জিগারির সেই বকরা তো লমনিতে মুলারী বাইদের আর জিগারিদের ভোগে লেগে গেছে। খুব নাচা গানা হয়েছে। সারা রাতই চলেছে নিশ্চয়ই নাচা-গানা লমনিতে।

বকরার আওয়াজ না পেয়ে পেন্ড্রাটা আমাকে কিছু বলবে না তো?

চিন্তিত গলাতে আমি বলাম।

না রে বাবুয়া না। আমরা হচ্ছি মানুষ। বুড়হা দেও-এর তৈরি সবচেয়ে কিমতি প্রাণী। দিমাগওয়ালা প্রাণী। জানোয়ারকেও ভয় যদি পেতে হয় তবে মানুষ হয়ে জন্মানো কেন? বাঘ বা পেন্ড্রা যদি মানুষখেকো না হয়, তবে তাদের থেকে তোমার আমার কোনো ভয় নেই। এ তল্লাটে এই মুহূর্তে কোনো মানুষখেকো বাঘ বা শোনচিতোয়া আছে বলেও আমার জানা নেই।

শোনচিতোয়াটা আবার কি জিনিস?

ওই হল। পেন্ড্রাকেই অনেকে শোনচিতোয়া বলে এদিকে।

আমাকে খেয়েই যদি তার অ্যাকাউন্ট ওপেন করে?

মানে?

বলেই মনে পড়ল যে, ও তো ইংরেজি জানে না। কিন্তু বুদ্ধিমান মারুতি ইংরেজি না বুঝেও মানেটা বুঝল।

ও বলল, টোটাবাবু, মানুষের সবচেয়ে বেশি ভয় এই দুনিয়ার সবচেয়ে খতরনাক যে জানোয়ার, শুধুমাত্র তারই কাছ থেকে। অন্য কোনো জানোয়ারের কাছ থেকেই তেমন ভয় নেই।

কি সে জানোয়ার?

আদমি? অউর ক্যা? হাঁতো!

আমি বাইরে একটু বসে থাকলে তুমি রাগ করবে না তো? আজ সারাদিন তোমার সঙ্গে যেসব জায়গাতে গেলাম, যেসব মানুষ দেখলাম গাছ, নদী, সেই সবের কথা একা একা ভাবব একটু। তোমাদের এই পৃথিবী এক অন্য পৃথিবী মারুতি। এই পৃথিবী যে আছে, সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। অভিভূত হয়ে রয়েছি আমি। সত্যিই আবিষ্ট।

বলেই, ভাবলাম, মারুতি অভিভূত বা আবিষ্ট শব্দ দুটির মানে বুঝল কি?

তারপরই ভাবলাম, নাই-বা বুঝল। কিছু শব্দ থাকে, বাক্য, কথাও যা বলতে পারলেই যেমন গভীর আনন্দ হয়, যেমন 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' সেই আনন্দই যথেষ্ট। যাকে বলা হল, সে তা বুঝল, কি না বুঝল তাকে কিছুই এসে যায় না।

বললাম, আমি কোনো কাজই তো আগে করিনি। কখনওই। এই আমার প্রথম কাজ। ভালো করে যদি কাজ না করতে পারি তবে তোমাদের চুন্নুবাবুর কাছে আমার বড়োমামার বে-ইজ্জৎ হবে। তাই একটু ভাবাভাবি করতে হবে। একা থাকা দরকার।

ফুঃ।

বলেই, একটা তাচ্ছিল্যময় ফুঁ দিল মারুতি। যেন, আমারই মুখের উপর।

বলল, কাজ আবার কি? কাজকে খেলা ভাববে। খেলতে খেলতে কাজ করবে, আর কাজ করতে করতে খেলবে। আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন। কাজ নিয়ে মাথা ফাটায় তোমাদের মতন শহরের মানুষেরাই। আরে কাজ না হয় একটু কমই করবে, দুটো পয়সা না হয় কমই কামাবে।

আমি বললাম, মনে হচ্ছে, তুমি তো আমাদের বাগবাজারেরই জ্ঞাতি।

জ্ঞাতি? সেটা কি জানোয়ার?

না, না জানোয়ার নয়।

তবে? খাওয়ার জিনিস? খেতে খুব ভালো বুঝি?

আমি হেসে ফেলে বললাম, না, না খাওয়ার জিনিসও নয়। জ্ঞাতি কাকে বলে কাল বলব। আমারও ঘুম পেয়েছে।

মারুতি পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলল, কিন্তু একথা সবসময়েই জানবে যে, বুড়হা দেও-এব সুন্দর পৃথিবীতে কম পড়েছে কোন জিনিসটার? একটার নাম করো? নীল আকাশ আছে, যার রঙে মন ভেসে যায়। রাতে অবশ্য সেই হয়ে যাবে রুপোলি অথবা ঘোর কালো। বন আছে, পাহাড় আছে, নদী আছে, নারী আছে, পাখি আছে, বাঁশি আছে, গান আছে, মহুয়া আছে, নাচ আছে, এইসব নিয়েই তো মানুষে চমৎকার বেঁচে থাকে। শুখা মহুয়া, বাজরা বা জোয়ারের রুটি, আর সঙ্গে একটা সবজি বা পাতা বা ফুল-এর তরকারি, মাসে দু মাসে একবার এক থালা খশবুদার সাদা ভাত। জুঁইফুলের মতন সাদা। কখনও সখনও দু'চারটি আটার রুটিও। আহা! কী আমরা। কী বড়োলোকি। সুখী হতে হলে বেশি টাকার দরকার হয়নি কোনোদিনই কারোর। বুঝলে টোটাবাবু। সুখের বাসা ছিল চিরটাকাল তোমার মনেরই মধ্যে। বাইরে থেকে কেউই তোমাকে দিতে পারে না তা। কোনোদিনই পারবে না। এই কথাটা মনে রাখবে। সবসময়েই মনে রাখবে। কাজ অবশ্যই করবে, কিন্তু কাঠ কাটতে গিয়ে গাছ চাপা পড়ে যেসব মানুষ মরে, সেইসব বুদ্ধুদের মতন কাজ চাপা পড়ে কখনও মোরো না। বুঝেছ? হাঁতো?

আমি হাসলাম।

ভাবছিলাম, ওকি বুঝবে, আমার সমস্যা। মা, বোন তাদের ভবিষ্যতের চিন্তার কথা। আমরা যে না-বড়োলোক, না ওদের মতন গরিবলোক। আমরা যে বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মধ্যবিত্ত। আমরা না ঘরকা না-ঘাটকা। না-বামুন, না নমশূদ্র। আমরা না পরতে পাই রাজার পোশাক, না পারি ন্যাংটো হয়ে থাকতে। আমাদের যে বড়োই বিপদ, ভয়, চক্ষুলজ্জা। মধ্যবিত্ত বাঙালির দুঃখের কথা ও ছত্তিশগড়ের গভীর বনের বাসিন্দা এই বনচারী সরল বুদ্ধির, সাদা মনের মারুতি পানকা বুঝবে কী করে?

মারুতি বলল, যাই। আমিও একটু ভাবাভাবি করি।

কি নিয়ে?

আমার একটাই স্বপ্ন আছে টোটাবাবু।

কী স্বপ্ন?

একটাই স্বপ্ন।

কিসের স্বপ্ন?

রাজকুমারী মুলারীবাই-এর।

কে সে?

সে মুলারী। সে রাজকুমারী। তাকে আর অন্য কিছুই হতে হয়নি। সিরিফ মুলারী হওয়াই যথেষ্ট ছিল। তার পশ্চাৎপট ভবিষ্যৎ ছাড়াই সে ফুটে থাকে, মনিয়ারী কৈরাহা নদীর জলের মধ্যে মধ্যে কালো পাথরের আড়ালে আড়ালে শরৎকালে ফুটে-থাকা গাংগারিয়া ফুলেরই মতন। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। মুলারীবাই নামটাই আমার কাছে যথেষ্ট। তুমি আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না টোটাবাবু।

তুমি নিশ্চয় প্রেমে পড়েছ। সে তো খুবই সুখের কথা।

প্রেম? তুমি পড়েছ কখনও?

আমি চুপ করে থাকলাম।

প্রেম কি সুখের? তাই তোমার ধারণা? সে বড়ো জ্বালার। কালো নাগিন-এর ছোবলও এর তুলনায় অনেকই কম যন্ত্রণার।

বলেই, আরেকটা হাই তুলে মারুতি ভিতরে চলে গেল। যাওয়ার আগে আগুনের মধ্যে থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো তুলে আগুনটাকে নেড়ে চেড়ে দিয়ে গেল। ফুলকি উড়ল। ফুলকি মরে ছাই হল। মারুতি ঘরে গেল।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার সময়ে বলে গেল, কোনো ভয় নেই। বসে থাকো। রাতের রূপে চান করো। তবে এখনও কুয়াশা থাকে তো। আর মাসখানেক পরেই দেখবে চাঁদের রাতের রূপ। তবে আগুনের থেকে দূরে যেতে হবে। আগুন তো চাঁদের সতিন। দেখবে, জিন-পরীরা খেলা করতে আসবে তোমার সঙ্গে। দেখতে পাবে না, তাদের অনুভব করবে তোমরা চারপাশে। সে এক পরম অস্বস্তিকর উত্তেজনাময়, বিপজ্জনক ভালো লাগা।

তারপর এক মুহূর্তে চুপ করে থেকে বলল, সত্যিই আসে কিন্তু। ঠাট্টা নয়। আর যার সঙ্গে খেলে যাকে দেখা দেয়, চোখের দেখা, দেখাই শুধু নয়, ছোঁওয়া দেয়, ত্বকের ছোঁওয়া, তার লাশ পাওয়া যায় পরদিন, জঙ্গলে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, খেলবে কিনা ভেবে দেখো টোটাবাবু।

যেতে যেতে আবারও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, শোবার সময়ে দরজায় ভালো করে হুড়কো দিয়ো কিন্তু। হাঁতো?

বললাম তো ঠিক আছে। দেব।

সামান্য বিরক্ত হয়েই বললাম আমি। অমন রাতে অমন পরিবেশে অত কথা শুনতে বা বলতে আমার ভালো লাগছিল না।

কি ঠিক আছে? বলো তো? দরজা কটা?

একটাই তো।

একটা নয়। তাহলে আর বলছি কি?

দুটো?

আমি বললাম অবাক হয়ে।

হ্যাঁ। একটা ঘরের, একটা মনের। দুটোই বন্ধ কোরো। হাঁতো?

ভাবলাম, এত মহা দার্শনিকের খপ্পরে পড়লাম। নয়তো পাগলের। আমাকে পাগল করতে তো গামহারগাঁও-এর এই প্রকৃতিই যথেষ্ট ছিল। তার উপরে মারুতি পানকা। দেখছি শুধু পাগল নয়, উন্মাদই হয়ে যাব।

মারুতি ঘরের ভিতরের আধো-অন্ধকারে সেঁধিয়ে যেতেই সেই পাখিটা আবারও ডেকে উঠল, 'কীরে! কীরে! কি কি কি'?

চমকে উঠলাম।

মারুতি এতক্ষণ ছিল সামনেই বসে, কথোপকথনরত, তাই এই চন্দ্রালোকিত বনময় রাতের নির্জনতার স্বরূপ বোধ হয় ঠিকমতন বুঝতে পারিনি। ও চলে যেতেই, সেই ছমছমে নির্জনতা আমার বুকের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে কোনো শীতল সরীসৃপের মতন উঠে এল। কী একটা পাখি ডাকছিল দূরে, গুব গুব গুব গুব করে। অন্য একটি ডাকছিল মনিয়ারি কৈরাহা নদীর দিক থেকে টাকু-টাকু-টাকু। আরও একটা পাখি কিছু দূরের নদীর বুকের উপরে উড়ে উড়ে ডাকছিল হট্টিটি-হুট। টি-টি-টি হুট। আমার গা শিউরে উঠল ভালোলাগায়। ভাণ্ডারের ডানদিকে জমি ঢালু হয়ে গড়িয়ে গেছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে। বাঁ দিকে এবং সামনেও গভীর জঙ্গল। দূরে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। ঘন রহস্যে ঘেরা। আলো কাঁপছে ছায়া কাঁপছে মৃদুমন্দ হাওয়াতে।

সামনের ভালু-টুং জঙ্গলেরই মধ্যে। তার হাঁটুর কাছ থেকে ফুল সবুজ মোজার মতন জঙ্গল শুরু হয়েছে। কোন অনাদিকাল থেকে এই সব পাহাড় জঙ্গল আমার চোখকে ধন্য করবে বলে দাঁড়িয়ে আছে তা কে জানে। আমার জন্মের কত হাজার বছর আগে থেকে?

বিভূতিভূষণের "আরণ্যক" যখন পড়ি তখন স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র আমি। লবটুলিয়া বইহার, সরস্বতী কুণ্ড, যুগলপ্রসাদ, সেই ঠক্করবাজি হোহো নাচ নাচা অল্পবয়সি ছেলেটি যে সেলাম করে বলত, "সেলাম লিজিয়ে বাবু, ম্যায় পরদেশিয়া।" সেই গরিবস্য গরিব, যেন কালো পাথরে কোঁদা মেয়ে কুন্তা, রাজা দোবরু-পান্নার মেয়ে রাজকন্যা ভানুমতি, সেই টিন্ডেলরা, বাবা আর ছেলে। কী যেন নাম ছিল বাবার? আসরফি টিন্ডেল? রাতে কুকুর ঢুকত গভীর জঙ্গলের মধ্যে খড়ের ঘরে। তারপর যখন বেরিয়ে যেত তখন ফুটফুটে চাঁদের আলোতে দেখা যেত, কুকুর নয়, এক পূর্ণ যুবতী। তারপর একদিন আসরফি টিন্ডেলের ছেলের অক্ষত লাশ পাওয়া গেল জঙ্গলের মধ্যে। রাতে, হাতে লণ্ঠন নিয়ে কী যেন খুঁজতে বেরিয়েছিল সে। নাকি সেই যুবতীর পেছন পেছনই গেছিল?

বুনো মোষদের দেবতা "টাঁড়বারো?"

বাগবাজারের ভাড়াবাড়ির একতলায় প্রায়ান্ধকার ঘরের কোণে মাদুর পেতে জানালার পাশে বসে 'আরণ্যক' পড়ার পর থেকে যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম। বিভূতিভূষণ চলেছেন,জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে জ্যোৎস্নালোকিত রাতে "আলোছায়ার বুটিকাটা গালচের" উপর দিয়ে। দূরে মহালিখাপুরের পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে।

এই সব শুধু আমার স্বপ্নেই ছিল। সে স্বপ্ন যে কোনোদিনও সত্যি হবে, তা ভাবিনি। বড়োমামা আমাকে পাণ্ডববর্জিত নরকে পাঠাচ্ছেন মনে করে হয়তো নিজে অপরাধবোধ করেছেন মনে মনে

অথচ আমিই জানি এ কোন স্বর্গে পৌঁছেছি এসে। সত্যি কথা বলতে কী আমার ভেতরে যে এই এক অন্য রোম্যান্টিক আমি ছিল এবং এরকম প্রচণ্ডভাবেই ছিল, তা গামহারগাঁওতে না এলে নিজেও হয়তো জানতেও পারতাম না। ইতিমধ্যেই দিন রাতের প্রতিটি ক্ষণই আমাকে কী যে এক মুগ্ধতা গ্রাস করে ফেলেছে, তা কী বলব। আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলেও অন্য পাড়াতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসা বেড়ালেরই মতন আমি হয়তো ঠিক পথ চিনে আবারও এখানেই ফিরে আসব।

মারুতি ভেতরে চলে যাওয়ার পরে প্রকৃতিহত হয়ে আমি বসেছিলাম ভাণ্ডারের বারান্দাতে। কাঠের চেয়ারটাতে ভাণ্ডারের দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দেওয়ালের দিকে পিছন ফিরে বসলাম, যাতে এই রাতকে ভালো করে দেখতে পারি। মারুতির ভাষাতে, এই রাতে চান করতে পারি।

ভাবছিলাম রাজকুমারী মুলারীবাইও কি ভানুমতিরই মতন কেউ? কত যে প্রশ্ন। কত যে জিজ্ঞাসা। কী বলব। কে সে সবের উত্তর দেবে?

মারুতির কাছে দিনমানে শুনেছিলাম যে, আমার কাজটা হল, ছগনলাল পোপোটলাল অ্যান্ড কোম্পনি গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে অথবা ফড়েদের কাছ থেকে যত বীজ কেনে তা ওজন করিয়ে, হিসেব করে তার দাম দেওয়া। বস্তাবন্দি সেইসব বীজ ট্রাকে তুলে দেওয়ার জন্যে আলাদা সৈন্যদল আছে। ঝাড়তি পড়তি যা কিছু অথবা যা পাঠাবার নির্দেশ তখনও পাওয়া যায়নি তা ভাণ্ডারেরই তুলে রাখার লোক আছে। ভাণ্ডারের একজন খিদমতগারও আছে। খানা পাকাবার, তেল মালিশ করবার ও অসুখে শুশ্রুষা করবার। সে-ও সন্তরাম সিং ছিলেন না বলে ছুটি নিয়ে তার বাড়ি গেছিল অচনকমার-এ। সে ফিরে আসবে কালই। তার নাম ফাগগু। সেও সন্তরামবাবু এবং মারুতিরই মতন জাতে পানকাই। কারণ গোন্দ-বাইগারা,পানকারা ছোটো জাত বলে, তাদের ছোঁওয়া খায় না। আমার রান্না না কি করে দেবে কৌশল্যা, সেই দশরথ নানার মেয়ে। কারণ, আমি নাকি উঁচু জাতের। তা শোনা পর্যন্ত প্রবল আপত্তি করেছি। বলেছি, আমি জাত মানি না। আমিও ফাগগুর হাতের রান্নাই খাব।

ওই কৌশল্যা মেয়েটিকে আমর ভীষণ ভয় করেছে প্রথম দর্শন থেকেই। অজগরের মতন চাউনি মেয়েটির চোখের। অমন মেয়ে আমি তার আগে আর দেখিনি। অবশ্য আমার দেখাদেখির জগৎটুকুও তো খুবই ছোটো। সত্যি ছোটো।

নিম, করৌঞ্জ, মহুয়া, চিরাঞ্জি দানা, একরকম বুনোফুলের বীজ, যার নাম হাসিন, তিনি কাড়ুয়া, তিল, সরগুজা, এই সবের বীজ গ্রামের মানুষেরা সংগ্রহ করে। তাদের কাছ থেকে পাইকারেরা অনেক সময় কিনে এনে কোম্পানিকে বিক্রি করে, লাভ রেখে। আবার অনেক সময়ে গ্রামবাসীরা নিজেরাই এনে বিক্রি করে আমাদের কাছে সরাসরি। তাতে কোম্পানির মুনাফা হয় বেশি। এবং গ্রামবাসীরাও একটু বেশি পায়।

মারুতি বলছিল, সবসময়ে তো বীজের চাহিদা থাকে না, তাছাড়া এক জাতের বীজ এক এক সময়ে ওঠে। তখন কাজও থাকে না তেমন। আর যখন কাজ থাকেও তখনও এমন কিছুই নয়।

তারপর বলেছিল, ভেবেছিলাম শহুরে মানুষ তুমি, এই জঙ্গল বোধহয় তোমার ভালো লাগবে না। এখানে সিনেমা হল নেই, এমনকি অমরকন্টক বা বিলাসপুরে যেমন আছে, তেমন চুলছাঁটা সেলুনও নেই, বড়ো বড়ো আয়না লাগানো। এমনকী লম্বা-চওড়া ডাবল আয়না বসানো লা-জয়াব একটা পানের দোকান পর্যন্ত নেই। তোমার কী করে ভালো লাগবে? কিন্তু এই তিনদিনেই দেখছি তুমি আমাদের বন-পাহাড়ে-নদীর প্রেমে পড়ে গেছ। তাও তো এখনও মেয়ের প্রেমে পড়েনি। সেটা ঘটে গেলে আর ফিরবেই না কলকাতাতে।

আমি না বলেই ওকে বলেছিলাম, আয়না না থাকাই ভালো। আয়না, মানুষের সঙ্গে দোস্তির চেয়ে শত্রুতাই করে বেশি।

সবসময়ে কাজ সমান থাকে না কেন? কোনো না কোনো বীজের মরশুম তো থাকেই সবসময়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

কোম্পানির হাতে অর্ডার বেশি থাকলে তখনই বীজ স্টকে রাখতে হয় বেশি করে। নইলে কেনার তাগিদও থাকে না কোম্পানির। কারণ তেল-সাবান-ওষুধের কোম্পনির চাহিদা না থাকলে অনেকসময়েই বীজ নষ্ট হয়ে যায়। এসব গ্রামের অল্পে খুশি আদিবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনে যেটুকু দরকার সেটুকু বীজ বাড়িতে পিষে তেল করে নেয় বা অন্যভাবে ব্যবহার করে। জঙ্গল জায়গা তো! ব্যাংকও নেই। চেক-টেকেও বিশ্বাস নেই। সবই কাঁচা টাকার কারবার। পেন্ড্রা রোড থেকে কেঁওচি হয়ে টাকা পাঠান চুন্নুবাবু ট্রাক-ড্রাইভারের মারফত। সেই টাকা দিয়ে নগদেই বীজ কিনতে হয়। অনেক সময়ে দাদনও দিতে হয়। এই সবেরই হিসেব রাখার জন্যেই আমাকে নিয়ে এসেছেন কোম্পানি আগের অ্যাকাউন্ট্যান্টের জায়গাতে। যোগ্যতার চেয়ে সততাই তোমার চাকরির বড়ো শর্ত। তাই টিশানবাবুর রিস্তেদার, জানাশোনা তোমাকেই নিয়ে এসেছেন ওঁরা।

আগে নাকি মগনলাল লাডিয়া বলে একজন মাড়োয়ারি ছিল এইসব কাজের জন্যে। সে তালেবর লোক। এক বছরের মধ্যে ব্যবসাটা বুঝে নিয়ে এবং চুন্নুবাবুকে বুদ্ধু বানিয়ে ভালো পয়সা করে নিয়ে নিজস্ব ব্যবসা চালু করেছে শেওতারাইতে, বিলাসপুর থেকে কাছেও হয়েছে। ট্রাকে ট্রাকে তার মাল যায় শেওতারাইতে তারপর সেখান থেকে বিলাসপুরে। আর বিলাসপুরে গেলে তো কথাই নেই। পুবে বা পশ্চিমে বা দক্ষিণে বা উত্তরে যেদিকে খুশি মাল পাঠানো যায়। গুজরাটি ব্যবসাদারেরা নাকি মাড়োয়ারিদের দেখতে পারেন না। কী করে মুনিম রাখলেন মগনলালকে তাই নাকি ভেবে পেত না মারুতি।

একথা কেন বলছ?

মধ্যপ্রদেশের ধার জেলাতে মাণ্ডুর দুর্গ আছে না? মাণ্ডুর রূপমতী আর বাজবাহাদুরের গল্প তো এইসব জঙ্গলের গোন্দ বাইগা পানকারাও জানে। তা সেই মাণ্ডুতে গাধা শাহ আর ভাইসা শাহ নামে দুই মাড়োয়ারি বানিয়ে ছিল। গুজরাটি ব্যবসাদারেরা তাদের মাকে অপমান করার কারণে গুজরাটি ব্যবসাদারদের তারা কষে টাইট দিয়েছিল। তারপর থেকেই গুজরাটিরা তাদের পেছনে ধুতির কোঁচা গোঁজে, সমানে নয়।

তাই?

অবাক হয়ে, হেসে বলেছিলাম আমি। সত্যিই। মারুতি কত কী জানে!

সে অনেকই লম্বা গল্প। ম্যানেজার সাহেব ফিরে এলে শুনো। গুজরাটি ব্যবসাদারের মাড়োয়ারি মুনিম ভূ-ভারতের মধ্যে সম্ভবত শুধু আমাদের কোম্পানিতেই ছিল।

আমি ভাবছিলাম সে যাই হোক, ওই মগনলাল চাকরি ছেড়ে দেওয়াতেই নির্লোভ এবং সৎ নামি কেরানির জাত বাঙালি বলেই না চাকরিটা আমার হল।

ক্যাশবুক রাখতে হবে। IMPREST SYSTEM-এ। অল্প কটা HEADS OF ACCOUNT। কিছু ইন্টারন্যাল ডেবিট নোটস, অন্য ভাউচার ইত্যাদি। অচানকমারের ডিপোর অ্যাকাউন্ট্যান্ট সবই বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাকে কাল দুপুরে গামহারগাঁওতে এসে। খাতা এবং ক্যাশ ব্যালান্সও বুঝিয়ে দিয়েছেন। নামকোওয়াস্তেই অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আসলে আমি ক্যাশিয়ার। খাতা লেখা, লেজার, জার্নাল, ফাইন্যাল অ্যাকাউন্টস সবই হয় পেন্ড্রা রোডে। আমাকে শুধু উইকলি রিটার্ন পাঠাতে হবে এখান থেকে ট্রাক-ড্রাইভারের হাতে।

কাজটার রকম আমাকে হতাশ করেছে। মানে অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজটার। এখানে বেশি দিন থাকলে পরে বোধহয় আর ফাইন্যাল অ্যাকাউন্টস করতেই পারব না। সব কাজই ভুলে যাব। অন্য কোথাওই চাকরি পাব না। কিন্তু আবার খুশিও করেছে খুবই এই কাজের রকম ও পরিবেশ।

প্রতিবেশও। আমাদের দেশটা যে এত বড়ো, এত সুন্দর, এত সরল যে আমাদের আদিবাসীরা, এমন যে গরিব, তাও আমার জানা ছিল না। অথচ এত হাসিখুশি তারা। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ে। কলকাতার মানুষদের মতন রামগরুড়ের ছানা নয় আদৌ।

সাবান, তেল ও ওষুধ বানাতে যে এইসব গভীর জঙ্গলের নানান গাছ গাছালি পাতা-পুতা ফুল ফল বীজ এর সাহায্য দরকার হয় তা জানা ছিল না। এখানে না এলে কি জানতে পারতাম। নানারকম ওষুধ কোম্পানিও ফল বীজ ফুল মূল নেন আমাদের কোম্পানির কাছ থেকে। প্রকৃতিই যে সব কিছুর মূলে, সব জোগানদারের মূল জোগানদার, এই সরল সত্যটাই জানা হত না এই জঙ্গলে নির্বাসিত না হলে। জিগারি, মারুতি দশরথ এবং আরও যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এ কদিন তাদের সকলকেই ভালো লেগেছে।

ভালো লাগেনি শুধু কৌশল্যাকে। মেয়েটাকে আমার কেমন ভয় করছে।

হিন্দুস্তান লিভার থেকে আরম্ভ করে ল্যাকমে ইন্ডিয়া, সিপলা, ডাবুর, হামদর্দ, দে'জ মেডিক্যাল, বেঙ্গল কেমিক্যাল ইত্যাদি আরও কত বড়ো বড়ো সব কোম্পানির এজেন্টরা নাকি পেন্ড্রা রোড থেকে রেক বোঝাই করে এইসব বীজ নিয়ে যান তাঁদের বিভিন্ন কারখানাতে। খয়ের চালান যায়। বুনো তেঁতুল। আঁওলা বা আমলকী, নানা পাতা-পুতা আরও কত কী। শাল ফুলের কথা জানতাম। একবার দেখেছিলাম শান্তিনিকেতনে। বসন্তোৎসরের সময়ে। কিন্তু শালের ফলের কথা জানতাম না। পাছে, ফড়েরা সব বীজ কিনে নেয় ও আমাদের হাতে দাম বেশি পড়ে যায়, তাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রত্যেক গ্রামের সরপঞ্চ, মুখিয়া, মুকদ্দম, ইত্যাদিদের খুশি করে রেখে অগ্রিম দাদনও দিয়ে রাখতে হয়। এইসব কাজই করে মারুতি পানকা। আমাকেও করতে হবে। এখানে কারো কাজই ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্ট করে ভাগ করা নেই। সকলেরই সব কিছু জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে হতে পারে। এবং হয়ও হাসিমুখেই।

প্রায় মাইল পনেরো হাঁটিয়েছে আজ মারুতি আমাকে। তাও মোটে গোটা পাঁচেক গ্রামে যাওয়া গেছে। সবসুদ্ধ নাকি তিরিশটি মতন গ্রাম আছে আমাদের এলাকায়। সেই সব গ্রামের প্রায় সব মানুষের সঙ্গেই মারুতির দহরম-মহরম অথচ সন্তুরাম এবং মারুতি ছোটো জাতের। পানকাদের নাকি ছোটো চোখে দেখে গোন্দ-বাইগারাও।

মাট্রিনালা নদীর পারে এক দঙ্গল বড়ো বড়ো খয়ের গাছের ছায়াতে যখন আমরা আজ একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে বসেছি দুপুরবেলাতে, তখন একজন নারী ও শিশু, একজনের বয়স হবে চল্লিশ আর একজনের পাঁচ, ওপার থেকে পায়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে এল। আমাদের কাছে এসে পৌঁছলে ওদের ভাষাতে নিজেদের মধ্যে কীসব কথা বলে মারুতি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে, তার দু হাত দিয়ে সেই মধ্যবয়সি নারী এবং শিশু দুজনেরই দু-পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ওরা চলে গেলে আমি একেবার অবাক হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম মারুতিকে, ওরা কারা?

মারুতি বলল, আমার গ্রামের লোক।

তুমি পাঁচবছরের মেয়েটিকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে কেন?

মারুতি অবাক হয়ে গেল আমার কথাতে। বলল, বাঃ। ও-ও তো মেয়ে। নারী তো। ছোট আর বড়োতে তফাত কি? মেয়েরা সবসময়েই প্রণম্য। সববয়সি মেয়েরাও।

আমি ভাবছিলাম, যে-জাতের ঐতিহ্য এইরকম, সেই জাতকে ছোটো জাত হিসেবে কেন গণ্য করা হয়, আর করেই বা কারা? তা কোন পণ্ডিতে বলতে পারে। আশ্চর্য আমাদের দেশ। আশ্চর্য এস সব জাতপাতের রকম। মানুষের কী অপমান।

দিনশেষে পাহাড়শ্রেণী ও নিবিড় জঙ্গলের মধ্যেও গ্রাম কটিতে ঘুরে গামহারগাঁও ফিরে এসে আমার মনে হচ্ছিল, কলকাতার স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে, শেখার মতন শিখিনি বোধহয় কিছুই। বই পড়ে বোধহয় খুব একটা শেখাও যায় না সবসময়ে। হয়তো কম সময়েই যায়। শিক্ষার

অনেকই রকম হয় হয়তো। প্রকৃতির এই মহাবিদ্যালয়ে এই বিরাট ভারতবর্ষের পটভূমিতে আমাকে সম্ভবত জীবনের সব পাঠই একেবারে নতুন করে নিতে হবে। এ এক নতুন প্রাণবন্ত নানা রঙে রসে গন্ধে স্পর্শে উদ্বেল পাঠশালা। আমি এখানে পড়ুয়া। আর প্রকৃতি আমার দিদিমণি।

আগুনে ঔজ্জ্বল্য কি কমে এল?

বারান্দার চেয়ারটি ছেড়ে আমার কোথাওই যাওয়া হল না। আমার চোখও ছোটো হয়ে এসেছিল তখন। অভ্যাসও তো নেই। উঁচু নিচু জঙ্গল পাহাড়ের পথে নদী-নালা পেরিয়ে এতখানি হাঁটা। দিনভর। ভয়ও করে।

ভাবলাম, সবই হবে শনৈঃ শনৈঃ। ঘোরা হবে দিনে রাতে, জানা হবে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির কোলের মানুষদের। ধীরে ধীরে।

এমন সময়ে কী একটা জানোয়ার ডেকে উঠল হাঁচি দেওয়ার মতন শব্দ করে পর পর দু-বার। ফিঁচিক! ফিঁচিক! বেশ কাছ থেকেই।

এটা আবার কী রে বাবা। আমার জানবার বিশেষ উৎসাহও হল না। ঘরের দরজার দিকে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। এবং ঠিক সেই সময়েই সেই পাখিটা শিমুলের মগডাল থেকে আবার তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল। 'কী রে কী রে? কি কি কি?

গা ছমছম করে উঠল। ভিতরে ঢুকেই দরজার হুড়কো বন্ধ করে দিলাম।

ভয় পেলাম কি?

সেই মিশ্র অনুভূতিতে ভয় অবশ্যই ছিল। তবে বিস্ময় ও কৌতূহলও বড়ো কম ছিল না। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল যে, বাগবাজারে ছিলাম মাত্র চার রাত্তির আগেও এবং এখানে এই আমার তৃতীয় রাত।

মনে হচ্ছে যেন, এখানেই বাস করছি কতযুগ হল।

বনে এলে, মনে বোধহয় এমনি হয়।

সেদিন সকালে নাস্তা পানি করে ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে মারুতি একটা নতুন রাস্তা ধরল।

বললাম, চললে কোথায়?

কোথায় আবার? মসজিদে।

মসজিদ? এই জঙ্গলে মসজিদ আছে না কি? এখানে মুসলমান তো দেখলামই না।

সে জন্যে নয়। শেওতারাই-এর কসাই নিয়ামত বলে, সব পথই মসজিদেই যায়।

তুমি তো মাংসই খাও না। কসাইয়ের সঙ্গে তোমার দোস্তি হল কী করে?

আরে, যে পথ দিয়ে হেঁটে যাবে তার দুপাশ চেনা-অচেনা, জাত বেজাত, মেয়ে-মরদ সক্কলের সঙ্গে দোস্তি করতে করতে যাবে। দুটো মুখের কথা আর একটু হাসিতে তো পয়সা লাগে না।

বাঃ।

হ্যাঁ। এই কথা আমার মা বলতেন। আর বলতেন তুই যখন এ পৃথিবীতে এসেছিলি তখন আমি তো অবশ্যই, সব আত্মীয়-স্বজন আনন্দ করেছিল, হেসেছিল, মিষ্টিমুখ করেছিল। মানুষ জন্ম

পেয়েছিল এতো তোর মস্ত ভাগ্য। এমন কাজ করতে করতে পথ চলবি জীবনের যে, যখন তুই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবি তখন পৃথিবীর, মানে তোর পৃথিবীর প্রত্যেকে যেন তোর জন্যে কাঁদে আর তুই যেন হাসতে হাসতে যাস। প্রত্যেক মানুষেরই এই ভাবনা থাকা উচিত। এই জন্মে যদি ভালো কাজ করে যেতে পারিস, কারোকে না ঠকাস, ভালোর বন্ধু হোস, খারাপের শত্রুতা করিস, আর ঈশ্বরকে সর্বদা মনে রাখিস তবে এই তোর শেষ জন্ম, সে কথা জানিস। যাতে মুক্ত হয়ে যেতে পারে তোর আত্মা সে দিকে নজর রাখতে হবে। সকাল থেকে রাত ঈশ্বরের অদৃশ্য হাতে হাত রেখে হাঁটবি। যদি তাই করতে পারিস তবে তোর ক্ষতি করবে এমন কোনো শক্তি থাকবে না পৃথিবীতে। কোনো শক্তিই নয়। এই ভাবনাটা বুকের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে।

তাই?

আমি বললাম।

হ্যাঁ।

মারুতি বলল। আমার মা বড়ো ভক্তিমতি মহিলা ছিলেন। যার অন্তরে ভক্তি আছে তার সবই আছে।

তাই?

আবারও বললাম আমি। আমার মা অবশ্য বৃহস্পতিবার আর শনিবারে শশা, কলা, বাতাসা দিয়ে লক্ষ্মীপুজো করতেন। নিজেই গুন গুন করে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়তেন। আর আমরা ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থাকতাম, কখন পুজো শেষ হবে আর কলা-বাতাসা-শশা পাব প্রসাদ। ভক্তি কাকে বলে পুজো কেন করে, এসব জানতাম না। কেউ বলেও দেয়নি। তবে পাশের বাড়ির ভটকাই একদিন বলেছিল, লক্ষ্মীপুজো করলে মানুষ বড়োলোক হয়। কিন্তু এই পাড়াতেই দ্যাখ টোটা, যারাই আমাদের চোখের সামনে বড়োলোক হল তাদের বাড়িতেই আর লক্ষ্মীপুজো হয় না। বন্ধ হয়ে গেছে। বৃহস্পতি শনি সন্ধেবেলা শাঁখ আর ঘন্টা বাজে না তাদের বাড়িতে।

ভটকাই-এর কথাতে প্রথমে অবাক হলে ওর সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় ছিল না।

মা কোনো কোনোদিন একটি গান গাইতেন লক্ষ্মী বন্দনার

"এসো সোনার বরণ রানি গো, এসো শঙ্খকমল করে
এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।"

গানটা যেমন সুন্দর, মা গাইতেনও তেমন সুন্দর করে। খালি গলাতেই যেন কত অদৃশ্য যন্ত্র বেজে উঠত অনুষঙ্গ হিসেবে। আমি একটা থার্ডক্লাস। মায়ের গানের গলা একটুও যদি পেতাম। গান যে কত বড়ো সম্পদ তা গান যারা ভালোবাসে অথচ আমারই মতন যাদের গলাতে সুর নেই, শুধু তারাই বোধহয় জানে।

আজকের এই নতুন পথটা গেছে একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে কিছুটা। অথচ এদিকে এমন মাঠ এ ক-দিনে একটিও দেখিনি। আর সেই মাঠে নানা রকম ঘাসফুল ফুটেছে। মনে হচ্ছে দেবভূমিতে এলাম।

এত ফুল। কী ফুল?

শুধোলাম আমি অবাক হয়ে, মারুতিকে।

পুটোলাকা।

ও বলল।

তারপর বলল, এখনই কি? গরম যত বাড়বে থাকবে তত এদের বাহাব বাড়বে।

এ ফুল কি কেউ লাগিয়েছে? না এমনিতেই হয়েছে?

সব ফুলই তো এমনিতেই হয়, সব পাখি যেমনি করে ডাকে সব প্রজাপতি যেমনি করে পাখা মেলে। মানুষ ঈশ্বরের ফোটানো ফুল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে এনে লাগিয়ে বলে,আমি লাগিয়েছি। এই 'আমি'টাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। অমার মা বলতেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমর মায়ের কাছেই শোনা এসব কথা।

ফুলগুলো লাগিয়েছে কে? বলো না। এ তো জংলি ফুল নয়।

লেবিনসাহেব।

কবে?

কে জানে! কবে? শুনেছি, প্রথম দিকে লেবিন সাহেব না কি এদিকেই কোথাও থাকতেন। পরে ইসিবিসিতে উঠে গেছেন।

নিজের পয়সাতে লাগিয়েছেন? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছেন?

যারা মোষ তাড়ান, এমন করেই তাড়ান।

আমি ভাবছিলাম, আরণ্যক ওর যুগলপ্রসাদ তাহলে বিভূতিভূষণের বানানো চরিত্র নয়। সব বনে জঙ্গলেই হয়তো যুগলপ্রসাদেরা থাকে।

আমরা চলেছি আজ গুণিয়া বস্তির দিকে। অনেকখানি পথ বনে জঙ্গলে, মাঠে নদী নালা পাহাড় পেরিয়ে। মনে মনে কেবলই বলি এই পথ যেন শেষ না হয়। যেদিকে খুশি বনের মধ্যে চলে গেলেই হল। পথ যে এত সুন্দর হয় তা কি আগে জানতাম?

সেই দিনটার প্রায় পুরোটাই গুণিয়া গ্রামে কাটালাম। গুণিয়া, নাকি ছিরহট-এর কাছাকাছিই।

মারুতি বলছিল।

গুণিয়া গ্রামের মুখিয়া চৈতুরাম পোর্তের বাড়ির সামনের মাটির দাওয়াতে বসে আমাদের কাজ করছিলাম। সেখানেই গ্রামের সব মানুষ এসেছিল। আশে পাশের গ্রামে, যে সব গ্রামে দু-চার ঘর মানুষের বাস, সেইসব গ্রামের মানুষও এসেছিল। আর এসেছিল লমনি রেঞ্জ-এর দুই ফরেস্ট গার্ড। সাগেলা আর নর্মদ। তাদের আসার কারণ 'তোলা' তোলা। শহরে বাকসর্বস্ব সরকারের ট্রাফিক পুলিশ যেমন রাজপথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'তোলা' তোলে, এরাও প্রয়োজনে দশ-বিশ-বাইশ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নদী পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে হেঁটে আসে গরিব গ্রামবাসীদের থেকে 'তোলা' তুলতে। কারণ, মারুতির ভাষাতে 'তোলা' ওদের বাপের সম্পত্তি। আক্ষরিকার্থেই এদের 'খেটে খেতে' হয়।

সূর্য পশ্চিমে হেললে মারুতি আর আমি রওনা হলাম গামহারগাঁও-এর দিকে। পথে মনিয়ারি কৈরাহা নদী পেরোতে হবে। প্রায় মাইল পাঁচেক চড়াই-এ উতরাইয়ের পথ। তবে পথে একবার চলতে আরম্ভ করলে দূরত্বের হিসাব রাখা যায় না, নেহাতই বেরসিক না হলে। আমি অন্তত রাখি না। কারণ, শহুরে আমি এসব পথের প্রতি বাঁকে-বাঁকে নিজেকে নবীকৃত করি। পাঁচ মিনিট বাদে বাদেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নিজের মনেই বাঃ! বাঃ! করে উঠি।

মারুতি আমার উচ্ছ্বাস দেখে হাসে, আর বলে হায়। হায়। মাড়োয়ারি মগনলাল লাডিয়াকা বাদমে ইয়ে কওন আয়া! তুম কৈসি অ্যাকাউন্টো বাবু হো! তুম সাচমুচ ডুবাওগে হাম লোঁগোকো। হিসাব সব্বেহি গড়বড় হো যায়গা।

আমি উত্তরে কিছুই বলি না। বুঝি যে, মারুতি পানকার ভালোলাগার প্রকাশ এইরকমই।

মনিয়ারি কৈরাহা নদীর পারে যখন এলাম তখন চোখ যেন আর সরতে চাইছিল না। নদীর ওপারে আদিম শাল-জঙ্গল। মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক। ঢেউ-এর পর ঢেউ-এ পাহাড় শ্রেণী হালকা থেকে গাঢ় সবুজ হয়ে মিশে গেছে নির্মেঘ নীল আকাশের সঙ্গে। সবুজের যে কতরকম। শালবনে ফুল এসেছে। হাওয়াতে মহুলফুলের গন্ধও ভাসছে শালফুলের গন্ধের সঙ্গে। কতগুলো বড়ো বড়ো ঝোপের মতন গাছে সাদা সাদা ফুল এসেছে। হাওয়া, তাদের গন্ধর রুমাল তুলে নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে তার অদৃশ্য দোসরের হাতে সেই রুমাল তুলে দেবার জন্যে। রিলে রেস চলছে যেন। আর লাল, হলুদ, বেগনি, সিঁদুরে এবং সাদা, কত না ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলো। যদি নাম জানতাম সব ফুলের। কোনো গাছের পাতা শুকিয়ে গেছে। তাদেরই বা কী রঙের বাহার। পাটকিলে

খয়েরি, ফিকে লাল, কালচে, হলদে কালো। মাছের কানকো-ধোওয়া জলের মতন লাল ফুলে ছাওয়া একটি মস্ত গাছ দেখলাম। তাদের পাতাগুলো ফিনফিনে। মারুতিকে জিজ্ঞেস করতে, সে কোমরে হাত দিয়ে ফুলে ফুলে হাসল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, এগুলো ফুল নয়। নতুন পাতা এসেছে গাছে। এই গাছের নাম কুসুম।

কুসুম?

হ্যাঁ।

বাসনাকুসুম?

সেটা আবার কি?

না। সেটা একটা গান। আমার মা করেন মাঝে মাঝে।

"বাসনাকুসুম হৃদয়ে যা ছিল সকলি দিয়েছি ফেলিয়া।"

বলেই ভাবলাম যে, সেই গানের বাসনাকুসুম এর সঙ্গে এই কুসুম এর তফাত আছে।

এই চাকরি নিয়ে গামহারগাঁওতে না এলে কোনোদিনও কি জানতে পেতাম যে আমাদের দেশের এই সব মিশ্র, স্বাভাবিক বনের সব গাছই পর্ণমোচী নয় এবং যারা পাতা-ঝরায় তারাও সবাই বছরের একই সময়ে তা ঝরায় না। কেউ বসন্ত শেষে, কেউ শরতে, কেউ শীতে ঝরায়। কী বিচিত্র সুন্দর আমাদের এই বন-জঙ্গল। ভালোলাগায় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

কি নাম ঝোপগুলোর?

জিজ্ঞেস করতে, মারুতি অনিচ্ছাতে উত্তর দিল আনজানা।

গামহারগাঁও-এ আমাদের ভাণ্ডারের আশ-পাশে অনেক কাঁঠাল ও আম গাছ আছে। মারুতি বলছিল যে, আরও দু একদিন পরেই কাঁঠালের মুচি আর আমের বোলের গন্ধে নাকি ম ম করবে আকাশ বাতাস। করৌঞ্জের গন্ধ উড়বে। সেই দিনের অপেক্ষাতেই দিন গুনছি এখন থেকেই আমি।

দূরের কোনো গ্রামে ধামসা আর মাদলে চাঁটি মেরে উৎসাহী যুবকেরা এখন থেকেই রাতে নাচ গানের জন্যে মহড়া দিচ্ছে।

এখানে আসার পর থেকে এরকম শুনতে পাই প্রায় রোজই রাতে। আগামী কালই হোলি। কাল সব কাজকর্ম বন্ধ। এখানে আসা অবধি দেখছি যে, সন্ধে হলেই গভীর বন-পাহাড়ের মধ্যের অদৃশ্য ছোটো ছোট গ্রামগুলি নৃত্য-গীতে মুখর হয়ে ওঠে। ওদের ভাষা তো আমি বুঝি না। গামহারগাঁও-এর বুড়ো ভবঘুরে গুণিন গাণ্ডা গোন্দ বলেছিল, ওদের গোন্দ ভাষার নাম হচ্ছে 'গোন্দি'।

বাইগা, পানকা, এদের ভাষার কি নাম তা কে জানে! সম্ভবত ওরাও ওই ভাষাই বলে। ভাষা বুঝতে পারি না ঠিকই, কিন্তু এদের গানের সুরে আর মাদল ধামসার আওয়াজে মন বড়ো উদাস হয়ে যায়। কী যেন চায় মন। কিন্তু কী যে চায়, তা বোঝে না।

মারুতি সেদিন আমার প্রশ্নর উত্তরে বলছিল, এখন তো হোলির সময়। আলাদা ব্যাপার। আনন্দের, নাচ-গানের, নেশা করার এমন উৎকৃষ্ট সময় নাকি এই বনে পাহাড়ে আর নেই। কিন্তু সারা বছরই সন্ধের পর এখানের সব মানুষেরা নাচগান নিয়েই থাকে। বিশেষ করে শুক্লপক্ষে। সপ্তমী অষ্টমীতে শুরু হয় আর চূড়োতে পৌঁছোয় পূর্ণিমাতে।

কোনো গানেরই ভাষা বোঝার কি খুবই প্রয়োজন থাকে শ্রোতার? শুধুমাত্র গজল বা নগমা ছাড়া? ওদের পাহাড়-জঙ্গল বেয়ে-আসা দূরাগত গানে আর আদল-ধামসার ধাধ্রাম শব্দে কেমন যেন ঝিমুনি আসে আমার। এ কথা মারুতিকে বলাতে, পরশুদিন সে আমাকে বলেছিল, ওই ঝিমুনিটারই তো আরেক নাম মস্তি। আমাদের নাচ-গানের পুরো মজাটাই এই একঘেয়েমিরই মধ্যে। থাকো এখানে। বুঝবে।

মনে হয়, দিকে দিকে এই ঝিম-ধরা চাঁদের রাতে, গ্রামে গ্রামে ছেলে মেয়েরা মহুয়া আর হাঁড়িয়ার নেশাতে যেন উত্তাল হয়ে কোনো অনন্ত ঘুমপাড়ানি গান গাইছে।

এই বাক্যটি পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল? উত্তাল অথচ ঘুমপাড়ানি।

ভাবলাম, আমি।

হলে হল। ওয়াল্ট হুইটম্যান যেমন করে বলেছিলেন " Do I contradict myself? Very well then, I do contradict myself."

তেমন করেই নিজের সওয়াল-এর জবাব দিলাম আমি।

একই রকম সুর, গলার এবং মাদল আর ধামসার আওয়াজের একই রকম ওঠানামা, যা একঘেয়েমির চূড়ান্ত বলে মনে হতে পারত, তাই আবার বৈচিত্রের চরম বলে মনে হয়। সত্যিই এ এক আশ্চর্য জাদু। এই প্রাচীন, বিরাট দেশের আদিম বাসিন্দা, এই আদিবাসীদের জাদু।

আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম নদীর পারে। পা দুটি যেন আটকে গেছিল। নদীর সাদা আর গেরুয়া খাতের সাদা জল, আর ছোটো বড়ো বিভিন্নাকৃতি কালো পাথরের উপরে বিদায়ী সূর্যের আলো পড়ে অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল পুরো জায়গাটি। আর নদীর কি নাম। মনিয়ারি কৈরাহা। আহা। নাম শুনেই প্রেম হয়ে যায়। বাঁশিও শোনার দরকার নেই।

পুবের আকাশ আলো করে হোলির আগের রাতের চাঁদ উঠেছে। বিশ্ব-চরাচর উদ্ভাসিত করে। একটি সোনালি থালার মতন। আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে হোলির চাঁদ যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু হারিয়েছেন জীবনে। গামহারগাঁও-এর এই চাকরিটি না পেলে, আমার জন্ম সত্যিই বৃথা হত।

পশ্চিম দিকে পলাশ আর শিমূল কী ফোটান যে ফুটেছে, তা কী বলব। শেষবেলার ম্লান বিধুর আলো তাদের বিধুরতর করেছে। নদীপারের একটা উঁচু গাছ ও ঘন সবুজ, প্রায় কালচে পাতার মধ্যে মধ্যে ঠিক সিঁদুররঙা ফুল ফুটে আছে এক রকমের। আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলাম সেই ফুলগুলোর দিকে।

মারুতি বলল, কী দেখছে অমন করে? ওগুলো সিন্দুর।

সিন্দুর? ফুলের নাম?

হ্যাঁ। না তো কি!

গাছের নামও সিন্দুর?

হ্যাঁ।

মারুতিটা গাছগাছালি চেনে কিছু কিছু। কিন্তু ভালোবাসে না। যেসব গাছের বীজে বা ফলে বা ফুলে, যেসব লতাতে তার প্রয়োজন নেই, তাদের নাম সে জানে না। জানার কোনো আগ্রহও নেই। বনপথে দু পা চলি, আর আমি তার কনুই ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলি, এটা কি গাছ? ওটা কি ফুল? সেটা কি লতা? ওই যে দূরে উড়ে গেল, কি পাখি ওটা?

মারুতি বিরক্ত হয়ে বলে, আর রে রে! পেড় হ্যায়, পেড় হ্যায়। আউর ক্যা। অজীব আদমি টৌটাবাবু তুমনে। ফুল হ্যায়, লতাহি হ্যায়, অউর ক্যা? চিড়িয়া হ্যায়। সিরিফ চিড়িয়াই। খাবসুরত ছোকরী হোতি থি তো সবহিকি না ইয়াদ রাখতা থা। ই সবকি নামসে হামারা ক্যা মতলব?

তারপর আমাব অপার ঔৎসুক্যে রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলত, লাগতা কি, তুম তো সাচমুচ কোই বিমার আদমী হ্যায়।

অধিকাংশ গাছকেই মারুতি শুধু গাছ বলেই জানে, ফুলকে ফুল, নদী-নালাকে নদী-নালা বলে। নাম জানার মধ্যে এই অঞ্চলের মনিয়ারি কৈরাহা আর মাট্টিনালার নামই জানে শুধু। তাও ও দুটি এই অঞ্চলের মুখ জলধারা বলেই। অথচ কত অজস্র ছোটো ছোটো সুন্দর, ক্ষীণ-কটি দুধলি সাপের মতন আঁকাবাঁকা নালা আর নদী যে এই পুরো এলাকার বন-পাহাড়ের বুকে আঁকিবুঁকি করে, সেই

বুককে কাটাকুটি করে চলে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। মারুতি তাদের কারোরই নাম জানে না। জানবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই।

বলে, ধ্যাত। দের হো রহা হ্যায়, চলো ছোটাবাবু জলদি। ইয়ে সিরিফ নাল্লাই হ্যায়, অউর ক্যা? নদ্দী হ্যায়। অউর কওন চি?

আমি মনে মনে নাম না-জানা নদীর, নাম না-জানা নালার, নাম না জানা গাছের, নাম-না জানা পাখির ইচ্ছেমতো নাম দিয়ে দি। নিজেই ডাকি তাদের, নিজের মনে। নিজেরই দেওয়া নামে। আর কেউ জানতেও পারে না।

মারুতিই আমাকে শিখিয়েছে, নদীর বালিতে বা বনপথের ধুলোতে যদি কোনো সাপের চলে যাওয়ার দাগ দেখো তাহলে নজর করে দেখবে। দাগটি যদি আঁকাবাঁকা হয় তবে বুঝবে যে সে সাপ বিষাক্ত। আর যদি সোজা চলে তাহলে বুঝবে নির্বিষ। মনিয়ারি কৈরাহা যদি নদী না হয়ে সাপ হত, তবে কি সে বিষাক্ত হত?

ভাবি আমি।

পথ চলতে তো আমি এতদিন শুধু সামনে চেয়েই চলতাম। কিন্তু বনের পথ চলতে যে হঠাৎ বিপদ ও অপার আনন্দকে আবিষ্কার করার জন্যে মাঝে মাঝেই যে উপরে ও নিচেও চেয়ে চলা দরকার সে কথা এখানে এসেই প্রথম শিখলাম।

তাছাড়া, গাণ্ডা গোন্দ আরও শিখিয়েছে, একশো আশি ডিগ্রি দৃষ্টি মেলে জঙ্গলে পথ চলার কথা। জিম করবেট-এর বইতে যেমন পড়েছিলাম। সবসময়ে সচেতনভাবে সচেষ্ট থাকলে তবেই এই দৃষ্টি ক্ষমতা আয়ত্তে আসে। গাণ্ডা গোন্দ ওসব 'ডিগ্রি' বা 'অ্যাঙ্গল'-এর কথা জানে না। হাত নেড়ে, তর্জনী নির্দেশ করেই শিখিয়েছিল তা। শিখতে এখনও পারিনি। তবে চেষ্টা চলছে অবিরত। এখানে এসে বুঝতে পারি যে, যার শেখার চেষ্টা আছে তাকে আজীবন, চিতায় ওঠার আগের মুহূর্তে অবধি শুধু শিখেই যেতে হয়। তবে এই শেখা বড়োই আনন্দের। প্রকৃতি পাঠ-এর মতন পাঠ নেই। প্রকৃতিই যে আমাদের সকলের দ্বিতীয় মা।

যে কোনো নদীর বা নালাই যে শুধুমাত্র নদী বা নালাই নয়, তাদের যে আলাদা আলাদা সৌন্দর্য আছে, চাল আছে, যাকে ভালো বাংলাতে বলে 'ঋতি', (নাটুকে গোদা গাঙ্গুলি শব্দটা শিখিয়েছিল আমাদের) তা মারুতি কি করে জানবে। প্রত্যেক জলধারাই আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে।

পাখি চেনে না ও তেমন। 'মোরাঙ্গী'র যে কি সৌভাগ্য তা 'মোরাঙ্গী' জানে না। সম্ভবত পাখিটা আমাদের গামহারগাঁওয়ের ভাণ্ডারের সামনে ভালু-টুংরির পাশে বুড়ো শিমুলের উপরে বেশ কিছু দিন ধরে বসে থাকে বলেই নাম জানতে ও বাধ্য হয়েছিল। বা সন্তুরামবাবু শিখিয়ে দিয়েছিলেন ওকে।

কে জানে।

মারুতি বলল, আজ বড়ি ভুখ লাগা টোটাবাবু। গুনিয়া বস্তি কি মুখিয়া উও শালে চৈতুরাম পোর্তে, কামিনা নাম্বার ওয়ান হ্যায়। হামলোগোঁনে দিন ভর উ বস্তিমেহী ঠারহা মগর শালে কুছভি খিলায়া-পিলায়া নেহি। ভয়সা কাঁহাকা। না দানা, না পানি। পানি, মতলব চার লোটা পীনেকে পানি দিয়েথে। মগর ইয়ে ক্যা বদতমিজি। ছোঃ!

আমি বললাম, তুমি তো চৈতুরাম পোর্তের জামাই নও যে, তোমাকে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব খাওয়াবে।

মারুতি বলল, ফুঃ। ওর মেয়েকে বিয়ে করলে তো! ও প্যাটেল হলেও করতাম না, মুকাদ্দম হলেও নয়। মেয়ে তো নয়, হিড়িম্বা।

তুমি রামায়ণও পড়েছ না কি? তুমি তো আদিবাসী।

রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের প্রত্যেকের। শুধু কি হিন্দুদেরই জন্য নাকি?

রামায়ণ-মহাভারতের গল্প প্রতিটি নিরক্ষর মানুষেও জানে। আমাদের যা কিছু ভালো মন্দ ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের জ্ঞানগম্মি সবই তো রামায়ণ-মহাভারত থেকেই এসেছে। তা ছাই, পড়তে পারুক আর না-ই পারুক। মুখে মুখেই ছেলেবেলা থেকে আমরা শিখেছি রামায়ণের গল্প। যেমন করে লমনির উস্তাদ হরদেওপ্রসাদ, উস্তাদি গান শিখেছে তার গুরুর কাছে, শুধু কানেই শুনে। আদিবাসী মানে কি? আমরাই তো আদি বাসিন্দা। আমাদের সব কিছু জানবার হক আছে।

ওর কথা শুনে বললাম, ঠিক কথা।

তবে কথাটথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

খিদে আজ আমারও খুব লেগেছে।

খ্যায়ের, ছোড়ো। চলো, জোর কদমসে ভাণ্ডার পৌছনা। ফাগগু আজ গরম গরম রোটি আর বাইগনকা ভাত্তা বানায়গা। হরা মিরচা অউর লেহসুন ডালকর। বোলকর আয়া উসকো। হুম্মচকে খায়েগা আজ। হাঁতো।

বলেই, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আররে বুড়হা দেও!

কি?

আমি অবাক হয়ে বললাম।

দেখোই না একবার।

বলেই, আমাদের প্রায় পায়ের সামনেই মনিয়ারি কৈরাহার বড়ো বড়ো উপলকীর্ণ পেলব মিহি বালির উপরে তর্জনী নির্দেশ করে দেখাল।

দেখলাম, বালির উপরে কি একটা দাগ। তারপর আরও কাছে গিয়ে দেখলাম।

মারুতি বলল, দিখো তো সাহি টৌটাবাবু।

মারুতি, লেনদেন কাজ কারবার করে করে, পেন্ড্রা রোডের ট্রাক-ড্রাইভার, কুলি-কামিন, গামহারগাঁওয়ের দোকানের মানুষ, শেওতারাই আর বিলাসপুরের নানা ব্যাপারী এবং যাওয়া আসা করা বাস-এর কনডাক্টর-ড্রাইভারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে হিন্দিটা বেশ ভালোই রপ্ত করে ফেলেছে। ওর ভাষাতে ওর আদিবাসী মাতৃভাষার কোনো চিহ্নই থাকে না আর বিশেষ করে অবশ্য যখন আমাদের মতন অনাদিবাসী মানুষের সঙ্গে কথা বলে। পানকারা যদিও প্রকৃতার্থে আদিবাসী নয়। তাও ভালো। আমি একটু একটু বুঝতে পারি। নইলে শরীরের অঙ্গভঙ্গি আর সংকেতের দ্বারাই তার সঙ্গে আমার মনের ভাব আদানপ্রদান করতে হত। বডি-ল্যাংগুয়েজ দিয়ে।

মারুতি, তার প্রায় সর্বক্ষণের সাথি টাঙ্গিটা বাঁ কাঁধের উপরে টাঙিয়ে দিয়ে নিজের সবুজ রঙা হাফ শার্টটা তুলে নির্মেদ পেট ও বুকের অধিকাংশ উন্মুক্ত করে মুখ থেকে ঘাম মুছল ভালো করে একবার। তারপরই দু-হাত দু কোমরে রেখে বলল, ক্যা সমঝা?

ক্যা?

আমি কিছুই না বুঝে বোকার মতন বললাম।

ভাবলাম, সেই রাতে মানে এখানে আমার দ্বিতীয় রাতে, আগুনের সামনে বসে যে জিনপরীদের কথা বলছিল ও, তাদেরই পায়ের ছাপ নয়তো এ!

কিতনা বড়োকা বা! বাপরে বাপ!

আবারও বলল মারুতি।

কি?

বাঘোয়া। বড়ো বাঘ। পেন্ড্রা-ফেন্ড্রা নেহি। এক ডাবল ভঁইসাকো পটকাকে, সাথ মে লেকর ইতমিনানসে দু মিল পাহাড়কি ভারী চঢ়াই পার কর দেগা।

মারবার পরে আবার অত সার্কাসের দরকার কি? খেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

আমি বললাম।

বাঘের স্বভাব আমারই মতন। নিরিবিলি নির্জনে ছাড়া সে খেয়ে সুখ পায় না। মারুতি বলল।

তাই?

হাঁতো।

তারপর নিজেই বলল, এই বাঘটা ঝিকারপানির পাহাড়ে থাকে। এই মনিয়ারি কৈরাহা নদী ধরেই নেমে আসে সন্ধের মুখে মুখে সেই পাহাড় থেকে। এর নাম ঝিকারপানির বাঘ। চলে আসে রাতে রাতেই আমাদের গামহারগাঁও অবধিও। তারপর গামহারগাঁও ছাড়িয়ে ওদিকে অচানকমারেও যায় কোনো কোনোদিন। কোনোদিন বা উলটোদিকের লমনির জঙ্গল হয়ে চলে যায় কেঁওচি অবধিও। আবার ফিরে যায় সূর্য ভালো করে ওঠার আগেই ঝিকারপানি পাহাড়ের গুহাতে। সেই তো বনের রাজা। এই সবই তো তারই রাজত্ব।

অত দূর দূর যায় একই রাতে? বলো কি তুমি!

আমি বললাম, অবিশ্বাসী গলাতে।

আমি তো সব ব্যাপারেই অজ্ঞ।

ভাবছিলাম, কিছু মানুষের স্বভাব থাকে বিনাকারণে মিথ্যা কথা বলার। মিথ্যা বলে, বা বাড়িয়ে বলে, তারা অনাবিল আনন্দ পায়, আমাদের বাগবাজারের পটলাদারই মতন। সেই মিথ্যা কথনে বা বাড়িয়ে বলায় তাদের যেমন লাভ হয় না কোনো, অন্যের কোনো ক্ষতিও হয় না। কিন্তু পটলাদা বা মারুতিরা কারণহীন AMPLIFICATION-এর ব্রত উদযাপন করার জন্যেই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়।

মারুতিও পটলাদারই মতন।

মারুতি বলল, হাঁতো! একটা বড়ো বাঘে এক রাতে কত চলতে পারে জানো?

আমি কী আর জানি। এইসব জঙ্গল পাহাড়ের সব বিদ্যাতেই পুরোপুরি আনপড় আমি, চুপ করেই রইলাম।

তবে আর কথা বলো কেন? প্রয়োজনে, এক রাতে পনেরো-বিশ এমনকী তিরিশ মাইলের চক্করও কিছুই নয় তার কাছে। সে যে বনের রাজা!

বলেই বলল, এইটা মাদি বাঘ।

কি করে বুঝলে?

পায়ের দাগ দেখেই বুঝলাম। আমি তো তোমার মতন হিসেবের খাতায় 'রেওয়া' না কি বলছিলে কাল রাতে, সেসব মিল করতে শিখিনি। কিন্তু বাঘের পায়ের ছাপের অঙ্ক মিল করতে শিখেছি যখন ন্যাংটো অবস্থাতে বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতাম তখন থেকেই।

নদীর বালিতে নামতে নামতে বললাম, ন্যাংটো অবস্থাতেই বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে কেন? ভয়ডর ছিল না তোমার? এখন তো তোমার কতই ভয় দেখি। বাঘে ভয়, জিন-পরীতে ভয়, সাপে ভয়, গাউর-এ ভয়। বুনো মোষ-এ ভয়।

এই মধ্যপ্রদেশেই 'রেওয়া' বলে একটা রাজ্য আছে শুনেছিলাম। রাজারা যেখানে সাদা বাঘের চাষ করেছেন। কিন্তু তোমাদের লাভ-লোকসানের হিসাবের রাজ্যেও যে অন্য 'রেওয়া' আছে তা তো জানা ছিল না।

বলেই বলল, বাঃ রে। ঘুরব না। বন-পাহাড়-নদী এই সবই তো আমাদের খেলাঘর। আর শৈশবে তো সব মানুষই ভগবানই থাকে। না থাকে তখন অন্য কোনো ভয়, না থাকে কোনো রিপুর ভয়। তখনই তো মানুষের আসল স্বর্গবাস হয়। শিশুরা তো ঈশ্বরেরই দূত। আমাদের কি তোমাদের শহরের মতন কেয়ারি করা সব শৌখিন ফুলে-সাজানো সমান করে ছাঁটা ঘাসে-ছাওয়া পার্ক আছে? এই বন জঙ্গলই তো আমাদের পাঠশালা। এই সবই তো আমাদের পার্ক, যতদূর দেখতে পাচ্ছ তুমি তোমার দশদিকে, সবই।

তা আমাদের শহরের পার্কও তুমি দেখেছ না কি? 'পার্ক' শব্দটা জানলে কি করে। মানে শুনলে কার কাছ থেকে?

দেখিনি। পার্ক? হাঃ।

কোথায় দেখলে?

বিলাসপুরেই। এদিকের সরকারি কয়লা খাদগুলোর বড়ো অফিস তো সেখানেই। সিপাত রোডে। গেছিলাম চুন্নুবাবুর সঙ্গে একবার। তাছাড়া একবার তোমাদের কলকাতাতেও তো গেছিলাম। লেবিনসাহেব নিয়ে গেছিলেন। তখন অবশ্য আমার বয়স নয়-দশ।

কলকাতায়?

হাঁতো।

কি দেখলে?

চিড়িয়াখানা। হাওড়া ব্রিজ। জাদুঘর। কোম্পানি বাগান।

বলো কি তুমি। এর পরও কি তোমাকে গাঁইয়া ভাবা যায়। অত সব তো আমি নিজেও দেখিনি কলকাতাতে জন্মকর্ম হয়ে।

হাঃ। তাই তো হয়। অন্ধকার তো প্রদীপের তলাতেই থাকে।

বিজ্ঞের মতন বলল, মারুতি।

ভাবলাম, আশ্চর্য। আমি কলকাতারই ছেলে অথচ আজ অবধি জাদুঘর এবং কোম্পানি বাগানে যাওয়াও হয়ে ওঠেনি। কোম্পানি বাগান মানে বটানিকাল গার্ডেন। ভাবছিলাম, কলকাতার মানুষদের ঔৎসুক্য বড়োই কম। আমরা কূপমণ্ডুকের জ্বলন্ত উদাহরণ। এই মারুতিরাও যেমন গাছকে গাছ, ফুলকে ফুল, পাখিকে পাখি, নদীকে নদী বলে, আমরাও সেরকমই। দুপাতা বাংলা, ইংরেজি শিখে আর একটু অঙ্ক জেনে ওদের চেয়ে খুব বেশি এগোইনি সম্ভবত, শিক্ষার ব্যাপার কৌতূহল যার নেই, সব বিষয়েই অপার কৌতূহল, সে মানুষ ডিগ্রির ভারে ন্যুব্জ হয়ে থাকলেও তাকে শিক্ষিত বলা যায় কি?

বললাম, আরে আমাদের কলকাতা শহরটাই তো একটা চিড়িয়াখানা। মানুষের। তবু চিড়িয়া আর জানোয়ারে রাজ্য এইরকম গহন জঙ্গলের এলাকা থেকে চিড়িয়াখানা দেখতে কেউ কি কলকাতাতে যায়? অবাক করলে তুমি!

কেন? কত জানোয়ার দেখলাম, যা আমাদের জঙ্গলে দেখিনি কখনও। পাখি। বাবাঃ কী বিরাট কাছুয়া রে বাবু। কত বয়স, কে জানে। হাতি। কী প্রকাণ্ড শুঁড়। আর কী তাগড়া। উট পাখি দেখলাম। বাবা! সে কি পাখি, আমাদের ময়ূর-মোরগা-তিত্বর-বটেরেরা দেখতে পেলে ভয়েই অক্কা পেত।

আর কি করলে?

খেলাম। কত কি খেলাম।

কি খেলে?

আইসক্রিম। বেশ মিষ্টি। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কমমিষ্টি একটা জিনিস খাওয়ার লোভ ছিল আমার, তার নাম শোনার পর থেকেই, তা লেবিনসাহেব খেতে দিলেই কই? কোনো উৎসাহই দিলেন না।

সেটা কি মিষ্টি?

জ্যোতি বসু।

আঁতকে উঠে আমি বললাম, কি?

মারুতি গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সেই কিমতি মিষ্টি খাদ্যের নামটি আবার উচ্চারণ করল। জ্যোতি বসু।

হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। অমন বিপদে জীবনে পড়িনি। বললাম, এ নামের কম মিষ্টি খাবারের কথা তোমাকে কে বলেছিল?

মারুতি বলল, কে আবার। স্বয়ং লেবিনসাহেব। লেবিনসাহেব, রায় সাহেবকে বলছিল যে।

রায়সাহেবটা আবার কে?

যার বাড়িতে আমরা পাঁচজন ছিলাম।

তাঁকে কি বলেছিলেন লেবিনসাহেব?

বারবারই বলছিলেন কমমিষ্টি জ্যোতি বসু, কমমিষ্টি জ্যোতি বসু।

বুঝলাম যে, আমার সহকর্মী, পবিত্র, অকলুষিত বনবাসী মারুতি পানকা কমমিষ্টি অথবা কম-অনিষ্ট কমিউনিস্টদের নামও শোনেনি। যেমন, আমি শুনিনি গামহারগাঁও এর মোরাঙ্গী পাখির নাম।

ভাবছিলাম, এ সংসারে কেউই সর্বজ্ঞ নয়। সকলেই কম বেশি শেখার আছে সকলেরই কাছ থেকে। আজ ভাণ্ডারে ফিরে মাকে আর বড়োমামাকে দুটি পোস্ট কার্ড লিখব আলাদা করে। লোভনীয় এবং "কমমিষ্টি" কিমতি খাদ্য জ্যোতি বসুর কথা জানিয়ে। তা জেনে, আমি যে কোন স্বর্গে আছি তা বুঝতে পারবেন ওরা। স্বর্গই তো! IGNORANCE IS BLISS!

জ্যোতি বসু তখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন কি? কে জানে।

এই ভারতবর্ষ এমন খাদকও যে আছে, যে, জ্যোতি বসুকে খাদ্যের মধ্যে গণ্য করে, তা সকলেরই জানা দরকার। তবে মারুতি পানকা তাঁকে খেলেও তিনি সুখাদ্যর মধ্যে আদৌ গণ্য হতেন কি না, বলা যায় না তা। সহজপাচ্য হতেন কি না, তাও নয়। তাঁকে খেলে হয়তো বৈদ্যনাথ *দাবাখানার* এক কৌটা কজ্জহারও খেতে হত মারুতির, তাঁকে হজম করতে।

বাঘের পায়ের দাগ দেখে যখন আমরা নদী পেরোব, ঠিক সেই সময়েই *ঝিকারপানি* পাহাড়ের দিক থেকে একটা গা-শিউরানো উঁ-উঁ-উঁ-আউঁ আওয়াজ ভেসে এল। যত সংক্ষেপে আওয়াজটার বর্ণনা দিলাম, আওয়াজটা মোটেই তত সংক্ষিপ্ত নয়। যথেষ্ট দীর্ঘায়িত। কী বল। সে তো আওয়াজ নয়! আমার ব্রহ্মতালু যেন ফুঁড়ে গেল সে ধ্বনিতে। পাহাড় বন সেই মন্দ্রস্বরকে প্রতিধ্বনিত করল অনেকক্ষণ ধরে। গগননিনাদী সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনাঞ্চল স্তব্ধ হয়ে গেল। কাঠঠোকরা তার ঠকঠকানি বন্ধ করল। সব পাখিরাই থেমে গেল যেন রাজাকে প্রণাম জানাতে। প্রতিধ্বনি ফিরে যাবার আগেই আবারও উঠল। সে ধ্বনি। তারপর পরপর ক্রমাগত হয়েই যেতে লাগল। তবে স্বস্তির কথা এই যে ক্রমশই তা দূর থেকে দূরে চলে যেতে লাগল। তার মানে, বাঘিনি আজ অন্যদিকে যাচ্ছে।

খেয়েছে!

স্বগতোক্তি করল মারুতি।

কী হল!

হবে আমার কি? এই শালিও আরেক কৌশল্যা!

কৌশল্যা!

আমি অবাক হলাম মারুতির কথা শুনে। তার কথার মানেও বুঝলাম না।

জুড়ি খুঁজছে। গরম ধরেছে যে শালির। এই পথে এখন কিছুদিন আমাদের সাবধান যাতায়াত করতে হবে। বাঘ-বাঘিনি জুড়ি পেলেও বিপদ, না পেলেও বিপদ। তোমাকে সে একেবারে বাইগন ভাত্তা বানিয়ে ছেড়ে দেবে হে কলকাত্তাইয়া টৌটাবাবু।

কে?

দুজনেই।

মানে?

মানে, বাঘিনিও বানাতে পারে, কৌশল্যাও বানাতে পারে। তবে তোমার পক্ষে কৌশল্যার হাতে বেগুন-ভাত্তা বনাটাই ভালো।

কী যে বলো না। বলছটা কি?

আমার গণ্ডমূল কর্ণমূল এবং যাবতীয় মূল গরম এবং লাল হয়ে উঠল।

হ্যাঁ! তবে কৌশল কিছু শিখে এসেছে কৌশল্যা। অভিজ্ঞজনে বলেন।

কোথা থেকে?

বিলাসপুর থেকে।

সেখানে কি?

ইস্কুল আছে কৌশল শেখার।

তাই?

নয় কি? যেখানে কারখানা, যেখানে কয়লাখনি, যেখানে শহর, জনপদ, সেখানেই কৌশল শেখার ইস্কুল থাকবেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে মারুতি বলল, স্বাভাবিক। আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন গুহাতে থাকত, যখন আগুনও আবিষ্কার করেনি মানুষে, যখন ফসলও ফলাতে শেখেনি তখন থেকেই তো এই খিদে আছে। মানুষের খিদের শুধু দুই-ই রকম হয় টোটাবাবু। আদিমতম খিদের।

কি কি?

পেটের খিদে আর পেটের তলার খিদে।

আমি চুপ করে রইলাম।

মারুতি হয়তো জানে না, জানবে কি না কখনও, তাও অজানা, মানুষের আরেকরকম খিদেও আছে। অন্তত কিছু মানুষের। তা জ্ঞানের খিদে, মনের খিদে। জিগীষা। সেই খিদের খোঁজ সে এখনও পায়নি। হয়তো পাবেও না কোনোদিন। যদি না পায়, তবে সেটা তার দুর্ভাগ্য বলেই মেনে নিতে হবে।

আর যদি জানতে পারে, যেদিন পাবে, সেদিন ওই দুই খিদেই অবান্তর হয়ে যাবে। তবে একথা ঠিক যে, সাধারণের কাছে ওই দুই খিদেই তো সব। রাজনীতিকরা খুব বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের ওই এক নম্বর খিদেকেই মূলধন করে রাজনীতির বেসাতি করে গেলেন চিরটা দিনই অথচ তাঁদের মতন ভালো কেউই জানেন না যে, মানুষের মনের খিদের মতন যন্ত্রণাদায়ক খিদে, প্রকৃত স্বাধীনতার খিদের মতন জ্বলন্ত খিদে আর কিছুই নেই। ছলে-বলে-কৌশলে মানুষকে পেটের খিদে আর পেটের তলার খিদেটুকুই শুধু জানতে দিয়ে, তাকে ভুলিয়ে, তাদের ভোটের মোয়া খাওয়ানোটাই তাঁদের একমাত্র কাজ। এদেশীয় রাজনীতিকরা, আমার মনে হয়, মানুষের আসল খিদেকে মেরে দেওয়ার অপরাধে, ইতিহাসের কাছে একদিন অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। আপাদমস্তক ভণ্ডামির অপরাধে, সাধারণ মানুষের হিতৈষী সেজে তাদের সর্বনাশ করা অপরাধে, তাঁরা শাস্তি একদিন পাবেনই।

এসব কথা মারুতির সঙ্গে আলোচনার নয়। ভাগ্যিস নয়। এই গামহারগাঁও, ছিরহট, অচানকমার, লমনি, কেঁওচি, অমরকণ্টক এসব যে স্বর্গরাজ্য। এই স্বর্গভূমে ওইসব ছোটো ছোটো সাধ, ছোটো ছোটো লোভ, ছোটো ছোটো উচ্চাশার কথা মনে না আনাই ভালো।

চলো বাবু। বলে, মারুতি যেই আগে এগিয়েছে, অমনি হুক। হুক। হুক। করে তিনবার খুব জোরে একটা বুক হিম করা আওয়াজ শুনতে পেলাম আমাদের সামনের তিনদিক থেকে।

এ আবার কোন জানোয়ার? ভাল্লুক কি? শুনেছি এখানে বিরাট বিরাট ভাল্লুক আছে। বুকে সাদা 'v' চিহ্ন। 'V' for victory? তারা হারে না। বনে বাঘও তাদের এড়িয়ে চলে। তাছাড়া তারা মাথা-মোটা গোঁয়ার-গোবিন্দও নাকি খুব।

কিসের আওয়াজ?

চমকে মুখ তুলে দেখি, নদীর উলটোদিকের যে ভাঙন ধরা উঁচু পাড়ের দিকে পায়ে চলা পথটি গেছে খোয়াই ধরে, তারই ঠিক পেছনে এবং ডান ও বাঁ দিকে, এক এক দলে তিন-চারজন করে মানুষ, বিভিন্ন উচ্চতার কালো পাথরের টিলার উপরে তীরধনুক বর্শা এবং টাঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষগুলো প্রায় ন্যাংটা। খালি গা, কৌপিনের মতন সাদা এক ফালি করে ন্যাকড়া জড়ানো কোমরের কাছে।

আমাদের পেছনে তখন মস্ত বড়ো হলুদ থালার মতন চাঁদ উঠছে আর সামনে কমলা-রঙা থালার মতন সূর্য ডুবছে।

মারুতি তাদের দিকে চেয়ে কিছু বলতে যাবার আগেই এক ঝাঁক তীর এসে আমাদের সামনে ও দুপাশে পড়ল। বালিতে গেঁথে গেল কিছু। কিছু ঘষটেও গেল কিছুটা, গতিজাড্যতে। মারুতি এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে যেতে গিয়েই দেখি, আমাদের পেছন দিক থেকেও ওইরকমই, আর একদল মানুষ তীরধনুক বাগিয়ে দৌড়ে এগিয়ে আসছে নদীর পাড়ের উঁচু জঙ্গল থেকে নেমে।

মারুতি ফিশফিশ করে আমাকে বলল, টাকার থলেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও।

প্রায় দেড় হাজার টাকা ছিল থলেটাতে। কোম্পানি থেকে দেওয়া চামড়ার একটা কাঁধে-ঝোলানো থলিতে। বাস কনডাক্টরদের ব্যাগের মতন। সকালে, আমরা যখন বেরিয়ে পড়েছি তখন বাস থেকে নেমে বড়ো রাস্তা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ড্রাইভার নাথু সিং দিয়ে গেছিল, পেন্ড্রা রোড থেকে ও আজ বাসেই এসেছে। ট্রাকের আর্মেচার নাকি জ্বলে গেছে। বাসটা লেট করে ছেড়েছে পেন্ড্রা রোড থেকেই। ছিল তিনহাজার পাঁচশো মতন। দাদন দিয়েছি আজ। গণিয়া, চুরালিয়া আর চিল্পুর গ্রামে। একটু বেশিই দিতে হয়েছিল মারুতির মতে, কারণ বানারসিলাল ফড়ে, কম্পানিকে এবারে প্রায় কিনে নেবার মতলব করেছে।

এই বানারসিলাল ফড়ে সম্বন্ধে মারুতি আর কিছুই বলেনি আমাকে। তবে ওর চোয়ালের মধ্যে দাঁতের পাটিদুটো হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠতে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একথা। গণিয়ার মুখিয়ার ঘরের সামনের বড়ো নিমগাছের ছায়াতে পাতা চৌপাইতে বসে শুধু এইটুকু বলেছিল সে আমাকে।

যা আছে তা সবই দিয়ে যাও। টাকা তো চুন্নুবাবুর। কিন্তু প্রাণ তো আমাদের। থলিটাই দিয়ে দাও।

মারুতি আদেশ করল আমাকে।

থলিটার মধ্যে নাটুকে ফোর টোয়েন্টি গোদা গাঙ্গুলির দলেরই একজন, নলিনী সরকার স্ট্রিটের ঝুমরীর, আমাকে প্রেজেন্ট করা একটি মোষের শিং-এর সাধের চিরুনি ছিল। সেটা দিয়ে দিতে আমার বুক ফেটে গেলেও উপায় ছিল না কোনো।

লোকগুলো চারদিক দিয়ে আমাদের একেবারে ঘিরে ফেলল। ভাবলাম বনদেওতার থানে নিয়ে গিয়ে বলি-টলি দেবে নাকি? হোলিতে কি মানুষ বলি দেওয়া রেওয়াজ? ওরা সবসুদ্ধু জনা আঠারো-কুড়ি হবে। তার উপরে সশস্ত্র। খালি হাতে আমাদের কিছু করার ছিল না। খালি পায়ে দৌড়োতে পারতাম এবং তা করার মতলবেই ছিলাম কিন্তু ওরা যে চারদিক দিয়েই ঘিরে ফেলেছিল আমাদের। দেখলাম, ওরা কথার চেয়ে কাজে পটু। মারুতি কিছু বলার আগেই প্রথমে আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে নদীর বালিতে ফেলে কিল চড় লাথি মারতে লাগল। হয়তো মারুতির চেয়ে আমি লম্বা চওড়া বলে এবং স্বাস্থ্য ভালো বলে ভেবেছিল, ওর চেয়ে গায়ের জোর এবং সাহস আমার বেশি।

কিন্তু আমাকে মাটিতে ফেলে আমার বুকের উপরে চড়ে বসল তো বটেই, মারুতিকেও রেয়াৎ করল না। তবে মনে হল আমারই উপরে আক্রোশটা বেশি। কেন? তা কিছুতেই ভেবে পেলাম

না। আমার প্রতি এই বিশেষ বিরূপতার কোনো কারণই বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম হয়তো আমার হাতের এইচ, এম.টি 'জওয়ান' হাতঘড়িটার জন্যেই এমন করছে। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা পাস করার পরেই বাবা আমাকে ওটা কিনে দিয়েছিলেন। বাবার শেষ স্মৃতি ঘড়িটা খুলতে আমার একটু দেরি হয়েছিল। তাতেই ওদের মধ্যে একজন আমার হাত লক্ষ করে দুহাতে টাঙ্গি তুলল, হাতটি কেটে দু টুকরো করবে বলে। তাড়াতাড়ি ঘড়িটা খুলে দিলাম।

অবশ্য বাঁ-হাত কাটা গেলে দুঃখের কিছু ছিল না। ভবিষ্যতে কোনোরকম বাঁ-হাতি অপকর্মের দায় এবং দুর্নাম থেকে চিরদিনেরই মতন মুক্ত হওয়া যেত।

কিন্তু ঘড়িটা নেবার পরও লোকগুলো ওদের ভাষাতে কী সব বলতে লাগল একসঙ্গে মারুতিকে। তারই মধ্যে ছিরহট, মুকাদ্দম, আর মুলারীবাই-এর নাম উচ্চারিত হতে শুনলাম বারবার।

এই মুলারীবাই-এর নাম প্রথমবার আমি শুনি জিগারির কাছে। তারপর মারুতির কাছে। মুলারীবাই, ছিরহট গ্রামের মুকাদ্দম-এর মেয়ে নাকি। কিন্তু আমি মুলারীবাইকে আসার পর একবারও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। আমি তো তাকে চিনি না। কিন্তু আমি না চিনলেও মারুতি তাকে বিলক্ষণ চেনে। আর চেনে বলেই, বড়ো বাঘিনির পায়ের দাগ নদীর বালিতে দেখে মারুতির যেমন বৈকল্য ঘটেছিল, মুলারীবাই তার ধারে-কাছে এলেও যে তার তেমনই বৈকল্য ঘটত সে বিষয়ে মুলারীর প্রতি তার মনোভাবের কথা জেনে যাওয়ার পরে, আমার কোনোই সন্দেহ ছিল না। মারুতি যখন ধারে-কাছে ছিল না তখন এলেও হয়তো আমি তাকে চিনতে পারতাম। রাজকন্যাকে চিনতে পারব না এমন প্রজা আমি নই। সহজাত বুদ্ধি দিয়েই চিনে ফেলতাম।

ব্যাপারটা বড়োই গোলমেলে ঠেকতে লাগল। নির্বুদ্ধি আমার সমস্ত বুদ্ধি জড়ো করেও আমি এই দুর্বোধ্য অঙ্কের কোনো উত্তর পেলাম না। ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হয়ে গেল যখন কুচকুচে কালো মাঝারি উচ্চতার প্রায় নগ্ন মানুষগুলো যাবার আগে আমার দিকে দেখিয়ে—টোটা। টোটা। টোটা। বলতে বলতে অস্তগামী সূর্যের পূর্ণাবয়ব গাঢ়-কমলা-রঙা গোলাকৃতি বলয়ের মধ্যে তাদের তীরধনুক দা আর টাঙ্গি কাঁধে কোনো দুঃস্বপ্নর দেশের ভুতুড়ে মানুষদের মতন চলমান কালো শিল্যুটগুলো নিয়ে সেঁধিয়ে গেল, যেন সূর্যকে তীরবিদ্ধ করার জন্যই।

ওরা চলে গেলে একসময়ে আমি শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বালিতে বসলাম।

আগে লক্ষ্য করিনি, আমার মুখের দুই কষ বেয়েই রক্ত গড়াচ্ছে, ডান চোখের নিচটা কেটে গেছে। নিচের ঠোঁটটাও প্রায় দুফাঁক হয়ে গেছে। রক্তে আমার সাধের সাদা শার্টটা ভেসে যাচ্ছে। গত পুজোতে মাসিমণি দিয়েছিল শার্টটা।

কিন্তু এও ঠিক যে, সেই মুহূর্তে মানসিক ধাক্কা ছাড়া আমার আদৌ কোনোরকম শারীরিক কষ্ট ছিল না।

তারপর সপ্রতিভ, রসিক মারুতি বলল, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। বাঘিনি কামড়ালে পুরো মাথাটাই পাড়হেন মাছের মাথার মতন ধড় থেকে আলাদা করে দিত। এরা বাঘের পূজারিমাত্র। বাঘ তো আর নয়। খ্যয়ের কোনো চিন্তা নেই। কাল হোলির দিন সকালে মেন্ড্রিসেরাই-এর কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।

মেন্ড্রিসেরাই? সেটা কি? মানে, সে কে?

সে এক মস্ত গায়নিকলজিস্ট। বিশাল লম্বা। তোমাকে বলেইছি তো!

কত লম্বা?

তা, কম করে পঁচিশ তিরিশ মানুষ তো হবেই।

মহা ফাঁপরেই পড়লাম আমি।

গায়নিকলজিস্টের কাছে? আমাকে? মহা ফাঁপরেই পড়লাম আমি।

হ্যাঁ। টোটেম খাইয়ে দেব তারপরে। ভালো হয়ে যাবে।

টোটেম কি?

তা জানি না। লেবিনসাহেব বলেন। কোনো ওষুধ-টষুধ হবে।

ওই রকম মানসিক অবস্থাতেও কমমিষ্টি জ্যোতিবাবুর খাদ্যগুণের কথা মনে পড়ে আমার হাসি পেয়ে গেল। কান্নার সময়ে হাসি পেল।

তারপরই মারুতি দৌড়ে নদীর পাড়ে গিয়ে কী কতগুলো চেরা-চেরা ফিনফিনে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসে দু হাতে কচলে আমার ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল।

বুঝলাম যে, সারা রাত শরীরের যন্ত্রণায় কাতরাতে হবে। কিল চড় লাথি ঘুষিতে পিলে ফেটেছে না কানের ড্রাম বরবাদ হয়েছে তা কে জানে। কিন্তু সেই সব বিপদ না হয়ে কোনোক্রমে সামলে নেওয়া যাবে, কিন্তু তেইশ বছরের টগবগে পুরুষ হয়েও পাঁচিশ তিরিশ মানুষ লম্বা গায়নিকলজিস্ট-এর হাত থেকে বাঁচার কি উপায়? টোটেমই বা কি করে খাব?

পাঠক। সেই মুহূর্তে, ওই বনমধ্যে বসিয়া হাঁক পাড়িয়া আমার ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা যাইল।

হায় মুলারীবাই। একী সমাপন! তুমি যে উগ্রসেন হইতে নিষ্ঠুর। তুমি কে? কে তুমি রাজকন্যা? যে টোটাকে গামহারগাঁও-এ জিগারি 'ফুটিবার নহে' বলিয়াই 'ফুট্রুস' অ্যাখ্যা দিয়াছে সেই টোটারই দ্বারা সেই সুন্দরী কিরূপে বধ্য হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিবমিষার উদ্রেক হইল।

এমতাবস্থায় সেই শ্বাপদসংকুল, জিন-পরীদের বিচরণক্ষেত্র গহন অরণ্য-মধ্যে আসন্ন অন্ধকার রাত্রির ভয়াবহতা বহুগুণ বর্দ্ধিত করতঃ ঝিকারপানির বাঘিনি পুনর্বার গর্জন করিয়া উঠিল। এবং এইবার দূরেও নয়। অদূরেই।

মারুতি ফিশফিশ করিয়া কহিল, বাবু কোনোই চিন্তা নাই। আগামীকালই মেড্রিসেরাই-এর কৃপাতে তোমার সমুদয় শারীরিক অস্বস্তি দূরীভূত হইবে। এক্ষণে বোবার মতন চুপ করিয়া থাকো। বাঘিনি কামোন্মত্তা। সে করিতে পারে না এমন কর্ম আর নাই।

আমি ভাবিলাম, কাল প্রত্যুষেই আমি এই অকুস্থল হইতে পলায়ন করিব। য পলায়তিঃ স জীবতিঃ।
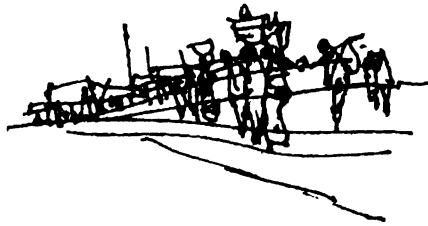
চলে গেল হোলি। এই বসন্তবনের শত শত বাসনাকুসুম ফোটানো হোলি। দেখা হল না। 'কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান'। হোলিও দেখা হল না, গায়নিকলজিস্ট মেড্রিসেরাই-এর কাছেও যাওয়া হল না। মুলারীবাইকেও দেখা হল না।

যেদিন ছিনতাই বা ডাকাতি যাই হোক হয়, সেই রাতে মানে, হোলির আগের রাতে তো দু চোখের পাতা একমুহূর্তের জন্যেও এক করতে পারিনি। সর্বাঙ্গে ব্যথা। ডান চোখটি মেলতেও পারিনি। কাটা ঠোঁট ফুলে ঢোল হয়ে গেছিল।

মারুতি অনেকই শুশ্রূষা করেছিল গাণ্ডা-গোন্দ-এর প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী। নানা পাতা-লতা বাটা-বুটাও লাগিয়েছিল।

ফাগশু তো হায়। হায়। ক্যা হোগা। হামকো ভি মার ডালেগা উও বাইগা ডাকাইত লোগ। ম্যায় কাম ছোড়ক ভাগুংগা দিনদৌরী। মেরী মায়ী একেলি বেওয়া, ছোটি বহিনভি হ্যায়। দো পইসা বানানে কি লিয়ে হিঁয়া আ কর ক্যা হামারা জান যায়েগা।

এখানে আসার পর থেকেই খিদমতগার ফাগশু এতদিনে এল।

আমি ওর ওই কথা শুনছিলাম কিন্তু ওকে বলিনি যে, আরে আমারও তো সেই একই কথা!

তাছাড়া, বাইগা ডাকাতেরা কেন আমাকে মারল, কেন মুলারীবাই-এর নাম করল আর কেনই বা আমার নাম ধরে ডেকে আমার দিকে আঙুল তুলে বার বার দেখাল?

যে মুলারীবাইকে আমি দেখিনি পর্যন্ত সে আমাকে এ কী চক্করে ফেলল। এই জঙ্গলে চক্কর চক্কর। এখান থেকে পালিয়ে না গেলে আমার প্রাণটাই যাবে।

ভাবলাম, কলকাতায় গিয়ে রিকশা চালাব, নয় ঠ্যালা টানব তাও ভালো।

ফাগশু সেই রাতে একটা ক্বাথ বানিয়েছিল। মধু, পেঁয়াজ, রসুন আর আদা দিয়ে, মধ্যে তুলসী-পাতা বেটে তা জ্বাল দিয়ে। গাণ্ডা গোন্দ-এর কথামতন। অন্য কিছু খাওয়ার তো উপায় ছিল না। এমনকী উপাদেয় খিচুড়িও নয়।

হোলির সাত দিন পরে এই আজ দুপুরেই প্রথম ভাত খেতে পারলাম। অড়হরের ডাল আর পেঁপের লঙ্কাহীন তরকারি দিয়ে। শক্ত রুটি খেতে এখনও সম্ভবত সময় লাগবে।

আজই রাতে প্রথম খিচুড়িও রেঁধেছিল ফাগশু, মুগ আর মুশুরি মিশিয়ে। বড়ো স্বাদু খিচুড়ি।

রান্নার হাত সকলের ভালো হয় না। ভালো রাঁধুনি হতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাগে। ফাগশুর হাত ভারি ভালো। ধুলোবালি দিয়েও ও অমৃত স্বাদের রান্না করতে পারে।

কৃষ্ণপক্ষ। এখন চাঁদ ক্রমশই দেরিতে উঠবে।

কত কী শিখেছি, শিখছি একটু একটু করে এখানে আসার পর থেকে। আরও কত কিছু জানার আছে।

হপ্তা হপ্তাতে মাইনে হয় এখানে সকলের। তবে আমি বলেছি, আমাকে মাস পুরোলেই একেবারে দিতে। বড়োমামার কথানুযায়ী আমি বড়োমামাকেই পাঠিয়ে দেব মাসমাইনের টাকা। বড়োমামা বলেছেন, তিরিশ টাকা নিজের হাত খরচার জন্যে রেখে, বাকি চারশো সত্তর টাকা ওঁকে জয়সোয়াল বাসের ড্রাইভারের হাতেই পাঠিয়ে দিতে। উনি আমাদের উত্তর কলকাতার বাসিন্দা কোনো গার্ড সাহেব বা ড্রাইভার সাহেবের হাত দিয়ে মাকে পাঠিয়ে দেবেন। মানি-অর্ডারের চার্জ বেঁচে যাবে।

পাঁচশো টাকা মাইনে আমার। আর দু-দিন পরেই প্রথম মাসের মাইনে পাব। প্রথম রোজগার। ফাগশু পায় একশো। আর মারুতি পানকা তিনশো। অথচ কাজ তিনজনেরই কমবেশি সমান। জিম্মাদারীও। তফাত শুধু এই যে, ওরা ইংরেজি জানে না, আমি জানি। আরও বড়ো তফাত এই যে, ওদের আমার মতন মামা বা পিসে নেই মুরুব্বি। নইলে, আর কেউ না জানলেও আমি জানি, অ্যাকাউন্ট্যান্ট আমি নামেই। যে ছাতার অ্যাকাউন্টস আমাকে রাখতে হবে তা মারুতিই সহজে রাখতে পারত। আসলে মনে হয় যে, মদন লাডিয়া বেইমানিই শুধু করেনি কোম্পানির ব্যবসাটাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে বসেছিল, এই কথা বোঝার পরই তাঁদের একজন পড়ে লিখে, খেলাধুলা-করা হোয়াইট কলার্ড যুবকের দরকার ছিল যে বনে-পাহাড়ে দিনে গড়ে মাইল দশেক হাঁটতে পারবে, কাজ দেখাশোনা করতে পারবে এবং যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। বড়োমামা যেহেতু বিলাসপুরেই আছেন বহুবছর এবং থাকবেনও আরও বহুদিন তাই আমার পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব হবে না বলেই হয়তো ছগনলাল পোপোটলালের অংশীদারেরা মনে করেছিলেন।

মারুতি একদিন বলেছিল, ছোড়ো ত! যো হারামী হ্যায় সো হারামীই হ্যায়। মামাজি চাচাজি তো ছোড়ো, আপনা পিতাজিকো মুমেভি মুত দেতা হ্যায় উও সব আদমি। হারামী তো শুয়ারকা

ঘরমেহি না প্যায়দা হোতা, ইনসানকি ঘরমে হোতা থোড়ি। মগর। হাম-তুম বহত কওশিশ করনেসেভি হারামী অউর হারামজাদা না বন পায়েঙ্গে।

বেশ লাগে এই মারুতিকে আমার। তাছাড়া ও আমার কাছে এই জঙ্গল পাহাড়ের, পাখি জানোয়ারের জ্ঞানের উৎসর সঙ্গে সঙ্গে অনাবিল হাস্যরসেরও উৎস। বয়সে হয়তো আমর চেয়ে অতি সামান্যই বড়ো কিন্তু জানে কত্ত! যেমন 'কমমিষ্টি' খাদ্য জ্যোতি বসু। যেমন মেন্ড্রিসেরাই। অর্থাৎ এই অঞ্চলের সুপ্রাচীন এক শালগাছ, যে গাছকে এই নিবিড় বনাকৃত পাহাড়বেষ্টিত ছোটো ছোটো জনপদের সব গোন্দ-বাইগা, পানকা এবং হিন্দুরাও তাদের রক্ষয়িত্রী বলে মনে করে, হোলিতে আর হরিয়ালিতে যার কাণ্ড সিঁদুর-চর্চিত হয়, যার গুঁড়ির কাছে পাথরের চাঙড়ের ফাঁকে, ভক্তিভরে পুঁতে রাখা ত্রিশূল, বল্লম ইত্যাদিতে পুজো চড়ানো হয়, ফুল আর নারকোল দিয়ে, মোরগা অথবা পায়রা বলি দেওয়া হয়, সেই গাছেরই নাম গায়নিকলজিস্ট।

কলকাতার তাবৎ গায়নিকলজিস্টরা এবং কমরেড জ্যোতি বসুও যদি মারুতি পানকার কথা জানতে পারেন তবে যারপরনাই পুলকিত হবেন নিশ্চয়ই।

জানি না, আমার মা-ও তাঁর মহিলা সমিতির রবিবারের মিটিং-এর চা পানের মধ্যান্তরে আমার চিঠিতে জেনে, ইতিমধ্যেই তুমুল হাস্যরোলের মধ্যে এই তথ্য পেশ করেছেন কি না।

আমরা গরিব হলেও ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি যে, মায়ের সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ অতি গভীর। এটা আমার বাবার বাড়ির নয়, মায়ের বাড়ির ট্র্যাডিশান। একবেলা হাঁড়ি চড়ত না আমাদের একটা সময়ে, বাবার মৃত্যুর পরে পরে, কিন্তু তবু লাইব্রেরির চাঁদা মা বন্ধ করতে দেননি। পুঁটির স্কুলের মাইনেও না। মা বলতেন, কোনো মানুষই শুধু পেটের সুখ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। মনের বিকাশ যারা না করে, জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ, তারাও এখনও জানোয়ারের স্তরেই পড়ে আছে। পড়ে থাকবে। কম খেলেও চলে যায়, কিন্তু বই পড়তেই হবে, গান শুনতেই হবে। যে মানুষ মাতৃভাষার চর্চা করে না, মাতৃভাষার সাহিত্য পড়ে না তাকে শিক্ষিত বলাই যায় না।

এখন রাত তিন প্রহর।

ফাগগু সুর করে রামায়ণ পড়ছে বারান্দার দাওয়াতে, বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে, আগুনের আলোতে। বাল্মীকি রামায়ণের হিন্দি অনুবাদ। মাঝে মাঝে রামচরিত মানস থেকে দোঁহাও আবৃত্তি করে ও শুনিয়ে দেয় ও আমাকে। ফাগগু ইংরেজির 'ই' জানে না। কোনো স্কুলেও যায়নি কখনও। ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলের নাম শুনলে সে-ও হয়তো মারুতিরই মতন জিজ্ঞেস করবে বস্তুটি সুখাদ্য কি-না। অথচ ওকে 'অশিক্ষিত' বলি, কোনো অর্থেই তার কোনো উপায় নেই।

ও প্রথম যেদিন বাড়ি থেকে ফিরে এসে আমার সামনে দাঁড়াল, প্রথম দর্শনেই এমনই নত হয়ে দু হাত জড়ো করে আমাকে প্রণাম করেছিল পরম বিনয় ও সৌজন্যের সঙ্গে যে, ওর সেই মোহন, বিনত রূপটি আমার অকারণের সর্বগুণবর্জিত মিথ্যে উচ্চমন্যতা এবং ঔদ্ধত্য আমাকে দিয়ে কোনোদিনও অন্য সামনে নিজেকে অমন নত করে, অমনভাবে প্রণাম করাতে পারবে না। ইংরেজি-শেখা বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিরা বংশধর বাঙালি, ইংরেজের চাকর বাঙালি আমার মূল ভারতীয় স্রোত থেকে অনেকই দূরে সরে এসেছি বোধহয় অনবধানে। সেই নির্গুণ কিংবা উদ্ধত বাঙালিদেরই প্রতিভূ আজকের 'শিক্ষিত' বাঙালিরা।

এই পনেরো দিনেই আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, বিনয়, এই সহনশীলতা এই স্বাভাবিক সহবত এই হচ্ছে ভারতের শাশ্বত শিক্ষা। ওরাই, এই মারুতি, ফাগগু, গাগ্গা গোন্দ, দশরথ নানা, কৌশল্যা, চৈতুরাম পোর্তে, অদেখা মুলারীবাই এবং সেই বাইগা ডাকাতেরা, যারা আমাকে মেরে টাকা ও ঘড়ি কেড়ে নিয়েছিল তারাও, আসল ভারতীয়। ওরা ভালোতে-মন্দতে মেশানো। কিন্তু ওদের মধ্যে কোনো বিজাতীয়ত্ব নেই। লোক-দেখানো ভড়ং নেই। শহুরে "বুদ্ধিজীবীদের" মতন

জনজীবনের অভিজ্ঞতাহীন নিরর্থক পুথি পড়া অহং নেই। এই গ্রামীণ ভারতবর্ষের সুস্থ এবং সুষম উন্নতির উপরেই পুরো দেশের উন্নতি নির্ভরশীল।

আমি ও আমরা এইদেশের এক শতাংশও নই। অথচ এই আমরাই এই বিরাট ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা। অথচ এই আমরা আমাদের সুখ-দুঃখের সংজ্ঞা, আমাদের শিক্ষা-উচ্চশিক্ষার সংজ্ঞা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির সংজ্ঞা এদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছি। এখনও দিচ্ছি।

জানি না, দিন হয়তো বদলাবে একদিন। গণতন্ত্র যেদিন প্রকৃত প্রাণ পাবে, প্রাণিত হবে, সেদিন।

আমার যা মনে হচ্ছে, তা হয়তো সম্পূর্ণই ভুল। কিন্তু মনে হচ্ছে। অবশ্য আমার জ্ঞানগম্যি পড়াশুনাই-বা কতটুকু। বাগবাজারের এই অর্পণ বোসই যে একমাত্র ঠিক তেমন মনে করার মতন অশিক্ষিত যে আমি নই শুধু সেটুকুই বলতে পারি। ST. AUGUSTINE বলেছিলেন : "THE SUFFICIENCY OF MY MERIT IS TO KNOW THAT MY MERIT IS NOT SUFFICIENT."

আমার জ্ঞান যে কত সামান্য তা আমি বিলক্ষণ জানি।

মারুতি গেছে, হাতে লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে বাস রাস্তাতে দশরথ নানার কাছে। কী খবর পাঠাল পেভ্রা রোডের অফিস, বিলাসপুরে যাওয়া ট্রাক মারফত, তাই জানতে।

শীত কমে যাচ্ছে প্রতিদিনই। সাপের ভয়ে নাকি বাড়বে এখন ক্রমশ। সাপের নাকি গোনাগুনতি নেই। সাপ ছাড়াও এসব জঙ্গল-পাহাড়ে নাকি ভয়াবহ অনেক কিছুই আছে। অবয়ব সম্পন্ন, অবয়বহীন।

মারুতি মুখে মুখে কৌশল্যার শ্রাদ্ধ করে বটে, কিন্তু আমি বুঝতে পারি স্বামী-পরিত্যক্তা বেচারী কৌশল্যার প্রতি ওর একটা চোরা দরদ আছে। যে দরদকে স্বীকার করতে চায় না ও কারো কাছেই। একটি ছোট্ট শিশুরা বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে কৌশল্যা বৃদ্ধ বাবার দোকানে শিঙাড়া গড়ে আর ভেজে, ছানার গজা তৈরি করে দু বেলা দু মুঠো হয়তো জুটিয়ে নেয় কিন্তু কোনো যুবতীই কি শুধু পেট পুরলেই বাঁচতে পারে? মনিয়ারি কৈরাহার পারে, হাটবারে, গুলগুলিয়ার পথে যখন সব কুমারী আর বিবাহিত মেয়েরাই দুধার থেকে ঘন সবুজ অরণ্য থেকে আলো-ছায়া শতরঞ্চির মতন বনপথ মাড়িয়ে সেজে-গুজে, মুখে করৌঞ্জের তেল মেখে, নিমতেল মাখা চকচকে খোঁপাতে কাঁঠাল বা গিলগিলি কাঠের হলুদ কাঁকই গুঁজে, নয়তো বেণীতে লাল পলাশ বা বেগনি পারুল ফুল গুঁজে, তামার বা পেতলের গয়না পরে কলকল করে কথা বলতে বলতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, চলকে চলকে হেঁটে যায়, তখন কৌশল্যারও কি ইচ্ছে করে না.....তার শরীরেও কি একটু রিকিঝিকি ওঠে না?

আমার হঠাৎই মনে হল, স্বল্পদিন হল এখানে এসে এবং থেকে আমি হয়তো একটু বেশিই ভাবছি এদের সম্বন্ধে। একথা মনে হতেই নিজেকে বকলাম।

মাইনে পাঁচশো টাকা। তাও আমার যোগ্যতার তুলনাতে যথেষ্ট। কিন্তু এই যে উপরি-পাওনা এই পাগল করা প্রকৃতি, এই আদিম অরণ্য এইসব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, এইসব ডাইনি-জ্যোৎস্নার রাত, ক্যালেন্ডারে দেখা ছবিরই মতন, জিন-পরীরা যে-রাতে ঘুরে বেড়ায় এই সব গা-ছমছম করা বনে, তেমন সব রাতের মায়া, এসব কোথায় পেতাম। কলকাতাতে থাকলে এমন সব অনুভূতির শরিক কি কোনোদিনই হতাম।

মাঝে মাঝেই ভাবি, কী করে যে বড়োমামাকে জানাব আমার কৃতজ্ঞতা, তা আমি জানি না। আসলে, আমার মধ্যে যে একজন কবি বাস করত, অন্য মানুষ, এক অ্যাডভেঞ্চরাস, বেপরোয়া সত্তা, একে তো উত্তর কলকাতার অলিগলির মধ্যে ঠিক এমন করে কখনও প্রস্ফুটিত দেখতে পেতাম না। প্রস্ফুটিত করা তো দূরের কথা, তার অস্তিত্ব, তার বীজ যে আমার মধ্যে সুপ্ত ছিল তাও তো জানতাম না কখনওই।

এত বড়ো গাছ, মরে গেলে তো কাঠ নষ্ট হয়ে যাবে। কত দাম।

মরে তো গেছেই। বাজ পড়ে মরে গেছে তো! দেখছ না এর ছাল সব খুলে খুলে পড়ছে।

তারপর বলল, দামি তো ছিলই এ কাঠ। তাই এক ঠিকাদার, যে এই ক্যুপ নিলামে ডেকে নিয়েছিল, তার লোকজনকে পাঠিয়েছিল কাটতে।

কবে?

এখন নয়। বহুদিন আগে। কিন্তু মেড্রিসেরাই-এর গাছে করাত লাগাতেই মেড্রিসেরাই-এর গা থেকে মানুষের গায়ের রক্তের মতন লাল-রঙা রক্ত বেরোতে শুরু করেছিল। লোকজনেরা ভয় পেয়ে সেদিন ফিরে গেছিল। সেই রাতেই তারা স্বপ্ন দেখল যে, মেড্রিসেরাই তাদের বলছেন যে, তারা যেন তাঁর গায়ে করাত না লাগায়। তিনি এই অঞ্চলের সকলকেই রক্ষা করেন, তাই তাঁকে কাটলে পুরো অঞ্চলেরই খুব ক্ষতি হবে। লোকেরা ঠিকাদারকে বললও সেই দুঃস্বপ্নের কথা। কিন্তু ঠিকাদার ব্যাবসাদার মানুষ। শুধু তার মুনাফাই বোঝে সে। আর এত বড়ো গাছ।

সে বলল, বাজে কথা ছেড়ে, কাল আবার করাত লাগাও।

তারপর?

সেই রাতেই সেই কাঠুরেরা এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়। তারপরে মারাও যায়।

এ কতদিন আগের ঘটনা?

সে আমার জন্মের আগে তো বটেই। তখন আমার বাবারই ছুটপন ছিল। বাবার বয়স এখন নব্বই।

কি ছিল?

ছুটপন।

মানে?

মানে আপনারা যাকে বলেন, বচপন।

বাঃ। বেশ সুন্দর শব্দ তো।

তবে এই শব্দটা গোন্দ শব্দ নয়, ছত্তিশগড়িয়া শব্দ। লমনি বস্তিটা বড়ো রাস্তার উপরেই তো। বড়ো বস্তি। রাস্তার এদিকে গোন্দ আর ওদিকে বাইগা বস্তি। তবে বাইগা বস্তিটা ছোটো, গোন্দদেরটাই বড়ো। এখানে কেঁওচি, অমরকন্টক, সোহাগপুরের লোকজন তো আসেই। পেন্ড্রা রোডেরও। তাই হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতেরই প্রভাব পড়েছে আমাদের উপরে। যেসব গ্রাম পাহাড় বনের অনেকই গভীরে তারাই এখনও গেঁয়ো আছে। মানে, প্রকৃত আদিবাসী। আমরা আপনাদের কাছাকাছি এসে ক্রমশই জাল হয়ে উঠছি। দু নম্বর।

চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম, গেঁয়ো থাকলেই সুখে থাকতে। এই বড়ো রাস্তা আর বড়ো জায়গার, কয়লাখাদের কাছাকাছি থাকলে প্রাচীন সরল ভালো মানুষেরাও সব খারাপ হয়ে যাবেই। তোমরাও যে যাচ্ছ তাতে আর আশ্চর্য কি? জাল আর দু নম্বরি মানুষে শহরগুলো তো ভরে গেছে। আমাদের কাছে তোমাদের না আসাই ভালো।

বললাম, বলো তারপর কি হল?

তারপরও ঠিকাদার আবার আরেকদল চেরাইদারকে লাগাল মেড্রিসেরাইকে কাটাতে। আবার রক্ত বেরোল। এবং তারাও স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন দেখার পরে ঠিকাদারের লোকেরা ভয় পেয়ে মেড্রিসেরাইকে কাটতে অস্বীকার করল। ঠিকাদার নিজেও সেই রাতে স্বপ্ন দেখল যে, আর আগে বাড়ার চেষ্টা করলে তারও প্রাণ যাবে।

তারপর?

তারপর আর কি? শক্তের ভক্ত নরমের যম। তারপর থেকে দশ বস্তির মানুষ, এ অঞ্চলের সব

মানুষ, মেন্ড্রিসেরাইকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতে লাগল। হোলিতে, হরিয়ালিতে, যেমন বললাম আপনাকে।

একটা নীলকণ্ঠ পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে এসে মেন্ড্রিসেরাই-এর ডালে বসল। তারপর আবারও ডাকতে ডাকতে চলে গেল রোদ-পোড়া জঙ্গলের গভীরে। আর ঠিক সেইসময়েই রেফারির বাঁশিটা বেজে উঠল নিস্তব্ধ নিথর রৌদ্রদগ্ধ বিরল-পত্র আগুয়ান-সকালের বনের মধ্যে ফু-র-র-র, ফু-র-র-র, ফু-র-র-র করে।

চারদিকে তাকিয়ে পাখিটাকে খুঁজতে লাগলাম।

এই ডাকটা আমাদের গামহারগাঁও-এর ভাণ্ডারের বাঁ পাশে যে গভীর জঙ্গল, জামগাছতলির কুয়োর পশ্চিমদিকে, সেদিক থেকে প্রতিদিনই সকালে নাস্তা করার সময়ে শুনি। জিজ্ঞেস করব করব করেও মারুতি আর ফাগগুকে জিজ্ঞেস করা হয়নি একদিনও।

সাগেলাকেই জিজ্ঞেসে করলাম, এটা কি পাখি সাগেলা?

কোনটা?

দাঁড়াও! আবার ডাকুক।

ঠিক আছে।

ও বলল।

বললাম, তুমি কখনও ফুটবল খেলা দেখেছ? সকার? মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা?

সকার? সেটা কি জিনিস টোটাবাবু? খায়? না পরে?

ধ্যাত। খেলা, খেলা। একরকমের খেলা। সেই খেলাতে যে-মানুষ দু-পক্ষের মধ্যে সালিশি করে, হার জিত ঠিক করে দেয়, তাকেই বলে রেফারি। রেফারির মুখে যে বাঁশি থাকে এই পাখিটা সেই রেফারির বাঁশিরই মতন আওয়াজ করে।

সাগেলা বলল, ও বুঝেছি। খো-খো খেলাতেও ওই কেকারি না কি বললে, তা থাকে। দেখেছি একবার সোহাগপুরে।

কেকারি নয় সাগেলা, রেফারি।

ওই হল।

ওর কথা শেষ হবার আগেই পাখিটা আবারও ডাকল।

বললাম, ওই যে। ওই যে। কি পাখি ওটা?

সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে হেসে উঠল সাগেলা। হাসতেই থাকল।

বোকার মতন সেই আওয়াজটা যেদিন থেকে এসেছিল, সেদিকের গাছগুলোর উপরের ডালগুলোতে তীক্ষ্ণ চোখে খুঁজতে লাগলাম পাখিটাকে।

সাগেলা বলল, ওটা কোনো পাখি নয় টোটাবাবু। বলেই নুড়ি তুলে সেই সাহাজ গাছটার গুড়ি লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। আর অমনি আমি দেখতে পেলাম যে, একটা কাঠবিড়ালি, যে তার পাশের একটি গাছ থেকে নীচে নেমেছিল, হড়বড়িয়ে তরতরিয়ে উপরে উঠে গেল।

সাগেলা বলল, ওরা শুধু যে ওরকম করে ডাকে তাই নয় প্রতিবারই ডাকের সময় ওদের ল্যাজটা পিঠের ওপরে সোজা তুলে কাঁপায়। ডাকের তালে তালে।

অবাক হয়ে বললাম, তাই।

তাই তো।

সাগেলা বলল, যেমন করে মারুতি পানকা বলে "হাঁতো!"

অবাক হয়ে গেলাম। রেফারি, পাখি নয়, কাঠবিড়ালি! সত্যি! কত কী-ই যে জানছি প্রতিদিন এদের কাছ থেকে, প্রকৃতির কাছ থেকে। ভারি কৃতজ্ঞ লাগে।

উপরের ঝকঝকে নীল আকাশে কী একটা পাখি ধীরে চক্কর দিচ্ছিল। কিন্তু খুব বেশি উপরে

নয়। তার ছড়ানো, চেরা চেরা ডানার ছায়াটা আমার আর সাগেলার গায়ের উপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে বৃত্ত সম্পন্ন করে লাল মাটির ছায়াহীন পথটার উপরেও ঘুরে ঘুরে ছায়ার আলপনা দিচ্ছিল। ছায়ামাত্রই আধিভৌতিক। নিঃশব্দে ছায়াটা ঘুরছিল। ওই অনেক দূর গড়িয়ে যাওয়া সকালেও আমার গা সেই ছায়ার দিকে চেয়ে যেন ছমছম করে উঠল।

সাগেলাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি পাখি? শকুন?

নাঃ। এটা পাহাড়ি-বাজ। ভারি শয়তান পাখি। ছোটোখাটো জানোয়ার, পাখি, সাপ সবই একছোঁতে তুলে নেয়।

নাম কি?

প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই পাখিটা অভাবনীয় তীব্র গতিতে সোজা নেমে এল, আমরা যেখানে বসেছিলাম, তারই বাঁদিকে। একটু দূরে যেখানে ঝড়ে পড়ে যাওয়া একটা খয়ের গাছ পাথালি হয়ে মাটিতে শায়িত ছিল জঙ্গলের বুকে, সেখানে। তারই আড়াল থেকে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের দুজনেরই চোখের আড়ালে-থাকা একটা দু-হাত লম্বা সবুজ আর সাদা-রঙা সাপকে মুখে করে যে প্রায় সোজা ব্যালিস্টিক মিসাইল-এর মতন উপরে উঠে গেল। সাপটাকে ধরেছিল তার তীক্ষ্ণ শক্ত ঠোঁট দিয়ে শরীরের মাঝামাঝি। সাপটার শরীর শূন্যে দুদিকে আন্দোলিত হতে লাগল অসহায়ের দু-হাত তোলা নিষ্ফল প্রতিবাদের মতন। পাখিটা সাপটাকে ওইভাবে ঠোঁটে করেই একটা চকিত বাঁক নিয়ে মাট্রিনালার দিকে উড়ে গেল। পরমুহূর্তেই বড়ো বড়ো পত্রশূন্য শালগাছের জঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে গেল একটু পরেই।

হাঁ করে চেয়েছিলাম সেদিকে।

সাগেলা বলল, মোরাঙ্গী। একজোড়া আছে।

কোথায় থাকে?

ও হেসে বলল, গামহারগাঁওতে চুন্নুবাবুর ভাণ্ডারের পাশের বড়ো শিমুলের মাথায়।

তারপরই বলল, আমি দেখেছিলাম একদিন সন্ধেবেলাতে। আপনি এতদিন আছেন আর দেখেননি তাদের?

উপরের দিকে কে আর তাকায়? একদিন অবশ্য দেখেছিলাম রাতে। চাঁদ ছিল। হোলির আগে। চাঁদের আলোতে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

তা তো দেখাবেই। চাঁদের আলোতে দিনের আলোর মতন দেখাবে কী করে!

তারপরে বলল, একটা কথা বলি টোটাবাবু?

বলো।

এই বনে জঙ্গলে উপরে না তাকিয়ে পথ চলো না। বাঘের মতন শক্তিশালী জানোয়ারও এই ভুল করেই গাছে বসা শিকারির গুলিতে মারা পড়ে। শহরে নগরে তো তোমরা উপরে তাকিয়ে চলো, জঙ্গলেও তেমনই মাঝে মাঝে না তাকালে অনেকই বিপদ। মাঝে মধ্যে উপরে তাকাবার অভ্যেস করবে। আস্তে আস্তে। উপরে না তাকালে ফুল, পাখি, প্রজাপতিই বা দেখবে কী করে।

আমি চুপ করে রইলাম।

হরিয়ালিতে তোমরা যে ফসল বোনো, তা কি কি ফসল?

বললাম আমি।

শহরে উপরে তাকিয়ে চলার কথাটা আক্ষরিকার্থে বলেনি সাগেলা। এরা সকলেই দেখছি, ছোটবড় দার্শনিক। প্রকৃতি সম্ভবত সব মানুষকেই দার্শনিক করে তোলে, যেসব মানুষের আধার ভালো।

নানারকম ফসল বুনি।

যেমন?

চালই হয় অনেকরকম। আমরা নিজেরা খেতে পাই, কি নাই পাই, ভালো দাম তো পাওয়া যায়।

কি কি নাম সেই সব চালের?

ঝিল্লি, সফরি, দুবরাজ। মামুলি চালের নাম লোচাই। জংলি ধানও হয় নানারকম।

যেমন?

সাঁওয়া, গৌলন্দনি।

আর?

আর কি? জওয়ার, মকাই, গেঁহু। গেহুঁর আটা বড়োলোকের খাদ্য, ভালো চালেরই মতন।

তাই?

হ্যাঁ, এখানের মানুষেরা বড়ো গরিব।

তাই?

হ্যাঁ টোটাবাবু।

তারপর বলল, তেল-এর বীজও করি আমরা অনেকরকম। মানে, গাছের বীজ বা ফল থেকে যে তেল হয়, তাদের কথা বলছি না। এইসব তেল আমাদের মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া বা চাষ-করে তারপরে বোনা ফসল থেকে হয়।

কী তেল? সরষে?

সরষেকে আমরা বলি রাই। তিল্লী। মানে, তিল। জাগনিও হয়।

জাগনিটা কি জিনিস?

সরষেরই মতন। ফড়েদের মুখেই শুনেছি, এদের নাকি অন্য অনেক জায়গাতে বলে সরগুজা।

আমার কাছে দুই-ই সমান। যেমন জাগনি, তেমনই সরগুজা।

ভাবলাম, আমি।

বললাম, খেতে কখন ফসল ফলে? জাগনি বা সরগুজা বা সরষে কিছুই তো দেখিনি কখনওই। মানে, এইসব ফসলের খেত।

তারপর বলল, দুঃখের কি? এখানে তো আছো। হরিয়ালিতে লাগানো সব ফসলই শীতের মুখে এবং শীতের মধ্যে উঠবে। তখনই আশ মিটিয়ে দেখতে পাবে। জাগনি বা সরগুজা আর রাইয়ে, পাহাড়ের ঢাল আর উপত্যকা আর নদী নালার পার সব হলুদে হলুদে হয়ে যাবে। চোখ ধেঁধে যাবে। রাখোয়ার ছেলেরা নানা ফসল পাহারা দেবে তখন রাত-দিন। কাকতাড়ুয়া মাথা নাড়বে, হাত নাড়বে, রুখু উত্তুরে বাতাসে। শনশন করে হাওয়ায় চাবুক মেরে হারামজাদা সুগাদের বড়ো বড়ো ঝাঁক এসে হাজির হবে।

হারামজাদা বলছ কেন?

হারামজাদা নয়। শুয়োর আর টিয়ার মতন ফসল-ধ্বংসকারী পশু আর পাখি তো আর নেই-ই। ওদের রূপই আছে। গুণ কিছু নেই। আর শুয়োরের রূপের কথা না-হয় নাই বললাম। তবে মাংস বড়ো ভালো। খেয়েছ কখনও টোটাবাবু? শুয়োর?

নাঃ।

আমি বললাম।

টিয়া আর চন্দনার মতন সুন্দর পাখি, যে পাখি শহরের মানুষে এত আদর করে পোষে তারা যে এই পাহাড় বনের মানুষদের এত বড়ো শত্রু তা তো সত্যিই জানতাম না। ভাবছিলাম, সত্যিই কত অল্পই জানতাম কলকাতায়। অথচ যা কিছু জানতাম, যেসব খবরে খবরের কাগজ ভরা থাকে, তার এক শতাংশ না জানলেও কিছুমাত্রই যেত-আসত না আমার। নিজের দেশের সাধারণ সব খবরই যদি না জানি, তবে রাশিয়াতে বা চীনে বা অ্যামেরিকাতে কি হয়েছে বা ঘটেছে বা ঘটছে তা জেনে কী করব।

ডাল? ডাল করো না তোমরা সাগেলা?

হ্যাঁ। করি বইকী। কুটবী, কোদো।

আমরা তো জানি মশুর, মটর, ছোলা মুগ। এসব আবার কি ডাল?

হ্যাঁ। এসবও ডাল। আমাদের এখানে একটা ডাল হয়, তোমাদের মটর ডালের মতন দেখতে, তাকে বলে তেওড়া। একটু তেল দিয়ে কড়াইতে ছাড়লে পরেই লাফাতে থাকে।

তাই?

ভাবছিলাম, 'তেওড়া' তালে লাফায় কি?

মটরেরই মতন আরও একটার ডাল আছে আমাদের। তাকে আমরা বলি, বাটরা।

বললাম, ব্যস করো সাগেলা। এত ডাল দিয়ে কি করব? একদিনে হজম করতে পারব না। সাগেলা বলল, আরও নানা ফসল করি আমরা।

সাগেলা উঠল পাথরটা ছেড়ে ফিরে যাবার জন্যে।

কী যে শান্তি জঙ্গলে দিন রাতের সব সময়েই, কত যে রহস্য, কী অপার নিস্তব্ধতা, ভিতরে সেঁধোলে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না। কোনো বিপদও নেই একমাত্র দু-পেয়েদের কাছ থেকে আসা বিপদ ছাড়া। গাণ্ডা গোন্দ ঠিকই বলে, ওদের বড়হা দেও, মানুষের মতন এমন খতরনাক জানোয়ার আর সৃষ্টি করেননি।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, এই পথটা কোথায় চলে গেছে মেভ্রিসেরাইকে পাশ কাটিয়ে?

জঙ্গলে।

তারপর?

আরও জঙ্গলে।

তারও পর?

আরও জঙ্গলে গিয়ে অচানকমার হয়ে শেওতারাই-এর জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছেছে। জঙ্গলের এইসব লাল মাটির পথ কি সিনেমা বা থিয়েটারে বা বাইজি-মহল্লাতে গিয়ে শেষ হবে বাবু? জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলই সব। জঙ্গলে একবার ঢুকে গেলে জঙ্গলহি জঙ্গল।

মেভ্রিসেরাই থেকে লমনির দিকে যেতে যেতে আমি বললাম, আমার ক্যামেরা নেই। থাকলে তোমাদের এই মেভ্রিসেরাই-এর একটা ফোটো তুলে রাখতাম। এতবড়ো যে শালগাছ হতে পারে, ভাবা যায় না।

ফোটো দিয়ে কি হবে টোটাবাবু? নিজের চোখের মধ্যে ছবিটা ভরে নিয়ে যাও। যখন খুশি বের করে দেখে নেবে।

তা যা বলেছ।

মেভ্রিসেরাই-এর একটা ফোটো আছে চিফ কনসার্ভেটর সাহেবের তোলা, লমনির বন-বাংলোর খাওয়ার ঘরে।

তাই? তা দেখিয়ে দিলেই পারতে।

ডি.এফ. ও সাহেব আছেন এখন, ভিতরে ঢুকি কোন সাহসে? পরে চুরির দায়ে পড়তে হবে। আরদালি চুকলি করবে।

হ্যা।

সেই জায়গাটাকে এসেই আবারও বলল সাগেলা, মেরে দাও না টোটাবাবু শম্বরটাকে। ও বেচারাও বাঁচে। জরা, বড়ো কষ্টের বাবু।

বনের প্রাণীরাও জরাগ্রস্ত হয়?

বেশি হয় না, তার আগেই তাদের মধ্যে অধিকাংশই ফওউত হয়ে যায়। তবে যারা জরাগ্রস্ত হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরে, তাদের বড়ো কষ্ট। জরাতে বনের এইসব টগবগে প্রাণী বড়োই কষ্ট

পায়। কারণ, তারা যে চিরদিনই একা। স্বয়ম্ভর, আত্মবিশ্বাসী। মানুষের মতন বউ ছেলে মেয়ে নাতি-নাতনি তো থাকে না তাদের। পরমুখাপেক্ষীও নয় তারা, কোনো ব্যাপারেই। তাই ......

তারপর বলল, তুমি তো শুনছই না। মেরে দিলে, ও বেচারা সত্যিই বাঁচে, কী চেহারা হয়েছে। হাড়-জিরজির, লোম-ওঠা, তুমি নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। মরে গেলে ও নিজেও বাঁচে, আমরাও একটু শিকার খাই।

শিকার খাই মানে?

শিকার করা জানোয়ারকেই তো আমরা শিকার বলি। শিকার মানেই মাংস। মাংস বলতে, বললামই তো, আমরা পাঁঠা ভেড়া মুরগি ওসব বুঝি না। এসব খাওয়ার পয়সা কোথায়?

বললাম, তুমি মগনলালবাবুকে বলো না, মেরে দেবেন। তাঁর আর তাঁর লোকজনের তো শুনেছি বন্দুক-রাইফেল লাঠি-বল্লম সবই আছে।

ভালোই বলেছেন। সে তো মাড়োয়ারি। জৈন। সে মাংস খায় নাকি?

তারপরই বলল, মাংস খায় না তা নয়, কিন্তু সে অন্য মাংস।

কি মাংস?

ছোকরিদের মাংস।

তা খেতে কেমন?

যখন খাবে তখনই বুঝবে। তবে সব পুরুষের পেটে হজম হয় না।

বলেই, সাগেলা হয়তো ভাবল, আমার সামনে এই বেঁফাস কথাটা বলে ফেলে ঠিক করল না।

বলল, ইস বাঁতে কিসিকো মত বাতানা টোটাবাবু। জানসে মার ডালেগা।

আমার এই একটামাত্র কমজোর "জান" যে কত মানুষে, কত কারণে "মারডালেগা" তাই ভাবছিলাম।

তোমাদের খুবই কাছের মানুষ শুনেছি মগনবাবু আর বানারসিলাল ফড়ে?

কাছের মানুষ?

ঘেন্নার সঙ্গে সাগেলা উচ্চারণ করল কথাটা।

ঘেন্নাটা আসল না কপট তা বুঝতে পারলাম না অবশ্য। যদিও গোদা গাংগুলির নাটকের দলে ছিলাম, অভিনয় আমি আদৌ করতে পারি না। নিজে তো পারিই না, জীবনে অন্যের অভিনয়ও বুঝতে বহু সময় লেগে যায়। সর্বার্থেই বোকা আমি। চালাক হওয়ার কোনও ইচ্ছাও নেই অবশ্য।

কে বলেছে এ কথা?

সাগেলা বলল।

শুনেছি।

আমি বললাম।

যেই বলুক, সে হয় ভুল বলেছে, নয়, তার অন্য কোনও মতলব আছে। ওদের জন্যে আমার আর নর্মদের চাকরিই যেতে বসেছিল একটু হলে।

ওদের মানে?

মানে ওই মগনবাবু আর বানারসিলাল ফড়ের জন্যে।

বাঁচাল কে? রাজপুত সিং? তোমাদের ফরেস্টার?

আপনি পাগল টোটাবাবু। রাজপুত সিং আমাদের দোস্তই যদি হবে তার নামে কি বাঁদর পুষি।

চুপ করে রইলাম। ভাবলাম, কুকুর পোষা উচিত ছিল। আমার কিন্তু আদৌ মনে হল না যে, সাগেলা, মগনলাল লাডিয়া বা বানারসিলালের দলে আছে। বরং মনে হল, সে আমারই মতন বোকা। অতিমাত্রায় সরল। ধূর্তামির ভেক ধরতেও সে অপারগ।

ওকে বললাম, জঙ্গলের মালিক-তো তোমরাই। সত্যিই যদি শিকার খেতে চাও তো শুয়োর

মেরে দেব। মারুতি বলছিল, বর্ষার পরই শুয়োরের মোচ্ছব লেগে যাবে বাজরা আর জওয়ারের খেতে। তখন.....। আর শুনেছি তো বন্যবরাহর মাংসও সুস্বাদু। স্বয়ং রামচন্দ্র খেতেন।

তা জানি না, তবে শুয়োরের মাংস তো উপাদেয়ই। তবে মুখে যথার্থ স্বাদ আনতে, ভাত দিয়ে শুয়োরের মাংস খাবার আগে চালের হাঁড়িয়া আর মহুয়ার মদ মিশিয়ে খেতে হবে। তবেই না জমবে নাচ অউর গান।

তারপরে বলল, তবে হয়ে যাক একদিন টোটাবাবু। কবে দু পেয়ে জানোয়ার মারবে তার ঠিক নেই। আগে একটা চারপেয়ে মেরে আমাদের দিল খুশ করো। জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে আমি আর নর্মদ কেটেকুটে সাফ করে নাড়িভুঁড়ি পুঁতে প্রমাণ লোপ করে দেবে। রাজপুত সিং তো দূরস্থান, শকুনও টের পাবে না।

লমনির চেক পোস্টে পৌঁছে আমি বললাম, তুমি আমার জন্যে এই রোদে এতখানি হেঁটে গেলে এবং এলে মেন্ড্রিসেরাই দেখাতে, সে জন্যে তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি সাগেলা?

অবাক হয়ে ও বলল, কি আবার করবে?

বলেই বলল, টোটাবাবু, এসো তোমার সঙ্গে আমি কেলাপান পাতাই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেলাপান"টা আবার কি জিনিস?

বন্ধু-পাতানো।

মানে? আমাদের মেয়েরা যাকে বলে "সই" বা "মিতে" পাতানো?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তা হবে। তোমাদের শহরের কথা জানি না, তবে আমাদের এই গোন্দ-বাইগাদের মধ্যে অনেকই রকম বন্ধু-পাতানোর চল আছে। ছেলেদের, মেয়েদের।

কী রকম?

কত রকম। বাজলি, সখি, জাওরা, মহাপ্রসাদ, গুলাবফুল, কেলাপান। নাও হাতে হাতে হাত মিলাও আমার কেলাপান। বলেই, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল।

ও বলল, পরে একদিন দিনক্ষণ দেখে লমনিতে বা গামহারগাঁওতে দাওয়াত দেব তোমাকে। সেদিন কেলাপান-এর জন্যে ভোজও হবে। দেখি, সম্ভব হলে, মুকাদ্দমদেরও বলব দু-চারটে গ্রামের।

তোমাদের এইসব কথাগুলোর মানে কি সাগেলা? "সরপঞ্চ", "মুকাদ্দম", "প্যাটেল", "মুখিয়া" ইত্যাদি।

সাগেলা হাসল। বলল, জঙ্গলের মধ্যে যেসব গ্রামের সরকারি পাট্টা দেওয়া হয়নি সেইসব গ্রামের কর্তাব্যক্তিকে বলে মুকাদ্দম। কোথাও প্যাটেলও বলে। মোগলরাও যেমন যুদ্ধ করে, একসময়ে গোন্দদের কবজা করেছিল, তেমন মারাঠিরাও করেছিল। তাই মারাঠি বা গুজরাটি "প্যাটেল" শব্দটিও চলে। সরপঞ্চ আছে, যেখানে পঞ্চায়েত আছে। সেই সরপঞ্চই সেইসব গ্রামের কর্তা। মুখিয়াও থাকে। তবে যে গ্রামে মুকাদ্দম বা সরপঞ্চ থাকে সেখানে আবার মুখিয়া থাকে না।

ভাবলাম, কমার্সের ছাত্র না হয়ে যদি পলিটিক্স-এর ছাত্র হতাম বা সোশ্যাল সায়ান্সের তবে ভালো হত। তবে, যে শিখতে চায়, সেই হয়তো ছাত্র। সে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয় নিয়ে পড়েছিল সেটা অবান্তর।

সাগেলা নীচু হয়ে বলল, পরনাম বাবু।

ওই না বললে "কেলাপান" বানালে আমাকে। আবার বাবু বলছ, "পরনাম" বলছ।

ও হো। ঠিক তো! ভুল হয়ে গেছে।

বলেই, আমার হাতে হাত রেখেই আমাকে তার দুর্গন্ধি ঘেমো বুকে জড়িয়ে ধরল। তার চুট্টা আর খইনির গন্ধ-ভরা মুখটাকে আমার মুখের কাছে নিয়ে—

ভাবলাম, চুমু খাবে নাকি? হতে পারে। যার যেরকম কপাল। ওই ঘনিষ্ঠতার খেসারত হিসেবে আমার কাঁধে, বেলটের সঙ্গে ঝোলানো দোনালা বন্দুকের নলটা সাগেলার মাথাটা ঠুকে গেল। কিন্তু তাতে সে একটুও কাতর হল না। সদ্য আরব্ধ কেলাপানকে জুদা করতে চাওয়া বন্দুকের নলটাকে বাঁ হাতে মুঠো করে চেপে ধরে রেখে বলল সে, কেলাপান। আমরা কেলাপান। তোমার এই বন্দুকই সাক্ষী।

ঠিক।

আমি বললাম।

তারপর চলে আসার আগে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, রাজপুত সিং কোথায়?

শেওতারাইতে। আর কাজ কি? আর্ধেক সময়ে নাকাতে দাঁড়িয়ে তোলা তোলে আর অন্য সময়ে শেওতারাই।

পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আর ফরেস্ট ডির্পাটমেন্টের মধ্যের তফাত কি দিন দিনই কমে আসছে?

যা বলেছ কেলাপান। দেশের সব সরকারি দপ্তরই পুলিশের দপ্তর হয়ে উঠেছে। "পইলে মার গাঁড়পর দো ডান্ডা, পিছে বাত।" বিচার-টিচার এই সব শব্দগুলোই মুছে ফেলা উচিত। সবই "বকোয়াস" হয়ে গেছে। তাও যখন আমাদের এই বন পাহাড় সাদা চামড়ার সাহেবদের তাঁবে ছিল, আইনের বাঁধন, ভয় ডর কিছু ছিল। স্বাধীনতার পাঁচ সাত বছরের মধ্যেই সব যেন কেমন ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। লজ্জাটজ্জাও লোপ পেতে বসেছে। কোমরে শাড়ির কষিটা ঢিলে করা হয়ে গেছে। এখন শুধু খুলে পায়ের কাছে ফেলে দেওয়ার অপেক্ষা। লজ্জা না থাকলে, আওরতের কি থাকে বলো? এই দেশও তো আওরতই।

মধ্যপ্রদেশের নিবিড় অরণ্যময় পাহাড়ি এলাকায় প্রায় অশিক্ষিত সামান্য ফরেস্ট গার্ড সাগেলা গোন্দ এর মুখে এই সরলীকৃত স্বাধীনতা উত্তর দেশের অবস্থার ব্যাখ্যা শুনে ন্যায্যত আতঙ্কিত হলাম

তারপর বলল, পরে তোমার সঙ্গে বসব একদিন। খুবই চক্করের মধ্যে আছি কেলাপান। আমার বাড়ি যদি এই গ্রামে না হতো, আমার বুড়ো বাবা যদি না থাকত, তবে আমি বদলি নিয়ে কবেই অন্যত্র চলে যেতাম। বলব, সব বলব। ভালো লাগে না চারধারের এই চক্কর। চাকরিও হয়তো ছেড়ে দিতাম।

ভাবলাম ওকে বলি, জায়গা বদলালেই কি চক্করের হাত থেকে বাঁচবে? তাও তো এখানে এমন প্রকৃতির মধ্যে বাস করো। সর্বদুঃখ হরণকারী প্রকৃতি।

তুমি বিয়ে করোনি?

সাগেলা বলল, করেছিলাম একবার। সেই কবে।

বউ মরে গেল চীচক রোগে। তারপর আর করিনি।

চীচক রোগটা কি রোগ?

মুখে আঙুল দিয়ে ফুটফুট কেটে সাগেলা দেখাল।

বুঝলাম, বসন্ত। আসল বসন্তই হবে।

বাসের বা ট্রাকের জন্যে দাঁড়াবে তো? চলো, আমাদের নাকা থেকে জল খেয়ে যাবে। যবের ছাতুর শরবত খাবে? ফরেস্ট ডিপার্ট থেকে গরমের দিনে বিনা পয়সার যবের ছাতু দেয় আমাদের।

না সাগেলা। আসার আগেই ভরপেট যবের ছাতুর শরবত খেয়ে এসেছি। বাঙালির পেটে বেশি ছাতু সহ্য হবে না। আমি এগোচ্ছি। হেঁটেই যাব জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। গরমের ভয় আর নেই। বলেই, আঙুল দিয়ে পশ্চিম দিকের আকাশে ওকে দেখালাম।

সাগেলাও দেখল। মেঘ করেছে সেদিকে। এতদিনে পশ্চিমঘাটের উপরে জড়ো হাওয়া মেঘের পূর্বী যাত্রা শুরু হল।

অনেকখানি পথ যে কেলাপান। পৌঁছোতে পৌঁছোতে তো বিকেল হয়ে যাবে তোমার।

যাক না। আমার কাজটা কি? বর্ষা নামলেই তো দু মাস ছুটি।

ভাবছিলাম ওকে বলি যে, আমার কাছে ও পথ তো পথ নয়, সে যে নন্দন কানন।

কলকাতায় যাবে? ছুটি হলে?

না না। ছুটি, মানে, কাজ থাকবে না। কোথাওই যাব না। এই ছত্তিশগড়ের বন-পাহাড় আর ওই গোন্দ-বাইগা পানকাদের আমার বড়ো ভালো লেগে গেছে কেলাপান।

সাগেলা হাসল। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, এখনও রাজকুমারী মুলারীবাইকেই দেখলে না তুমি, তার আগেই এত ভালো লেগে গেল! তোমার কপালে বিপদ আছে কেলাপান।

হেসে, জঙ্গলের শুঁড়ি পথে পা বাড়িয়ে বললাম, তা আর বলতে।

ও হাত নাড়ল।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়তেই বাগবাজারের অর্পণ বোস, একেবারেই অন্য একজন মানুষ হয়ে গেল। আমার অতীতকে আমি মুছে ফেলেছি। গোলন্দনি ধানের আর কুটবী ডালের আর জাগনি তেলের দেশে, মোরাঙ্গী-ওড়া, স্কুলের নিচু ক্লাসের ফুটবল ম্যাচের রেফারির মতন বাঁশিবাজানো কাঠবিড়ালির দেশে এসে সত্যিই আত্মহারা হয়ে গেছি।

আনন্দে ডগমগ হয়ে আমি যেন উড়েই চলতে লাগলাম, অসমান, বন্ধুর, অথচ নয়নভোলানো বন পথে।

ট্রিপ ট্রিপ করে কী একটা ছোট সবুজ পাখি, দেখে মনে হয়, টিয়াদের নাতি বা নাতনি হবে, একমুঠো উড়াল সুখের মতন সামনে সামনে শূন্যে একবার উঁচু আরেকবার নিচু হয়ে উড়তে বসতে বসতে উড়তে চলেছে। আকাশে মেঘের যাওয়া আসা শুরু হয়েছে। ঝুর ঝুর হাওয়া দিয়েছে একটা। রোদ ঢেকে গেছে মেঘে। অনেকই দিন পরে অরমিতা প্রকৃতি বুঝি রমিতা হয়ে উঠবে। কিছু একটা ঘটবে আজ। আকাশ তাই বলছে। বাতাসও। "আকাশে আজ কোন চরণের আসা যাওয়া। বাতাসে আজ কোন পরশের লাগে হাওয়া।"

ভাবলাম, কে বলতে পারে। আজই হয়তো দেখা হয়ে যাবে মুলারীবাই-এর সঙ্গে। আমার এই পথ গেছে ছিরহট আর গণিয়া বস্তির মাঝখান দিয়ে। আজও যদি বনকন্যারা চানে আসে মনিয়ারি কৈরাহাতে? এই উষর, পরম-প্রত্যাশী কামগন্ধী বনে, এই মর্মরিত মনে, কখন যে কী ঘটে যায়, আগে থাকতে কে বলতে পারে।

ভারি মধুর এই প্রত্যাশা। হয়তো সব প্রত্যাশাই।

প্রত্যাশারই আরেক নাম তো জীবন।

কে যেন বলে উঠল, আমার ভিতর থেকে।

পাকদণ্ডি পথে কিছুটা এগোতেই লমনি পেছনে হারিয়ে গেল। পর্ণমোচী বন যদিও পাতলা হয়ে

গেছে, তবুও সব গাছের পাতাই তো আর ঝরে না গরমে। অনেক গাছের পাতা ঝরে শরতে হেমন্তে বা শীতে।

ছেলেবেলাতে কবিতা পড়েছিলাম....''আমলকী বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু/ পেয়েছে খবর পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু।'' আমলকী বনের বর্ণনা শুধু কবিতাতেই পড়েছিলাম, তা যে নিজের চোখে দেখতে পাব, তা কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলাম?

আমি গামহারগাঁওতে আসার মাসখানেক পর থেকেই আমলকী বনে আমলকী ধরতে শুরু করেছিল। মনিয়ারী কৈরাহার পাশেই আমাদের ভাণ্ডার থেকে আধ মাইলের মধ্যে একটা ছোটো টিলার উপরে শুধুই আমলকী বন। টিলাটার নামই সেই জন্যে ''আঁওলা টিলা''। দেখতে দেখতে এই ক'দিন বড়ো বড়ো আমলকীতে ভরে গেল ফিনফিনে পাতাওয়ালা গাছগুলো। মারুতি, ফাগগুকে পাঠিয়েছিল দুজন অল্পবয়সি মেয়েকে সঙ্গে দিয়ে আঁওলা টিলাতে। কয়েক ঝুড়ি আঁওলা এনে জমা করেছে আমাদের ভাণ্ডারে আমাদের নিজেদের জন্যে মুখশুদ্ধি আর আচার বানাবার জন্যে। সারা বছর খাওয়া হবে তা। কৌশল্যা নাকি নানারকম মশলা-টশলা দিয়ে দুর্দান্ত আঁওলার আচার বানায়। পুরি বা ফুলকা, শুধু সেই আঁওলার আচার দিয়ে খেলেও নাকি অমৃতর মতন স্বাদু লাগে।

আঁওলা, আমাদের কোম্পানির হয়ে যে সব কুড়ুনিরা, যার মহুল ফুল কুড়োয়, শালের ফল কুড়োয়, তারাই ঝুড়ি ঝুড়ি করে এনে পাহাড়প্রমাণ জড়ো করত রোজই। আর একদিন অন্তর ট্রাক এসে নিয়ে যেত পেন্ড্রা রোড-এ। এক বিকেলে কাজ তদারকি করতে গেছিলাম সেই আঁওলা টিলাতে। আরও কি পরিমাণ আঁওলা আছে তারই আন্দাজ করতে। কিন্তু সেখানে পৌঁছোবার আগেই এমন এক দৃশ্য দেখলাম যে, আমি একটা কেলাউন্দা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

শিঙাল আর সঙ্গীরা মিলিয়ে ছোটো বড়ো নানা আকারের প্রায় শ খানেক চিত্রল হরিণ সেই আমলকী তলাতে ছুটোছুটি করে আমলকী খাচ্ছে। যেসব গাছগুলো ছোটো ছোটো, তাদের নিচে পেছনে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে আমলকী ছিঁড়ে খাচ্ছে। নইলে তো মাটিতে পড়ে থাকে যা, শুধু তাতেই তাদের অধিকার। শেষ বিকেলের কমলা-রঙা আলো এসে হরিণদের সোনার উপরে সাদা বুটিকাটা গায়ে পড়াতে এক কোমল বিধুর আভা বিকিরিত হচ্ছে।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চিত্রার্পিতের মতন আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে। তারপর আরও ভালো করে দেখব বলে যেই এক পা এগিয়েছি অমনি সামনের একটি বড়ো শিঙাল দলকে সাবধান করে ডেকে উঠল টাঁউ! টাঁউ! করে! আর সঙ্গে সঙ্গে দলটির সব সদস্যই একবার আমার দিকে তাকিয়েই হুড়োহুড়ি করে টিলার উলটোদিকের গড়ানো ঢালের দিকে যেন দৌড়ে গেল। দৌড়ে গেল না বলে উড়ে গেল বলাই ভালো। মাছের ঝাঁকের মধ্যে বড়ো বোয়াল বা চিতল মাছ এসে পড়লে যেমন করে ঝাঁকের মাছেরা ছত্রভঙ্গ হয় ওরাও যেন তেমনই মুহূর্তের জন্যে ছত্রভঙ্গ হয়েই আমার চোখের আড়ালে গিয়ে আবার অবশ্যই দলীভূত হল।

আমি চলেছি একা একা বনপথে সামনের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাতে তাকাতে। যতই দেখি, তাতেই মুগ্ধ হই। একটা নীলকণ্ঠ পাখি ডাকতে ডাকতে উলটোদিক থেকে উড়ে এসে আমাকে অতিক্রম করে পেছনে চলে গেল।

আমার সঙ্গে স্থানীয় কেউই নেই যে, আমার লাগাতার প্রশ্নের জবাব দেবে। তবে সঙ্গে না থেকেও তারা রেহাই পাবে না। কারণ ভাণ্ডারে ফিরেই তাদের প্রশ্নবাণে অবশ্যই জর্জরিত করব। ফাগগুও কম জানে না। কেনই বা কম জানবে? এরা তো সব অরণ্য পর্বতেই বড়ো হয়ে উঠেছে। অরণ্যই তো ওদের ক্রীড়াভূমি। ওরা সব অরণ্যচারী।

একা একা কোথাও গেলে ভাণ্ডারে ফিরতেই মারুতি যা ফাগগু আমাকে প্রশ্ন করত, আজ কি নতুন অভিজ্ঞতা হল বলো?

আর আমি যেমনি এক এক করে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকব আর মারুতি বলতে থাকবে হাঁতো। হাঁতো। হাঁতো।

ওর এই 'হাঁতোর' ব্যাকরণ অশুদ্ধ। একই সঙ্গে প্রশ্নবাচক এবং অনুকৃতিবাচকও। মারুতির "হাঁতো" তে অপিনিহিতিও সুপ্ত ছিল। কারণ "তো" উচ্চারিত হবার আগেই ও-কার উচ্চারিত হয়ে যেত। শব্দটা শোনাত "হাঁওতো"। তবে একে অপিনিহিত বলা যায় কি না জানি না। কারণ, স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন ব্যাকরণে পড়েছিলাম, অপিনিহিত শুধু উ বা ই-কারান্ত শব্দের বেলাতেই হয়।

এবারে সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। এখানে এমন জায়গাকে বলে "টাঁড়"। কিন্তু মারুতি বলেছিল এ অঞ্চলে এমন উষর টাঁড় খুব কমই আছে। হয়তো জায়গাটিতে কখনও বনবিভাগে "ক্লিয়ার-ফেলিং" করেছিলেন। অন্য সময়ে এক বর্ষাতেই নাকি ঘাস-এর বন গজিয়ে যায়। এখন প্রখর গ্রীষ্মে তাই সেই টাঁড়, ফরসা মানুষের টাক-এর মতন ফাঁকা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে পুটুস-এর ঝোপ।

এসব জায়গা, মারুতি বলে, খরগোশ আর তিতিরের স্বর্গরাজ্য। এই টাঁড়-এর সীমানাতেই জঙ্গলের আঁচল চারদিক দিয়ে ঘেরা। কালি তিত্বর ডাকছে থেকে থেকে। এই পাখিগুলোর ডাক এমনি তিতিরদের ডাক থেকে আলাদা। ভারি সুন্দর দেখতে এই পাখিগুলো। কালো আর বাদামিতে মেশা, সোনালিও আছে, কোথাও কোথাও। বুকটা সাদা ছিট ছিট। হলুদের ছিটও আছে। কাছ থেকে একবারই দেখেছিলাম। পায়রারা চেয়ে ছোটো হয় আকারে। মারুতিই চিনিয়ে দিয়েছিল। সাধারণ তিতির ছাই-রঙা। সেইগুলো যেমন মাটিতেই থাকে বেশি, এরা এক বুক বা কোমরসমান উঁচু কোনো গাছ বা ঝোপের ডালে বসে সমান বিরতিতে ওদের ডাক ডেকে দুপুরের একঘেয়েমি বা শেষ বিকেলের শান্তিকে ছিদ্রিত করে।

হঠাৎ দেখলাম, গোল গোল ক্ষুদে ক্ষুদে একদল পাখি, ছোটো ছোটো পা ফেলে দ্রুত দৌড়ে গেল এক ঝোপের আড়াল থেকে অন্য ঝোপের আড়ালে। দেখলে মনে হয়, তিতিরের বাচ্চাই হবে বুঝি। কিন্তু গণিয়া বস্তি থেকে গামহারগাঁওতে ফেরার সময়ে একটি দলকে আমার আর মারুতির সামনে দিয়ে পায়ে চলা পথ আড়াআড়ি পেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম যখন, তখন দুখু উত্তেজনাতে চিৎকার করে উঠেছিল, আরে বটের। বটের। মারো। মারো। ধড়কা দেও টোটাবাবু।

বন্দুক আমার কাঁধেই ছিল। দুখু বাইগার শিক্ষাদান প্রায় বৃথাই হয়েছিল। বন্দুকটা টোটাবাবুর কাঁধে মুখ্যত দর্শনধারী হয়েই এতদিন শোভা পেয়েছে ও পাচ্ছে, ব্যাংকের গুঁফো দারোয়ানদের বন্দুকের মতন।

তাছাড়া, যে টোটা নিজেই "ফুট্টুস" সে বন্দুকের টোটা ফুটোবেই বা কি করে?

এতদিন ওদের সকলের জবরদস্তিতে শিমালের ফুল খেতে আসা একটি কোটরা হরিণকে মেরেছিলাম। জিভ কামড়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছিল বেচারি। রক্তে ভেসে গেছিল গা। সঙ্গীরা আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল। আমার মন বিষাদে ভরে গেছিল। আমি তার কাছে যাইনি, মাংসও খাইনি। মৃত্যু আমাকে বড়োই ব্যথিত করে, সে পাখি বা হরিণ বা মানুষ যার মৃত্যুই হোক।

"Every death diminishes me. For whom the bell tolls! The bell toll for thee."

বন্দুক চালাতে জানা এক কথা, আর তা "সময়ে" চালাতে জানা আর এক কথা। জঙ্গলের মধ্যে একটি সামান্য পাখি বা খরগোশ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে রক্তে এমনই দামামা বাজতে শুরু করে যে, বন্দুকে হাত ছোঁওয়ানোর কথা একবারও মনে থাকে না। বাঘ শিকারিরা যে

কী করে বাঘের দিকে বন্দুক তাক করেন তা তাঁরাই জানেন। বাঘের ডাক দূর থেকে এবং একবার কাছ থেকে শুনেই তো তাকে আমার দেখার ইচ্ছে একেবারেই উবে গেছে। দেখতে হলে বরং কলকাতাতে ফিরে চিড়িয়াখানাতে গিয়েই দেখব। নিরাপদে।

"যার যা গড়ন ভাইডি!" দ্বারিকদা যেমন বলেন।

ফাগগু বলেছিল, এই বটেরের মাংস নাকি ময়ূরের চেয়েও ভালো। দুখু বাইগাও অবশ্য সেই কথাই বলেছিল। ফাগগু বলছিল, রান্না করলে বা কাবাব বানালে বোঝাই যায় না যে মাংস। মনে হয় মাছ। শেওতারাই-এর বদরু মিঞা নাকি তিত্বর বটের মোরগা মোর মারার যেমন যম, পাকাবারও তেমন বাহাদুর। তার হাতে জাদু আছে। একবার নাকি অচানকমারে যে খিচুড়ি আর আলুকা ভাত্তা বানিয়েছিল তার স্বাদ এখনও মারুতির মুখে লেগে আছে। সাধারণত নিরামিষাশি মারুতি গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছিল যে, হাঁতো! মাংস রান্না করতে জানে মুসলমানেরা। ভোগীর জাত ওরা। পেঁয়াজ, রসুন, লংকা, নুনই ওদের "জান"। ভুলেও টক খায় না ওরা তা জানো।

কেন? টক খায় না কেন?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

টক খেলে করার ক্ষমতা কমে যায়।

কী করার?

আরও অবাক হয়ে শুধিয়েছিলাম।

মারুতি একটু হেসে, দু হাতের আঙুল দিয়ে একটি মুদ্রা দেখিয়েছিল, মুখে এক রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে।

কী বোঝাতে চেয়েছিল আমি বুঝিনি।

যাই বলো টোটাবাবু রান্নাটাকে একটা অন্য জগতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে মুসলমানেরা। জীবন উপভোগ করতে জানে এরা।

তাই?

আমি বলেছিলাম।

হাঁতো।

মারুতি বলেছিল।

একটা কালি তিতির ডাকছে টাঁড়ের ডানদিক থেকে আর অন্যটা সাড়া দিচ্ছে, তার দোসর, বাঁদিক থেকে।

আমি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের দেখবার চেষ্টা করছি। পথ, নামেই। গ্রামের মানুষ এ গ্রামে চলাচল করে তাই তাদেরই পায়ের দাগে দাগে ক্ষীণ পথরেখা তৈরি হয়েছে। বুনো জানোয়ারেরাও চলাচল করে। বর্ষা এলে, এইসব পথের কোনো চিহ্নও থাকবে না। দখল নিয়ে নেবে প্রকৃতি, রাতারাতি। অত্যাচারী জমিদারের মতন। তখন বনভূমির বড়ো শিমাল বা নিম, সাহাজ বা পিপ্পল কোনও মহিরুহর নিশানা দেখে দেখেই পথ চলতে হবে বনে। বর্ষা নেমে যাবার বেশ কিছুদিন পরে গেলে নাকি তখন হঠাৎই আবিষ্কার করতে হবে যে, জমি বেদখল করে নিয়েছে বন।

অবশ্য 'বেদখল' না বলে "পুনর্দখল" বলা উচিত। বনের যা কিছু, তা তা বনেরই।

একটি ছোট্ট পাখির ডাক, বনের মাঝ-দুপুরে ডিজেল ট্রেনের এঞ্জিনের মতো প্রায় নিঃশব্দ হাওয়ার মধ্যে যে কতখানি শব্দের সঞ্চার করে, তা যিনি নিজ কানে না শুনেছেন তা জানেনও না। ডাক শুনে, দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বোধহয় কালি তিতির খুঁজতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময়ে কী একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম সামনে থেকে। কোনো খুরওয়ালা বড়ো জানোয়ারের পায়ের ভারী আওয়াজ।

আওয়াজটা সামনে থেকে আসছে। অত্যন্তই দ্রুতবেগে দৌড়ে আসছে জানোয়ারটি আমার দিকে। কী জানোয়ার বুঝতে পারলাম না। বোঝার মতন অভিজ্ঞতাও ছিল না। কোনো বড়ো গাছের পেছনে যে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝব বা দেখব তেমনও উপায় নেই। কারণ হাতের কাছে বড়ো গাছ একটিও নেই। তাই, বেগতিক দেখে বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দু হাতে ধরে বুড়ো আঙুলটা সেফটি-ক্যাচ-এর উপরে ছুঁইয়ে নলটা সামনে করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

নিজেকে বললাম, আমি একটুও ভয় পাইনি। কিন্তু নিজের অব্যক্ত কথা মন শুনল বলে মনে হল না।

কয়েক সেকেন্ড পরেই দেখলাম একটা প্রকান্ড শিঙাল শম্বর শিং-এর ডালপালা বয়ে নিয়ে দ্রুত দৌড়ে আসছে আমারই দিকে, ঘোড়ার ''গ্যালপিং''-এর মতন। আমাকে শিং দিয়ে বিদ্ধ করবে বলে নয়, যেন কোনো ব্যাপারে নালিশ করতে আসছে আমার দিকে। আমাকে সালিশি বানাতে চায়। দেখলাম, প্রায় ঘোড়ার মতন বিরাট শরীরী সেই শম্বরের গ্রীবা ও ঘাড় উপব পানে তোলা। অতবড়ো শিংটা পিঠের উপরে এমনভাবে শুইয়ে রেখেছে যে, জঙ্গলের কোনো ডালপালা সেই শিংয়ে আটকে গিয়ে তার গতিতে ব্যাহত করতে পারার ''জোট''টি নেই।

যে মুহূর্তে শম্বরটি আমার দৃষ্টিগোচর হল তার পরমুহূর্তেই অনেকগুলো লাল-রঙা কুকুর, তাদের মুখ আর ল্যাজ কালো, লাফাতে লাফাতে তাকে ধাওয়া করে এগিয়ে আসতে লাগল। ততক্ষণে আমি বুঝেছি যে, ওই কুকুরগুলোই শম্বরটাকে তাড়া করে নিয়ে এসেছে, এই বে-আবরু টাঁড়ের দিকে, গভীর বনের ভেতরের আবরু থেকে।

ইংরেজি সিনেমাতে বিলেতের লর্ডরা হরিণ শিকার করছেন দেখেছি, এমনই কুকুরদের দিয়ে হরিণ তাড়া করিয়ে। অসকার ওয়াইল্ডের ''দ্য পিকচাব অফ ডরিয়ান গ্রে'' বইয়েতে এরকম শিকারের বর্ণনাও পড়েছিলাম। তার মানে, এই শম্বর আর কুকুরদের পেছনে পেছনে এক বা একাধিক শিকারিও অবশ্যই আসছে। সে বা তারা দৌড়ে আসছে না ঘোড়ায় চড়ে, তা কে জানে। কিন্তু একথা ভাবতে আমার যতটুকু সময় লাগল তার আগেই দেখলাম দুটি লাল কুকুর শম্বরটার পিঠে লাফিয়ে উঠে মাংস খুবলে খেতে লাগল আর অন্য চার-পাঁচটা দু পাশে আড়াআড়ি শম্বরের শিং ও পায়ের খুরের বিপদ বাঁচিয়ে তার পেটের কাছে কামড়ে ধরে ছুটন্ত শরীর থেকে ঝুলতে লাগল। আরও অনেকগুলো কুকুর তার পেছনে, তাকে অবিরত ক্ষতবিক্ষত করতে করতে দৌড়ে যাচ্ছিল। শম্বরটার দুই বিস্ফারিত চোখে যে আতঙ্ক আঁকা ছিল তা জীবনে ভুলব না।

ওরা আমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পরেই সম্বিৎ ফিরে পেলাম আমি। এ তো খুন! খবরেব কাগজের ভাষাতে ''মার্ডার ইন ব্রড ডে-লাইট''।

অতগুলো কুকুর মিলে দুই পাশ এবং পেছন থেকে একটি শম্বরকে অমন করে আক্রমণ কবে ছিঁড়ে খাওয়ার মধ্যে কোনো পৌরুষ নেই। ন্যায় নেই। অবশ্য কুকুরেরা তো কুকুরই! তাদের মধ্যে পৌরুষ আশা করাটাই অন্যায়, যখন মানুষের মধ্যেই পৌরুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর ন্যায়ও কি আজকাল মানুষের কোনো কর্মেই আছে? ন্যায়, ধর্ম সব রসাতলে গেছে।

''এখন যে ঘোর কলি!''

মারুতি পানকা প্রায়ই বলে।

আমি সম্বিৎ ফিরে পেতেই জোরে দৌড়ে গেলাম কিছুটা ওদের পিছন পিছন। দেখলাম, একটি দোলামতো কিন্তু শুকনো জায়গাতে শম্বরটা চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পড়ে গেছে আর সেই কুকুরগুলো অতবড়ো জ্যান্ত প্রাণীটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। জবাই করার মতনই দৃশ্য। সারা শরীর

দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। চোখে দেখা যায় না। শম্বরটার কষ্টও চোখে দেখা যাচ্ছিল না। তবে একথাও সত্যি যে শ্বাস-নালি কেটে 'জবাই' করলে পুরো শরীরটা উৎক্ষিপ্ত উৎসারিত হয়ে উথালপাথাল করতে থাকে একটু শ্বাস নেবার বৃথা শেষ চেষ্টায়। সেই মৃত্যু কিন্তু শম্বরটার এই জঘন্য মৃত্যুর চেয়েও সাংঘাতিক হৃদয়বিদারক।

মারুতি দার্শনিকের মতন বলে, মওত তো মওতই হ্যায়। উসকি অ্যায়সী অউর অইসী ক্যা হোতা হ্যায়?

আমার মন বলে, জরুর হোতা হ্যায়। মৃত্যুরও রকম আছে বইকী।

অত বড়ো শম্বরটা বারবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। শিং দিয়ে, তার চারটি বলিষ্ঠ পা দিয়ে নাগাল পাবার চেষ্টা করল কুকুরগুলোর, যে পায়ের একটি চাঁট খেলে চিতাবাঘের মাথার খুলিও ফেটে যায়। কিন্তু সেই খল, ইতর, ধূর্ত শত্রুরা তাকে ধূর্তামির সঙ্গে এড়িয়ে চলতে লাগল। তবে ওই রক্তপায়ী কুকুরগুলো সম্বন্ধে একটাই ভালো কথা বলার ছিল। একরম খল, ধূর্ত নীচ ইতর যেসব কুকুর আছে মানুষদের মধ্যে, যারা "যূথবদ্ধ" থাকে এই কুকুরগুলোরই মতন তারা ভন্ড। একশোভাগ ভণ্ড। কিন্তু বুনো কুকুরগুলোর আর যাই দোষ থাক, তাদের মধ্যে কোনো ভণ্ডামি ছিল না।

শম্বরটা ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল। এমন সময় দুদিক থেকে দুটো কুকুর জ্যান্ত শম্বরটার দুটি চোখ উপড়ে নিল। নিয়েই শব্দ করে পরমানন্দে খেতে লাগল। কালো রক্ত গড়িয়ে গেল চোখের কোটরের অন্ধকার হয়ে যাওয়া গর্ত দুটি দিয়ে। ঠিক সেই সময়েই একদল সাদা-বুক শকুন কোথা এসে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল মাথার উপরে। তারও কিছু বাদে, নেমে এল একেবারে মাটিতে। শম্বরটা আর কুকুরগুলোর কিছুটা দূরত্বে থেকে চারপাশে ঘিরে রইল তাদের।

শম্বরটা মাঝে মাঝে তখনও মাথা তোলার চেষ্টা করছিল, পা ছোঁড়ারও। ওর শারীরিক কষ্টর চেয়েও অনেক বেশি করে বেজেছিল ওকে ওর এই অপমান। কিন্তু খুনিগুলো যে দলে ভারী। তারা যে খেলার নিয়ম জানে না। জানলেও, মানে না। আজকাল পশু কিংবা পশুর মানসিকতার মানুষ, যারাই দলে থাকে, তারাই সব যুদ্ধে জেতে। একা-থাকাদের বড়োই কষ্ট। বড়ো করুণ মৃত্যু তাদের জন্যে অপেক্ষা করে। পশু তো কথা বলতে পারে না, আমি মানুষ বলেই বলতে পারি যে, এইসব প্রতিবাদী মৃত্যু করুণ হলেও মহান। বড়ো মানুষেরা কোনোদিনও দলে ভেড়েননি কুকুরদের বা ভেড়াদের মতন। নিজেদের গর্ব ও আত্মসম্মানের কারণে তাঁদের কষ্টের কথা বলেনও না কারোকে। তাঁরা গড্ডলিকার নন।

বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বোকা-আমি স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে থেকে, আমার মনে হল, হয়তো আমি অত্যন্ত বোকা বলেই যে, এ অন্যায়। এ ভারী অন্যায়। বন্দুকটা তুলেই শূন্যে পরপর দুবার গুলি করলাম। ভেবেছিলাম গুলির শব্দে কুকুরগুলো এবং শকুনগুলোও পালাবে। কিন্তু দেখলাম, কুকুরগুলো রক্তমাখা মুখে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমার দিকে মাথা তুলে দেখল। শকুনগুলো গুলির শব্দে বিরক্ত হয়ে একবার সামান্য উপরে উঠল মাটি ছেড়ে, এই ফিট দু-তিন, তারপরেই আবার মাটিতে নামল।

হঠাৎই তখন আমার ভয় হল যে, কুকুরগুলো সংখ্যাতে এতই বেশি যে এতবড়ো শম্বরটাও হয়তো খাদ্যে হিসেবে তাদের জন্যে অকুলান হবে। শম্বরটাকে অতি দ্রুত শেষ করে আনছে ওরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ যেমন খাবলা দিয়ে দিয়ে খিচুড়ি খায় তেমন করে খেয়ে। শম্বরটা শেষ হয়ে গেলেই তো তারা আমাকেও ওইভাবে ছিঁড়ে খেতে পারে! তাদের সর্বনাশা সাংঘাতিক খিদে তো জেগে গেছে।

কথাটা মনে হতেই, আমার বুকের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে একটা দারুণ ভয় সেঁধিয়ে গেল। পেছন ফিরেই ভয় পাওয়া আমি ভীষণ জোরে দৌড়োতে শুরু করলাম। চড়াই চড়ে, ওই টাঁড়টা পেরিয়ে,

যখন আবার বনের মধ্যে ঢুকলাম তখনই একজন মানুষ আমাকে তাঁর ছড়ানো দুহাতের দু'হাতের মধ্যে গ্রহণ করলেন। সাদা চামড়ার, দীর্ঘ, সুদেহী একজন মানুষ। পরনে খাকি হাফপ্যান্ট আর খাকি বুশশার্ট। পায়ে, খাকি কেডস জুতো, মোটা শস্তা মেটে-লালরঙা উলের মোজার সঙ্গে পরা।

বললেন, উ্যা মাস্ট বি দ্য নিউ চ্যাপ ওয়াকিং ফর ছগনলাল পোপটলাল।

ইংরেজি বুঝতে পারলেও বলার অভ্যেস তো ছিল না। মাথা নাড়িয়ে সাহেবকে জানালাম, আমিই সেই অধম।

উনি বললেন, আই অ্যাম জন লেভেলিন। পিপল হিয়ার কল মি লেবিনসাব। নাইস টু মীট উ্যা টোটাবাবু।

বললাম, বাবুটা কর্তন করলেই ভালো হয়। তারপর বললাম, লেভেলিন-এর বানান কি?

LEWELLYN। অক্ষরগুলি আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করলেন লেবিন সাহেব।

তারপর বললেন, উ্যা ক্যান কল মি বাই মাই ফাস্ট নেম। জন।

বললাম, হ্যাড হার্ড আ লট অ্যাবাউট উ্যা। বাট মাই ইংলিশ ইজ পুয়োর।

ফটকের সঙ্গে নিউমার্কেটের দোকানিদের সঙ্গে দরদাম করতাম, ফটকেরই বুদ্ধিতে। ফটকে বলত, একটু অভ্যেস করলেই ইংরেজি বলতে পারবি। সাহেবরা টাটকা টাটকা গেছে দেশ ছেড়ে। তখনও তাদের প্রভাব ছিল। কলকাতা রাজস্থানের রাজধানী হয়ে যায়নি তখনও। দোকানিরা "Take take, no take no take একবার তো see" গোছের ইংরেজি বলত। সেই Conversational English-ই আমাদের কাছে বহুত ইংরেজি ছিল।

সো হোয়াট। দ্য মোর উ্যা গেট ওভার উয়োর শাইনেস, দ্য বেটার ফর উ্যা।

তারপর বললেন, তুমি আমার সঙ্গে হিন্দিতেও কথা বলতে পারো। তোমাকেই বাইগা ডাকাতরা লুটে নিয়ে মেরেছিল না, মনিয়ারি কৈরাহা নদীর বুকে?

হ্যাঁ।

আমি বললাম।

তারপরেই লেবিনসাহেব বললেন, তুমি কি ছিরহট বস্তিতে যাচ্ছ? মুলারীবাই-এর কাছে?

আমি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললাম, না, না। আমি তাকে চিনি না। দেখিওনি কখনও।

লেবিন সাহেব হেসে ফেলে বললেন, স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড!

আমি বললাম, ডাকাতির কথা আপনিও জেনে গেছেন?

শুধু আমি কেন? পঞ্চাশ বর্গ মাইল এলাকার সব মানুষই জেনে গেছে এবং মুলারীবাই যে তোমার প্রেমে পড়েছে সে কথাও।

আমার কান লাল হয়ে উঠল।

কে বলেছে?

আমি কিছু বলতে হয় তাই বললাম।

কে বলেনি বলো? হাওয়া বলেছে, রোদ বলেছে, চাঁদ বলেছে, বৃষ্টি বলেছে, পাখি বলেছে। এখানে ওরাই আমার দূত।

আমি ভাবলাম, মুলারীবাই আমাকে না দেখেই সত্যি ভালোবেসেছে কি না জানি না, তবে এটুকু জানি, ভালোবাসা কারওই পেতে হলে এমন হাওয়া, রোদ, বৃষ্টি, চাঁদ আর পাখির দেশেই পাওয়া ভালো।

তারপর বললেন, আসছ কোথা থেকে?

মেভ্রিসেরাই।

ও। দুপুরে খেয়েছ কিছু?

না। খাব। গামহারগাঁওতে পৌঁছে।

লেবিনসাহেব অবাক হয়ে বললেন, গামহারগাঁও? হেঁটে? সন্ধের আগে পৌঁছোতেই পারবে না। কতখানি পথ তা কি জানো? ঘোরা পথ।

তারপরই শম্বরটার কথা মনে হল আমার।

বললাম, কয়েকটা কুকুরকে গুলি করে মারা কি আমার কর্তব্য ছিল না?

আপনি মেরে দিতে পারবেন?

হাঃ। এতক্ষণে তারা কি সেখানে আছে আর!

নেই? চলে গেছে? খাবেই না যদি, তো মারল কেন শম্বরটাকে!

খাবে বইকী। ওদের খাওয়া নিজ চোখে না দেখলে বুঝতেই পারবে না—কী দ্রুত খায় ওরা, নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে। এখুনি গেলে দেখবে এর মধ্যেই খেয়ে শেষ করে আবার অন্য কোনো শিকারের খোঁজে গেছে। শম্বরটার কঙ্কাল আর শিং পড়ে আছে শুধু আর শকুনগুলো কামড়াকামড়ি করছে সেগুলোর উপরে। রাত নামলেই হায়না আর শেয়াল কটাং কটাং শব্দ করে হাড় ভাঙবে, হাড়ের সুরুয়া খাবে।

ইসস।

আমি বললাম। এই নৃশংসতার কি কোনো প্রতিকার নেই?

খুব জোরে হেসে উঠলেন মিস্টার লেভেলিন।

হাসছেন কেন?

হাসছি, তুমি এর মধ্যে নৃশংসতা দেখলে বলে।

নৃশংসতা নেই? এ যে বীভৎস।

প্রকৃতির মধ্যে কোনো নৃশংসতা নেই। বীভৎসতা আর নৃশংসতা শব্দদুটির মানে এক নয়।

বলেই বললেন, তোমার পুরো নাম কি?

অর্পণ বোস।

না মিস্টার বোস, টোটাবাবু, প্রকৃতির মধ্যে কোনোই নৃশংসতা নেই। যা নৃশংসতা বলে মনে হয়, তা আপাতই। পুরোপুরি। ঈশ্বর ওই শম্বরের মতন এই বুনো কুকুরদের সৃষ্টি করেছেন। এদের খাদ্য পশু-মাংস। এরা দলবদ্ধ জানোয়ার। এদের একের শরীরে এমন বল নেই, মনেও এমন সাহস নেই যে, কোনো বড়ো জানোয়ার তো বটেই, কোনো মাঝারি জানোয়ারকেও ওরা একা কবজা করতে পারে। একটি কালো-মুখ লাল-কুকুর ইচ্ছে করলেও একা-একা একটি মাঝারী সাইজের চিতল কি বড়ো কোটরাকে হয়তো কাবু করতে পারবে না তাই তারা যূথবদ্ধ হয়েই থাকে, ভারী ভারী শহরের শিক্ষিত, ক্ষমতালোভী, অর্থ, যশ পুরস্কার-লোলুপ যূথবদ্ধ বুদ্ধিজীবীদেরই মতন। প্রকৃতির জগতে এই বুনো কুকরদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। তাই হয়তো ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের প্রকৃতিই এমন যে, তারা জঙ্গলের প্রাণীদের তাড়া করে মেরে, ভয় দেখিয়ে তাদের মনে ভয় জাগিয়ে রেখে বিশেষ প্রাণীদের সংখ্যা কোনো এক বিশেষ বনে বাড়তে দেয় না। তাদের ভয়ে তৃণভোজী প্রাণীরা এক বন থেকে অন বনে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়। একে প্রকৃতির মধ্যের ভারসাম্য বজায় থাকে। ঈশ্বর যে কেন কী করেন তা অত সহজে বোঝার নয়।

তারপর বললেন, একটি শব্দ তুমি হয়তো শোনোনি, শুধু তুমিই বা কেন, আজ হয়তো অনেকেই শোনেননি কিন্তু আজ থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর পরে ওই শব্দটি প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই অতি পরিচিত হবে। তা নিয়ে তর্ক হবে, সেমিনার বসবে। শব্দটির তাৎপর্য যখন প্রত্যেকেই বুঝবে, তখন খুবই দেরি হয়ে যাবে।

একটু থেমে বললেন, তুমি বোধহয় ঠিক সময়েই এসেছ আমাদের এই সুন্দর পাহাড় বনে। এই সবই নষ্ট হয়ে যাবে দেখতে দেখতে, হয়তো পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই।

কেন? কারা নষ্ট করবে?

অত্যন্ত দুঃখ এবং অবিশ্বাসের গলাতে বললাম আমি।

করবে, ঈশ্বরের সৃষ্ট সবচেয়ে বিপজ্জনক জীব, যারা এই ঢোলদের চেয়েও MEAN, SELF-RESPECTLESS, লোভী, স্বার্থপর মানুষেরা। আর কারা! এখন তো সকলেই স্বাধীন। সাহেবদের তো তাড়িয়েছ তোমরা। স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভাবে চুরি করে গাছ কাটা, জানোয়ার মারা শুরু হয়েছে, বিদেশি টুরিস্টদের এনে তাদের দিয়ে বাঘ মারিয়ে, অথবা SHOOTABLE DISTANCE-এর মধ্যে "PRODUCE" করে ফরেন এক্সচেঞ্জ কামানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে (যে ফরেন এক্সচেঞ্জ দেশের নেতারা বিদেশে গিয়ে ফূর্তি করার জন্যে খরচ করবেন।) তাতে আর বড়ো জোর ধরো পঞ্চাশ বছর লাগবে এই গভীর জঙ্গল ঝাঁটি-জঙ্গলে পরিণত হতে।

একে বাঁচাবার কোনো উপায়ই কি নেই?

উদ্বিগ্ন আমি বললাম।

আছে হয়তো। বাঁচাতে চাইলে তোমরাই একমাত্র পারো! দেশের তরুণেরা দেশেরা সৎ নির্লোভ মানুষেরা। যাদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। তারাই।

আমরা দুজনে ওঁর বাংলোর পেছন দিকের বাগানের গেট দিয়ে ঢুকে পেছনের বারান্দাতে বেতের চেয়ারে বসেছিলাম। তখন সেদিকে ছায়া ছিল।

উনি বললেন, তোমার জন্যে রুটি করতে বলি? রুটি আর কুমড়োর তরকারি আর বিউলির ডাল।

না না। সকালে পেট ভরে খেয়ে বেরিয়েছি। চা খেতে পারি শুধু।

চা তো আনছেই। এই যে। আমাদের আসতে দেখেই চা ভিজিয়ে দিয়েছিল। এখানে একটা চার বেডের হাসপাতালও চালাই আমি। তাই গরম জলের বন্দোবস্ত সবসময়েই থাকে।

শব্দটা যে কি তা তো বললেন না? যে শব্দটির কথা বললেন একটু আগে।

ও হ্যাঁ। ECOLOGY। ECOSYSTEM। প্রকৃতির মধ্যে বিধির বিধানে সব কিছুই যে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর যে একটি পরিবার, তার এক ছেলের ক্ষতি হলে যে সারা পরিবারেরই ক্ষতি, একথা লোভী মানুষেরা যখন বুঝব তখন বড়োই দেরি হয়ে যাবে।

আপনি আমাদের দেশে এসে রয়েছেন কেন? আপনার দেশ কোথায়?

চামড়া সাদা হলেই যে মানুষে ইংরেজ হয় না এই সরল সত্যটা জানতাম বলেই প্রশ্নটি করলাম।

এসেছিলাম মিশনারি হয়েই। কিন্তু "মিশান" ছেড়ে দিয়েছি বহুদিনই আমি। এখন আমি একজন নিছক সাধারণ, গরিব, জংলি ভারতীয়। ছত্তিশগড়ের এই নানা আদিবাসী ও অন্যান্য মানুষদের ভালোবেসে ফেলেছি।

আপনার দেশ কোথায় ছিল?

আমার দেশ ছিল আয়্যারল্যান্ডে।

আপনি কি সি. আই. এ-র চর?

বামপন্থা-প্রভাবিত সরল অনভিজ্ঞ আমি বোকার মতন প্রশ্ন করলাম।

খুব জোরে হেসে উঠলেন লেভেলিনসাহেব।

চা চলকে পড়ল, ওঁর হাত থেকে।

বললেন, তোমাদের কলকাতায় এই শব্দটি খুব চালু আছে, না? তারপর বললেন সি.আই.-এর পুরো নাম সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি। ইউনাইটেড স্টেটস-এর গোয়েন্দা সংস্থা। তেমন সংস্থা রাশিয়ারও আছে। কে জি বি। না, আমি সেসব দলের চর কোনো নই। আই. আর. এ করতাম আয়ারল্যান্ডকে ভালোবাসা, তার স্বাধীনতা চাওয়া একটি সংস্থা, কিন্তু সে কারণেই আমাকেও

আমার দেশে জেলে যেতে হয়েছিল। আমি ইংলিশ নই, আইরিশ। আমিও চাই আমার ছোট্ট সুন্দর দেশ স্বাধীন হোক, তোমরাও যেমন তোমাদের মস্ত দেশকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলে। কিন্তু তোমাদের আমি পরাধীন অবস্থাতেও দেখেছি, স্বাধীন অবস্থাতেও দেখছি। হিউম্যান মেটেরিয়াল হিসেবে পরাধীন ভারতবাসী, স্বাধীন ভারতের মানুষদের চেয়ে অনেকই ভালো ছিল যে, একথা আমি অবশ্যই বলব। তারা শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজি বলতে পারত না বটে, কিন্তু তাদের "চরিত্র" ছিল। মানুষ হিসেবে তারা অনেকই বেশি খাঁটি ছিল। কোনো দেশই স্বাধীনতা হাতে পেয়ে মুচমুচে কিন্তু রসে-টইটম্বুর কড়াই থেকে সদ্য তোলা জিলাইবির মতন তা সঙ্গে সঙ্গেই খেতে পারে না। দেশ গড়ে তো দেশের সাধারণ মানুষেই। নেতারা নয়। স্বাধীনতা পেলেই হল না, সে স্বাধীনতা রাখা যাবে কি না তাও নির্ভর করে সেই দেশের মানুষদেরই উপরে।

আপনি কত বছর আছেন এখানে?

ওঃ। সে অনেকই বছর। মাঝে দুবার আমার জন্মভূমিতে গেছিলাম। আর যাব না। আমার ভয় হয়েছে তোমাদের দেখে যে, আমার আয়ারল্যান্ডও যদি স্বাধীন হয় তবে হয়তো.....।

তারপরই বললেন, তুমি কখনও ছাতুর লিট্টি খেয়েছ?

না।

মারুতিকে বোলো একদিন, করে খাওয়াবে।

কেন? সেটা কি বস্তু?

খেতে দারুণ। তবে শীতকাল ছাড়া খাওয়া যায় না। আচার আর সরষুকা শাক দিয়ে খেতে হয়।

হঠাৎ ছাতুর লিট্টির কথা বললেন?

বললাম, কারণ স্বাধীনতার সঙ্গে ছাতুর লিট্টি তুলনীয়, তাই। খেতে দারুণ। কিন্তু হজম করা খুবই মুশকিল।

চা আর মুড়ি খেয়ে আমি বললাম, এবারে আমি যাব।

যাবেই? আজ এখানে থেকেই যাও না।

নাঃ। মারুতি চিন্তা করবে।

হাঃ। এখানে কেউই কারো জন্যে চিন্তা করে না। খামোখা চিন্তা করাটা শহরের মানুষদেরই বাতিক। দেখলে না, সন্তুরাম সিং কেমন বেড়াতে গিয়ে সেখানেই থিতু হয়ে গিয়ে সন্ত বনে গেল। চিন্তিতদের মধ্যে তার কোম্পানির তোমরা তো ছিলেই, তার পরিবারও তো ছিল। তাতে সন্তুরামবাবুর কি এল গেল?

তাই? কোথায় থাকত তারা? মানে ওঁর পরিবারের মানুষেরা?

ঠিক জানি না। শুনেছিলাম, ধুতি পাহাড়ের পায়ের কাছে কোথাও। কই, তার পরিবার যে চিন্তা করবে সে কথাও তো সন্তুরাম সিং একবারও ভাবল না। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন অন্য সব জীবেরই মতন, তিনিই আমাদের শারীরিক ও মানসিক জীবনধারণের সব বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। নিজে চাহিদাকে যদি কমিয়ে রাখতে পারো এই পৃথিবীই তোমার ঘর। সবখানেই তোমার ঘর। যেদিকে দু-চোখ যাবে, চলে যাবে।

আপনি কি বিবাহিত?

না। কেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন?

নন বলেই এমন কথা সহজে বলতে পারছেন। দায়দায়িত্ব তো নেই, আমি বললাম।

হাঃ। করে হাসলেন মি. লেভেলিন।

তারপর উলটে বললেন, আমাকে, হাউ বাউট উ্য? তুমি কি বিবাহিত? এবং হলে, সে কথা কি মুলারীবাই জানে?

নাঃ।

মুলারীবাই-এর প্রসঙ্গে কিছু বললাম না আমি। মুলারীবাই-এর প্রসঙ্গ এই শিক্ষিত বিদেশিও ওঠানোতে বিরক্ত হলাম।

উনি আবার বললেন, তবে? বিবাহিতও নয় তবু তুমি এমন দায়দায়িত্বর কথাটথা জানলে কী করে।

আমার বাবা মারা গেছেন। সামান্য চাকরি করতেন। মা আর ছোটো বোন আছেন। তাদের সব দায়িত্বই আমার।

বাঃ। দ্যাটস লাইক আ গুড ইন্ডিয়ান। এসব পশ্চিমি দেশে পাবে না। তবে সেখানে ডেমোক্রেসি, অব্যর্থ বাতের দাওয়াই হিসেবে যেমন শুখা-মহুয়ার সেঁক, তেমনই ধরে গেছে আর কী দাওয়াই হিসেবে! সরকার যে ট্যাক্স নেয় মানুষের কাছ থেকে তার বদলে অনেক কিছুই দেয়, সেখানে সকলকেই। নিখরচায় শিক্ষা, চিকিৎসা, পেনশান, বেকার-ভাতা বার্ধক্য ভাতা। জানি না এ-দেশেও করদাতারা কবে সেই সব সুযোগ সুবিধা পাবেন। জবাহরলাল নেহরুর তাত্ত্বিক ডেমোক্রেসি কবে প্রাণ পাবে। সরকার দায়-দায়িত্বের অনেকখানিই বহন করলে তবেই ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব অনেকই কমে যায়।

মানুষটা বড়ো চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলেন, ভাবছিলাম।

বিদেশিদের মুখে দেশের নিন্দা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল।

বললাম, তোমার কোন দেশের পাসপোর্ট?

মিস্টার লেভেনিন দীর্ঘ সময় আমার দু চোখে চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, আই অ্যাম অ্যাজ মাচ অ্যান ইন্ডিয়ান অ্যাজ উ্য আর, ইয়াং ম্যান। আই হ্যাভ রিনাউন্সড মাই ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ। আই অ্যাম আ হাড্রেড পার্সেন্ট ইন্ডিয়ান। অ্যান্ড ডেসপাইট অফ এভরিথিং, আই অ্যাম প্রাউড টু বি ওয়ান। প্লিজ ডু্য নট লুক-ডাউন আপন মি। মাই লেজিটিমেট প্রাইড উইল বি জেনুইনলি হার্ট।

লেভেলিনসাহেবের বাংলো পেছনে পড়ে রইল। একটা বাঁক থেকে বাংলোর সামনেটা চোখে পড়ল। ফুলে ফুলে ঝলমল করছে এই গরমেও। কী ফুল কে জানে! একদিন এসে ফুল চিনতে হবে। একটিমাত্র চিনলাম। পুটোলাকা।

কিছুক্ষণ পরই হারিয়ে গেল বাংলোটা একটি টিলার আড়ালে।

আকাশ একবার মেঘের ছাতা মেলে ধরেছে মাথাতে আবার পরক্ষণেই সরিয়ে নিচ্ছে। দিগন্ত জুড়ে মেঘের মাদল বাজছে। কোনো বড়ো ওস্তাদ আজ পূরবী গাইবেন। তারই প্রস্তুতি চলেছে যেন দিকে দিগন্তরে। মাঝে মাঝেই সেই ফিসফিসে হাওয়াটা জোর হচ্ছে। কানেব কাছে এসে কী যেন অস্ফুটে বলেই আবার দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে দূর-দূরান্তরে। পোড়া মাটি, মরা ঘাস, ঝরা ফুল আর মেঘবাহী হাওয়ার মিশ্র গন্ধে মাতালের মতন লাগছে আমার এই আদিগন্ত প্রকৃতির মধ্যে, বনের পর বন, মেঘের পর মেঘের মতন পাহাড়শ্রেণী, যা কিছুই দু চোখে দেখছে আমার, তার সবেরই মালিকানা যেন আমারই একার।

হঠাৎই যেন পাশেই মাটি ফুঁড়ে একটি বছর দশেকের ছেলে উদয় হল। কদম-ছাঁট দেওয়া তার চুলে। পেছনে বিঘতখানেক একটা টিকি। গায়ে একটি বগল-ছেঁড়া নীলরঙা জামা, পরনে হাঁটুর উপরে তোলা ধুতি। খালি, ধূলি-ধূসরিত পা।

ছেলেটি বলল আমাকে, লেবিনসাহেব বললেন, তোমাকে ঝিকারপানি পাহাড়ের পায়ের পাতা অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে। ওখানে একটা গোলাই আছে, মস্ত মস্ত তিনটে নানকুরি গাছের নিচে। ওইখানে যদি পথ হারিয়ে যাও সারা রাত বনে ঘুরে মরতে হবে। তিনটি গাছের নিচ দিয়ে তিনদিকে রাস্তা চলে গেছে। আর এই বনে, দারহা, কিচিন, জিন-পরী সবই আছে। নেই এমন কেউই নেই।

তাই?

হ্যাঁ।

অবাক হলাম আমি সে কথা শুনে। এই একটুকু একটা ছেলেকে পাঠালেন উনি বন্দুকধারী আমার পথপ্রদর্শক করে। ভাবছিলাম, কত কিই না জানার আছে, শেখার আছে এই বনে জঙ্গলে। এখানে রোড-সাইনাস বলতে এইসব গাছপালা পাহাড় নদীই। ট্রাফিক পুলিশ নানকুরি গাছ। সেটা কি গাছ কে জানে! দেখলেই জানতে পারব। সে গাছ কি আগে দেখেছি, কে জানে। এখানে ট্রাফিক সার্জেন্ট-এর সাইরেন হল গিয়ে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত চমকে দেওয়া মোরাঙ্গী পাখির ডাক।

ছেলেটির নাম গণেশ। এও নাকি জাতে পানকা।

কোন পানকা? তুমি?

ওকে শুধোলাম আমি।

ততদিনে আমি ওদের সম্বন্ধে একটু একটু জেনেছি।

গণেশ হেসে বলল, বাঘ পানকা।

গণেশ নাম ছেলেটি আমার ডান পাশে পাশে হাঁটছিল। একটু পেছনে। ওর মুখটা ভালো দেখতে পারছিলাম না। পথে অথবা জীবনে যে পাশে থাকে, তাকেই সবচেয়ে কম দেখা যায়, সবচেয়ে কম ভালো করে। এটা দুঃখের।

তোমরা ক-ভাই বোন?

আমি একা। মানে, ভাই। আর আমার ছোটো বোন আছে।

কি নাম তার?

অদ্রি।

বাঃ।

গণেশ পথপাশের ঝোপ থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে পাকিয়ে সরু করে কানের মধ্যে ঢুকিয়ে কান খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, কেন? বাঃ কেন?

উত্তরে জবাব খুঁজে পেলাম না আমি।

বললাম, তোমরা লেবিনসাহেবের বাংলোতেই থাকো?

না। আমরা থাকি লুদ্রা তালিয়াপানিতে।

কি নাম বললে গ্রামের?

লুদ্রা তালিয়াপানি।

এখানে কি করছ তাহলে?

এখানে আমার মামার বাড়িতে এসেছি।

মামাবাড়ির গ্রামের নাম কি?

সিলপিরি।

বাঃ।

বাঃ কেন?

ও বলল।

আবারও লজ্জা পেলাম। তবু বললাম, গ্রামের নামটি ভারি সুন্দর।

গ্রাম, গ্রাম, নাম, নাম। তার আবার সুন্দর-অসুন্দর কি?

এখানে আর কোন কোন গ্রাম আছে?

বহুতই গ্রাম আছে।

ছেলেটি উদ্ধত ও উদাসীন গলাতে বলল।

কি নাম তাদের?

কত নাম। চকমকটোলা, গাংগারিয়া, চুকুপুকা, পাকারিপানি, ধারকাট্টা আরও কত আছে।

ও। তাই বুঝি।

হাঁতো।

এত দেখি মারুতির চ্যালা।

ভাবলাম আমি।

আচ্ছা গণেশ, তুমি লেবিনসাহেবের বাংলোতে কি করছিলে?

দেওয়াল রং হচ্ছে মাটি দিয়ে। রং করছিলাম। রং হয়ে গেলে জিগারি দিদিরা সেই দেওয়ালে ছবি আঁকবে লাল রং দিয়ে।

কোন জিগারি?

মানে?

না, আমি একজন জিগারিকেই চিনি। ভাবছিলাম, সে কি না।

খুব হাসে কি সে?

গণেশ বলল।

আমি লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, ঠিক তাই।

গণেশ বলল, ছিরহট গ্রামের মুলারীবাই-এর চামচা?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাও ঠিক।

হ্যাঁ। সেই জিগারিই।

সে এখন এই গ্রামে?

হাঁতো।

গ্রামটার নাম কি?

আসিবিসি।

বাঃ।

এটা কি কোনো অসুখ?

কোনটা?

আমি অবাক হয়ে বললাম।

তোমার এই বাঃ টা।

লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলাম।

তারপর গণেশকে জিজ্ঞেস করলাম। তুমি মুলারীবাইকে দেখেছ?

কে না দেখেছে তাকে।

কেন? আমি তো এখনও দেখিনি।

তুমি পোড়াকপালে। তাই দেখোনি।

সে কি খুব সুন্দর দেখতে?

তুমি সুন্দর বলতে কি বোঝো?

দশ বছরের ছেলের কাছ থেকে অমন পালটা প্রশ্ন প্রত্যাশা করিনি।

বললাম, আমি কিছু বুঝি না। কেমন সুন্দর বলোই না।

কী করে বোঝাব তোমাকে। তুমি আষাঢ়ের বৃষ্টি পড়া আষাঢ়ের সকালের মতন সুন্দর।

ও।

গণেশের বর্ণনাতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বললাম আমি।

তুমি মাঘ মাসের সন্ধে দেখেছ? যখন মাঠে গোঁন্দলি আর সাঁওয়া ধান কেটে নেওয়া হয়ে যায়, কিন্তু মাঠময় গন্ধ তখনও থাকে, পাটকিলে রঙা মেঠো ইঁদুরেরা, কাটবার সময়ে যেসব ধান ঝরে পড়ে যায়, সেগুলো খাওয়ার জন্যে যখন ইতিউতি দৌড়াদৌড়ি করে, যখন সোনার মতন আলো পাহাড়তলির বনকে স্বর্গের কোনো বনের মতন রূপসি করে তোলে, তখনকার সন্ধে?

না।

মুলারীদিদি সেই মাঘিসন্ধের মতন সুন্দর।

ও।

ও কেন? বাঃ নয় কেন?

গণেশ আমাকে আরও চমকে দিয়ে বলল।

আমি বললাম, বাঃ।

তুমি বৈশাখী পূর্ণিমাতে বনে বনে ঘুরেছ কখনও? যখন শাল ফুল, করৌঞ্জ আর মহুয়ার গন্ধে আর চাঁদের আলোতে জিন-পরীরা খেলা করে আলো ছায়ার গালচের উপর।

না।

মুলারীদিদি সেই বৈশাখী পূর্ণিমার রাতের মতন সুন্দর।

এবারে আমি বললাম, সাবধানেই বললাম, বাঃ।

তারপর অনেকক্ষণ আমি স্তব্ধ হয়ে হাঁটতে লাগলাম সেই গণেশ নামক কিশোরটির পাশে পাশে। অদেখা মুলারীবাই-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তো বটেই, গণেশের কবিত্বতেও কম মুগ্ধ হয়ে নয়।

ভাবছিলাম, গণেশের মতনই, অনেকেই বোধহয় কবিতা সঙ্গে নিয়েই জন্মায়, আর কিছুটা পায় পরিবেশ প্রতিবেশ থেকে। কাব্যিক, কাব্য না পড়েও হওয়া যায়, প্রকৃতি-পাঠ করেই।

একটা ছোটো টিলা পেরিয়ে একটা নালা পেরোলাম আমরা। নালাটা পেরোতে পেরোতে জিজ্ঞেস করলাম গণেশকে, এই নালাটির নাম কি?

তালিয়াপানি।

বাঃ।

গণেশ, মনে হল, আমার মুখের দিকে চাইল। মুখ তুলল একবার। কথা বলল না।

একটু পরে ওকে বললাম, আচ্ছা গণেশ, তোমাদের মানে, পানকাদের গন্দরা ছোটো চোখে দেখে কেন? অথচ আমার তো মনে হয় তোমরা সত্যিই খুব বড়ো জাত।

ওদের নজরই ছোটো, তাই।

তারপরই বলল, তবে অবশ্য ব্যাপার একটা ঘটেছিল। তাও অনেকদিন আগে।

কবে?

সে কী আমি জানি। গাণ্ডানানার কাছে শুনেছি আমরা। কশো বছর আগে তা কি গাণ্ডানানাও জানে।

কোন গাণ্ডা? গাণ্ডা গোন্দ?

হ্যাঁতো। সেই মানুষটা সকলেরই নানা। তার কাছে সবাই সমান। কোনো ভেদ নেই, মেয়ে-মরদ, বাইগা-পানকা, সব গোন্দ-মারিয়ারই একামামা সে।

হ্যাঁ। গাণ্ডা গোন্দকে আমি জানি: তা ঘটনাটা কি তা শুনি।

এক পানকা যুদ্ধ করতে গেছিল।

বলেই, গণেশ থেমে গেল।

তারপর?

তারপর আর কি? যুদ্ধ যেখানে হচ্ছে সেখানে পৌঁছোবার আগেই তার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল এক ব্যাঙের।

তারপর?

ব্যাঙ দেখেই তো সে পানকা কুপোকাত। দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে সেঁধোল।

তারপর?

তারপর আর কি? যে ব্যাঙ দেখে ভয় পেয়ে বাড়িতে পালায় তাকে বা তার বংশধরদের আর কে খাতির করে। আমাদের কোনো নচ্ছার পূর্বপুরুষের জন্যে আমাদের আজও বদনামের ভাগী হতে হয়। কিন্তু হতে কি হয়? পানকার মধ্যেও সবাই কি আর সমান? আমরা হলাম গিয়ে বাঘ-পানকা। পানকাদের যে অনেকই রকম হয় তা তো তুমি জানোই।

হ্যাঁ। তা অবশ্য জানি। এ কদিনে সেটুকু জেনেছি।

জঙ্গলের বাঘের জ্ঞাতি আমরা। বাঘেদের থেকে আমাদের কোনোই ভয় নেই বলে গন্দ-বাইগা সকলেই আমাদেরই সঙ্গে নিয়ে ঘন বনে ঢুকতে চায়। কারণ, ওরা জানে, আমরা সঙ্গে থাকলে বাঘের থেকে ওদেরও কোনো ভয় নেই। লেবিনসাহেব সে কথা জানে বলেই তো আমাকে পাঠাল বন্দুকধারী তোমার সঙ্গে, যাতে দিনে দিনে ঝিকারপানির পাহাড় অবধি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি। যাতে নানকুরির গোলাইতে তুমি পথ না হারাও।

বলেই বলল, কি বুঝলে?

মানে, লেবিনসাহেবও এই বাঘ-বাইগাদের মানেন।

বুঝেছ তাহলে ঠিকই।

তারপরই আমি বললাম, কিন্তু আমি বুঝছি না, ঝিকারপানির বাঘ থেকে এই দুপুরবেলায় আমার কিসের ভয়? তাছাড়া, আমার সঙ্গে তো বন্দুকও আছে।

তুমি জানো না? সেই খবরই তুমি জানো না?

না তো! কি?

কালকে দুপুর তিন প্রহরের সময়েই গণিয়া বস্তির ঘাসিরাম পোর্তেকে যে পাহাড়ের নিচে বড়ো বাঘে ধরেছে। আজই না সকালে তার একটা গোড়ালিসুদ্ধু পায়ের পাতাকে খুঁজে পেতে এনে মাট্রিনালার পরের জঙ্গলে গোড় দিয়েছে বস্তির লোকেরা। দাহ করাই উচিত ছিল। কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু তো! অগত্যা।

ছায়াতে শুয়েছিল বাঘেরা। জোড়াতে ছিল। না জেনে প্রায় তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিল।

ঘাসিরাম পোর্তে? মানে, গণিয়া বস্তির মুখিয়া চৈতুরামের কেউ হয় নাকি?

হ্যাঁতো। ঘাসিরাম, চৈতুরাম পোর্তেরই বড়ো ছেলে।

বল কি তুমি। ছেলেটাকে যে আমি চিনতাম। প্রায় সারাদিন সেদিন কাটিয়েছিলাম ওদের বস্তিতে।

তা চিনতেও পারো। আমিও তো চিনতাম। তা, তোমার এবং আমার দুজনেরই চেনা বলেই কি বাঘ তাকে ছেড়ে দেবে?

মিঞা-বিবি একটু নিরিবিলিতে শুয়ে আছে, লজ্জা বলেও কি মানুষটার কিছু ছিল না? বেশরম মানুষে দুনিয়াটার ভরে যাচ্ছে দিনকে দিন।

আমার মনে হল এই গণেশ পানকা ছেলেটা হয় প্রচন্ড এঁচড়ে পাকা, নয় ও কারও কপিক্যাট। নইলে ওই বয়সি ছেলের পক্ষে এমন করে কথা বলা অসম্ভব।

গণেশ আবার বলল, বাঘ ছাড়বেই বা কেন? তুমিও যদি সেই ভুলই করো তাহলে.....।

তারপরই বলল, তুমি তো আর ডুডু ডাকেরার মতন কুষ্ঠরোগী নও।

সে আবার কে?

গণেশ বলল, আরে তুমি কদিন এখানে এসেই কি আমাদের সম্বন্ধে সবই জেনে যাবে?

ভাবছিলাম, বাঘ-পানকা গণেশ মাত্র দশবছর বয়সেই যদি এত বিষয়ে এত কিছু জানে তাহলে সেই অনুপাতে তিন মাসে তো আমি কিছুই শিখিনি।

তা, লেবিনসাহেব তো আমাকে এসবের কিছুই বললেন না।

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম।

কিসের কি বলবেন?

বাঘের মানুষ নেওয়া কথা। ঘাসিরাম পোর্তের কথা।

সে আবার খবর কিসের। সাহেবের গোয়ালঘরে বুধনি গাই গতকাল সকালে যে লাল বাছুরটি বিইয়েছে তার যে তিন তিনটি কান সে খবরও কি সাহেব তোমাকে দিয়েছে? যে সে তিনগুণ শুনছে? সে কথা?

না তা অবশ্য বলেননি।

তবে।

তারপর বলল, তবে সাহেব অবশ্য আমাকে না-পাঠালেই পারত।

কেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কেন না, তোমার কাঁধে বন্দুক রয়েছে তো! বন্দুক, বাঘে ঠিকই চেনে। সে তোমাকে দেখেই দূর থেকে সরে পড়বে।

আমি আর গণেশকে বলতে পারলাম না যে বাঘও হয়তো বন্দুক চেনে আর বন্দুকও হয়তো বাঘ চেনে কিন্তু আমাকে তো দুজনের কেউই তেমন চেনে না। লেবিনসাহেব জেনেশুনেও আমাকে যে বাঘের খাদ্য করতে চাননি, তা ভালো।

গণেশ বলল, যাকগে বাঘ- পানকা ডাকেরা পানকার নাতি, দুধ পানকার বেটা গণেশ তোমার সঙ্গে আছে, তোমার কোনোই ভয় নেই। নানকুরি গাছেদের গোলাইয়ে পৌঁছেই তোমাকে যে পথ দেখিয়ে দেব, তা ধরে তুমি চলে গেলে মনিয়ারি কৈরাহা পাবে। তারপর সেই নদীর বুক ধরে এঁকেবেঁকে বাঁয়ে চলে গেলেই দু মাইল পরে আঁওলাটিলা। তারপর তো চিনতে অসুবিধেই নেই। ওদিকে তো তোমায় রোজই যাতায়াত করতে হয়। কি? হাঁতো?

তুমি আঁওলাটিলাও চেনো নাকি?

অবাক হয়ে বললাম আমি, গণেশকে।

চিনব না! আমি সবই চিনি।

তুমি এদিকেও আসো?

আরও আশ্চর্য হয়ে বললাম।

আসব না। বাঃ রে।

কেন আসবে?

মাঝে মাঝেই তো আসি। ইচ্ছে হলেই আসি।

তারপর উলটে আমাকে প্রশ্ন করল দশরথ নানাকে চেনো তুমি? গামহারগাঁও বাজারের?

হ্যাঁ। চিনি বইকী।

কৌশল্যা চাচিকে চেনো?

হ্যাঁ। তাকেও চিনি।

মনে মনে বললাম, ভালো করেই চিনি।

কৌশল্যা চাচি আমার নিজের চাচি ছিল। চাচা ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করল সিলপিরির ফুলমাতীয়া মাসিকে।

তারপরই আমাকে জিজ্ঞেস করল, ডুংগা কেমন আছে?

কে ডুংগা?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

আহা। আমার চাচেরা ভাই, কৌশল্যা চাচির পুঁচকে ছেলে।

সে-ও।

আমি বললাম।

তারপর বললাম, ভালোই আছে। খুবই ভালো।

খাওয়াদাওয়া ঠিকমতন করে? ভারী বায়নাবাজ ছিল।

তা করে। এখানে বায়না করবে কার কাছে? করলেই মার খায় যে! কিন্তু দুধ বা অন্য খাবারের চেয়ে বেশি খায় ধুলোই।

আমি বললাম।

হ্যাঁ। আগেও তাই খেত। ওর পেটে একদিন পিপ্পল গাছ গজাবে। ওর নাম দিয়েছিলাম আমি মিট্টিবাবা। দেখবে, ও বুড়ো হলে মিট্টিবাবার নামে মন্দির হবে অমরকণ্টকে। কে যে এই দুনিয়াতে কোন ভেক ধরে আসে তা কে জানে!

দশ বছরের গণেশের দার্শনিকতাতে হতবাক হয়ে গেলাম আমি।

কী করে যে চড়াই-উতরাই পাহাড় উপত্যকাময় পথে হাঁটতে হাঁটতে দু ঘন্টা সময় কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। কত পাকদণ্ডী পথ একে অন্যের উপরে আঁকিবুঁকি কেটে গেছে। কোনোটা সম্বর হরিণের পথ, কোনোটা গাউরের, কোনোটা শুয়োরের দলের। কোনো পথ দিয়ে আবার সকলেই চলে, মানুষ সুদ্ধু। গণেশের সব নখদর্পণে। একবার থেমেও দাঁড়াতে হল না। একসময়ে দেখলাম সত্যিই তিনটি প্রকাণ্ড এবং অদ্ভুতদর্শন গাছ, যাদের নাম গণেশ পানকা বলল, নানকুড়ি, এক ঝাঁক গামহার-ওর মধ্যে।

সত্যিই। গণেশ সঙ্গে না থাকলে রাস্তা ভুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

আমেরিকান কবি ROBERT FROST-এর কবিতা পড়েছিলাম, সেই কবিতাটির কথা মনে পড়ে গেল। জানি না, নির্ভুল মনে আছে কি না!

"The woods are lovely, silent and deep
I have miles to go, miles to go
And promises to keep"

নেহরু সাহেবের প্রিয় এই কবিতাই ফটকে পছন্দ করত বেশি। আমার কিন্তু "The Road Not Taken" ই অনেক বেশি ভালো লাগত।

মনে মনে বললাম, হায়রে ফটকে! তুই যদি সত্যিই জানতিস "Woods are lovely, silent and deep"এই বাক্যবন্ধটির প্রকৃত তাৎপর্য।

এমন এমন জায়গাতে যার আসার সৌভাগ্যই না হল জীবনে তার কবিতা পড়ে লাভ কি? কবিতা আর প্রকৃতি সমার্থক। প্রকৃতির বুকের মধ্যে এমন এক হঠাৎ সুযোগ এসে না পড়লে আমিই কি ছাই কোনোদিনও এই গভীর কিন্তু সরল সত্যটি জানতে পারতাম।

পেছন ফিরে ওকে কিছু বলব ভাবলাম। কিন্তু সে অদৃশ্য। খুবই আশ্চর্য হলাম। যাওয়ার সময়ে বিদায় নিয়েও গেল না। আমাকে একটু ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ দিল না। অবাক কাণ্ড তো। ছেলেটা কি উবে গেল!

দাঁড়িয়ে পড়ে আমি পেছনে ও পাশে, দু পাশেই ভালো করে দেখলাম। নাঃ। কোনো চিহ্ন নেই।

ভাবছিলাম, এরা জঙ্গলের মানুষ, জঙ্গলের প্রাণীরই মতন ওদের গতি-প্রকৃতি। দেখা যখন না দিতে চায় তখন তাদের দেখা পায় এমন সাধ্য কার?

আমি গামহারগাঁওতে পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধে নামবে যেমন, গণেশও যখন লেবিনসাহেবের আসিবিসি গ্রামে ফিরে যাবে, তখনও সন্ধে নেমেই যাবে সেখানেও। সে বাঘ-পানকা হতে পারে কিন্তু বিন্ধ্য পর্বতমালার মধ্যে এই নিবিড় অন্ধ জঙ্গলের আর পাহাড়ের নীল-সবুজ-পাটকিলে-লাল ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মধ্যে তো শুধুমাত্র বাঘই থাকে না। আরও কতরকম বিপজ্জনক প্রাণী, সাপ, ওদের ভয়ের নানারকম ভূতপ্রেতও থাকে। ছেলেটির কি ভয় ডর বলেও কিছু নেই? দোনলা বন্দুক হাতে পূর্ণ যুবক আমি ভয়ে কেঁপে যাই আর ওই অতটুকু ছেলের হাতে তো একটি পাচন বাড়ি পর্যন্ত নেই।

মনিয়ারি কৈরাহার পাশে পাশে আঁওলাটিলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম আমি, যে গামহারগাঁও-এর আমার এই চাকরিটা নিছক কোনো চাকরি নয়। বাগবাজারের টোটা বোস এর জীবনে এ এক মস্ত বড়ো টার্নিং-পয়েন্ট। নানকুরি গাছেদের গোলাইয়ে পথ ভুললে যেমন পথিক পথভ্রষ্ট হয়ে প্রচণ্ড বিপদে পড়তে পারে, মানুষের জীবনের পথেও তেমনই বহু অদৃশ্য গোলাই থাকে। তার একটিতে ভুল পথে গেলেও জীবনের জঙ্গলেও সে চিরভ্রষ্ট হতে পারে।

মনিয়ারি কৈরাহার বুক ধরে যখন হেঁটে যাচ্ছি দেখি নদীর গা থেকে যে একটা মস্ত কুসুম গাছ উঠেছে তার গায়ে ফালা-ফালা করে বাঘ নখ আঁচড়েছে। দুখু বাইগা অচানকমারের জঙ্গলের একটা গামহার গাছে এইরকম আঁচড় দেখিয়ে চিনিয়ে দিয়েছিল। পেছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে বাঘেরা নাকি এমন করেই তাদের নখে ধার দেয়। সেই কুসুম গাছেরই নিচে বাঘ ও বাঘিনির পায়ের রীতিমতন শোভাযাত্রা করে যাওয়ার দাগ দেখলাম নদীর সাদা বালির উপরে। অন্ধকারও হয়ে আসছে। সেই জায়গা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাওয়াই ভালো ভেবে, জোরে পা চালালাম।

এই কুসুম গাছ এখানে আসার আগে কখনও দেখিনি।

কলকাতার বাগবাজারে কুসুমগাছ দেখবই বা কি করে। কলকাতাতে চিড়িয়াখানায় আর শিবপুরের বটানিকাল গার্ডেনের বহু গাছগাছালি আছে বলে যদিও শুনেছি। কিন্তু সেখানেই বা গেছি কবে? তাছাড়া, গেলেও চিনিয়েই বা দিত কে? বটানিকাল গার্ডেনে তো একদিনও যাইনি। চিড়িয়াখানাতে বাবা নিয়ে গেছিলেন একবারই আমার দশ বছরের জন্মদিনে। তবে সেখানে হাতি জিরাফ জলহস্তী ময়ূর এসবই দেখেছিলাম, নানারকম সাপ আর কুমির। গাছ দেখতেও আবার কেউ চিড়িয়াখানাতে যায়? অথচ আজ বুঝতে পারছি যে শুধু চিড়িয়াখানাতেই বা কেন? যেখানেই গাছগাছালি আছে সেখানেই ইচ্ছে থাকলে গাছ চেনা যায়। চেনার ইচ্ছে থাকলে চিনিয়ে দেবার লোকের অভাব হয় না।

এই ছত্তিশগড়ের মারুতি পানকা যে কমমিষ্টি জ্যোতি বসুকে স্বাদু মিষ্টি বলে গণ্য করে, সেই তো এই কুসুমগাছ চিনিয়েছিল আমায়। বলেছিল, তোমাদের কলকাতার চিড়িয়াখানাতে এই গাছ আছে।

এখন আর নতুন ফিনফিনে পাতারা মাছের কানকোর মতন লাল নেই। চিকন সবুজ হয়েছে। কীরকম যে সবুজ তা ঠিক বোঝাতে পারব না। আমাদের পাড়ার জলসাতে আলপনা ব্যানার্জি একটা শাড়ি পরে এসেছিলেন, তার রং ঠিক এই রকম সবুজ। অনেকটা কচি-কলাপাতার মতন সবুজ।

সবুজকে আগে তো শুধু সবুজ বলেই জানতাম। লালকেও লালই। হলুদকে হলুদ। কিন্তু প্রত্যেক রঙেরই যে এতরকম হয়, তা কি এখানে না এলে জানতে পেতাম। লালের মধ্যেও যে গেরুয়া বা ভগুয়া লাল হয়, আবার গেরুয়ার মধ্যেও যে বুদ্ধবাদী, শাক্ত, বৈষ্ণব এবং লালধর্মীও হয় এসব তো এখানে না এলে কোনোদিনও জানতেই পেতাম না।

নদীর খাত থেকে যেই পাড়ে উঠেছি, কে যেন বাঁশিতে ডাকল আমাকে। সে বাঁশি কোনো মানুষের বাঁশি নয়। সে বাঁশি বাজাচ্ছিল আকাশ, বাতাস, মনিয়ারি কৈরাহার রুখুশুখু বুক, ঊর্ধ্ববাহু পর্ণমোচী গাছেদের অগণ্য শুকনো ডালপালা আর যেসব গাছে পাতা আছে অথবা নতুন পাতা এসেছে কুসুম গাছেরই মতন, সেই সব গাছের পাতারা।

একটা জোর হাওয়া আসতে লাগল, বাঁশি বাজিয়ে শি শি করে আমার পেছন থেকে। কতদূর থেকে, পশ্চিমঘাটের কোন দুর্গম সিঙ্গার আর পরিখা ছুঁয়ে আসছে সে হাওয়া তা কে জানে। ভাবলেও রোমাঞ্চ হচ্ছিল। সেই হাওয়াতে ঘাস পাতা ফুল সব আন্দোলিত হতে লাগল ঝুরো-বালি, মাটি, ও বহুবর্ণ শুকনো পাতারা বুক ঘষটে ঘষটে এগিয়ে যেতে যেতে এক অশ্রুতপূর্ব ঐকতান বাজাতে লাগল আর ঠিক সেই সময়েই হাজার হাজার অদৃশ্য পাহাড়ি ঝিঁঝি যেন কারো অদৃশ্য হাতে-টেপা সুইচে একসঙ্গে করতাল বাজাতে লাগল শুদ্ধ গান্ধারে। সেই সকাল থেকে বয়ে যাওয়া গরম, গায়ে ছ্যাঁকা-দেওয়া "লু" যেন হঠাৎই কোনো মন্ত্রবলে ঠান্ডা মেরে গেল। এই ক-মাস ধরে যত জ্বালা যত তাপ, যত কাম এই পাহাড়ে, জঙ্গলে, পাথরে বালিতে গাছগাছালিতে, শিলাজতুতে পুঞ্জীভূত হয়েছিল সব যেন এক মিলনের তীব্রতম কামনাতে উন্মুখ উৎসুক, উৎকর্ণ হয়ে উঠল। এবং তারপরই দূরাগত মেইল ট্রেনের মতন হাওয়াটা প্রথম বৃষ্টির আভাসকে পাইলটিং করে নিয়ে এল। বাষ্পীভূত জলকে। আর তারপরই এল জলকণাবাহী বৃষ্টি। অচেনা, পরদেশি, গন্ধমাতাল বৃষ্টির মেইল ট্রেনইটা হই হই করে চলে এল কোনো স্টেশনেই না-দাঁড়িয়ে। আমার স্টেশনেও সে দাঁড়াল না। কোন অচেনা দেশে গিয়ে সে থামবে তা সে নিজেই জানে। অবশেষে এই মনিয়ারি কৈরাহা আর মাট্টিনালা আর অচানকমার, লমনি, ইসিবিসি, আর গামহারগাঁও-এর দেশে, সিলপিরি, পাকারিপানি, চমমকটোলা, লুদ্রা তালিয়াপানির ছত্তিশগড়ে বৃষ্টি এল।

বৃষ্টি এল।

বৃষ্টি এল কামার্ত যুবকের মতন।

তার দাড়িকামানোর প্রথমদিন থেকে যত কাম সে তার দু উরুর মধ্যে জমিয়ে রেখেছিল সেই সব কাম অমরকণ্টকের দুধধারা হয়ে শায়িত প্রকৃতির সর্বাঙ্গ যেন মুহূর্তের মধ্যে ভিজিয়ে দিল, পরম এবং তীব্র আশ্লেষে। আর বাগবাজারের ক্যাবলাচূড়ামণি এই অধম টৌটা বোস, বন্দুক-কাঁধে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে সেই মহতী, সুগন্ধি, অর্ধনারীশ্বরের আধখানির সঙ্গে অন্য আধখানির সার্বিক সঙ্গমে সাক্ষী হয়ে রইল। মন আমার আনন্দে কেঁদে উঠল। না বলেই বলে উঠল, "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।"

ভাবছিলাম, এত সৌন্দর্য, এত মহান মিলন ও বিরহ, সৃষ্টির এত বৈচিত্র্য, বিনাশের এত অভিনবত্ব পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে?

বৃষ্টি আমার সারা শরীরকে চুপচুপে করে ভিজিয়ে দিল আর তারই সঙ্গে দিগন্ত জুড়ে মেঘের গুরু গুরু গুরু শুরু হল। কত হাজার হাজার মাদল আর ধামসা আর টুমা, আদিমতম আদিবাসীদের সৃষ্টিশীল ও প্রলয়ংকারী লক্ষ হাত যে একই সঙ্গে বাজাতে লাগল, কখনও 'যৎ'-এ কখনও বা কীর্তনাঙ্গ গানের কোনো নাম না জানা সুকঠিন তালে যে কী বলব।

ঠিক সেই সময়ই কোথা থেকে একটি মস্ত দল, চিত্রল হরিণের, দৌড়ে এসে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মানিয়ারি কৈরাহার বুকে ছুটোছুটি করে পরমানন্দে খেলতে লাগল। শিঙালেরা শিঙে শিঙে খটাখট আওয়াজ তুলে ছেলেদের মিছিমিছি লাঠিখেলার মতন এক উত্তাল খেলাতে মাতল। চারদিক দিয়ে তিতির আর বটের আর কালি-তিতিরে চিঁহা চিঁহা চিঁহা করে ডেকে উঠল, ময়ূরময়ূরীরা কেঁয়া কেঁয়া শব্দ করে বনরাজের অদৃশ্য প্রাসাদের ঘন গহনের অশ্রুত নূপুরের শব্দে তমাল আর কদম গাছ থেকে বর্ষাবরণের তীব্র আনন্দে অধীর হয়ে তাদের তীব্র-তীক্ষ্ণ আর্তি দিকে-দিগন্তরে ছড়িয়ে দিল। একদল চন্দনা শন শন শব্দ করে মনিয়ারি কৈরাহার উপর দিয়ে গামহারগাঁও-এর দিকে উড়ে গেল। শম্বরের দল ঝিকারপানি পাহাড়ের পায়ের নিচের গভীর খাদের মধ্যে জঙ্গলের কোরকের শুকনো কিন্তু ছায়াছন্ন নালা থেকে ডেকে উঠল পৌনপুণিক, সংক্ষিপ্ত ধাতব শব্দ করে। ঝিকারপানি পাহাড়ে যে এত প্রপাত, এত শুকনো জলধারার ভ্রূণ লুকিয়ে ছিল তা লক্ষ্যও করিনি এতদিন।

বৃষ্টি হয়েই চলল। তার বেগ ক্রমশ বাড়তেই লাগল। দশদিক এই বিকেলেই এমন অন্ধকার করে এল যে, মনে হল রাতই বুঝি নেমে এসেছে। পাহাড় থেকে ক্ষীণ কিন্তু অজস্র ধারে জলরেখা এসে মনিয়ারী কৈরাহার বুকে মিলেছিল। নদীধারা বেয়ে জল নামতে। এখনও অনেক দেরি। তৃষিতা শঙ্খিনী সর্পিণীর মতন বালিরেখা সেই বৃষ্টিজাত প্রাথমিক আর্দ্রতা এবং জল শুষে নিল। তবে এতদিনের রুক্ষতা নদীকে যে বৈধব্যর সাদা পোশাক পরিয়েছিল তা এখন জল পেয়ে কোমল নরম মসৃণ এক মৃদু খয়েরিতে আভাসিত হল।

এমন সময়ে ঝিকারপানির বাঘ এবং বাঘিনি একইসঙ্গে ডেকে উঠল। তারাও হয়তো সঙ্গমে মেতেছে। আজ সঙ্গমেরই দিন।

হায় মুলারী। মুলারীবাই। তুমি কোথায়? কবে দেখা দেবে তুমি? এমন নির্জন, আদিগন্ত, প্রাকৃত,আদিম প্রকৃতির মধ্যে যখন পৃথিবী বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গম করছে তখন তুমি যদি থাকতে। আমার সঙ্গে, প্রমাণ দিতে তোমার ভালোবাসার! যদি থাকতে, তবে কী যে হত! কী যে হত তা আমি ভাবতেও পারি না।

আমি যে পুরোপুরিই অনভিজ্ঞ। আমি একটা রিয়্যাল রয়্যাল থার্ড-ক্লাস।

যখন ভাণ্ডারে পৌঁছলাম অবশেষে দু প্রহর রাতে, দুবার পথ হারিয়ে, পাঁচবার হোঁচট খেয়ে, তখন বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু সারা আকাশ জুড়ে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সে এক অকল্পনীয় আশ্চর্য দৃশ্য। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অথচ কোনো শব্দ নেই। একটুও শব্দ নেই। কে যেন অদৃশ্য হাতে কয়েক কোটি পাওয়ারের বৈদ্যুতিক হালকা নীলচে ডে-লাইট বাল্বের আলোকে পঞ্চাশ একশো স্কোয়ার মাইল এলাকার আকাশে সমান ভাবে বণ্টন করে প্রতি পলে একবার করে সুইচ টিপছেন আর সুইচ নেভাচ্ছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদ শাগির্দকে 'কণ'-এর একও নয়, আধও নয়, সিকি যেভাবে লাগাতে শেখান কোনো অদৃশ্য আলোকসম্পাতক যেন তেমন করে সিকি পাওয়ারের আলো, সিকি সেকেন্ড জ্বালিয়ে রেখেই পরক্ষণেই নিভিয়ে দিয়ে সিকি সেকেন্ড পরে আবারও জ্বালাচ্ছেন।

যখন এ ঘর সে ঘরের পাশ দিয়ে কুয়োতলির ধার ঘেঁষে সপসপে হয়ে ভিজে, ভাণ্ডারে উঠলাম তখন দেখি মারুতি আর গাণ্ডা গোঁন্দ একটু আগুন করে ভাণ্ডারের বারান্দাতে বসে আছে আর জিগারি টিয়াপাখির ঠোঁটের মতন টুকটুকে একটি লাল শাড়ি আর দাঁড়কাকের গায়ের রঙের মতন উজ্জ্বল কালো ব্লাউজ পরে তার দু হাতের রুপোর মকরবালা নেড়ে নেড়ে কলকল করে কথা বলছে। হ্যাজাক জ্বলছে বারান্দার কাপড়-শুকনো লম্বা কণ্টা-বাঁশটার কোণ থেকে।

ওই অন্ধকার, ভেজা জঙ্গলে এতখানি পথ হেঁটে এসে, ভাণ্ডারের বারান্দার হ্যাজাকের আলোতে জিগারিকে যেন রঙ আর আলোর যুগলবন্দি বলে মনে হচ্ছে। জিগারির এই নবরূপে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি।

আর ওদের সামনে পড়ে আছে কী একটা মস্ত সাপ। হলদেটে-সবুজাভ রঙের।

ওরা সকলে আমাকে দেখে একইসঙ্গে হই হই করে উঠল।

বলল, কী যে কর। মহা বে-আক্কেলে লোক যা হোক! গামহারগাঁওতে এখুনি ফাগগুকে পাঠিয়েছি, হ্যাজাক নিয়ে তোমাকে খোঁজার জন্যে লোকজন জড়ো করে আনতে।

কেন?

আমি বললাম।

মারুতি রেগে বলল, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? প্রথম বৃষ্টি। তার উপরে জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে কোথায় যে হারালে। কতরকম খতরা যে আছে এই প্রথম বৃষ্টি-নামা রাতের জঙ্গলে সে সম্বন্ধে তোমার কি কোনো ধারণা আছে? ওই দ্যাখো। এই শঙ্খচূড় তো গাণ্ডা নানাকে তাড়া করে আমাদের ভাণ্ডার অবধি ধেয়ে এসেছিল। আর এর ছোবল, মাথায় ছোবল। কামড়ালে আর বাঁচে না কেউই। কেউই নয়।

আমি অপরাধীর মতন বললাম, ইস। বন্দুকটা আমারই সঙ্গে ছিল। আমি থাকলে ওটাকে মারতে পারতাম।

এই কথাতে ওরা সকলে হেসে উঠল একসঙ্গে।

জিগারি তাচ্ছিল্যের গলাতে বলল, ফুঃ। বন্দুক থাকলেই যেন আপনি মারতে পারতেন তেড়ে আসা শঙ্খচূড়কে। সে মূর্তি যে কেমন হয় সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে?

বললাম, আমার কথা ছাড়ো। মোহিনী বা ভীষণা কোনো কিছুর ধারণাই তো আমার নেই। মুলারীবাইকেও তো আজ অবধি দেখিনি। তাড়া করে আসা শঙ্খচূড়কে না দেখলেও কিছু হবে না।

আমার কথাতে ওরা সকলে মিলে হই হই করে হেসে উঠল।

জিগারি বলল, বাবুটা রসিক আছে।

ছিল না। তোদের পাল্লায় পড়েই হচ্ছে আস্তে আস্তে।

গাণ্ডা গোন্দ বলল।

তারপর বলল, তা মুলারীকে তো দেখলেই হয়। সে তো আজও তোমারই কথা জিজ্ঞেস করছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

তাই? তোমাকে?

অবিশ্বাসী গলাতে বললাম আমি।

তাই তো। আমি তো ছিরহট গ্রাম থেকেই আসছি আজ।

তাই? তা কখন এসে পৌঁছোলে?

বৃষ্টি নামার আগে আগেই। আজ যা গরম গেছে সারাটা দিন।

সাপ তাড়া করল কখন?

হাঃ। মারুতির তাপ্পির কথা ছাড়ো। শঙ্খচূড়ে তাড়া করলে কারো পক্ষে বেঁচে আসা কি সম্ভব? তাড়া করেনি। ওই উপরের গুহাতে ছিল। গুহাতে জল-ঢোকাতে ও তড়িঘড়ি নেমে আসে।

তারপর?

উত্তেজিত গলাতে বললাম আমি।

তারপর বললাম, তুমি তো সেদিন রাতে ওইখানেই শুয়েছিল। আমিও তো কতক্ষণ গল্প করেছিলাম সেই রাতে তোমার সঙ্গে ঐখানেই বসে।

তাকে কি? গুহাটা তো আমার তোমার বাবার সম্পত্তি নয়। এই পৃথিবীতে সাপটারও যতটুকু অধিকার আমার তোমার তার চেয়ে বেশি অধিকার একটুও নয়। তাছাড়া, আমরা প্রায় জীবনভরই সাপের মাথারই উপরে বসে থাকি। জানতে পারি না কেবল, তাই!

তাই যদি হবে, তবে তাকে মারলেই বা কেন? আর মারলেই বা কি করে? বন্দুকটা তো আমার কাছেই ছিল।

হাঃ। এখানের কজন মানুষের বন্দুক আছে? তারা কি সাপ মারে না?

কে মারল? তুমি, গাণ্ডানানা?

নাঃ।

তবে? মারুতি, তুমি?

মারুতিও বলল, নাঃ।

তবে?

জিগারি মেরেছে।

জিগারি! কী দিয়ে মারল?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

ওই।

তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ওই চ্যালা কাঠটা দিয়ে। আজই বিকেলে বৃষ্টির আগে ফাগগু চেলা করেছিল। রান্নার কাঠ ফুরিয়ে গেছে বলে। তা ঘরে তোলার আগেই তো বৃষ্টি এল। তুলতেও পারেনি।

ভাগ্যিস।

বাঃ বাঃ। তুমি তো খুব সাহসী জিগারি।

আমি সপ্রংশস চোখে চেয়ে বললাম।

সাহসী হতে পারি টোটাবাবু কিন্তু তোমার মতন সংযমী মহৎ মানুষ তো আর কোনোদিনও হতে পারব না।

কেন? হঠাৎ এ কথা?

আমি সেই ভিজে জামাকাপড়ে কাঁধে বন্দুক-ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে সঙ-এর মতন বললাম।

মুলারীদিদি বলছিল।

মুলারীদিদি! অবাক করলে তুমি। যাকে দেখলামই না এখনও। সে আবার কী বলছিল?

বলছিল, আমি যাদের দেখে ভুঁরু কোঁচকাই, যাদের দুচোখে দেখতে পারি না, তারাই আমার পেছনে ফেউ-এর মতন লেগে থাকে আর যে মানুষের স্বপ্নে আমি বিভোর, আজ তিনমাসে তারই সময় হল না আমাকে একবার চোখের দেখা দেখে যাবার।

আমি কিছু বলার আগেই গাণ্ডানানা বলল, একেবারে বিয়ের দিনই দেখলেই তো হয়। তাড়া কিসের?

জিগারি খুব জোরে হেসে উঠল।

বলল, একবারেই জোড়িদার? অদলবদলই হোক আগে।

মারুতিও হাসল জিগারির কথা শুনে।

আমার খুব খিদে পেয়েছিল। রাগও হচ্ছিল। আমি কি এই জঙ্গলের অশিক্ষিত, আনপাড়

মানুষগুলোর লাফিংস্টক? কী ভেবেছে ওরা? ক্যালকাটা ঊ্যনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট আমি। আমি যে ওদের সঙ্গে কথা বলি, এই তো যথেষ্ট।

ওদের এত কথা বলে লাভ ছিল না। বুঝতও না। তাই মারুতিকে বললাম, খুব খিদে পেয়েছে। বুঝলে।

মারুতি বলল, জামাকাপড় ছাড়ো, চান করে এসো কুয়োতলি থেকে। ঠান্ডা বসে যাবে। মৌসমের প্রথম বৃষ্টি।

চান? কেন? এই ঠান্ডাতে।

এই প্রথম বৃষ্টিতে চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের সব ময়লা কুচলাও নেমে আসে নিচে। তোমার গা-মাথা সব সেই সব খতরনাক জিনিসে ভরা। চান করে, শুকনো জামাকাপড় পরো। তারপর ফাগগুকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। সে খিচুড়ি চাপিয়েই গেছে। জিগারিদেরও খিদে পেয়েছে খুবই। ছিরহট তো আর কম পথ নয়। গাগুা নানা আর ও এই গরমে হেঁটে এসেছে। তুমি তো দুনিয়াকে ঠান্ডা করে নিজেও ঠান্ডা হয়ে এলে।

বললাম, এখান থেকে ছিরহট কতদুর?

জিগারি হাসতে হাসতেই বলল, ছিরহট থেকে গামহারগাঁও যতখানি দূর, গামহারগাঁও থেকে ছিরহটও ঠিক ততখানিই দূর। দূরের আসল হিসাব হচ্ছে মনের দূরত্ব। তুমিই বলোতো টোটাবাবু, কত দূর?

বলেই, আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

তারপর হাসি থামিয়ে বলল, বললাম না, ওসব মাইল দিয়ে মাপা দূরত্ব, দূরত্ব নয় টোটাবাবু। দিল এর সঙ্গে দিল মিললেই দু পা। মাইলের হিসেবে হাজার মাইল দুর হলেই বা কি হয়?

আবে। ওরা যে আমাকে একটুকুও গ্রাহ্যই করে না। সকলেই ভাবে, ইয়ার্কির পাত্র।

ভাবলাম আমি।

জিগারি বলল, যাই আমি, ফাগগুকে ডেকে নিয়ে আসি।

আরে আমার টর্চটা নিয়ে যা। অন্ধকারে যাস না। তার উপর প্রথম বৃষ্টি।

মারুতি বলল।

জিগারি এক ঝটকাতে উঠে দাঁড়িয়ে, বাঁ হাত দিয়ে তার শাড়ির আঁচলটা টেনে বুক ঢাকল।

আমি ভাবলাম, নতুন হাতঘড়ি কেনার পর ছেলেরা যেমন ঘন ঘন ঘড়ি দেখে, মেয়েরাও বুক প্রথমে যখন ফোটে, তখন বারবার বুক আঁচল দিয়ে ঢাকে অনভ্যস্ত গর্বিত হাতে। কতই বা বয়স হবে জিগারির! ভাবখানা যেন.....।

জিগারি বলল, কোন সাপে কাটবে আমায়? আমি যে নিজেই কালনাগিনি! তাছাড়া টর্চ আমি কখনই নিই না।

কেন?

দূর! দূর! কখন কি চোখে পড়ে যায়। অনেকদূর অবধি যায় তো আলো। আলো জিনিসটা ভালো যেমন, খারাপও খুব। খামোখা অন্যকে বিব্রত করে লাভ কি?

গাগুা বুড়ো স্নেহের ধমক দিয়ে বলল, কিছু কথাও জানে মেয়েটা! সত্যি।

তবুও মারুতি জোর করেই টর্চটা ওর হাতে গুঁজে দিল।

জিগারি চলে গেলে, গাগুা গোন্দ বলল, এমন মেয়ে কিন্তু হয় না মারুতি। ও যেন ঝরনা। ওর সঙ্গে যে ঘর বাঁধবে তার ঘর হবে হাসির বেড়ার, হাসির মেঝের, হাসির টালির। আমি কালই ওকে নিয়ে তোর মায়ের কাছে যাব দিনদৌরীতে। তার আগে ঘোটুল-এ যা। অদলবদল করেই দ্যাখ না। সেইখানে গোলমাল হলে তো মা কিছু করতে পারবে না।

ছাড়ো তো নানা! মাইনে পাই ক-টাকা? এখানে না খেতে টাকা লাগে না। মায়েরই চলে না। তার বিয়ে করব। যত্ত তোমার.......

জিগারির খরচ ও নিজেই চালিয়ে নেবে। জিগারি কি বসে থাকার মেয়ে? অনেকই গুণের মেয়ে। নইলে, মুলারীব মতন মেয়ে ওকে এত ভালোবাসে।

এই জোড়িদার আর অদলবদল শব্দ দুটোর মানে জানি না। জানতে হবে। ভাবছিলাম আমি।

ভাণ্ডারের ভিতর যেতে যেতে বললাম, কাল থেকে আর বন্দুকটা নিয়ে কোথাওই যাব না। এটা একটা বোঝা। কোনো কিছুকেই মারতে আমার ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করলেও হয়তো পারতাম না। আজই তো যখন বৃষ্টি নামল একটা মস্ত পাটকিলে রঙা খরগোশ দুটো বড়ো বড়ো কান উঁচিয়ে আমার সামনেই একটা করৌঞ্জ গাছের কাণ্ডর আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে মনিয়ারি কৈরাহাতে চিত্রল হরিণদের বৃষ্টির মধ্যের সেই খেলা দেখছিল। তার ভিজে কান দুটো থেকে বৃষ্টির জল গড়াচ্ছিল। আহা!

ইস মারলে না তুমি! খিচুড়ির সঙ্গে খরগোশের মাংস যা জমত না আজ এই ঠান্ডাতে।

গাণ্ডা নানা বলল।

খরগোশের মাংস কেমন খেতে?

মারুতি বলল।

মাটি মাটি গন্ধ থাকে। ভালই। সাহিলের মাংসও কিন্তু খেতে দারুণ। সাহিলএও মাটি-মাটি গন্ধ থাকে।

সাহিলটা কি জিনিস?

সাহিল জানো না? ওই যে গা-ময় কাঁটা থাকে বড়োবড়ো, সাদা সাদা। বিতিকিচ্ছিরি দেখতে। মনে হয় বনশুয়োরের ভায়রাভাই।

মারুতি হেসে উঠল, গাণ্ডা নানার কথা শুনে।

গাণ্ডা নানা আবার বলল, মারলে পারতে টোটাবাবু।

নাঃ, আমার দ্বারা হলো না। হবে না।

যে, খরগোশই মারতে পারে না সে মানুষ মারবে কি করে! বন্দুক আমরা ফেরতই দিয়ে দেব চুন্নুবাবুকে। নইলে বন্দুক চুরি গেলে আবার নতুন ফ্যাসাদে পড়বে।

বুদ্ধিমান মারুতি বলল।

তা ঠিক।

আমি বললাম।

তারপর বলল, আমাদের এই সব বনে জঙ্গলে যার কাছেই আইনমানা পাশী-বন্দুক আছে সব হ্যাপা তারই পোয়াতে হয়। নিজের প্রাণ বা ধন বা মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে একটিও গুলি করলে তোমার নিস্তার নেই। জেলে যেতে হবে। দারোগা-পুলিশ ছিঁড়ে খাবে। হাঃ। কী আইন।

আমি ভাবছিলাম, শহরেই যেন অন্যরকম হয়, এমনই ভাবছে মারুতি।

আর বে-পাশী বন্দুক দিয়ে তোমার দুশমনকেই সাবড়ে দাও আর হরিণ-সম্বরই ধড়কাও কেউই দেখতে আসবে না। আর ফরেস্টারেরা তো সবাই রাজপুত সিং এরই মতন! তার আবার তাদের ভরসা। ফেরতই দিয়ে দাও বন্দুকটা।

মারুতি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, কুয়োতলিতে সাপের ভয় নেই। সবসময়ই বালটি আর ঘড়ার ঠং ঠং আওয়াজ হয় তো। শুকনো জামাকাপড নিয়ে যাও। অন্ধকারে উদোম হয়েই চান করো। তোমাকে দেখছে কে? আর এত রাতে কুয়োতলিতে যাবেও না কেউই।

আমি শুকনো পায়জামা পাঞ্জাবি সঙ্গে নিয়ে, শুধু জুতো মোজাটা খুলে আগুনের পাশে রেখে, কুয়োতলিতে গিয়ে ভিজে জামাকাপড় সব খুলে ফেলে খুব ভালো করে সারা গায়ে সাবান মাখতে লাগলাম। উদোম জায়গায় শুধু উদলা গায়েই নয়, উলঙ্গ হয়ে চান করাটা ভারী অস্বস্তির। আমি

শহরের ছেলে। জন্মাবধি দরজা বন্ধ করে করপোরেশনের জলজমানো চৌবাচ্চার বদ্ধ জল থেকে মগে করে জল তুলে কাকের চানের মতন চান করাই অভ্যেস। এসবে পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে অনেকই সময় লাগবে। যাই হোক, সাবান মাখা শেষ হলে ভালো করে জল ঢেলে চান করলাম। চান যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ঠিক সেই সময়েই এক ঝলক তীব্র আলো এসে পড়ল আমার উপরে। পেছন থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে কে যেন মেয়েলি গলাতে হেসে উঠল।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবিটা গলিয়ে পায়জামার মধ্যে তড়িঘড়ি পা-দুটো ঢোকাতে লাগলাম।

আলোটা যেদিক দিয়ে এল সেই দিকে ফিরে তাকালাম আমি। ঝোপের বিপরীত দিক থেকে আসছিল আলোটা। টর্চের আলো। আমার দু চোখ ধেঁধে গেছিল। দেখতে পাচ্ছিলাম না কিছুই।

হাসিটা আবারও হল। এবারে আগের থেকেও জোরে।

এবারে গলা চিনলাম। জিগারি।

জিগারি বলল, হয়েছে চান?

হ্যাঁ।

তারপর বিরক্ত গলাতে বললাম, আলো ফেললে কেন?

তেমনই হাসতে হাসতে সে বলল, ফেললাম। কিন্তু তোমার চান করা দেখতে নয়।

এদিকে কি করতে এসেছিলে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সাপের বিছের ভয় অগ্রাহ্য করে তোমার উলঙ্গ শরীরের বাহার আমি দেখতে আসিনি মোটেও।

আমি বললাম, দ্যাখো জিগারি, আজকে সারা দিন ভারি ধকল গেছে। কত মাইল পথ যে হেঁটেছি তার হিসেব নেই। তার উপরে বৃষ্টির পরে অন্ধকারে পথ হারিয়ে আরও দুর্ভোগ। ভাণ্ডারে ফিবে চলো। খিদেতে পেট চোঁ-চোঁ করছে। তুমি না গেছিলে ফাগগুকে ফিরিয়ে আনতে বাজার থেকে। আজকে এবং এখন কোনো রসিকতাই সহ্য করার মতন মানসিক অবস্থা আমার নেই।

তাই তো। সে তো ফিরে এসেছেই। খিচুড়িও বোধহয় হয়ে গেছে এতক্ষণে।

তবে এখানে কি দেখতে আলো ফেললে?

ডাকিন।

জিগারি নৈর্ব্যক্তিক গলাতে বলল।

বলেই বলল, দেখবে?

বলেই আমাকে অতিক্রম করে সে সেই ঝোপের দিকে এগিয়ে যেতেই কী যেন কী একটা খসখস আওয়াজ তুলল। আওয়াজটা আমার মনের ভুলও হতে পারে। জিগারি মারুতির পাঁচ-ব্যাটারির টর্চটাকে ঘুরিয়েই আবারও বোতাম টিপল। মনে হল, একটি নারীমূর্তি, ছিপছিপে লম্বা, আলুথালু কেশ।

সেটাও আমার মনের ভুলও হতে পারে।

টর্চ-এর আলোটা ঝোপ ঝাড় ভেদ করল, কিন্তু মনে হল যেন তার শরীর ভেদ করে বেরিয়ে গেল। মনে হল, সেই যেই হোক, তার শরীরটা যেন স্বচ্ছ। পরক্ষণেই মনে হল, সে যেন জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে দৌড়ে গেল, জঙ্গলের গভীরে। কিন্তু কোনো শব্দ হল না। সে যেন কোনো ছায়ামূর্তি।

আমি হতবাক হয়ে স্বগতোক্তি করলাম, কে?

বলেই, ভেজা জামাকাপড় সাবানের বাক্স গামছা সব হাতে নিয়ে ভান্ডারের দিকে এগোলাম। জিগারি চলল আমার পাশে কথা না বলে। দু একবার পথে আলো ফেলে ও ঘুবিয়ে দেখে নিল সাপ বিছে আছে কি নেই।

আমি আবারও বললাম, কে? ও কে জিগারি? কেউ ছিল কি?

সে যেই হোক।

জানি না। আমি নিজেও জানি না। সত্যি বলছি।

তারপর হেসে বলল, টোটাবাবু, তুমি আড়াল থেকে লুকিয়ে আমার চান দেখলে তবু বুঝতাম। আমরা যে মেয়ে। মেয়েরা যে সুন্দরী। আমরা দেখারই মতন। পুরুষের উলঙ্গ বাহার রূপ দেখার চেয়ে তো পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠা ভালুক দেখাও ভাল। ছিঃ। ছিঃ। তাছাড়া, অন্ধকারে দেখতেই বা কি পেল? সাপ-খোপে কামড়ালে কি হত বলো তো? মাথার গোলমাল হল কি? কে জানে।

কে ও?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

ছাড়ো ও বাবু। একটা ডাকিনের নজর পড়েছে তোমার উপরে। তুমি সাবধানে থাকবে। কাম-চাগলে মেয়েরা মানুষখেকো বাঘিনির চেয়েও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

স্বগতোক্তি করল জিগারি, বেশরম কাঁহাকি। ছিঃ। ছিঃ। অজীব আওরত। সাচমুচ।

ও কে? কে এমন করে এই অন্ধকারে, টিপটিপে বৃষ্টিঝরা রাতে দেখতে এল আমার চান? এমন করে। তাছাড়া বাঘেও তো ধরতে পারত। তাছাড়া কারোকে তো দেখাও গেল না। অশরীরী!

বাঘ? বাঘ আসবে কোত্থেকে। পাশেই ভাণ্ডার। একটু দূরেই গামহারগাঁও বাজার। তুমি বড়ো বাঘের কথা বলছ কি? ফুঃ। পেভ্রা-মেভ্রা, শোনচিতোয়া-ফোনচিতোয়া কখনও কখনও চলে আসে কুকুর কি বকরার লোভে।

জিগারি বলল।

আমি ওকে বললাম, সে কি! তুমি আর গাণ্ডা নানা আজই ছিরহট থেকে এলে আর গণিয়া বস্তির ঘাসিরাম পোর্তেকে যে কাল বিকেলে ঝিকারপানির নিচেই বাঘে ধরেছে তাও কি জানো না! বাঘ বাঘিনি জোড়াতে আছে। বিলকুল মস্ত এখন।

জিগারি হেসে বলল, তুমি জানো কি টোটাবাবু। বাঘ-বাঘিনি কখনও "জোড়িদার" হয় না, ওদের সবসময়ই "অদলবদল"। এ বছর একজন তো পরের বছর অন্যজন। ওদের মতন বুদ্ধি কি মানুষের আছে? না, হবে কখনও? বাঘ যে বনের রাজা। বহতই অকল তাদের।

পরক্ষণেই বলল, কিন্তু কাকে নিয়েছে বাঘে গতকাল বললে?

ঘাসিরাম। গণিয়া বস্তির। চৈতুরাম পোর্তের ছেলে।

জিগারির কণ্ঠস্বর শক্ত হয়ে গেল। হাসি মিলিয়ে গেল। এ যেন সেই চেনা জিগারি নয়। একেবারে চুপ করে গেল ও।

তারপর আবারও বলল, কালই নিয়েছে বাঘে ঘাসিরামকে?

হ্যাঁ। গতকালই তো। বিকেলে।

তোমাকে এ কথা কে বললে?

গণেশ।

কে?

আরে গণেশা পানকা। বাঘ পানকা। তোমাদের লেবিনসাহেবই তো তাকে পাঠালেন আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে। তিনটি নানকুরি গাছের যে গোলাই আছে না, যেখানে অনেকেই পথ ভুলে যায়, সেখানে যাতে পথ না ভুলি.....

জিগারি বড়ো বড়ো পা ফেলে আমাকে পেছনে ফেলে রেখে ভাণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে থেকে ভাণ্ডারের হ্যাজাকের আলো এবং গাণ্ডা গোন্দ আর মারুতি যে আগুন করে বসেছিল সেই আগুনের আভাও দেখা যাচ্ছিল। আমি জিগারির ওই আশ্চর্য পরিবর্তনের কোনোই মানে বুঝলাম না। টর্চ নিয়ে এসেও আমাকে অন্ধকারে ফেলে দ্রুত ভাণ্ডারে

ফিরে যাবারও মানে বুঝলাম না এবং ঠিক সেই সময়েই বড়ো শিমুলটার মগডাল থেকে সেই মোরাঙ্গী পাখিটা ডেকে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে, কীরে! কীরে! কীরে। কি? কি? কি?

আমি যখন গিয়ে পৌঁছোলাম ভাণ্ডারে তার আগেই দেখলাম টর্চ হাতে করে জিগারি বাজারের দিকে চলে গেল। কী করতে বাজারে গেল কে জানে। ভাবছিলাম, মেয়েটার দুর্জয় সাহস। এসসব বনাঞ্চলে সন্ধে নাগাদ পরে পুরুষেরাও বড়ো একটা যায় না কোথাওই বাড়ি ছেড়ে। মেয়েদের তো কথাই নেই। আর এই অল্পবয়সেই সুন্দরী যুবতী হুট-হাট করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমি যেতেই, মারুতি বলল, মাথাতে কাঙ্গি লাগিয়ে এসো, তারপরে খাব।

কি রান্না করেছে আজ ফাগগু? গাগু নানা আর জিগারি মেহমানের জন্যে?

মশুর ডালের পাতলা খিচুড়ি, আলুভাজা কড়কড়ে করে, কাঁঠালের বিচি ভাজা, আর শুকনো লংকা ভাজা। দশরথ নানার দোকানের কৌশল্যার হাতের বানানো গাওয়া ঘি তো আছেই। আর কি চাই।

না। আমার আর কিছুই চাই না।

তুমি কোন আক্কেলে মেভ্রিসেরাই থেকে লমনি হয়ে গামহারগাঁওতে হেঁটে এলে? মারুতি বলল।

আমার যে ভারি ভালো লাগে এই জঙ্গল পাহাড়ে একা একটা হেঁটে বেড়াতে। হারিয়ে যেতে। এমন তো জন্মাবধি কখনও দেখিনি। কী ভালো যে লাগে। মনে হয় এই সবই আমার জমিদারি, আমারই নিজস্ব। আর কেউই ভাগীদার নেই এর। আর ওই পথে না এলে তো লেবিনসাহেবের সঙ্গে আলাপও হত না। একদল জংলি কুকুর কি করে যে একটা মস্ত শিঙাল শম্বরকে খেয়ে মুহূর্তের মধ্যে সাফ করে দিল তা কী বলব। বীভৎস একেবারে।

লেবিনসাহেবের সঙ্গে দেখা হল আর মোরাঙ্গী পাখির ইংরেজি নামটা জেনে এলে না।

ঠিক বলেছ তো। ঈস। একেবারে মনে ছিল না। অথচ একটা মোরাঙ্গী দেখলাম মেভ্রিসেরাই-এর কাছেও।

চিনলে কি করে?

সাগেলা চিনিয়ে দিল।

কী করছিল মোরাঙ্গী পাখিটা সেখানে?

একটা জ্যান্ত সাপ ধরে নিয়ে মুখে করে উড়ে গেল।

তাই?

হ্যাঁ।

আর কি দেখলে পথে?

এবারে গাগু গোন্দ জিজ্ঞেস করল।

আহা যা বৃষ্টি এল তা কী বলব। এমন বৃষ্টি আসা দেখাটাও জীবনের একটা বিশেষ অর্জন।

বলেই ভাবলাম "অর্জন" শব্দটির মানে কি বুঝল ওরা। তবে ওদের মুখ দেখে বুঝলাম যে, আমার খুশির মাত্রা যে অপরিসীম একথাটা ঠিকই বুঝল।

এক সময়ে জিগারি ফিরে এল।

কী দেখলি?

মারুতি শুধোল ওকে।

যা ভেবেছিলাম। কৌশল্যাদিদির জ্বর হয়েছে। বিকেল থেকে সে শুয়েই আছে ডুংগাকে নিয়ে। সে বাড়ি থেকে বেরোয়ইনি। দশরথ নানাও ঝাঁপ বন্ধ করে এখুনি বাড়িতে সেঁধোবে। শেষ বাসও চলে গেছে।

হুঁ।

গাণ্ডা গোন্দ বলল। চিন্তিত মুখে। ওরা তিনজন চোখ মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে যেন নীরবে কি বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে এমনই আমার মনে হল। অথচ আমাকে কিছু বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মারুতি বলল, তুমি আর কখনও একা একা জঙ্গলে যাবে না টোটাবাবু। কারোকে না কারোকে নিয়ে যাবে।

বলেই বলল, খনা লাগানা ফাগগু।

কেন? মগনলাল কি মারা গেছে? সেই জন্যে আমাদের খতরা?

আমি বললাম মারুতিকে।

মগনলাল মারা গেছে যে সেটা ঠিক। কিন্তু সে জন্যেও নয়।

মগনলালকে কে বা কারা শেওতারাইতে পরশু রাতে ছুরি মেরেছিল ধাঙর পট্টিতে। সেখানে খারাপ পাড়াতে গেছিল না কি সে। তার বুকে পেটে ছুরি মেরেছে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা। শুধু তাই নয়, তার পুরুষাঙ্গও নাকি কেটে নিয়েছে। ওই এক দোষ ছিল মগনলালের। ওই একদোষেই জীবনটাও গেল।

গাণ্ডা গোন্দ বলল, মগনলালের কথাই যখন তুললে তখন বলি যে, মনটা খারাপ লাগছে। লোকটা রোজ সন্ধেবেলা তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ত। আমি এলে, আমাকে শোনাত। তোমরা আমাকে যেমন যত্ন-আত্তি করো এই ভাণ্ডারে এলে, সেও তেমনই করত। সব মানুষই তো দোষগুণেই হয়।

দোষ আর কি?

ফাগগু বলল।

দোষ নয়?

জিগারি রোষকষায়িত চোখে বলল ফাগগুকে।

তারপর বলল, পুরুষ জাতটাই অমন।

ফাগগু বলল, বাহাদুর আদমিকি কমজোরি ওহি ইক চিজসেই হোতা হ্যায়। হর বাহাদুর আদমিকেই ছোকরিকি শখ হোতা হ্যায় বহতই।

ঝুট বাত। গলত বাত।

বলল, জিগারি।

তারপর বলল, যো বদমাস হোতা উ বদমাসই হোতা। বদমাসি ছিপানে কি লিয়ে ইতনা প্যায়েরভিকি জরুরত ক্যা? ইসমে বাহাদুরি ভি ক্যা হ্যায়?

ফাগগু নিজেকে জিজ্ঞেস করে বলল, বাহাদুরি ইসমে নেহি, বাহাদুর আদমিকি.....

আমি মাথা আঁচড়ে এসে তোয়ালে ও ভিজে জামাকাপড় আগুনের কাছে বারান্দাতে টাঙানো শন-এর দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, আচ্ছা, নানকুরি গাছটা কি গাছ? তোমরা কেউই তো আমাকে চিনিয়ে দাওনি। আজ প্রায় তিন মাসের মতন এখানের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি।

নানকুরি গাছ?

গাণ্ডা গোন্দ খুব অবাক হল। অবাক হল মারুতি আর জিগারিও।

মারুতি বলল, এতদিন চুন্নুবাবুর জঙ্গলের মুহুরিগিরি করছি, নানকুরি গাছ বলে তো কোনো গাছ দেখিনি।

আমি বললাম, তোমরা কোনো খবরই রাখো না। বাঘেরই মতো নিচে তাকিয়ে হাঁটো তোমরা। ওই পথে এত হাজারবার চলাচল করেছ অথচ তিনটি নানকুরি গাছের গোলাইটা দেখনি? যেখানে সকলেরই পথ ভুলে হয়ে যায়? লেবিনসাহেব যদি গণেশ পানকাকে না পাঠাতেন তবে তো আমিও পথ গুলিয়ে ফেলতাম। তাছাড়া মারুতি তুমি তো আচ্ছা লোক। কালই চৈতুরাম পোর্তের

ছেলে ঘাসিরাম পোর্তেকে যে বাঘে ধরল ঝিকারপানির নিচে তাও তো আমাকে বলোনি তোমরা। জানলে কি আর আমি ওই পথে হেঁটে আসি? ট্রাক বা বাস ধরেই আসতাম গামহারগাঁওতে।

ওরা সকলেই চুপ করে রইল।

আমি বললাম, বাঘ-বাঘিনির আওয়াজও শুনলাম। পিলে চমকে গেছিল আমার শুনে। মেঘ গর্জনও তার তুলনাতে কিছুই নয়।

মারুতি বলল, ঘাসিরাম পোর্তে আজ সকালেই এখানে এসেছিল দাদনের টাকা নিতে। ওদের আরও দুশো টাকার দরকার। মগনলাল খুন হয়ে যাওয়াতে এখন বাছাধনেরা পথে এসেছে। আমি ইচ্ছে করলে এখন ওদের টাইট দিতে পারি। কিন্তু দেব না। কারণ, আমার মালিক ভালো। তিনি বলেন, গরিবকে কখনও ঠকাবে না আর কারো ক্ষতি করবে না কখনও। যে সময় এবং জীবনীশক্তি পরের ক্ষতি করার চিন্তাতে নষ্ট করবে সেই সময় নিজের উন্নতি করার জন্যে ব্যয় করলে তোমার ভালো ছাড়া খারাপ হবে না।

তাই?

আমি বললাম।

জিগারি সেই যে এসে কৌশল্যার খবর দিল তারপর থেকে সে কোনো কথাই বলছে না। হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। ছিঁর ঘাসে বোনা আসনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে নিজের দুহাতের কনুই দুই হাঁটুর ওপরে রেখে আর মুখটি দু হাতের পাতার মধ্যে একটি ফুলের মতো ধরে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। হ্যাজাকের আলোতে আর আগুনের আভাতে তার মুখটিকে একটি চাঁপা ফুলের মতন দেখাচ্ছে।

জিগারি বলল, তোমাকে কে নানকুরি গাছেদের গোলাইতে নিয়ে গেল সেটা বলো সবাইকে।

কে আবার। বললামই তো গণেশ। বাঘ-পানকা। কদম-ছাঁট চুল মাথাতে। লম্বা টিকি। কৌশল্যার কিরকম আত্মীয় হয় শ্বশুরবাড়ির দিক দিয়ে।

মারুতি বলল, গণেশ পানকা ঝিকারপানির পাহাড়ের পায়ের কাছে দু বছর আগে বছরের ঠিক এই সময়েই বাঘের হাতে মরেছিল। তখন একটা ল্যাংড়া মানুষখেকো বাঘ ঝিকারপানিতে আস্তানা গেড়েছিল। এখন যে বাঘিনী থাকে ঝিকারপানি পাহাড়ে, সে এসেছে ওই মানুষখেকো মরার পরে। এখন, মানে এই বছরে হুটুককারীর জঙ্গল থেকে একটা ছোকরা বাঘ এসে জুড়ি বেঁধেছে। চলে যাবে খেলা শেষ হলে। এই বাঘিনি কোনোদিনও কোনো মানুষকে কিছু বলেনি। আজ অবধি বলেনি। শম্বর, চিতল, কখনও গাউরের বাচ্চা ধরে খায়। সাহিলও ধরে।

বলছ কি তোমরা?

আমি সোজা হয়ে বসলাম। শিরদাঁড়া বেয়ে এক শীতল সরীসৃপ বয়ে গেল।

বললাম, লেবিনসাহেব তাকে পাঠালেন কেন? ছেলেটা আমার পাশেপাশে কতক্ষণ কত গল্প করতে করতে এল। মুলারীবাই-এর সৌন্দর্য সে যেমন বর্ণনা দিল, তেমন তো কোনো কবিও দিতে পারবে না।

ছেলেটা কবিই ছিল। বেঁচে থাকলে মস্ত কবি হত।

তাই?

হাঁতো।

মারুতি বলল। তারপর বলল, ছেলেটার মুখ তোমার মনে আছে? কেমন দেখতে বলো তো?

আমি একটু ভেবে বললাম, ওর মুখ আমি দেখিনি।

কেন? এতখানি পথ সে পাশে পাশে এল,তবুও দেখোনি।

না। সে আমার পাশে কিন্তু সামান্য পেছনে হেঁটে আসছিল।

আমি বললাম, তোমরা তাহলে কি বলতে চাইছ?

কিছুই না। তুমি আজ খুব বেঁচে এসেছ। এর আগে গণেশ বাঘ-পানকার সঙ্গে নির্জন গ্রীষ্ম

দুপরে যাদেরই দেখা হয়েছে তাদের মধ্যে পাতিরাম ছাড়া আর কেউই তোমার মতো তার সঙ্গে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতা বলার জন্যে বেঁচে থাকেনি। তাদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে জঙ্গলে, টাঁড়ে বা কোনো নালার মধ্যে। গণেশ পানকা কখনই রাতে দেখা দেয় না। ভর দুপুরে এক আকাশ আলোর মধ্যে গা ছমছম নির্জন বনেই সে দেখা দেয়, যাকে মারবে, তাকে।

লোকে বলে, সেই মানুষখেকো বাঘিনির আত্মাটা নাকি গুলি খেয়ে মরার পরে গণেশ বাঘ-পানকার মধ্যে ঢুকে গেছে। গণেশ বাঘ-পানকা বলেই সেই বাঘিনির হত্যার প্রতিশোধ নেয়। সেই বাঘিনিই গণেশের রূপ ধরে। গণেশ অপঘাতে মরেছিল বলেই তো তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তাকে মানে, শরীরের যতটুকু পাওয়া গেছিল।

আমি বললাম, তোমরা সকলেই উন্মাদ নয়তো অশিক্ষিত, জংলি। আমি নিজে এতক্ষণ কথা বললাম তার সঙ্গে, এতরকম কথা, আর তোমরা বলছ......

গাণ্ডা গোন্দ বলল, তোমার কোনো প্রিয়জন তার জীবন দিয়ে আজ তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করি না তোমাদের ওইসব কুসংস্কার।

আমি বললাম।

তারপর বললাম, জঙ্গলে থেকে থেকে তোমরা সত্যিই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধ, জংলিই হয়ে রয়েছ। সভ্যতার আলো তোমরা কখনই দেখবে না। তোমাদের এই ছত্তিশগড়, এই গোন্দ, বাইগা, পানকাদের বড়োই ভালোবেসে ফেলেছিলাম আমি। এই আশ্চর্য প্রকৃতিকে। ভগবানকে আমি কোনোদিনও দেখিনি। কিন্তু এখানে আসার পর বুঝেছি যে ভগবান মানে এই প্রকৃতিই। আমাদের আসল মা যিনি। যিনি আদি এবং অনন্ত এবং যাঁর গায়ে টাঙ্গি আর করাত চালিয়ে আমরা মহাপাতকের কাজ করছি। মেন্ড্রিসেরাই না হয় মস্তই বড়ো। কিন্তু আসলে সব গাছই মেন্ড্রিসেরাই। যেকোনো গাছের গায়ে টাঙ্গি অথবা করাত লাগালে তার গা দিয়ে রক্ত বেরোবেই। আমরা সাদা চোখে দেখতে পারি না, এই যা। যারাই গাছ কাটে বা কেটেছে তাদেরই একদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, আর যাই বলো মানতে রাজি আছি কিন্তু গণেশ পানকা ভূত একথা আমাকে তোমরা বোলো না। আমি কাল সকালে নিজেই যাব ইসিবিসি গ্রামে লেভেলিন সাহেবের কাছে। নিজেই গিয়ে জিজ্ঞেস করব তাঁকে, তিনি গণেশকে পাঠিয়েছিলেন, কি পাঠাননি।

লেভেলিন সাহেবটা কে?

এ তোমরা যাকে লেবিনসাহেব বলো।

ফাগণ্ড বলল, ভেতর থেকে, এসো, খাবার লাগিয়ে দিয়েছি। খিচুড়ি ঠান্ডা হয়ে যাবে।

খাওয়াদাওয়ার পরে মারুতি আর জিগারি চাদর বালিশ নিয়ে ভালুটিলাতে চলে গেল শুতে। বিয়ে করেনি কিন্তু ওরা। বিয়ে করবে কি না তারও ঠিক নেই। কিন্তু না করলেও ওদের দুজনের মধ্যের বন্ধুতাতে কোনো দাগ লাগবে না। জোড়িদার নয় ওরা। অদলবদল।

আমি আর গাণ্ডা নানা ভাণ্ডারে বারান্দার ডানদিকের শেষ প্রান্তে নিরিবিলিতে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে গল্প করছিলাম। গাণ্ডা গোন্দ এর চুট্টার চিমসে গন্ধ বৃষ্টিস্নাত বন-পাহাড়ের গন্ধে সামান্য

ক্ষণের জন্যে বিকৃতি এনেছিল। কলকাতার একটি বাস যে পরিবেশকে কতখানি দূষিত করতে পারে তার একটা আন্দাজ করা যায় এই নির্মল পরিবেশে একটিমাত্র সামান্য চুট্টাজনিত কলুষের প্রকৃত প্রকৃতি বুঝতে পেরে।

গাণ্ডা নানাকে বললাম, নানা, আজ এতখানি হেঁটেছি, কত কীসব আশ্চর্য জিনিস ও কাণ্ড-মাণ্ড দেখলাম, মেন্ড্রিসেরাই, বুনোকুকুরের দলের শম্বর ধাওয়া করে এনে পেড়ে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে খেয়ে সাফ করে দেওয়া, তোমাদের লেবিনসাহেব, বাঘ-পানকা গণেশ, তারপর এই বৃষ্টির রূপ, আহা! বৃষ্টিতে হরিণদের মিছিমিছি মারামারির খেলা মনিয়ারি কৈরাহার বুকে। এবং তারও পরে, অন্ধকারে পথ হারিয়ে যাওয়াতে এতই পরিশ্রান্ত আছি যে আজ ঘুমই বোধহয় আসবে না আমার। এক্সারসাইজ না করলেও যেমন ঘুম আসে না তেমন আবার একদিনে একসারসাইজ বেশি করলেও আসে না। তার চেয়ে বসে বসে তোমার গল্প শুনি। বৃষ্টির পরে চাঁদ উঠেছে। ইসস কেমন যে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওই বুঝি স্বর্গ, বা ফ্রেমে-বাঁধানো কোনো ছবি।

তা ঠিক।

গাণ্ডা নানা বলল।

তারপর বলল, কোনো সুন্দর বা কুৎসিত জিনিসই নির্ভেজাল নয়। সৌন্দর্যের বুকের মধ্যেই অসৌন্দর্য থাকে। আর যা অসুন্দর বলে মনে হয়, তার মধ্যেও সৌন্দর্য থাকে।

তারপর বলল, ঠিক আছে। করব গল্প। তবে গল্প তো আমি সবসময়ই করি নিজে, নিজেরই সঙ্গে।

একটু থেকে বলল, আজকে ছিরহট থেকে জিগারি আমার সঙ্গে এল। ভারি হাসিখুশি মেয়েটা। ওর কাছে যেই থাকবে, সে তার বরই হোক কী পাওনাদার তার মন কখনওই খারাপ হবার উপায় নেই। হাসির মতন আশীর্বাদ বুড়হা দেও মানুষকে আর কিই বা দিয়েছেন। যে জীবনটাকে হেসেই না কাটিয়ে দিতে পারল, তাকে শুধুমাত্র সেই অপরাধেই আবারও এখানে আসতে হবে।

আমি চুপ করে বসে, বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। বৃষ্টি হয়ে এই তিনমাসের সব ধুলো ময়লা মুছে গেছে পরিবেশ থেকে। আজকে শুক্লপক্ষের নবমী বা দশমী। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতে ঝকঝক করছে চাঁদের আলো বৃষ্টি ভেজা বন পাহাড়ে। কী একটা পাখি গুব-গুব-গুব করে একটানা ডেকে চলেছে দূরের বড়ো রাস্তার পাশের মাট্টিনালার দিক থেকে। আর টুপ টুপ যুপ টুপ করে একটা পাখি ডাকছে কুয়োতলির কাছের জামগাছের পেছনের জঙ্গল থেকে আর তার দোসর সাড়া দিচ্ছে মনিযারী কৈবাহার দিক থেকে। কী একটা জন্তু ডেকে উঠল টাকটু-উ, টাকটু-উ করে। আর তারই প্রত্যুত্তর দিল তাবই স্বজাতিব অন্য প্রাণী, ভাণ্ডারের ডান দিকের ঢাল থেকে। ডাকটা যেন বুকেব মধ্যে চাটি মারতে লাগল।

আমি বললাম কি ওটা?

গাণ্ডা নানা হেসে বলল, তক্ষক গো। এখানে তক্ষকেরা মস্ত বড়ো বড়ো হয়। দেখলে, ভয় পেয়ে যাবে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নাতে গাণ্ডা নানাব চুট্টার ছায়াটাকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। আলো-ছায়ার কত খড়কে-ডুরে শাড়ি, কালো-সাদাব অলিগলিতে কত বুটি, কত স্ট্রাইপ, ইলিবিলি। আলোর মাঝে মাঝে থাবা অন্ধকারের মধ্যে কত রহস্যই যে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে।

যাই-দেখা যায় না, তাই দেখতে ভাবি সাধ হয় আমার। বোধহয় সব মানুষেরই। যা-কিছুই ঢাকা থাকে, বা অদৃশ্য থাকে, তা স্তনসন্ধিই কালো ছোপ-ছোপ অন্ধকার, তারই আড়ালে বা নিচে কি আছে তা দেখার উদগ্র বাসনা থাকে মানুষমাত্রেরই।

সাহিত্যিক সমরেশ বসু বেঁটেখাটো হলেও যেমন সুন্দর দেখতে ছিলেন তেমনই মিষ্টি করে কথা বলতেন। হাসিটা ভারি মিষ্টি ছিল। একদিন আমাদেব বাড়ির পাশের বাড়ির রায়েদের বাড়িতে

এসেছিলেন তাঁর কী একটা উপন্যাসের চিত্রনাট্যের ব্যাপার। রায়বাবুরা ছিলেন সিনেমার প্রডুসার। ওঁরা রেফ্যুজি। ঢাকা শহরে নাকি বাড়ি ঘর সবই ছিল। প্রাণ আর মান নিয়ে এক বস্ত্রে চলে আসেন বর্ডার পেরিয়ে সাতচল্লিশে।

সেদিন সকালে সমরেশ বসুকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে ওঁদের ভাড়া-বাড়ির বৈঠকখানাতে খুবই ভিড় হয়েছিল। একথা সেকথার পরে সমরেশবাবু বলেছিলেন, ভাই আপনাদের দেশ ছিল ঢাকা?

তারপরই বলেছিলেন, সত্যি! ঢাকা জায়গাটা দেখার ইচ্ছা ছিল বহুদিনের।

প্রথম বাক্যটা যে দ্ব্যর্থক তা কেউই বুঝতে পারেননি।

বোঝা মাত্রই হাসির হুল্লোড় উঠেছিল।

সেই একবারই দেখেছিলাম, সমরেশ বসুকে কাছ থেকে।

গোণ্ডা গোন্দকে শুধোলাম, আচ্ছা, নানা, তোমরা কি সত্যিই ভূতে বিশ্বাস করো?

করব না ? ভগবানে যেমন করি, ভূতেও করি।

ভূত কি কথা বলে?

বলে বইকী! মানুষের মধ্যে, যেমন ভগবান থাকেই তেমন ভূতও থাকে। মানে, মানুষের মূর্তি ধরে।

পরক্ষণেই নিজের ডান হাঁটুটা হাত দিয়ে মালিশ করতে করতে বলল, বাতে বড়ো কষ্ট দিচ্ছে। একটা ছেলেও পেলাম না।

মানে?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

যে ছেলে, মায়ের গর্ভ থেকে পা-আগে করে বেরিয়েছে তার বাঁ-পা একবার বাতের জায়গাতে ছুঁইয়ে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে বাত গায়েব হয়ে যাবে।

সকলেই তো নামার সময়ে পা আগে করেই নামে মায়ের পেট থেকে।

আমি বললাম।

দূর বোকা। তুমি সত্যিই ছেলেমানুষ। মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান যখন বেরোয় জন্মাবার সময়ে, তখন তার মাথাই আগে বেরোয়। তাও জানো না?

না। আমি তো জানতাম না। বাতের যে এমন ওষুধ আছে তাও জানতাম না। আমার মায়ের কোমরে বাত হয়েছে। মাকে লিখে দেব তো ওষুধটা।

আরও ওষুধ আছে।

কি?

শুখা মহুয়া লোহার শুকনো তাওয়াতে সেঁকে নিয়ে গরম মোটা কাপড় জড়িয়ে যদি ব্যথার জায়গার সেঁক দাও কদিন, তো ব্যথা একেবারে সেরে যাবে।

তাই?

হ্যাঁ।

কতরকম ভূত আছে তোমাদের এইসব জঙ্গল পাহাড়ে?

ওই ডাইনি জ্যোৎস্নার মধ্যে বসে, শহরের ছেলে আমি, দশদিকে দিগন্ত অবধি বিস্তৃত পাহাড় জঙ্গল নদীরেখার গা-ছমছমে ছবিতে মুগ্ধ এবং একটু ভীতও, প্রশ্ন করলাম গাণ্ডা নানাকে। আমি না হয় দু পাতা ইংরেজিই পড়েছি আর এরা তো সব পাঠ নিয়েছে জীবন থেকে। গাণ্ডানানার বয়স আমার বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর আজকের বয়সের অনেক বেশিই হত। গাণ্ডানানাও তো আমার পিতাই। শিক্ষাদাতা পিতা।

নানা, উত্তর দেবার আগেই এক ঝলক হাওয়ার সঙ্গে কী একটা ফুলের গন্ধ এল নাকে।

কি ফুলের গন্ধ এটা নানা?

কাচনার।

দিনের বেলা দেখিয়ো তো। চিনে রাখব।

দেখাব।

এতক্ষণ হাওয়া ছিল না। হাওয়া দিতেই রাতের বনের রহস্যময়তা যেন মুহূর্ত মধ্যে হাজারগুণ বেড়ে গেল। ছায়ারা হেলে দুলে নাচতে লাগল। আলোর গালচেতে কালোর আঁচল উড়তে লাগল। চারদিক ফিশফিশ করে অদৃশ্য কারা যেন কথা বলতে লাগল। যেসব গাছ পর্ণমোচী নয় তাদের ডালপালারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল আমাকে। ভয় করতে লাগল আমার। দিনের ও রাতের প্রকৃতির মধ্যে এতদিন ভালোবাসা ছিল, বিস্ময় ছিল, কৌতূহল ছিল অপরিসীম, কিন্তু ভয় ছিল না কোনোদিনও। এই প্রথম ভয় পেলাম। বাঘ-পানকা গণেশ যে ভূত এই কথা ওরা সকলে মিলে আমাকে বলছে। ওরা কি ইচ্ছে করে রসিকতা করার জন্যেই এমন করল? কিন্তু কুয়োতলিতে যখন চান করছিলাম তখন জিগারির টর্চের হঠাৎ ফেলা আলোতে যে নারীমূর্তির আভাস দেখলাম সেই বা কে? আমি এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে জিগারি ও মারুতিও প্রথমে ভেবেছিল যে হয়তো বিকৃত-রুচি কৌশল্যাই আমার চান দেখার জন্যে রাতের অন্ধকারে সাপ-খোপ এর ভয় তুচ্ছ করে পুটুস ঝোপগুলোর আড়ালে বসেছিল। কিন্তু আমার আগে আগে ভাণ্ডারে পৌঁছে মারুতিদের যা বলার বলে, সরেজমিনে তদন্ত করবার জন্যেই গেছিল নিশ্চিত হতে যে,সেই ছায়ামূর্তি কৌশল্যাই কি না। কিন্তু জিগারি গিয়ে দেখল যে, কৌশল্যার জ্বর। সে শুয়েই আছে সকাল থেকে। তবে সেই ছায়ামূর্তি কার?

গাণ্ডা গোন্দ স্বগতোক্তি করল, যেন আমার মনের নিরুচ্চারিত প্রশ্নেরই জবাবে। গণেশ ছেলেটাও মরত না। বাঘিনিটা যখন লমনির ল্যাংড়া মুখিয়াকে ধরল তখনই যদি আমাকে ওরা খবর দিত। আমি তখন ছিলাম পকরাপানি গ্রামে।

কেন? তোমাকে খবর দিলে কি করতে তুমি?

মন্ত্র পড়ে, তারপর যেখানে ল্যাংড়া মুখিয়া মরেছিল, তারই কাছের সবচেয়ে বড়ো মাহারুখ গাছটাতে একটা বড়কা গজাল গেঁথে দিয়ে বাঘিনির চোয়ালটাই একেবারে বন্ধ করে দিতাম। তাহলে গণেশটা মরত না। তবে অবশ্য বাঘিনিরও শাস্তি কম হয়নি গণেশ বাঘ পানকাকে মেরে।

কি শাস্তি হয়েছিল?

মাট্টিনালার চোরা বালিতে ডুবে বুক অবধি আটকে গেছিল। তারপর বাঘের মতন জানোয়ারকে কে না অপমান করেছিল? হায়নাতে, শেয়ালেতে, সকলে মিলে তিল তিল করে তাকে শেষ করেছিল। নীল মাছি পড়েছিল হাজার হাজার। আহা! কী জানোয়ারের, বনের রাজার কী হেনস্তা! চোখে দেখা যায় না।

তারপর বলল, বুঝলে, আমার এত বয়স হল, কখনও বাঘকে চোরাবালিতে ফাঁসতে দেখিনি। আশ্চর্য। হয়তো বাঘ-পানকার ছেলেকে খাওয়ার অপরাধেই তার ওই শাস্তি বরাদ্দ ছিল।

ভূতদের কথা বলো না নানা। শুনি একটু।

আমি বললাম।

এমন সময়ে মনিয়ারি কৈরাহার বুক থেকে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে কি যেন কী বুকের মধ্যেটা পর্যন্ত চমকে দিয়ে ডেকে উঠল। সেই ডাক প্রতিধ্বনিত অনুরণিত হল চারদিকের বন-পাহাড়ে। বৃষ্টির পরে মনে হল, বনের শব্দগ্রহণ ও শব্দপ্রেরণ ক্ষমতা অনেকই বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই গমগমে, বুকের ও মাথার সব স্নায়ু ও শিরা উপশিরার নাড়া দেওয়া ডাকটা ক্রমশই ঝিকারপানি পাহাড়ের দিকে সরে যেতে লাগল। মরে যেতে লাগল ক্রমান্বয়ে। তারপর একেবারেই থেমে গেলে ভয়ার্ত আমি বললাম, কী ওটা?

গাণ্ডা নানা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, হুন্ডার।

হুন্ডার কি?

গাণ্ডা নানা তার দু হাত দিয়ে এবং মুখে সেই জানোয়ারের চেহারার যা বর্ণনা দিল তাতে ঠিক বুঝলাম না। জংলি জানোয়ার যা দেখার তা তো সব এখানে এসেই দেখেছি। কলকাতার চিড়িয়াখানাতেও তো মাত্র একবারই গেছিলাম আমার দশ বছরের জন্মদিনে। বাবা নিয়ে গেছিলেন। তাই অনুমান করে নিতে হল। ইংরেজি নাম গাণ্ডানানা জানলেও না হয় কথা ছিল, জানোয়ারটা যে কি তা বুঝতে পারতাম। মনে হল হায়না। নাও হতে পারে।

গাণ্ডানানা বলল, মস্ত মস্ত গাছে থাকে নাগবাঁশি ভূত।

কী ভূত?

নাগবাঁশি।

কি গাছে?

কত গাছে। মাহারুখ, আকাশমণি, গারারি, পিপুল, শিশু, চিরল ভোঁসরাল, বাকাইন, কালা শিবিষ, কাহুয়া আরও কত নাম বলব।

আর? আর ভূত নেই।

ভাগেশ্বর দেও আছে। সে ভূত নয়, জানোয়ারদের দেবতা।

কেমন দেখতে?

ও বাবা! তার রূপ কি একটা? কখন কোন রূপ ধারণ করে তার ঠিক কি? বড়ো বড়ো চোখ, ভাঁটার মতন, রাতের বেলা রংমশালের মতন জ্বলে। মানে, যখন দেখা দিতে চান, তখন যদি গ্রামের মানুষেরা শম্বর বা গাউর বা হরিণ বা বাঘও শিকার করার জন্যে রাতের বেলা মাচায় বসে থাকে বা ফাঁদ বা জাল বা খাদ কেটে তখন ভাগেশ্বর দেও জানোরদের সাবধান করে দেন ওদিকে না যেতে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে বুনো মোষদের দেবতা 'টাঁড়বারোর' কথা পড়েছিলাম। আমাদের পাড়ার পল্টুদার বাড়িতে মস্ত লাইব্রেরি আছে। উনি একটা বই দিয়েছিলেন, আলগারনন ব্ল্যাকউড-এর লেখা। নর্থ আমেরিকান 'মুজ' শিকারের গল্প। তাতে এরকম আধিভৌতিক ব্যাপার ছিল। মনে আছে।

বললাম, তা ভাগেশ্বর দেও থাকেন কোথায়?

ওনার বাস, বহতা জলে, পাথর বা টিলার নিচে।

আর?

আরও আছে। যেমন মাচান।

মাচান? ভূতের নাম?

হ্যাঁ। সন্ধের পরে তার নাম না করাই ভালো। সে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেখানে যেখানে বড়ো পথ চলে গেছে সেখানে থাকে আর পথিকদের সবকিছু লুটে নেয়।

ভূতও, লুটেরা? বলো কি নানা?

আমি সত্যি সত্যিই অবাক হয়ে বললাম।

নয় তো আর বলছি কি?

আর?

মস্ত বড়ো মাথা উঁচু শিমুল গাছের কোটরে যদি আগুন জ্বলতে দ্যাখো কখনও তো জানবে যে তা নিছক আগুন নয়। সেও একরকমের ভূত।

তাই? আর?

মকড়ামল ক্ষত্রী বলে একরকমের ভূত আছে—তারা মস্ত রোমশ মাকড়শার রূপে গাঢ় অন্ধকার

রাতে দেখা দেয় কখনও কখনও। যেন বনের রাস্তা পেরুচ্ছে।

সারাগলিন বলেও একরকমের ভূত আছে।

সে দেখতে কেমন?

ও বাবাঃ। সেতো সবসময়েই মুখ হাঁ করেই থাকে। তার নিচের ঠোঁটটা থাকে মাটিতে আর উপরের ঠোঁটটা থাকে আকাশে।

তাই?

আমি বললাম।

ভাবছিলাম, এই জ্ঞানী গাণ্ডানানার ভূত-ভক্তিতে অবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই। একদিন চাঁদে পা দেওয়া মানুষদের যে, "মাকড়ামল ক্ষত্রী' বা "নাগবাঁশি" বা "সারাগলিন" ভূতে কিছুই করতে পারে না একথা গাণ্ডানানাকে বলে লাভ নেই।

তারপর নানা বলল, গণেশ পানকার হাত থেকে বেঁচে তুমি অন্ধকারে দু ঘন্টা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে বেড়ালে তখন যদি জানতে এত সব ভূতের কথা তবে কি পারতে অমন দুঃসাহস করতে। তাছাড়া বাঘ, ইয়া ইয়া দাঁতওয়ালা বুনো শুয়োর, বড়ো বড়ো অজগর সাপ, করাইত সাপ, শঙ্খচূড়, মানুষের হাতের মতো বড়ো রোমশ সব বিছে, খতরনাক, নাক-চিবুক খুবলে নেওয়া ভালুক, গাউরের দল, চিতা এ বনে নেই এমন জানোয়ার আছে না কি?

অনেক জানোয়ার নেই-ও নানা তোমাদের বনে পাহাড়ে।

যেমন?

হাতি নেই, গন্ডার নেই। কতরকমের হরিণ আছে আমাদের দেশে, কতরকমের পাখি, সব কি আর আছে?

না। তা নেই। তা থাকার কথাও নয়। তবে যা আছে তোমাকে কাচপোকার মতন টিপে মেরে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। শম্বরের পায়ের চাঁটে এবং শিং-এর গুঁতোতে বাঘের কপাল ফাটে, তার পেট এ ফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেতে পারে তা কি তুমি জানো?

না। আমি আর কি জানি নানা। কতটুকু জানি? কিন্তু তবুও বাঘ অত বড়ো বড়ো শিঙাল শম্বরকে পটকে দেয় কি করে?

আরে বাঘ যে হল পৃথিবীর সব শিকারির সেরা শিকারি। সামনে থেকে আক্রমণ করে সে থোড়াই। তাছাড়া একটি শিকারকে বেছে নিয়ে তাকে যে কতক্ষণ থেকে পিছু নেয়, কত ঘন্টা সময় যে দেয়, তা কি তোমরা জানো? ধৈর্য যদি কেউ শিখতে চায় তবে তাকে তো বাঘের কাছ থেকেই শিখতে হবে। আলো-ছায়া হাওয়া, গন্ধ, চড়াই, উতরাই, জল এসব সম্বন্ধে কত চিন্তা ভাবনা করে তবেই না তার কাছাকাছি পৌঁছে পেছন থেকে কোনাকুনি তার ঘাড়ে পড়ে এক পটকান দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে। তারপর শিং-এর পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে বসে শম্বরটার ঘাড়টাকে মাটিতে চেপে ধরে রাখে শরীরের সব শক্তি দিয়ে। শম্বরটা যেই ছটফটিয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠতে চায় মাটি থেকে অমনি তার মেরুদন্ড থেকে ঘাড়টি মটকে ভেঙে যায়। শম্বরের ঘাড় কামড়ে তবু পড়ে থাকে বাঘ যতক্ষণ না সব ছটফটানি ধড়ফড়ানি শেষে হয়। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে ধীরে সুস্থ খাওয়া শুরু করে।

সবচেয়ে আগে কি খায়?

তুমি পারশে মাছের কোন অংশ আগে খাও?

গাণ্ডানানা উলটে আমাকে শুধোল।

বললাম, মাথা।

গাণ্ডা গোন্দ হেসে বলল, বাঘ শম্বরের পেছন দিকটা আগে খায়।

কেন?

তা কি করে বলব। যার যেমন রুচি।

গাণ্ডা গোন্দ বলল, তুমি তো আমাকে অনেক প্রশ্নই করলে এবার আমি তোমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি?

ধাঁধা? মানে কুইজ?

কুইজ-টুইজ কাকে বলে তা আমি জানি না। অবশ্য আজই আমাকে জিগারি শিখিয়েছে আসতে আসতে।

তাই?

হ্যাঁ।

ভারি মজার মেয়ে ওই জিগারি। খুব ভালো বউ হবে ও সব দিক দিয়ে। যেই বিয়ে করুক না কেন ওকে।

তারপরই বলল, আচ্ছা তুমি মুলারীবাই-এর সঙ্গে কবে দেখা করবে? অতবড়ো ঘরের মেয়ে মুলারী। রাজকুমারী। যেমন সুন্দর, তেমন সম্ভ্রান্ত। ওদের পরিবারের সব মেয়েরই ঠোঁট নোনতা।

মানে?

মানে, তুমি আজ অবধি কোনো মেয়েকে চুমু খেয়েছ টোটাবাবু?

নাঃ।

তুমি এখনও সত্যি সত্যিই ছোটো আছ। তোমার টোটা সত্যিই ফুট্টুস। কৌশল্যা না কি এইরকমই বলেছিল? তোমার জীবনই বৃথা।

হ্যাঁ।

আমি বললাম।

আমার মনে পড়ে গেল কোথায় যেন পড়েছিলাম, "sweet seventeen yet unkissed" তাও মেয়েদের বেলাতে। আর আমি হচ্ছি এক দামড়া ছেলে। কিন্তু ....। আমারই বয়সি মারুতি পানকা তখন ভালুটিলার কালো পাথরের বেদিতে "অদলবদলের" খেলাতে মেতেছে।

নাঃ। জীবনে কিছুই হল না।

গাণ্ডা গোন্দ বলল, মুলারীর দিদিমাকে আমি একদিন চুমু খেয়েছিলাম এক হরিয়ালিতে, নাচতে নাচতে। তখন তো আমিও টগবগে জোয়ান। চুমু, জীবনে অনেকই খেয়েছি কিন্তু অমন পুরন্ত ঠোঁটের নোনতা চুমু কখনও খাইনি। রাজার রক্ত আছে ওদের শরীরে তাই অমন বিশেষত্ব। বুড়া দেও না করুন, তুমি যদি কোনোদিন খুবই গরিব হয়ে যাও, তোমার ঘরে যদি একটু নুনও না থাকে তবে এমন চাঁদের রাতে জ্যোৎস্না দিয়ে গোঁলন্দনি বা সাঁওয়া ধানের ভাত মেখে মুখে দিয়ে মুলারীকে একটা করে চুমু খাবে আর কাঁচা লংকাতে এক কামড়। ব্যস। আর কোন অভাব?

আমি হেসে বললাম, ওর ঠোঁট যে জ্বলবে লংকার ঝালে।

হাঃ হাঃ করে হাসল গাণ্ডা গোন্দ।

বলল, আরে বোকা ছেলে, প্রেম মানেই তো জ্বলুনি। মন জ্বলবে, শরীর জ্বলবে, সেই জন্যেই তো প্রেম করা। মুলারীর মতন সুন্দরী এ তল্লাটেই আর নেই। যে তোমার প্রেমে পাগল তোমাকে না দেখেই, আর তুমি....।

এমনটা ঘটল কি করে বলো তো নানা? এমনও হয় কখনও?

হয় বইকী। শুদ্ধ প্রেম এরকমই হয়। অথচ এই যে মুলারীর প্রেম এ পুরোপুরিই কাম। কারোকে চোখেও না দেখে তার বর্ণনা শুনেই যদি কেউ কারো জন্যে পাগল হয় তবে তা প্রেম অবশ্যই নয়। তা কাম।

তারপর নানা বলল, প্রেমে কি শুধু প্রেমই থাকে টোটাবাবু?

কি থাকে তবে? আর কি থাকে?

মায়া থাকে, মমতা থাকে, সহমর্মিতা থাকে, করুণা থাকে, দয়া থাকে, কামও থাকে। এমনকী ঘৃণাও থাকে। ঘাসের মধ্যে সাপের মতন সার সার শুয়ে থাকে এরা জড়াজড়ি করে। ওদের মধ্যে কোনটা যে কখন সড়াত করে ফনা তুলে উঠে তোমাকে কামড় দেবে তুমি তা পূর্বমুহূর্তেও জানতেও পারবে না। কামড়ের পরে, তাকে বিষই বল অথবা অমৃত, তারই নাম হবে প্রেম।

বাঃ। ভারি সুন্দর বোঝাল তো।

আমি যদি সুন্দর করে কথাও না বলতে পারব তবে, কি আজ রাতে কপালে এমন সুন্দর খিচুড়ি জুটত? কথা দিয়েই তো আমার মাধুকরী।

তারপরই বলল, তোমাকে একটা কথা বলব টোটাবাবু?

বলো।

তোমার কি একবারও মনে হয়নি যে তোমাকে চোখে না দেখেও মুলারীবাই তোমার প্রেমে এমন করে পড়ল কি করে?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, হয়নি যে তা নয়। বারে বারেই মনে হয়েছে।

তবে? তার উত্তর কিছু খুঁজে কি পেলে?

নাঃ।

আমি পেয়েছি।

গাণ্ডানানা বলল।

কি?

মুলারী যতখানি তোমার প্রেমে পড়েছে তার চেয়ে অনেকই বেশি পড়েছে জিগারি। প্রথম দর্শনেই।

বললাম, আর কৌশল্যা?

সেও পড়েছে। তবে ওরটা নির্জলা কাম। বিষধর কাম।

নির্জলা মানে?

মানে নির্জলা মদ যেমন, তেমনই আর কী।

ওই যে এত সেজেগুজে জিগারি তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে মারুতিকে নিয়ে ভালুটিলাতে চাদরা বালিশ বগলদাবা করে নিয়ে শুতে গেল, তা কেন জানো কি?

কেন?

তোমাব মনে ঈর্ষা জাগাবার জন্যে।

ধ্যাত। যত বাজে কথা।

আমি বললাম।

ধ্যাত নয়। তুমি বাজি ধরো আমার সঙ্গে। মারুতি পানকাকে আমি চিনি। ও তোমার চেয়েও বাজে।

বাজে মানে?

বাজে মানে, নিকর্মা। সেও তো আজ অবধি চুমু খায়নি কারোকে।

আজ খাবে।

আমি হেসে বললাম।

জানি না, যদি জিগারি জবরদস্তি করে খায় তবে অন্য কথা। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস ভাইবোনের মতন পাশাপাশি ওরা দুজনে এখন গভীর ঘুমে আছে। মারুতি ঘুমের ঘোরে জিগারিকে কোলবালিশ করলেও হয়তো করতে পারে কিন্তু আর কিছু ওর দ্বারা হবে না। ও একটা আশ্চর্য ছেলে।

খারাপ?

খারাপ কেন? বলব, ভালোই। কিন্তু স্বাভাবিক নয়। আদৌ স্বাভাবিক নয়। তোমাদের মতন বয়সি ছেলে-মেয়েদের যদি একে অন্যকে চুমু খেতেও ইচ্ছে না করে, তাহলে তোমাদের গুণিনের কাছেই নিয়ে যাওয়া উচিত। মন্ত্রপড়ানো উচিত। যে বয়সের যা। এর মধ্যে ভালো বা মন্দের কিছু নেই। কিন্তু তোমরা স্বাভাবিক নয়। এটা খারাপ। খুবই খারাপ।

আচ্ছা নানা, এই যে "জোড়িদার" আর "অদলবদল" শব্দটি তোমরা প্রায়ই বলো, তাদের মানে কি?

ও তাও জানোনি এতদিনে! আমাদের "ঘোটুল"-এ দুরকম প্রথা চালু আছে।

ঘোটুল কি?

হায় বুড়হা দেও। তাও জানো না?

ছেলে মেয়েরা বড়ো হলে, যৌবন পেলে, তাদের বিয়ের আগে গ্রামেরই এক প্রান্তের একটি আলাদা ঘরে, মস্ত বড়ো ঘরে, তারা থাকে। ঘরের মধ্যে আবরুও থাকে। যুবক-যুবতীরা তাদের মনোমতো সঙ্গী বেছে নিয়ে সহবাস করে সেখানে।

সেখানেই থাকে?

না না। থাকে মানে, চিরদিন থাকে না। যতদিন না মন স্থির হয় ততদিন থাকে। সন্ধে নামার আগে আগে প্রতিদিন মেয়েরা গ্রাম ছেড়ে গিয়ে আগে পৌঁছে উঠোন ঝাঁটায়, আগুন জ্বালে, চুল বাঁধে, সাজে। ছেলেরা তার পরে আসে। নাচ-গান হয় সকলে মিলে, অনেক রাত অবধি। গল্প গাছা, তারপর যে যার সঙ্গীকে নিয়ে শুতে যায়।

"জোড়িদার" আর "অদলবদলটা" কি ব্যাপার? তাই তো বললে না একামামা।

বলছি। অনেকে তাদের সঙ্গী নির্বাচন পাকাপাকিভাবে করে নেয়। সেই জুড়িদের বলে জোড়িদার। অনেক আবার কদিন পর পরই জুড়ি বদলায়, নিশ্চিত হতে যে, তার সঙ্গীর সঙ্গে বাকি জীবন থাকতে পারবে কি না। এমন যারা জুড়ি করে, তাদের সেই পদ্ধতিকেই বলে "অদলবদল"।

বাঃ। মুগ্ধ হয়ে বললাম আমি। ভাবলাম, এমন নিয়ম শহরের সভ্য সমাজে কবে যে চালু হবে। সেক্স-এডুকেশনে এবং জীবনের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে ওরা যে কত এগিয়ে আছে আমাদের চেয়ে। ভাবছিলাম, সেই অদলবদল বা জোড়িদার হওয়ার সুযোগ এ জীবনে আমার হবে না ঠিকই কিন্তু এখানে এসে আমার বাগবাজারি জীবনটা যে বদলে গেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এওতো একরকমের 'অদলবদল'!

তারপরই গাণ্ডানানা বলল, আচ্ছা তোমার জন্মস্থানে কি চাঁদ আছে? তুমি কি লগনচাঁদা?

ওসব আমি জানি না। মা জানবে।

আমি বললাম। আমি ওসবে বিশ্বাসও করি না।

হুঁ!

তারপর বেশ কিচুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার কি মনে হয় টোটাবাবু জানো?

কি?

মুলারী তোমার প্রেমে পড়েছে জিগারির কাছে তোমার কথা শুনে শুনে। এমন হয়। অনেকেই হয়। অনেকেই হয়। মুলারীর সঙ্গে যতক্ষণ তোমার দেখা না হচ্ছে, সে বাঁচলেও বাঁচতে পার কিন্তু জিগারি একেবারেই মরেছে। টোটাবাবু দিকু, তুমি আমাদের এই সুন্দর নিষ্পাপ সরল মেয়েগুলোর জীবনে এমন অশান্তি হয়ে কেন এলে এখানে বলো তো? জিগারির বাবা জিগারিকে একটি নৃত্যরতা লালনীল মাছরাঙা শিকার করে তার মাংস খাইয়েছিল সে যখন ছোট্ট মেয়েটি ছিল তখন। তাই যুবতী হয়ে জিগারি একটি মাছরাঙাই হয়েছে। সে মাছরাঙার মতোই নাচে। হাওয়া এসে যেমন করে বড়ো গাছগুলোর অগণ্য পাতাদের হেলায়, দোলায়, নাচায়, জিগারির নাচও তেমন। নাচ ওর মনে। নাচ ওর সর্বাঙ্গে। আর হাসি। যেই দূরের বনে কেউ 'ধামসা' বা 'মাদলে' চাঁটি দেয় বা 'মোহন বাজা'র বা 'টুমার' শব্দ কানে আসে ওর অমনি ও ছুটতে ছুটতে সেখানে চলে যায়।

তারপর বলল তুমি ওর নাচ দেখেছ কখনও?

না।

মুলারীর নাচও দেখার মতন। যদিও ওরা একা একা কেউ নাচে না। দল বেঁধেই নাচে, তবুও দলের মধ্যেও ওরা স্বতন্ত্র। এই তো হরিয়ালি এসে গেল বলে। আর কদিনই বা বাকি? আমি নিজে নিয়ে যাব তোমাকে ছিরহট গ্রামে। দেখবে কত মজা হবে। খাওয়াদাওয়া, নাচ-গান। যাবে তো?

যাব। হরিয়ালি কবে?

এই তো, এই সামনের পূর্ণিমাতেই।

পূর্ণিমা তো এসেই গেল।

হরিয়ালিও তাই।

আরও কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

গাণ্ডা নানা একবার উঠে শঙ্খচূড় সাপটার ল্যাজ ধরে টেনে একটু দূরে ফেলে দিয়ে এল।

সাপ মারলে নাকি পোড়াতে হয়?

আমি বললাম।

আমি জানি না। যেখানে রেখে এলাম, সেখান থেকে রাতের মধ্যেই ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে খেয়ে নেবে।

কে?

খানেওয়ালা কত আছে। বুড়হা দেও-এর বন্দোবস্তে কোনোই গড়বড় নেই। খাদ্য আর খাদক এই সূত্রেই বাঁধা আছি আমরা সকলেই।

তারপরে বলল, চলো, আজ শুয়ে পড়ি। তোমাকে একদিন সারাদিন বসে আমাদের গল্প করব। আরো কত গল্প আছে। কত্তরকম গল্প। তবে জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বসে শুনতে হবে। যেখানে বিরক্ত করার কেউই থাকবে না।

আমার উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কী সুন্দর মিশ্র গন্ধ আসছে হাওয়াতে ভেসে। ডাইনি জ্যোৎস্নায় মনিয়ারী কৈরাহার বুকের উপরে সেই লম্বা লম্বা ঠ্যাং ঝোলানো পাখিটা চমকে চমকে ডাকছে হাট্টিটি-হুট-টি টিটি-হুট টিটিটি হুট। ওর চমক, আমার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। ওরাই কি 'হট্টিমা-টিম-টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম'?

না। এগুলো শুধু পাখিই। শিং নেই এদের।

গাণ্ডার গোন্দ বলল, তুমি আমাদের বুড়হা দেওকে দেখেছ কখনও?

ভগবান?

হ্যাঁ।

না। দেখিনি। কোনো ভগবানকেই দেখিনি।

কাল সকালে দেখাব তোমাকে। ভগবান না দেখলেও ভূত তো দেখেছ।

কোথায়?

অবাক হয়ে বললাম আমি।

গণেশ ভূত।

তারপর গাণ্ডা নানা আঙুল দিয়ে দূরে কতগুলো পেয়ারাগাছকে দেখাল। ভাণ্ডারের ডান পাশে একটা একটা ঢাল আছে। জমি ঢালু হয়ে গড়িয়ে গেছে। সেই ঢাল-এর পায়ের কাছ দিয়ে একটা নালা বয়ে গেছে। তা এখন খটখটে শুকনো। আজকের বৃষ্টির পরে ভিজে নরম হয়েছে অবশ্য নালার মাটি। তবে জল নেই। সেই নালাটা আর ভাণ্ডারের মধ্যে ভাণ্ডার থেকে একশো গজ মতন দূরে আট-দশটা পেয়ারা গাছ আছে। কেউ লাগিয়েছিল কোনোদিন একটি বৃত্ত রচনা করে। এখন সে গাছগুলোর একটিতেও একটিও পাতা নেই। শুকনো ডালপালা, কাঠ, এবং কুটোগুলোও চাঁদনি

রাতের পটভূমিতে কালো রঙে আঁকা ফ্রেমে বাঁধানো কালো একটি আশ্চর্য সুন্দর ছবিরই মতন দেখাচ্ছে, যেমন ছবি, পৃথিবীর কোনো শিল্পীই আঁকতে পারবেন না।

চলো। রাত হল। শোবে।

গাণ্ডানানা বলল।

কাল বড়া দেও-এর স্পর্শ পাবে ওরা। দেখাব তোমাকে।

আমি একটু থাকি। ভারি ভালো লাগছে।

না। আজ তুমি একা বাইরে থেকো না। চলো।

কেন? একথা বলছ নানা?

এমনিই!

আমরা যখন ভাণ্ডারের ভিতরে ঢুকছি তখন শিমুলের মগডাল থেকে সেই মোরাঙ্গী পাখিটা আবারও ডেকে উঠল কী রে! কী রে! কি ? কি? কি?

ভাণ্ডারের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তো শুলাম, কিন্তু ঘুম আসছিল না। অনেক কথা মনে ভিড় করে আসছিল।

কিছু কিছু নাম থাকে, যেমন মানুষের যেমন জায়গার, যা একবার শুনলে কিছুতেই ভোলা যায় না। তেমনই নাম মারুতি পানকার বাড়ি যেখানে, সেই দিনদৌরির। মারুতির কাছে জঙ্গলের সাথে চলতে চলতে কত যে তার মা এবং দিনদৌরির কথা শুনেছি যে সেসব যেন মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই।

এখানে থাকতে থাকতে যদি নাও যাওয়া হয়, তবে একবার ছুটি নিয়েও সেখানে যাব ঠিক করেছি। মারুতির আর আমার ছুটি এক সঙ্গে তো হবে না। হলে কোম্পানির সত্যিই ক্ষতি হবে।

দিনদৌরিতে নর্মদা নদের উপরে মান্ডলার দিক থেকেও আসা যায়। সেই মান্ডলা, যার দুর্গ বিখ্যাত। এই মান্ডলার উত্তরে যে মুণ্ডারা থাকে তারা নাকি ভারি সুন্দর দেখতে। বিহারের রাঁচি ও সিংভূম অঞ্চলের মুন্ডাদের, মানে বিরসা মুন্ডার বাড়ি যেখানে ছিল, সেই অঞ্চলের মুন্ডারা নাকি অন্যরকম দেখতে। এই সবই আমার গাণ্ডানানার কাছেই শোনা। মানুষটা মহীরুহর মতো। নিজে দাঁড়িয়ে থাকলে বা নিজের এলাকাতে থাকলে কী হয়, কোনো মহীরুহতে যেমন দূরদূরান্ত থেকে পাখি এসে বসে দেশ বিদেশের খবর দেয় তাকে, ফল নিয়ে আসে মুখে করে, ফুলের রেণু, বীজ, তা থেকে জন্ম হয় নতুন গাছের,লতা-পাতার, ফুলের রেণু বীজ, তা থেকে জন্ম হয় নতুন গাছের, লতা-পাতার ফুলের গাণ্ডানানা তেমনই। খবর সত্যিই কিছু রাখে মানুষটা। হাজার হাজার বছর গাছপালা মাটি চাপা থাকার পর যেমন প্রস্তরীভূত হয়ে কয়লা হয়ে যায়, গোণ্ডানানাও তেমনই যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। পরতের পর পরত জ্ঞান এসে তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে মুড়েছে বছরের পর বছর। তার বয়সেরও গাছপাথর নেই। মারুতি বলে, পঁচাশি পেরিয়ে গেছে। অথচ পাহাড়ে পাহাড়ে দিনে কুড়ি মাইল পথ চড়াই উতরাইয়ে এখনও হেঁটে যাবে কোনোরকম দানাপানি ছাড়া। আশ্চর্য মানুষ।

মান্দলা থেকে গুপ্ত গঙ্গা নদী পেরিয়ে ছবি, রায়ঘাট আর সাক্কা পেরোলেই দিনদৌরি। আর এই গামহারগাঁও থেকে যেতে হলে তো সুন্দরগড় থেকে নাওয়াকেরা কুনজারা হয়ে বান্দারচুঁয়া, প্রতাপগড়, অম্বিকাপুর, বিসরামপুর, বৈকুণ্ঠপুর হয়ো হাসদেও নদীর পেরিয়েও যাওয়া যা—য়।

গাণ্ডারা নানার কাছে নানা জায়গার নাম শুনি, মারুতির কাছেও শুনি, আর ভাবি, আমাদের দেশটা কত বড়ো, কত বিচিত্র। কত রকমের মানুষ, কতরকম তাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার। কলকাতাতেই থাকলে এইসব কি জানা হত আদৌ?

ভাবছিলাম, প্রথমে যখন এখানে আসি, তখন কটি গাছই বা চিনতাম। কতরকম বীজের বা

ওষধি লতাপাতা গাছের কথাই বা জানতাম। এই চার মাসে কত কী-ই না চিনলাম, জানলাম। তবে শেখা ও জানার বাকিও আছে অনেকই। এখনও সামান্য শিখেছি।

আমাদের পাড়ার রকে বসে যখন নান্টা, পিন্টু, ফটকে, সুমিত এদের সঙ্গে আড্ডা মারতাম তখন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, কংগ্রেস-সি পি এম, উত্তম-সুচিত্রা, হেমন্ত, সতীনাথ, ধনঞ্জয়, সন্ধ্যা মুখার্জি আর আলপনা ব্যানার্জিদের কথা, চুনি আর পি কে-র কথা, জ্যোতিবাবু-প্রফুল্ল সেনদের কথা আলোচনা করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। আঁটসাট করে শাড়ি পরা দিশি মুরগির মতন "সুচিত্রা-সুচিত্রা" ভাব-করা পাড়ার মেয়েদের দেখেই ভেবেছি পৃথিবীর নারী জাতির বুঝি এরাই একমাত্র প্রতিভূ। অনুরোধের আসরের গান শুনে ভেবেছি, এই গানই বুঝি পৃথিবীর একমাত্র গান। পৃথিবী তো দূরস্থান,আমাদের দেশটাই যে কত বড়ো, কত বিচিত্র, বড়োমামার দয়া না হলে এবং অবশ্যই বাবা হঠাৎ না চলে গেলে, আমার জীবন ঘটনাপরম্পরায় এখানে আমাকে নিয়ে এলে সে কথা ও জানা হতো না।

এই রাজ্য ছেড়ে আর যাব না ভাবছি। এখানেই এক ফালি জমি বন্দোবস্ত করে দুটি ঘর বানিয়ে নিয়ে মাকে নিয়ে আসব। বেশি জমি বা বড়ো বাড়ির দরকারই বা কি এখানে? সারা পৃথিবীই তো আমার! " I am the monarch of all I survey."

রাতের বেলা শীতে ও বর্ষাতে এবং অবশ্যই গ্রীষ্মেও মাথা গোঁজার মতন একটা জায়গা হলেই হল। আর একটি বারান্দা। খুব চওড়া বারান্দা।

সারাটা দিনই তো প্রকৃতির বুকের কোরকে, জল, হাওয়া, ধুলো, বালি নদী, পাখি প্রজাপতির মধ্যে কাটানো যাবে। ঘর তো শুধু রাতটুকুরই জন্যে।

মাঝে মাঝে মনে হয় কৌশল্যার ছেলে ডুংগার মতন এখানে ধুলো খেয়ে থাকলেও মন্দ হয় না। এই দৃশ্যে ও গন্ধেই পেট ভরে যাবে। পেটের জন্যে আলাদা বরাদ্দ কিছু না করলেও চলবে। "বড়োলোক" হওয়া আর "সুখী" হওয়া যে এক নয় এই কথাটা এখানে না এলে, এই বনবাসের না থাকলে জানা হত না।

এই আদিবাসীদের বাইগা, কবিরপন্থী পানকা, ভিমা (ভীমসেন) ধিমার (জেলে), ছত্তিশগড়িয়া লামানা, বানজারা আরও কত সব জাত দেখলাম।

নর্দমা যদিও নদ, তাকে বলা হয় মাইকাল কন্যা। মাইকাল পর্বতমালা থেকে উদ্ভূত তাই। আসলে নদ আর নদীরা মধ্যে কী যে তফাত তা আমি জানতাম না। চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া গান্ডা নানাই একদিন বলেছিল, যে-নদীর জন্ম প্রস্রবণ বা ঝরনা বা প্রপাত থেকে তাকে বলে নদী। আর যার জন্ম, কোনো হ্রদ বা পোকরা (পুকুর) থেকে, (যেমন পাহাড়চুড়োতে নর্মদা উদগম) তাকে বলে নদ।

গাণ্ডানানার কথা ভৌগোলিকেরা মানবেন কি না জানি না তবে মানেটা আমার কাছে খুবই জুতসই ঠেকেছিল।

এখানে ঘাসই যে কতরকমের আছে তাও কি ছাই আগে জানতাম। আমাদের কোম্পানির সঙ্গে ঘাসের যদিও কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু অনেক ফড়ে ঘাসও সংগ্রহ করে। আসন, মোড়া, ঝাঁটা গোরু-মোষের জাবনা ইত্যাদি হয়। ওষুধে লাগে দু এক রকমের ঘাস।

চুন্নুবাবু একদিন বলেছিলেন, যখন আমরা সকলে দুদিন পেন্ড্রা রোডে গিয়েছিলাম যে এই মধ্যপ্রদেশে শুধু ঘাসই হয় চল্লিশ রকমের। তার মধ্যে মারুতি, গাণ্ডাননা আর দুখি বাইগা যে করকমকে চিনিয়ে দিয়েছিল সেগুলোর নামই আমি জানি শুধু। ভারি সুন্দর সব নাম। পুলি, চিকুয়া, ভোঁস, গারু, রুসা, দুব, ফুশ, শামা, ছির, ভুরুভুরি, দীননাথ (হ্যাঁ! ঘাসের নাম দীননাথ!) ফুলবাহাবি কুশ আরও কত বলব।

বাঁশও হয় ছ-রকমের। তবে সব জায়গাতে সব কিছু হয় না। এই তো প্রকৃতির খেলা। কোন আঁচলে আর কোন জমিতে যে কোন বুটিদার কাজ বসাবেন তিনি, কোন ডোরা তা তাঁরই খুশি।

মেডিসিনাল প্লান্টস-এর মধ্যে আছে সর্পগন্ধা, অশ্বগন্ধা, জংলি পেঁয়াজ জংলি রসুন, কালি হলদি, তেজরাজ চিরায়ত আকারকার, কেওকান্দ, জংলি আদা ইত্যাদি আরও অনেকরকম।

লতার মধ্যে তো আছে অজস্র। কিন্তু নাম শিখেছি ও চিনেছি অল্পকটিরই। যেমন, শিকাকাই। মা, শিকাকাই শ্যাম্পু মাখতেন চুলে এক সময়ে। কলকাতায় সেই সময়ে শিকাকাই শ্যাম্পু খুব জনপ্রিয় ছিল। তখন কি জানতাম এই মাইকাল আর বিন্ধ্য পর্বতমালা আর ছত্তিশগড়ের বনজঙ্গলের লতা থেকেই তা সংগৃহীত হয়? শিকাকাই ছাড়াও চিনেছি সাগরগোটি কুকরঞ্জ, হাতিস্পন্দন, অগ্নিশিখা (গাছ নয় লতা) কেওটি মাকর ইত্যাদি।

ঝোপঝাড়-এর মধ্যে যা ফুল-ফলের কিছু কিছু আমাদের কোম্পানির কাজে লাগে তার কিছু কিছু হচ্ছে কাটাঙ্গি, বাবুল, চিরচিরা, সিমাল, খাটুয়া, ভাঁটা কালি, মুসলি, বৈবারাঙ্গ, বনতুলসী, নীরগুড়ি, ঝারবেরি, গুরসুকরি, হরশিঙ্গার তুলসী ইত্যাদি।

গাছেদের মধ্যেও আর কটিরই বা নাম জেনেছি? গাছের তো সমুদ্র এখানে। কটি ঢেউকে আর চিনে রাখা যায়? শুনেছি, আমার সঙ্গে "কেলাপান" পাতানো ফরেস্ট গার্ড সাগেলার কাছে যে, প্রায় দেড়শো রকম গাছ আছে মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে। তাদের মধ্যে কিছু কিছুর নাম আবার ভারি মজার। যেমন "খুরসানি ইমলি'।

চুন্নুবাবু বলেছিলেন, এগুলোর অন্য নাম "বাওবাব"। মধ্যপ্রদেশের "ধার" জেলার মাণ্ডুর দুর্গের (রূপমতী—বাজবাহাদুরের মাণ্ডু) মধ্যেও এই মহীরুহ অনেক দেখা যায়। এদের আরেকটি নাম "THE UPSIDE DOWN TREES.আফ্রিকা থেকে মুসলমান নবাবেরা এই গাছ এনে ভারতের নানাা জায়গাতে লাগিয়েছিলেন নাকি একসময়ে। অপেক্ষাকৃত রুখু জায়গাতে হয় এই গাছ।

এখানে গাছেদের যে নামগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং গাছের রূপও তার মধ্যে সাদা খয়ের, মুণ্ডালী, মাহারুখ, চিচোয়া, সাদা শিরিষ, হিঙ্গোট এবং গোন্দি। গোন্দদের ভাষার নামও গোন্দি।

রুদ্রাক্ষর গাছও দেখেছি অনেক। ঠাকুমার গলাতে রুদ্রাক্ষর মালা ছিল। সেই রুদ্রাক্ষর কি যেন নাম ছিল, সপ্তমুখী না কী যেন! সেই গাছ যে দেখব, তা কখনও কি ভেবেছিলাম! এখানে "গাধা পলাশ" নামে একরকমের গাছ আছে। বেচারিদের নাম গাধা হল কেন কে জানে!

পাঙ্গারা, ঝারবেরি, বান্দর লাড্ডু, দুধি, কুর্চি, বিজা, পিলু (রাগের নামে নাম), রেইনট্রি। বাঘ-পানকা গণেশ আমাকে যে তিনটে বড়ো গাছ দেখিয়ে বলেছিল "নানকুরি" গাছ সেগুলো দেখতে রেইনট্রিরই মতন। মনে হয়। বয়স তাদের যেন এক শতাব্দী!

সাজা গাছ গোন্দ বাইগাদের কাছে খুবই পবিত্র গাছ। ওদের সব শুভ কাজেই সাজা গাছের পাতা লাগে।

মহুয়া থেকে মদ তো তৈরি হয়ই, কিন্তু মহুয়া ছাড়া এখানে আরেকরকম গাছ হয়, তাকে বলে 'সলফি'। গাছগুলো দেখতে বড়োলোকেদের বাড়িতে যেমন 'পাম গাছ' হয় অনেকটা সেই রকম। তাল-খেজুরের গাছে হাঁড়ি বসিয়ে যেমন রস নামিয়ে এনে তা গাঁজিয়ে বা ফারমেন্ট করে তাড়ি করা হয় এই সলফি গাছ থেকেও তেমন করা হয়। এই রসের নেশা নাকি সাংঘাতিক। এক চুমুক খেলেই নাকি মাথায় চড়ে যায়। অনেকে তাই, গাণ্ডা নানান মতো, মহুয়ার সঙ্গে মিশিয়ে খায়।

আমি তো ও রসে বঞ্চিত। অনেক রসেই বঞ্চিত। এখন দেখি, হরিয়ালির পূর্ণিমা রাতে রাজকুমারী মুলারীবাই-এর সন্দর্শনে গিয়ে কী ঘটে! আদৌ কিছু ঘটে কি না!

এখন রাত গভীর। ভাবনাতে যে সময় কি ভাবে সুগন্ধরই মতন উড়ে যায় তা বোঝা পর্যন্ত যায় না। পাশের চৌপাইতে গাণ্ডানানা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ফাগুও কোণে তার চৌপাইতে ঘুমিয়ে কাদা। শুধু আমারই ঘুম আসছে না।

ভাবছিলাম, এখন কি সেই মরা শঙ্খচূড় সাপটাকে শিয়ালে কী হায়নাতে টেনে নিয়ে গেছে? তক্ষক দুটো তখনও ডাকছে থেকে থেকে, টাকটু-উ-উ! টাকটু-উ-উ। আর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় বিধবার বেশ পরা সেই মনিয়ারী কৈরাহার বুকের উপরে সেই পাখিটাও তেমনই ডেকে ফিরছে। হুট্রিটি-টি-হুট, হুট-হুট, হট্রিটি-টি-হুট। মারুতি আর জিগারির বাসর জাগছে কি ও?

হোলিতে ডাকাতদের হাতে মার খেয়ে তো শয্যাশায়ী হয়েই ছিলাম এখন দেখি হরিয়ালিতে কি হয়! ভাবছিলাম "অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকায়ে যায়।"

এখন কত রাত কে জানে!

আচ্ছা সত্যিই কি বাঘ-পানকা গণেশ ভূত? এইসব মানুষগুলো বড়োই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সকলেই। নইলে গাণ্ডা গোন্দ থেকে শুরু করে জিগারি, মারুতি, ফাগণ্ডু, এরা প্রত্যেকেই ওই কথা বিশ্বাস করে?

যাই হোক, কাল সকালেই ওদের লেবিনসাহেবের কাছে ওরা নিজেরাই যখন যাবে তখনই ওদের সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

এখানের সবই ভালো। শুধু ভূত আর ভগবান নিয়ে এরা বড়ো বেশি মাথা ঘামায়, এই যা।

বৃষ্টি নামার পরে প্রকৃতি ঠান্ডা, স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। শুধু গামহারগাঁও এর মানুষেরাই নয়, গণিয়া, ছিরহট, অচানকমার, লামনি, কেঁওচি, শেওতারাই সব জায়গার মানুষই আজ বড়ো আরামে ঘুমুচ্ছে বহু মাস পরে।

এখন মারুতি আর জিগারিও কি ঘুমুচ্ছে?

সত্যিই কি মারুতি জিগারিকে কোলবালিশ করে ঘুমুচ্ছে ভালুটিলার মধ্যে? চাঁদের আলো এসে পড়েছে কি নতুন চিকন পাতাতে ভরে যাওয়া শিমুলের ডালেদের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে, গুহার মধ্যে? জিগারির মুখেও কি পড়েছে এক ফালি চাঁদ? নিশ্চয়ই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে জিগারিকে! জিগারি কি সব শাড়ি জামা পরেই শুয়ে আছে মারুতির সঙ্গে? স্বামী-স্ত্রীরা কি জামাকাপড় পরেই ঘুমোয়? একজন যুবতীকে কোলবালিশ করে শুতেই বা কেমন লাগে, কে জানে!

দূরের ছিরহট গ্রামের রাজকুমারী মুলারীবাই কি এই মুহূর্তে ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে শুতে শুতে আমার কথা একবারও ভাবছে?

পাকা ফোড়াতে হাত বোলালে যেমন এক কষ্টমেশা আনন্দ হয়, আমারও ঠিক তেমনই আনন্দ হচ্ছে মুলারীবাই-এর কথা ভেবে। সকালে আমাকে "বুড়হা দেও" দেখাবে বলেছে ওই পেয়ারা গাছগুলোর বৃত্তের মধ্যে। কে জানে! কেমন দেখতে বুড়হা দেও?

কী যে বলল বুড়ো, তা সে বুড়োই জানে!

ঘুমে দু চোখ প্রায় বুজে এসেছে এমন সময়ে হঠাৎ সেই অতিপ্রাকৃত ডাক ডেকে উঠল শিমুলের মগডাল থেকে মোরাঙ্গী—কীরে! কীরে! কি? কি? কি?

নাগবাঁশি আর ভাগেশ্বর দেও ভূতেদের রাজত্বে সেই মধ্যরাতের সাপখেকো মোরাঙ্গীর হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে আমার বুকের মধ্যেটা চমকে উঠল।

তারপরই সব শান্ত হয়ে এল। কেবল নদীর উপরে সেই পাখিটা নিজে চমকে চমকে আর আমাকেও চমকে চমকে ডাকতে লাগল ডিড-ট্য-ডু-ইট? ডিড-ট্য-ডু-ইট, ডিড-ট্য-ডু-ইট করে।

কাকে যে এই প্রশ্ন করে চলে ওই পা-ঝোলানো পাখিগুলো যুগ-যুগান্ত ধরে?

✸

ভাল লাগে না

যেদিন এখানে এসে পৌঁছল তার কয়েকদিন পরে বিকেলে বেরিয়েছে। সামনে দিয়ে একটা খালি সাইকেল রিকশা বেরিয়ে যাচ্ছিল।

এই যে, এই রিকশা, পাবলিক লাইব্রেরি যাবে?

চলমান সাইকেল রিকশাটা থেমে গেল। রিকশাওয়ালার বয়স তিরিশ-টিরিশ হবে।

একটি হলুদ-কালো চেকচেক বুশ শার্ট ঊর্ধ্বাঙ্গে আর নিম্নাঙ্গে একটি আধময়লা পায়জামা। মুখের দুই কষে সদ্যচিবোনো পানের রসের লালিমা লেগে আছে।

রিকশাওয়ালা দার্শনিকের মতন চোখ সরু করে কয়েক মুহূর্ত নমিতের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, ভাল লাগে না।

বলে কি মানুষটা! ভারি অবাক হল নমিত। কী বলা যায়। 'দার্শনিকের মতনও' নয়, যে পুরোপুরিই দার্শনিক।

তারপর ভাবল, এই শিলচর শহরটা, এই বরাক উপত্যকা এবং পুরো কাছাড়ই একটি বিশেষ জায়গা, যা অরিজিনাল। যার সঙ্গে অন্য কোনো জায়গারই তুলনা চলে না।

ওষুধ কোম্পানির ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে এখানে না এলে সত্যিই হারাতো নমিত অনেক কিছুই। এই উপত্যকা, এই শহর, এই শহরের মানুষজন, সব কিছুরই এক বিশেষত্ব আছে। মাসখানেক হল এখানে এসেই বুঝেছে সে কথা।

ঘড়িতে দেখল, পাঁচটা বাজে।

মেঘাদা বলেছিলেন পাবলিক লাইব্রেরিতে দেখা করতে। উনি সাড়ে পাঁচটাতে পৌঁছোতে বলেছিলেন। অনেকে যেমন পুলিশ হয়েও ভদ্রলোক থাকেন, মেঘাদাও একেবারে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি হলেও স্বভাবে পাক্কা সাহেব ছিলেন। অথচ যাকে বলে একেবারে ভেতো বাঙালি। লুঙ্গি পরেন, শিঁদল শুঁটকি খান। তাঁর সাড়ে-পাঁচটা মানে সাড়ে-পাঁচটাই।

নমিত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তাতেই পড়ল। রিকশাওয়ালা তো তার দুর্জ্ঞেয় ভাল লাগে না উচ্চারণ করেই চলে গেল। এখন, সময়ে পৌঁছোয় সে কি করে! শেষে ঠিক করল, হেঁটেই যাবে।

তার অফিসেব সামনে থেকে পাবলিক লাইব্রেরিতে পৌঁছে যেতে আধঘণ্টার মতনই লাগা উচিত। কিন্তু, এই "ভালো লাগে না"র দেশে এছাড়া আর উপায়ই বা কি? অন্য দিন হলে রিকশার অভাব ছিল না। কী কারণে যেন সারাদিন আজ রিকশাওয়ালাদের হরতাল ছিল। চারটেতে হরতাল উঠেছে। তারপর আর অনেক রিকশাওয়ালাই রিকশা বের করেনি। হয়তো দুপুরে খেয়েদেয়ে বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুম লাগিয়েছিল। তারপর আর ভাল লাগেনি বেরোতে। আর ওই রিকশাওয়ালারই মতো যারা বা পথে বেরিয়েওছে তাদেরও মুখে "ভাল লাগে না"।

এ শিলচরেই সম্ভব। হয়তো এই শান্ত, সবুজ শহরে, এই উপত্যকাতে এখন্য কলকাতার মতন সর্বগ্রাসী লোভ এসে থাবা গেড়ে বসেনি। কিন্তু জমির দাম শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। এত

টাকা আসে কোত্থেকে? উৎসটা? কে জানে! তবে কাছেই বাংলাদেশ। চোরাচালান-টালানও করে নিশ্চয়ই কিছু মানুষ যেমন প্রায় অধিকাংশ সীমান্তভূমিতেই করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া আছে চা। ক্যাশ ক্রপ। এই শহরের চারদিকে তো বটেই, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, ওদিকে হাফলং সব দিকেই অগুনতি চা বাগান। কংগ্রেসের মারকুট্টে মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবও তো এই শিলচরেরই মানুষ। তাঁদের পরিবারেরও একাধিক চা বাগান আছে।

কলকাতায় নমিতদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতু সেন সাহেবের বাড়ির এক পার্টিতে সন্তোষমোহন দেবের এক ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মাঝারি উচ্চতার, সামান্য ভুঁড়ি আছে, মাঝবয়সি ভদ্রলোক। হাতে পাইপ। মুখে হাসি। নাম সম্ভবত ঝুনু দেব। হ্যাঁ ঝুনুবাবুই! ঝুনুবাবু সেনসাহেবকে বলেছিলেন, যদি কখনও চুপচাপ বিশ্রাম নিতে চান কয়েকদিন তাহলে আমাদের বাগানে গিয়ে থাকুন। অলফাউন্ড। এভরিথিং অন দ্য হাউস। উই উইল বি ভেরি হ্যাপি। আমার মেজদা থাকেন ওখানে। দেখাশোনার কোনোই খামতি হবে না।

সেনসাহেবও পাইপ কামড়ে বলেছিলেন, দেখি, যাব একবার। সবই তো আছে জীবনে। শুধু সময় নেই। সময়।

এমনই হয় সংসারে। যাদের হাজার জায়গা আছে বেড়াতে যাওয়ার, হাজার নেমন্তন্ন, তাদেরই যাওয়ার সময় নেই কোথাওই। আর নমিতের মতন স্বল্পবিত্ত, সাধারণ যারা, যাদের সাধ আর সাধ্যের মধ্যে ফাঁক থাকে সব সময়ই বিস্তর, তাদের কে ডাকে? কেউই ডাকে না। তাদের বাৎসরিক ছুটি, তাদের মধুচন্দ্রিমা সব অবহেলাতে অপসৃত হয়। অথচ মধুচন্দ্রিমাতে মধু তো বড়োলোকদের বেশি থাকে না স্বল্পবিত্তদের চেয়ে।

"মানি বিগেটস মানি"। তাছাড়া, তেলা মাথার মানুষেরা তেলা মাথাতেই তেল দিতে ভালোবাসেন।

অবশ্য ওদেরও একটা বক্তব্য আছে। নমিতের কোম্পানির বড়োসাহেব সেনসাহেব একদিন অন্য কারোকে বলছিলেন, ওভারহিয়ার করেছিল নমিত। বলেছিলেন, যাঁরা ওয়েল-অফ, অবস্থাপন্ন, তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ জীবনের একটা সময়ে এসে নিজেদের আর্থিক সমতার মানুষ ছাড়া অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। না, সবাই যে স্বার্থপর বা গরিবদের মানুষ মনে করেন না, তা নয়। নানারকম লোভ স্বার্থপরতা, কী অকৃতজ্ঞতা এবং নীচতার শিকার হতে হতে তাঁরা হয়তো বাধ্য হয়েই নিজেদের Coterie-তেই ফিরে যান। তাছাড়া ঈর্ষার কামড় তো সব সময়ে থাকেই।

সেনসাহেব বলেছিলেন, ঘোষসাহেবকে, বুঝলে ঘোষ, আমাদের এই বঙ্গভূমে তোমার সাফল্যের পরিমাপ নির্ধারিত হয় তোমার শত্রুসংখ্যা দিয়েই। Success is measured by the number of your enemies.

ঘোষসাহেব বলেছিলেন, শুধু বঙ্গভূমে কেন? সব জায়গাতেই তো এরকমই।

না, ঘোষ। বঙ্গভূমির মতন দেশ আর নেই এই বাবদে। ডি. এল. রায় ঠিকই লিখেছিলেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।"

নমিত ভাবছিল এই শিলচর তো বঙ্গভূম নয়। একদিন অবশ্যই ছিল। এখন মানচিত্রে আসাম হয়ে গেছে। আসলে শুধুমাত্র বঙ্গভূম তো নেই-ই আর, এ জায়গা। সর্বার্থেই কসমোপলিটান হয়ে গেছে। যাই হোক। তবে এও ঠিক যে, এই কাছাড়ে, বরাক উপত্যকাতে মুখ্যত বাংলা ভাষাভাষী মানুষদেরই বসবাস যদিও, কিন্তু রাজ্যটা তো আসামই। এখানের মানুষদের ওপরে জোর করে অহমিয়া ভাষা চাপানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে উনিশশো একষট্টিতে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে সমেত চৌদ্দ জনের প্রাণ গেছিল পুলিশের গুলিতে। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গর কজন শিক্ষিত বাঙালি এই খবর রাখেন? যদিও তাঁদের প্রত্যেকেই বাংলাদেশের ভাষা

আন্দোলনের কথা জানেন, একুশে ফেব্রুয়ারির কথা জানেন। বাংলাদেশের শহিদদের জন্যে নানা কবিতা গদ্য, গানে কান্নাকাটি করেন। তাতে কোনো দোষ দেখেনি নমিত। কিন্তু বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে নাকি মাত্র দুজন মারা গেছিলেন। ওর মনে হয় যে, এটা অত্যন্তই লজ্জার কথা। কাছাড়েব শহিদদের কোনো খোঁজই রাখেন না কলকাতার মানুষেরা। কলকাতার মানুষদের মতন কূপমণ্ডুক মানুষ সম্ভবত পৃথিবীতে নেই। তাঁদের কাছে কলকাতা আর ভারতবর্ষ সমার্থক। শুধু ভারতবর্ষই বা কেন, হয়তো সারা পৃথিবীই। তাজ্জব ব্যাপার।

লজ্জাই হয় ভাবলে।

দেবি করলা ক্যান? ইটা কিতা?

কী করব দাদা! সাইকেল রিকশা এল না। অন্য রিকশাও ছিল না।

যখনই কারো সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে বারাইবা, এই সব ইভেনচুয়ালিটির কথা মনে বাইখ্যাই বারাইতে অইব। হাজারও ছুতা দেওয়া, হেই আমাগো বাঙালিগো একটা হেবিট-এ দাঁড়াইয়া গ্যাছে। কোনো জাতেরই কিসসুই অইব না, অইতে পারে না, যদি পাংচুয়ালিটি, ডিসিপ্লিন তাদের রক্তে-মাংসে মিশ্যা না যায়।

তারপর মেঘাদা একটু চুপ করে থেকে বললেন, চেষ্টা করলেই পারন যায়। যারা সময় দিয়া সময় রাখবার না পারে, তাদের লগে আমার পক্ষে কুনো সম্পর্ক রাখনই সম্ভব নয়। এই কথা তোমারে আজ শ্যাষ বারের মতনই কয়্যা দিলাম নমিত। মনে কিছু খারাপ পাইও না য্যান।

নমিত লজ্জিত হয়ে বলল, না না, খাবাপ পাব, মানে, ভাবব কেন? আপনি তো ঠিকই বলেছেন। আর আপনি নিজে তো সব সময়েই সময় মেনে চলেন।

হ। অবশ্যাই চলি। টাইম ইজ মানি। কিন্তু এহনে সময়—যে হতভাগারা মাইন্যা চলে তারাই হইল গিয়া ওয়ারস্ট সাফারার ইন অল স্ফিয়ারস অফ লাইফ। তাগো পদে পদেই বিপদ। কী অফিসে, কী কলেজে কী থিয়েটারের বিহার্সালে! আমাগো কিসসু অইব না।

তাবপরই বললেন, চলো, আউগগাইয়া যাই গিয়া।

প্রথম প্রথম মেঘাদার ভাষাটা বুঝতে নমিতের খুবই কষ্ট হতো। এখন অসুবিধা হয় না। তবে মেঘাদার ভাষাটা সিলেটি বা কাছাড়ের ভাষা নয়। ওঁর বাড়ি ফরিদপুরে না কোথায় যেন ছিল। ওঁর মানে, ওঁর পিতৃপুরুষের। ওঁর বাবা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন। উনি ফরিদপুর জায়গাটা দেখেনওনি কখনও। অথচ আশ্চর্য, ভাষাটা ওঁর মুখে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে।

কে জানে! এমনি করেই বোধহয় অসহায় মানুষেরা, বিনা দোষের উদ্বাস্তুরা, পৃথিবীর সব দেশেই নিজেদের শিকড় আঁকড়ে থাকার বৃথা চেষ্টা করেছে যুগে যুগে। স্বদেশ হারিয়ে গেছে কিন্তু নস্টালজিয়া যায়নি।

নমিত ভাবে, এ অবশ্যই এক ধরনের মূর্খামি। পবম মূর্খামি। যে দেশে, তাদের স্বদেশী বলে মানেনি সেই দেশকে বর্জন করাই উচিত ছিল। কিন্তু যা কিছুই উচিত তার কতটুকুই বা করতে পারে মানুষ! পৃথিবীর সব দেশেরই অগণ্য হতভাগ্য মানুষ?

যারা না বেরোল, না বেরোল, কিন্তু যারা বেরোলও, তাদের ভাল না লাগার কী কারণ হল? মানে, রিকশাওয়ালাদের কথা বলছি।

মেঘাদা হেসে উঠলেন। বললেন, আরে ভাল্লাগে নার সঙ্গে প্রকৃত ভাল লাগা-না-লাগার কোনো সম্পর্ক নাই। ওইটা একটা স্পেশ্যাল এক্সপ্রেশন বরাক উপত্যকার মানুষদের।

বলেন কি আপনি? ভাল্লাগে না?

ঠিকোই কই।

শিলচরের মানুষদের মুখের এই 'ভাল লাগে না' মানেটা আক্ষরিকার্থে ধরবা না। তার লগ্যে রিয়্যাল ভাল লাগা-না-লাগর কুনো রিলেশনই নাই।

এ আবার কি কথা? 'ভাল লাগে না' মানে ভাল না-লাগা নয়?

না। কইল্যামই তো! ভাল লাগে না মানে এখানে হইতাছে, ''না''। মানে, নিগেটিভ। বোঝলা?

এ তো আশ্চর্য মজা। কী নেগেটিভ?

হঃ। কত রঙ্গে ভরা আমাগো দ্যাশ।

তারপরই বললেন, তুমি জলপাইগুড়িতে বা উত্তরবঙ্গে গেছো কি কখনও? ঔষধ বেচো নাই সেই তল্লাটে কখনওই?

নাঃ।

গ্যালে জানতা। সিখানে যদি কুনো চাষারে জিগাও তুমি, কী করেন বা হে? সে তোমারে উত্তর দিবে, ''না করি কোনো''।

দক্ষিণ কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা নমিত অবাক হল। তারপর হেসে বলল, তার মানে?

মানে হইল গিয়া, কিছু করতাছিও না, কিছু করুমও না। খামোখা আমারে বিরক্ত কইর‍্যেন না। এই আর কী!

নমিত হেসে ফেলে বলল, এর মানেটা কি? এই নেগেটিভ অ্যাপ্রোচের? এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির?

মানেডা আর কি? কাজ করুম না। ''ভাল লাগে না''র না আর ''না-করি-কোনো''র না-এর মধ্যে তফাত বিশেষ নাই। বোঝলা নমিত। ইসব অঞ্চলের মাটি বড়ো উর্বরা। বৃষ্টিও হয় প্রচুর। চাষে তেমন কষ্ট তো ছিল না আগে। কৃষি-ভিত্তিক দ্যাশ তো। এই সুরমা, বরাক, খুশিয়ারা সবই প্রাণদায়িনী। তবে এহনে এই হইল গিয়া আমাগো ফিলসফি অফ লাইফ। পুরা ভারতবর্ষেরই। ইন জেনারাল। কাম আমরা করুম না। নিজের নিজের কাম ভাল কইর‍্যা করুম না, কিসসুই জানুম না, শিখুম না। কিন্তু আমরা এহনে হইলাম গিয়া টিফির পুকা। আমরা, এই অধুনা মানুষেরা সর্বজ্ঞ।

পুকা মানে?

আরে ওই হইল গিয়া। তোমরা যারে কও পোকা, ওই আর কী!

তাই?

হ।

এহনে আমরা গল্ফ জানি (যদিও যহনে পোলাপান আছিলাম তহনে ডাণ্ডাগুলি আর কাঁচা জাম্বুরা দিয়া মুথা-ঘাসে ভরা মাঠে ফুটবল খেলন ছাড়া কিসসুই খেলি নাই), স্নুকার জানি, চেস জানি (সেটা অবশ্য বরাবরই জানতাম), ক্রিকেট, সকার, ব্যাডমিন্টন, টেনিস। সাধারণের ব্যাডমিন্টন আর টেবল টেনিস তো ছাইড়্যাই দিলাম। কী আমরা এহনে জানি না, আমারে কওতো একবার দেহি নমিতবাবু? কোন ফিলিম অ্যাকট্রেসের কোন তারিখ থিক্যা ডিভোর্স হইছে তা পর্যন্ত জানি। শুধু জানি না, আমাগো নিজেদের করণীয় যা কিছু কাম, কী বাড়িতে, কী আফিসে, কী স্কুলে বা কলেজে। এই জাতের উপর দিয়া অন্য হক্কল জাত হাঁইটা যাইব না তো কে যাইব? আমরা চাকর অইব না তো কে অইব?

আপনি বড়ো পেসিমিস্ট মেঘাদা। বড়ো নিন্দুকও বটেন।

নমিত ক্ষীণ কণ্ঠে বলল।

হঃ। মাইন্যা লইলাম।

তারপর বললেন, খাইবা নাকি একখান?

কি?

পান?

নাঃ।

তারপর বলল, আচ্ছা! আপনি বলছেন, তাই খেতে পারি এক খিলি।

বাবাঃ! আমার এতই বাধ্য! ক্যান? আমার তো বিবাহযোগ্য মাইয়া নাই ঘরে! আর ব্রাহ্মণীও তো নাই।

আঃ। আপনি না!

তারপর বলল, খয়ের ছাড়া খাব একটা। আর জরদা-টরদা তো একদমই না।

হঃ। কও কী! জরদাই না খাইবা তো পান খাইবা ক্যান? পথের পাশে কত ঘাস, পাতা-পুতা গজাইয়া আছে, তারই দুগা ছিঁড়্যা লইয়া ছাগলের মতন চিবাও গিয়া। পয়সা খরচ কইর‍্যা পান খাওনের কাম কি?

নমিত হেসে ফেলল।

বলল, যাই বলুন। আমি একদিনই জরদা খেয়েছিলাম। প্রাণ প্রায় গেছিল আর কি।

এমন পাখির ছাওয়ের মতন যার পরাণ তার পরাণডা চইল্যা গেল কী রইয়্যা গেল তা জাইনবার লইগ্যা আমার কুনো ইন্টারেস্টই নাই।

আজ শনিবার। মেঘাদা ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজার। খুব কড়া। তবে দুঃখ করে বলেন যে, আজকাল যে-কোনো কাজই নিজে যেটুকু করা যায় শুধু সেটুকুই করা যায়। অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা যে কাজে দরকার, সে কাজ করতে পারা ভারি কঠিন। কাজ করতে বললে এবং ভাল করে করতে বললে তো বটেই, শত্রুই শুধু বাড়ে। তাই অফিসে কাজ আর কারোকেই করতে বলেন না উনি। নিজে ঘাড় গুঁজে কাজ করেন। ফলে, চিরাচারিত নিয়মে অন্যদের অধিকাংশ কাজও তাঁর ঘাড়েই চাপে। তবে শনিবার পাবলিক লাইব্রেরিতে আসেন অফিস করার মতন। রিলিজিয়াসলি। নানা বিষয়ে তাঁর ইন্টারেস্ট। পড়েন, নোটস নেন। শখ ছিল বড়ো ঔপন্যাসিক হবেন। তা না হতে পেরে ব্যাচেলর মানুষ শিলচর থেকেই একটি লিটল ম্যাগাজিন বার করেন। সেই সূত্রে বহু তরুণ-তরুণীর যাতায়াত ঘটে, সবিশেষ, প্রতি শনিবার সন্ধেবেলা। তাঁর অম্বিকাপট্টির বাড়িতে শিলচরের তরুণ কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, চিত্রী সবাই জমায়েত হন। কবিতা-গল্পপাঠ হয়, নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। কেউ কেউ গানও গায়। আঁকা ছবি নিয়ে আসে কেউ কেউ। তাঁর মাতৃপিতৃহীন ভাইঝি সরোজা নাকি একাই দশভুজা হয়ে সবাইকে চা-তেলেভাজা আর মুড়ি জোগায়।

মেঘাদার বাড়ির শনিবারের এই আড্ডার কথা এখানে আসা অবধি অনেকের মুখেই শুনেছে

নমিত। কিন্তু আজই প্রথম এসে পৌঁছল সেখানে। সরোজার মা-বাবা প্লেনে যখন কলকাতা থেকে শিলচরে আসছিলেন তখন হাইলাকান্দির কাছে এয়ারক্র্যাশে মারা যান একই সঙ্গে। কাছাড়ের গরিব মানুষেরাও প্লেনে যাতায়াত করতে বাধ্য হন কলকাতাতে। কারণ, ট্রেনে বা বাসে গুয়াহাটি যাওয়া বড়ো কষ্টকর। দীর্ঘ সময়েও লাগে। কাছাড়ের মানুষদের অনেক রকমের কষ্ট। সে সব এখানে না এলে জানতেও পেত না নমিত। মঝে মাঝে ভেবে ও অবাক হয় যে কলকাতার তথাকথিত 'শিক্ষিত' মানুষেরা প্রকৃতই নিজেদের প্রতিবেশ সম্বন্ধে কত কম জানে। অথচ শিক্ষার আরেক নাম অনুসন্ধিৎসা। কষ্ট সত্যিই আছে অনেক। তবে আনন্দও আছে। যেমন সরোজা।

বাইরের দরজাটা খোলাই ছিল। দরজার বাইরে কয়েকটা সাইকেল। কয়েক জোড়া চটি, কাবলি এবং কেডস জুতো। আজকাল যে কত রকমেরই জুতো বেরিয়েছে। হাঁটার, দৌড়োনোর, নানারকম খেলার। সারা পৃথিবীর মানুষে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর জুতো আবিষ্কারের পর থেকে এতদিন সম্ভবত তথ্যটি জানতই না। সহসাই যেন আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝতে পেরেছে যে, ওই সব জুতো ছাড়া অন্য জুতো পরলেই পায়ের বারোটা বেজে যাবে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই মেঘাদার সঙ্গে ভিতরে ঢুকল নমিত।

ঘরে ঢুকেই মেঘাদাই যে গৃহস্বামী এমন মনে করার কোনো কারণ আর রইল না। যারা ইতিমধ্যেই বসার ঘরের মেঝেতে পাতা মস্ত শতরঞ্জি এবং সাদা চাদরে ঢাকা তক্তপোশের উপরে ইতস্তত বসে ও আধশোয়া হয়েও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তারা মেঘাদাকে স্বাগত জানাল এমনই ভাবে, যেন বাড়িটা তাদেরই। মেঘাদাই অতিথি।

একজন উঠে এসে মেঘাদার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে ভিতরের ঘরে রেখে এল। আরেকজন বলল, গেঞ্জি আর লুঙিটা নিয়ে আসব নাকি?

যাঃ।

মেঘাদা বললেন, লজ্জিত হয়ে।

তারপর বললেন, দ্যাখস নাই যে নমিত সঙ্গে আছে। নূতন মানুষ, কী ভাবব অনে। পুরানা হইতে দে অরে এট্টু। আমি ইন্দারাতে দুই বাল্টি জল ঢাইল্যাই লুঙি-গেঞ্জি পইর‍্যা চুল ফিরাইয়া ফিটফাট হইয়া আইতেছি পাঁচ মিনিটে। সরোজা বুঝি এহনেও চা-টা দ্যায় নাই তুমাগো?

একবার দিয়েছে সরোজাদি। আবার হবে পেঁয়াজি আর মুড়ির সঙ্গে।

মেঘাদা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, ওহো, আলাপই করানো হয় নাই। ইনি হইলেন গিয়া নমিত মুখার্জি: ইওরো ফার্মাসিউটিক্যালস-এর সেলস ম্যানেজার। ইনিও তুমাদেরই মতন রোগাক্রান্ত।

কি রোগ?

একজন জিজ্ঞেস করল।

ভাইরাল ফিবার?

অন্যজনে বলল।

ওষুধ কোম্পানির ম্যানেজারেরও জ্বর হয় তাহলে? এটা একটা নিউজ।

আরেকজন বলল।

সকলেই সেই কথাতে হেসে উঠল।

যে ছেলেটি বলল কথাটা, সে সুদর্শন, তরুণ। একটা সবুজ-রঙা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে আছে আধময়লা পায়জামার সঙ্গে। মুখে বুদ্ধির প্রসাধন। একমাথা ঘন কালো চুল পাশ ফিরিয়ে আঁচড়ানো। কপালের একটা পাশ ঢেকে রয়েছে সেই চুলের ঢলে। তীক্ষ্ণ নাক। উজ্জ্বল দুটি চোখ। ঝকঝকে ছেলে। নমিতের চেয়ে বয়সে বছর পাঁচেকের ছোটো হবে।

একজন বলল, দুর্বিনয়ের কথার ধরনই এমন। কিছু মনে করবেন না স্যার।

কী নাম বললেন? দুর্বিনয়?

ইয়েস।

বাঃ।

নমিত বলল।

বাঃ কেন?

অন্য আরেকজন বলল।

বাঃ এই জন্যে যে, বাঙালিদের নামের মধ্যে বিনয় আর সুবিনয়দের ভিড়ে দুর্বিনয়ও যে আদৌ থাকতে পারে এটা ভাবার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছিল আমার।

তাই?

বলে, লাজুক হাসি হাসল ছেলেটি।

এমন সময়ে আরেকজন বলল, এই তো এসে গেছে সরোজাদি!

নমিত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। এবং তাকাতেই বিদ্ধ হল। বিদ্ধ হল মানে, বাল্যাবধি কতশো নারীকেই তো কাছ থেকে দেখেছে। আত্মীয়, অনাত্মীয়, বোনের বন্ধু, বন্ধুর বোন, পাড়ার মেয়ে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ, কিন্তু তাদের কারোকে দেখেই বা তাদের কারো সঙ্গে মিশেই নমিতের একবারও তারই মতন অন্য একজন মানুষ ছাড়া আর অন্য কিছু বলেই মনে হয়নি। মনে হয়নি যে, নারীরা অন্যরকম, মনে হয়নি যে তারা পুরুষের পরিপূরক বা তারা নইলে বিধাতার সৃষ্টি হিসেবে পুরুষ অসম্পূর্ণই থেকে যেত।

সরোজাকে পোঁয়াজির প্লেট সাজানো ট্রে-হাতে করে ঘরে ঢুকতে দেখেই বিদ্যুৎতাড়িতের মতন নমিত চমকে উঠেছিল। সে যেন ওর বুকের মধ্যে না বলেও বলে উঠল এই নারীর জন্যেই তোমার জন্ম। এর জন্যেই এত বছর তুমি অপেক্ষাতে ছিলে। কোনো মেয়েও যে এমন মেয়েলি হতে পাবে এই সত্য সরোজাকে না দেখলে নমিত হয়তো কোনোদিন জানতেও পেত না।

মাথার উপরে বাঁশের ধারার বেড়ার ফলস-সিলিং থেকে লম্বা ঝোলানো তারের শেষে একা ন্যাংটো বাল্ব জ্বলছিল। সরোজার পরনে একটা হালকা খয়েরি, বেদানার দানার মতন রঙের খযেরি শাড়ি, সাদা, ছোটো-হাতার ব্লাউজ। ছোটো-হাতা মানে, বগলকাট্টি নয়। সভ্য অথচ হ্রস্ব। পেছন থেকে ঘুরিয়ে এনে বুকের ওপরে ফেলে-রাখা একটি পুষ্ট বেণী। কোমর ছাপিয়ে নেমেছে এসে উরুসন্ধির কাছে। তার একেবারে প্রান্তে, আজকাল আকছার দেখা-যাওয়া রঙিন বা সাদা কাপড়ের ফুল নয়, সত্যিকারের ফুল। গোলাপের মতো দেখতে অথচ গোলাপ নয়। হালকা খয়েরি-রঙা। একেই কি মাছি গোলাপ বলে? ভাবল নমিত। তারপরই ভাবল, নাঃ। মাছি গোলাপ তো এত বড়ো হওয়ার কথা নয়।

নমিত দাঁড়িয়ে উঠে হাতজোড় করে নমস্কার করেই নির্বাক হয়ে অপলকে চেয়ে রইল তার দিকে। আর আশ্চর্য! সরোজাও যে স্থান-কাল পাত্র সব ভুলে ওই ভাবেই ওই ন্যাংটো উজ্জ্বল বাল্বের নিচে দুহাতে ট্রেটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল নমিতের চোখে চেয়ে। তাদের দুজনের দিকে যে বহুজোড়া চোখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে কথা তারা দুজনে একেবারেই ভুলে গেছিল। সময়ের মনে সময় বয়ে যেতে লাগল।

জমায়েত হওয়া বহুজনের মধ্যে থেকে কে যেন কথা বলল। কে বলল, কী বলল, কিছুই কানে গেল না নমিতের। হয়তো সরোজারও নয়। মানুষ-মানুষীর হাতে কখনও কখনও, কোনো দেবদুর্লভ সময়ে সময়ও যে পরাজিত হয়, তা আচম্বিতে উপলব্ধি করে চমৎকৃত হয়ে গেল নমিত।

সম্বিত ফিরে পেয়ে সরোজা ট্রেটা নিচু করল। সকলে হাতে-হাতে বড়ো বড়ো প্লেটগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে রাখল

একজন বলল, এই সরোজা, মুড়ি দিলি না আর?

দেব। হাত তো দুটোই। এসো না পলাশদা, নিয়ে আসবে আমার সঙ্গে।

সরোজা যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে, আবারও নিজেকে নিজের মালকিন করে নিয়ে বলল।

চল।

বলে, পলাশ নামক ছেলেটি, যে নমিতেরই সমবয়সী হবে বলে মনে হল, সরোজার সঙ্গে ভিতরে গেল।

দুর্বিনয় চুপ করে নমিতের মুখে চেয়েছিল। কী যেন খুঁজছিল সে নমিতের মুখে। নমিতের মনে হল নমিত মেঘাদার বাড়িতে সন্ধেবেলাতে আসাতে অত মানুষের মধ্যে একমাত্র দুর্বিনয়ই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং কিছুটা বিরক্তও বোধ করছে।

কে একজন বলল, সরোজাদি, মুড়ির মধ্যে পেঁয়াজ কুচিয়ে দিয়ো। ভুলো না।

আরেজজন বলল, কাঁচালংকাও দিয়ো কুচি করে।

কপট বিরক্তির সঙ্গে সরোজা বলল, আজ আমার পিমা আসেনি। তার জ্বর। একা হাতে তোদের মতন এক সৈন্যদলকে সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আরে দাও দাও, প্লিজ। তুমি ইচ্ছে করলে, কী না দিতে পারো?

দুর্বিনয় বলল।

"কী না" শব্দ দুটি নমিতের কানে লাগল। দুর্বিনয়ও হয়তো নমিতের কানে লাগাবার জন্যেই বলেছিল। কিন্তু সরোজা কথাটা শুনেও না শোনার ভান করল।

পেঁয়াজ-লংকা যা খাও তোমরা, দেখে মনে হয় মুসলমান।

মুসলমানদের গায়ে কত জোর দেখো না! কত খাটতে পারে তারা। হিন্দুদের মতন নাকি? যে একটা বউ রেখেই...

অ্যাই কি হচ্ছে স্থিত!

পলাশ সরোজার সঙ্গে ভিতরে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বকে দিল, সে ছেলেটি এই কথা বলল, তাকে।

একটু পরেই পলাশ ফিরে এল একাধিক মুড়ির বাটি নিয়ে ট্রেতে। সরোজা এল না আর। সম্ভবত চা করছে। চা বলে চা! ভাবছিল নমিত। কত কাপ চা লাগবে কে জানে। কেটলি এখানে এনেই তো দিলে পারে। বেচারি!

হঠাৎই এই সদ্য, আলাপিত কন্যাটির প্রতি ওর এত মমত্ববোধ, সহমর্মিতা, সমবেদনা সমব্যথা— এই সবেরই আরেক নাম কি ভালবাসা?

কে জানে! কখনও ভালবাসেনি তো কারোকে আগে।

ভাবছিল, নমিত।

চা নিয়ে এল পলাশ এবং সরোজা। তাদের পেছন পেছনে মেঘাদাও এসে ঢুকলেন। ঢুকে তাঁর ইজিচেয়ারটাতে বসলেন লুঙির ওপরে হাফহাতা গেঞ্জি এবং একখানা পাতলা সুতির চাদর গায়ে দিয়ে।

শীত বড়ো তাড়াতাড়ি চলে গেল এবারে।

বললেন, মেঘাদা।

চেয়ারটা যে তাঁরই সে কথা নমিত ঘরে ঢুকেই বুঝেছিল। কারণ, সে চেয়ারটাতে ঘরে অত মানুষ থাকা সত্ত্বেও অন্য কেউই বসেনি। একটা নীল রঙা বড়ো তোয়ালে পাতা ছিল তার ওপরে। মাথার কাছে তেলের ছোপ। কিছু তেলও মাখেন বটে মেঘাদা! মাথার তেলের ব্যবহার যখন প্রায় উঠেই গেল দেশ থেকে তখন মেঘাদা সম্ভবত একাই হেয়ার-অয়েল ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। চেয়ারটার ডান ধারে একটা ছোটো তেপায়া। তাতে কাগজ, কলমদানি, একটি কালো-রঙা ডায়ারি, সুর কোম্পানির, 'প্রতিদিন' দৈনিক পত্রিকার পুজো সংখ্যা, বহু ব্যবহৃত হয়ে প্রায় ছোঁড়াখোড়া এ মাসের 'নবকল্লোল'। পানের বাটা রাখা ছিল তার পাশে।

মেঘাদা জমিয়ে সেই ইজিচেয়ারে পা তুলে বসে হাতে এক কাপ চা তুলে নিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, দুর্বিনয়, তোমার কাছে আজ নতুন খবর কি আছে?

দুর্বিনয় বলল, আজ জন্মজিৎদার একটা নতুন কবিতা শোনাব। দারুণ কবিতা। কাছাড়ি ভাষাতে লেখা কিন্তু।

বলেই নমিতের দিকে ফিরে বলল, আপনারই বুঝতে একটু অসুবিধে হবে। আমরা সকলেই ঠিকই বুঝব।

অসুবিধে হবে কেন? আমরা মানে বলে দেব। তাছাড়া যে কোনো ভাষাই শিখে নেওয়া যায় দুদিনেই একটু কান থাকলেই। গানেরই মতন। সরোজাই কি আগে তোমাদের ভাষা বুঝতে পারত! ওর মা যেহেতু খাস শ্যামবাজারের মেয়ে, ওর মাদার-টাঙ তো ছিল শ্যামবাজারি ভাষা। ও যখন পারে তখন নমিতই বা পারবে না কেন?

বলেই বললেন, কলকাতাতে তোমাদের বাড়ি কোন পাড়াতে?

লাজুক লাজুক মুখে নমিত বলল, আনন্দবাজারের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে "কলিকাতায় নিজ বাটী" বোঝাতে যা বোঝায়, তা নেই আমাদের। তবে দু পুরুষ হলো ভবানীপুরেই আছি। ভাড়া বাড়িতে।

মেঘাদা বললেন, তাই?

তারপর বললেন, বিবাহযোগ্য এবং নেগোশিয়েটেড ম্যারেজ যাদের হবে তেমন ছেলেমেয়ে যে বাড়িতে আছে, তাদের রবিবারের আনন্দবাজার রাখতেই হয়।

কী অসীম সার্থকতা একটি কাগজের জীবনের?

পলাশ বলল।

তারপর মেঘাদা বললেন, আমিও কি ছাই বুঝতাম, এখানে যখন প্রথম এলাম ধুবড়ি থেকে। পার্টিশানের পরই না আমার বাবা ফরিদপুর থেকে পাট গুটিয়ে ধুবড়িতেই এসে উঠেছিলেন। মানুষ যেখানে থাকে সেখানেরই মতো তাকে হয়ে যেতে হয়। ভাষা বুঝতে হয়, সেখানের খাওয়া-দাওয়াতে অভ্যস্ত হতে হয়, সেখানের রীতিনীতি, সামাজিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া, বিধিনিষেধ জানতে-শুনতে হয়। তা নাহলে সেখানের মানুষের একজন হয়ে থাকাই তো সম্ভব নয়।

পলাশ বলল, জন্মজিৎদার কবিতাটা তো শুনতে দিন মেঘাদা।

আপনি তো থিসিসই সাবমিট করবেন মনে হচ্ছে। "চেঞ্জ ইন হ্যাবিট্যাট"-এর উপরে। আমরা কি হাতি, না পাণ্ডা ভালুক?

ওয়াইল্ড-লাইফ এনথুজিয়াস্ট, জনার্দন বলল।

মেঘাদা বললেন, পাণ্ডা ভালুক তবু এখনও অনেকগুলান পাওয়া যাইব, তুমি আমাগো ওয়ান অ্যান্ড ওনলি জনার্দন।

সরি। সরি।

তারপরই বললেন লজ্জা পেয়ে।

তারপর বললেন, কও দেহি দুর্বিনয়। পড়ো জন্মজিৎবাবুর কবিতাখান। তা তিনি নিজে আইলেন না ক্যান?

তিনি গেছেন হাইলাকান্দি।

ক্যান? হাইলাকান্দি ক্যান?

হাতি বারাইছে।

হাতি? হাতির লগে তাঁর কি?

আহা! তাঁর আত্মীয়দের চা বাগানে হাতি বড়ো উপদ্রব করছে। চারজন লোক মেরে দিয়েছে মস্ত একটা একরা দাঁতাল। সেটাকে রোগ ডিক্লেয়ার করাতে না পারলে কুলিরা কাজ বন্ধ করে দেবে

বলেছে পরশু থেকে। আলটিমেটাম দিয়েছে। জন্মজিৎদার সঙ্গে যে এস. ডি. পি. ও.-র খুব খাতির। শিলচর গুরুচরণ কলেজের এক ইয়ারের ছাত্র তো দুজনেই।

দুর্বিনয় বলল, "রোগ" ডিক্লেয়ার করলেই তো হাতি লজ্জাতে আত্মহত্যা করবে না।

একজন বলল, হাতির আত্মহত্যা করাটাও মোটেই সোজা কথা নয়। দড়ি পাবে কোথায়? হাতিও গাছ থেকে ঝুলতে পারে এমন গাছই বা পাবে কোথায়? কলসিই বা পাবে কোথায় সেই সাইজের?

হেসে বললেন মেঘাদা, তোমরা বড়ো ফাকসা আলাপ করো। সময় আর নষ্ট না কইর‍্যা ইবারে..

ধ্যাৎ! জন্মজিৎদার কবিতাটা শুনতে দেবে কি দেবে না বল তো। এ যে একেবারে পদ্মবনে হস্তীসম ব্যাপার-স্যাপার। কোথায় কবিতা, কোথায় হাতি।

উত্তেজিত হয়ে এবারে বলল দুর্বিনয়।

নমিত চুপ করে চায়ের সঙ্গে একমুঠো মুড়ি পেঁয়াজি দিয়ে খেতে খেতে এই সব কথোপকথন শুনছিল। মজা লাগছিল ওর। রসবোধ আছে শিলচরের মানুষদের। তাছাড়া, আরও একটা ব্যাপার খুব ভাল লাগছে ওর এই একমাস এখানে আসার পর থেকে। তা হল, কলকাতার মতন মদের সংস্কৃতি শিলচরে এখনও এসে পৌঁছোয়নি। গত মাসেই বরাক উপত্যকা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্মেলন হয়ে গেল। প্রায় দিন পনেরো ব্যাপী। যাত্রা, লোকগীতি, সাহিত্যসভা, কবিতা পাঠ। কলকাতা থেকে সাহিত্যিক, গায়ক এসবও এসেছিলেন। গায়ক তো নয়, গায়িকা। গান ভাল লেগেছিল লোপামুদ্রা মিত্রর। জয় গোস্বামীর কবিতা এবং আরও অনেকের কবিতাকে সুর দিয়ে গাইলেন। জীবনমুখী গানের একটি ধারা। কিন্তু সাহিত্যিক যিনি এসেছিলেন তিনি সুপার-ফ্লপ। না পারেন কথা বলতে, না আছে রসবোধ। বোধহয় মদটদ না পেয়ে চটেও ছিলেন উদ্যোক্তাদের উপরে। যখন সাহিত্যসভা হবে তখন তিনি করিমগঞ্জে তাঁর এক কবি বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বসে থাকলেন। বাংলাদেশ থেকেও এসেছিলেন দুজন সাহিত্যিক। তাঁরাই বলতে গেলে সবদিক সামলে নিলেন। ওই সাহিত্যিকের চেয়ে অন্য যে কোনো কবি-সাহিত্যিক এলেই ভাল হত। যাকগে, নমিতের তো কোনো হাত ছিল না! ও এখানে একেবারেই নতুন। সবে দেখছে শুনছে। তার কিছু বলার মতো অবস্থা এখনও আসেনি।

পড়ব?

দুর্বিনয় বলল এবারে।

আর নছল্লা না কইব্যা এবারে দয়া কইব্যা পইড়্যা ফ্যালাও। মেঘাদা অনেকক্ষণ ধরেই এই Beating about the bush এবং নানা detractions দেখে (তার মধ্যে তাঁর নিজের অবদান যদিও কম নয়।) বিরক্ত হয়ে বললেন। এই সভা বা অ্যাসেমব্লিতে উনিই Speaker। মেঘাদার কথাতে সভা নীরব হল।

দুর্বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে যাবে এমন সময়ে পলাশ চেঁচিয়ে উঠল, দাঁড়া, দাঁড়া। সরোজা আসেনি। তার আবার আজ কি হল? ভিতরে করেটা কি সে? সরোজা, ও সরোজা। তাড়াতাড়ি।

সরোজা এসে দাঁড়াল।

বসে পড! বসে পড়।

আবার বলল, পলাশ।

সরোজা মেঘাদার ডানপাশে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে শতরঞ্জিতে বসলে এবারে দুর্বিনয় সত্যিই পড়া শুরু করল।

কবিতার নাম

"তোমারে কইয়ার হুনো"

নমিত বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল দুর্বিনয়ের মুখে। মেঘাদা চা-টা শেষ করে বাটা থেকে একখিলি পান মুখে পুরে জরদার কৌটো থেকে একটু জরদা নিয়ে মুখে ফেলে, নমিতকে ইঙ্গিতে চুপ করে শুনতে বললেন।

দুর্বিনয় এবার কাগজটা সামনে ধরে আবৃত্তি করতে লাগল :

"কাইল মাইজ রাইত কিতা যে
অইল আমার মনো
একবার ই কাইত
একবার হি কাইত
ঘুম আইল না তেবো
আলপিন একটা খুচা দিল বুকুর জেব
আসলে আলপিন নায়
ই তোমার চে'রা
কুশিয়ারার, এ পারো তুমি, হিপারো আমি
মাঝেদি এক বেড়া।"

সকলেই হাততালি দিয়ে উঠল। কেউ বলল, মারভেলাস। কেউ বলল, দুর্দান্ত। আনন্দে আত্মহারা সকলেই। শুধুমাত্র সরোজাই মুখ নিচু করে চুপ করে রইল। আর দুর্বিনয় মাথা উঁচু করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সরোজার মুখে চেয়ে তার নিথর নীরবতার সমুদ্রে কারণ খোঁজার জন্যে মনে মনে ডুবুরি হয়ে নামল। নিস্তব্ধতা ভেঙে সবচেয়ে প্রথম নমিতই প্রশ্ন করল, মানেটা আমাকে বলবেন না?

মেঘাদা বললেন, নিশ্চয়ই বলবে। আসলে, কাছাড়ি ভাষার সঙ্গে আমাদের লেখ্য ভাষার বিশেষ অমিল নেই। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য কবলে আর কান খুলে শুনলেই বুঝতে পারবে। বল দুর্বিনয়, মানেটা বলে দে নমিতকে।

দুর্বিনয় একবার চকিতে আড়চোখে সরোজার দিকে চেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নমিতকে বলল,

"কাল মাঝরাতে কী যে হল আমার মনে।
একবার এপাশ ফিরি আরেকবার ওপাশ, তবু ঘুম কিছুতেই এল না।
একটা আলপিন
বুকের পাঁজরে খোঁচা
দিতে লাগল।
আসলে সেটা আলপিন নয়,
তোমার চেহারা। কুশিযারার
এপাবে তুমি ওপারে আমি,
মধ্যিখানে এক বেড়া।"

বাঃ।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল নমিত।

বুঝলেন তো?

সবই বুঝলাম শুধু চে'রা আর কুশিয়ারা শব্দ দুটির মানে বুঝলাম না।

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

নমিত বুঝতে পারল না এতে হাসির কি হল?

দুর্বিনয় বলল, চে'রা শব্দটির অর্থ হল চেহারা কিন্তু এখানে মুখও বলা যেতে পারে।

আর কুশিয়ারা?

আরে! এয়ারপোর্ট থেকে যখন এলেন শিলচর শহরে তখন কুশিয়ারা নদী পেরিয়ে কি আসেননি! বরাক নদীর একটি উপনদী কুশিয়ারা। অবশ্য কতজন আর নদীর নাম জিগ্যেস করে। নদী শুধু নদীই!

কাকে জিজ্ঞেস করবেন? নদীকে?

হঠাৎ সরোজা বলে উঠল।

তা কেন? যদি কেউ জানতে চায়, তবে কি তাকে বলার লোকের অভাব হয়?

পলাশ বলল।

নমিত বলল, এখানের, মানে, বরাক উপত্যকার সকলেই কি এইরকম ভাষাতেই কথা বলেন?

না না। সকলেই কেন বললেন! এখানে যে অনেকই ভাষাভাষী আছেন। তবে বাংলা ভাষাভাষীরাই তো বেশি তাই বরাক উপত্যকায় বাংলা কমবেশি বোঝেন অন্য সব ভাষাভাষীই।

বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষাভাষী আছেন এই উপত্যকায়? আর সুরমা উপত্যকায়?

সুরমা নদী আর উপত্যকা তো চলে গেছে পূর্ব-পাকিস্তানে। অধুনা বাংলাদেশে। শ্রীহট্টতে। ইংরেজরা যাকে বলতেন সিলেট। তাই বরাকের কথাই বলি।

পলাশ বলল।

এখানের মোট জনসংখ্যা কত হবে?

নমিত শুধোল।

তা প্রায় সাড়ে সতেরো লাখ মতন হবে। তার মধ্যে বাংলা ভাষাভাষীই সাড়ে তেরো লাখ। অসমিয়া ভাষাভাষী সাত হাজার মতন হবে। হিন্দিভাষী প্রায় দু লাখ মতন, রাফলি। 'ডিমাছা' বলে একটি ভাষা আছে। তাও প্রায় ন' হাজারের ওপরে হবে ওই ভাষাভাষীর সংখ্যা। এ ছাড়াও আছে দুরকম মণিপুরি ভাষা।

দুরকম মানে?

কেন? বাংলা ভাষারও তো কত রকম আছে। নেই? লেখ্য ভাষার কথা বলছি না। কথ্য ভাষা। দক্ষিণ বাংলার ভাষা আর উত্তর বাংলার ভাষা কি এক? রাঢ় বাংলার ভাষার সঙ্গে কলকাতার ভাষা কি মেলে? বাংলাদেশের চাটগাঁ, নোয়াখালি, মৈমনসিং, বরিশাল, ঢাকা, এ সমস্ত জায়গার মুখের ভাষাই তো আলাদা আলাদা। তাই মণিপুরিরও রকমভেদ আছে। স্বাভাবিক। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি আর মেইতেই মণিপুরি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষাভাষীর সংখ্যা কত হবে মেঘাদা?

জনার্দন বলল।

মেঘাদা বললেন, তা বত্রিশ-তেত্রিশ হাজার তো হবেই।

আর মেইতেই মণিপুরির?

তার ডবলেরও বেশি। আরে! তোরা ছ্যামড়ারা পড়াশুনা তো করবি না! সুজিতবাবু চমৎকার একখানা আর্টিকল লিখছিলেন না স্মরণিকাতে!

কিসের স্মরণিকা?

নমিত শুধোল।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের স্মরণে যে বইটি বারাইছিল এই তো মাত্র কয়দিন আগেই। সপ্তদশ সম্মেলনের স্মরণিকা। তাতেই পইড়্যা লইও সুজিত চৌধুরীর আর্টিকলখানা। কি যেন নাম ছিল? আরে নামটাও যে মনে পড়ত্যাছে না।

"বরাক উপত্যকার দুখিনি বর্ণমালা।"

একটি ছেলে বলল।

রাইট। ঠিকোই কইছ কল্যাণ।

মেঘাদা বললেন।

তারপর বললেন, আরে আজ জন্মজিতের ফারস্টক্লাস কবিতাটা ছাড়া তোরা কেউই কি আর কিছুই শুনাইবি না?

নমিত বলল, মেঘাদা আপনার এই গুরুচণ্ডালি ভাষাটা বড়োই পীড়াদায়ক।

নমিতের সেই কথাটাতে সরোজার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি এসেই মিলিয়ে গেল।

মেঘাদা বললেন, আমাগো ফরিদপুইর্যা ভাষাটা এক্কেরে ত্যাগ কইরা ফ্যালাইলে, পরে তো আর কইতেই পারুম না।

ক্যান? শুনিসনি কি তোরা নিধুবাবুর গান। "নানান দেশে নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা"।

কে নিধুবাবু?

আরে! তোরা এক্কেবারেই ইললিটারেট, গবেট। রামনিধি গুপ্ত। যিনি প্রথম বাংলা টপ্পার প্রবর্তন করেন।

পলাশ বলল, কখনও তো শুনিনি ওই গান।

নমিত বলল, আমি কিন্তু জানি ওই গানটি। ওর গলাতে লজ্জা ফুটে উঠল। লজ্জা কার জন্যে, কেন, তা সে নিজেও বুঝল না।

জানো গানটা? বলো কি তুমি নমিত? সে তো দাঁতভাঙা টপ্পা। লাস্ট লাইনটাতে এসে "ঘুচে কি তৃষাতে' মনে হয় যেন গায়ক অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। কুঁকড়ে কুঁচিমুচি হয়ে প্রাণ ঘুচে যাবে বুঝি। মাত্র একবারই আমি শুনেছিলাম গানটি হাতিবাগানের এক ভদ্রলোকের বাড়ির আসরে কালীপদ পাঠক মশায়ের গলাতে। শোনাও তো দেখি গানখানি। হায়! হায়! সেই কবে শুনেছিলাম! সে কি আজকের কথা!

সকলের দৃষ্টিই নমিতের মুখের উপরে পড়ল। নমিত একটু গুনগুন করেই ধরে দিল। ও জানে যে, গানটা ও ভালই গায়। কিন্তু মেঘাদাদের গান শোনাবার কোনো ইচ্ছা বা আশু প্রয়োজন ওর ছিল না। ও কিন্তু রাজি ছিল গানটি শুধুমাত্র সরোজাকেই শোনাবার জন্য। গানটি ধরে দিয়েই ও এক ঝলক তাকাল সরোজার দিকে।

প্রথম কলিটি গাইবার পরই ওর মনে হল সরোজা যেন তীরবিদ্ধ হরিণের মতো স্থির হয়ে গেছে। গান-এর মতন তীর কি আর আছে? যে সেই তীর কখনও খেয়েছে আর যে কোনও সেই তীর আত্মবিশ্বাস ভরে ছুড়েছে কারো দিকে, শুধু তারাই জানে এর সুখ-দুঃখের কথা। আস্তাই থেকে অন্তরাতে এল নমিত, শেষ বিকেলের বিধুর আলোতে হরিণী যেমন করে বনের গভীর থেকে বনজ ঝরনায় জল খেতে নামে।

নমিতের গান শেষ হলে স্তব্ধতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। ঘরে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকেরই যেন বাকরোধ হয়ে গেল। সরোজা মুখ নামিয়ে তার গোড়ালি-ঢাকা শাড়ির পাড়ের দিকে অপলক চেয়েছিল। ফুল-সাজানো বেণীও ছিল সেই পাড়ের পারে। বেণীতে লাগানো সেই মাছি-গোলাপের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা গেল সেই গানের অভিঘাতে।

প্রথমে কথা বললেন মেঘাদাই।

বললেন, এ এক আশ্চর্য প্রাপ্তি।

বলেই, একটু চুপ করে থেকে সকলের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা কি বলো?

অন্য কেউই কিছু বলার আগেই উনি আবার বললেন, নমিতকে আমাদের "মিলনী"র পার্মানেন্ট মেম্বার না করে কি আর উপায় আছে? ওর এই প্রতিভাটির কথা তো জানা ছিল না আমার। জানি যে ও কবিতা-টবিতাই লেখে শুধু। যেমন তোদের মধ্যে অনেকেই লেখে। কিন্তু এমন গান! এমন গান তো তোরা কেউ গাইবার কথা ভাবতেই পারিস না।

সকলেই সমস্বরে বলল, তা ঠিক।

পলাশ বলল, কথা থাক। পরে হবে। আর কথা না হয়ে আর একটা গান হোক।

সরোজাও মুখ তুলে সলজ্জে বলল, হ্যাঁ। তাই হোক।

ঘরভর্তি সকলে এবং মেঘাদাও অবাক হয়ে সরোজার মুখে চাইলেন।

পলাশ বলল, তাও কথা ফুটল আজ। কী হয়েছে রে তোর সরোজা আজ? শরীর খারাপ নয় তো?

দুর্বিনয় বলল, এখনও হয়নি কিছুই। তবে হতে পারে। অবশ্যই হতে পারে।

এ কথার মানে?

মানে, যে বোঝার বা যারা বোঝার, তারা ঠিকই বুঝেছে।

দুর্বিনয় বলল।

মেঘাদাকে এই প্রথম একটু চিন্তিত দেখাল। চিন্তাটা ঠিক কার জন্যে? এই সাপ্তাহিক মিলনমেলার ভবিষ্যৎ? না, সরোজার ভবিষ্যৎ? না অন্য আর কিছুর জন্যে? তা তিনি নিজেও সঠিক বুঝলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

দুর্বিনয়ই নীরবতা ভেঙে বলল, গান নমিতবাবু। শুরু করুন।

কিন্তু ওর গলার স্বরে যত না আগ্রহ ঝরল তার চেয়ে অনেক বেশি ঝরল ঈর্ষা। হয়তো একটু বিদ্রূপও। বসন্তের বনপথে যখন পলাশ ও শিমুলের ফুল মিলেমিশে পড়ে থাকে তখন যেমন দূর থেকে বোঝা যায় না কোনটা শিমুল আর কোনটা পলাশ, দুর্বিনয়ের ঈর্ষা আর বিদ্রূপকেও তেমনই আলাদা করা যাচ্ছিল না। মিলেমিশে ছিল।

তখনও নমিত চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইল। মাথা তুলবে কী করে! তুললেই যে সরোজার চোখে চোখ পড়বে। সে যে বাঘের চোখে চোখ পড়ারই মতন হবে। ওর আটত্রিশ বছরের জীবনে নমিত এমন বিপদে এবং অস্বস্তিতে আর পড়েনি। নিজেই নিজের কারণে লজ্জাতে মরে গেল। ওষুধ কোম্পানির সেলস ম্যানেজার হিসেবে বলিয়ে কইয়ে—তুখোড় বহির্মুখী হিসেবে ওর খ্যাতি ছিল, কিন্তু ও যে হঠাৎ বাহ্যত এমন অন্তর্মুখী হয়ে উঠবে বা উঠতে পারে তা ও নিজেও জানেনি কখনও।

মেঘাদা বললেন, গাও, আরেকখানা গান গাও নমিত। সকলেই শুনতে চাইছে।

নমিত মেঘাদার বাক্যটি শেষ হওয়ার আগেই ধরে দিল গানটা। "সুখ কি সতত হয়, প্রণয় হলে"।

গানের মুখটি পরিষ্কার হতেই মেঘাদা বললেন, বাঃ। এটা কার গান হে? এটাও কি নিধুবাবুর?

নমিত বলল, না। এটা গিরীশ ঘোষের জীবনের প্রথম গান বলে শুনেছি।

কার কাছে শুনেছ?

দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। উনি কালীপদ পাঠকের কাছে গান শিখতেন তো!

জনার্দন বলল, তাই? ঠিকানাটা দেবেন তো।

কেন? তুই কি করবি?

পলাশ বলল।

গান শিখব, যখন কলকাতায় যাব।

দেব। নমিত বলল।

তা দিতে পারেন কিন্তু জনার্দনও যে ওঁর কাছে শিখলেই আপনার মতো গাইতে পারবে এ কথা ভাবার মতো মূর্খ আমাদের জনার্দনই হতে পারে। তুই জীবনমুখী গান গা জনার্দন। যা তোর হবে। যা তুই গাইছিস।

এই গানের কি নাম?

চোখ সরু করে অত সহজে দমবার অপাত্র জনার্দন বলল।

পলাশ বলল, গান শুনে আমাদের একেক জনের বুকেব মধ্যে কী সব ঘটে যাচ্ছে বুঝছিস না, কত ফিউজ কেটে গিয়ে সব ঘোর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে দেখছিস না? এ গানের নাম হওয়া উচিত মরণমুখী গান। আবার কারো কারো হৃদয়ে আলোও জ্বলে উঠছে।

বলেই, সরোজার দিকে ফিরে বলল, বল সরোজা? উঠছে না?

সরোজাকে বাঁচাবার জন্যে মাঝে পড়ে মেঘাদা তাড়াতাড়ি বললেন, গানটা আবার শুরু করার আগে গানের বাণী কি শোনাও তো একবার নমিত।

নমিত বলল,

"সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে?
সুখ অনুগামী দুখ, গোলাপেও কণ্টক মেলে।
শশী প্রেমে কুমুদিনী
উন্মাদিনী একাকিনী
তথাপি সে কুহকিনী কত নিশি ভাসে জলে।
সুখ কি সতত হয় প্রণয় হলে?"

বাঃ বাঃ। মেঘাদা বললেন।

তারপর বললেন, নাও শুরু করো নমিত। কোনোরকম বাজনা ছাড়াই এমন গান তুমি গাও কি করে হে ছেলে!

নমিত মুখে কিছু বলল না। বলবেই বা কেমন করে? ও যখন ওর মনকে কেন্দ্রীভূত করে গান গায় তখন কোনো অদৃশ্য পুরুষ তার পাশে বসে এসরাজে সুর দেন আর পেছনে কারা যেন জোড়া তানপুরাব ঝিনিঝিনিতে দু কানে তার সুব ঢেলে দেন। ওর গলা সুর থেকে নড়বে কি করে?

গানটা শুরু করলে নমিত মেঘাদার শেষ প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই।

সব প্রশ্নের উত্তর হয় না।

এখন রাত গভীর।

যে বাড়িতে ও পেয়িংগেস্ট হয়ে আছে সেই বাড়ির মালিক অমলবাবুও ঘুমিয়ে পড়েছেন। উনি মাতাল। তবে ক্ষতিকারক মাতাল নন। শুনেছে নমিত। ও থাকাকালীন একজন শালা-শালিও আসেননি পালিতলি থেকে। রাত করে বাড়ি ফেরেন সোম থেকে শনি। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পবই তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁর বাপের বাড়িব নিন্দা করেন। সরকাব পবিবারের সকলেই যে নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ, বেইমান, এই সব কথা শুনে শুনে প্রতিবেশীদের সকলেরই বিশ্বাস জন্মে গেছে যে পালিতলির সরকারদের মতন অমন নীচ মানুষ সংসারে আর হয় না। অথচ তাঁর কোনো শালা-শালি যখনই আসেন কালে-ভদ্রে, তাঁদের আপ্যায়নের ঠ্যালা দেখে ভিরমি খেতে হয় নাকি প্রতিবেশীদের।

পালিতলি জায়গাটা ঠিক কোথায়? কোন বাংলায়? পুবে না পশ্চিমে? উত্তরে না দক্ষিণে? কোন জেলায়? কোন সাবডিভিশনে? কোন মউজাতে তা জানতে খুব ইচ্ছে করে নমিতের। কিন্তু

রবিবার, যে দিনটি সন্ধ্যায় বাড়ি থাকেন অমলবাবু, তাঁর মতো, ভদ্র, স্ত্রী-অন্তপ্রাণ, সন্তানবৎসল, প্রতিবেশী-প্রিয় মানুষ আর দুটি দেখা যায় না। যে কারণে তাঁর অসীম ধৈর্যশীলা চমৎকার স্ত্রী চৈতালী বউদি অমলবাবুর সারা সপ্তাহের দোষকে সপ্তাহান্তের প্রাপ্তির কারণে নিঃশর্তে ক্ষমা করে দেন, সেই একই কারণে হয়তো পাড়া-প্রতিবেশী প্রত্যেকেই অমলবাবুকে ক্ষমা করে দেয়। যে-কোনো মহল্লাতে বাস করতে গেলেই যেমন হঠাৎ-হঠাৎ এসে পড়া বেআদব, দুশ্চরিত্র হনুমানের অত্যাচার অথবা ভাদ্র মাসে পথের মাঝে রাতভর জুড়ে-থাকা কুকুর-কুকুরির উদ্ভট বিরক্তিকর দৃশ্য সহ্য করতেই হয়, তেমনই অমলবাবুর মতন কিছু স্বীকৃত বিপত্তি নিয়েই বাস করতে হয় এই মহল্লাতেও। কলকাতাতে নমিতদের ক্লাবের ভটচারিয়াদা যেমন পাইপ মুখে বলেন, "ইটস ওল ইন্ দ্যা গেম ব্রাদার!" নমিতও ঠিক তেমন করেই নিজেকে বোঝায় অমলবাবু করা পুরো সপ্তাহের অশান্তি মেনে নিতে-নিতে।

অমলবাবু ঘুমিয়েছেন। অশান্তির অর কোনো কারণ নেই। কিন্তু তবু ঘুম আসছে না আজ নমিতের।

ওর জানালার পাশেই পথ। পথের ওপাশে একটা মস্ত কদম গাছ। কলকাতাতে থাকতে কদম গাছ চিনত না। এখানে এসে চিনেছে। আর জানালার দিকেই বাড়ির গা ঘেঁষেই আছে একটি রবার গাছ। সেটিকে নাকি অমলবাবুর তেরো বছরের বড়ো মেয়ে চার বছর আগে রথের মেলা থেকে এনে লাগিয়েছিল। গাছটার চার বছরের বাড় দেখে অবাক হয়ে যায় নমিত। একটা বয়স পর্যন্ত মেয়েদের বাড় এরই মতন। তাদের একটা বয়স পর্যন্ত, মেয়েদের তিন মাস না দেখলে, দেখে চিনতেই পারা যায় না, এমনই বদলে যায় চেহারা। একই বয়সি হাফপ্যান্ট পরা ক্যাবলাচরণ খেলার সাথীকে একই জায়গাতে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা দৌড়ে যায় কোন না কোন অচিনপুরে। ওদের গলার স্বরে কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। সেই স্বর আগের থেকে গাঢ় হয় শুধু। আর তাদের খেলার সাথীর এতদিন তারই মতন মিষ্টি গলার স্বর ভেঙে-চুরে একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। নাকের নিচে যখন গোঁফের রেখা ছায়া ফেলে তখন ছেলেদের গলার স্বর পুরোটাই বদলে যায়। পুরুষেরা যে নারীদের থেকে অনেকই ব্যাপারে আলাদা, তখনই বুঝতে শেখে মেয়েরা নিজেরাই এবং হয়তো ক্যাবলাচরণ খেলার সাথীরাও।

এ রকম নানা এলোমেলো পারম্পর্যহীন ভাবনা আসছে নমিতের মাথাতে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। একবার এপাশ আরেকবার ওপাশ করছে। "কণ্টকশয্যা" শব্দটা জানে শিশুকাল থেকেই। কিন্তু শব্দটার মানে জানল আজ এই প্রথম।

কী যেন নাম সেই কবির? হ্যাঁ জন্মজিৎ রায়। আলাপ করতে হবে ওঁর সঙ্গে। কুশিয়ারা নদীটাও দেখা হয়নি ভাল করে। সব নদীই নারীদের মতন। তাদের পেরিয়ে আসার সময়ে তাদের ভাল করে দেখা হয় না, হয়তো বোঝাও যায় না। কিন্তু পেরিয়ে দূরে আসার পরে তখন বড়ো সাধ যায় আশ মিটিয়ে দেখতে, ভাল করে চিনতে।

কী যেন কবিতাটা! দারুণ কিন্তু। কোনোই সন্দেহ নেই। জন্মজিৎ রায়ের কি কোনো কাব্যসংগ্রহ আছে এই বরাক উপত্যকার ভাষাতে লেখা? খোঁজ করতে হবে মেঘাদার শনিবারের মিলনীর সভ্যদের কাছ থেকে। কথা হয়েছে যে, পরের শনিবার মিলনীর সব সভ্যের নাম, ঠিকানা, পেশা, শখ এবং তিনি কবি না গায়ক না চিত্রী না আবৃত্তিকার এবং আরও বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটা সাইক্লোস্টাইলড লুজ-লিফের পুস্তিকা দেওয়া হবে নমিতকে। মাসিক চাঁদা চল্লিশ টাকা। তা ও দিয়ে এসেছে। অলটারনেট শনিবারে শুধু মুড়ি তেলে ভাজা নয়, ভাল ভাল খাওয়া থাকে। খাওয়া থাক আর নাই থাক নমিতকে সেখানে যেতেই হবে। মরেছে সে। জীবনে এত বিপদে আর কখনই পড়েনি। তাও এখানে জীবকটা থাকলে তার পরামর্শ নেওয়া যেত। একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু। কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুর কাছ থেকেও যেমন পরীক্ষার হলে পাশাপাশি পরীক্ষা দিতে বসেও টোকা

যায় না, তেমনই জীবনের অনেকই সমস্যা থাকে, যেখানে তার সাহায্যও পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তলে একটা নিভৃত জায়গা থাকেই, যেখানে অন্তরঙ্গতম বন্ধু বা নিকটতম আত্মীয়র স্পর্শও পৌঁছোয় না। সেখানে শুধুমাত্র অন্তর্যামীরই আসন। শুধুমাত্র তাঁর আঙুলই পৌঁছোতে পারে সেখানে।

আরেকবার পাশ ফিরল নমিত।

কী যেন কবিতাটা!

"তোমারে কইয়ার হুনো" অর্থাৎ, তোমাকে বলছি শোনো।

তাই তো?

তাইই হবে।

"কাইল মাইজ-রাইত কিতা যে
অইল আমার মনো
একবার ই কাইত
একবার হি কাইত
ঘুম আইল না তেবো
আলপিন একটা খুচা দিল বুকুর জেব
আসলে আলপিন নায়
ই তোমার চে'রা
কুশিয়ারার এ পারো তুমি, হি পারো আমি।
মাজেদি এক বেড়া।"

বেড়াটা ভাঙতে হবে, ভাঙতে হবে। ওর একটা বুলডোজার চাই। হ্যালো হ্যালো সি.এম.ডি.এ, সুভাষ চক্রবর্তী মশাই, মিস্টার কান্তি গাঙ্গুলি, আমার একটা বুলডোজার চাই। দয়া করে স্পিড-পোস্টে পাঠান শিলচরে।

রাত আরও নির্জন। দূরের পথের মোড়ে না কি চার্চের কাছে কারা যেন নিচুগ্রামে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে। দু-তিনজন পুরুষ। নাকি কেউ কথা বলতে নমিতের মাথারই মধ্যে! পথের আলোতে কদম আর রবার গাছের ডালপালার পাতা-পুতার ছায়াগুলো পথের ওপরে নানা হালকা-গাঢ় সাদা-কালো আলপনা বুলোচ্ছে মৃদুমন্দ হাওয়াতে। বসন্ত আসছে। তার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

ঘুম আসছে না সত্যিই নমিতের। সরোজা! আঃ সরোজা! ঈঃ সরোজা! কেন মরতে এলাম শিলচরে। প্রোমোশনে? ছাতার প্রমোশন। এমন প্রাণঘাতিকা উন্নতির কোনোই প্রয়োজন ছিল না নমিতের।

ভাবল, নমিত।

আবারও পাশ ফিরে মনে মনে ঠিক করল কালকে কুশিয়ারা নদীটা ভাল করে দেখতে যাবে। সারাদিন কাটাবে নদীপারে, নৌকোতে। "কুশিয়ারার এ পারো তুমি হি পারো আমি, মাঝেদি এক বেড়া।"

তারপরই মনে পড়ল যে কাল নটার সময়ে ভাড়ার গাড়িকে বলে দিয়েছে। হাইলাকান্দি যাবে। সেখানে ওর দুজন সেলসম্যান আছে। তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। অফিসটা নাকি খুবই ছোট। ওরা একটু বড়ো জায়গা দেখে রেখেছে দু-তিনটি, নমিত গিয়ে দেখে আসবে আজ রাত পোয়ালে। হাইলাকান্দিতে যেতে কি কুশিয়ারা নদী পেরুতে হবে? নদীও তো নারীরই মতন ঘুরে ঘুরে চলে, কুরে কুরে খায়। কে যেন বলল, এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে পেরিয়ে এসেছিল ও। নদী তো ঘুরে গিয়ে হাইলাকান্দির পথে আবারও দেখা দিতে পারে।

আরেকটা গান বার বার মনে আসছে ওর। এই ছোট্ট জায়গাতে সাতটার পরেই মহল্লা নির্জন হয়ে যায়। আটটার পরে সাইকেল রিকশার প্যাঁকপ্যাঁকানিও শোনা যায় না আর। এখন গুনগুন করেও গান গাওয়া যাবে না। এখন রাত একটা। তবে আওয়াজ না করে গলার অভ্যন্তরে গানটাকে জাগিয়েই আবার আঁতুড়ের শিশুরই মতন নুন খাইয়ে মারবে বলে ঠিক করবে ভাবল।

এটাও যে নিধুবাবুরই গান।

"প্রবোধ কি মানে আঁখি?
না দেখি তাহারে
তারে বুঝলে বুঝিবে কেন?
মোর মতো দেখে যারে।
মনোনয়ন সংযোগ তারে দেখিবারে
প্রবৃত্তিরে নাহি দেখে
থাকে নিবৃত্তিরই ঘরে।
প্রবোধ কি মানে আঁখি?
না দেখি তাহারে!"
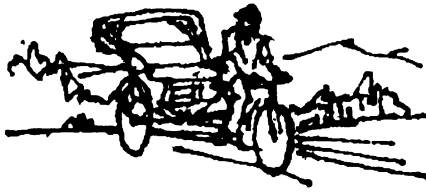
প্রায় মাস দুয়েক হয়ে গেল এখানে। অফিসের কাজ বেশ গুছিয়ে এনেছে। "মিলনী"তেও যাচ্ছে প্রতি শনিবার। যাচ্ছে আর পোকা যেমন ধীরে ধীরে মাকড়শার জালে আটকে যায় তেমনই আটকে যাচ্ছে অমিত, আটকে যাচ্ছে ওর অমোঘ নিয়তির বিনি-সুতোর ফাঁসে।

সকালে চান-টান করে নিয়ে ব্রেকফাস্টও সেরে নিল। চৈতালী বউদি ছুটির দিনে ভাল কিছু করেন। কাজের জন্য ও রান্নার জন্যে দুটি মেয়ে আছে যদিও, তবু ছুটির দিনগুলোতে, নমিত দেখেছে যে তিনি নিজে হাতে কিছু না কিছু করেনই। চৈতালী বউদির রান্নার হাতটিও বড়ো ভাল। যাই করুন না কেন দারুণ স্বাদ হয়।

রান্না যে মেয়েদের কত বড়ো গুণ, পুরুষের হৃদয় জয় করার কত সহজ পথ যে তা, এই সরল সত্যটা আজকাল কজন মেয়েই বোঝেন! ডালপুরি, আলুর দম, নয়তো লুচি, বেগুনভাজা, কুমড়োর ছেঁচকি, পায়েস, নয়তো সুজির মোহনভোগ, ভাল করে গাওয়া-ঘি ঢেলে, তেজপাতা,লবঙ্গ, কিশমিশ দিয়ে, সুজিটাকে কড়া করে লাল করে ভেজে নিয়ে, বেশি চিনি দিয়ে। নয়তো অন্য কিছু।

খাওয়ার সময়ে সামনে বসে থাকেন চৈতালী টেবলে। বলেন, মোহনভোগ খেলে গায়ে জোর হয়। ভাল করে খান।

গয়ের জোর দিয়ে কি করব? আমি তো বন্দরের কুলি নই। কারো সঙ্গে মারামারিও করতে যাচ্ছি না। মস্তিষ্কের জোরেই চলে যাবে বউদি।

চৈতালী রহস্যময় চোখে বলেন, গায়ের জোরের অনেকই রকম হয়। বিয়ে তো একদিন করবেন। সেদিন বুঝবেন।

কথাটা বুঝেও, না-বোঝার ভান করে নমিত। চৈতালীর বয়স হবে নমিতেরই মতন। দুটি বাচ্চা। মেয়েটি তেরো বছরের, ছেলেটি তিন বছরের। কিন্তু বাচ্চাদুটি যতখানি না প্রেমজ তার

চেয়ে বেশি কামজ বলে মনে হয়। প্রেম ব্যাপারটা বোধহয় অমলবাবুর অভিধানে নেই। কজনের অভিধানেই বা আছে? বিশেষ করে পুরুষের অভিধানে। নমিতেরও দাম্পত্যে প্রেম থাকবে কি থাকবে না তা বোঝা যাবে শুধু বিয়ের পরেই। অবশ্য নমিতই বা কতটুকু বোঝে? তাছাড়া দাম্পত্য ব্যাপারটা বড়োই গোলমেলে। বাইরে থেকে অত সহজে কিছু বোঝাও যায় না।

একটি গাড়ি এল। সাদা অ্যাম্বাসাডর।

চৈতালী বলল, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে।

হুঁ।

খাওয়া প্রায় শেষ করে এনে লুচি দিয়ে সন্দেশ খেতে খেতে বলল নমিত।

কোথাও যাবেন?

কোথাও তো যাবই।

বেশ মজার কাজ আপনাদের কিন্তু। কোথায় যাবেন আজ?

হাইলাকান্দি।

বাঃ।

বাঃ কেন?

কী মজা। অতবড়ো গাড়িতে একা কো যাবেন, কত জায়গাতে ঘুরবেন। আমাকে তো একদিন নিয়ে গেলেই পারেন সঙ্গে। অবশ্য আপনার দাদাও একটা মারুতি বুক করেছে।

বাঃ। খুব ভাল।

নমিত বলল।

তারপর বলল, আপনাকে নিয়ে গেলে অমলদা মাথা ভাঙবেন না?

তার খেয়ালই থাকবে না, থাকে না। আমি হচ্ছি ক্যালেন্ডারের না-বদলানো পাতা। যখন বসন্ত আসে তখনও শীতকালের পাতাই ঝোলে। এ বাড়িতে একটিই ঋতু, একই নিয়ম।

তিনি কোথায় গেছেন?

প্রতি রবিবার সকালে যেখানে যান।

কোথায়?

তাসের ঠেকে। জুয়া খেলবে। সেখানেই একগাদা ছাইভস্ম গিলে এসে রাক্ষসের মতন খাবে। তারপর ঘুমোবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কোলবালিশ জড়িয়ে। অজুহাত হল, সপ্তাহে রোজই রাতে যারা হুইস্কি খায় তাদের রবিবারের সকালে বেশ ভাল পরিমাণ বিয়ার খেতে হয়। তাতে নাকি সিসটেম flushed হয়ে যায়। কিডনি ভাল থাকে। যত্ত সব। কুলত্থ কলাই খেলেই হয়! রবিবার সন্ধেবেলাটাতে অবশ্য বাড়ি থাকে। একটু কাজের কথাটথা হয় তখনই। রিন্টু-মিন্টিকে একটু আদর-টাদর করে।

আর? আপনাকে?

নমিত বলল, শেষ গ্রাস মুখে পুরতে পুরতে।

না সে সব কিছু নেই। এখন ভাইবোনের মতন সম্পর্ক।

তাই? ভাই-বোন?

হ্যাঁ। সত্যিই!

মাঝে মাঝে নমিতের ভয় হয় যে, সে কোনো জালে জড়িয়ে পড়ছে না তো? একই পোকা কত মাকড়শার জালে পড়বে। তাছাড়া সব জালেরই বুনন যে আলাদা আলাদা। অমলদাদের অবস্থা যথেষ্টই ভাল। শুনেছে, তাঁরা উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ারের মানুষ। সেখানে নাকি শহর থেকে অনেক মাইল দূরে জমি-জমাও আছে। সেখান থেকে আয়ও হয় মন্দ নয়। ব্যবসার আয়ও খারাপ নয়। টিনের সাব-ডিলারশিপ আছে। কাঁচা টাকাও রোজগার কম হয় না। আসলে ওর মনে হয়, অমলবাবু ওকে পেইংগেস্ট রেখেছেন আয় আশ্রয়ের জন্যে যতটা নয়, তার

চেয়ে বেশি সিকিউরিটির কারণে। চৈতালী বউদি বাচ্চাদের নিয়ে একাই থাকেন রাত দশটা-এগারোটা অবধি। বিপদ-আপদ অসুখ-বিসুখ। বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষ থাকলে সুবিধে হয়। অথবা কে জানে কেন রেখেছেন? অন্যের মন বোঝার মতো ক্ষমতা নমিতের নেই। তাছাড়া চৈতালীর করুণ একাকিত্বটা ওর চোখে পড়ে। সে অপ্রত্যক্ষভাবে অনুযোগও জানায়।

কিন্তু আশ্চর্য! অমলবাবু কিন্তু কখনও কিছু বলেন না। কালই সকালে দেখা হয়েছিল। বললেন, কী ব্রাদাব, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে না তো? চৈতালী কিন্তু মহা কেপ্পন। কষ্ট হলে আমাকে জানাবেন। আর মশারি টাঙিয়ে শোন না কেন? এই গুডনাইট-ফুডনাইটের লং-টার্ম এফেক্ট কি তা তো কেউ পরীক্ষা করে দেখেনি। না কি দেখেছে? জানি না। পরে হয়তো জানা যাবে দীর্ঘদিন এই সব ব্যবহার করার পরে হয়তো ব্রঙ্কিয়াল-ট্রাবল ডেভেলপ করে গেল। ক্যানসারও হতে পারে। কে বলতে পারে! ক্যানসার-ম্যানসার যে কী থেকে হয় তা কি এখনও মানুষে জেনেছে?

মশারি টাঙালে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে।

নমিত বলেছিল।

হাসলেন খুব জোরে অমলবাবু।

বললেন, ব্যাচেলারের আবার দমবন্ধ কি? আগে বিয়ে করুন তারপরে বুঝবেন দমবন্ধ হওয়া কাকে বলে। গলায় এমন ফাঁস পড়বে যে, দম কাকে বলে তা ভুলেই যাবেন।

তারপরই বললেন, চলি।

নমিত খাওয়া সেরে উঠল। খাওয়ার ঘরের কোনাতে লাগানো বেসিনে মুখ ধুতে ধুতে বলল, হাইলাকান্দি থেকে কিছু আনতে হবে আপনার জন্যে?

বেসিনের উপরের আয়নাতে চৈতালীর মুখের ছায়া পড়েছিল। ফরসা গোলগাল মুখ। বড়ো সিঁদুরের টিপ কপালে। মুখ দেখলে মনে হয় বুদ্ধি নেই। কিন্তু মুখ খুললেই বোঝা যায় প্রখর বুদ্ধিমতী এবং রসিকা রমণী। মনে হয়, খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষীও।

গাড়িতে বসে একটা সিগারেট ধরাল। প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু কাল রাতে মেঘাদার বাড়ি থেকে বেরিয়েই কুড়িটার দুটো প্যাকেট কিনেছে। আর ছাড়া বোধহয় হল না সিগারেট।

ড্রাইভার বলল, কোন রাস্তা দিয়ে যাবেন স্যার হাইলাকান্দি? হাইলাকান্দিই যাবেন তো?

ভাবছি।

ড্রাইভার এঞ্জিনটা স্টার্ট করেছিল। বন্ধ করে দিল। ডিজেলের এঞ্জিন। ধকধক আওয়াজ করে একটা।

নমিত বলল, অম্বিকাপট্টিতে চলো একবার। হাইলাকান্দির পথে।

কার বাড়ি যাবেন?

তুমি কি চিনবে নাম বললে? ইনকাম ট্যাক্সে কাজ করেন, মেঘনাদ...

ও মেঘাদা! মেঘাদাকে কে না চেনে!

আমার বাড়িও অম্বিকাপট্টিতেই যে। চমৎকার মানুষ। উনিই তো আমাদের পাড়ার প্রাণ। নিজে ব্যাচেলার কিন্তু তাঁর মতো বিরাট পরিবার খুব কম বিবাহিতরই আছে। সুখে-দুঃখে সকলের পাশে থাকেন। আমাদের পাড়াতেই ইনকাম ট্যাক্সের একজন নোটিস সার্ভার থাকে। আরেকজন বি কম পাস উকিল। কী পয়সাটাই না কামায় স্যার। উরিঃ ফাদার। কিন্তু মেঘাদা মেঘাদা! প্রকৃতই সজ্জন ব্যক্তি।

ভালই হল। চলো তাহলে।

এঞ্জিন স্টার্ট করে গাড়ির চাকা গড়াল ড্রাইভার।

তোমার নাম কি ভাই?

আমার নাম মদন।

মদন কি?

এই পদবি ব্যাপারটা তুলে দিলে ভাল হয় না স্যার? আমি শুধু মদনই যদি থাকি তাতে কি আপনার আপত্তি আছে?

না, আমার আপত্তির কি?

আপনি আমাকে বলতে পারেন স্বপন মদন।

মানে?

মানে আমার বাবার নাম স্বপন আর মায়ের নাম মীনাক্ষী। আমার একমাত্র বোনের নাম চামেলি। তার নাম দিয়েছি আমি মীনাক্ষী চামেলি।

বাঃ।

বলল নমিত।

তারপর বলল, তোমার যদি বোন না থাকত? তুমি যদি একমাত্র সন্তান হতে তবে কী নাম রাখতে তোমার?

কেন? স্বপন মীনাক্ষী মদন।

বাঃ

বলে, হেসে উঠল নমিত।

মদন বলল, এই জাতপাত আর পদবিতেই দেশটা গেল।

হুঁ।

নমিত বলল।

তারপর মনে মনে বলল, শুধু এতেই নয়, আরও অনেকই কারণ আছে দেশটা যাবার। কিন্তু এখন এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন মানসিকতা ওর নেই। দেশ তো গেছেই। অথবা জন্মায়নি। পঞ্চাশ বছর যদি গর্ভধারণের পক্ষে যথেষ্ট সময় না হয়, তবে আর কিছু বলার নেই। যাকগে যাক। দেশ গেলে যাক, তার সরোজা থাকলেই হল।

শীত যাই যাই করছে। তবে বসন্ত এখনও আসেনি। আসবে। ভাগ্যিস আসবে বসন্ত। প্রতি বছরই আসে। 'সবিনয়-নিবেদন' নামের একটি পত্রোপন্যাসে পড়েছিল যে, বসন্ত ''Familiarity breeds contempt'' এই ইংরেজি প্রবাদটি জানে বলেই হয়তো এসেই পালিয়ে যায়। বাস্তবে সে দীর্ঘস্থায়ী হয় না কিন্তু কল্পনাতে আঁটে। আসুক আসুক, বসন্ত আসুক। এবারে সে এলে আর পালাতে দেবে না।

এই সব ভাবতে ভাবতেই বড়ো রাস্তায় এসে পড়ল গাড়ি তারপর চলতে লাগল। জোরে। রবিবার বলে ট্রাফিক বেশি নেই। গাড়ির পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে বসল নমিত। ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে বসে, রাতে ঘুম-না-হওয়া, চান করা এবং বেশ ভাল ব্রেকফাস্ট খেয়ে ওঠা নমিতেব চোখ দুটি ঘুমে বন্ধ হয়ে এল। বন্ধই হয়ে ছিল।

একসময়ে স্বপন মদন বলল, নামবেন না স্যার?

ও চোখ খুলে বলল, কোথায়?

তারপরই দেখল মেঘাদার বাড়ি পৌঁছে গেছে। যে-পথে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়, এক সময়ে সেইসব পথই গাড়িতে অতিক্রম করলে তার দূরত্ব অকস্মাৎ নস্যাৎ হয়ে যায় সময়ের মাপে।

এসে তো পড়ল। এখন? নামবে কি? কী করবে নমিত?

দারুণ সপ্রতিভ, ইন্টার কলেজিয়েট ডিবেটে ফার্স্ট হওয়া নমিত, বড়ো অপ্রতিভ ভীত, হয়ে গেল, ক্রুদ্ধ কুকুর দেখা বিড়ালনির মতন। শরীরের সব রোম শুয়ে গেল। বুক ধকধক করতে লাগল। ওর মধ্যে যে এই নাম-না-জানা সাংঘাতিক অসুখটি ছিল, তাকে এতদিন অনবধানে লালন-পালন করছিল, সে খবর তো কই তাদের দুঁদে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ড. মুখার্জি কখনও তাকে জানাননি!

মেঘাদা এখন কি করছেন কে জানে? যদি বাড়িতে না থাকেন? সরোজা যদি একা থাকে? ওরে বাবাঃ! সেই ভযাবহ পরিস্থিতির কথা ভাবতে পর্যন্ত পারছে না নমিত। ও ভাবছিল, কেন যে মরতে শিলচরে এল? এল তো এল, কেন যে মেঘাদার সঙ্গে আলাপ হল? আর কেনই বা তাঁর বাড়িতে আসতে গেল?

নামবেন না স্যার?

স্বপন মদন বলল।

ভাবছি।

তবে এলেন কেন? যদি নামবেনই না!

না। ভাবছি। অসুবিধা আছে।

তারপব বলল, মদন, তুমি ভাই গিয়ে একটু দেখে এসো তো মেঘাদা আছেন কিনা? আসলে নামলেই দেবি হয়ে যাবে তো। আমার অফিসের ছেলেবা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে হাইলাকান্দিতে।

বেশ।

বলে, স্বপন মদন নেমে গেল স্টিযারিং ছেড়ে।

দিনেব বেলা এই সময়ে তো আসেনি একবারও। তাই তেমন করে লক্ষ্য করেনি যদিও প্রতি শনিবাবই এসেছে। এসেছে, অথচ সরোজাকে কখনও একা পায়নি। একা পেলে কী করবে বা কী বলবে তা নিয়ে ভাবেওনি কিছু অথচ ভারি ইচ্ছে করেছে একটু একলা পাওযার।

চাবটি সিঁড়ি আছে দেখল নমিত বাড়িটার সামনে। গেট-এর ওপরে আর্চ করা দুটি ম্যাজেন্টা রঙা বোগানভিলিয়া দুপাশে। ফুল ফুটেছে খুবই। ছোট্টই বাগান। ভালবাসার বাগান বোধহয় ছোট্টই হয। এই বাগানের পেছনে সরোজাকে দেখতে পেল ও মনে মনে। তারপরই ভাবল, ভালবাসা ছাড়া কোনো বাগানেই ফুল ফোটে না। সে মনের বাগানই হোক কি ফুলের বাগান! একপাশে মুসান্ডা। নলি বাঁশের ঝাড। লালপাতিযার ঝাড। ইংরেজি নামটা মনে পড়ছে না এক্ষুণি। বড়ো পিসিব যোধপুর পার্কের লনে আছে অনেকগুলো দেওয়ালের পাশ বরাবর। আশ্চর্য! বরাক উপত্যকার মতন বাঁশের রাজত্বে কেউ শখ করে বাড়িতে বাঁশ লাগায়? কাঁটালি চাঁপার গাছ। রাতে এসব লক্ষ্য কবেনি।

নমিত গাড়িতে বসে ভাবছিল যে, আমবা যাই দেখি তাব মধ্যে কম কিছুই লক্ষ্য করি। দেখা নানারকম হয, তা ফুলের বাগান কী কুশিয়ারা নদী বা সরোজার মুখখানি, যাইই হোক না কেন! মনে পডল, সাইকেলগুলো আর মোটর সাইকেলটা চাঁপা গাছের নিচেই রাখা থাকে প্রতি শনিবার।

একজোড়া মউ-টুসকি পাখি বঙ্গনের ঝাড থেকে উড়ে গেল শিশুর মুঠিভরা ভালবাসার মতন।

দবজাটা খুলে গেল। কে খুলল কে জানে।

স্বপন মদন ফিরে এসে বলল, মেঘাদা বাড়িতে নাই।

নেই?

ভারি ভয় পেয়ে গেল নমিত।

তাবপবই বলল, চলো, চলো হাইলাকান্দি। দেরি হয়ে গেল আমার।

স্বপন মদন যখন গাড়িটা ব্যাক করছিল তখনই নমিত দেখতে পেল যে ভিতর থেকে খোলা দরজাটার কপাট দুটো কেউ নিঃশব্দে বন্ধ করে জানালার পেছনে এসে দাঁড়াল। তখনই দেখল, জানালার সামনে ঘন-সন্নিবিষ্ট মাছি-গোলাপের লতা। শেষ বাতের স্বপ্নের মতন ফিকে-গোলাপি ফুল ফুটে আছে। ছায়ার মতন ঘরের অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল সরোজা জানালার সামনে। ছায়ার রং দেখে মনে হল নমিতের যে, গতরাতের শাড়িটিই পরে আছে সে। তার মানে, চান করেনি এখনও। সরোজা চান কববে এই কথাটা মনে হতেই নমিতের সারা শরীর শিরশির করে উঠল।

হায় শরীর। এই শরীর।

ভাবল! নমিত।

তার মধ্যে এই শিরশিরানো শরীর যে ছিল, তা কালকে রাতের আগেও জানত না ও। ভেবেছিল, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, অ্যাডভার্টিজমেন্ট, কম্পিউটার সায়েন্স এসব গুলে খেয়ে সে একটি সর্বজ্ঞ হৃদয়হীন Robot হয়ে গেছে। ভেবেছিল, তার জীবনে কেরিয়ার, সাকসেস এবং আলটিমেটলি বোর্ড-রুমই একমাত্র গন্তব্য। তার গন্তব্যর তালিকার মধ্যে সদাই পান-খাওয়া বাঙালি ভাষায় কথা বলা ইনকাম ট্যাক্সের এক বড়ো কেরানি মেঘাদার বাড়িও যে আদৌ ঢুকে পড়তে পারে সে কথা একবারও দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

কবিতার সঙ্গে অবশ্য সম্পর্কে ত্যাগ করতে পারেনি। এবং সেইটাই হয়েছিল কাল। কবিতা বড়ো সাংঘাতিক বস্তু। ওর বন্ধু জীবকের ভাষাতে, যাকে বলে A snake in the grass। বোঝা যায় না যে আছে। কামড়াবার আগে একেবারেই বোঝা যায় না।

গানও গেয়েছে চানঘরে। কিন্তু বুদ্ধদেব গুহর মতো Trash Romantic গল্প লেখা লেখকদের লেখা-টেখা পড়া ছেড়ে দিয়েছিল বহুদিনই। তার এই অশেষ বুদ্ধিজীবীর নির্মোক যথেষ্ট দুর্মর হয়ে উঠেছিল বলেই সবিশেষ বিশ্বাস জন্মেছিল ওর। কিন্তু এখন দেখছে যে, ভিতরে ভিতরে ও যথেষ্টই প্রাকৃত আছে। রোম্যান্টিক।

এসব কি? ছিঃ ছিঃ। অভাবনীয় সব ব্যাপার-স্যাপার। ছিঃ! না, না, ছিঃ।

গাড়িটা যখন বড়ো রাস্তাতে এসে পড়ল তখন গাড়িতে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল একটি সুদর্শন ছেলে। খদ্দরের হালকা হলুদ-রঙা পাঞ্জাবি পরা একটি সুদর্শন তরুণ সাইকেল জোরে চালিয়ে ঢুকছিল মেঘাদাদের বাড়িরই গলিতে।

স্বপন মদন একটা খারাপ গালাগালি দিল। ছেলেটা শুনতেও পেল না।

স্বপন মদন বলল, হালায় প্রেমে পড়েছে নির্ঘাত। মরবে একদিন। ওকে বাঁচাতে পারে এমন সাধ্য কোনো দেবদেবীরই নেই।

একটুর জন্যে যে প্রাণটা যেতে পারত সেই কারণে ছেলেটির কিন্তু কোনো উত্তাপ ছিল না। হলুদ বাল্বের নিশানের মতন তার পাঞ্জাবির কোনা ফাল্গুনের প্রভাতী হাওয়াতে উড়িয়ে দিয়ে সে গলিতে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ চিনতে পারল নমিত তাকে। দুর্বিনয়। সার্থকনামা দুর্বিনয়। প্রথম দেখাতে মেঘাদার বাড়ির ল্যাংটো বাল্বের নিচে যতখানি সুদর্শন বলে ভেবেছিল, ও আসলে তার চেয়ে অনেকই বেশি সুদর্শন। অত্যন্ত লম্বাও। ও নিশ্চয়ই সবোজাব কাছে যাচ্ছে। জানে নিশ্চয়ই যে, মেঘাদা থাকবেন না এই সময়ে বাড়িতে।

দিলে না কেন চড়িয়ে?

স্যাব? কিছু কইলেন কি?

বলছি, অমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতন সাইকেল চালায়, দিলে না কেন চড়িয়ে তোমার গাড়ি তার ওপরে।

তার উপায় কি আছে বলেন? এই দেশে গাড়িতে যে চড়ে বা গাড়ি যে চালায় সব দোষই তো তারই। সে সবসময়েই দোষী। আমার বাবার কাছে শুনেছি যে ব্রিটিশ আমলে এমন ছিল না। মানুষের প্রাণে একটা ভয়ডর বলে ব্যাপার ছিল। আইনের শাসন ছিল।

তা ঠিক। কিন্তু তখন চোর ডাকাত ঘুষখোর ঘুষের দালাল বা যেকোনো দালালেরই গাড়ি ছিল না। তখন যাঁরা গাড়িতে চড়তেন তাঁদের সম্মান ছিল। সমীহ করত পথের মানুষ তাঁদের। সেটাও একটা ব্যাপার। তা ভুলে গেলে চলবে কেন?

সেটা অবশ্য ঠিকোই কইছেন স্যার। বাবাকে বলব আমি আজ বাড়ি ফিরে একথা।

আজ বুধবার। বেশ কয়েকটি বই ও ম্যাগাজিন ও একটি ক্যাসেট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মেঘাদা একটি ছেলেকে দিয়ে গতকাল নমিতের অফিসে। শনিবারের এখনও অনেকই দেরি। কী করে যে রবি থেকে মঙ্গল কেটে গেল তা নমিতই শুধু জানে। আগামীকাল ব্যাংক হলিডে আছে। নমিতের অফিসও বন্ধ। হয়তো ইনকাম ট্যাক্সও বন্ধ। বন্ধ না হলেই ভাল। মেঘাদার বাড়ি পৌঁছে বলতে পারবে মেঘাদার কাছেই এসেছিল, ভেবেছিল বাড়ি থাকবেন উনি। আজ ছুটি তো! সেই জন্যে।

মিথ্যাচারে অভ্যস্ত নয় নমিত। এখনও নয়। জানে না, কোনোদিন হয়তো হয়ে উঠবে। যদি না হয়ে উঠতে হয় তবে ওর মতন সুখী আর কেউই হবে না। আজকাল যারা মিথ্যা বলে না, মিথ্যাচার করে না সেইসব মানুষকে সকলেই বোকা বলে। কিন্তু শুধুমাত্র বোকারাই জানে, মানে, যারা শুধুমাত্র সততার কারণেই বোকা বলে গণ্য আজকের পৃথিবীর কাছে, সেই বোকামির আনন্দ। সেই শুদ্ধ আনন্দর স্বরূপ অশুদ্ধ চালাক মিথ্যাচারীরা তাদের সমস্ত প্রাপ্তির বিনিময়েও কোনোদিনও জানতে পারবে না। মিথ্যাচারী ও নয় বলেই ওর বলা মিথ্যাটা আদৌ সত্যর মতো শোনাবে না যে তা ও জানে। তবু...। চেষ্টা করবে।

কাল সকালে ও যাবেই সরোজার কাছে।

মেঘাদার পাঠানো বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখছিল। যতই দেখছিল ততই অবাক হচ্ছিল ও। কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধর মান এই প্রত্যন্ত প্রদেশের শহরে যে এরকম উঁচু হবে সে সম্বন্ধে ওর কোনোই ধারণা ছিল না। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন তো কত জায়গাতেই হয়। কিন্তু সেই সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত ''স্মরণিকাটা'' নেড়েচেড়ে দেখে, লেখাগুলি পড়ে, চমৎকৃত হয়ে গেছিল ও। পড়তে পড়তে রাত দুটো হয়ে গেছিল।

অধিবেশন সভানেত্রী অনুরূপা বিশ্বাসের একটি লেখা আছে স্মরণিকাতে। ''বরাকের সাহিত্যব সূচনা থেকে প্রাক স্বাধীনতা''।

কবি অশোকবিজয় রাহা, যাঁর বিখ্যাত দুটি লাইন আশৈশব শুনে এসেছে তার মায়ের কাছে,

''হঠাৎ দেখি আরে!

আধখানা চাঁদ আটকে গেছে টেলিগ্রাফের তারে।''

সেই কবির দেশও যে এই বরাক উপত্যকায় তা জানা ছিল না নমিতের। তাঁর একটি কবিতা অনুরূপ বিশ্বাস উদ্ধৃত করেছেন তাঁর নিবন্ধে ·

''দূর থেকে দেখেছি সেদিন ধূম্রদেহ হাফলং পাহাড়
অতিকায় দনুর সন্তান
লাফ দিয়ে উঠে গেছে অর্ধেক আকাশে
কোমরে জঙ্গল গোঁজা, সূর্যের মাকড়ি জ্বলে কানে
দূর শূন্যে বল্লম উঁচানো।''

বাঃ।

নিজেই নিজের মনে বলেছিল, নমিত।

আরেকজন কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য।

রামেন্দ্র দেশমুখ্যও যে এই কাছাড়েরই মানুষ তাও জানত না নমিত। আসলে জানত এই বরাক উপত্যকা সম্বন্ধে অতি সামান্যই। যখন প্রোমোশানে বদলি হয়ে আসে এখানে তখন মন ভারি খারাপ হয়ে গেছিল। এখন বুঝতে পারছে এখানে এসে যে, কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের "কফি হাউস" বা রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর আর ল্যান্সডাউনের মোড়ের "সুতৃপ্তি" এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর "কফি হাউস" অথবা "আনন্দবাজার" বা "দেশ"-এর ঘরের বাইরে থেকেও, এই এত দূরের যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন শহরে বাস করেও তাঁরা শুধু কাব্য-সাহিত্য সংগীত মনজ্ঞই নন, তাঁদের গুণের মান কলকাতার শিরোপা-পাওয়া অনেক কবি সাহিত্যিক গায়কের চেয়ে অনেকই উঁচু।

করুণারঞ্জন ভট্টাচার্যর একটি কবিতা থেকে অনুরূপা বিশ্বাস উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

"ক্রেনে ভারী বস্তু টেনে তুলে নিয়ে ফেলার মতন
চতুর্দিকে কাণ্ডকারখানা আবাদ হাসছে,
মধ্যে দীর্ঘ রেলপথ। গানের কুয়াশামাখা সমতট।
সমতল সমতটে, দু'ধারে চন্দনবৃক্ষ, শিরীষ অর্জুন,
ঝাউগাছ, মাঠ চলে গেছে, উঁচু-নিচু, দূরে নীল পাহাড়ের দিকে।
মনোরম ট্রেনে মমতার ইস্টিশন পর পর
প্রেমডুবি বাজাও, বাউল পার হও?
জোড়াগঞ্জ ছেড়েছি কবেই
ঐ বাউলকৃষ্ণচূড়া গাঁ'র অনন্ত ট্যুরিস্ট আমি—
ঐ ট্রেনের প্যাসেঞ্জার।"

অনুরূপা দেবী তাঁর প্রবন্ধের শেষে লিখছেন :

"সে সব দিন আজ হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে রামেন্দ্র দেশমুখ্যর চোখে ঘোর লাগা শিলচরের পথের দু পাশে অজস্র বকুল ঝরানো, অপরাজিতার নীল মেলা, কাঞ্চনের বর্ণসুষমা, সুবভি মাতাল কবিতার দিনগুলিও।

কিন্তু কবিতা হারিয়ে যায়নি। কবিরাও যাননি হারিয়ে। দিন বদলের পালায় তারা বদলে নিলেন নিজেদের আর বদলে গেল কবিতাও। এলেন নতুন কবিদল। শিলচরকে "কবির শহর" করলেন তাঁরা। তবে সে প্রসঙ্গ আসবে পরে।"

কলকাতায় বসে, কলকাতার সব উচ্চমন্য কবি-সাহিত্যিকদের লেখা পড়ে নমিত কখনওই জানেনি যে, বাংলা ভাষার জন্যে যখন বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে দুজন শহিদ হয়েছিলেন এই ববাক উপত্যকাতেই শহিদ হয়েছিলেন, তেরো জন। তার মধ্যে অধিকাংশই টিন-এজার। তরুণীরাও ছিলেন। বুকের রক্ত দিয়ে যাঁরা ভাষার স্বাধীনতার দাম দিলেন তাঁদের পরম অবহেলিত করে রাখল মূল বাংলার ভূখণ্ড এবং তার রাজধানী কলকাতা। এর চেয়ে গভীর লজ্জা আর কি হতে পারে?

কলকাতার একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে এই লজ্জার ভাগ নমিতেরও অবশ্য নেওয়া উচিত।

ভাবছিল নমিত।

এখানের কবি দিলীপকান্তি নস্করের একটি কবিতাও অনুরূপা দেবী উদ্ধৃত করেছেন তাঁর অভিভাষণে। সেই কবিতাটি পড়ে মাথা হেঁট হয়ে যায় লজ্জাতে।

"আমি কোত্থেকে এসছি, তার জবাবে যখন বললাম :
করিমগঞ্জ, আসাম
তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন—'
বাঃ। বেশ সুন্দর বাংলা বলছেন তো!
আমি আর কি বলতে পারি,

ওকে ঠিক জায়গাটা ধরিয়ে দিতে গিয়ে বললাম—
বাংলা ভাষার তেরো শহিদের ভূমিতে আমার বাস;
তখন তিনি এক্কেবারে আক্ষরিক অর্থেই
আমাকে ভির্মি খাইয়ে দিয়ে বললেন :
ও। বাংলাদেশ? তাই বলুন!"

এই তিনি "কিনি" তা নমিত জানে না। তবে কলকাতার অধিকাংশ আঁতেলই যে এই তিনিরই মতন যে বিষয়ে নমিতের কোনো সন্দেহ রইল না আর।

এখানে আসার পর থেকে একটি নাম অনেকের মনেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে শুনেছে। সেই নামটি বিজিৎ চৌধুরীর। তিনিই সভাপতি ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতির ওই সম্মেলনের। "স্মরণিকার" প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সুলিখিত, চিন্তার বাহক এবং দ্যোতক। একটিও ছাপার ভুল নেই কোথাওই। বানান ভুলও নেই বললেই চলে।

মনে মনে অশেষ কৃতজ্ঞ হলো নমিত মেঘাদার কাছে। "স্মরণিকা" ছাড়াও যে সব বই তিনি পাঠিয়েছেন তা হল "বরাকপারের গল্প"। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ গল্পকার প্রয়াত ভানু সেনগুপ্ত, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য এবং শঙ্কর গুপ্ত, ১৯৫১-১৯৬০ মহীউদ্দিন, অতুলরঞ্জন দেব এবং কামাল উদ্দিন আহমেদ, ১৯৬১-১৯৬০ শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, অপরেশ ভৌমিক, গণেশ দে, অরিজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ ভট্টাচার্য এবং সুভাষ কর্মকার, ১৯৫১-১৯৬০ বদরুজ্জমান চৌধুরী, প্রয়াত অনুশ্রী সেন, নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, তারও পরে ১৯৫১-১৯৬০ জয়া দেব, শুভঙ্কর চন্দ, দেবব্রত চৌধুরী, সাবিকউদ্দিন চৌধুরী এবং আশিফ, রহুল নাথ-এর একটা করে গল্প সংকলিত হয়েছে। এবং যেহেতু গল্পগুলি বড়ো নয়, নমিত পড়ে ফেলতে পারল। গল্পগুলির মান নিঃসন্দেহে উঁচু। সবচেয়ে বড়ো কথা বরাক উপত্যকার গন্ধ আছে সেইসব গল্পতে। এই গল্প সংকলনটি ওই সম্মেলনের নাম থেকেই প্রকাশিত।

শ্রীদেব বইগুলির সঙ্গে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন সম্ভবত মেঘাদার অনুরোধে। লিখেছিলেন ·
প্রীতিভাজনেষু,

আপনিও যে আমাদেরই একজন হয়ে উঠেছেন তা জেনে খুবই আনন্দ হচ্ছে। আমাদের দেওয়া-নেওয়ার অনেককিছুই আছে। ফিরে গিয়ে কলকাতার কবি সাহিত্যিকদের বলবেন যে আমাদের এই উপেক্ষিত "তৃতীয় ভুবন" তাঁদের দয়া বা করুণার উপরে নির্ভর করে ছিল না। নেই। এবং থাকবেও না। বঙ্গভাষার ইতিহাসে যে তিনটি যুগের কথা আমরা জানি, "কল্লোল যুগ" বা "কৃত্তিবাস যুগের" মতন কোনো যুগ নয় সেই সব যুগ, তা হল গৌড়ীয় যুগ, নদিয়া যুগ এবং কলিকাতা যুগ। ত্রিপুরারাজমালা, সঞ্জয়ের মহাভারত, অনন্তরামের রামায়ণ প্রভৃতির তথ্যরাশি যথাযথভাবে আবিষ্কৃত হলে ও তা নিয়ে গবেষণা হলে এ কথা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হবে যে, সাহিত্যে কলিকাতা যুগের জন্মের অনেকই আগে (গৌড়ীয় যুগেই) শ্রীহট্টের সাহিত্য চেতনা ও সাহিত্য কর্ম নিজস্ব প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

একটি কথা বলব নমিতবাবু। কিছু মনে করবেন না। আপনি উচ্চশিক্ষিত তায় কলকাতাব বুদ্ধিজীবী তাই বলতে ভয় হয়। কথাটা হচ্ছে এই যে, জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল, অজ্ঞতার সীমা কোনোদিনও ছিল না। আপনারা কলকাতাবাসীরা চিরদিনই অন্যদের সম্বন্ধে উদাস। আপনারা কূপমণ্ডুক। সর্বজ্ঞ। তা না হলে, কলকাতার তিনশো বছর নিয়ে আপনারা বালখিল্যের মতন লাফালাফি করতে পারতেন? যদি আমাদের ইতিহাস জানতেন, যদি জানতেন যে কটক শহরের বয়স দু হাজার বছর এবং গৌহাটির তিন হাজার বছর। আপনারা কলকাতার আঁতেলরা জানেনও না আপনাদের সম্বন্ধে আমাদের, ওড়িশাবাসীর এবং অসমবাসীদের কি ধারণা। চোখ খুলুন আপনারা, কান পাতুন, প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে উৎসুক হোন।

এই প্রত্যন্ত প্রদেশে পড়ে থেকে মাতৃভাষার জন্যে বুকের রক্ত দিয়ে এখনও আমরা এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার যে হব না সে বিষয়ে এখন্য নিঃসন্দেহ নই। আমাদের নিজস্ব ভাষার অধিকার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার তো বটেই, এমনকী পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তেমন ভাবে অবহিত নন। এর চেয়ে বড়ো দুঃখ আর কি হতে পারে? আপনি এখন আমাদের 'মিলনী'র সভ্য হয়েছেন তাই আপনাকে এত কথা বলতে সাহস পেলাম। অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করবেন। আগামী শনিবার আপনার গান শোনার জন্যে তীব্র আগ্রহ থাকল।

প্রীতি জানবেন। ইতি অ দ।

চিঠিটি পড়ে নমিতের লজ্জা আরও বাড়ল। ও ভাবছিল যে প্রথমদিনেই নিধুবাবুর "নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা" এই গানটি গেয়ে ভালই করেছিল। যাঁরা বুকের রক্ত দিয়েছেন মাতৃভাষার জন্যে, তাঁদের মুখেই তো এই গান মানায সবচেয়ে বেশি।

অন্যান্য বইয়ের মধ্যে ছিল "বরাক উপত্যকার বাঙ্গালী-হিন্দু সমাজের বিবাহের চালচিত্র"। অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। শিলচর মহকুমা পরিষদ প্রকাশিত "বিজন কুসুম"। শ্রীহট্ট কাছাড়ের পাহাড়ি গান আছে তাতে। লোকসাহিত্যের নানা টুকিটাকিও আছে।

অনুরূপ বিশ্বাসের "উনিশে মে আয়ুষ্মান হও" এবং "ছড়া দিলাম ছড়িয়ে"। ছবিদ্রস্তা সম্পাদিত্য ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা "মা-নিষাদ"। "প্রবাহ"। সম্পাদক নলিনীরঞ্জন নাথ। "লালা' নামক একটি জায়গা থেকে প্রকাশিত।

নমিতদের কলকাতার পাড়ার লালাদাকে বলবে ফিরে গিয়ে ও কলকাতাতে যে, তাঁব নামে ববাক উপত্যকাকে একটি জায়গা আছে। আর দিলীপকান্তি নস্করের "মাতৃভূমি, বাংলাভাযা মা"। সুজিত চৌধুরীর ভূমিকা সম্বলিত। পি.টি.এস.-এ ছাপা। চমৎকার প্রডাকশন।

ধীরে ধীরে সবকটি বইই পড়বে নমিত। 'লালন মঞ্চ' নামের আরও একটি পত্রিকা ছিল।

যে ছেলেটি বইগুলি এনেছিল, সে বলে গেল সামনের শনিবার আরও অনেক বই মেঘাদাব বাড়িতে নমিতকে দেওয়া হবে।

অসমীয়া উগ্র জাতীয়তাবাদ কাছাড়ের বাঙালিদের বাংলা ভাষা প্রেমকে আদৌ যে ভাল চোখে দেখছেন না সে কথা এই সব নানা পত্রপত্রিকাতে স্পষ্ট। চক্রান্ত চালু আছে। নমিত ভাবছিল যে, এবাবে কলকাতাতে ফিরে কলকাতার কবি-সাহিত্যিক, যাঁদের ও চেনে তাঁদের অবহিত কবাব চেষ্টা করবে। যদি না তাঁরা ইতিমধ্যেই অবহিত থাকেন এ বিষয়ে। কিন্তু তাঁরা কি করবেন, না করবেন সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁরা তো নিজেদের মান, যশ, পুরস্কার নিয়েই সারা দিন সারা মাস সারা বছর ব্যস্ত থাকেন। একচক্ষু হরিণেরই মতন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই কোনো বকম দায়বদ্ধতাই নেই। তাঁদের সময় কোথায় সুদুর বরাক উপত্যকার গর্তে বাস করা মন্দভাগ্য বাঙালিদের কথা ভেবে সময় নষ্ট করবার? পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও কি কিছুমাত্রই করণীয় নেই এই কালো মেঘ অপসারণের ব্যাপারে?

কবি-সাহিত্যিকেরাও তো কলম ধরলে পারেন। 'A pen is mightier than a sword'. এ কথা কে না জানে! কিন্তু কলকাতার কোন কবি-সাহিত্যিক এসব কথা লিখবেন? আসাম সরকার যদি তাঁদের বই আসামে ঢোকা নিষিদ্ধ করে দেন! কাব্য-সাহিত্য চর্চাও তো এখন সম্পূর্ণই একধরনের সুযোগসন্ধানী মানুষের কুক্ষিগত হয়ে গেছে। যাঁরা ভেলিগুড়ের ব্যবসারই মতন কাব্য-সাহিত্যকেও একধরনের ব্যবসা বলে মনে করেন। এই সব বিপজ্জনক Extra curricular activity-তে শামিল হলে ভাতে অথবা মদে হাত পড়বে না!

শিলচরে এসে আর একটা জিনিস দেখে খুবই ভাল লাগছে নমিতের। কলকাতার মতন মদের সংস্কৃতিটা এখনও এখানে এসে জাঁকিয়ে বসেনি। অত্যন্তই আনন্দের কথা সেটা।

নমিত নিজে যে মদ মাঝে-মধ্যে খায় না তা নয়। কলকাতাতে খেত। তবে মদ খাওয়ার মধ্যে কখনও কোনো বাহাদুরি দেখেনি। জীবনে বাহাদুরি করার অনেকই ক্ষেত্র আছে। মদ খাওয়ার মধ্যে কোনো বাহাদুরি আছে বলে কখনওই মনে করেনি ও। বাবার পয়সাতেও কোনোদিনও খায়নি।

তবে শিলচরের মানুষে মদ কম খেলেও অমলবাবু সম্ভবত একাই ভারসাম্য রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। অমলবাবু মানে যাঁর বাড়িতে নমিত পেয়িংগেস্ট আছে। অবশ্য এখানে আর মাস দুয়েক থাকতে হবে।

তাদের কোম্পানি শিলচর, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জে নিজেদের জমি কিনে ফেলেছে। বাড়ি তৈরির কাজও শুরু হয়ে গেছে। আগের ম্যানেজার এই বাড়ি তৈরি বাবদে বেশ কিছু টাকা তছরুপ করাতেই তাঁকে অপসারিত করে সেনসাহেব রাতারাতি, প্রায় উইদাউট নোটিসে নমিতকে শিলচরে পাঠিয়েছেন।

নমিত সঙ্গী-সাথীর অভাবে এখানে এসে মদ আর খাচ্ছে না। না খেয়ে চমৎকার আছে। শরীরে অনেক স্ফূর্তি অনুভব করছে। ভাল আছে। ভাল থাকতে হবে ওকে। চাকরির ভবিষ্যৎ এবং সরোজার কথাও ভেবে।

কালকে বউদিকে ও একটা চিঠি লিখবে কলকাতাতে সরোজার কথা জানিয়ে। ঠিক করল। বউদি ওর সময়বয়সি। বান্ধবীর মতন। দেওর-বউদির সম্পর্ক মনে হয় জামাইবাবু-শালির সম্পর্কের চেয়েও অনেকই মধুর। যদি সম্পর্কটি স্বার্থগন্ধহীন এবং কাম-গন্ধহীন রাখা যায়। নমিত ভাগ্যবান এ বাবদে।
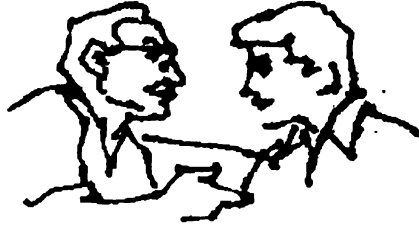
মেঘাদা বাড়িতে আছেন কি না বোঝা গেল না। হয়তো ওঁদের অফিস খোলা। পোস্ট অফিস তো খোলাই আছে।

ভাবছিল, নমিত।

সাইকেল রিকশা থেকে নেমে দুরু দুরু বুকে মেঘাদার বাড়ির দরজাতে দাঁড়িয়ে বেল টিপল। তখন বেলা সাড়ে দশটা হবে।

একটা মেয়ে এসে দরজা খুলল। খুলতেই ভেতর থেকে একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ ভেসে এল।

ও আমার সোনা। কাঁদে না। কাঁদে না। লক্ষ্মী সোনা। এই তো হয়ে গেল।

কার গলা? সরোজার কি? জানবে কি করে? সরোজার গলা তো চিনে রাখতে পারে এমন করে শোনার সুযোগ হয়নি তার।

সেই কণ্ঠস্বরই বলল, কে রে পিমা?

একজন ভদ্রলোক। দাদুকে চাইছে।

নাম জিজ্ঞেস করতে পারছিস না? দেখছিস না আমি কী করছি?

আপনার নাম

মেয়েটি ফিরে এসে বলল।

নমিত। নমিত মুখার্জি।

দরজাটা আধখোলা রেখেই বোকাবোকা দেখতে পিমা নামক মেয়েটি চলে গেল। তার বয়স হবে ন-দশ বছর।

দরজাটা আধখোলা ছিল বলেই সরোজা বলতে পারল না যে দেখা করবে না। আবার নমিতকে বাইরে দাঁড় করিয়েও রাখতে পারল না। অগত্যা সরোজা বলল, ভিতরে নিয়ে আয় বাবুকে। বসতে বল। চেয়ার এগিয়ে দে। কবে যে এসব শিখবি! সত্যি! আমার হয়ে গেল বলে।

নমিত ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বোকার মতন বলল, মেঘাদা নেই?

দু-হাঁটু জোড়া করে মাটিতে বসে সরোজা সামনে একটি প্লাস্টিকের লালরঙা গামলাতে মাস তিন-চারেকের একটি উলঙ্গ পুরুষ শিশুকে সাবান দিয়ে চান করাচ্ছিল।

সরোজা বলল, জেঠু যে নেই তা বুঝি আপনি জানতেন না? আজ তো ওঁর অফিস ছুটি নেই।

ও! না। আমি জানতাম না। আমার অফিস তো ছুটি। তাই ভেবেলছিলাম হয়তো ওঁর অফিসও...

হয়তো আবার কি? আপনি তো জেঠুর কাছে আসেননি।

তবে কা-কা-কার কাছে?

দারুণ সপ্রতিভ নমিত অপ্রতিভ হয়ে বলল।

আমার কাছেই এসেছেন। কিন্তু তাতে অপরাধের তো কিছু হয়নি।

একটি হলুদ আর কালো জংলা কাজের একটি কটকি-শাড়ি পরেছিল সে। বাঁ পায়ের পাতার কাছে কালো সায়ার আভাস দেখা যাচ্ছিল। হলুদরঙা একটি হ্যান্ডলুমের ব্লাউজ। কপালের ওপরে চুল এসে পড়েছে। দু হাতে শিশুটিকে তুলে ধরে সরোজা ওর মুখে চোখ না রেখেই বলল, বসুন। আমার হয়ে যাবে এখুনি।

কথা না বলে, নমিত বসল একটি চেয়ারে। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছিল ঘরে। চেয়ারটা যেখানে পাতা ছিল সেখানেই সেদিন মেঝেতে বসেছিল দুর্বিনয়। বুঝল যে, শনিবার সব চেয়ারটেয়ার সরিয়ে মেঝেতেই শতরঞ্জি পাতা হয়। শুধুমাত্র মেঘাদার ইজিচেয়ারটা পাতা থাকে।

সরোজা পাশে রাখা তোয়ালে তুলে নিয়ে শিশুটির আপাদমস্তক ভাল করে মুছল। সরোজা যখন দুটি হাত উঁচু করল তখন নমিত দেখল তার বগলতলি ঘামে ভিজে গেছে। দেখামাত্রই নমিতের সারা শরীরে বিদ্যুৎচমকের মতন শিহরন খেলে গেল।

চমকে উঠল সে নিজের অব্যক্ত অভব্যতাতে। ভাবল, আজ অবধি তো কত অসমবয়সি নারীশরীর দেখেছে, তাদের ব্লাউজ-ঢাকা বগলতলিতে চোখও পড়েছে কিন্তু কখনও তো এমন অস্বস্তি বোধ করেনি সারা শরীরে। কী যে হল নমিতের! এই রোগের চেয়ে তো যে কোনো অন্য রোগ ভাল ছিল। ওলাওঠা, জন্ডিস, সাংঘাতিক বিলিরুবিনের, কিন্তু এ রোগ কী রোগ?

সরোজা বলল, বসুন আপনি, আমি আসছি। বলে, ভিতরে গেল শিশুটিকে নিয়ে।

একটু পরে পিমার কোলে জামাকাপড় পরিয়ে, পাউডার মাখিয়ে, কপালে কাজলের টিপ পরিয়ে বাচ্চাটিকে নিয়ে এসে দরজা খুলে পিমাকে বলল, সাবধানে যাবি। ফেলে যদি দিস তো তোর হবে। তুই যে একটা এক নম্বরের ঢেঁকি। আর বউদিকে বলবি যে সন্ধেবেলা যাব।

আমি কি এক্ষুণি ফিরে আসব দিদি, না মাকে একবার দেখে আসব? জ্বর বাড়ল কিনা কে জানে!

দেখেই আয়। তবে খুব দেরি করিস না। ওষুধটা ঠিক সময়মতো খাচ্ছে কিনা দেখিস। বার্লির টাকাটা নিয়েছিস তো নাকি ড্রেসিং টেবলের ওপরেই ফেলে এলি?

পিমা বলল, না না, নিয়েছি।

পিমা চলে গেলে নমিত বলল, ওকে ছেড়ে দিলেন। বাড়িতে তো আর কেউই নেই।

না। কেন এ কথা? কেউ নেই মানে? আমি তো আছি।

আপনাকে পাহারা দেবার তো কেউই রইল না।

কেন? আপনিই তো রইলেন। তাছাড়া আমি তো একাই একশো।

ও।

বোকার মতো বলল, নমিত।

তারপরই বলল, কিন্তু আমার লোভকে কে পাহারা দেবে?

আপনার লোভকে? কিসের লোভ? যে লোভই হোক কোনোই চিন্তা নেই। আমি পাহারা দেব।

হেসে বলল, সরোজা।

হাসলে যে কী সুন্দর লাগে তাকে!

ভাবল, নমিত।

পরক্ষণেই বকল নিজেকে খুব। কী যে হয়ে গেল ওর। কি তা যে অইল! হায়! হায়!

আপনি এত লাজুক কেন? লজ্জা তো মেয়েদেরই ভূষণ। আমাকে তো সকলেই খুব স্মার্ট, আউট-স্পোকেন বলেই জানে।

হয়তো। কিন্তু রবিবারে, সাদা অ্যাম্বাসাডরে করে এসে জেঠু নেই শুনেই পালিয়ে গেলেন কেন ভয়ে? পালিয়েই যদি যাবেন তবে এলেনই বা কেন?

নমিত মুখ নিচু করে একটু চুপ করে থেকে বলল, সেই তো হচ্ছে কথা। তা কি আমি নিজেই জানি।

কি?

এই কেনই বা এলাম আর কেনই বা পালিয়ে গেলাম।

তারপরই বলল, আমি নাইবা এলাম, দুর্বিনয় তো এসেছিল রবিবারে। আসেনি!

ঝরনার মতন হেসে উঠল সরোজা। তার চুল আবারও এসে পড়ল তার কপালে, গালে।

খুব ইচ্ছে করল নমিতেব যে নিজের দু হাত দিয়ে যতন ভরে সবিযে দেয় সেই কেশভার সরোজাব কপাল আর মুখ থেকে।

সরোজা হাসতে হাসতে বলল, আপনি সত্যিই ছেলেমানুষ। দুর্বিনয়ের সঙ্গে আমাব কি? ও তো একটা দুধের শিশু।

ও কিন্তু আপনাকে অসম্ভব ভালবাসে। শিশু যেমন মাকে ভালবাসে হয়তো তেমন করেই। শিশুর কাছে মা যেমন আগল-খোলা তেমন তো অন্য কারো কাছেই নন!

কী করে জানলেন?

কি?

যে দুর্বিনয় আমাকে ভালবাসে।

প্রথমদিনই যে বুঝেছি। আপনি যে আমার গান ভাল বললেন তাতে ও কী ভীষণ রেগে গেল। ওব মুখচোখের ভাবই কেমন বদলে গেল তা কি আর আমি লক্ষ্য করিনি!

তাই? তাতে কি হল? কত মানুষই তো কত মানুষকে অসম্ভব ভালবাসে। সংসারে কজনেব ভালবাসা পরিণতি পায়? কত পারসেন্টের? কারোকে একতরফা ভালবাসলেই তো আর হলো না, অন্য পক্ষের ভালবাসাও তো পেতে হবে।

দুর্বিনয়ের মতন চমৎকার ছেলেকে ভালবাসেন না আপনি!

অবাক হয়ে বলল, নমিত।

ভীষণ ভাল লাগে ওকে। হয়তো ভালওবাসি। কিন্তু ছোটো ভায়ের মতন। ভাল লাগা আব ভালবাসা কি এক? ভাল, জীবনে এক-দুজনকেই বাসা যায়। ভালবাসা বড়ো কষ্টের নমিতবাবু। কারোকে ভাল না বাসাই ভাল। আপনি কি কখনও ভালবেসেছেন কারোকে?

নমিত চুপ করে রইল।

সরোজা বলল, যাক। এই সব দুঃখকষ্টর প্রসঙ্গ এখন থাক। আপনি এসেছেন। আপনাকে জনারণ্যের মধ্যে তো পাওয়া যাবেই, সেদিন যেমন পাওয়া গেছিল, এমন একাব করে তো রোজ রোজ পাওয়া যাবে না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কি খাবেন বলুন?

কিছু না।

তা কি হয়? জেঠু শুনলে রাগ করবেন।

আপনি যা-কিছুই করেন বা করেন না, সবই কি আপনার জেঠুরই জন্যে?

মিথ্যে বলব না আপনাকে। সব না। জেঠুকে সব কথা বলিও না। সবকিছুই জেঠুর জন্যে করিও না।

জীবনে সত্যকে পছন্দ করে অনেক মানুষই কিন্তু সত্য ছাড়া মিথ্যা কখনও একটিও বলে না এমন কেউই কি আছে?

জানি না। তবে যা দোষের নয়, যা পাপের নয়, তার মধ্যে লুকোনোর কি থাকতে পারে? আপনি তো আমার পাপ নন, অন্ধকার নন, আপনি যে আমার মস্ত পুণ্য, আমার আলো।

বাঃ।

কি বাঃ?

আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন।

নিজে একটু-আধটু কবিতা লিখি, জেঠুর কল্যাণে এত কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে মিশি, একটু গুছিয়ে কথাও যদি বলতে না পারি তাহলে আর কি করলাম!

অধিকাংশ কবিরা চমৎকার কথা বলতে পারেন মনে মনে, নিজের সঙ্গে নিজে, একা একা অথবা কলম হাতে, সাদা খাতার সঙ্গে। কিন্তু কথা আপনার মতন গুছিয়ে একমাত্র উকিল-ব্যারিস্টারেরাই বলতে পারেন। যাঁদের মধ্যে অনেকের কথাই শুধু কথারই কথা অবশ্য। এবং যাঁদের অধিকাংশ কথাই যে সত্যি নয় সে কথা তাঁরা নিজেরাও জানেন।

তাই কি?

তাই নয়? ভাল কথা বলতে পারা ওই উকিল-ব্যারিস্টারেরই তো দেশটাকে ডোবালো। সেই শুরু হয়েছিল জিন্না আর গ্রেট জবাহরলাল নেহরু দিয়ে। আজ অবধিও তার জের চলছে।

আপনি একটু বসুন। আমি এক গ্লাস শরবত করে নিয়ে আসি। নাকি, চা খাবেন?

আপনার কি ধারণা হয়েছে যে, এই ছুটির দিনে সকালে মেঘাদার অনুপস্থিতিতে আপনার কাছে আমি চা কিংবা শরবত খেতেই এসেছি?

না। তা নয়। হয়তো অন্য অনেক কিছুই খেতে এসেছেন। আজকে মাংস হয়েছে। খেয়ে যাবেন? গন্ধরাজ লেবু আছে। কড়কড়ে করে আলু ভাজা। মসুর ডাল। কাঁচা লংকা আর কালোজিরে সম্বাব দেওয়া। খাবেন?

নাঃ।

বেশ তাহলে এই বসলাম আপনার সামনে। খোলসা করে বলুন তো কেন আপনি এসেছেন? আর কেনই বা গত রবিবারে এসেছিলেন? জেঠুর সঙ্গেই দরকার তো আজ অবধি জেঠুকে তা বলেননি কেন যে রবিবারে এসেছিলেন সকালে।

কী করে জানলেন আপনি?

কি?

যে বলিনি আমি মেঘাদাকে?

জেঠু কি তাহলে বলতেন না আমাকে? সাত কথা শুনিয়ে দিতেন। বলতেন, অসভ্য হয়েছ।

কেন বসালে না? কেন চা খাওয়ালে না? জেঠুকে আপনি মোটেই বলেননি। তার মানে, জেঠুর কাছে আসেননি আপনি আদৌ সেদিন।

না।

কি না?

আসিনি।

তবে? আমার কাছে এসেছিলেন?

হ্যাঁ।

কেন?

নমিত কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল সরোজার চোখে।

বাইরে ঘুঘু ডাকছিল, বুলবুলি, দাঁড়কাক ডাকছিল চ্যাগারের উপরে বসে। একটি সাইকেল রিকশা প্যাঁক প্যাঁক করে চলে যাচ্ছিল, যেন কোনো রাজহাঁস। পাশের বাড়ির রেডিয়োতে কণিকা ব্যানার্জির গান বাজছিল "দূরে কোথায়, দূরে দূরে, আমার মনে যে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে"। নমিতের মনে হচ্ছিল ওর জানা স্যাটেলাইট আর কম্পিউটারের জগৎ যেন হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে। আর কোনোদিনও নড়বে না। স্থবির একেবারে। আর কোনোই দৌড়াদৌড়ি নেই ওর বাইরের জগতে। ভিতরে জগতে তো নেই-ই। ও এইরকম কোনো ঘুঘু আর বুলবুলি-ডাকা, হাওয়াতে গাছগাছালির ছায়া-নড়া জগতেরই বাসিন্দা হতে চেয়েছিল শিশুকাল থেকে, যখন মায়ের কোলে শুয়ে রূপকথার গল্প শুনত, যখন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নার্সারি ক্লাসে পড়ত তখন থেকেই, যে জগতে জাগতিক অভাব আছে, অপূর্ণতা আছে হয়তো অনেকই কিন্তু অভাববোধ নেই, খাই-খাই নেই, দীর্ঘশ্বাস নেই, যেখানে মাদুর পেতে বসে সরোজার মতন কোনো নারী তার খুব কাছে বসে রবীন্দ্রনাথের গান গায়,—"তুমি অনেক দিয়েছ নাথ, নাথ হে।"

সরোজা বলল, আপনি কিন্তু জবাবটা দিলেন না।

কোন কথার?

কেন এসেছিলেন আমার কাছে?

নমিত ওর দু চোখে দু চোখ রেখে বলল, খুব ভাল লেগে গেছে আপনাকে। জানেন, বলেই, কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল।

বাঃ।

মুগ্ধতার সঙ্গে বলল, সরোজা।

বাঃ কেন?

এমন শুদ্ধ পবিত্র প্রেমের কথা আজকালকার কম ছেলে-মেয়েই বোধহয় ভাবতে পারে। প্রেম বলতে তো আজকাল সকলেই শুধু শরীরটা বোঝে।

কি জানি!

নমিত বলল।

তারপর বলল, প্রেম কি কোনোদিনও শরীরে ছিল? শরীর অনেকই সময়ে প্রেমের অনুগামী হয়তো হয়, কখনও কখনও। অবচেতনে হয়তো শরীরের কামনা থাকেই, হয়তো তীব্র হয়েই থাকে, কিন্তু তা বলে শরীরটা তো আগে নয়।

কখনওই নয়। আগে আলাপ, তার পরে তো তান, বিস্তার, ঝালা।

বলেই বলল, আপনাকে আমারও খুব ভাল লেগেছিল। আমিও সারারাত ঘুমোতে পারিনি। সে প্রথম রাতে। কী বোকা-বোকা, না? এই বয়সে!

আমি জানতাম।

অবাক হয়ে বলল সরোজা, কী করে?

জানতাম। আমিএ পাশ ও পাশ করতে করতে ভাবছিলাম যে, সে আমার কথা সেই মুহূর্তে যদি নাই ভাবে তবে আমার সব কষ্ট পাওয়াই তো বৃথা।

তাই?

বলেই, আবারও ঝরনার মতন হেসে উঠল সরোজা। আবারও তার ঘন কালো কেশভার কপালে গালে ভেঙে পড়ল। আবারও খুব ইচ্ছা করল নমিতের যে নিজের দুটি হাত দিয়ে পরম যত্নে সরোজার চুলের গোছ সরিয়ে দেয়।

একদৃষ্টিতে, বোবা মুগ্ধতাতে চেয়ে ছিল নমিত সরোজার চোখে।

কী দেখছেন?

আপনার চোখে একটু চুমু খাব?

ইচ্ছে হলে খান। পারমিশান নেবার কি আছে? আমাদের দেশের শাস্ত্রে চোখে চুমু খাওয়া তো অপরাধের মধ্যে গণ্য নয়। কী মুর্খ মানুষগুলো! চোখই যে মানুষের মনের আয়না, শরীরের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রবেশদ্বার, এই সহজ কথাটা গবেটগুলোর মাথাতে কেন যে আসেনি, কে জানে!

নমিত চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে সরোজার কাছে নিচু হয়ে ওর দু হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে দু চোখের পাতার উপরে চুমু খেল। মুখে শব্দ করে।

চোখ বুজে ফেলল সরোজা।

বলল, উঁ-উঁ-উ-উঁ-উম।

পরক্ষণেই উঠে পড়ে বলল, আমি একটু আসছি।

ওকে দেখে নমিতের মনে হল, সরোজার বুঝি জ্বর হয়েছে।

মনে পড়ে গেল ওর, কোথায় যেন কবে পড়েছিল যে মানুষের জ্বরের অনেকরকম হয। তার মধ্যে একটা রকমের নাম কামজ্বর।

একটু পরে সরোজা ফিরে এল। এসে বসল আবার নমিতের সামনের চেয়ারে।

শরীব খারাপ লাগছে?

নাঃ।

তবে?

আপনি অত্যন্ত বিপজ্জনক পুরুষমানুষ।

কেন?

কারো চোখের চুমুতেই কোনো নারীর হৃদয় গলে যায়, শরীর গলে যায় এমন কোনো বিপজ্জনক পুরুষের কথা তো কোনো গল্প-উপন্যাসেও পড়িনি।

পুরুষ মাত্রই বিপজ্জনক। তাছাড়া আগামী দিনের কোনো কবি-সাহিত্যিক হয়তো লিখবেনও আমার কথা। কে বলতে পারে! সাহিত্য তো অ্যাকাউন্ট্যাসি নয়, যে, একটা ডেবিট হলে একটা ক্রেডিট হবে এমন নিয়ম তাকে মেনে চলতেই হবে। সাহিত্য বারোমেসে ফুলের গাছ। তার ফুল ফোটার কি বিরাম আছে কোনো?

আপনার নামটিও খুব সুন্দর। কিন্তু মানে কি? পরদিন অনেক অভিধান ঘাঁটলাম। তাও পেলাম না। ভেবেছিলাম দুর্বিনয়কে বলব, মানে জেনে আসতে।

কেন, ওকেই কেন? অন্য কারোকে নয় কেন?

নমিত হাসিমুখে বলল।

বাঃ রে! ও যে আমার উত্তীয়। আমি চাইলে ও স্বর্গ থেকে পারিজাত ফুল নিয়ে আসতে পারে, দিনের আকাশে ও সার সার তারা ফুটিয়ে দিতে পারে। শুধু আমার চাইবারই অপেক্ষা।

তাই?

হ্যাঁ।

অথচ আপনিই ওকে ভালবাসেন না! হাউ ক্রুয়েল!

না। শুধু আমিই নই। কালে কালে, যুগে যুগে, শ্যামারা কোনোদিনও উত্তীয়দের ভালবাসেনি। ভালবেসেছে বজ্রসেনদেরই।

ভেরি মিন অফ উ্য। কিন্তু কেন?

কী জানি! আমরা হয়তো ওরকমই। যারা সব সমর্পণ করে আমাদের পায়ে তাদেরই আমরা আমাদের ক্রীড়নক করি। যারা আমাদের উপেক্ষা করে, তাদের জন্যেই ঘর ছাড়ি। তাদের পায়ে আছড়ে পড়ি। "হায়! এ কী সমাপন!"

এক আকাশ আলোভরা সকাল বেলা এগারোটাতে কারো চোখে চুমু খাওয়াটা কি সর্বস্ব সমর্পণের মধ্যে গণ্য হবে?

নমিত বলল।

আবারও ঝরনার মতন হেসে উঠল সরোজা।

বলল, আপনি সত্যিই খুব ভাল কথা বলেন। তবে গানটা গান আরও ভাল। আজ একটা গান শোনাবেন? শোনাবেন তো?

শনিবার শোনালে হবে না?

না।

আদুরে গলাতে বলল সরোজা।

কেন না? না কেন?

সে গান তো সকলের গান হয়ে যাবে।

এ গান হবে আমারই একার, নিজস্ব। একা ঘরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে, চানঘরে চান করতে করতে, আমি আমার সেই একলার গানের কথা মনে করব। সেই গানের সুর আর কথা চিরুনির আঁচড়ের মতন, আদুরে পোষ্য কুকুরির কামড়ের মতন আমার স্নায়ুতন্ত্রীতে ঝনঝন করে উঠবে, সাবানের ফেনার মতন আমার সর্বাঙ্গে বুদ্‌বুদ তুলবে, সে গান কারো সঙ্গেই ভাগ করে নিতে হবে না আমাকে।

নমিত চুপ করে রইল।

ভাবছিল, কারো মুখের কথাও যে শৃঙ্গারের চরম হতে পারে এ কথা এর আগে কখনওই জানত না। মুখের কথাও যে 'সুরভিত উদ্যানে'র মতন হতে পারে, তা সত্যিই জানা ছিল না ওর।

বললেন না, আপনার নামের মানে?

সরোজা আবারও বলল।

আমার নামের মানে, নম্রতা। নমিত।

আর কারো কি আছে এই নাম? কখনও শুনিনি।

আমি তো "আব কেউ" নই। আমি যে আমিই! একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

তারপর বলল, তবে আমার জ্ঞাতসারে এই নাম আরেকজনেরও আছে।

কার?

পশ্চিমবঙ্গেব বনমন্ত্রী শ্রীযোগেশ বর্মনের সেক্রেটারির।

তাই? কি করে জানলেন? চেনেন বুঝি?

চিনি মানে, একদিন ফোন করেছিলেন একটা প্রয়োজনে উনি। আমি যখন ওকে বললাম, বললেন, যাক আরেকজন "নমিত" পাওয়া গেল তাহলে!

উনি বললেন, খুব সাবধানে থাকবেন।

কেন?

আমি শুধোলাম।

নমিত বলল।

উনি বললেন, একজন ঔপন্যাসিক আমার নাম শুনে বলেছেন যে, কোনো উপন্যাসের নায়কের নাম দেবেন উনি নমিত।

তাই?

নমিত বলল।

বাঃ। ভালই হল। নায়ক যদি পছন্দের না হয় তবে সেই নমিত আমি বলে চালিয়ে দিতে পারেন আত্মীয়-পরিচিতদের কাছে।

হেসে উঠল সরোজা। নমিতও।

নমিত বলল, আপনার নামটিও খুবই আনকমন। সরোজা। শুনিনি কখনও।

আমার মতন যারা সাধারণ, তাদের বাবা-মায়েরা অনেক ভেবেচিন্তে হয়তো আমাদের নাম দেন তাদের সাধারণত্বের গ্লানি লাঘব করতে।

সে কথা তো আমার সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে। এবারে মানেটা বলুন।

সরোজা মানে, সরসীতে যার জন্ম। পদ্ম।

বাঃ। সরোজিনী নামটি শোনা যায়। সরোজ তো শোনা যায়ই। কিন্তু সরোজা ভারি আনকমন নাম।

যাই বলুন, তা বলে পুরুষেরও পদ্ম নাম হলে কেমন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন পদ্মলোচন মনে হয়। হয় না?

সরোজা বলল।

সরোজার কথাতে দুজনেই আবারও হেসে উঠল একই সঙ্গে।

একটা গান শোনান না। হুট করে কে চলে আসবে।

কে?

পিমা আসতে পারে, দুর্বিনয় আসতে পারে। কী যে জ্বালায় না আমাকে ছেলেটা! যখন-তখন ঘামাচির মতন কবিতা জন্মাবে তার মাথাতে আর দৌড়ে আসবে সাইকেলে চড়ে। শোনো শোনো সরোজাদি। তোমাকে নিয়ে এখনি কবিতা লিখেছি।

বাঃ। তবে তা গর্বিত হওয়ারই কথা আপনার।

মোটেই নয়।

কেন নয়?

কারণ, ওর কবিতার মধ্যে খুব কম কবিতাই কবিতা-পদবাচ্য হয়।

বাঃ। এই কথা তো বড়ো-ছোটো যে কোনো কবির বেলাতেই প্রযোজ্য। কবিরা যে সব কবিতা লিখে গোল্লা পাকিয়ে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেন সেগুলো জড়ো করা গেলে তা রি-সাইক্লিং করে একটা বড়ো পেপারমিল চালানো যেত!

কাটাকুটি বা ছেঁড়াছোঁড়ি না করলে কেউ কি কবি হতে পারেন? বাতিল করার মধ্যেই তো সব সৃষ্টির বীজের উন্মেষ নিহিত থাকে। Failures are the Pillars of Success. এই কষ্টটাই তো "সৃষ্টির" আনন্দ। ছবি ছিঁড়ে ফেলা, কবিতা গোল্লা পাকিয়ে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেওয়া, গান তোলার পরও সংযমী হয়ে যতক্ষণ না পারফেক্ট রেন্ডিশান হচ্ছে ততক্ষণ সে গান যতই ইচ্ছা করুক তবুও না-গাওয়া, এই সব কষ্টরই তো আরেক নাম "সৃষ্টিশীলতার" আনন্দ।

তা হবে। কিন্তু আমার তো প্রাণ যায়। তাছাড়া ওকে কত বলি যে, তুই তোর সব কবিতাই বা আমাকে নিয়েই লিখবি কেন? আমি কি মাধুরী দীক্ষিত? কিছু কবিতা বানরী বা ঘোটকী বা কুকুরি বা অন্য প্রজাতির কোনো স্ত্রীলিঙ্গকে নিয়ে লেখ। না, তা নয়। সে শুধু আমাকে নিয়েই লিখবে। একদিন সরোজাকে নিয়ে লেখা ওর সব কবিতা আমি কোনো সরসীতেই নিক্ষেপ করে দেব। দেখবেন আপনি।

কোন সরসীতে?

মানে?

"যৌবন সরসী"ও তো আছে।

বাজে কথা রাখুন।

দুর্বিনয়কে তা বলে বললেন না যেন সে সব কথা। আহত হবে।

না। তা জানি। ও যেমন পাগল। হয়তো আত্মহত্যাই করে বসল। আর পুলিশে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে ধরে নিয়ে গেল। যে সব কবিতা আমাকে সে দিয়েছে কম করে তার দশগুণ তো তার বাড়িতে আছে।

ওর বাড়িতে কে কে আছেন?

কেউই নেই। শুধু ওর বিধবা মা। দুর্বিনয়ের বাবা খুবই অল্পবয়সে মারা যান। ওদের দু-তিনটে চা বাগান ছিল। ওর জেঠুরা মিলে সব ঠকিয়ে নিয়ে নেন। ওর তখন দু বছর বয়স।

মায়ের বাড়িতে কেউ মুরুব্বি ছিলেন না?

ছিলেন। শুনেছি ওর নিজের বড়ো মামাই মোটা টাকা খেয়ে জাল উইলের এগজিকুটর হয়ে ওদের সর্বনাশ মসৃণ করেন।

এ রকমও হয়!

এ রকমই তো বেশি হয় নমিতবাবু। সংসার তো এই রকমই।

নমিতবাবুর বাবুটা কর্তন করলে হত না? বাবু তো আমি কোনোকালেই ছিলাম না।

থাক না।

কেন? থাকবে কেন?

প্রথমত, শুনতে ভাল লাগে। দ্বিতীয়ত, বাধা হিসেবে থাক। দূরত্ব হিসেবে থাক। দুর্গমতার প্রতীক হিসেবে থাক। যে পথে বাধা নেই, যে পথ সুগম, সেই পথে গন্তব্যে পৌঁছোনোর মধ্যে কোনোই আভিজাত্য নেই।

তাহলে শুধু বাবু কেন? আগেকার দিনে যেমন বলা হত, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু এমন কিছু বললে হয় না?

সরোজা হেসে বলল, না। আমার পক্ষে বাবুই যথেষ্ট।

আর আমি কি বলে ডাকব? আপনাকে?

মনে মনে পেঁচি, খেঁদি, বুঁচি, কেলি যা খুশি তাই বলেই ডাকবেন। বাইরে সরোজাই বলবেন। সরোজা বলেই তো আমার পরিচিত আত্মীয়রা সকলেই ডাকেন। আজকের মতন একান্তে দেখা হলেই শুধু আমাকে অন্য কোনো নামে ডাকতে পারেন। শুধু আমিই জানব সেই নামটা। অভিজাত কোনো নাম।

যদি আয়েষা বলে ডাকি? বেশ অনেক যুগ পিছিয়েও যাওয়া হবে বঙ্কিমবাবুর কাছে। আর নামটি অভিজাতও হবে।

বেশ নাম।

তবে আয়েষাই থাক।

তা থাক। তবে আয়েষা নিজে কতদিন থাকে তা কে বলতে পারে।

মানে?

মানে নেই। সব কথার মানে খুঁজতে নেই। আমি ভাবছি, আপনাকে আমি "আলপিন" বলে ডাকব।

খুব জোরে হেসে উঠল নমিত।

বলল, জন্মজিৎবাবুর কবিতাটি কিন্তু অসাধারণ। "আসলে আলপিন ন'য়, তোমার চে'রা।"

মানুষটিও মজার। এ বাড়িতেই আলাপ হয়ে যাবে কখনও। হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, লালা, কত জায়গা থেকেই যে কবি, চিত্রী, গায়কেরা আসেন আমাদের বাড়িতে, জেঠুকে সকলেই ভালবাসেন। এই পৃথিবীতে স্বার্থহীন ভালবাসা বাসার মানুষ যে বড়োই কমে এসেছে। এই শনিবার অনেক তরুণী আসবে। আসতে ভুলবেন না যেন আপনি। আপনার জন্যেই বিশেষ ভিড় হবে। তাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে এই 'আলপিন' হয়তো আপনাকে খোঁচা দেবে না আর।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বলল, সত্যি! আপনিও দুর্বিনয়ের মতন ছেলেমানুষ। বড়ো হড়বাড়িয়া আপনি। একি তাসের দান যে ফস-স করে ফেলে দিলেন! অন্যদের কার হাতে কি আছে বোঝার চেষ্টা করুন একটু। প্রয়োজনে সাফলিং-এর সময় জোচ্চুরি করুন। জীবিকাতে জোচ্চুরি করছে যখন শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ তখন জীবনেও না হয় করলেন একটু-আধটু।

জীবনে যারা জোচ্চুরি করে তারা জীবন চাপা পড়ে মারা যায়।

নমিত বলল।

জীবিকার জোচ্চোরেরাও মারা যায়। তবে পরের প্রজন্মের হাতে। দৌড়টা অনেক লম্বা। হাজার হাজাব মিটারের দৌড় তো। অনেক ল্যাপ দৌড়োতে হয়। সাদা চোখে বোঝা যায় না, এই যা।

এবারে আমি উঠব।

কেন? তাড়া কিসের? কেউ কি বসে থাকবে আপনার জন্যে? জেঠুর কাছে শুনেছি আপনি পেয়িংগেস্ট আছেন এক জায়গাতে। জেঠু বলছিলেন আপনার গৃহস্বামিনী নাকি...

কি?

না। সে জেঠুর কাছেই শুনবেন। খেয়েই যান। এখানে খেয়ে যান।

নাঃ।

কেন? বাববার না বলছেন কেন?

একদিনে এত সুখ সইবে না। আস্তে আস্তে সওয়াতে হবে।

তাই?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমাকে গান না শোনালে যেতে দেব না।

বেশ। একটা গানের কথা শনিবার থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল।

কার গান?

এটাও নিধুবাবুর।

বেশ। শোনান। তার আগে আমি দৌড়ে গিয়ে এককাপ চা করে নিয়ে আসছি। এককাপ চা খেয়ে, গলা ভিজিয়ে তারপরেই গানটা শোনান। এতক্ষণ রইলেন, কিছু খেলেন না।

কেন? চোখে যে চুমু খেলাম।

সেটা তো ফাঁকি।

আমি তো পূর্ণতা বলেই জানলাম।

সবোজা ভিতরে যাওয়ার একটু পরেই বাইরেব ভেজিয়ে রাখা দরজাটা কে যেন জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলল। শব্দ করে উঠল পাল্লা দুটো।

পাশ ফিরে তাকাল নমিত।

দেখল দুর্বিনয়। দুর্বিনয়ের মুখে, বলা বাহুল্য, বিনয় ছিল না। সে নমিতের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, ভাল?

হ্যাঁ।

কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ।

কী করতে?

আপনি যা করতে।

মানে?

কবিতা শোনাতে এবং...

এবংটা কি?

কবিতার রসদ সংগ্রহ করতে।

তাই?

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, দুর্বিনয়।

ক-টা কবিতা শোনালেন?

সুযোগ পেলাম কই,

কেন? বললেন যে অনেকক্ষণ এসেছেন।

আপনি "অনেকক্ষণ" বলতে কতক্ষণ বোঝেন তা আমি কী করে বুঝব!

ও।

আসলে সরোজা সর্বক্ষণই তো আপনার কথাই বলে গেলেন। আমরা কথা বলি বা দুটি কবিতা শোনাই তার সুযোগ আর পেলাম কোথায়?

বাজে কথা বলছেন।

সত্যি বলছি। বাজে কথা বলে আমার লাভ?

সত্যি?

সত্যি।

দুর্বিনয়ের মুখচোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ভারি সুন্দর চেহারা দুর্বিনয়ের। চেহারার মধ্যে এক বিশেষ আভিজাত্যর ছাপও আছে। ওব মুখে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল নমিত। সরোজার যাকে ভাল লাগে, সে কি খারাপ হতে পারে!

দুর্বিনয় বলল, সরোজাদি আসার আগে আমি কি কবিতা শুনতে পারি না একটা দুটো? আপনার?

পারবেন। শনিবার। আজ নয়। সব কবিতা তো সকলের জন্যে নয়ও। এত বোঝেন আর এটুকু বোঝেন না?

তা ঠিক।

আপনি আপনার সরোজাদির এত ভক্ত কেন?

নমিত বলল।

বলব?

বলুন।

এমন মেয়েলি মেয়ে আমি আর দেখিনি।

বাঃ। আপনি কবির মতনই বললেন কথাটা। "মেয়েলি মেয়ে"। ভারি সুন্দর করে বললেন।

আপনার গানের কথা শিলচর শহরে সবাই জেনে গেছেন।

দুর্বিনয় বলল।

তাই? তবে তো বিপদ হল।

বিপদের মধ্যেই তো সম্পদ থাকে।

আপনি বয়সে তরুণ, সুদর্শন, বড়ো চাকরি করেন, কবিতা লেখেন, কবিতা পড়েন, তার ওপবে এমন গানও গান। তাই এই শনিবারে শিলচর শহরের তরুণীরা মেঘাদার বাড়ি রেইড করবেন।

তবেই তো সর্বনাশ। বিপদ তেমন বেশি সংখ্যাতে এলে তার মধ্যে থেকে সম্পদ কি বাঝা সম্ভব হবে?

হবে হবে। এমন এমন সব মহিলা আসবেন যে, দেখবেন তাঁদের কাছে আপনার সরোজাকেও বাঁদি বলে মনে হবে।

তাই? আমি নিজে তো বান্দা। আমার বাঁদিই ভাল লাগে। আপনার মতো রাজপুত্র তো আমি নই যে, স্বয়ংবরসভায় নিমন্ত্রণ পাব।

কী বসেন! আপনার জন্যে স্বয়ংস্ত্রী সভা হবে।

এমন করে বলবেন না। শিলচর শহর এবং তার রমণীকুল সম্বন্ধে এই কদিনে আমার যে ধারণা হয়েছে তা অতি উচ্চ। আপনার কথাতে আমি কিছুই মনে করিনি। কিন্তু বোকা লোকে এর কদর্য অর্থ করতে পারে। শিলচরের মেয়েদের কি বিয়ে করা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ নেই? আমার তো ওঁদের অত্যন্ত গুণী, অন্তর্মুখী এবং আত্মসম্মান জ্ঞান-সম্পন্না বলেই মনে হয়েছে। ওঁরা অত্যন্ত শালীন এবং সভ্যও। কলকাতার অনেক তরুণীদের মতন ফাজিল নন আদৌ।

এঁরা তো একটু কনসার্ভেটিভ।

দুর্বিনয় বলল।

যাঁদের কনসার্ভ করার কিছু থাকে তাঁরাই কনসার্ভেটিভ হন।

তাই? বাঃ। বেশ বলেছেন তো কথাটা।

নমিতের মনে হলো, দুর্বিনয়ের শৈত্য একটু একটু করে গলছে। অবশ্য তা গলাবার জন্যেই সে তাপের সৃষ্টি করেছিল। নমিতকে দুর্বিনয় হয়তো আর "এনিমি নাম্বার ওয়ান" বলে ভাবছে না।

দুর্বিনয় বলল, আপনার গানের কিন্তু তুলনা নেই। দিনে কতক্ষণ রিওয়াজ করেন?

মাসে এক-দুদিন, বাথরুমে।

বাজে কথা।

রিওয়াজ অন্যভাবে হয়। সপ্তাহে ছোটোবোনের সঙ্গে সকালে অন্তর দুদিন ঝগড়া করি একেবারে তারাতে। তাতেই যা রিওয়াজ হয়। দুজনেরই।

বোন কি গান গান?

রবীন্দ্রসঙ্গীত।

দুর্বিনয় হেসে বলল, বাজে কথা।

কি?

ঝগড়াটাই রিওয়াজ।

মারি-বিস্কিট আর চা নিয়ে ঢুকল সরোজা।

দুর্বিনয়ের দিকে চেয়ে বলল, কি রে! কখন এলি? তাই গলা পাচ্ছিলাম ভিতর থেকে। ভাবছিলাম কে হতে পারে এই অসময়ে। তুই ছাড়া আর কে হতে পারে!

আমার গলাটা না হয় নমিতবাবুর মতো সুন্দর নয় কিন্তু তা বলে তুমি আমার গলাটা চিনতেই পাবলে না এ খবরে আমি আদৌ খুশি হলাম না কিন্তু।

তো কি করা যাবে!

সরোজা বলল।

নমিত বুঝতে পারল যে, নমিতের সামনে সরোজা দুর্বিনয়ের সঙ্গে ফর্মাল হচ্ছে। বুঝে, দুঃখ পেল। উঠে দাঁড়িয়ে সরোজাকে বলল, দুর্বিনয় সাইকেল চালিয়ে এসেছে। তেষ্টাটা ওরই বেশি পাবার কথা। চা-টা ওকেই দিন। আমি আজ উঠি।

সে কী! একজনের জন্যের জিনিস অন্যজনকে দেব কেন? আর দিলেই বা সেই তা নেবে কেন?

সরোজা বলল।

নমিত বলল, এই "কেন"র কোনো উত্তর হয়তো নেই কিন্তু সকলেরই জীবনে জীবনময়

অনুক্ষণ এমনটিই ঘটছে। একজনের জন্যে যা সংরক্ষিত তা অন্যজনে পাচ্ছে। অথবা পেতে চাইছে। এই নিরবধি বহমান প্রবাহকে আপনি ঠেকাবেন কি করে! সত্যিই উঠব আমি।

সরোজা আহত যতটা হল, রেগে গেল তার চেয়ে বেশি। বলল, সত্যিই খাবেন না? চা?

না। কঠিন স্বরে বলল নমিত।

কেন স্বরে কাঠিন্য লাগল ও নিজেই বুঝল না। কিন্তু লাগল।

চায়ের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে থেকেই সরোজা বলল, নমিতবাবু, আপনার বয়স কত?

বয়স কি বয়সে হয় সরোজা দেবী?

তবে? কিসে হয়?

অভিজ্ঞতায়।

বাঃ। ঠিক বলেছেন স্যার। এই কথাটাই তো আমি সরোজাদিকে বোঝাতে পারি না। কতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করি। রাইট উ্য আর। বয়স বয়সে হয় না। হয়, অভিজ্ঞতায়।

বলেই, সরোজার দিকে ফিরে বলল, দেখলে সরোজাদি।

সরোজা বলল, তুমি চুপ করো দুর্বিনয়। আমি ব্যস্ত আছি। চান করতে যাব। রান্নাও বাকি আছে একটু। শিউলি বউদির বাচ্চাটাকে চান কবাতে এনেছিলাম।

কেন? উনি নেই?

থাকবেন না কেন?

তবে?

আমার ভাল লাগে, তাই।

ওঃ।

চায়ের ট্রে-টা সেন্টার টেবলে নামিয়ে রেখে সরোজা নমিতের দিকে ঘুরে বলল, তাহলে? ঠিক আছে। খাবেনই না যখন, তখন—

বলেই দরজা বন্ধ কবার জন্যে দরজার দিকে এগোল।

দুর্বিনয় অবিশ্বাসের গলাতে বলল, আমিও যাব? এখুনি? সত্যি সত্যি?

কী মুশকিল! আমাব কি চান-খাওযা নেই? তোমার কবিতা শোনানোর মানুষ কি একমাত্র আমিই? পাগল করে দেবে তুমি আমাকে।

আহত হল দুর্বিনয়। বিশেষ করে নমিতের সামনে অমন রূঢ় কথা বলাতে। বড়ো হোক, ছোটো হোক, তরুণ হোক কী প্রাচীন হোক, কবিমাত্রই জানেন তাঁর কবিতাকে অপমান করলে বুকে কেমন বাজে। কবিতার মান-অপমান যে ব্যক্তির মান-অপমানেব চেয়েও অনেকেই বড়ো, অনেকই অন্যরকম।

এই শনিবার আসছেন তো নমিতবাবু?

দুর্বিনয় বলল, নমিতের সঙ্গে দরজার দিকে যেতে যেতে।

বলতে পারছি না।

সেকি? কেন?

এই শনিবার কিন্তু আমি থাকব না বাড়িতে দুর্বিনয়। জেঠুর এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ের প্রথম বার্ষিকী শনিবার। আমাকে সেখানে যেতেই হবে।

সরোজা বলল।

বাঃ। তুমি না থাকলে কি করে হবে?

দুর্বিনয় শিশুব মতন বলল।

হবে। তোমাদের "মিলনীর" আমি কে? তাছাড়া, আমি কি চিরদিনই তোমাদের ঝি-গিরিই করব? আমার নিজস্বতা বলতে কি কিছুই নেই?

নমিত এ সবের মধ্যে একটিও কথা বলল না। দু হাত জড়ো করে নমস্কার করে বলল, চললাম। ভাল থাকবেন। আমার উপরে রাগ করবেন না।

কেন? রাগ করব কেন? কী কারণে?

উষ্মার সঙ্গে বল সরোজা।

শুধুমাত্র যথার্থ কারণেই যদি সবসময় রাগ করতেন বা অন্য কেউও করত, সংসারে তবে আর দুঃখ ছিল কি?

বলেই, দরজা দিয়ে বাইরে এল ও।

দুর্বিনয় বলল, একটা রিকশা পাঠিয়ে দেব মোড় থেকে?

না, না, আমি ধরে নেব।

তাহলে চলুন মোড় অবধি আমিও হেঁটে যাই আপনার সঙ্গে।

কোনো উত্তর দিল না নমিত।

বলল, আজ তোমার ছুটি? তোমাকে তুমিই বলছি। তুমি অনেকই ছোটো।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাই তো বলবেন। আমরা সকলেই আপনার অ্যাডমায়ারার হয়ে গেছি গান শুনে।

তোমার আজকে ছুটি?

আমার কোনোদিনই ছুটি নেই।

কী করো তুমি দুর্বিনয়?

আমার একটা ছোট্ট দোকান আছে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বলতে পাবেন। দুজন ছেলে আছে হেল্পার। মালিক আমিই।

তুমি কি ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার?

এঞ্জিনিয়ার-টিঞ্জিনিয়র নই। ডিপ্লোমা নিয়েছিলাম একটা। স্কুল ফাইন্যালের পরে আর পড়াশুনো করতে পারলাম কই? মাকে খাওয়াতে তো হবে। আমার ইতিহাস বলব আপনাকে একদিন।

দুঃখের ইতিহাস? বঞ্চনার ইতিহাস তো?

ঠিক ধরেছেন। কি করে বুঝলেন?

না। আমি শুনব না। তুমি কারোকেই ওসব বোলো না।

অবাক হয়ে চলা-থামিয়ে ও বলল, কেন বলুন তো? একথা কেন বলছেন?

যাঁদের তুমি এসব কথা আজ অবধি বলেছ তাঁদের মধ্যে কেউই কি তোমার জন্যে কিছুমাত্র করেছেন?

না। তা করেননি।

তবে নিজেকে ছোটো করবে কেন? এই সমাজে নিজস্বার্থ ছাড়া কেউ কারো জন্যে কিছুই করে না। অন্যের বিপদে বড়ো আনন্দ হয় যে অধিকাংশ মানুষের। তোমাব দুরবস্থা যাতে প্রলম্বিত হয়, তাই চায় মনে মনে প্রত্যেকে।

কেন?

তোমার অসুবিধা না থাকলে, দুঃখ না থাকলে তাদের তুমি সেসব কথা বলবেই না তো আব! কুকুরকে বিশ্বাস করে বলো সবকিছু, পথের গোরু-ছাগলকেও। কিন্তু মানুষকে কখনও বোলো না। ডাঁটে থাকবে কলার তুলে। যতই কষ্ট থাক। এরা সব শক্তের ভক্ত নরমের যম। এরা কেউই তোমার হিতার্থী নয়।

সত্যি! ঠিকই বলেছেন। এমন করে আমাকে কেউ বলেনি।

তোমার দোকানটা কোথায় দুর্বিনয়?

চার্চ রোডে।

কোথায় কোথায় কাজ করো? মানে, তোমার কাস্টোমার কারা?

যেখানে পাই। যে আসে তার কাজই করি। বাড়ির ওয়্যারিংয়ের কাজ পেলে তো হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, লালা, উধারবন্ধ, কোথায় না চলে যাই! প্রফিট ভাল থাকে তো তাতে! আর শহরের মধ্যে তো কোনো জায়গাই বাদ নেই। মালুগ্রাম, শ্রীমাপুরী, তারাপুর, চার্চ রোর্ড, অম্বিকাপট্টি, গুরুচরণ কলেজের এদিক-ওদিক। যে ডাকে, তার ডাকেই সাড়া দিই।

তোমার পার্মানেন্ট ক্লায়েন্ট নেই কোনো?

না। পার্মানেন্ট থাকবে কি করে। প্রয়োজন হলেই না ডাকবে।

তা কেন? মাস মাইনে দিয়েও রাখতে পারে। মেটেরিয়াল সাপ্লাই করবে তারা। তোমার লেবারের জন্যে একটা বাঁধা টাকা দেবেন ওঁরা প্রতি মাসে।

তাই? হয় নাকি এমন?

হয় বইকী? তোমার কার্ড আছে?

হাঃ। আমার আবার কার্ড। একটা টাইপ করে সাইক্লোস্টাইল করে নিয়েছিলাম। ছিল তো একটা মানিব্যাগে। কাজে তো লাগে না। দাঁড়ান দেখি। বলে, দাঁড়িয়ে পড়ে, ম্যানিব্যাগ থেকে বের করল একটা কুঁকড়ে-যাওয়া কাগজ। দিল, নমিতকে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা মোড়ে পৌঁছোল।

রিকশা ডাকল একটা দুর্বিনয় নমিতের জন্যে।

নমিত বলল, তাও ভাল যে "ভাল লাগে না" বলেনি রিকশাওয়ালা।

হেসে ফেলল দুর্বিনয়। বলল, হ্যাঁ এই আমাদের এক দোষ। "ভাল লাগে না" শিখে গেছেন আপনি?

রিকশাতে উঠতে উঠতে নমিত বলল, নিজের ব্যবসার সময়ে কবিতা লিখো না। কবিতার জন্য আলাদা সময় বের করে নেবে। যারা বলে, ব্যবসা করে বা চাকরি করে বা পেশায় থেকে কবিতা লেখা যায় না, তারা বাজে কথা বলে। সবকিছু করেও সবকিছু করা যায়। সময়ের আর তোমার ইন্টারেস্টের ঘরগুলোকে ভাগ করে নিতে হবে। যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?

কি কবে? মানে, ভাগ কবব কি করে?

তোমাকে শিখিয়ে দেব। এই নাও আমার একটা কার্ড। কোনো টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একদিন এসো।

কোথায়?

অফিসে বা বাড়িতে যেখানে খুশি। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবে। বাড়িতে আমার ফোন নেই। ফোনটা অফিসেই কোরো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে এলে দেখা করব না। তবে এ বাড়ি শিগগিরই ছেড়ে দেব। নতুন বাড়িতে ফোন থাকবে।

বেশ।

বলেই দুর্বিনয়, সাইকেলে উঠে বাঁ দিকের পথে চলে গেল, হাত তুলে বিদায় নিয়ে।

রিকশায় যেতে যেতে নমিতের গায়ে হাওয়া লাগছিল। বসন্ত আসবে আসবে করছে। ভোরের দিকে হাওয়া ছাড়ে একটা। কোকিল ডাকে মাঝরাত থেকে পাগলের মতন।

বেশ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল নমিত। কেন যে আসার আগে সরোজাকে কষ্ট দিয়ে এল! যাকে ভালবাসে তাকে কি কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায় ও? বউদি একথা প্রায়ই বলে। বলে, তোমার অদ্ভুত স্বভাব নমিত। আমাকে কষ্ট দিয়ে তুমি কী খুব আনন্দ পাও, না? তুমি একজন Sadist।

নমিত ভাবে যে, সে নিজেই জানে যে নিজে কত কষ্ট পায় সেই অন্যদের কি করে বোঝাবে! জানে না। ও বড়োই কমপ্লিকেটেড। নিজেকেই বোঝে না নিজে তায় অন্যকে বোঝাবে কি করে। সরোজা যদি সত্যিই না থাকে শনিবারে তবে মেঘাদার বাড়িতে ও যাবেই না। ওর মনে হল, শুধু ও কেন? একথা জানতে পারলে আগে, অনেকেই হয়তো আসবে না।

কাল রাতে একটা নাটক দেখতে নিয়ে গেছিল হিমাশিস ভট্টাচার্য এবং দেবাশিস দাস। ভারি ভাল ছেলে ওরা।

হিমাশিস থাকে সুভাষনগরে আর দেবাশিসের বাড়ি নরসিংতলাতে। এরা দুজনেই খুবই সাহিত্যমনস্ক! এদের সঙ্গে নমিতের আলাপ হয়েছিল বুধবারে শ্রীপ্রভাস সেন মজুমদারের বাড়িতে। উনি শিলচরের ডাকসাইটে উকিল। নমিতদের কোম্পানির একটা পেটেন্টের মামলা নিয়ে তাঁর কাছ যেতে হয়েছিল নমিতকে। ভালই হয়েছিল। নমিত জানত না যে, বরাক উপত্যকা সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রভাসবাবুই।

একজন চিত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ওখানেই। নাম মৈনুদ্দিন চৌধুরী। উনি ওই সম্মেলন উপলক্ষেই এসেছিলেন শিলং থেকে। বাড়ি যদিও শিলচরেই। খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ। শিলংয়ে গিয়ে ওঁর স্টুডিয়ো দেখার নিমন্ত্রণ করলেন।

"শহিদ দিবস" দেখতে এসেছিল এক নবীন দম্পতি। নাম অনুপ আর অরুন্ধতী সেন। অনুপ শিলচরের দূরদর্শন কেন্দ্রতে আছে। চমৎকার ছেলে।

সঞ্জীব আবার গান-পাগল। নিজেও গায়ক। নমিত গান গেয়েছিল তা "মিলনী"-র কারো মুখে শুনেছিল সে। আগেই নাটক দেখতে গিয়ে আলাপ হয়ে গেল।

ওদের বারেবারেই বলল নমিত যে, ওদের ভাষাতেই ওর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু ওরা শুধু হাসে। আর কদিন এখানে থাকলেই ভাষাটা শিখে নেবে নমিত। নমিত তা জানে। সব ভাষারই উচ্চারণ এবং টানটোনই হচ্ছে আসল। কান না থাকলে ভাষা শেখা যায় না। গানও যখন কান দিয়েই শিখেছে, গানের ব্যাকরণ গুলে শেখেনি, তখন এই কাছাড়ী ভাষা বা সিলেটি ভাষাও অবশ্যই শিখতে পারবে। সব ব্যাকরণের প্রতিই নমিতের এক তীব্র অসূয়া আছে। হয়তো ও সর্বার্থেই অশিক্ষিত বলেই।

ওর কলকাতার বন্ধু ডিনা মালহোত্রা বলত, "The easiest way to learn a language is to fall in love with a girl who speaks the language."

নমিতও হেসে বলল, For love making, body language is the only universal language which has not language barrier, very much like instrumental music.

তাতে ডিনা হেসে উঠে ওর পিঠে চাপড় মেরে বলত, ড্যা আর আ জিনিয়াসকি বাচ্চা। "আর" কথাটার উপর জোর দিয়ে বলত। কলকাতা ছেড়ে এসেছে বলেই কলকাতার নানা টুকরো-টাকরা কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝেই।

"শহিদ দিবস" নাটকটা স্থানীয় উপভাষাতেই লেখা। লিখেছেন বিশ্বজিৎ চৌধুরী। তিনি একটি ছোটো চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। পেশাতে নাকি ভদ্রলোক এঞ্জিনিয়ার। চমৎকার নাটক। এত অল্প খরচেও যে কোনো নাটক মঞ্চস্থ করা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কলকাতার প্রয়োজক-নির্দেশকদের উচিত শিলচরে এসে ওই সব নাটক দেখা।

ভাষা আন্দোলনের জন্যে শহিদ যিনি হলেন তাঁর বিধবাই না খেয়ে থাকেন আর শহিদ দিবসে

সেই প্রখ্যাত শহিদকে নিয়েই রাজনীতিকদের, পাড়ার মাস্তানদের কী লীলাখেলা! Pointless নাটক নয়। অত্যন্ত বাস্তববাদী meaningful নাটক। অভিনয়ও প্রত্যেকেরই চমৎকার। বিশেষ করে যে মহিলা মৃত শহিদের স্ত্রীর ভূমিকাতে অভিনয় করেছেন। তবে জায়গায় জায়গায় একটু over acting, over emotion আছে। ছেলের চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন এবং মৃত শহিদের এক সময়ের বন্ধু, কুম্ভীরাশ্রু ফেলা ধূর্ত স্বার্থপর রাজনীতিক নেতার ভূমিকাতে যে ভদ্রলোক অভিনয় করেছেন তিনিও অনবদ্য। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম মনে করে রাখেনি। অথচ রাখাটা উচিত ছিল।

স্থানীয় উপভাষায় লেখা আরও নাটক দেখার ইচ্ছের কথা বলল নমিত হিমাশিসদের। ওরা বলল দেখাবে। এও বলল যে 'নসীব' নামের একটা নাটক এই উপভাষাতে রচিত প্রথম নাটক। শ্রীঅনন্ত দেব নাকি ওটি লেখেন। উনিশশো আশিতে তা প্রথমবার মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও "শকুনর ছাও", ধর্মনগরের ড. নাথের লেখা, দেবব্রত চৌধুরীর 'কুঠার', চিত্রভানু ভৌমিকের 'যাইতাস কই', 'আইজও আন্দাইর', 'লালমোহনের সংসার' এবং তীর্থংকর দত্তর লেখা 'উত্তরাধিকার' ইত্যাদি। বরাক উপত্যকাতে এই উপভাষাতে লেখা নাটক সমন্ধে নাটকের দলগুলি এবং দর্শকদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে নাকি সাম্প্রতিক অতীত থেকে।

দেখা যাওয়ারই কথা। ভাবছিল নমিত। এই উপভাষার ওপর পুরো দখল না-থাকা সত্ত্বেও তার বুঝতে খুব একটা অসুবিধে তো হল না! এই ভাষা ভারি মিষ্টি এবং আন্তরিক। অবশ্যই শিখবে সে। এবং শিখতে পারলে সরোজাকে একদিন এই ভাষা অনর্গল বলে চমকে দেবে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হল। তার কারণও ছিল। নাটকের পরে হিমাশিসরা সকলেই যে যার মতন চলে গেল। নমিতদের কোম্পানির এক বড়ো ডিস্ট্রিবিউটর মি. বরজাতিয়া এসে হল থেকেই তাকে নিয়ে গেছিলেন তাঁর হোটেলে। গৌহাটি থেকে এসেছেন তিনি তিনদিনের জন্যে।

অনেকদিন পরে হুইস্কি খেল নমিত। বেশ বেশিই খেল। তারপর তিনিই তাঁর প্রাইভেট ট্যাক্সিতে নমিতকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

বরজাতিয়া সাহেব বললেন, বাংলাদেশ থেকে স্মাগলড হয়ে— আসা হুইস্কি। জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল।

নমিতের মনে হয় স্কটল্যান্ডের ওই কোম্পানি যত বোতল হুইস্কি না তৈরি করেন তার চেয়ে বেশি বোতল শুধুমাত্র বম্বেতেই বোধহয় বিক্রি হয়। এই সব স্মাগলড "স্কচ" খাওয়ার চেয়ে চুল্লু খাওয়াও ভাল। নমিতের মস্তিষ্কের, হয়তো পায়ের ভারসাম্য একেবারেই হারিয়ে গেছে।

ওর একতলার ফ্ল্যাটে একটা বড়ো বসার ঘর, শোওয়ার ঘর, অ্যাটাচড বাথরুম। বসার ঘরের লাগোয়া একটি চওড়া বারান্দা। বাগানের দিকে মুখ করা। গ্রিল দিয়ে ঘেরা। সেদিক দিয়েও তালা খুলে ঢোকা যায়। বসবার ঘরে এবং শোওয়ার ঘরেও চাবি দিকে 'লক" করা যায়। একটি চাবি আছে বাড়িওয়ালা অমলবাবুর কাছে। ওর কাছে ডুপ্লিকেটটা।

আজ নমিতও অমলবাবু হয়ে গেছে। বেশ ভাল নেশা হয়েছে বুঝতে পারছে। বার-বারান্দা দিয়ে না ঢুকে সে ভিতর বারান্দা দিয়েই ঢুকে পড়ল। এদিক দিয়েও ঢোকা যায়। অথচ কোনোদিনও ঢোকে না। কিন্তু চাবিটা পকেট থেকে বের করে বার বার ঘুরিয়েও দরজাটা খুলতে পারল না। চোখে ভাল দেখতেও পাচ্ছিল না। কেবলই নমিতের ওর বউদির কথা আর সরোজার কথা মনে পড়ছিল। মাথাটা ভার হয়ে আছে।

এমন সময়ে, আধো-অন্ধকারের মধ্যে কে যেন ওকে নরম হাতে সরিয়ে দিয়ে চাবিটা খুলে দিল। সে বোধহয় একতলাতেই ছিল। অথচ গাড়ির শব্দ শুনে দোতলা থেকে নেমে এসেছিল? কিন্তু কে? তারপর ওকে প্রায় বুকে জড়িয়ে এনে বিছানাতে শুইয়ে দিল সে। শুইয়ে "দিল" না বলে, বলা ভাল যে "ফেলল"। তারপরে সে-ই নমিতের জুতো-জামা সব খোলাল। এমনকী গেঞ্জি এবং ভিতরের ব্রিফও।

খুবই ঘুম পাচ্ছিল নমিতের। কী ঘটতে যাচ্ছে অথবা কে তা ঘাটাচ্ছে তা বুঝতে পারছিল না ও। বোঝবার ইচ্ছেও ছিল না। অনভ্যস্ত কোনো চুলের তেলের আর পাউডারের গন্ধ তার নাকে আসছিল। মেয়েলি ঘামের অচেনা গন্ধ। এখন তো তেমন গরম নেই। তবু ঘাম? নরম, খুব নরম বুকের পরশ! তার ঠোঁটের উপরে চেপে-ধরা নরম কামুক ঠোঁটের চাপ? আর তার উরুসন্ধিতে ঘন ঘন বিস্ফোরণ। কারা ঘাটাচ্ছে? উল্ফা নাকি? ঝুনু চৌধুরীদের চা বাগানেও কি ULFA রা আক্রমণ করবে? খুন করবে নমিতকে? কিন্তু সে তো প্রাণদায়িনী ওষুধেরই ব্যাপারী। এই সব প্রাণঘাতিনী প্রক্রিয়া কে বা কারা করছে তার উপরে? আর করছেই বা কেন? তাজ্জব কি বাত!

এখন, তার খাটের উপরে, তার শরীরের ভিতরে যে ভূমিকম্প উঠেছিল, রিখটার স্কেলে কেউ কি মাপল? কে মাপল?

তা থেমে গেছে। লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। নানা ধাতব ছাই উড়ে উড়ে পড়েছে চারপাশে। তবে সাদা। ট্যালকম পাউডার।

কে এত পাউডার মাখে কে জানে! নাকি কোনো ময়দা-কলের মালিক?

নমিতের বউদি বলে, বেশি পাউডার মাখলে স্কিন নষ্ট হয়ে যায়। বউদি তুহিনা মাখে। হাতে, পায়ে, মুখে। ভারি মিষ্টি গন্ধ। আর চান করার আগে অলিভ অয়েল। ইটালিয়ান। সারা বছর। ভারি মসৃণ চামড়া বউদির। সরোজা কি মাখে কে জানে।

তার যখন ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল, মানে, নমিতের, অনেকই সেবা করেছিল বউদি। খুবই কাছে থাকত তখন। ওডিকোলন-জলের পটি দিত। তাকে জড়িয়ে ধরে থাকত। বউদি খুব ভাল। শালীন। মণিপুরের লকটাক হ্রদের মতো শান্ত স্থির। যেখানে ফুমডির ওপরে নাচুনে হরিণরা খেলা করে। হ্রদ নিজে স্থির থাকে। হ্রদ সুন্দর, সুগন্ধি, শান্ত।

কিন্তু এই সাদারঙা ভূমিকম্পটা কোথা থেকে এল, তারপর কোথায় যেন চলে গেল। নমিত আধো-জ্ঞানে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বাগানে প্যাঁচা-প্যাঁচানি উড়ে উড়ে ঘুরেঘুরে ঝগড়া করছিল। বাগান থেকে মিশ্রফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। দূরের হাইওয়ে দিয়ে একটা ওভার-লোডেড ট্রাক ককিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। মোড় পৌঁছে তারপর বাঁক নিল তারাপুরের দিকে। তারপরই সব নিস্তব্ধ। রাত সুনসান। তার পরেই নমিতের বাল্ব ফেড-আউট করে গেল। আর কিছুই মনে ছিল না।

সকালে ঘুম যখন ভাঙল, তখন অনেকই বেলা। ও বেল দিলে তবে চা দিয়ে তবে চা দিয়ে যায় কাজের ছেলেটি। বেল দিল একসময়ে। ছেলেটি আসবে। তার নাম হারু। চা দিতে এল। সঙ্গে মুড়ি আর দু কোয়া বড়ো রসুন। রোজ খায় নমিত। দাদার দেখাদেখি।

বেল দেবার আগেই আতঙ্কিত চোখে মেঝেতে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে থাকা সব একবার দেখে নিয়েই জামা-কাপড়-গেঞ্জি-মোজা-ব্রিফ সব ওয়ার্ডরোবে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। তারপর রাতের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে নিয়ে দরজাটা খুলে দিল চাবি ঘুরিয়ে। আশ্চর্য! সকালে তালা কোনো রকম আপত্তি করল না! তালাদের মানসিকতা বোঝা দায়। রাতে এই তালাগুলো, সব শালা তালা, অদ্ভুতভাবে বিহেভ করে। আলো ফুটলেই লক্ষ্মীসোনা। যাচ্ছেতাই!

চা এলো। চা খেলো। এও একটা অভ্যেস। এই অভ্যেসই মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

কিন্তু কাল রাত্রে কি হয়েছিল?

এই জন্যেই হয়তো নমিতের বাবা বলতেন, মদ খুবই খারাপ জিনিস। মদ কখনও ছোঁবে না। এমনিতে তেমন ছোঁয়ও না। তবে কলকাতায় কবি-সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবেরা আবার মদ না খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের কবিতা বেরোয় না। খিচুড়ি দিয়ে রাম, পারশে মাছ আর আলুপোস্ত দিয়ে জিন, পাঁঠার চাট-এর সঙ্গে হুইস্কি এই সবই আঁতেলপনারই একটা বিকাশ। থুড়ি, পেকাশ।

নমিত চান করল ভাল করে। তারপর অফিসের জামা-কাপড় পরে যখন ব্রেকফাস্ট খেতে গেল খাবার ঘরে, দেখল বউদি। মানে অমলবাবুর স্ত্রী। কাল রাতে তিনি ছাড়া আর কে ছিল একতলাতে?

বললেন, শরীর খারাপ?

নমিত বলল, না তো! মুখ না তুলেই বলল।

তার গলাতে গভীর বিরক্তি ঝরল।

কাল কোথায় গেছিলেন রাতে?

কাজ ছিল।

কিছু চুরি গেছে কি আপনার? কাল রাতে?

চুরি? নাঃ। জানি না।

গেছে।

কি?

পরে জানতে পাবেন।

অমলদা নেই বাড়িতে?

না। তিনদিনের জন্যে গতকাল আইজল-এ গেছেন।

ও।

তারপর অমলবাবুর স্ত্রী বললেন, আজ আপনি কখন ফিরবেন অফিস থেকে? আমি আনিয়ে রাখব। আপনার দাদা যা খান। ঘরেই সব মজুত থাকতে পথে-বিপথে ঘোরা কেন? নাকি অন্য কোনো ব্র্যান্ড খান আপনি? দাদা খান রয়্যাল চ্যালেঞ্জ।

আপনাদের বাড়ি যেন কোথায়? সুলসুলি না কোথায় যেন? অমলদা প্রতি রাতেই যে জায়গার নাম করে নামতা পড়েন সে জায়গা কোথায়? বরাকভ্যালির কোনদিকে?

সে জায়গা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে। আমাদের বাড়ি ডায়মন্ড হাবড়ার কাছে।

ঈসস। অশিক্ষিত। অশিক্ষিত। আটারলি অশিক্ষিত। আটরলি বাটারলি অশিক্ষিত। ভাবল নমিত।

ও ভাবল, অশিক্ষিত আর শিক্ষিত নারীর শরীর কি আলাদা রকম হয়।

তারপর ভাবল, নাঃ! শরীর তো পৃথিবীর সব নারীরই একইরকম। কিন্তু সেই শরীরের সাজ, তার ক্রিয়া-বিক্রিয়া, তার চাওয়া-পাওয়া সবই অন্যরকম। শুধু নারীর শরীর কেন? পুরুষের শরীরেরও। দু জনেই তো মানুষ। শুধু দু রকমের মানুষ।

দুটো ডিম-এর ওয়াটার-পোচ আর চারটে টোস্ট নিয়ে এর হারু। জ্যাম, জেলি এবং মাখনের পাত্র। গোলমরিচ, নুন। একটা আস্ত পেঁয়াজ, দুটি কাঁচা লংকা। জেনারাল উইংগেট-এরই মতন ও পেঁয়াজ ভক্ত।

উনি এবারে হারুকে বাজারে পাঠালেন। বললেন, যা, বাজারটা করে নিয়ে আয়। যা যা বলছি। টাকা আর থলিয়া রান্নাঘরের টেবিলের উপরে রাখা আছে।

হারু চলে গেল থলিয়া নিয়ে। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল।

দুধ খাবেন? কেলেগের সিরিয়াল এনে রেখেছি। নতুন বেরিয়েছে।

নমিত ভাবল যে বলে, বেরিয়েছে অনেকই দিন। ‘ডায়মন্ড হাবড়া’র কাছের সুলসুলিতে পৌঁছোতে হয়তো বহুত দিন লেগে গেছে। ওঃ গড! ডায়মন্ড হাবড়া।

তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নমিত বলল, আমি আর এখানে থাকব না।

কেন ভাল লাগেনি?

চাবি দিয়ে লোক পাঠিয়ে দেব। আমার মালপত্র সব নিয়ে যাবে।

আপনার দাদা আসা অবধিও থাকবেন না?

না।

হঠাৎ মহিলার চোখ দুটো জলে ভরে এল। মুখ নামিয়ে নিলেন। নিজের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন উপরের ঠোঁট দিয়ে। তারপরই শব্দ না করে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

চোখ তুলে দেখল নমিত। দেখে কিন্তু মনে হল না যে, অভিনয় করছেন মহিলা।

নমিতের ভিতর কোথায় যে কি ঘটে গেল। ওর সামনে কেউ কাঁদলে ওর বুকের ভিতরে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। কিন্তু কত রক্ত ঝরাবে ও! পৃথিবীতে কাঁদে এমন মানুষই তো বেশি। চারদিকেই তো কান্নাই। হাসে আর কজন? তাও অতি সামান্য কান্নাই দেখা যায়, বেশিটাই দেখা যায় না হিমবাহর মতন। চোখের আড়ালেই থাকে।

তারপরই উনি কাছের একটি চেয়ারে এসে বসে বললেন, আমি জীবনে এত সুখী কখনও হইনি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে বললেন, আপনার কোনো কলঙ্ক লাগবে না। মানে, বিপদ হবে না। আমার লাইগেশান করানো আছে।

তারপর আবারো থেমে বললেন, আমি ভারি দুঃখী নমিতবাবু। আমি ভিখারি। মানুষ অপরিচিত ভিখারিকেও ভিক্ষা দেয়। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি তো আর কারো কাছেই ভিক্ষা চাইনি এ পর্যন্ত। অসহ্য হয়েছিল। আর কী বলব। বড়ো লজ্জা করে।

তারপরেই নমিতকে একেবারে চমকে দিয়ে সেই সামান্য শিক্ষিতা, টিভির পোকা, শুধুমাত্র সিনেমা-ম্যাগাজিনপড়া মহিলা বললেন, মানুষ মনের প্রেম ছাড়াও যেমন বাঁচে না, শরীরের ভালবাসা ছাড়াও বাঁচে না। আমার যে দুটোর একটাও নেই নমিতবাবু।

নমিত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল অমলবাবুর স্ত্রীর ফরসা গোলগাল একটু মোটা-সোটা মুখের দিকে। হাতের গড়নও গোলগাল। নমিতের মায়ের হাতের গড়নও ওইরকম ছিল। মহিলার পায়ের গড়ন কী বুকের গড়ন কেমন তা কাল অজ্ঞানাবস্থাতে দেখেনি। তবে ইচ্ছে করলেই আজ সজ্ঞানে দেখতে পারবে। যদি ইচ্ছে করে।

আপনি সম্পূর্ণই মুক্ত। যে ভিখারিনি ভিক্ষা নেয় তার কি কিছুমাত্রও দাবি থাকে সেই দাতার উপরে? তাছাড়া আর তো দুটো রাত। ও তো ছেলেমেয়েদেরও নিয়ে গেছে আইজল দেখাতে। কাজের মেয়ে দুটোকে আমি ছুটি করে দিয়েছি।

আপনি আইজল দেখেছেন?

না। আপনি?

না।

আমাকে নিয়ে আপনি একবার যাবেন?

নমিত ভাবল, মহিলার মাথার গোলমাল আছে। নয়তো নিম্ফোম্যানিয়াক। সবাইকেই নিয়ে গেলেন, আপনাকে নিয়ে গেলেন না কেন অমলবাবু?

আমি কি মানুষ? দোতলার বারান্দায় দাঁড়ের মধ্যে যে চন্দনা পাখিটা আছে তাকে কি কোথাও নিয়ে যায় আপনার অমলবাবু? পুত্রার্থে ভার্যা। কথাটা শোনেননি? আমার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। অমলবাবুর একটি উনিশ বছরের রাখন্তি আছে। তার কাছ থেকেই রাত করে ফেরে সপ্তাহে ছ'দিন। তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে।

বলেন কি? হ্যাঁ!

কিন্তু রাখন্তিটা কি জিনিস?

ওই হল। রাখন্তি, রাখনি, রক্ষিতা, রাঁঢ় কত নামই তো আছে। রাখন্তি বলে, নদে জেলাতে। রাখনি বলে হুগলি জেলাতে। কৃষ্ণের যেমন শত নাম, তাদেরও তো শত লীলা আর শত নাম।

ছেলেমেয়েরা জানবে না? তাকেও নিয়ে গেলেন কোন আক্কেলে?

ছেলেমেয়েরা জানলেও কিছু বলবে না।

বলবে না? বলেন কি আপনি!

কেন বলবে? The king can never do any wrong. বাবার নেকনজরে থাকলে তারা কি না পাবে মা তো রোজগার করে না। আমাকে ওরা ভালবাসবে কেন? এখনও ছোটো আছে বলে একটু যা বাসে। যতই বড়ো হবে ততই বাবাগত প্রাণ হয়ে উঠবে। ওদের বাবা যদি আমাকে সম্মান দিত, একটু ভালবাসত, তবেই না ওরা বাসত।

একটু চুপ করে থেকে উনি বললেন, আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতা, এই-সেই নানা কথা পড়ি, কাগজে, টিভিতে দেখি, কিন্তু যতদিন না পশ্চিমী দেশের মেয়েদেরই মতন এদেশের মেয়েরা রোজগার না করছে ততদিন এসব ফাঁকা বুলি। স্ত্রী স্বাধীনতা আছে রাজা মহারাজাদের ঘরে আর গরিব-গুরবোদের ঘরে। জঙ্গলের আদিবাসীদের মধ্যে। আমরা তো বিনি মাইনের রাখনি।

তারপর বললেন, নমিতবাবু, আপনি মানুষটি বড়ো ভাল। শুধু দেখতেই যে আপনি ভাল তাই নয়। প্রথম যেদিন আপনি এলেন সেই দিন থেকেই আমি মনে মনে আপনার সেবাদাসী।

ছিঃ।

বিরক্ত হয়ে বলল নমিত।

চা-টার তলানিটুকুও উত্তেজনাবশে খেয়ে ফেলে উঠে পড়ল নমিত।

ওকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে অমলবাবুর স্ত্রী বললেন, ফিরে আসবেন তো?

নমিত মুখ না তুলেই বলল, দেখি।

প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে উনি বললেন, আসবেন না?

ভেবে দেখব। বলে, নমিত বেরিয়ে গেল।
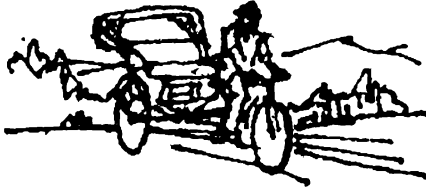
'মিলনী'তে কিন্তু আর একদিনও যাওয়া হল না।

তাতে অনেকেই নমিতের উপরে অসন্তুষ্ট হল। তবে মাঝে একদিন মেঘাদা একজনের বাড়িতে নমিতের গানের বন্দোবস্ত করে সকলকে ডেকেছিলেন। শুধু একটি বেহালার সঙ্গতে ও বারোটি গান গেয়েছিল। সঙ্গে একটি তানপুরা এবং তবলা থাকলে অনেক সুন্দর হতে পারত অনুষ্ঠান। তবু মনে হল, খুব একটা অসুন্দর হয়নি। সকলেই দারুণ খুশি।

সরোজাও এসেছিল গান শুনতে। তবে পেছনের দিকে বসেছিল। গানের শেষে বহুজনই এসে নমিতকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছিলেন।

কিন্তু সে আসেনি।

সরোজা সেদিন একটা সাদা ভয়েলের শাড়ি পরে এসেছিল। ফিকে-বেগনি রঙা ব্লাউজ। খোঁপাতে বেঁধেছিল তার প্রবল ঘনকালো কেশভার। খোঁপাতে ফিকে-বেগনি-রঙা ফুল গুঁজেছিল। কি ফুল ঠিক জানে না নমিত। জ্যাকারান্ডাও হতে পারে।

দুর্বিনয় কিন্তু একেবারে সামনের দিকে বসেছিল। সবাই মেঝের ফরাসের উপরে বসেছিলেন। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবিতে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিল ওকে। আলোর মধ্যে খোলা, তরোয়ালের মতন। ও যখন গান শেষে নমিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, নমিত ওকে একটা চিঠির কপি দিয়েছিল। চিঠির Textটি ছিল একটি Fax Message। চিঠিটি নমিতের অফিসের কলকাতার হেড

অফিস থেকে লেখা। দুর্বিনয়কেই। দুর্বিনয়কে ওদের কোম্পানি শিলচর শহরের চার্চ রোড এবং হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জের যে নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার সোল ইলেট্রিকাল কনট্রাক্টর নিয়োগ করেছে। মাসে তাকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে অন অ্যাকাউন্ট। তারপর কাজ শেষ হলে বিল করবে। শেষ হওয়ার আগেও করতে পারে। সব মেটেরিয়াল কোম্পানিই দেবে। এই ব্যবস্থাতে তার সম্মতি থাকলে সে যেন কাছাড়ের ম্যানেজার নমিত মুখোপাধ্যায়কে পত্রপাঠ জানায়।

নমিত বলল, একটা স্কুটার অথবা মোটর সাইকেল কিনে নাও। তা কেনার জন্যে অ্যাডভান্সও আমি স্যাংশান করে দেব। হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জ তো যখন-তখন সাইকেলে যেতে পারবে না। দেখো, আমাকে বে-ইজ্জত কোবো না। ভাল করে কাজ কবো। আমাদের নির্মীয়মান তিনটি বাড়ির প্রত্যেকটির বাইরেই তোমার নাম লেখা বোর্ড টাঙিয়ে দাও। সোল ইলেকট্রিকাল কনট্রাক্টর হিসেবে। আর একটা ফোন নিয়ে নাও O.Y.T.তে। সেই বোর্ড-এ ফোন নাম্বারও দিয়ে দেবে। দেখবে তখন ওই বোর্ড দেখে কত নতুন কাস্টোমার আসে। লোকজনও নিতে হবে। এমন সব লোক কাজে রাখবে যাদের সময়জ্ঞান আছে। যারা খাটতে ভয় পায় না এবং দায়িত্বজ্ঞান আছে। ব্যবসা অনেক বাড়লেও কোনো আত্মীয়-স্বজনকে নেবে না। যদি কারোকে সাহায্য করতে চাও তবে তাদের অন্যত্র চাকরি করে দিয়ো, যদি পারো। যদি না পারো, তাহলে আর্থিক সাহায্য কোরো মাসে মাসে। ব্যবসাটা ব্যবসাই। সেটা খয়রাতির জায়গা নয়। কারোকে নিতে পারো তেমন মনে করলে কিন্তু কাজের সময়ে কোনোরকম আত্মীয়তা দেখানো চলবে না, কোনোবকম অ্যাডভান্টেজ নেওয়া চলবে না। অন্য দশজন কর্মচারীরই মতন কাজ করতে হবে এবং তার কোনোরকম ক্রুটিবিচ্যুতি হলে যে সঙ্গে সঙ্গে চাকবি যাবে, এ কথাও বলে নেবে।

ঠিক। আমি ইতিমধ্যেই শিক্ষা পেয়েছি খুব আমার এক জ্যাঠতুতো দাদাকে নিয়ে। তাঁকে আর আসতে মানা করে দিয়েছি।

দুর্বিনয় বলল।

বেশ করেছ।

দুর্বিনয়ের চোখ-মুখ ঝলমল করছিল। আনন্দে। কিন্তু কেন? নমিত তো কোনো দযা করেনি ওকে। ও তো ব্যবসা সত্যিই করে। চিঠিব জন্যে তো এত আনন্দ হওয়ার কথা না। বেশ ছটফটও কবছিল দুর্বিনয়। লক্ষ্য করল নমিত।

কী ব্যাপার?

না। আগামীকাল সরোজাদির জন্মদিন। অথচ আগামীকাল শনিবাব। কাল মিলনীর সভা হবে কি না জানি না অবশ্য কিন্তু কাল যেতে মানা করে দিয়েছে বাড়িতে।

কেন?

তা জানি না। আর সরোজাদি নিজে না জানালে তার মনের কথা জানার সাধ্য তো অন্য কারোই নেই।

তাই?

তাই তো। আরও যদি মেশেন তো বুঝবেন।

তুমি এমন ছটফট করছে কেন?

সরোজাদিকে নিয়ে চাইনিজ খেতে যাচ্ছি।

এক গাল হেসে বলল, দুর্বিনয়।

নমিত মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল ওর মুখে। অবিমিশ্র সারল্য আজকাল বড়ো একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এত সহজে এতখানি খুশি হওয়ার ক্ষমতাও বোধহয় কমে আসছে মানুষের। ভাবল ও।

সাইকেলে বসিয়েই তাকে নিয়ে যাবে নাকি?

নমিত ওর কথার রেশ টেনে বলল।

না না। সাইকেল আনিইনি। সাইকেল রিকশাতে যাব।

আর ফেরা?

ওই রিকশাকেই রেখে দেব। যা নেবে, তা নেবে।

থাকবে তো? না কি বলবে, ‘‘ভাল লাগে না।’’

হেসে উঠল দুর্বিনয়।

বলল, না। বলবে না।

ভিড় পাতলা হলে মেঘাদা এসে বললেন, এই যে ব্রাদার। ওই একখান গান গাইলা, কী য্যান? হ্যাঁ। ‘আমারো এমনও যে হবে’—কার গান সেইটা?

নিধুবাবুর।

কত গান লিখছিলেন সেই গুঁফো ভদ্দরলোক! লিখাজোখা নাই দেহি। আস্তাইটার বাণীটা কও তো দেহি।

‘‘আমার এমনো যে হবে, প্রেম যাবে
সে কভু মনে ছিল না, ছিল না।
আমার এ চিত, নিশ্চিত ছিল
এ প্রেম, বিচ্ছেদ হবে না।’’

বাঃ বাঃ। তা তুমি এহনে যাবা কই?

কোথায় আবার? মোল্লার দৌড় মসজিদ। বাড়ি যাব।

চলো, আমার সঙ্গে একখানে।

কোথায়?

চলোই না। শিঁদল শুঁটকি খাওয়াইব অনে।

নমিত যেন ইলেকট্রিক শক খেল। বলল, উরিঃ ফাদার। না মেঘাদা। প্রাণ যাবে নাকি? আমার মাসিমাকে দেখেছিলাম মেসোমশাই-এর অর্ডারে চাঁটগাইয়া এক বন্ধুর অনুরোধে নাকে ওডিকোলোন-মাখানো রুমাল লাগিয়ে শুঁটকি মাছ রাঁধতে। তাঁদের কলকাত্তাইয়া বাড়িঅলা দুদ্দাড় করে উপর থেকে নেমে এসে বলেছিলেন, ‘‘আপনারা বাঙাল জানতুম, রেফ্যুজি জানতুম, কিন্তু আপনারা যে এমন পচা বাঙাল তা তো জানতুম না মহায়।’’

থোও এসব কথা। রেফ্যুজি! ই আমাকেও কইছিল একজনে। তা আমি কয়্যা দিচ্ছিলাম যে আমরা হইলাম নেহরু সাহেবের জামাই। রেফ্যুজি কয়েন না।

তারপর বললেন, ও সব কথা ছাড়ান দাও। কথায়ই আছে যে, যে দ্যাশে যাইবা সে দ্যাশের খাওয়ার খাইবা, সে দ্যাশের মাইয়ারে বিয়া করবা, সেই দেশের ভাষায় কথা কইবা, তবে না ক্যানে! চলো আমার লগে। আজ শিঁদল খাওয়াইমু। পরে একদিন লইট্যা। তারপর দ্যাখবাঅনে এক থালা ভাত শুদাশুদা শুঁটকি দিয়াই খাইতাছ আহা! আহা! কইর‍্যা।

আজ নয়। আজ অমলবাবুর স্ত্রী আমার জন্যে মুগের ডালের ভুনি খিচুড়ি রান্না করবেন।

তা তুমি কি দিবা তাঁরে, তার বদলে? গান? তুমি তো পোলা গান গাইয়াই জগত মাতাইয়া দিতা পারো।

নমিত চুপ করে রইল। আশ্চর্য! অমলবাবুর স্ত্রী, যাঁর ডাক নাম বুড়ি, গান একেবারেই ভালবাসেন না। এমন কোনো মেয়ে ও জীবনে দেখেনি আগে যিনি গান ভালবাসেন না। মেয়েরাই তো সরস্বতীর সবচেয়ে বড়ো বাহিকা, ধারিকা। সত্যি! ভগবান কত বিচিত্র রকমের মানুষই না সৃষ্টি করেন পৃথিবীতে! অথচ গান ভালবাসেন না বলেই যে, মানুষটাকে বাতিল করে দিতে হবে তার কোনো মানে নেই। হাতির পেখম নেই, ময়ূরের কেশর নেই, বাঘের শুঁড় নেই—এসব নিয়ে তো কোনো অনুযোগ চলে না!

নরোজা কেমন আছে? সে যাবে না আপনার সঙ্গে?

আরে না। তারে লইয়া চাইনিজ খাওয়াইতে গেল দুর্বিনয়।

নমিত বলল, চীনারা যদি আবারও ভারত আক্রমণ করে তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আর কোনোই দরকার হবে না।

ক্যান? দবকার অইব না ক্যান?

সারা ভারতের পথেঘাটে ফুটপাথে সেখানে যেখানে "চাইনিজ" নামক খাদ্য রান্না হয়, এবং অবশ্যই বাড়ি-বাড়িতেও, সেই সব "চাইনিজ" তাদের খাইযে দিতে পারলে রিয়্যাল চাইনিজদেব মৃত্যু অনিবার্য।

মরব ক্যামনে? পেটে খারাপ হইয়া?

সরল মেঘাদা প্রশ্ন করলেন।

নমিত হেসে বলল, না, না, পেট খারাপ হয়ে না, নিছক শকেই মারা যাবে। শিয়ার শকে।

হাসতে হাসতে এক খিলি পান মুখে পুরে দিয়ে মেঘাদা বললেন, কইছ ব্যাশ। আমি তো এই জন্যেই চাইনিজ-ফাইনিজ ইক্সপেরিমেন্টের মধ্যে এক্কেরে নাই। তা, তুমি যখন শিঁদল খাইবাই না আমি আউগাইয়া যাই গিয়া। তুমাব পথ তো আলাদা। "তুমার ই পথ আমার পথেব থিক্যা গ্যাছে বাঁইকা, তুমার ই পথ"। কি কও?

নমিত হাসতে হাসতে বলল, ঠিক।

তারপরই জুদা হবার সময়ে বললেন, একখান কথা জিগাইমু?

বলুন।

তুমাব কি সরোজার লগ্যে ঝগডা-টগডা অইছে নাকি? এক্কেরে আসা ছাইড়্যা দিছ যে আমাগো অম্বিকাপট্টিতে?

নমিত গলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর এনে বলল, না, না। আসলে সময় করতে পারি না। তা ছাড়া সরোজা কি ঝগড়া করতে পারে কারো সঙ্গে, আদৌ? আমার তো বিশ্বাসই হয় না।

কও কি তুমি। স্যা তো ইক-নম্বরী ঝগডাটি। আবও বলব, নমিত বলল, আগে ভাব হলে তবপরে তো ঝগডার কথা! ভাবও তো হয়নি এখনও ভাল করে।

তা নাও অইতে পারে। স্যা এক অদ্ভুত মাইয়া। কোন ধাতুতে যে তৈরি জানি না। এক্কেরে ওর মাযেব মতন হইছে। জিদ্দি যে জিদ্দি। বাপরে।

আপনি যদি মেঘাদা সিলেটি, মানে কাছাড়ি ভাষাটা বলতেন আমাব সঙ্গে, তাডাতাডি শিখতে কত সুবিধা হত। আপনি বলেন আপনার ফরিদপুরেব ভাষা।

হ। তা কয়টা শব্দ শিখছ? কাছাডি ভাষার?

ইটা কিতা? একটা।

খুব জোরে হেসে উঠলেন মেঘাদা। বললেন, গুড স্টার্ট। গুড স্টার্ট। আচ্ছা তোমার লগে দেখা হইলে ইবার থিক্যা ওই ভাষাতেই কথা কমু অনে।

রিকশা করে যাচ্ছিল নমিত বাড়ির দিকে। কাল সরোজার জন্মদিন। ঠিক কবল, সকালে হলুদ গোলাপ কিনে নিয়ে যাবে। হলুদ গোলাপ কি পাওয়া যাবে শিলচবে? অধিকাংশ মেয়েই মিষ্টির চেয়ে নোনতা পছন্দ করে বেশি। এখানে কি দইবড়া-টড়া ভাল পাওয়া যায়? জানে না ও। তার চেয়ে, বড়ো কইমাছ যদি পায় তো কইমাছ আর কচি পাঁঠার মাংস নিয়ে যাবে দু কেজি।

কিন্তু মন যে যেতে চায় না। ও যে আর সরোজার যোগ্য নেই। ও যে ভ্রষ্ট হযে গেছে। সরোজা যেন এক মস্ত স্বচ্ছজলের সরসীর একবারে তলের কালো জমিতে পা দিয়ে জলের উপরে মুখ বেব করে ফুটে আছে। ফুটে আছে নিশিদিন কোনো রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে পুঞ্জীভূত মবকতমণির মতন। তাকে স্পর্শ করার মতো হীন নমিত হবে কী করে!

ঈসস। এটা তুমি কী করলে নমিত।

ও নিজেই বলল নিজেকে। মা জানলে কী বলবেন? দাদা বউদি, এমনকী তার কোম্পানির এম ডি সেন সাহেবও? সন্তোষমোহন দেবের ছোটো ভাই ঝুনুবাবু? ছিঃ ছিঃ। এই জন্যেই কি এত পড়াশুনো করল? যে পরিবারে, যে পরিবেশে সে মানুষ, যেমন মেয়েদের সঙ্গে সে কৈশোর থেকে মেলামেশা করেছে তাদের প্রেক্ষিতে এই "বুড়ি!" চল্লিশ ছুঁই ছুঁই নারী। ক্লাস এইট অবধি পড়া। "ডায়মন্ড হাবড়ার" বুড়ি! ছিঃ ছিঃ।

কিন্তু কী করবে ও। ওর মন যে বড়ো নরম। বুড়িরও তো দোষ নেই কোনো। ঘি আর আগুন একসঙ্গে থাকলে হুতাশন তো চডচড় শব্দে বাড়বেই। সে আগুনে, সব সংস্কৃতিই ভেসে যেতে যে পারে এক ক্ষণিক দুর্বলতার মুখে সে কথা নমিতের মতো আর কে জানে! দোতলার বারান্দার দাঁড়ে ঝোলা চন্দনাটির চেয়েও তো সে অসহায়। এই নারী। চন্দনাও হয়তো দাঁত দিয়ে শিকল কেটে কোনোদিন মুক্ত হতে পারে কিন্তু অমলবাবুর স্ত্রী বুড়ি তো কখনওই পারবে না।

নমিতের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে অমলবাবুর ব্যবহার। তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না? ওর মনে হয়, বোঝেন। নমিতকে হয়তো পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবেন উনি সুযোগ-সুবিধা পেলে। আর যদি তাই দেন তবে বুড়ির কি হবে? বুড়ির বয়সও তো সরোজারই সমান হবে। না, সরোজার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়োই হবে হয়তো বুড়ি।

সরোজা মুক্ত। তার ভবিষ্যতের কত কল্পনাই না তার মনে। আর বুড়ির ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই। বলার মতন তেমন কোনো অতীতও নেই, যা নিয়ে, যা রোমন্থন করে, সে অবসরের বেলা সুন্দর করে তুলতে পারে। ছেলেমেয়ে দুজনকেই অমলবাবু গত সপ্তাহে শিলংয়ের রেসিডেনশিয়াল স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। তাহলে এখন বুড়ির কি হবে? ওই চন্দনা পাখিটি ছাড়া তার কথা বলার মতন দ্বিতীয় কেউই তো আর রইল না।

নমিতের কোম্পানি ওকে বম্বেতে বদলি করতে পারে আরও প্রোমোশন দিয়ে। আমস্টার্ডম থেকে ইওরোবোর্ডের যে ডিরেক্টরেরা এসেছিলেন তিন মাস আগে, নমিত কলকাতাতে থাকাকালীন, তাঁরা নাকি সবচেয়ে ইমপ্রেসড নমিতকে দেখে।

ওকে কাছাড়ে পাঠাবার কারণ ছিল এই যে, ওর কোম্পানি এখানে অনেক জমি কিনে ডায়াসকোরিয়ার চাষ করবে। এখানে নতুন কারখানা বসাবে। ডায়াসকোরিয়া থেকে বার্থ-কন্ট্রোল পিল তৈবি হয। বম্বের সিপলা, দিল্লির ডাবুব সকলেই কোলাবরেশানে ইন্টারেস্টেড। কলকাতাব দেজও। এখানে একেবারে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হবে। এশিয়ার বিগেস্ট প্ল্যান্ট বসবে বার্থ-কন্ট্রোল পিল-এব। সে কারণেই তাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন সেন সাহেব। এখন নমিত ফোন আর ফ্যাক্স বসিয়ে নিয়েছে বাড়িতেও। একতলার আবও একটি ঘব নিয়েছে—ইন্টার-কানেক্টেড করে নিয়েছে দরজা ফুটিয়ে। কিন্তু অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও অমলবাবুর বাড়ি ছেড়ে যায়নি। বুড়িরই জন্যে।

ওর সঙ্গে দেখা হলেই অমলবাবু হেসে বলেন, আপনি আছেন তাই ঘুরে ঘুরে কাজ করতে পারি। আপনিই তো আমার লোকাল-গার্জেন। আমার স্ত্রীর জন্যে কোনাই চিন্তা নেই আর আমাব।

বুকের মধ্যেটা ধক করে ওঠে নমিতের কথাটা শুনে।

সপ্তাহে অন্তত তিন সন্ধে বা রাতে যখন অমলবাবু থাকেন না শহরে তখন বুড়ি নমিতের হয়ে যায়। দিনে দিনে এক অদ্ভুত মায়া, এক আচ্ছন্নতা জন্মাচ্ছে নমিতের তার উপরে। ড্রাগের নেশা করে মানুষ যেমন জেনে-শুনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, তেমনই করে সার্বিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও। বুঝতে পারে। কিন্তু বুড়ি যখন আসে সুগন্ধি সাবান মেখে চান করে, পারফ্যুম মেখে, স্তনসন্ধিতে-উরুসন্ধিতে পাউডার লাগিয়ে, তখন কে জানে কী ভর করে নমিতের উপরে। কত বছরের কাম যে যে জমেছিল বুড়ির ভিতরে তা কে জানে।

মাঝে মাঝে ওর ভীষণ ইচ্ছে করে অমলবাবুর রাখন্তি বা রাখনি বা রক্ষিতা বা রাঁঢ়কে একবার দেখতে। সে যদি না থাকত, তবে তো নমিতের জীবন এমন ভাব বিপর্যস্ত হত না।

ওর শিশুকালে ছাদের কার্নিশে বসে থরথর করে কাঁপতে থাকা বেড়ালের তাড়া-খাওয়া একটা

সাদা পায়রাকে ধরে ফেলেছিল। তারপরে তাকে খুব করে দানা-মটর খাইয়ে, জল খাইয়ে তার নিজের ঘরে পাখার তলাতে একটি ঝুড়িচাপা দিয়ে রাতে পরম যত্নে রেখেছিল। নটবরদা বারে বারে সাবধান করে বলেছিল, অমন করে ঝুড়ি-চাপা দিয়ে না রাখলে রাতে বেড়াল স্কাইলাইটের বা দরজার পাখির ফাঁক দিয়ে এসে ঠিক পায়রাটাকে খেয়ে নেবে। আট বছরের শিশু নমিত আঁতকে উঠেছিল সে কথা শুনে। নটবরদাই সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেছিল নমিত। কিন্তু সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই সাদা মার্বলের মেঝেতে ছোপ-ছোপ লাল রক্ত আর মেঝেময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাদা রক্তমাখা পালক দেখে ভয়ে আর অপরাধবোধে চিৎকার করে উঠেছিল সে। ওর কাছে যে-দুর্বল আশ্রয় চেয়েছিল তাকে নমিত রক্ষা করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। সারাটা জীবন নমিতকে সেই অপরাধবোধ কুরে কুরে খেয়েছে। আজ তার মধ্য-যৌবনে অমলবাবুর স্ত্রী বুড়ি ঠিক সেই সাদা পায়রাটার মতনই তার কাছে বাঁচার আবেদন নিয়ে এসেছে। কী করবে নমিত?

নমিত কি করবে?

খুবই সকালে অফিসে পৌঁছেছিল সেদিন।

অনেক ভেবে ও নিজে অম্বিকাপট্টিতে মেঘাদার বাড়িতে সরোজার জন্মদিনে যাবে না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওদের অফিসের নাইট-দারোয়ান ও বেয়ারার কাছে সব খোঁজখবর নিয়ে হলুদ গোলাপ, ভাল রসগোল্লা, মাংস ও কই মাছের জোগাড় করে বেয়ারাকে দিয়েই সাইকেল রিকশা করে পাঠাবার বন্দোবস্ত করল যাতে সাড়ে-দশটা পৌনে-এগারোটার মধ্যে পৌঁছে যায়। যতক্ষণে ওই সব কিনে আনছিল ওরা ততক্ষণে একটা চিঠিও লিখে ফেলল সরোজাকে।

মেঘাদার বাড়ি যে ফোন নেই তা একদিক দিয়ে ভালই। ভাবছিল ও। এই ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল মানুষের মনের গভীরতা, চিন্তাশক্তি সব নষ্ট করে দিচ্ছে। একটা চিঠির মাধ্যমে একজন মানুষ যেমন করে নিজেকে পদ্মফুলের পাপড়ির মতন খুলতে মেলতে পারে, ত' কি ফ্যাক্স মেসেজে বা ফোনে পারে? না, পারা কখনও সম্ভব? মানুষের হৃদয়বৃত্তি, অন্তর্মুখিতা সব কিছুই নষ্ট করে দিচ্ছে এই সব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন। টাকা, আরও টাকা, আরও ব্যবসা পৃথিবীময়, এই সবের জন্যে হয়তো এইসব উপকারী হতে পারে কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক যেখানে, সেখানে এই সব উদ্ভাবন মানুষকে ভোঁতা, matter of fact, mundane, স্থূল করে দিচ্ছে দিনকে দিন। মানুষ সময় নিয়ে বসে একটা চিঠি লিখতেই পারে না, তার মনঃসংযোগ আসবে কি করে? সে সাহিত্য বা কবিতা পড়বে কি করে? আর এই সব করে যে-সময়টা মানুষ বাঁচাচ্ছে তা আরও টাকা রোজগার ছাড়া আর কোন কাজে সে লাগাচ্ছে? যে ছেলে আমেরিকাতে আছে, সে বাবার মৃত্যুর খবর সঙ্গে সঙ্গে পাচ্ছে বটে কিন্তু দাহ করতে আদৌ আসছে কি? আসতে হয়তো দশ ঘণ্টা লাগত মোট জেট-প্লেনের কল্যাণে। কিন্তু সে বলছে, "হোয়াটস দ্যা পয়েন্ট ইন ওয়েস্টিং আ হেল অফ আ লট অফ মানি টু সী আ ডেড পার্সন"?

তবে? এই সময়, এই টাকা, মানুষের কোন প্রকৃত হিতে লাগছে! মানুষ যদি হৃদয়হীন অমানুষই হয়ে যায় তবে তার হাতে কত সময় থাকল, কত বৈজ্ঞানিক আর বৈদ্যুতিক গ্যাজেটস তার নিয়ন্ত্রণে থাকল, তাতে কিই বা এসে যায়?

মানুষের সমাজ যুগ-যুগান্ত ধরে যা কিছু সূক্ষ্ম মানবিক বৃত্তি অথবা প্রবৃত্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিল, এই বিশ্বব্যাপী টাকা, আরও টাকা রোজগারের অন্ধ আঁধি তার সব কিছুই ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিতে বসেছে। অথচ এর বিরুদ্ধে একজন মানুষকেও সোচ্চার হতে দেখে না। ওর মনে হয় যে, একটা দিন শিগগির আসবে যখন মানুষ এই বিজ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করে তার অভাবের শান্তির মননের দিনে ফিরে যাবে! সেদিন হয়তো নমিত মুখোপাধ্যায়েরা বেঁচে থাকবে না কিন্তু দেশে দেশে সরোজার মতন মেয়ে, দুর্বিনয়ের মতন ছেলেরা বেঁচে থাকবে, প্রেম আবারও ফুটে উঠবে মানুষ-মানুষীর মনে, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাও আবারও মানবিক বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃত হবে, নিছকই কম্পিউটারের 'Data' হিসাবে 'Stored' হবে না। এই সব আপাত-চালাক মানুষ, যারা কম্পিউটার আর সুপার-কম্পিউটার নিয়ে লম্ফঝম্ফ করে তারা সম্ভবত জানে না যে, কম্পিউটারে যদি 'Garbage feed' করা যায় তবে ফল হিসেবে 'Garbage'ই বেরোবে। স্মৃতিশক্তি বা আঁক কষার ক্ষমতা মারাত্মক ভার হওয়াটাই মানুষের পরমতম উৎকর্ষতা নয়, স্মৃতিতে কী সে ধরে রাখছে, আঁক কষে সে ডুবন্ত সাবমেরিন থেকে মিসাইল ছুড়ছে, অথবা অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট থেকে কামানের গোলা, না প্রেম বা প্রীতি বা সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে অন্যর প্রতি, সেটাই বড়ো কথা। আধুনিক মানুষের এই সার্বিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মধ্যেই যে তার মৃত্যুবীজই আক্ষরিক এবং তাত্ত্বিক অর্থে নিহিত আছে তা যেদিন এই বিজ্ঞানের মদমত্ত অন্ধ মানুষ বুঝবে, সেদিন অনেকই দেরি হয়ে যাবে।

নমিত লিখল,

সরোজা, না, অয়েষা,

কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে "তুমি" বলেই সম্বোধন করছি। আমি আমার অনুজ ও অনুজাদের মধ্যে 'আপনি' বলে শুধু তাদেরই সম্বোধন করি, যাদের আমি পছন্দ করি না। যারা আমার হৃদয়ের কাছের, তাদের 'তুমি' বলতে পেরে তাদের আরও কাছের বলে ভাবাটা সহজতর হয়।

আজ তোমার জন্মদিন। লোকমুখে জানলাম। লোকমুখে জানলাম বলেই নিজে যেতে সংকোচ হল। তুমিও হয়তো চাও না যে আমি তোমার কাছের মানুষ হই। তোমার কাছে, তোমার পায়ে পায়ে বাধ্য মৃগশিশুর মতন যে মানুষটি আছে, যার নামের সঙ্গে তার স্বভাবের কোনোই সাযুজ্য নেই, সে বড়োই ছেলেমানুষ। কিন্তু সে বড়ো ভালও।

সংসারে ভালত্বর, সারল্যর, সততার কোনোই বিকল্প নেই। যে যাই বলুক এই বিশ্বাসই মানুষের শেষতম মহৎ বিশ্বাস বলে গণ্য হবে, যতদিন সভ্যতা থাকবে। তবে একথাও ঠিক সরোজা যে, ভালত্বর সংজ্ঞা নিয়ে তর্ক আছে, থাকবেও চিরদিন। তর্ক থাকা ভাল। যে-মানুষেরা তর্ক করে না, পরের সঙ্গে তো বটেই, নিজের সঙ্গেও, সে মানুষদের মনুষ্যত্বে অচিরেই মরচে পড়ে যায়।

তুমি আমার জীবনে এক পরম প্রাপ্তি। তাই নিত্য ব্যবহারে তাকে মলিন করতে চাই না আমি। কখনও কোনো বৈশাখের ভোরে, যখন মিষ্টি হাওয়া বইবে, বকুল ঝরবে তোমাদের বরাক উপত্যকাব এই শিলচব শহরের পথের পাশে পাশে, কোকিল ডাকবে পাগলের মতন, তখন তোমাকে মনে করে আমাব বুকের মধ্যেটা উহু-উহু করে উঠবে। ঘোর শ্রাবণের ঘন বরষায়, অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টির পরে যখন রোদ উঠবে, যখন চাপ-চাপ ঘন-সবুজ মুথাঘাসে-ভরা মাঠে-মাঠে হলুদ ফড়িং উড়বে উদ্বেল উৎসারে, যখন বাতাবি ফুলের গন্ধ ভাসবে বৃষ্টিশেষের হাওয়াতে তখন তোমাকে বারেবারই মনে পড়বে আমার। তুমি আমার বসন্ত। তাই আমার জীবনে তুমি চিরদিন থাকার নও। তাছাড়া সব রকম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ততেই আমার তীব্র অনীহা। আসবে ক্ষণকালের জন্য তুমি, ফিবে ফিরে আসবে। আবার ফিরে যাবে। প্রতিবার আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃত নবীকৃত হবে তুমি। "Familiarity breeds contempt" তাই তোমাকে familiar করব না আমি। তুমি থাকবে আমার কল্পনাতে।

সুন্দরতম ফুল অথবা নারীকে কল্পনাতেই রাখতে হয়। দূরের দুর্গম নিভৃত বনপথেই তারা প্রকৃত সৌন্দর্যের ধারক হয়। ঘরে অথবা ফুলদানিতে সব নারী, সব ফুল আঁটে না। আঁটাতে গেলে, তাদের প্রতি অন্যায় করতে হয়ই। যারা তাদের সৌন্দর্যে ও গন্ধে মুগ্ধ এবং মোহিত হয়, তাদের প্রতিও অন্যায় করা হয়। জানি না, যা বলতে চাইলাম, তা বুঝিয়ে বলতে পারলাম কিনা! না-বোঝাতে পেরে থাকলে নিজগুণে বুঝে নিয়ো।

তুমি সেদিন বলেছিলে যে, তোমরা চিরদিনই উত্তীয়দের বিসর্জন দিয়ে বজ্রসেনদের পায়ে সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হয়েছ। আমার একটিই প্রার্থনা তোমার কাছে। For a change, উত্তীয়কে একবার জিতিয়ে দাও না। লক্ষ্মীটি।

তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার এই আটত্রিশ বছরের জীবনে শুদ্ধ প্রেম কাকে বলে তা আমি জেনেছি। প্রকৃত প্রেম চিরদিনই অধরা। তা ঘরের মধ্যে কোনোদিনই আঁটেনি। তুমি লক্ষ লক্ষ বিবাহিত দম্পতিকে নির্জনে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, প্রেম তাঁদের জীবনে আছে কি না? তাঁরা অন্য কথা বললেও বুঝে দেখবে, তুমি বুঝতে চাইলে বুঝবে যে, প্রেম নেই। যা আছে, তা প্রেম নয়। প্রেম নেই। যা আছে, তা অভ্যেস, তা পুতুল-খেলা। প্রেম প্রজাপতির মতন, বসন্তেরই মতন ক্ষণস্থায়ী। গুটি থেকে বেরুনোর পরে তারা বেশিদিন বাঁচে না। দৈনন্দিনতা এবং নৈকট্যই প্রেমের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। তাতে প্রেম এমন নিশ্চিত ভাবেই মরে যে, তাকে বাঁচায় এমন স্টেরয়েড বা অ্যান্টিবায়োটিক পৃথিবীতে নেই। ওষুধ কোম্পানিব সেলসও ম্যানেজার হয়ে একথা আমি কবুল করছি।

বরাক উপত্যকায় হঠাৎ পাওয়া আমার জলজ সরোজাকে আমি চিরদিন মহার্ঘ্য আতরের গন্ধের মতনই তুলোর মধ্যে করে আমার মনের গোপন স্থানে রাখা বহুমূল্য বেলজিয়ান কাটগ্লাসের আতবদানিতে সারা জীবনই রাখতে চাই। তোমাকে সুখী দেখে, সুখী হতে চাই। তোমার ভাল কবতে পেরে খুশি হতে চাই। আমি তোমাকে "তুমি যে তুমিই শুধু" সেই কারণেই ভালবেসেছি। চিবদিনই, ভালবাসব। আমাব সমস্ত হৃদয়ের পাটরানি হয়ে থাকবে তুমি চিরদিন। সে জন্যে আমাব খাটবানি-হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই।

ভাগ্যিস সকলে বোঝে না। আমি বলছি যে, দুর্বিনয় বড়ো ভাল ছেলে। তোমার চেয়ে বযসে সে ছোটো হতে পারে কিন্তু তোমার যোগ্যতম সে। সে শরীর-মনের সব ভালবাসাতে তোমাকে আপ্লুত করে দেবে। তাকে তোমার গ্রহণ করতে হবেই কাবণ তাকে যদি তুমি 'না' বল সেই অভিঘাত সে সহ্য কবতে পারবে না। হয়তো আত্মহত্যাই করে বসবে। নিষ্পাপ হৃদয়ের পবিত্র ভালবাসা, একচক্ষু হরিণেরই মতো যা একাগ্র, তার কোনোই বিকল্প নেই সবোজা। এমন ভালবাসা যাবা জীবনে ফিরিয়ে দেয় তাদের আজীবন হাহাকারে কাটে। আমি কম জানি। কিন্তু যতটুকু জানি, তাতে কোনো ফাঁকি নেই।

কালকে আমার গান শুনতে গিয়ে তুমি আমাব সঙ্গে দেখা না করে ভালই করেছ। কাছে না এলেও আমি জানি দূব থেকে ভ্রুকুঞ্চন করে পরম বিবক্তির সঙ্গে তুমি আমার গান শুনে, আলোকিত আসনে আমাকে অনুক্ষণ দেখতে দেখতে রোমাঞ্চিত হয়েছ। যখন সকলে গান শেষে বলেছে আহা। আহা। তখন তোমার বুক শ্লাঘাতে ভরে গেছে। কাবণ, তুমি জেনেছো, যে-মানুষটি এত নারী-পুরুষের ভালবাসা পেল, তুমি পেয়েছ তারই উজাড়-করা ভালবাসা।

কি? ঠিক বলিনি আমি।

অনেক শিশু আছে, যারা দীর্ঘক্ষণ বায়না করে, ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদে, একটা গ্যাস বেলুন, বা একটি পুতুল বা একটি চকোলেটের জন্যে। যে-মুহূর্তে তারা তা হাতে পায়, তার পরমুহূর্তেই কিন্তু তা মাটিতে ফেলে দেয়। না, তারা মূর্খ বলে নয়, তারা যোগী বলে। চাওয়াটা অবশ্যই একটা সাধনা। কিন্তু পাওয়াটা নয়। শিশুদের কাছ থেকে আমার-তোমার মতন বড়োদের অনেক কিছুই শেখার আছে সরোজা।

তোমাকে আরও বড়ো চিঠি লিখতে হলে আমার চাকরি যাবে। কোম্পানি তো আমাকে চিঠি লেখার জন্যে মাইনে দেয় না। তাছাড়া, আমি বিশ্বাস করি, একজন পুরুষের জীবনে তার কাজই সবচেয়ে বড়ো। খুব কম পুরুষই জানে যে, মেয়েরা কর্মী-পুরুষকে যতখানি ভালবাসে, অন্য কোনো পুরুষকেই ততখানি ভালবাসে না। পুরুষকারের অনেক রকম আছে। তার মধ্যে মস্ত একটা বড়ো রকম হচ্ছে To excell in whatever he does। তেমন পুরুষদেরই মেয়েরা মনে মনে চিরদিন বরমাল্য দিয়েছে, জীবনে দিতে পারুক, আর নাই পারুক। কাজই আমার সবচেয়ে বড়ো প্রেম সরোজা। তোমার চেয়েও আমি আমার কাজকে ভালবাসি। আশা করি, তুমি বুঝবে। এবং বুঝে, ক্ষমা করবে।

কাল চাইনিজ কেমন খেলে?

সত্যি কথা বলতে কি দুর্বিনয়কে আমি তোমার চেয়েও বেশি ভালবেসে ফেলেছি। ও যেন একটি শিমুল গাছ। ঋজু। সটান। দুদিকে সমান্তরালে ছড়ানো তার হাত। তার মধ্যে কোনো বক্রতা, কোনো খলতা নেই, তার হৃদয়ের রঙ বসন্তের শিমুলেরই মতো। প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে, বনহরিণী যেমন ভালবেসে শিমুলের ফুল খায়, তুমিও তেমনি করেই পরম আহ্লাদে পরিপ্লুত হয়ো দুর্বিনয়ের রাঙা হৃদয় নিয়ে।

সন্ধেবেলায় "মিলনীর" সকলকে মাংস খাইয়ো। আর রসগোল্লাটা তোমার জন্যে রেখো। মেঘাদার কাছে জেনেছি, তোমার রসগোল্লা প্রীতির কথা।

একদিন তোমার হাতে শিঁদল শুঁটকি খাব। খেয়ে গন্ধে মরে গেলেও খাব। তুমি নাকি দারুণ রাঁধো। সেদিন দুর্বিনয়কেও ডেকো।

একটা কথা বলি। দুর্বিনয় জীবনে খুব উন্নতি করবে। একদিন ওর ব্যবসা মস্ত বড়ো হবে। অধিকাংশ পুরুষের সাফল্যের মধ্যেই তার ব্যর্থতার, তার সর্বনাশের বীজ সুপ্ত থাকে। দুর্বিনয় যখন অত্যন্ত সফল হবে জাগতিক অর্থে, সেদিন ওকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব শুধুমাত্র তুমিই নিতে পারো।

তোমার এই জন্মদিন অগণ্য অনাগত জন্মদিনকে স্বাগত জানাবে এই প্রার্থনা করি।

ভাল থেকো।

আমার উপরে রাগ না করে, আমাকে ক্ষমা করো।

—ইতি তোমার শুভার্থী, নমিত

চিঠিটা বড়ো তাড়াতাড়িতে লিখল। হয়তো অনেক আপাত-বিরোধিতা এবং পুনরাবৃত্তি রয়ে গেল। গেলে গেল। চিঠিও হচ্ছে চুমুরই মতো। নাকের আড়াল সরিয়ে, চুলের আড়াল সরিয়ে যে সব সাবধানি, কপিবুক অথবা পারফেক্ট চুমু খেতে চায়, তাদের চুমুতে ভালবাসা থাকে না, অঙ্ক থাকে।

অঙ্ক ভালবাসে না নমিত।

চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিল তার লোককে। জগদানন্দ। সে স্থানীয় মানুষ। শর্টকার্ট রাস্তাও চেনে। বলল, খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। রিকশা বাইরে দাঁড়িয়েই ছিল।

মিস্টার পুরকাইতের সঙ্গে ডায়াসকোরিয়ার প্ল্যান্টেশনের ডিটেইলস নিয়ে একটা মিটিং ছিল। প্রোজেক্ট রিপোর্ট-এর কপি পাঠিয়েছেন গুহ চক্রবর্তী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস, ওদের কোম্পানিব অডিটর এবং ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টস। ওর কমেন্টস পাঠাতে হবে কলকাতাতে, সাহেবকে। মিস্টার পুরকাইত রিটায়ার্ড ডেপুটি ডিরেক্টর অফ অ্যাগ্রিকালচার। কাছাড় থেকেই অবসব নিয়েছেন। বাড়িও লালাতেই। ওঁকে নমিতদের কোম্পানি প্ল্যানটেশানটা সেট-আপ করার জন্যে রিটেইন করেছে।

মিটিং শেষ হয়ে গেল। উনি প্ল্যানটেশানের সাইটে যাবেন। হাইলাকান্দির পথে একটি চা বাগানের পাশেই অনেক জমি পেয়েছে ওরা।

মিস্টার পুরকাইত চলে গেলেন।

নমিত বসে বসে সেদিনের ডাক দেখছিল। হংকং থেকে একটা ফিনান্সিয়াল কাগজ আসে। কলকাতা হয়ে আসতে আসতে তিন চার দিন লেগে যায়। তবু, সেন সাহেব ইনসিস্ট করেন যে, ওইটি পড়তেই হবে। উনি বলেন, পৃথিবীটা যে গ্যাসবেলুনের মতনই কোথায় উড়ে চলেছে, ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিজ, লেবার আর র ম্যাটেরিয়ালের অ্যাভেইলিবিলিটি ইত্যাদি সম্বন্ধে সব জানা যাবে পড়লে। তবে পড়তে হবে Between the lines. ব্যবসাটা কেমন মসৃণ ভাবে চালানো হচ্ছে তার চেয়েও অনেক বড়ো চিন্তা একজন আন্ত্রাপ্রেনোরের, পরের কারখানাটি পৃথিবীর কোন প্রান্তে খুলতে পারবেন বা পারা উচিত তাই নিয়ে। Lack of expansion means decay. যে-কোম্পানির টার্ন-ওভার প্রতি বছর না বাড়ে, যে খবরের-কাগজের সার্কুলেশান প্রতি বছর জেনুইনলি না বাড়ে, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরা আরম্ভ হয়ে যায়। মাটি যখন সরা শুরু হয়, তখন বোঝা যায় না। যখন পাড় ভেঙে জলে পড়ে তখনই কালের করাল নদীর দংশন টের পায় মানুষে। কিন্তু বড়োই দেরি হয়ে যায় তখন।

এ সব সেনসাহেবের মতামত। নমিতের সত্য সম্বন্ধে এখনও কিছু জানে না। সত্যিই ওর বড়ো সাহেব সেনসাহেব ডায়নামিক মানুষ। প্রচণ্ড সফল। কিন্তু কবিতা লেখা আর কবিতা পড়া ভীষণই অপছন্দ করেন। রবীন্দ্রনাথের "পূর্ণ মানুষ"-এর সংজ্ঞাকে তবু ছুড়ে ফেলতে পারে না নমিত। অবশ্য "পূর্ণ মানুষ" কজনই বা হতে পারেন। অধিকাংশই তো বনমানুষ, শিম্পাঞ্জি, হনুমান, নয়তো হাফ অথবা কোয়ার্টার-বয়েলড মানুষ!

এমন সময়ে জগদানন্দ ফিরে এল, হাতে প্লাস্টিকের একটি বড়ো কৌটো নিয়ে। সঙ্গে একটি চিঠি।

ঠিক আছে। থ্যাংক ড্যু। তুমি যাও।

বলল নমিত।

তারপর চিঠিটা খুলল। সরোজাই লিখেছে।

দুর্বোধ্য নমিতবাবু,

এই সম্বোধনের জন্য মার্জনা করবেন। সম্বোধনে কি লিখব ভেবে পেলাম না। আপনি প্রিয়জন তো ননই কিন্তু শত্রু কিনা সে কথাও বুঝে উঠতে পারলাম ন। তবে দুর্বোধ্য অবশ্যই।

আপনি খুব মহান এবং উদার ব্যক্তি, সন্দেহ নেই। দয়ালুও। আপনার অফিসের পাড়াতে শীতলাদেবীর একটি মন্দির আছে। অনেক ভিখারিনি সেখানে বসে থাকে। আপনার ভিক্ষা তারা পেলে কৃতার্থ হবে। দৈনিক তাদের একবার দেখা দিলেই তো পারেন। বে-পাড়াতে দানধ্যান কেন? বে-পাড়াতে প্রেম করাও যেমন বিপজ্জনক, দানধ্যান করাও যে, এ কথাটি কি আপনি জানেন না?

আমার জন্মদিনের কথা কেউই জানে না। দুর্বিনয় একটি বালখিল্য তাই আপনাকে বলেছিল। শুনেছি, আপনি যে-বাড়িতে থাকেন সেই বাড়িতে একটি চন্দনাপাখি আছে। সে নাকি মাঝে মাঝেই বলে ওঠে "কটা বাজেরে? ও বউ, কটা বাজে?" সেই পাখিকে দয়া করে আমার হয়ে বলে দেবেন যে "বারোটা বাজে।" এবং দুর্বিনয়কে যদি আপনার এতই পছন্দ তবে আপনি সেই চন্দনার সঙ্গেই দুর্বিনয়ের বিয়ে দিন।

শিলচর শহরের সবদিকে এখন হাতির খুবই উপদ্রব বেড়েছে। বিশেষ করে সন্ধের পর। দশ-বারোজন মারাও গেছেন। গাড়িতেও সন্ধের পরে কোথাওই যাতায়াত করবেন না শহরের বাইবে। যে সব খবর আপনাদের কলকাতা থেকে আসা নামী-দামি ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজে পাবেন না তা শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জের প্রতি পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানেই পাবেন। খবর শুধুমাত্র খবরের কাগজেই থাকে না।

কলকাতার মানুষেরা তো বরাক উপত্যকাতে যে প্রায় চোদ্দো লক্ষ বাঙালি বাস করেন সে খবরই রাখেন না। খবরের কাগজেরা যেখানে থেকে বিজ্ঞাপন পান না সেখানের খবর ছাপতে

সম্ভবত গা করেন না কোনো। আমাদেব এই "তৃতীয় ভুবনের" মানুষেরা তবুও আপনাদের কোনোরকম দয়া ব্যতিরেকেই বেঁচে এসেছি, বেঁচে থাকব। কলকাতার মানুষেরা কি জানেন যে, আমাদের এখানে ভাষা আন্দোলনে তেরো জন শহিদ হয়েছিলেন একষট্টিতে? বাংলাদেশে তো দুজন শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের শহিদ দিবস নিয়ে কাগজেরা কত চোখের জলই না ফেলেন! ফেলবেনই তো! বাংলাদেশে খবরের কাগজ, নানা মাসিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক বিক্রি করতে হবে তো! বাংলাদেশ তো বাংলা প্রিন্ট-মিডিয়ার সবচেয়ে বড়ো বাজার। আমাদের কথা মনে রেখে কোন লাভ হবে কলকাতার কাগজওয়ালাদের?

আজ রাতে জেঠু বাড়িতে থাকবেন না। দুর্বিনয়কেও বলব না আসতে। আপনি একাই আসবেন। আমার এখানে খাবেন। কইমাছ। তেল-কই। সরষের তেল, ধনেপাতা, কাঁচালংকা, কালোজিরে দিয়ে রাঁধব আপনার জন্যে। আর দই-মাংস। সকালে পিমা পায়েস করেছে। তাও থাকবে। আপনার পাঠানো রসগোল্লা তো আছেই ফ্রিজ ভর্তি। জন্মদিন আমি কখনওই পালন করি না। আমার মা-বাবা আমার জন্মদিনেই মারা গেছিলেন দুর্ঘটনাতে। দুর্বিনয়ের নির্বুদ্ধিতা তো বুঝতে পারছেন এখন!

শিঁদল শুঁটকি আমি রাঁধিও না, খাইও না। তবে খেতে চাইলে রাঁধিয়ে আনাতে পারি। আমার মা তো কলকাতার ঘটির মেয়ে ছিলেন। এ সব পৈশাচিক ঝাল-তেলের রান্নাব সঙ্গে আমার ঝগড়া।

যদি কোনো দুর্বোধ্য কারণে না-আসতে পারেন তবে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আমি পাশের বাড়ির ছবি বউদির সঙ্গে ভিডিয়ো ফিল্ম দেখতে যাব পলাশদের বাড়ি। অস্ট্রেলিয়ান ডিরেক্টর পল কক্স-এর একটি ছবি "দ্যা আইল্যান্ড" জোগাড় করেছে ও। তাতে নাকি ঋতু গুহর গাওয়া একটি গান "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই/বারে বারে কেন পাই না" থিম মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আপনিও দেখতে পারেন। যদি ছবি দেখেন তাহলে পাঁচটা নাগাদ আসবেন। ছবি দেখার পরে আমরা বাড়ি ফিরে আসব। আর জন্য কেউই থাকবে না। মশা-মাছিও নয়। আপনার ছায়াও জানবে না কথা দিলাম।

ইতি/স

পুনশ্চ · ছবি দেখতে একা গেলেও আমি সাড়ে-সাতটাব মধ্যেই ফিরে আসব। আজ যদি না আসেন, তাহলে আপনার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সিরিযাসলি বলছি কিন্তু। অবশ্য আপনার সঙ্গে আদৌ কোনো সম্পর্ক কি হয়েছে?

আপনার গানের রেশে এখনও মন-প্রাণ ভরে আছে। আপনাকে "বিপজ্জনক" বললেই সব বলা হয় না। আপনি ঘাতক। আপনার জেল হওযা উচিত। এমনি জেল নয়, যাবজ্জীবন অন্তর্লীন।
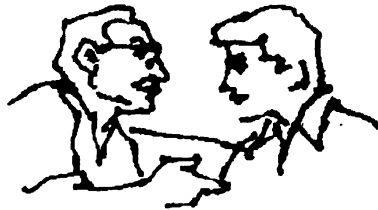
গতরাতে ঘুমোবার আগে একটি চমৎকার লেখা পড়েছিল নমিত। "স্মরণিকা"তে ববাক উপত্যকাব জনবিন্যাস সম্বন্ধে। সঞ্জীব দেব নস্করের লেখা। কত কিছু জানা গেল।

নমিত যদি লেখক হত, তাহলে কী ভালই না হত। এই সুন্দর বরাক উপত্যকা নিয়ে, জাটিঙ্গা উপত্যকা নিয়ে, কুশিয়ারার "বেডার" (মাঝেদি এক বেড়ার) পটভূমিতে সুন্দর একটি উপন্যাস লিখত।

তবে সে রকম একটি উপন্যাস লিখতে হলে বারবার তাকে আসতে হত এখানে, এই অঞ্চলের প্রকৃতি, মানুষ, গান, সাহিত্য, সংস্কৃতি এসব নিয়ে পড়াশুনো করতে হত পাঠাগারে। Unless one has a ''feel'' of the place সেই অঞ্চল নিয়ে লেখা অত সোজা নয়। সাহেব আই. সি. এস.-দের লেখা গেজেটিয়ারগুলোও অবশ্যই পড়তে হত।

সাহেবরা নাকি এদেশ শোষণ করতেই এসেছিল। ভাল কিছুই করেনি। নমিতের তো মনে হয়, সেই শোষণকারীদের এই দেশের প্রকৃতি, ফুল, প্রজাপতি, রীতিনীতি, রূপকথা, বন্যপ্রাণী, লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, স্থাপত্য, ইতিহাস ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যেমন আগ্রহ ছিল, তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না অধুনা আই. এ. এস.-দের মধ্যে।

পঞ্চাশ বছর দেশ স্বাধীন হল কিন্তু এই দেশকে নিয়ে কী করল রাজনীতিক আর দেশবাসীরা।

শিক্ষা আর অনুসন্ধিৎসা সমার্থক। যে যত বেশি শিক্ষিত, প্রকৃতার্থে, তার অনুসন্ধিৎসা তত বেশি এমনই দেখা যায়। এখন আর সেই সব dedicated আমলা দেখা যায় না। অবশ্য dedication কোথায়ই বা আর আছে? গত পঞ্চাশ বছরে জল-না-পাওয়া তৃণ ও উদ্ভিদের মতন সবই প্রায় শুকিয়ে গেছে। নমিত জানে না কোন জাদুকর এখন এই মৃতপ্রায় বৃত্তিকে পুনরুজ্জীবিত কবতে পাববেন।

এসব কথা যত কম ভাবা যায়, ততই নিজের শরীর-মনের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু কারো তো ভাবতে হবেই। একজনও যদি না ভাবে, না কিছু করে, তবে এই দেশের কি হবে? এই হতভাগ্য দেশটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার বা লালুপ্রসাদ যাদব বা জ্যোতিবাবুর যতখানি, তার চেয়ে একটুও কম তো নমিতের নয়! একটুও কম নয়! এই দেশ তো সতিনের ছেলে নয়, যে, চোখের সামনে উচ্ছন্নে গেলে, মনে আহ্লাদ হবে। কিন্তু এমন আত্মবিস্মৃত, নিজ-নিজ সুখপরায়ণ, শুধুমাত্র নিজ নিজ পকেট ভারী করার আকাঙ্ক্ষাতে আকাঙ্ক্ষিত জাত পৃথিবীতে আর আছে কি? জানে না নমিত। এ নিয়ে, না ভাবাই ভাল রাতে তাহলে ঘুমোতেই পারত না।

ওই স্মরণিকাতেই ইমামউদ্দিন বুলবুল-এর ''ভাষা সংগ্রামেব চেতনা . আমাদেব উত্তরাধিকার'' এই নামের প্রবন্ধতে স্থানীয় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর একটি সুন্দর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন উনি

''যে কেড়েছে বাস্তুভিটে
সেই কেড়েছে ভয়,
আকাশ জুড়ে লেখা আমার
আত্মপরিচয়।
হিংসা জয়ী যুদ্ধে যাব
আর হবে না ভুল
মেখলা পরা বোন দিয়েছে
একখানা তাম্বুল
এবার আমি পাঠ নিয়েছি
আর কিছুতে নয়,
ভাষাহীন ভালবাসার
বিশ্ববিদ্যালয়।''

কিন্তু শেষ দুটি পংক্তি নমিতের ঠিক বোধগম্য হলো না। যদি আমাদের মাতৃভাষার অবদমনের অপচেষ্টাই এখানে নানাভাবে করা হয়ে থাকে তাহলে ''ভাষাবিহীন ভালবাসা'' শব্দটিতে নমিতের আপত্তি থাকবে। ভালবাসতে হবে অবশ্যই মাতৃভাষাতেই। তাতে লজ্জা কি? কার সাধ্য আছে নমিতদের মাতৃভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে? এই বাবদে বাংলাদেশের ভাইবোনেদের কাছ থেকে এবং বরাক উপত্যকার শহিদদের কাছ থেকেও প্রত্যেক বাংলা ভাষাভাষীকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে।

আরেকটি প্রবন্ধ পড়ল দিলীপকুমার দের লেখা "বরাকে বাংলা মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ভবিষ্যৎ"। পড়ে, মন খারাপ হয়ে গেল। গভীর চিন্তা জাগল ওর মনে।

এরকম সাহসী লেখা আজকাল দেখা যায় না বড়ো, এই ভীরুদের দেশে। "ভীরুদের দেশ" বলতে বরাক উপত্যকাকে বোঝাচ্ছে না নমিত, বোঝাচ্ছে মূল বাংলা ভাষাভাষী ভূখণ্ডকে। সুযোগসন্ধানী, ঘুমন্ত পশ্চিমবঙ্গকে।

বাংলা ভাষাকে তো অন্য একাধিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও গলা টিপে মারার অপচেষ্টা নিত্যদিন হচ্ছেই কিন্তু দিলীপবাবুর মতন, যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে সোজা কথাটা এমন স্পষ্ট করে বলতে পারার সাহস ইদানীংকার কম বাঙালিরই আছে বলে মনে হয় নমিতের। "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে" এই উক্তিতে নমিতের চিরদিনই বিশ্বাস ছিল।

ব্যক্তিগত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মধ্যেই সীমিত ছিল। অমলবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তার যে এই অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা যদি সত্যিই গর্হিত অপরাধ হয়, তবে তার শাস্তি নমিতকে পেতেই হবে। কিন্তু দেশ ও জাতি এবং মাতৃভাষার প্রসঙ্গে ওই সব তুচ্ছ ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায়ের কোনোই ভূমিকা নেই। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বরাক উপত্যকার মানুষ যেমন সোচ্চার হয়েছেন, সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে এখানে কাজ করতে-আসা কিন্তু বাঙালি নমিত যতটুকু সোচ্চার হবে, তাতে সরোজা, দুর্বিনয়, মেঘাদা, পলাশ, অমলবাবু, তাঁর স্ত্রী বুড়ি এবং নমিতের পরিচিত-অপরিচিত সমস্ত বাঙালিকেই শামিল হতে হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। কে বড়োলোক আর কে গরিব, কে উচ্চশিক্ষিত আর কে অল্পশিক্ষিত, কে সচ্চরিত্র আর কে দুশ্চরিত্র, কে কমিউনিস্ট আর কে কংগ্রেসি, বা কে বি.জে.পি. তার ভেদ করলে চলবে না। এই যুদ্ধে প্রত্যেক বাংলা ভাষাভাষীকেই পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে যেমন এঁরা আগেও দাঁড়িয়েছেন।

"নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর
তাহে কি ফল চাতকিরো।
ধারাজল বিনে কভু
মিটে কি তৃষা।।
নানান দেশের নানান ভাষা।"

নিধুবাবুর এই গানটি গাইলেই নমিতের গায়ের সব রোম খাড়া হয়ে ওঠে। 'বন্দেমাতরম' গাইলে যেমন হয়।

আজকে ওদের চার্চ রোডের অফিস-কাম-রেসিডেন্সের একতলার ছাদ ঢালাই হচ্ছিল। যদিও ভাল এবং বড়ো ঠিকাদার এবং অফিসের ছেলেরা আছে তবু নমিতের আধঘণ্টার জন্যে গিয়ে সেখানে দাঁড়ানোটা জরুরি ছিল।

ছাদ পেটাই-এর গান গাইছিল যারা, তারা স্থানীয় অধিবাসী। তাদের ছাদ পেটাই-এর গান শুনতে শুনতে অন্য এক জগতে চলে গেছিল নমিত। এই দোলানি সুরের সঙ্গে "লালাবাই" এর মিল আছে। বেশিক্ষণ শুনলে সত্যিই ঘুম পেয়ে যায়। এই ছাদ পেটাইয়ের গান লোকসংগীতের এক বিশেষ ধারা। দুর্বিনয় সেদিন বলছিল যে, এই বিষয়ে মহম্মদ ফজলুল বারী নাকি একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন বরাক উপত্যকা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্মেলনের "স্মরণিকাতেই"। গানগুলি ছোটো ছোটো, যদিও বারংবার গাওয়া হচ্ছে। মনে হয় যেন পুরোটাই ধুয়ো। শুনে টুকে নিল নমিত। পরে, রাতে গিয়ে প্রবন্ধটি বের করে পড়বে এবং এই গানের কোনো উল্লেখ আছে নাকি দেখবে।

"তুমরা দেখ (অ) আইয়ারে
নদিয়ার চান্দ আমার উদয় হইয়াছে। (ধুয়া)
নিমাইচান্দে গীত গায়, জগাই মাথাই পিছে যায়
পন্থপানে চাইয়া কান্দে গর্ভধনী মায়রে
নদিয়ার চান্দ আমার উদয় হইয়াছে। (ধুয়া)
চুল নাই চুলুয়া বেটি চুলর লাগি কান্দে
কচুপাত্তা চিপা দিয়া উচচা খুফা বান্দে
হিরে হয় হয় হইয়া।

উম্মারিয়া মারে কিল গুম্মরিয়া উঠে
বেটিয়ে বলে মাঈগো মাঈ পিঠা বার করে
হিরে হয় হয় হইয়া।"

'গর্ভধনী' শব্দটি সঙ্গে কি 'রত্নগর্ভা'র কোনো মিল আছে।

ভাবছিল নমিত। তারপরই বুঝল যে, 'গর্ভধনী' শব্দটির অর্থ এখানে গর্ভধারিণী। যাই হোক, মহম্মদ ফজলুল বারী সাহেবের প্রবন্ধতে দেখবে এই গানের কথা আছে কিনা এবং থাকলে 'গর্ভধনী' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? শব্দটি ভারি মিষ্টি।

আরও একটি দ্বিপদী গাইছিল ছাদ পেটাই করা মানুষগুলি।

"তেলী আয় তেল বেচে ছট্টাক ছট্টাক
আন্ধাইব ঘর (অ) বউ মারে ভট্টাত ভট্টাত।।

অম্বিকাপট্টিতে সাইকেল রিকশা নিয়ে গিয়ে যখন পৌছোল তখন প্রায় পৌনে আটটা বাজে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সাতটার সময়। দিনে-রাতের সবসময়েই ও গাড়ি পেতে পারে। মারুতি এস্টিম বুক করা আছে। সাদা রং বেছেছে। দু-একদিনের মধ্যেই এসে যাবে। যতদিন না আসে, প্রাইভেট ট্যাক্সি ও সর্বক্ষণ রাখতে পারে। কিন্তু রাখে না। রাখে না, কারণ গাড়ি-চড়া মানুষের স্বাধীনতা সবচেয়ে কম। এবং পায়ে-হাঁটা মানুষের স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি। পায়ে হেঁটে না ঘুরলে কোনো দেশেরই কিছু দেখা হয় না। জানা যায় না। 'Feel of the place' পাওয়ার জন্যে জনারণ্যে পায়ে হেঁটে ঘোরাটা ভীষণই দরকার। তাই নমিত গাড়ি আর পা-গাড়ির মাঝামাঝি সাইকেল রিকশার সঙ্গে বফা করেছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিশুর মায়েদের মতো কড়ারে রিকশা রাখার কোনো প্রয়োজন বা ইচ্ছা নেই ওর। তাই রাখেও না। কিন্তু শিলচরের কোন রিকশাওয়ালা যে কখন বলে বসবে "ভাল্লাগে না" তা তো আগে থাকতে জানা যাবে না!

সরোজাই দরজা খুলল।

বসার ঘরটা ফুল দিয়ে সাজিয়েছে সুন্দর করে। সর্বত্রই ফুল। আজকে বেণী করেছে সেই প্রথম দিন যেমন করেছিল তেমন। হলুদ একটি তাঁতের শাড়ি। নতুন। কোরা-গন্ধর। এই গন্ধটির সঙ্গে পুজো আর নববর্ষের গন্ধ মিলেমিশে যায় নমিতের নাকে। অনেকের জন্মদিনও। সদ্য-প্রকাশিত

সদ্য বাঁধাই করা নতুন বইয়ের গন্ধের সঙ্গে—কোনো নতুন তাঁদের শাড়ি পরিহিত কোনো বাঙালি মেয়ের গায়ের গন্ধ গুলিয়ে ফেলে নমিত। বই এবং নারী দুজনকেই চুমু খেতে ইচ্ছে করে।

বেণীতে লাগিয়েছে হলুদ অমলতাস ফুল। অমলতাস ফোটা প্রায় শেষ হয়ে এল। কালো ব্লাউজ। হলুদ প্লাস্টিকের গোল গোল বল গেঁথে বানানো উজ্জ্বল মালা। হলুদ বলেরই বালা। পায়ে অ্যানোডাইজড স্টিলের পায়জোর। হালকা হলুদ-রঙা শায়া শাড়ির নিচ থেকে তার আভাস দেখা যাচ্ছে। কালো টিপ পরেছে। কাজলের কি? গাঢ় করে কাজল দিয়েছে দু চোখে। কলকাতার অধুনা-জনপ্রিয় গায়িকা স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত যেমন দেন। কাজলদানিতে বা কলাপাতাতে পাতা পেতলের প্রদীপের টাটকা কাজল একজন নারীর সৌন্দর্যে যে আলাদা মাত্রা এনে দেয়, তা যাদের দেখার চোখ আছে, তারাই জানে। তবে, চোখ সুন্দর হলে, সে চোখকে কাজল এক রহস্যময়তা দান করে। কালো কাজলের পটভূমিতে চোখের সাদা কণীনিকা অন্য এক অর্থ পায়। জীবনের অনেকই ক্ষেত্রেব খোলনলচে যে পালটে দিতে পারে, এই contrast, এই কথাও কম মানুষই জানেন হয়তো। Contrast-এর বাংলা প্রতিশব্দ কি? জানে না নমিত। কোনো ভাষাই ভাল করে জানে না। সাহিত্য ও ভাষা পড়ার সুযোগ জীবনে আর পেল কোথায়?

নতুন কচি কাঁচা আম উঠেছে মন হয় বাজারে সবে। নতুন গরমও সবে পড়েছে, কিশোরীর সবে-জাগা কামেরই মতন। কাঁচা আমপোড়া শরবত এনে দিল সরোজা। মধ্যে কাগজিলেবুর টাটকা-পাতা আর শুকনো-লংকা পোড়া। বানানো— বানিয়ে ফ্রিজে রাখা ছিল। এনে দিল সরোজা। নিজের গ্লাসটাও নিয়ে এল। নমিত হাতে গ্লাসটি নিয়ে সরোজার দু চোখে চেয়ে বলল, এটা কি? বশীকরণী?

আপনি তো আফ্রিকার হাতি। বশ তো মানেন না কারোরই আপনি! নিজে বশীকৃত না হলে, আপনাকে বশ মানায় এমন কে আছে।

নমিত উত্তর না দিয়ে সরোজার চোখে চেয়ে রইল। ঠিক এইরকম সুন্দর মুখ সে তার জীবনে আর দেখেনি। দুটি চোখের মধ্যে কী এক আশ্চর্য ঘুমলীন ভাব। অথচ সে চোখে একটুও শস্তা ঢলানি নেই। যে। সুন্দরী নাবী তার অপরূপ সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত তার সব সৌন্দর্যই মাঠে মারা যায়। বাইজি বা গণিকার সমতুল সেই মানসিকতা। কিন্তু যে সুন্দরী জেনেও জানে না, বিধাতা তাকে কী দিয়েছেন, সেই সুন্দরীর সৌন্দর্য অন্য এক বিশেষ মাত্রা পায়।

নারীরা কতটুকু জানে তাদের আশ্চর্য সুন্দর প্রভাবের প্রকৃতি একজন পুরুষের উপরে? তা তিনি শারীরিক সৌন্দর্যর অধিকারীই হন কী মানসিক সৌন্দর্যের? সৌন্দর্য সবসময়ে শারীরিক নাও তো হতে পারে। তবে যদি শরীরে সৌন্দর্যের সঙ্গে মানসিক সৌন্দর্যের মেলবন্ধন ঘটে তবে তো তা রাজযোটক মিলেরই সমার্থক। সরোজার বা নমিতের আয়েষার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

কিছু বলুন? কী দেখছেন অমন করে?

সরোজা বলল।

কী আর দেখব! দেখছি আমার সর্বনাশকে। ভাগ্যিস এখন "প্রহরশেষের রাঙা আলো" নেই।

ওই কবিতাটি না হয় থাক। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা 'ক্লিশে' করে তুলতে চান আমি তাঁদের বিরোধী।

আমিও। তবে রবীন্দ্রনাথ যে ধমনীতে ঢুকে গেছেন! হাজারিবাগে একজন রসিক বনচারী ছিলেন, যাঁর নাম ছিল মহম্মদ নাজিম। তিনি একটা কথা বলতেন তাঁর পরিচিত, এন. সি. ডি. সি.র একজন এঞ্জিনিয়র সম্বন্ধে।

কি বলতেন?

বলতেন "গোলি ব্রেইনসে ঘুষকে, ভেইনমে যাকর, টো সে নিকাল যাতা থা।"

কি? কি? আবার বলুন। উচ্ছল হাসি হেসে বলল, সরোজা।

কী সুন্দর যে দেখল ও সেই হাস্যময়ী সরোজাকে। নমিতের বুকের মধ্যে হায়! হায়! করে

উঠল। সৌন্দর্যর মার যে রাইফেলের গুলির মারেরও বাড়া এ কথা নমিতের মতন আর কজন জানে!

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বুঝলেন না? রাইফেলের গুলি মস্তিষ্ক দিয়ে ঢুকে, ধমনী দিয়ে গিয়ে, পায়ের পাতা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মানে কি হল?

কি আর হবে? আপনার হাসিরই মতন, যে সেই রাইফেলের গুলি অথবা হাসিতে মরল সে জানলও না যে, সে মরল, মৃত্যুর মুহূর্তের আগেই মৃত মৃততর হয়ে গেল। দ্যুলোক ভূলোক স্বর্গলোকের কোনো বিশল্যকরণীই আর তাকে বাঁচাতে পারবে না।

সরোজা বলল, আপনার মুখটি না থাকলে আপনার যে কি হত?

কী হত?

কাকে-চিলে তুলে নিয়ে ভাগাড়ে ফেলে দিত। আপনার কথা শুনলে মনে হয় কুরচিবনে এসেছি বসন্তে বা শিউলিতলায় এসেছি পুজোর আগে।

বাঃ। আপনি লেখেন না কেন?

ওসব আমার জন্যে নয়। আমি এ জন্মে ড্যাগমাস্টারি করতেই এসেছি।

সেটা আবার কি জিনিস?

ড্যাগ মানে ডেকচি তাও জানেন না? মানে রান্নাঘরে জীবনপাত করার জন্যেই এসেছি।

ব্রতটি খারাপ কিসে! শুধুমাত্র রসিক জনে, প্রকৃত প্রেমিকই জানে ড্যাগমাস্টারের ভূমিকা। কবিতা লেখা কি রান্না করা চেয়ে কঠিন নাকি? রান্নাও তো এক ধরনের কবিতাই! কবিতাও যেমন সকলে বোঝা না, রান্না করাটাও যে কবিতা লেখারই মতন এক মহান সারস্বতসাধনা সে কথাও সকলে বোঝে না। আসলে আপনার মতো ভার্সেটাইল নারী আজেবাজে পুরুষের ঘরনি হয়ে বববাদ হয়ে যাবেন এমন ভাবনা মনে এলেও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। আপনার যোগ্য পুরুষ, শিলচর তো দূরস্থান, বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে আছে কি না সন্দেহ।

থ্যাংক উ্য। সত্যি! পরম মিথ্যাকেও আপনি এমন সুন্দর করে বলেন না! মনে হয় যেন চরম সত্যিকথা শুনছি।

বলেই, কুশিয়ারা নদীর মতন হেসে উঠল সরোজা।

উপমাটা মনে এল নমিতের, কারণ আজই বিকেলে সে কুশিয়ারা নদী দেখে এসেছে।

নমিত বলল, "কুশিয়ারার এ পারো তুমি, হিপারো আমি/মাজেদি এক বেড়া।"

কবিতাটি যেন প্রথম শুনল ও এমন মনে হল নমিতের।

সেকি? আপনি জন্মজিৎ রায়ের এই কবিতাটি শোনেননি? আমি যেদিন প্রথম এলাম এ বাড়িতে সেদিনই তো পড়া হল। আপনি কোথায় ছিলেন তখন?

সরোজা নিজেও জানে যে সে শুনেছিল। তবু আবার সে শুনতে চাইল কবিতাটা, নমিতা মুখ থেকে। মুখে বলল, কোথায় আবার? হয়তো চা করছিলাম। কবিতা-টবিতা তো ড্যাগমাস্টারের জন্যে নয়। এমনিই কি বলি!

তারপরে বলল, বলুন না কবিতাটি শুনি।

আহা! বলব কি আর! আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে প্রতি রাতেই তো এই কবিতাটিই আবৃত্তি করি। বরাক উপত্যকার ভাষায়। পাছে আপনি আমার ভাষা না বোঝেন।

কবিতাটি বলুন।

"কাইল মাঝ-রাইত কিতা যে
অইল আমরা মনো,
একবার ই কাইত

একবার হি কাইত
ঘুম আইল না তেবো।
আলপিন একটা খুচা দিল বুকুর জেব।
আসলে আলপিন নায়।
ই তোমার চে'রা
কুশিয়ারার এ পারো তুমি, হিপারো আমি,
মাজেদি এক বেড়া।"

কবিতাটি শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সরোজা।

সত্যিই প্রতি রাতে একবার করে আবৃত্তি করি বিছানাতে শুয়ে শুয়ে।

আবার বলল নমিত।

শুনুন।

গলার স্বর বদলে গেল সরোজার। গম্ভীর হয়ে গেল।

বলল, শুনুন। আপনাকে একটা কথা বলব। সব সিরিয়াস ব্যাপারকেই লঘু করার এক আশ্চর্য প্রবণতা এবং ক্ষমতাও আপনার মধ্যে আছে। সেই ক্ষমতার অপব্যহার যত কম করেন ততই ভাল।

কেন এমন কথা বলছেন আমাকে? এমন রূঢ় কথা?

আপনি ভালবাসার কিছু বোঝেন না।

ঠিকই বুঝেছেন আপনি।

কি ঠিক বুঝেছি।

যে, আমি ভালবাসার কিছু বুঝি না। কিন্তু আমি তো এমন দাবি কখনও করিনি যে, আমি ব্যাপারটা বুঝি। তা ছাড়া তাত্ত্বিক আলোচনা করে জন্মদিনের সন্ধেটা মাটি করে কি লাভ। জন্মদিনে বাড়ির কুকুরকেও মানুষে কটু কথা বলে না। আর আপনি কি আমাকে...

বড়ো বাজে কথা বলেন আপনি।

বিরক্ত হল সরোজা।

ঠিক আছে। কথা থাক। আপনার গান কখনও শোনাননি? আজ জন্মদিনের আমাকে এই উপহারটা না হয় দিলেনই। অনেকের মুখেই শুনেছি যে, আপনি খুব ভাল গান করেন।

তারা জানে না। তাছাড়া জন্মদিনে, যার জন্মদিন উপহার তো তাকেই দেবার কথা। সেই উপহার দেয় এমন তো শুনিনি!

এই রে! একদম ভুলে গেছি। উপহার এনেছি। For the birthday baby.

বলেই, দাঁড়িয়ে উঠে ওর পাঞ্জাবির ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি ছোটো প্যাকেট বার করল নমিত। আর ক্যাডবেরির একটি বড়ো চকোলেট। তারপর দোষীর গলাতে বলল, শিলচরে ভাল র‍্যাপিং-পেপার কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো? আমি যে কিছুই জানি না। জনার্দনও জানে না বলল। তাই ন্যাংটো বাক্সতেই নিয়ে আসতে হল।

বাক্স ন্যাংটো হলে দোষ নেই। আপনার শুভেচ্ছা ন্যাংটো না হলেই হল। কিন্তু এসব তো আমি নেব না। কিছুতেই নেব না। তাছাড়া চকোলেট! আমি কি ছোটো খুকি?

আমার চোখে তাই। ঈশ্বর করুন! আপনি যেন কখনও বুড়ি না হন।

'বুড়ি' শব্দটি উচ্চারণ করেই একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

তারপর বলল, দেখুন। আমাকে হয়তো বম্বেতে বদলি করে দেবে। যে-কোনো দিন। আমি আপনাকে হয়তো আর বেশিদিন জ্বালাব না। এটা নিয়ে আমাকে সুখী করুন। আমার উপরে দয়া করুন। না নিলে ভারি দুঃখ পাব কিন্তু।

সরোজা নিজের জায়গা ছেড়ে না উঠেই বলল, কি আছে ওতে?

এতে?

হ্যাঁ।

মাছি গোলাপ।

কি?

তিনটি মাছি গোলাপ।

কি যে হেঁয়ালি করেন বুঝি না।

হেঁয়ালি নয়, হেঁয়ালি নয়। প্রথম যেদিন এখানে আসি, আপনাকে প্রথম দিন দেখি, সেদিন আপনি যে রংয়ের মাছি গোলাপ বেণীর শেষে গেঁথেছিলেন, যে-রংয়ের শাড়ি পরেছিলেন তারই সংগে মিলিয়ে দুটি রুবির দুল এবং একটি আংটি এনেছি। আন্দাজেই এনেছি। পরে দেখুন। আপনার আঙুলে ঠিক হবে তো?

বাবাঃ আপনার মনেও থাকে এত কথা! আমি তো ভুলেই গেছি কি রংয়ের শাড়ি পরেছিলাম সেদিন।

আমিও ভুলে যেতে চাই কি শাড়ি পরেছিলেন। কিন্তু সেই কপাল করে কি এসেছি?

তার মানে?

মানে, আমি তো মনে মনে আপনাকে কোনো শাড়ি না-পরাই দেখতে চাই।

আপনি অত্যন্ত অসভ্য। কোনো ভদ্রলোক কোনো ভদ্রমহিলার সঙ্গে এভাবে কথা বলেন না।

আমি ভদ্রলোক এমন দাবিও তো করিনি কখনও।

ঈসস। রুবি! এ তো ভীষণ দামি! না, না। আমি এ নিতে পারব না। আমি আপনার কে? এত অল্পদিনের আলাপ। এ দেবার অধিকার আপনার নেই। নেবার অধিকারও আমার নেই।

তাই?

বসে পড়ল নমিত বাক্সটি হাতে ধরেই।

বলল, দেখুন আমার যা সামান্য অভিজ্ঞতা এই সংসার সম্বন্ধে তাতে জেনেছি যে, খুব কম মানুষই এখানে স্বার্থহীন ভাবে কারোকে কিছু দেয়। দেওয়াটা খুবই কঠিন। কিন্তু দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন নেওয়াটা। দিতে যদি বা কিছু মানুষ জানেন তার চেয়েও অনেকই কম মানুষে জানেন নিতে।

আপনি যাই বলুন। এটা বাড়াবাড়ি। ও আমি নিই কী করে?

যেমন করে আমার চুমু নিয়েছিলেন আপনার দুই বন্ধ-চোখের পাতাতে।

তারপর একটু থেমে বলল, এই জিনিসটার দাম কি তার চেয়েও বেশি? আপনি কি আমার কাছ থেকে কিছুই নেননি? যা চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, আমি সে সবের কথাই বলছি। যা দেখা-ছোঁয়ার বাইরে সেই সবের দাম আপনি বোঝেন বলে মনে হয় না। তার দাম যদি বুঝতেন একটুও তবে এই তুচ্ছ উপহার এমন করে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না।

সরোজা বিড়বিড় করে কী যেন বলল নিচু স্বরে।

কী হল? ডাইনির মতন কী সব মন্ত্র বিড়বিড় করছেন? নিপাতন মন্ত্র নাকি? আপনি বলুন না। এখুনি আপনার সামনেই নিজেই নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে মরছি। মন্ত্র পড়ার দরকার কি?

আপনি কি যাত্রা করতেন?

সরোজা উঠে এসে ওর হাত থেকে বাক্সটা তুলে নিল।

নমিত বলল, ইয়েস। কিন্তু আপনি ধরলেন কি করে?

উত্তর না দিয়ে সরোজা বলল, কী যাত্রা? কী ধরনের ভূমিকাতে অভিনয় করতেন?

একটিই ভূমিকাতে। সব যাত্রাতেই একটি ভূমিকা।

তার মানে?

মানে, বিবেকের। মাঝে মাঝেই সাদা-পোশাক পরে বিবেক এসে গানের মাধ্যমে বিবেকের বাণী শুনিয়ে যান না যাত্রাতে। গাঁয়ের যাত্রা দেখেছেন কখনও? আমি সেই বিবেক।

হাসল অনেকক্ষণ পরে সরোজা। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বলল, আপনি যাত্রার বিবেক! আপনার নিজের বিবেক কি হারিয়ে গেছে? কই? কোনো কাগজ বা টি.ভি.-তে তো হারানোদের তালিকার মধ্যে আপনার বিবেককে লক্ষ্য করিনি!

আমার বিবেক যে অলক্ষ্যে হারায়। যে-বিবেক লক্ষ্যহীন সে তো চিরতরেই নিরুদ্দিষ্ট তাকে লক্ষ্য করবেন কী করে!

আপনাকে কি ধন্যবাদ দেব? এই দুর্মূল্য উপহারের জন্যে?

আমার উপহার অতি শস্তা। আপনি পরলেই তা দুর্মূল্য হবে। তাছাড়া ধন্যবাদ কি মুখে ছাড়া জানানো যায় না?

কিসে আর জানানো যায়?

কেন? চোখে। চোখ দিয়ে ধন্যবাদ জানানোটাই তো আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। Thank you—এর সংস্কৃতি তো বেনে! ইংরেজদের। তাদের খদ্দর পরে তেরঙা ঝান্ডা দিয়ে ছাগলের দুধ খেয়ে অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে দেশছাড়া করে আমরা কী দারুণ অনুকরণ করেছি তাদের। কাকের ময়ূরপুচ্ছ পরার মতন আর কী!

তাদের অপ্রত্যক্ষ সংগ্রামে তাড়িয়ে আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাদের পরাধীন হয়েছি। গ্রামে গঞ্জে, শহরে নগরে, ইঁদুরের ল্যাজের মতো রঙিন টাই-পরা বাচ্চারা অপার-অশিক্ষিত শিক্ষিকাদের কাছে সকাল বিকেল ড্যাড্ডি, মাম্মি, থ্যাংক উ্য শিখতে যাচ্ছে। যেন শিক্ষার এই পরাকাষ্ঠা। ঘুষ খেতে আর ঘুষ দিতে যতটুকু ইংরেজি জানলে চলে ততটুকু জানলেই যথেষ্ট। আমরা যথার্থই স্বাধীন জাত, শিক্ষিত জাত। নইলে নিজেদের যা-কিছু নিজস্ব সবই এমন ঘৃণাভরে ত্যাগ করি! ভাষা, পোশাক, সংস্কৃতি।

ঠিকই বলেছেন আপনি।

সরোজা বলল। সচরাচর আমি ঠিকই বলে থাকি।

আপনি বড়ো বেশি দাম্ভিক।

আদৌ নই। St. Augustine-এর একটা উক্তি আমি সর্বক্ষণ মনে রাখি।

কি সেটা?

"The sufficiency of my knowledge is to know that my knowledge is not sufficient".

বাঃ।

একটু চুপ করে থেকে সরোজা বলল, রাত গড়িয়ে যাচ্ছে। আপনি গান শোনাবেন না আমাকে একটা?

মাত্র একটা? সারা রাত ধরে শোনাব।

সারা রাত কেন? আজ কি আপনার ফুলশয্যার রাত!

যদি শয্যা একটা থাকে এবং শয্যাতে ফুল, তাহলেই তো ফুলশয্যা। ঠেকাচ্ছেটা কে? আমি সপ্তাহে কমপক্ষে দু-তিন দিন ফুলশয্যা করে থাকি। অফিসফেরতা মোড়ের দোকান থেকে ফুল কিনে নিয়ে যাই। আসল ফুলশয্যা তো কোনোদিনও হবে না। তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই।

কি ফুল? মানে, কেনেন কি ফুল?

কি ফুল মানে, যে-কোনো ফুল। তবে রং আলাদা আলাদা। যেদিন আমার মনের যেরকম রং থাকে, সেদিন সেই রংয়ের ফুল কিনি।

বাঃ।

সবই দেখি বাঃ। আপনি আমার দিদিমণি হলে বেশ হত। সব বিষয়েই একশো পেতাম তাহলে!

এখন কত রাত কে জানে! খুব বেশি নয়। তবু শিলচরের মতন শান্ত শহরে রাত দশটাই অনেক রাত।

রিকশা যেন দিগভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ রাতে ক্যাঁচর-কোঁচোর করে চলেছে নির্জন মফস্‌সল শহরের পথে।

একটা লোক, বেশ তুরীয় অবস্থা, সাইকেলে চড়ে উলটোদিকে থেকে আসছিল আস্তে আস্তে। তার মুখে মদের হালকা গন্ধের সঙ্গে একটি গানের সুরও আলতো ভাবে ঝুলে ছিল।

লোকটার গলাতে সুর আছে। গানটাও চমৎকার। স্থানীয় ভাষাতে লেখা। লোকটা গাইছিল, "যাব তার সঙ্গে প্রেম কইর না"।

গানটা দুদিন আগেই শুনেছে নমিত। ওদের অফিসের সেলসম্যান গান-পাগলা নবীন ভটচায্যি পরশুদিনই তার ওয়াকম্যানের ইয়ারফোনটা ওকে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই গানটা শুনুন, স্যার।

ইটা কিতা?

নমিত বলেছিল হেসে, স্থানীয় নবীনকে।

উষা দস্তিদার। দারুণ গায়।

সত্যিই ভাল লেগেছিল। কথা, সুর এবং গাওয়াও।

যে লোকটা মাতাল অবস্থাতেও সাইকেলে চড়ে টালমাটাল না হয়ে সুরে গান গাইতে গাইতে চলে গেল তার প্রতিও শ্রদ্ধা হলো। জাতে মাতাল, তালে ঠিক। ওর নিজের কানে বিধাতা সুর দিয়েছেন বলেই কারো বেসুরো গান শুনলে বড়োই শাস্তি বলে মনে হয়। বিধাতা, সৌভাগ্যক্রমে শুধু ওর কানেই সুর দেননি, আরও অনেকের কানেই দিয়েছেন। সুরে সুরে ভুবন ভরে উঠুক, ভরে উঠুক এই বরাক আর কুশিয়াবা আর জাটিঙ্গারা উপত্যকা।

আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। সপ্তর্ষি, কালপুরুষ, আরও কত তারা! কী সুন্দর সুন্দর সব নাম তারাদের। ইংরেজি Mars, Saturn, Jupiter, Sagaritus এই সব ইংরেজি নামই জানে আজকালকার ছেলেমেয়েরা কিন্তু তারা দেশি নাম জানে না, সংস্কৃত নাম। স্বাতী, শতভিষা, পুলহ, ক্রতু, বিদিশা আরও কত সুন্দর সুন্দর সব নাম।

কলকাতার আকাশে আজকাল আর তারা-টারা দেখা যায় না। ছেলেবেলাতে যেত। শিলচরের আকাশে শুধু তারাই নয়, অনেক উপগ্রহও দেখা যায়। যারা জানে না, তারা ভাবে তারাই বুঝি। কিন্তু উপগ্রহদের রাতের বেলা তারাদের মতনই দেখতে লাগলেও তারা অনেক কাছে থাকে আসল তারাদের তুলনাতে; আর তারা আস্তে আস্তে চলেও। স্থবির মনে হয় না তাদের তারাদের মতন।

আমাদের পৃথিবীটার আর আবরু বলে কোনো জিনিস রইল না। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির কারণে। ভাবছিল নমিত, শোবার ঘরে শুয়ে আছে কন্যা, তার শাড়ি উঠে গেছে ব্লাউজের বোতাম খুলে গেছে, ঢিলে-ঢালা নাইটিই পরে আছে হয়তো, আর সেই ঘরে অনুক্ষণ উঁকি মারছে এদিক-ওদিক থেকে স্যাটেলাইটগুলো। শুধু পৃথিবীই নয়, পুরো মহাকাশই এইসব কারণে বে-আবরু হয়ে গেছে।

কে যে কোটি কোটি বছর ধরে এই অগণন গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে এক অসীম নিয়মবদ্ধতায় চালিত-পালিত করছেন, আবর্তিত করছেন, প্রজাপতির পাখায়, পাখির পালকে কে যে তে রঙ

লাগিয়েছেন এ সবের উত্তর দিতে কেউ পারুক আর নাই পারুক সেই ধারক বাহককে অনুকরণের প্রতিযোগিতার শেষ নেই কোনো।

বিজ্ঞান আজ অবধি কিছু মাত্র উদ্ভাবন করেনি, শুধুমাত্র আবিষ্কারই করেছে। যা ছিল, তাকে চিনেছে অপার বিস্ময়ের সঙ্গে। আর নিজের পরম মূর্খতাজনিত শ্লাঘাতে ভর করে ভেবেছে যে, সে নিজেই ঈশ্বর। "কেন ভোলো, মনে করো তাঁরে। সে সৃজন পালন করেন এ সংসারে।"

গভীর রাতে তারাভরা আকাশের দিকে চাইলে এমন অনেক আপাত অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে আসে। যে সব কথা ভেবে মানুষের আর্থিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। হয়নি কোনোদিন। কে জানে! হয়তো আত্মিক উন্নতির হয়। হয়তো সেই জন্যের মানুষে এই সব কথা ভাবে।

আসবার সময়ে দরজা খোলার আগে সরোজার ডান হাতের পাতাতে চুমু খেয়েছিল একটা। তাতেই হাওয়া-লাগা সজনে গাছের মতন সরোজার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠেছিল।

বারে বারে সরোজার মুখটি মনে পড়ছিল নমিতের। সে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, সুরুচিসম্পন্না, শালীন মেয়ে। তবু তার জন্মদিনে নমিতকে একা বাড়িতে ডেকে সে হয়তো আন্তরিকভাবেই চেয়েছিল যে নমিত তাকে সোহাগভরে একটা চুমু অন্তত খাবে। বিশেষ করে, প্রথম দিনেই তার রূপ ও গুণে মুগ্ধ নমিত যখন তার চোখের পাতাতে চুমু খেয়েছিল। সেই চুমুর আবেশ এখনও রয়েছে সরোজার। হয়তো।

সরোজা কি কখনও জানবে যে, যা নমিত ওকে দিতে পারল না আজ রাতে, তা না-দেওয়ার কষ্টটা নমিতকে সরোজার কষ্টের চেয়েও অনেক বেশি বেজেছে? কী করে সরোজার মতন সরসীজাত পবিত্র কুমুদিনীকে ও স্পর্শ করবে? ও যে নষ্ট হয়ে গেছে! নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে।

ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনুক্ষণ। প্রতিদিন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতা ছিল না? "প্রভু নষ্ট হয়ে যাই"?

তাঁর আরেকটি কবিতার কথাও এমন এমন মুহূর্তে মনে পড়ে—

"তখনও ছিল অন্ধকার তখনও ছিল বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিল খেলা
ডুবিয়াছিল নদীর ধার আকাশে আধোলীন
সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন?
কী কাজ তারে করিয়া পার যাহার ভ্রূকুটিতে
সতর্কিত বন্ধদ্বার প্রহরা চারিভিতে
কী কাজ তারে ডাকিয়া আর এখনও এই বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার ফুরালো ছেলেবেলা।"

ক্ষমা কোরো। ক্ষমা কোরো সরোজা। ভাল লাগে না আমার। আমার ভাল লাগে না, ভাল লাগে না, ভাল লাগে না।

বাইরে আমি নষ্ট হয়ে গেছি। আমার অভ্যন্তরের অভ্যন্তরতম স্থলে আমাকে পবিত্র থাকতে দাও। যেখানে একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া আর কারও স্পর্শ পৌঁছোয় না।

সরোজা।

নমিত বলল, মনে মনে বলল, তুমি আমার মন্দির। ময়লা জুতো পায়ে যেতে পারি কি আমি তোমার কাছে?

ভাল লাগে না। ভাল লাগে না।। ভাল লাগে না।।

✸

পরদেশিয়া

নিবেদন

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের হেডকোয়ার্টাস মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে। তাঁদেরই অতিথি হয়ে বিলাসপুরে যাবাব সৌভাগ্য হয়েছিল গত ফেব্রুয়ারিতে। মধ্যপ্রদেশের নানা জায়গা দেখা থাকলেও ছত্তিশগড়ের এক আলাদা আকর্ষণ অবশ্যই আছে। ছত্তিশগড়ের নারী পুরুষ, তাঁদের বেশবাস, তাঁদের ভাষা, তাঁদের কর্ম্মমুখিনতা, সারল্য, নাচ-গান এসব কিছুরই এক আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য আছে।

মধ্যপ্রদেশের এই অঞ্চলও অন্যান্য অঞ্চলেরই মতো এখনও ফাঁকা আছে। কলুষিত হয়নি আকাশ-বাতাস। মধ্যপ্রদেশের বনবিভাগের অধিকাংশ আমলারাও অন্যান্য অনেক রাজ্যের বনবিভাগের আমলাদের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ, পরিশ্রমী, সৎ এবং সংবেদনশীল। তাই বারেবারে যেতে ইচ্ছে করে।

এস ই. সি. এল -এর জগতের গভীরে গতবাবে যাওয়ার সময় হয়নি। কিন্তু কয়লাখনি সম্বন্ধে স্বল্প কিছু জানি। কারণ, একসময়ে পূর্বভারতের বহু কয়লাখনির মালিকই আমাদের মক্কেল ছিলেন। এন সি. ডি. সি.-র অডিটও করেছি আমি। তখন অবশ্য সব কলিয়ারিই এন সি. ডি. সি.-র অধীনে ছিল। কোল ইন্ডিয়া, ই. সি. সি. এল., বি. সি সি. এল. ইত্যাদি তখনও স্থাপিত হয়নি।

এস. ই. সি. এল.-এর চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীউপেন্দ্র কুমারের সৌজন্য এবং অন্যান্য বহু অফিসারের সৌহার্দ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য, তাঁরা হলেন সর্বশ্রী সুভাষ চৌধুরী, গোপালচন্দ্র পাল, সুজিত মিত্র এবং পরিতোষ চক্রবর্তী।

অন্যান্যদের প্রত্যেকের নাম আলাদা করে উল্লেখ না করতে পারার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

এই উপন্যাসের পটভূমি এবং নায়ক নায়িকা প্রায় সকলেই এস ই. সি. এল.-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

ভবিষ্যতে 'ছত্তিশগড়িয়া' মানুষদের নিযে 'মাধুকরী'র মতো বড় কোনো লেখা লেখার ইচ্ছে নিয়ে ফিরে এসেছি। বারে বারে যাব ঐ অঞ্চলে আগামী দু'বছরে।

যাঁদের আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্যোগ না থাকলে আমার যাওযাই হতো না বিলাসপুরে, তাঁদেরই উৎসর্গ করলাম এই উপন্যাস।

বিনত

বুদ্ধদেব গুহ

ট্রেনটা কত লেট আছে?

থ্রি-টায়ারের পাশেব বার্থ-এর ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করল, অরা।

হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার আগেই কথাবার্তাতে বুঝেছিল যে, উনিও বিলাসপুরেই যাবেন, বিলাসপুরেরই বাসিন্দা ওই ভদ্রমহিলা, দু পুরুষ হল। বলেছিলেন, আমরাও বাঙালিই হচ্ছি। 'স' কে ইংরিজি 'S' এর মতন উচ্চারণ করছিলেন।

ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। বাইরে আলো ফুটেছে।

ভদ্রমহিলা একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ট্রেনটা খুবই জোরে চলছে এখন। রাতে যতটুকু লেট হয়েছিল তা পূরণ করার চেষ্টা চলছে জোর।

উনি বললেন, মনে তো হচ্ছে মেক-আপ করে নিয়েছে। প্রায় ঠিক সময়েই পৌঁছোবে। জায়গাটা ঠিক কোথায় তা বুঝতে পারছি না। কোনো স্টেশন এলে তবে বোঝা যাবে।

অরা তবুও ছোটো-তোয়ালে, সোপ-কেস আর দাঁত মাজার সরঞ্জাম নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোল। ট্রেনে উঠে, এই বাথরুমে যেতেই কান্না পেয়ে যায় ওর। শুনেছে, ফার্স্ট ক্লাস এ সি-র অবস্থাও এমনই, যদিও নিজে কোনোদিনই চড়েনি। গরিব, মধ্যবিত্ত, বড়োলোক, সকলেরই সমান খারাপ অভ্যেস। আর বাথরুমটা যদি ভিজে থাকে বা নোংরা, তবে ওর মেজাজটাই বিগড়ে যায় সাত সকালে। বাথরুমকেও পুজোর ঘরের মতন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যাঁরা রাখেন তাঁদেরই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করে অরা। আজ অবধি এমন কোনো পুরুষ দেখল না, যার বাথরুম সম্বন্ধে মতামত তার নিজের সঙ্গে মেলে! পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশই নোংরা।

বাথরুম থেকে বেরোতে না বেরোতেই ট্রেনটার গতি কমে এল। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল অরা যে, একটি বড়ো জংশনের কাছে এসেছে ট্রেনটা। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র ভরে নিল সুটকেসটাতে। বাথরুমেই মাথাটা আঁচড়ে এসেছিল। মেজোজামাইবাবুর দেওয়া ছোটো ইন্টিমেট পারফ্যুমটা হাত-ব্যাগ থেকে বের করে একটু স্প্রে করে নিল।

নিতে আসবেন ওকে বিলাসপুর স্টেশনে বড়ো জামাইবাবুর অফিসেরই একজন সহকর্মী। বড়ো জামাইবাবু হঠাৎ ট্যুওরে গেছেন। রিটায়ার করতে আরও বছর দশেক। অত্যন্ত উচ্চপদে আছেন। সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডের এলাকা নাকি প্রায় চারশো বর্গ কিমির মতন। তাই ঘোরাঘুরি প্রচুরই করতে হয়।

দিদি-জামাইবাবু আসতে বলেছিলেন শীতে, কিন্তু অরাব সময় হয়নি। তার নিজের চাকরির হ্যাপাও কম নয়। তাছাড়া, যে-কোনো চাকরিতে এই সময়টাই সবচেয়ে ঝক্কি-ঝামেলার। যত উঁচুতে উঠতে পারবেন রিটায়ার করার মুহূর্তে, সেই মতো পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি। সে সময়ের পোস্টিং কোথায় হবে না হবে তার উপরেও কোথায় সেটল করবেন না করবেন তাও নির্ভরশীল। ভাবলে অবাক লাগে যে, দিদির বিয়ে হয়েছে যখন, তখন থেকে কত জায়গাতেই না বদলি হল

ওরা। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস, ওয়েস্টার্ন কোলফিল্ডস, ওড়িশা, সিঙ্গরোলি, মার্ঘারিটা, সিঙ্গারেনি ইত্যাদি ভারতের কত না জায়গাতেই! অথচ এতবার বলা সত্ত্বেও কোথাওই যাওয়া হয়ে ওঠেনি এত বছরেও।

এত সব ভাবতে ভাবতে, অনেক ছড়ানো-ছিটোনো রেললাইনের ধাঁধা ভেদ করে একটা মস্ত স্টেশনে ঢুকল এবারে ট্রেনটা। বড়ো জংশন যে, সন্দেহ নেই। এখান থেকেই চিরিমিরি, মুনীন্দ্রগর, অনুপপুব আরও কত জায়গাতে ট্রেন যায়।

সঙ্গী মহিলাও ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিলেন। বললেন, বাঁচা গেল। এবার নিশ্বাস নেওয়ার মতন ফ্রেশ হাওয়া পাব একটু। নীল আকাশ, পাখির ডাক, গাছগাছালি। প্রতিবছরই বইমেলার সময়ে কলকাতাতে আমি বছরের অর্ধেক ছুটি নষ্ট করে যাচ্ছি গত আঠারো বছর, কিন্তু প্রতিবছরই দেখছি কলকাতা ক্রমশই থাকার অযোগ্য জায়গা হয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাস নিতে, চলাফেরা করতে এতই কষ্ট হয় যে, মানুষে কাজকর্ম আর কী করবে।

অরা চুপ করে রইল। কলকাতার নিন্দা সেও সবসময়েই করে কিন্তু যাঁরা কলকাতাতে থাকেন না তাঁদের মুখে কলকাতার নিন্দা সহ্য হয় না। একেবারেই নয়। তাছাড়া, কলকাতা যদি এতই খারাপ, তাহলে বইমেলাতে আসতে হয় কেন? দিল্লি বম্বে ব্যাঙ্গালোর তো দারুণ সব শহর কিন্তু সেই সব শহরেও কলকাতার মতন বইমেলা হয় না কেন?

ট্রেনটা দাঁড়াল, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে। প্রকাণ্ড স্টেশন। লম্বা প্ল্যাটফর্ম। নেমেই দেখল, প্ল্যাটফর্মে অন্যান্য কাগজের সঙ্গে 'আনন্দবাজার' আর 'দ্য টেলিগ্রাফ' ও বিক্রি হচ্ছে। অরা যতদূর জানত তাতে বিহার উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ এই সব অঞ্চলে 'যুগান্তর' আর এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'অমৃতবাজার পত্রিকার'ও খুবই রবরবা ছিল। এখনকার প্রবাসী বাঙালিরা বোধহয় জানেনই না যে যুগান্তর এবং অমৃতবাজার নব কলেবরে বেরোচ্ছে এবং বর্তমান দৈনিক এবং সাপ্তাহিকও রমরম করে চলেছে। এবং ভালোই কাগজ হয়েছে সেগুলিও। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর মতন 'মার্কেটিং' ব্যাপারটা আর কেউই বোঝেন না। আর যে-কোনো ব্যবসাতেই মার্কেটিংই হচ্ছে এখন আসল। যদিও কোয়ালিটি এবং প্রডাকশনটাও বড়ো কথা। তবুও মার্কেটিং-এর জন্যে পঙ্গু গিবি লঙ্ঘন করছে, অগায়ক গায়ক বনে চলছে, অ-লেখক হচ্ছে লেখক চূড়ামণি।

বড়দি লিখেছে, যে-ছেলেটি স্টেশনে আসবে, সে লম্বা। খেলাধুলো-করা স্পোর্টসম্যানের মতন চেহারা। নীল রঙা ফুল শার্ট আর সাদা ট্রাউজার পরে আসবে। প্ল্যাটফর্মের ভিতরে ঢুকবে না। কারণ, তাতে মিস করে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বাইরে বেরুনোর গেট-এ দাঁড়িয়ে থাকবে। তোর চেহারার বর্ণনাও দিয়ে দিয়েছি তাকে। তুই হলুদ শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে আসিস।

লিখেছিল, গায়ের রং যদিও কালো, চোখ-মুখ খুব ভালো। দারুণ ফিগার।

বড়দির বর্ণনা শুনে মনে মনে হেসেছিল অরা।

যাই হোক, শাড়ি-জামা পরেছে নির্দেশ মতনই। একটি হলুদ-রঙা মুর্শিদাবাদি সিল্কের শাড়ি। তার সঙ্গে কালো ব্লাউজ। রাতে চোখে কাজল দিয়ে বেরিয়েছিল। কামরা ও বাথরুমের আয়নাতে দেখল এখনও তার রেশ আছে।

মন্দ দেখতে না ওকে।

ভাবল, অরা।

ছোটো সুটকেসটা হাতে তুলে বয়ে নিয়ে ওভার ব্রিজ পেরিয়ে যখন গেটে পৌঁছল তখন দেখল কালো কোট-পরা চেকারের দু পাশে তিনজন নীল শার্ট পরা মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। একজনের দাড়ি-গোঁফ আছে। অন্য জনের দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। আর তৃতীয়জনেরও গোঁফ আছে। তবে শুধুই গোঁফ। এবং তিনজনই লম্বা।

নার্ভাস হয়ে, পেছনে একবার চেয়ে দেখল অরা যে, ওর ঠিক পেছনে পেছনেই আরও দুজন হলুদ শাড়ি পরা মহিলা। তবে বাঁচোয়া এই, একজন সদ্য যুবতী আর অন্যজন বেশ বয়স্কা।

টিকিটটা চেকারকে দিয়ে বাইরে বেরুতেই ওঁদের মধ্যে যিনি শুধু গোঁফধারী, প্রায় ছ ফিট লম্বা, ফরসা, হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, নমস্কার। আপনিই নিশ্চয়ই অরাদেবী।

নমস্কারের উচ্চারণে s ছিল। স ছিল না। তাকে দেবী বানানোতে খুশিই হল অরা একটু। যদিও বোকা-বোকা লাগছিল।

মনে পড়ে গেল ওর যে, ফার্স্ট-ইয়ারে পড়ার সময়ে লিটল-ম্যাগ করা একজন সহপাঠী তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল পরোক্ষে কলেজ ম্যাগাজিনে 'দেবী' শীর্ষক একটি কবিতা লিখে।

অরা অপরূপা সুন্দরী যাকে বলে তা নয় যে তা সে জানে। তবে এও জানে যে মাধুরী দীক্ষিত বা রূপা গাঙ্গুলি না হলেও সুন্দরী হওয়া যায় অবশ্যই। ওর দুটি চোখ, ওর ব্যক্তিত্ব আর চলনবলনের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা চিরদিনই পুরুষদের আকৃষ্ট করেছে। ও সেই নৈবেদ্যতে অভ্যস্তও হয়ে গেছে। অথচ আজ অবধি এমন একজন পুরুষও এ জীবনে চোখে পড়ল না, যাকে ওর নিজের ভালো লাগে। একমাত্র আভাস ছাড়া।

পরমুহূর্তেই নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল, ওসব কথা থাক।

অরা মাথা নাড়ল হেসে। সুটকেসটা নামিয়ে রেখে দু হাত জড়ো করে বলল নমস্কার। তারপর হাসি-হাসি মুখেই বলল, আপনার কষ্ট করতে হল আমার জন্যে।

না, না। এইসব কষ্ট করাও তো কাজের মধ্যেই পড়ে। এও আমার কাজ। এটা তো শুধু কাজই নয়, কর্তব্যও। তাছাড়া সব কষ্টই যে কষ্ট এমনও তো নয়। আনন্দও হয়ে ওঠে কষ্ট অনেক সময়ে।

তারপর বলল, আপনি তো মদনদার আদরের শ্যালিকাই। কত সময়ে কত থার্ড-ক্লাস মানুষকে রিসিভ করতে আর ট্রেনে তুলে দিতে হয় আমায়। আপনাকে রিসিভ করা তো আমার পক্ষে আনন্দেরই ব্যাপার।

তাই?

অরা বলল।

দিন। সুটকেসটা আমাকে দিন।

না, না।

বাঃ। তা কি হয় নাকি? কত মানুষের জুতো বইতে হয় আর এ তো সামান্য একটা স্যুটকেসই। এবং মহিলার।

জুতো বইতে হয়?

হয় না? পেটের জন্য কত কী করতে হয় মানুষকে। যার যেমন কাজ। পাবলিক রিলেশনের কাজ বড়ো সাংঘাতিক। ভি আই পি-দের আনতে-ছাড়তে হয়। একটা কমপ্লেনেই চাকরি নট হতে পারে। নট না হলেও এমন জায়গাতে পোস্টিং হবে যে কেঁদে কূল পাব না। অথচ আমি পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্টের লোক নই আদৌ।

স্টেশনের বাইরের চত্বরে পৌঁছে একটা সাদা অ্যামবাসাডর গাড়ি দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ওই যে, গাড়ি ওখানে। আসুন! বলেই, সেই সাদা অ্যামবাসাডরের পেছনের দরজা খুলে অরাকে যত্ন করে বসালেন ভদ্রলোক পেছনের সিটে। তারপব সুটকেসটা সামনে নিয়ে সুটকেসের সঙ্গে নিজেও বসলেন।

পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো? আপনার?

বললেন, উনি।

অরা তাড়াতাড়িতে বলল, না, না, কষ্ট কিসের?

তারপরই ভাবল, রাতে তো ভদ্রলোক সঙ্গে ছিলেন না। কষ্ট হলেই বা কী করার ছিল তাঁর?

তবু ভালো লাগল এই কথা মনে করে যে, ওকে আজ পর্যন্ত ওর চলে-যাওয়া বাবা ছাড়া এমন করে আন্তরিকভাবে কষ্টর কথা কেউই জিজ্ঞেস করেনি। ট্রেনের জার্নির কথা ছেড়েই দিল। জীবনের পথে চলতে সবসময়েই তো কত কষ্টই হয়। অন্যের কোনো কষ্টর কথা কেই বা জানতে চায়, আন্তরিকতার সঙ্গে?

এটুকু ভেবেই অবাক হল যে, সামান্য একটি অতি-ফর্মাল প্রশ্নের মধ্যে এত গভীর সব ভাবনা ও ঢোকাল কী করে? ও একটা যা-তা। চলে না নিজেকে নিয়ে।

তারপর ভদ্রলোক আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেন না।

বেশ চেহারাটি কিন্তু ভদ্রলোকের। এরকম লম্বা, অ্যাথলেট-এর মতন বিল্ট বাঙালি যুবক আজকাল দেখা যায় কমই। তাছাড়া, ব্যবহারটিও নিখুঁত। এটুকু বুঝতে পারছে অরা যে, মানুষটি তাঁর সহজাত সৌজন্যবোধের কারণেই এমন ভালো ব্যবহার করছেন অরার সঙ্গে। তার বড়ো জামাইবাবু সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর বড়ো অফিসার বলেই নয়।

ওর খুবই ইচ্ছে করছিল যে ভদ্রলোকের নামটি জিজ্ঞেস করে, কিন্তু মেয়েদের সহজাত সাবধানতায় অচেনা পুরুষকে প্রথম পরিচয়েই মাথায় চড়ালে যে সমূহ বিপদ তা ও জানে। কারোকে ভালো লাগলেও তা যে কখনই প্রকাশ করতে নেই। করলেই যে, সেই পুরুষ, পুরুষেরা 'বসতে দিলেই শুতে চায়'-এর জাত, তা প্রমাণ করবে অচিরেই। তার চেয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখাই ভালো। সন্ধেবেলার স্থলপদ্মের মতন। সকাল হলে তখন দেখা যাবে। সকাল যে হবেই তার তো কোনো নিশ্চয়তাও নেই।

তাই, চুপ করে থাকল।

গাড়িটা দেখতে দেখতে ফাঁকা জায়গাতে এসে পড়ল। হাওয়াটা এখনও ঠান্ডা। ফেব্রুয়ারির প্রথম। কাচটা তুলে দিল অরা। ভদ্রলোক, বাঁ হাতটা বাইরে বের করে, ভি আই পি-দের সিকিউরিটি গার্ডেরা যেমন করে সামনের সিটে বসেন; তেমন করে বসেছেন। অরাও যেন একজন ভি আই পি।

সুগঠিত হাতটা দরজার ওপরে শোভা পাচ্ছে। চওড়া শক্ত কাঁধ। মনে মনে যতই লিবারেটেড ফিল করুক না কেন, পুরুষ-নির্ভর কখনওই হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করুক না কেন; এখনও ভারতীয় মেয়েদের মনের গহন কোণে কোনো মনোমতো, বিশ্বস্ত, একাচারী পুরুষের চওড়া কাঁধে মাথা রাখার ইচ্ছাটা গভীরে প্রোথিত থাকেই। থাকবে চিরদিনই।

মেয়েদের এই নব্যজেহাদটাকে ভালো চোখে দেখে না অরা, নিজে স্বাবলম্বী এবং আধুনিক হয়েও। তাছাড়া, নারী আর পুরুষ দুজনে দু জনের পরিপূরক। দুজনে মিলেই তারা তাদের রক্তমাংসের খেলনা রচনা করে, ছেলেবেলার পুতুল খেলাকে প্রাণ দেয়। সম্পর্কটা যেখানে সম্মানের, ভালোবাসার; সেখানে প্রতিযোগিতা এনে বিভেদ সৃষ্টি করে অবশেষে যে কোনো গভীর লাভ হবে নারীদের, এমন মনে হয় না অরার। তসলিমা নাসরিনকে সে পুরোপুরি সমর্থন করে না। তবে একথাও মানে যে, নারীদের বিরুদ্ধে পুরুষের অবিচারের যুগযুগান্তরের পরাধীনতার, অত্যাচারের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাজ্বল্যমান বিদ্রোহ হিসেবে তসলিমার মতন একজন 'অবতারের' অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল নারীদের প্রতিভূ হিসেবে। পুরো উপমহাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছেন তসলিমা। তাঁর মঙ্গল হোক।

ঠিক সেই সময়েই ভদ্রলোক বললেন, আপনি তসলিমা নাসরিন পড়েছেন?

চমকে উঠল অরা, এই টেলিপ্যাথি দেখে অবাকও হল।

কয়লা-খাদের ব্ল্যাক-ডায়মন্ডের কারবারি হলে কী হয়, অন্য অনেক বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন ভদ্রলোক।

অরা বলল, হুঁ।

আপনি কী বলেন?

আমি আর কী বলব! যা বলার তা তো উনিই বলেছেন।

অরা বলল।

না, আপনি কি সমর্থন করেন তাঁর বক্তব্যকে?

না করার তো কোনো কারণ নেই। তবে কিছু কিছু ব্যাপারে আমি একমত নই।

বলেই বলল, আপনি পড়েছেন?

নিশ্চয়ই। না পড়লে আপনাকে জিজ্ঞেস করব কেন?

কোন বই পড়েছেন?

নির্বাচিত কলাম। লজ্জা। ফেরা। এবং নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্যও।

আপনি কী বলেন?

আমার মতও আপনারই মতো। কোনো কোনো ব্যাপারে উনি একটু ওভারডুয়িং করেছেন।

অরা কথা বাড়াল না। গাড়িটা একটি প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা দিয়ে সিকিউরিটি গেট পেরিয়ে একটি টাউনশিপ-এ ঢুকল।

বাঃ! কী সুন্দর।

স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলল, অরা।

হ্যাঁ। এইখানেই থাকবেন আপনি। এটি সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের নতুন কলোনি। নাম বসন্ত-ভিহার।

সবতাতে দিল্লির নকল-নবিশি কেন?

তা বলতে পারব না। এই সব ডিসিশন অন্যেরা নেন। পুরোনো কলোনিও আছে। তার নাম ইন্দিরা-ভিহার। সেও খারাপ নয়। গেস্ট হাউস-টাউস সব সেখানেই। আমিও ওখানে থাকি। দু দিকে দুই কলোনি। মাঝে অফিস।

আর কারখানা?

ভদ্রলোক হাসলেন।

বললেন, আমাদের কারখানা, কলিয়ারি। সে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে। বিলাসপুরেই এই এস ই সি এল-এর হেডকোয়ার্টার্স। এখানে শুধুই অফিস। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রডাকশন, মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টস, টেকনিকাল, ডিপার্টমেন্ট, পাবলিক রিলেশন্স, প্ল্যানিং, ট্রেনিং যা বলেন, সবেরই শিকড় এখানে।

তাই?

অবাক হয়ে বলল, অরা।

তারপর এখনও নামটা জিজ্ঞেস না-করাটা অভদ্রতা হবে ভেবে বলল, আপনার নামটা কিন্তু বলেননি এখনও, যদিও অনেক কথাই বললেন।

ওঃ। আমার নাম? আমি তো একজন নন-এনটিটি। নামটার দরকার আছে কি আদৌ? আবার যেদিন চলে যাবেন সেদিন দেখা হবে আপনার সঙ্গে। আমি আপনার সেবাদাস। রোবো। রোবোর নাম থাকে না, নাম্বার থাকে। আমাকে একনম্বর রোবো বা সেবাদাস বলেই ডাকবেন। যদি সেনগুপ্ত সাহেব অথবা মিসেস সেনগুপ্ত অর্ডার করেন তবেই আপনার সেবাতে আবার লাগা যাবে। আমি অনামা।

রোবো মানে?

ROBOT, T নিরুচ্চারিত থাকে যে!

এখানে কি সাহেবদের অর্ডারের সঙ্গে মেমসাহেবদের অর্ডারও মান্য নাকি?

সবক্ষেত্রে নয়। কোথাও কোথাও। সেসব বিশেষ বিশেষ মেমসাহেবদের এলেমের উপর নির্ভর

করে। ইন্দিরা গান্ধির এমার্জেন্সির সময় থেকেই আমলাদের স্ত্রীদের মধ্যেও অনেকে ওই বিদ্যেটা শিখে নিয়েছেন। 'শি ডিজায়ার্স দ্যাট' এইটুকু শুনলেই অনেক প্রবীণ আমলারও হাড়-খটখটিয়ে ওঠে।

তাই?

হেসে উঠল অরা সে কথা শুনে।

নামটা জিজ্ঞেস করে নিজেকে ছোটো করল। ভাবল অরা। এখন মানুষটা হয়তো কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করবে।

নিজের উপর রাগ হল ওর। মানুষটার গোঁফ দুটো কি বিচ্ছিরি। তবে ফিচার্স এবং ফিগার খুবই সুন্দর। সন্দেহ নেই।

তারপর নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, মানুষটি কি বিবাহিত?

জানার উপায় নেই।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে বসন্ত-ভিহারের সৌন্দর্য দেখতে লাগল।

গাড়ি এসে একটা বাংলোর সামনে থামল।

ভদ্রলোক বললেন, এসে গেছি। বলেই একঝটাকাতেই দরজা খুলে সুটকেসটা এক হাতে নিয়ে এমন করে নামলেন যে অরার কোনোই সন্দেহ রইল না যে ভদ্রলোক সত্যিই স্পোর্টসম্যান।

উনি নেমেই, গাড়ির পেছনের সিটে অরার দরজাটা খুলে দিয়ে, ধরে থেকে বললেন; নামুন ম্যাডাম।

গাড়ির শব্দ শুনেই স্মৃতি বাংলোর বসবার ঘব থেকে তাড়াতাড়ি বারান্দাতে এসে বলল, এলি তাহলে তুই এতদিনে! বিশ্বাস হচ্ছে না আমার চোখকে। বাবাঃ।

আমি যাই বউদি? ভদ্রলোক বললেন।

সে কি। এখনই যাবে কী? ব্রেকফাস্ট করে যাও। সেই ভোরে উঠে আনতে গেছ ওকে স্টেশনে। তোমাকে তো ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করতে পারি না, নইলে ধন্যবাদ দিতাম।

সেটা থাক। তাছাড়া মনটাও আমার ভালো নয়।

কেন?

এতদিন যে মনের কোণে দুর্বল হলেও একটা প্রচ্ছন্ন আশা ছিল যে তোমরা আমাকে অ্যাডপ্ট করলেও করতে পারো হয়তো কোনোদিন, আজ ইনি এসে আমার সেই আশাকে নির্মূল করে দিলেন। নিজেদের কাছের কেউই ছিল না বলেই তো পরকে কাছে টেনেছিলে বউদি। তাই না?

বড়দি ভদ্রলোকের পিঠে একটি আদরের চড় মেরে বললেন, না, না, এখনও আশা রাখতে পারো। দুষ্টু ছেলে।

ব্রেকফাস্ট খাওয়াটা থাক। ফেব্রুয়ারির বারো তারিখ থেকে আমাদের ইন্টার কোম্পানি টেনিস টুর্নামেন্ট শুরু হবে। এখনই গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। হেরে গেলে, দাদাই যা তা বলবেন। সিংগলস এবং ডাবলস দুটিতেই খেলতে হবে আমাকে। সকালেই লাইট ব্রেকফাস্ট করে এসেছি। আর আমি কিন্তু গাড়িটাকে নিয়ে যাচ্ছি ক্লাবে। নেমেই পাঠিয়ে দেব।

তা আবার বলতে! নিজের গাড়ির তেল কেন খরচ করবে মিছিমিছি আমার গাড়ি থাকতে?

ও। সেটা কোনো প্রবলেম নয়। ক্লাবে গাড়ি থাকবে তিন-চারটি। নইলে স্কুটার তো থাকবেই কতজনের। কারো পেছনে বসে চলে যাব। ইন্দিরা ভিহারেই তো খেলা।

তোমার সামেরু কি ফিরেছে?

না। সে কেঁওচিতে একটি ধাবাতে কুক হয়ে গেছে। অনেক বেশি কামাচ্ছে সেখানে। আসবে কেন? আসতে বলাটাও অন্যায়। সবাই যখন উন্নতি চায় জীবনে।

তারপরেই কী যেন ভেবে বলল, যেন বেশি রোজগারটাই জীবনের সব কিছু!

তাহলে তুমি আজকাল খাচ্ছ কোথায়? কবে গেছে সামেরু?

চিন্তান্বিত গলায় অরার দিদি বললেন।

তা দিন পনেরো হবে।

পনেরো দিন। আমাদের বলোওনি। আশ্চর্য! তাহলে খাচ্ছ কোথায়?

কেন? বাড়িতেই খাচ্ছি।

হাত পুড়িয়ে?

কি যে বলো বউদি! 'সাতকোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।' তবে সংখ্যাটা এখন কত কোটিতে দাঁড়িয়েছে এসে তা অবশ্য বলা মুশকিল। রবীন্দ্রনাথের পরে বাঙালির আর কোনো শ্রীবৃদ্ধি না হোক, সংখ্যাবৃদ্ধি তো হয়েইছে।

বলেই বলল, চলি বউদি।

তারপর হাতজোড় করে অরাকে বলল, চলি অরাদেবী। নমস্কার। আপনার সেবা করতে পেরে আমি ধন্য।

কথাটাতে যেন একটু খোঁচা ছিল বলে মনে হল অরার।

স্পষ্ট বুঝতে পারল না।

ভদ্রলোক বড়ো বড়ো পা ফেলে গিয়ে এবারে গাড়ির পেছনের সিটেই বসলেন। মানুষটির হাঁটাচলা, কথা-বলার মধ্যে বেশ একটা আলাদা ব্যাপার আছে। প্রথমদর্শনেরই ভালো লেগে গেছিল অরার। যেদিও ও নিজে মনসর্বস্ব মানুষ। তবুও শরীরের মধ্যে এক অননুভূত অনুভূতি হতে লাগল। এক ধরনের রিকিঝিকি। কিন্তু মানুষটার গোঁফটা একদম থার্ড ক্লাস।

মনে মনে বলল ও।

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে একটা জোর ঘুম লাগিয়েছিল অরা।

ট্রেনে, রাতে কখনওই ঘুম হয় না। যাঁরা প্রায়ই ট্রেন-জার্নি করেন, তাঁদের কথা অন্য।

বড়দি দুপুরে খাবার টেবিলে বসে বললেন, বড়ো জামাইবাবুর এক কলিগ হঠাৎই মারা গেছেন। একেবারে বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু। প্রথম অ্যাটাক। কোনো প্রিভিয়াস হিস্ট্রি ছিল না। আসলে ডায়াবেটিক যে ছিলেন, তা ধরাই পড়েনি আগে। বয়সও কিছু নয়। তার স্ত্রীর কাছে যেতে হবে বুঝলি। খাওয়াদাওয়ার পরে।

বড়দির বাংলোতে রান্নার এবং বাড়ির কাজ দেখে একটি ছত্তিশগড়িয়া মেয়ে। তার নাম বনবাসা।

বাগান দেখাশোনার জন্যে মালি আছে অবশ্য। তার নাম বীরাণ। সেও ছত্তিশগড়ের লোক। তাছাড়া, ড্রাইভার করিম বক্সও বড়দির নানা কাজে সাহায্য করে। বলতে গেলে, বড়দির ডানহাত।

ঘুম থেকে উঠে বারান্দার চেয়ারে এসে বসেছিল অরা।

এখন প্রায় বিকেল চারটে বাজে। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আছে একটা। ঠান্ডাটা বাড়বে আস্তে আস্তে, বুঝতে পারছে। বাগানটা ভারি সুন্দর। ফুলের গাছ যেমন অনেক আছে, বড়ো বড়ো গাছেরও অভাব নেই। স্থলপদ্মর গাছ আছে। অশোক। সোনাঝুরি। গেটের দু পাশে অমলতাস।

ওড়িশাতে যাকে বলে 'কণ্টা' বাঁশ, তার ঝোপ। বিনা যত্নেই সেই পীতবাঁশের ঝাড় শৌখিন বাগানের মধ্যে মানিয়ে গেছে। হালকা একটা হাওয়া বইছে। তাতে একটি দুটি পাতা ঝরছে। তবে এখনও পাতা-ঝরা, পাতা-খসার সময় আসেনি। পাখি ডাকছে নানারকম। চারদিকের প্রতিটি বাড়ি ও কোয়ার্টারের মধ্যেই গাছ আছে নানারকম। পাশের বাড়ির বাগানে একটা লালপাতিয়ার ঝাড়, ইংরেজিতে যাকে বলে পনসাটিয়া, খুব বড়ো হয়েছে। চমৎকার উজ্জ্বল লাল তাদের পাতাগুলি।

কিছু কিছু পাখিটাখির নাম জানে অরা।

ওর বাবা যখন ভিলাইতে পোস্টেড ছিলেন, তখন ওখানকার ডি এফ ও আচরেকার সাহেবের সঙ্গে ওরা প্রায়ই বনে-জঙ্গলে যেত। একবার অবুঝমারেও গেছিল। মধ্যপ্রদেশের বস্তার ডিভিশনে। আচরেকার সাহেব ছিলেন keen অরনিথোলজিস্ট। তিনিই অনেক পাখি চিনিয়েছিলেন শিশু অরাকে। বাবা, একটি দূরবিন নয়, অপেরা-গ্লাস কিনে দিয়েছিলেন। তখনই গল্প শোনে ও যে এই বিলাসপুরের কাছের অচানকমারের গভীর জঙ্গলে একজন বেলজিয়ান অরনিথোলজিস্ট গলায় বাইনোকুলর ঝুলিয়ে পাখির পেছনে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে শুয়ে-থাকা বাঘের ঘাড়ে পড়েছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ তাঁর ঘাড় মটকে দিয়েছিল।

গাছগাছলির নামও সেই শৈশবেই শিখেছিল। তারপর বাবার মৃত্যুর পরে কলকাতাতেই কেটে গেছে কুড়ি বছর। সেই সব দিনগুলো অ্যালবামের লাল হয়ে যাওয়া ফোটো আর বিবর্ণ স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে তার মনে। তবুও বেঁচে আছে। আর আছে বলেই এই প্রথমবার বিলাসপুরে এসে ভাবি ভালো লাগছে অরার। ওর শরীর-মন বলছে এই রকম কোনো জায়গাতেই থেকে যাবে। চওড়া চওড়া বড়ো রাস্তা, গাছগাছালি, পাখপাখালি, শহরের চারধারে নানা জংলি জায়গা। পিকনিক স্পটস। প্রকৃতির কাছে থাকা যা আনন্দ তা কি আর বড়োলোকি দিয়ে সমান করা যায়?

কোনো বড়োলোকি দিয়েই নয়।

মস্ত চওড়া পিচ-বাঁধানো পথ দিয়ে দশ-পনেরো মিনিট পরে পরে একট গাড়ি বা স্কুটার যাচ্ছে। অথবা অটো। অটোগুলো ভীষণ শব্দ করে। আর কালো ধুঁয়ো ওড়ায়। সারা দেশে আইন করে এগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ওদের সাইলেন্সার সিস্টেমেরও অবিলম্বে কিছু উদ্ভাবনের দরকার। শব্দদূষণে ওরা আর স্কুটার, এবং মোটর-সাইকেল সবার উপরে। ইদানীং কলকাতাতেও এই আপদ জুটেছে। শব্দ, ধুলো, ধুঁয়ো, ভিড় ভালো লাগে না আর।

চার-পাঁচটা বাংলোর পরে একটি বাংলোতে দুটি শিশু খেলা করছে। তাদের চিকন দেবশিশুসুলভ গলার স্বর এই অকলুষ নিস্তব্ধ পরিবেশে পাখির গলার স্বরের মতন অনুরণন তুলছে। এটা ভেবেই খুশিতে মন ভরে গেল অরার। যদি ওর কোনোদিন কোনো শিশু হয় তবে তাকে এমন পরিবেশ দিতে না পারলে কী লাভ? অরা, সেই অনাগত শিশুকে এতকিছু অঙ্গীকার করে, তার অনাগত বাবার শারীরিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্য ও দার্ঢ্য, তার না-হওয়া ঘরের পরিবেশ সম্বন্ধে সে এতকিছু ভাবে যে, এত অঙ্গীকার পূরিত কখনও হতে পারে না বলেই তার সন্তানও সম্ভবত কখনও হবে না।

সন্তানের পিতাই আগে নির্বাচিত হোক। তবে না সন্তান।

আবার পিতা-মাত্রই যে সন্তানের জন্মদাতা হবেনই তাবই বা গ্যারান্টি কোথায়? জীবন, আজকাল অগণ্য শর্তাধীন হয়ে গেছে।

বড়দি ও জামাইবাবুর বিয়ে হয়েছে আজ পঁচিশ বছর। কিন্তু কই? সন্তান তো আজও আসেনি। আর হবেও না। ওঁরা 'ন্যাদস'ও আছেন। 'গেঁতো'। আজকাল কত কি সব বেরিয়েছে। তেমন করে চেষ্টাই করল না। কার দোষে যে হল না, সেটাও জানতে চাইল না। দিদিটা বেশি বেশি রোমান্টিক। কেবলই বলে, বেশ তো আছি। আমার সঙ্গে তোর জামাইবাবুর গভীর প্রেম এবং ভাইসি-ভার্সা। এখনও হনিমুনই চলছে। সন্তান এলেই প্রেম, স্বামী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বাৎসল্যরসে পর্যবসিত

হয়। অধিক সন্তান হলে তো ল্যাজে-গোবরে হয়ে সব রসকষই চলে যায়। সন্তানের মা-বাবা হওয়াটাই বিবাহিত জীবনের একমাত্র উৎকর্ষতা নয়। এ ছাড়াও, বিবাহিত জীবনের পূর্ণতার নানা উপায় আছে, পথ আছে। বলে, বড়দি।

অবশ্য এ কথা অরা স্বীকার করে যে বড়দির বয়স এখন বাহান্ন হলেও সন্তানধারণের ক্ষমতা চলে গেলেও, বড়দি শরীরে এখনও প্রায় যুবতীই আছে। এখনও কী দারুণ বাঁধন শরীরের। আর মনে তো বটেই! যখন ওরা 'কোরবা'তে ছিল তখন এক পাঞ্জাবি হ্যান্ডসাম মাইনিং এঞ্জিনিয়র বড়দির প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করে। বড়দির কোনো ইনভলভ্‌মেন্ট ছিল কিনা জানে না। না-থাকারই কথা। তবে বড়োজামাইবাবু ভারি উদার মনের যথার্থ প্রেমিক মানুষ। বড়ো জামাইবাবু বলেন, সে মানুষ আবার মানুষ নাকি, যে তার প্রেম একজনকে দিয়েই নিঃস্ব হয়ে যায়? প্রেম তো আর দুধেল গাই নয়, যে শহরের গোয়ালাদের যে খাটালের মধ্যে খোঁটা পুঁতে সেই সীমানার মধ্যেই তাকে আজীবন বেঁধে রেখে জাবরকাটাতে হবে।

বড়দিদিও অসাধারণ মহিলা। তিনি হয়তো ভালোবাসেননি সেই চুগ সাহেবকে। কিন্তু একজন অবিবাহিত, সুদর্শন, পঞ্চনদীর তীরের তরুণ যদি বড়দির রূপে গুণে ভুলে এবং তাঁকে জীবনে আদৌ পাবে না জেনে আত্মহত্যা করে তবে কোনো না কোনো রকমের দুঃখ তো বড়দিকে পেতে হযেইছে!

সে হারিয়ে গেলেও যে প্রেমিককে কিছু দেওয়া যায়, তার জন্যে দুঃখের রকমটা অন্য, সে হারিয়ে গেলেও। আর যে কিছুমাত্র না পেয়েও পৃথিবী থেকেই সরিয়ে নেয় নিজেকে তার জন্যে মন তো সবসময়ে কাঁদেই।

সেই চুগ সাহেবের মৃত্যুদিনে বড়দি আর জামাইবাবু প্রতিবছর 'কোরবা'তে সেই গাছের কাছে যান। গাছটির কাছে যান যে গাছে ঝুলে চুগসাহেব আত্মহত্যা করেছিলেন। কয়েকজনে মিলে গানবাজনা করেন। ধূপ-ধুনো দেন। শরীরের প্রেমে ক্লেশ থাকে, গ্লানি থাকে, অশরীরী প্রেমই তো প্রেম।

চুগসাহেব ওপরে চলে গিয়ে দিদিকে যেমন করে কাঁদিয়ে গেছেন তা অন্য কেউই পারবে না।

অরার বড়ো জামাইবাবুর নাম মদন। চেহারা কথাবার্তাও তেমনই। এই বয়সেও তাঁর হাসিখুসি, রসিক, সংগীত ও সাহিত্যপ্রিয়তার কারণে অনেক তরুণীও তাঁর প্রেমে পড়বেন। অন্য মেয়ে হলে রাগ করত হয়তো কিন্তু বড়দি, এই কারণে গর্বিতই হয়। প্ল্যান্ট লাইফে একেই বলে "অ্যাকুয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিকস"। আনারসের বনে কলাগাছ পুঁতে দিলে কলাগাছের পাতাও কিছুদিন পরে আনারসের পাতার মতন হয়ে যেতে পারে।

বড়দিও নতুন আনারস হয়ে গেছে।

নানা এলোমেলো ভাবনা ভাবছিল একা বসে বসে অরা। কলকাতার নিয়তব্যস্ততা এবং সতত তোলপাড় করা উচ্চগ্রামের শব্দের আবর্তের মধ্যে বসে এমন নিরবচ্ছিন্ন ভাবনা ভাবার অবকাশই হয় না কখনও! আজ ট্রেন থেকে নামার পর থেকেই ভারি ভালো লাগছে। নিজের ভিতরে যে একটা কম্পাস ছিল ছেলেবেলায়, যে কম্পাসটা জীবনের দিকনির্দেশ করত, বলে দিত, কোনদিকে যাচ্ছে ও এবং ওর কোনদিকে যাওয়া উচিত, জীবনের গন্তব্যের পথে ভুলভ্রান্তি হলে যা তখন তাকে শুধরে দিত, সেই কম্পাসটাই হারিয়ে গেছিল যেন। আসলে কম্পাসটা যে আদৌ কোনোদিন ছিল সেই কথাটা পর্যন্ত ভুলতে বসেছিল পুরোপুরি। বিলাসপুরে এসে সেই কম্পাসের বিলাসটা যেন ফিরে পেয়েছে হারিয়ে-যাওয়া প্রিয় গয়নারই মতন। আসলে এই ভিতরের কম্পাসটা হয়তো নিছক বিলাসমাত্রই নয়, সেটা প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের, মানুষের মতন বেঁচে থাকার জন্যে, এই কম্পাস একটা অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন। অবলম্বন। নিজের মধ্যে নিজে আবার নিভৃতে নিঃশব্দে নিভৃতে ফিরে আসতে পেরে ভারি ভালো লাগছে অরার। ভারি, ভারি ভালো।

এমন সময়ে কার যেন পায়ের শব্দ পেল বারান্দাতে। কেউ ভেতর থেকে বাইরে এল।

কলকাতাতে বাইরে থেকে কে ভেতরে এল এবং ভেতর থেকে কে বাইরে এল তা বুঝি বোঝা পর্যন্ত যায় না! আজকাল বড়ো অপ্রয়োজনীর কর্ণভেদী শব্দ সেখানে। মনের ভেতর-বাইরের বেলা তো বোঝা যায়ই না। মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে একটু গাছ, একটু পাখি, একটু আলস্য, একটু নিভৃত অবকাশের যে বড়োই দরকার এই কথাটা বম্বে-দিল্লি-কলকাতার মানুষেরা বোধহয় ভুলেই যাচ্ছে। আর যতই ভুলছে, ততই অমানুষ হয়ে উঠছে।

টেলিফোনটা বাজল সেই সময়েই। বনবাসাই, মনে হয়, গিয়ে ধরল।

কথা বলছিল ও চাপা স্বরে। কিন্তু ওই শব্দহীন নিস্তব্ধ পরিবেশে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল তা।

বনবাসা ফিরে এসে বলল, দাশ মেমসাহেবকি তবিয়ৎভি গড়বড়া গিয়া হ্যায়। লগতা কি, উনকি ভি হার্ট-আটাক হুয়া হ্যায়। মেমসাবকি দের হোগী লওটনেমে। কাফি দের হোগী। কিঁউ কি, হুইয়েপর অউর আওরত কহি হ্যায় নেহী। কলকাত্তাসে রিস্তেদারোঁ লোগভি আ নেহি পঁহুছা আভ্‌ভিতক।

তাই?

অরা বলল।

শুনো দিদি। বনবাসা বলল, সামোসা, মেমসাব নিজের হাতে কালই গড়ে, ফ্রিজে রেখে গেছেন। কড়াইশুঁটির কচুরিও। পাটিসাপটাও করে রেখেছেন। ভাজব কি এখন, সামোসা আব কচুরি?

এসব তো শীতকালের খাবার। এখন ওসব?

অবাক হয়ে বলল অরা।

বনবাসা বলল, আপনি খেতে ভালোবাসেন, তাই।

তাই?

আবারও অবাক হয়ে খুশিতে ভরে গেল অরার মন। মা-বাবা নেই। বড়দির মতো আর কে জানে! কী ও ভালোবাসে আর না বাসে!

কি দিদি?

বনবাসা আবারও বলল।

না, না। একদম না। এই তো কত কী খেয়ে উঠলাম। এত কি খাই নাকি কলকাতাতে? না, এই সময়ে খাই?

তা কি হবে! বনবাসা বলল, দুই বোনে এতদিন পরে দেখা।

ঠিকই তাই।

গল্প করতে করতে যে, সময়ের খেয়ালই রইল না। এমনই তো হবার কথা।

তোমরা ক' বোন?

অরা জিজ্ঞেস করল বনবাসাকে।

হঠাৎই বনাবাসার মুখটা কালো হয়ে গেল।

বনবাসার বয়স হবে প্রায় অরারই মতন।

বনবাসা বলল দু বোন।

তোমার বোন কোথায় থাকে?

এখানেই।

মানে? এই বাড়িতে?

এই বাড়িতেই থাকত আগে। মেমসাহেবের কাজটাজও করত। আমার কোয়ার্টারেই থাকত।

বুঝেছি। বিয়ে হবার পর চলে গেছে। তাই তো?

বনবাসা মাথা নাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ।

এখন কোথায় থাকে তাহলে? 'এখানে' বললে যে।

মানে, থাকে বিলাসপুরেই। সারকাণ্ডা বলে একটা পাড়া আছে, সেখানে। যেখানে অনেক বাঙালিবাবুরাও থাকেন।

বাঙালিধাবুরা আর কোন পাড়াতে থাকেন? বিলাসপুরে?

ওঃ। সেতো অনেক পাড়ায়। টিকরাপাড়া, দীপরাপাড়া, আরও কত পাড়া। রেলকলোনি। সেই সব পাড়া ছাড়া অন্য জায়গাতে, যেমন এই এস. ই. সি. এল.-এর দুটি কলোনিতেও অনেকেই থাকেন।

তা তোমার বর কোথায় থাকে? এখানেই?

বনবাসা হাসল।

বেলা ততক্ষণে পড়ে এসেছিল। চাঁপাফুলের মতন রং হয়েছিল পশ্চিমী রোদের। বনবাসার হাসিটির রং তেমনই ম্লান হলুদ দেখাল।

বনবাসার গায়ের রং ধবধবে ফরসা।

বনবাসা বলল, আমার বোনেরই সঙ্গে থাকে আমার স্বামী। আমার স্বামী তাকে নিয়ে নিয়েছে।

তাই?

একটা ধাক্কা খেল অরা। দুঃখ পেল খুব।

তুমি আবার বিয়ে করো না কেন?

হুট করে আর বিয়েটিয়ের ঝামেলাতে যাব না ঠিক করেছি দিদি। এই পুরুষের জাতে দুরকমের পুরুষ হয়। এক দল ভেড়া আর অন্য দল শুয়োর। তাছাড়া, বিয়ে করার মতন সোজা কাজ আর কী আছে? ওতো পাঁচমিনিটেই করা যায়। মালা-বদলেই।

তোমার অভিমান আছে তোমার স্বামীর উপরে? তাই না?

অভিমান? আমার? না, না। কোনও অভিমানই নেই। দোষ তো আমারই। ও যে শুয়োর, তা আমার বোঝা উচিত ছিল বিয়ের আগেই।

একটু চুপ করে থেকে বলল ও, তবে আমাকে এই মুহূর্তে বিয়ে করতে চায় কমপক্ষে একশো জওয়ান। কিন্তু বিয়ে আমি করব না।

অরা ভাবল, বনবাসাও কি তসলিমা নাসরিন-এর বই পড়েছে?

তারপর বলল, তোমাকে যে তোমার বর ছেড়ে গেছে এ জন্যে লজ্জা হয় না? সমাজে সমালোচনা হয় না?

লজ্জা? আমার লজ্জা? আমরা তোমাদের মতন নই। আমাদের সমাজও নয়। ভাগ্যিস এই সব সামান্য কারণে জীবনের আনন্দ নষ্ট করি না আমরা। বিয়ে করলে, কালই করতে পারি। কিন্তু করব না।

তারপর বনবাসা অরাকে বলল, আপনারও তো বিয়ে হয়নি। তাই না দিদি? অথচ বিয়ের বয়স তো হয়েছে।

না।

কেন? হয়নি কেন?

আমাদের সমাজে বিয়ে হয় না বনবাসা। আমরা বিয়ে করি। অনেক বাছবিচার, অনেক পছন্দ-অপছন্দের পরই তা করি। আমাকে এখনও কারো পছন্দ হয়নি। আমারও হয়নি কারোকে। হয়নি বলব না ঠিক। মানে, ব্যাপারটা...

তেমন তো আমাদের সমাজেও। এই ছত্তিশগড় থেকে তোমরা অনেক কিছুই শিখতে পারো। অনেকে বলে, আমরা নাকি পিছিয়ে-পড়া। কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবন তোমাদের থেকে অনেকই এগিয়ে আছে।

বনবাসা বলল।

বুঝেছি।

অরা বলল।

বনবাসা বলল, আমারই মতন তোমার যাকে পছন্দ হয় তার তোমাকে হয় না, আবার তোমাকে যার পছন্দ হয় তোমার তাকে হয় না। তাই না?

বনবাসার মধ্যে একধরনের সহজাত বুদ্ধি ও সপ্রতিভতা আছে যা অনেক বি. এ., এম. এ মেয়ের মধ্যে দেখেনি অরা। এই সব মেয়ে শিক্ষার সুযোগ পেলে জীবনে কত বড়ো হতে পারত।

ভাবল ও।

মুখে বলল, ঠিকই বলেছ।

বিয়েটিয়ে খুব সাবধানেই করবেন দিদি। করতেই যে হবে, তারও কোনো মানে নেই। আমি তো বেশ আছি। সাহেব ব্যাংকে আমার নামে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন। আমার সব মাইনে তাতেই জমা হয়। হাতখরচের টাকা মেমসাহেবই দেন উপরি। খাওয়া, শাড়ি-টাড়ি, শীতের গরম পোশাক এসবও তো মেমসাহেবই দেন। আমার সাড়ে সাত হাজার টাকা ব্যাংকে জমে গেছে। জানেন? স্বামী থাকলে তো আমার টাকাতে মদ খেত। এই টাকা, আমার জমতো থোড়ি। তাছাড়া আমি আবারও বিবাহযোগ্যা বলে, বড়োলোক পাত্রী হিসেবে আমাদের সমাজে আমার দামও বেড়ে গেছে। কত ড্রাইভার, বেয়ারা, কুক টেরি বাগিয়ে জিনস পরে ডান হাতে স্টেনলেস স্টিলের বালা পরে এসে আমার কাছে ঘুরঘুর করে। আমি পাত্তাও দিই না। অবিবাহিত বড়োলোক মেয়ের যা গুমোর দিদি তা অবিবাহিত বড়োলোক পুরুষেরাও ভাবতে পারে না। অবশ্য বড়োলোক কথাটার মানে এক এক সমাজে এক একরকম। বিয়ে মানেই তো বন্ধন। ছেলে-মেয়ে, কান্নাকাটি। নিজের জীবনের সব মজাই বরবাদ। তাও তারা বড়ো হয়ে পায়ে দাঁড়িয়ে যদি আমাদের দেখত! আগেকার দিনে দেখত, এখন কোথায় দেখে?

বলেই বলল, কষ্ট হয় ছোটোবোনটার জন্যে। আমার চেয়ে সাতবছরের ছোটো। যখন ওকে নিয়ে আমার বর পাগলু ভাগল, তখন ওর বয়স ছিল মাত্র পনেরো। বেচারি! সংসারের আর পুরুষ জাতের কিই বা জানত তখন? আমার মরদটা, পুরুষের মধ্যে জাতে শুয়োর ছিল। ও গেছে, বেঁচেছি আমি। কষ্ট শুধু আমার বোনটাকে নষ্ট করল বলে। শুধু বোনটাকেই নয়, আমার সঙ্গে আমার বোনের সম্পর্কটাও নষ্ট করল বলে খুবই খারাপ লাগে।

অরা ভাবছিল, কষ্ট কার নেই? কিন্তু সরল, চলিতার্থে অশিক্ষিত, গ্রামীণ বনবাসা যত সহজে সদ্যপরিচিতকে তার কষ্টর কথা বলে হালকা হতে পারে, তেমন তো অরা পারে না! তাছাড়া, অরার কষ্টটা অনেকই জটিল। অনেকই বক্রতা দোষে দুষ্ট। অরার কষ্টর কথা বনবাসাকে বললেও বনবাসা বুঝবে না। এখনও মাঝে মাঝেই আভাসের কথা মনে পড়ে ওর। বিয়ে করবে, প্রায় ঠিকঠাকই সব; এমন সময়ে মল্লিকা এল আভাসের জীবনে।

মল্লিকা বড়োলোকের একমাত্র মেয়ে। ইংরেজি-মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করা। নিজে সাদা মারুতি চালিয়ে বেড়ায়। আভাস, ভেসে গেল ওর বাহ্যিক রূপে, জাঁকজমকে, চাকচিক্যে, দুর্মূল্য বেড-ডোর পারফ্যুমের সুগন্ধে। সত্যি ছেলেগুলো সব ছাগল! ভেসে গেল না বলে, বলা ভালো যে; ফেঁসে গেল। কিন্তু ছ মাসের মধ্যেই মল্লিকা যেমন হঠাৎ-স্রোতে এসেছিল তেমনই হঠাৎ-স্রোতে আবার চলে গেল বিয়ান্দকর-এর সঙ্গে।

আভাস মাথা নিচু করে ফিরেও এসেছিল অরার কাছে। কিন্তু অরা দেখা পর্যন্ত করেনি। দিনের পর দিন ফোন করেছে আভাস বাড়িতে। কিন্তু তবুও কথা বলেনি। বিশ্বাস, তারের বাজনারই মতন। একবার বাঁধা সুর নড়ে গেলে, তার ঢিলে হয়ে গেলে; নতুন করে সুর না বাঁধলে তা আর সুরে বাজে না।

বনবাসা বলল, চা তো খাবেন দিদি? চা করি?

অরা বলল, তোমায় করতে হবে না। অল্প করে চায়ের পাতা ভিজিয়ে চা দুধ চিনি সব আলাদা করে নিয়ে এসো।

এমন সময়ে টেলিফোনটা আবার বাজল। বনবাসা বসবার ঘরে ফোনটা ধরে বারান্দাতে এসে বলল, দিদি, আপনার ফোন।

আমার? কে করেছে?

মেমসাব। আপনাকে চাইছেন।

একা বসে থাকতে খুবই ভালো লাগছিল ওর। তবুও, বড়দির ফোন তাই গিয়ে ফোনটা ধরল।

বড়দি ফিশফিশে গলাতে বলল, রাগ করিস না। কর্তব্য তো আগে করার। যে ছেলেটি তোকে স্টেশনে আনতে গেছিল সেই তোকে কম্পানি দেবে। এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখাবে।

এমাঃ। সে কি! তুমি? তুমি কখন আসবে? তাছাড়া একদিন তুমি বিপদে পড়ে আটকে গেছ তো কী হয়েছে? আমি তো বেশ আছি একা। বনবাসা আছে হাতের কাছে। নির্জনতা এনজয় করছি থরোলি। আমি তো স্কুলের মেয়ে নই বড়দি যে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অচেনা-অজানা কাউকে পাঠাতে হবে? আমি চা খেয়ে বরং নিজেই একটু হেঁটে-হেঁটে ঘুরে আসব।

ছুটকি। কথা শোন। কিছুই তো চিনিস না এখানের। একা-একা কোথায় ঘুরতে যাবি? তাছাড়া, অচেনাই একদিন চেনা হয়; অজানা, জানা। ছেলেটি আমাদের খুবই কাছের। ওর সঙ্গে তোর জামাইবাবুর সম্পর্কটা ঠিক 'বস' আর 'সাবর্ডিনেট'-এর তো নয়! হলে, তোকে আনতে ওকে কখনওই পাঠাতাম না আমি স্টেশনে। তুই যে থাকবিই মোটে ক'দিন। এদিকে, তোর জামাইবাবুর তো ফেরারই কোনো ঠিক নেই। তুই তখনও এসে পৌঁছোসনি। আজ ভোরেই ফোন করেছিল। তোকে বলিনি, তোর মন খারাপ হবে বলে। সেখানের খনিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাছাড়া কেন্দা কলিয়ারির দুর্ঘটনার জন্যে দিল্লি থেকে সেফটি-অডিটের টিম এসেছে কোল ইন্ডিয়ার সব ইউনিটে। তাই নিয়েও সকলে ব্যস্ত তো বটেই, উৎকণ্ঠিতও। কিছু-একটা খুঁত ধরা পড়লে তোর জামাইবাবুর তো বটেই, সি. এম.ডি-রও চাকরি যাবে। মিস্টার দাশের আত্মীয়স্বজনেরা এখনও এসে পৌঁছোননি। এদিকে মিসেস দাশের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। একটি দশ বছরের মেয়ে। একমাত্র সন্তান। আমার তো এই অবস্থা। কথা বাড়াস না আর। তাকে বলে দিয়েছি, সে চলেও গেছে।

কাকে?

বিরক্তির গলাতে বলল অরা।

আরে! যে তোকে স্টেশন থেকে নিয়ে এল। বেড়াতে ইচ্ছে না করে তো ওর সঙ্গে গল্প করিস।

তুমি যে কী কর না দিদি!

আরও বিরক্ত হয়ে বলল অরা।

আমার একা থাকতেই ভালো লাগে। যার-তার সঙ্গে গল্প করতে একটুও ভালো লাগে না। সঙ্গে বই এনেছি অনেক, ইংরিজি ও বাংলা, পড়তাম। আমাকে না জিজ্ঞেস করেই তাকে বলে দিলে তুমি! আমার সত্যিই ভালো লাগে না এসব। আমি কি দশ বছরের খুকি নাকি? মিসেস দাশের মেয়ের মতন?

স্মৃতি কথা না বাড়িয়ে, রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

বুঝলেন যে, সদ্য এম. এ. পাস-করা যে-অরাকে পাঁচ বছর আগে কলকাতাতে দেখে এসেছিলেন এ অরা সেই অরা নয়। অনেকই বদলে গেছে সে। জেদি, কিছুটা একরোখা এবং অবাধ্যও হয়ে গেছে। দোষ অবশ্য তাঁরই। বছরে অন্তত একবার কলকাতাতে গেলে এমনটি হত না। প্রতি বছরই ছুটিতে স্বামীর সঙ্গে জব্বলপুরেই যান দেওরেরা, ভাসুর এবং তাঁদের কাজিনেরাও সব ভাই-ই বিভিন্ন জায়গা থেকে জড়ো হন সেখানে গিয়ে। বাড়িতে পুজো হয়। শাশুড়ি এখনও

আছেন তাই যেতেই হয়। ওঁদের শ্বশুরবাড়ি এখনও সর্বার্থেই যৌথ পরিবার। এমনকী প্রবাসেও দেখা যায় না। শাশুড়িই সর্বময়ী কর্ত্রী। কিন্তু তাঁর মতন ন্যায়পরায়ণা মহিলা কমই দেখেছেন স্মৃতি। এই বাৎসরিক সম্মিলনীতে আনন্দ করতেই যান। শুষ্ক কর্তব্যের খাতিরে নয়। তাছাড়া, যেসব আরামে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বাইরে বাইরে থেকে; গাড়ি, ড্রাইভার, মালি, রান্নার লোক, আলাদা শোবার ঘর, গিজার সে সবেরই অভাব আছে কলকাতায়। তাছাড়া নিজের পরিবারে মা-বাবা চলে যাবার পর থেকেই ভাইয়েরাও আলাদা হয়ে গেছে। কলকাতার বাহ্যিক রূপ তো বদলেছেই তাঁর কাছে, অভ্যন্তরীণ রূপটাও বদলে গেছে পুরোপুরি। সে কারণেও কলকাতা যেতে আর ইচ্ছেই করে না। সেই শেষবার গেছিলেন পাঁচ বছর আগে। তার স্মৃতি মধুর নয়। আর যাওয়ার ইচ্ছেও নেই।

অরা, বড়দার সঙ্গেই থাকে। বড়োবউদিকে কোনোদিনই স্মৃতির পছন্দ নয়। অতি সাধারণ, হাভাতে, অশিক্ষিত ঘরের মেয়ে। বি. এ., এম. এ. পাস করলেই শিক্ষিত হয় না কেউ। তার নজরটা বড়দার সঙ্গে এতদিন ঘর করেও একটুও বড়ো হল না। বড়দার সঙ্গে ব্যবহারও সে মোটেই ভালো করে না।

ওদের এক ছেলে, এক মেয়ে, তাদের ব্যবহারও তাঁর আদৌ পছন্দ হয় না। অত্যন্ত অসভ্য। দুর্বিনীত। অরা নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট করেই থাকে বড়দা-বউদিদের সঙ্গে। অথচ মেজদা-ছোড়দার এমন অবস্থা নেই যে, ওকে রাখে। বাড়তি একটি ঘরও নেই। অরা অবশ্য বড়দার বাড়িতে খরচ দিয়েই থাকে তার নিজের সম্মানের কারণে। যেহেতু সচ্ছলের সংসার তাই খরচ হয়তো একা থাকার চেয়ে অনেক বেশিই পড়ে।

এদিকে অরাটাও বিয়ে করছে না। এখনও এদেশে কমপক্ষে আরও কুড়িটা বছর মেয়েদের পক্ষে বিয়েটা একটা অবশ্যকরণীয় ব্যাপার। অবিবাহিত বা একলা মেয়েদের এখানে অনেকই অসুবিধে। বিপদ। তা, যে যাই বলুন। কিন্তু ওঁর তো কিছু করার নেই। এত মানুষ থাকতে পরদেশিয়াকেই বেছে বেছে অরার সঙ্গ দান বা স্টেশনে আনতে পাঠানোর পেছনে যে অন্য কোনো ভাবনা কাজ করেনি স্মৃতির মনে, এমনও নয়। তা করবেই বা না কেন? মা নেই, বড়বউদির মাথাব্যথাও নেই। ওদের নিজেদের সংসার দেখতেই হিমশিম খেতে হয়। আর বড়োবউদি তো রোজগেরে ননদকে ছাড়তে চানই না। এই সংসারে সকলেই যার যার স্বার্থ দেখে। হয়তো এটা দোষের নয়। তবে কখনও কখনও দোষের বলে মনে হয়। তাই, বড়ো দিদি হয়ে উনি যদি কিছুমাত্রই না করেন ছোটো বোনের জন্যে তবে কেই বা করবে? মেজো বোন যতি। স্টেটস-এই থাকে। দু-তিন বছরে একবার আসে। গাড়ি বাড়ি এবং ইউরোপের বা অন্যত্র-কাটানো হলিডের পাঁজাপাঁজা ছবি নিয়ে। ওরা যদি অরাকে একবার নিয়ে যেত তবে কত এলিজিবল ব্যাচেলরের সঙ্গে আলাপ হতে পারত তার। পছন্দ হত নিশ্চয়ই কারোকে না কারোকে। তা ওরা এমনই 'চিপ্পু' যে একবারও অরাকে নিয়ে গেল কই? শুধু নিজেদের বাড়ি আর গাড়ির গল্প, নিজেদের ছবি, নিজেদের ছেলেমেয়েদের ছবি, নিজেদের ওই বড়লোকির আনন্দেই মশগুল থাকে। কিছু প্রেজেন্টস নিয়ে আসে অবশ্য, যখনই আসে। এই করেই ওদের কর্তব্য সাঙ্গ করে। স্মৃতি নিজেই টিকিট কেটে অরাকে পাঠাতে পারতেন কিন্তু যাদের কাছে পাঠাবেন তারা যদি মুখ ফুটে একবারও না বলে, তাহলে পাঠানই বা কী করে! অরার জন্যে সত্যিই চিন্তিত স্মৃতি। বয়স রোজই বাড়ছে। চাকরিতে ওর অনেকই উন্নতি হয়েছে। কিন্তু বিয়েটাও জরুরি।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে এইসবই ভাবছিলেন মিসেস দাশ-এর মেয়ে মুন্নিব মাথাতে হাত রেখে বসে। এমন সময়ে মুন্নির তিনজন বন্ধু এবং তাঁদের মায়েরা এসে উপস্থিত হওয়াতে মুন্নি ওদের সঙ্গে সহজ হল। মিসেস চ্যাটার্জি আর মিসেস শ্রীবাস্তব বললেন ওঁকে চলে যেতে। ওঁরাও জানেন যে ওঁর ছোটো বোন আজই এসেছে কলকাতা থেকে এবং মিস্টার সেনগুপ্ত বিলাসপুরে নেই। তাছাড়া নতুন এবং পুরোনো কলোনি জুড়েই একটা প্রচণ্ড টেনশন চলছে। কেন্দা

কলিয়ারিতে চল্লিশ   মানুষ মারা গেছেন। তাতে সকলেরই ঘুম চলে গেছে। প্রত্যেক এরিয়ার জি. এম.-দের, সি. এম. ডি. বলে দিয়েছেন সেফটি-মেজার্স রিভিউ করতে। তাছাড়া, দিল্লি থেকে অডিট টিমও এসে গেছে। পান থেকে চুন খসলেই কার মাথাতে কখন যে খাঁড়ার ঘা পড়বে তা কেউই বলতে পারেন না। সেই টেনশন ছড়িয়ে গেছে মহিলাদের মধ্যেও।

সাম্প্রতিক অতীত থেকে, এই দেশে, প্রকৃত দোষী, যদি কেউ দোষী হয়ে থাকে; ছাড় পেয়ে যায়। শাস্তি এখন পেতে হয় SCAPEGOAT-দেরই। টেনশন সে কারণেই।

অরার স্বভাব এরকমই। যা করতে ওর ইচ্ছে করে না তা ওর করতে হলে ও ভীষণ অসভ্য অভদ্র হয়ে যায়। কোনোরকম কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

একবার ভাবল বনবাসাকে বলে যে, সেই বাবু এলে বলে দিতে যে তার শরীর খারাপ। সে শুয়ে আছে। দেখা করতে পারবে না।

মনে মনে এই ভেবেই সে বসবার ঘর ছেড়ে ভিতরে গেল। বনবাসাকে ডেকে পরামর্শ করতে যেতেই বনবাসা তীব্র আপত্তি করে বলল, পরুসাব-এর মতন ভালো সাব এই কলোনিতে নেই। কত মেয়ের বাবারা, জামাইবাবুরা যে পরুসাবের সঙ্গে মেয়ের আর শালির বিয়ে দিতে চান তা এখানের সকলেই জানে। সবদিক দিয়ে ভালো অমন সাব-এর সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া, বনবাসা বলল, দিদি! আপনি তো কদিন পরে চলেই যাবেন কিন্তু সাব-মেমসাব পরুসাবকে মুখ দেখাবেন কী করে? সাব তো প্রায়ই ট্যুরে যান। তখন পরুসাবই তো সব কিছু সামলে নেন। মেমসাহেবের কতো খিদমতগারি করেন।

অরা মনে মনে বলল, দিদির অতই পীরিত তো নিজে বিয়ে করলেই পারে। আমার পেছনে এমন করে কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার কী মানে হয়? আমি কি ছেলেদের সঙ্গে মিশি না, না আমার কৃপাপ্রার্থী কম আছে কলকাতাতে? পুরুষদের সম্বন্ধে ওর মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে। যদিও সেটা বনবাসার মতন সরলীকৃত ধারণা নয়। গাধা এবং শুয়োর ছাড়াও পুরুষদের মধ্যে আরও অনেক জাত আছে। যেমন হনুমান, কুকুর, হুলো-বেড়াল, মেনি ইত্যাদি।

এই মুহূর্তে পুরুষ জাতের শ্রেণীবিভাগের সময় নষ্ট না করে অরা গা ধুতে যাবে বলে মনস্থ করল। বনবাসার পরুসাব এবং দিদির 'ব্লু-আইড বয়' যদি আসেনই তবে এই ক্রাশড শাড়িতে তার সামনে যাওয়া যাবে না। যত্ত আপদ! বাথরুমে যাওয়ার সময়ে বনবাসাকে বলে গেল, তার পরুসাব এলে, যেন তাকে বসায়।

বাথরুমের লাগোয়া ড্রেসিংরুম। কার্পেট পাতা। মস্ত ড্রেসিং টেবল। তার উপরে বিরাট আয়না। স্যাটকেসটা খুলে, কোন শাড়ি পরবে তা ঠিক করতে বেশ একটু সময় লাগল অরার। নিজের সম্বন্ধে ভীত হয়ে পড়ল, এখানে আসা অবধি এই প্রথমবার। স্টেশন থেকে আসার সময়েই বুঝেছিল যে বনবাসার পরুসাব সম্বন্ধে ওর মনে বিশেষ একধরনের অনুভূতি হচ্ছে। শরীরেও। সেই কারণেই ওর ভীতি। ঠিক এই ধরনের পুরুষমানুষ ও আগে দেখেনি। দেখেনি বলেই ভয়। দেবতার মধ্যে থেকে অথবা বাঘের মধ্যে থেকেও কখন যে দৈত্য এবং হায়না দাঁত বের করবে তাও ওর জানা নেই।

কিন্তু অবাক হয়ে গেল যখন হালকা-বেগনি রঙা কোটা শাড়িটা ও বের করল স্যুটকেস থেকে। সঙ্গে ফিকে বেগনি রঙা ব্লাউজ। বের করেই, গা ধুতে গেল। গা ধুতে ধুতে ঈষদোষ্ণ জলে সাবানের ফেনা আর বুদ্‌বুদে গা ভরে দিয়ে শাওয়ারের নিচে শাওয়ার-ক্যাপ পরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, ওর শরীরে দারুণ এক সুখানুভূতি হল। এমনটা আর হয়নি কখনওই আগে। তারপর বড়ো তোয়ালে দিয়ে গা মুছে যখন ও ড্রেসিংরুমের প্রায় দেওয়াল-জোড়া আয়নার সামনে নিরাবরণ হয়ে দাঁড়িয়ে, তার পুরো শরীরের প্রতিবিম্ব দেখল সেই আয়নাতে, তখন নিজের শরীরে নিজেরই চুমু খেতে ইচ্ছে করল। ওর সম্পূর্ণতাতে ও যে এমন সুন্দর তা এর আগে কখনও জানেনি। কারণ, না কোনো বেডরুমে, না ড্রেসিংরুমে এমন নিভৃতে দেওয়াল জোড়া আয়নাতে নিজেকে দেখার সুযোগ হয়েছে ওর আগে। কলকাতাতে তো বাথরুম থেকে শায়াটা বুকের উপরে বেঁধে কোনোক্রমে দৌড়ে এসে নিজের ঘরে ঢোকে। তাতেও বড়দার বড়ো ছেলে পল্টু ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে। হাঁসের বাচ্চা যেমন ডিম ফেটে বেরিয়েই সাঁতার কাটতে শুরু করে, পুরুষের পুরুষ সন্তানরাও তেমনি জন্মের পর থেকেই নারীর শরীর যে তাদের ভোজ্যবস্তু এ কথা জেনে যায়। মাসি-পিসিও তাদের তালিকাতে থাকতে পারে।

তারপর অরা ভাবল, নিজেকে নিজে চুমু খাওয়া যায় না, যেমন নিজেকে নিজে লাথি মারাও যায় না, এবং সেই জন্যেই পরিপূরক হিসেবে, একা নারী বা পুরুষের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্যে অন্য একজন পুরুষ বা নারীর প্রয়োজন হয়ই! এটাই বোধহয় বিধাতার ইচ্ছা ছিল। আদম-এর ইভকে দরকার হয়ই, ইভ-এরও আদমকে।

খুব ভালো করে সাজছে যখন, নিজের প্রসাধিত মুখটিকে যখন দীপশিখার মতন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে নিজের চোখে, তখনই বাইরে একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। আওয়াজে বোঝা গেল যে গাড়িটা এসে বাংলোর গেটের সামনেই দাঁড়াল। বাথরুমটা থেকে গেটটা বেশি দূরে নয়। কোনো মোটরগাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে এবং দরজা খোলা এবং দরজা বন্ধ করার আওয়াজের সঙ্গে যে নিজের শরীর মনের সব দরজা জানালা রিমোট-কন্ট্রোল সুইচে এমন করে খুলে যাবে বা যেতে পারে, তা অরার ধারণা ছিল না। সে তৈরি। কিন্তু ড্রেসিংরুমের দরজা খুলে বেরোতে ভারি ভয় করতে লাগল।

ড্রেসিংরুম থেকে বেডরুমে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও কিছুক্ষণ।

শুনতে পেল, বনবাসার সঙ্গে তার পরুসাব-এর কথোপকথন।

ক্যারে বনবাসা? তু হ্যায় ক্যায়সি?

বহত আচ্ছা হ্যায় সাব। আপ বৈঠিয়ে। দিদি আ রহি হ্যায়।

মেমসাবনে ফোন কি থী? না?

জি সাব।

হুঁ।

চায়ে লাউঁ?

নেহি নেহি! আভ্‌ভি কুছ নেহি। ফিক্কর মত করো। তুমহারি দিদি হ্যায় কাঁহা? হামারি আওয়াজ মিলতেহি ছুপ গ্যায়ি কেয়া?

বনবাসা হাসল।

বলল, আপকি আওয়াজ শুনকর তো সবহি দৌড়কে আতি হ্যায়, ছুপেগি কাহে?

তো!

ম্যায় যাকর দেখতি হ্যায়, নাহানা হোগ্যায়ি ক্যা?

বনবাসা, আফটার অল, কাজের মেয়ে। তার সঙ্গে এমন রসিকতা করাটা অরার পছন্দ হল না। বাজে লোক একটা ওভার-কনফিডেন্ট। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, দাঁড়াও! তোমার

ওভার-কনফিডেন্সের বেলুন আমি ফুটো করে দেব। আমার বড়দিদিতে আর আমাতে অনেকই তফাত আছে। আমি হলে, বড়ো জামাইবাবুকে বিয়েই করতাম না। যত বড়ো বিলেতফেরত মাইনিং-এঞ্জিনিয়রই হন না কেন! আমি একজন 'টোটাল মানুষ'কে বিয়ে করব। মানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে 'পূর্ণ মানুষ'। সবদিক দিয়ে যে 'পূর্ণ পুরুষ'। আংশিক বা partial পুরুষে আমার রুচি নেই। তার চেয়ে আজীবন কুমারী থাকব তাও ভালো।

বনবাসা ঘরে ঢুকে বলল, পরুসাব আ গ্যায়া। আইয়ে দিদি।

অরা বলল, তুমি যাও, আমি আসছি।

শোবার ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ডানচোখের কোনা থেকে কাজল একটু মুছে নিল। ধেবড়ে গেছিল। শাড়ির পাড়ে গোড়ালি দিয়ে চাপ দিয়ে পেছনে শাড়িটা একটু নামিয়ে দিল। উঁচু হয়েছিল সামান্য। তারপর, পর্দা সরিয়ে বারান্দাতে আসতেই সেই পুরুষ চেয়ার ছেড়ে একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আবার এলাম জ্বালাতে। যদিও স্বেচ্ছাতে নয়, আদেশে।

মানুষটা ভদ্রতা জানে। মেয়েদের সম্মান জানাতে জানে।

ভালো লাগল অরার।

বলল, বসুন।

আপনি বসুন আগে।

অরা বসল। তারপরে বসল সেই পুরুষ।

অরা বেশ অপ্রতিভ বোধ করছিল মানুষটির সামনে, অথচ সপ্রতিভ বলে তার পরিচিত মহলে বিশেষ খ্যাতি আছে। সবকিছুই আপেক্ষিক।

ভাবল অরা।

তারপর বলল, আপনার নামটাই কিন্তু এখনও জানা হয়নি।

তাই? বউদি এখনও বলেননি বুঝি? হয়তো বলাটা প্রয়োজন মনে করেননি। নাম থাকাটা আমার মতন মানুষের আদৌ প্রয়োজন আছে বলেও হয়তো মনে করেননি।

দিদির কথা দিদিই জানবে। নামটা কী আপনার?

আমার নাম পুরুষ। বলতে পারেন, আমি একজন চিরন্তন পুরুষ।

বাক্যটা শুনেই চমকে উঠল অরা। বুকের মধ্যে চমক লাগল। সব মেয়েই তো যুগে যুগে এই চিবন্তন পুরুষকেই প্রার্থনা করেছে।

তারপর ভাবল, ভারি ভালো কথা বলেন তো ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ চুপ করেও থাকতে হল। বাক্যটির অভাবনীয়তায়।

বলল, আমি কি তবে আপনাকে চিরন্তন বলে ডাকতে পারি?

হাসল, বনবাসার পরুসাব।

বলল, তাও বলতে পারেন। আমার আপত্তি নেই। তবে দাদু আমার নাম রেখেছিলেন পরদেশিয়া।

পরদেশিয়া?

অবাক হয়ে অরা বলল, এরকম উদ্ভট নাম কেন?

বাবা মারা যাওয়ার পরে মা বিলাসপুরে চলে আসেন দাদুর কাছে। দাদু রেলে কাজ করতেন। বিমল মিত্র, সাহিত্যিককেও উনি চিনতেন। আমি এখানেই জন্মাই। মা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বাবার মৃত্যুর সময়ে। তাই দাদু নাম রাখেন পরদেশিয়া।

অদ্ভুত নাম তো।

অদ্ভুত কেন? ছত্তিশগড়িয়াই তো হচ্ছি আমি। তাই ছত্তিশগড়িয়ার নাম। তবে পোশাকি নাম হচ্ছে অর্ণব। মানে, অফিসের নাম।

অর্ণব মানে জানেন?

আমার সেটা না জানলেও চলত। কারণ সে নামটাও আমি নিজে রাখিনি। অর্ণব, মানে, সমুদ্রকে আমি একটুও পছন্দ করি না। নিজে রাখলে, ও নাম রাখতাম না।

কেন? পছন্দ নয় কেন?

সমুদ্র তো একই আধারে থাকে চিরটাকাল, হয়তো চেষ্টাও নেই তার। কূল ছাপিয়ে যাবার। কোনো ক্ষমতা বা ইচ্ছেই নেই।

অরা বলল। চিরটা কাল থাকে না মোটেই। যখন সে কূল ছাপাবে বলে মনস্থ করে তখন সবকিছুকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কূল ছাপায় না বলে মঙ্গল সকলেরই।

তা ঠিক। তবে, সেই 'চিরটা কালের' যে কালে তার বিস্তৃতি বা সংকোচন ঘটে তার পরিমাপের সঙ্গে মানুষের জীবনের পরিমাপের কোনো তুলনা তো চলে না।

বলেই বলল, সামনে যে এই প্রাচীন সেগুন গাছটা দেখলেন, এর বয়স কত জানেন? তার নিচে যে বড়ো কালো গোলাকৃতি পাথরের টিপিটা, তার বয়স? গাছটার বয়স দশজন মানুষের জীবনের সমান। আর পাথরটার বয়স কমপক্ষে হাজারজন মানুষের জীবনের সমান। সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে সমুদ্রকে প্রায় স্ট্যাটিকই বলা চলে। তার বয়স বাড়া বা কমা, লক্ষণবাহিত নয়।

তবে কী নাম রাখতেন আপনি? নিজের নাম রাখলে?

নদের নামে নাম রাখতাম। ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, তিস্তা, তোরসা। প্রমত্ততার সঙ্গে সবকিছুকে তীব্রবেগে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রেমিক যেমন প্রেমিকার বুকে আছড়ে পড়ে, তেমন করে সমুদ্রেব বুকে গিয়ে আছড়ে পড়তাম।

বাঃ।

ওর কথার ধরনে মুগ্ধ হয়ে, অজানিতেই বলে ফেলল অরা।

নিজেকে ও বেঁধে রাখবে ভেবেছিল। পরদেশিয়ার চেহারা দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল আগেই। এখন কথা শুনে মুগ্ধ হচ্ছে। মুগ্ধতারও কত বৈচিত্র্য হয়! ভয় করতে লাগল ওর। ভয়মিশ্রিত কৌতূহলেব সঙ্গে চেয়ে রইল পরদেশিয়ার দিকে।

আপনার নাম তো অরা। তাই না?

হ্যাঁ।

অরা! বাংলাতে কি অরা বলে কোনো শব্দ আছে?

বোধহয় নেই।

একটি অর্থহীন নাম বয়ে বেড়াচ্ছেন? বেড়াবেন আজীবন? কী দুর্ভাগ্য আপনার!

ইংরেজিতে তো মানে হয়। AURA।

হ্যাঁ তা হয়। তবে বাঙালি মেয়ের এমন নাম! একটু কষ্টকল্পিত।

তা কেন? বাবার এক কলিগের ছেলে এবং মেয়ের নাম ছিল ফ্লোরা এবং ফনা।

মানে?

অবাক হয়ে পরদেশিয়া বলল।

হ্যাঁ। FLORA এবং FAUNA।

অরা বলল।

এবারে হেসে ফেলল পরদেশিয়া।

বলল, এত ঠনাঠনদাসের মতন নাম হল।

ঠনাঠনদাস মানে?

সেই গল্প জানেন না? একজনের নাম ছিল ঠনাঠনদাস। বাবা-মা এমন বিচ্ছিরি নাম রেখেছেন,

সেই দুঃখে সে বেচারি একদিন নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করবে বলে সংকল্প করে গাঁয়ের বাড়ি থেকে বেরোল। কিন্তু কিছুদুর গিয়েই মধ্যে দেখল, জীর্ণ পোশাক পরে এক দীনদরিদ্র বৃদ্ধ মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলের মধ্যের ভোঁর ঘাসের বনে ঘাস কাটছে।

ঠনাঠনদাস শুধোল, তোমার নাম কী গো বুড়ো?

বুড়ো বলল, ধনপত।

অবাক হয়ে গেল ঠনাঠনদাস।

যার নাম ধনপতি কুবের, ধনপত; তারই এই হাল?

তারপর আরও কিছুদূর এগোবার পর দেখতে পেল জঙ্গলের পথের একটি চৌমাথাতে ছেঁড়া শাড়ি পরে একটি মেয়ে চার ভাগা মাছ নিয়ে বসে আছে। পাহাড়ি নদীর 'পাড়হেন' মাছ। তার শাড়ির এমনই অবস্থা যে, লজ্জা নিবারণ করাই মুশকিল। ঠনাঠনদাস শুধোল, তোমার নাম কী গো দিদি?

সে বলল, লছমী। অর্থাৎ, লক্ষ্মী।

আরেকটু এগোতেই দেখল, একজন মানুষ মরে গেছে। তাকে খাটিয়াতে শুইয়ে রাখা হয়েছে চাদর ঢেকে। তার বিধবা উচ্চৈস্বরে বিলাপ করছে। কয়েকজন লোক সেই খাটিয়া ঘিরে আছে। একটু পরেই 'রাম নাম সত হ্যায়' বলতে বলতে তাকে নিয়ে আড়পা নদীর শ্মশানে যাবে। ঠনাঠনদাস শুধোল, যে মানুষটা মারা গেছে, তা নামটা কী ছিল?

তারা বলল, অমরনাথ।

হায়! হায়! ভাবল, ঠনাঠনদাস।

তারপর সে আত্মহত্যার চিন্তা ত্যাগ করে একটি চৌপদী বলতে বলতে, গাঁয়ে ফিরে গেল।

কী চৌপদী?

অরা জিজ্ঞেস করল পরদেশিয়াকে।

পরদেশিয়া বলল,

'অমরনাথ জো, সো মর গ্যায়ে হ্যায়
ধনপত কাটতে হ্যায় ঘাস,
লছমী জো সো মছলি বিকতি হ্যায়
ভালাই ঠনাঠনদাস'।

হিহি করে হেসে উঠল অরা।

হেসে উঠেই, ওর মনে হল; এমন নির্দোষ আনন্দের অমলিন প্রাণখোলা হাসি সে বহুদিন হাসেনি। আশ্চর্য।

পরদেশিয়া গলা তুলে ডাকল, বনবাসা। আরে ও বনবাসা। কাঁহা গেইলি রে?

আই সাব।

আরে আই সাব কি! টেনিস খেলে এলাম দু ঘণ্টা, দম বেরিয়ে গেছে। কিছু খাবারটাবার তো দিবি, না কি তোর মেমসাব আমাকে ভুখা পেটে তাঁর বোনের খিতমদগারির ডিউটিতে লাগিয়ে গেল!

বনবাসা বলল, খাবার নিয়েই যাচ্ছি। আমার কি চোখ নেই? আপনি যে খেলার পোশাকেই এসেছেন, তা তো দেখেইছি।

খেলার পোশাকেই এসেছিল বটে তবে অরা ভালো করে লক্ষ্য করেনি। এবারে দেখল। সাদা ট্রাউজার। এটা পরে খেলেনি নিশ্চয়ই। শর্টসটা চেঞ্জ করে এসেছে মহিলার কাছে আসার আগে। সাদা গেঞ্জি, ফ্রেড-পেরির; তার উপরে ফ্রেড-পেরির হাফহাতা সোয়েটার। বুকে একটা হালকা নীলের 'ভি'। পায়ে বাটার টেনিসশু। ডান হাতে গাঢ় নীল রিস্ট-ব্যান্ড। খেলে এসেছে বলেই

সোয়েটারটা পরে আছে। এখন একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আছে বটে তবে সোয়েটার পরার মতো ঠান্ডা নেই। রাতে হয়তো পড়বে। পরদেশিয়ার দিকে চেয়েছিল অরা একদৃষ্টে।

আস্তে আস্তে ভালো-লাগা বাড়ছে ওর। শীতার্ত হয়ে আগুনের পাশে বসে থাকলে যেমন বাড়ে।

কী দেখছেন? এরকম জানোয়ার কলকাতার চিড়িয়াখানাতে বুঝি কখনও দেখেননি।

তা নয়। তারপর বলল, ম্যাচে হারলেন না জিতলেন?

'ম্যাচে' নয় 'সেটে'। এবং সাত-দুইয়েতে। প্রায় হ্যান্ডস-ডাউনই বলতে পারেন। সেভেন-জিরো হলে খুশি হতাম। শালা তিওয়ারির বড়ো বাড় বেড়েছিল।

শালা বলছেন কেন?

শালাকে কী বলে ডাকব? এই দু' অক্ষরের জবরদস্ত 'লব্‌জ'-এর মতো 'লব্‌জ' বাংলা ভাষায় কেন, কোনো বিদেশি ভাষাতেই নেই। শালা ইজ শালা!

তিওয়ারি কে?

সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। চিরিমিরিতে আছে।

চিরিমিরি? ভারি মজার নাম তো!

হ্যাঁ। ওখানের লাহিড়ি পরিবারকে মধ্যপ্রদেশের সকলেই চেনে। চিরমিরির নাম শোনেননি? বারেন্দ্রদের ডিপো।

তাই? ও হ্যাঁ। প্রমোদ লাহিড়ি কি ওই পরিবারের? উনি অনেকদিন বলেছিলেন একবার বেড়াতে নিয়ে যাবেন।

আপনি চেনেন নাকি প্রমোদ লাহিড়িকে?

চিনি মানে, আমার বন্ধুর জ্যাঠামশায়।

তাই?

এই টেনিস চ্যম্পিয়নশিপ কাদের মধ্যে হবে?

আমাদের সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর সমস্ত জোনের মধ্যে।

কতগুলো জোন আছে?

জোন তো আছে অনেকই। তবে এস. ই. সি. এল.-এরই মতো, ডবু. সি. এল., বি. সি. সি. এল., সি. এম. পি. ডি.এ., সি.সি.সি.এল. মহানদী, আরও কত জোন আছে। পশ্চিমবাংলাব আসানসোল-এ একজন সি. এম. ডি. আছেন ই. সি. সি. এল.-এর।

সি. এম. ডি.-টা কী জিনিস?

ওরে বাবা! তিনিই আমাদের দেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহশ্বের স্যান্ডউইচড ইনটু ওয়ান। 'সি. এম ডি.' মানে হচ্ছে চেয়ারম্যান-কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এক একটি কোম্পানিতে এক একজন সি এম.ডি.। সি. এম.ডি.-দের ওপরে কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান। তার উপরে সেক্রেটারি মাইনিং। তার ওপরে মন্ত্রী। এখন তো বাঙালি মন্ত্রী, অজিত পাঁজা।

তাই?

বনবাসা পাটিসাপটা আর কড়াইশুঁটির কচুরি নিয়ে এল।

পরদেশিয়া বলল, এ কিরে বনবাসা? মোটে দুটো করে? সব কি তোর দিদিকেই খাইয়ে দিলি? আমার খাতির ইজ্জত সবই জলে গেল? এই জন্যেই বলে, 'ব্লাড ইজ থিকার দ্যান ওয়াটার।'

ইংরেজিটা না বুঝেই বনবাসা হেসে বলল, ঠান্ডা হয়ে যাবে। শুরু করুন। গরম গরম ভেজে আনব। পাটিসাপটাও অনেক আছে। তারপরই বলল, দিদি কিন্তু একটাও খায়নি। আপনি যদি খাওয়াতে পারেন।

একটা পাটিসাপটা তুলে নিয়ে কামড় বসাতে যাচ্ছিল পরদেশিয়া। কথাটা শোনামাত্রই হাত নামিয়ে আনল। বলল, আপনি আগে খান। আপনি না খেলে, আমি খাব না।

এ কী?

অরা বলল। এ তো গায়ের জোরি।

যা বলেন তাই। কিন্তু সত্যিই খাব না।

খাওয়ার ব্যাপারে জোর করতে নেই। কোনো ব্যাপারেই জোর করাটা ঠিক নয়। ভদ্রতা নয়।

জোর করাটাই যে আমার স্বভাব। আমি যে নদ। নদী তো নই। জোর আমি করবই।

বাঃ রে!

বাঃ টাঃ বুঝি না। খান আগে।

নিরুপায় হয়ে অরা বলল, এ কিরকম জবরদস্তি।

জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে জবরদস্তি করাটা জরুরি। তাছাড়া, জবরদস্তি সহ্য করা এবং কবার মানুষ কারো জীবনেই কি খুব বেশি আসে?

পাটিসাপটাতে কামড় দিয়ে অরা পরদেশিয়ার চশমার মধ্যে দিয়ে তার ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখের গহনে নিজের চোখ ডুবুরির মতন নামিয়ে তার মনের কথা উঠিয়ে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। পরদেশিয়ার চোখের দৃষ্টিতে কোনোই তারতম্য নেই। যেমন সপ্রতিভ, উজ্জ্বলও তেমনই। ভাবালুতার রেশমাত্র নেই।

চোখ নামিয়ে নিল অরা।

তারপর বলল, হল তো! এবারে আপনি খান। তা আপনাদের সি. এম. ডি.-র হেডকোয়ার্টার্স কি এই বিলাসপুরেই?

হ্যাঁ। এই এরিয়ার মানে, সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের হেডকোয়ার্টার্স বিলাসপুরেই। এর অধীনে আছে অনেকগুলো জোন। সেই প্রত্যেকটি এরিয়াতে একজন করে জেনারাল ম্যানেজার আছেন। তাঁদের বলে, এরিয়া জেনারাল ম্যানেজার।

কতগুলো এরিয়া আছে?

দশটা।

কী নাম তাদের?

বাবাঃ। আপনি কি কলকাতার অডিট-টিমের মেম্বার নাকি? দিল্লির সেফটি অডিটের টিম নিয়েই সকলে ব্যতিব্যস্ত তার উপর...

বলেই হাসল, পরদেশিয়া। খেতে খেতে।

হাসিটা ভারি সুন্দর। টেনিস খেলে চুলগুলো এলোমেলো, বিস্রস্ত হয়ে গেছে। তাতে, তার পুরুষালি সৌন্দর্য আরও যেন বেড়েছে।

পরদেশিয়া বলল, কোরবা, চিরিমিরি, সোহাগপুর, জোহিল্লা, বৈকুণ্ঠপুর, গেভরা, হাসদেও, যমুনা, কডমা, কুসমুণ্ডা এবং রায়গড়। চারশো বর্গ কিমি জুড়ে আমাদের সি. এম. ডি.-র রাজত্ব।

সি. এম. ডি. কে এখন?

কুমারসাহেব। উপেন্দ্র কুমার।

পাঞ্জাবি? অবিবাহিত?

না, না বিহারের লোক, নর্থ বিহারের। দ্বারভাঙ্গা জেলাতে বাড়ি। তাছাড়া, কুমার মাত্রই কি অবিবাহিত হন? উনি বিবাহিত। চমৎকার ব্যালান্সড মানুষ।

তাই?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কথাই বলছেন বেশি, খাচ্ছেন কম।

কমই খাব। ভীষণ মোটা হয়ে যাচ্ছি।

সত্যি! মেয়েদের, বিশেষ করে বাঙালি মেয়েদের ফিগার বাতিক গেল না। ফিগার ভালো কি শুধু না খেয়ে হয়? এক্সারসাইজ করতে হয়। ভালো করে না খেলে জীবনে লড়াই করার জোর আসবে কোত্থেকে? মা হবেন কী করে? চলুন। কাল থেকে আমার সঙ্গে টেনিস খেলবেন।

মা যে সকলকে হতেই হবে তারই বা কী মানে আছে?

মা হতে ইচ্ছে করে না আপনার?

আগে ভবিষ্যৎ ঠিক হোক। বাবাই ঠিক হোক। তারপরে না মা হবার কথা!

সত্যি! আপনি। কথা বলাই মুশকিল আপনার সঙ্গে। বাবা তো যে-কেউই হতে পারে কিন্তু মা তো মা-ই।

তারপরই বলল, বলুন, খেলবেন কিনা টেনিস।

কখনও খেলিনি জীবনে।

জীবনে অনেককিছুই প্রথমবার করতে হয়। আপনি কি কোনো পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করেছেন? মনে হয়, করেননি। অথচ বিয়ে হলে করবেন। তাই 'জীবনে কখনও করিনি' এই এক্সপ্রেশনের মতন ভুল বা বোকা-বোকা এক্সপ্রেশন আর হয় না।

দু কান লাল হয়ে গেল অরার, গরম হয়ে গেল।

বলল, আপনি মেয়েদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয় জানেন না।

হয়তো জানি না। কারণ, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাটা আমার প্রি-অকুপেশন নয়। প্রেরোগাটিভ তো নয়ই! তাছাড়া দূষণীয় কী বলেছি এমন, তা তো বুঝলাম না। সঙ্গম তো কোনো মেয়ে একা একা করতে পারেন না। লজ্জা হোক, ঘেন্না হোক, ভয় হোক, যাই হোক; সঙ্গম করতে তো একজন পুরুষকে প্রয়োজন হয়ই! তাই প্রাপ্তবয়স্ক, শিক্ষিতা একজন মহিলার এই প্রসঙ্গে লজ্জিত হবার কী আছে আমি তো ভেবে পাই না। প্রসঙ্গই তো উঠিয়েছি মাত্র। আপনাকে তো আর আমার সঙ্গে সঙ্গম করতে বলিনি।

অরার কান তখনও ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

তারপর বলল, আপনি। সত্যি! সভ্য সমাজে অচল।

জানি। এবং ঠিক সে কারণেই সভ্য সমাজ আমি সযত্নে এড়িয়ে চলি।

তারপর পরদেশিয়া বলল, আপনি দেখছি আমার কথাতেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন। চা-টা আমিই আপনাকে করে দিচ্ছি। লিকার লাইট না কড়া? দুধ ক' চামচ? চিনি? দেখুন, কেমন চা করে আপনার রাগ জল করে দিই!

রাগের কী আছে! এমন করে কেউ কখনও বলেনি, তাই।

অরা বলল।

পরদেশিয়া মিত্র-র কোনো কিছুর মধ্যেই আপনি ভুলেও প্রিসিডেন্স খুঁজতে যাবেন না। আমি অরিজিনাল, একমাত্র; কারোরই অনুকরণ করি না আমি কোনো ব্যাপারেই, কেউ কেউ হয়তো আমার অনুকরণ করে থাকতে পারেন। শকডই হন আর প্লিজডই হন, আমার কথাতে বা কাজে, আমাকে অন্য কারও ছায়া বা অনুসরণকারী বলে কখনই ভুল করবে না অরা। ভুল করবে না। আমি আমিই। আমি 'কেউ' নই। যে কেউই তো নই-ই!

আপনি আমাকে প্রথম আলাপেই 'তুমি' বলছেন যে।

ইচ্ছে করছে। যে লোকগুলোকে আমি দেখতে পারি না, সে ছেলেই হোক কি মেয়ে; তাদেরই শুধু আমি 'আপনি' বলি। যাতে, সুযোগ বুঝে কাটিয়ে দেওয়া যায়। দাদুর কাছে শুনেছি, বিধান রায়েরও এই দোষ ছিল। উনি সকলকেই 'তুমি' করে বলতেন। একমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ ছাড়া। আসলে, ব্যাপারটা আত্মবিশ্বাসের। আমি, তুমি বললে তো সকলে খুশিই হয় দেখি। তুমিই প্রথম ব্যতিক্রম।

আপনি জোর করেই তুমি বলবেন?

বলব। কারণ, আমার জোর আছে।

গায়ের জোর?

গায়ের জোরটা আবার জোর নাকি? সে তো গুন্ডা-বদমাশ, হাতি-গন্ডার, বাঘেদেরও থাকে।

তবে কিসের জোর?

মনুষ্যত্বের জোর। আমার ব্যক্তিত্বের জোর। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পারো। তবে টিপিক্যাল বাঙালি মেয়েদের মতন দাদা বোলো না। আমি কারোরই দাদা নই। দাদা বলবে ভাইফোঁটা দেবে, জোর করে; তারপর চুমু খেতে চাইলে বলবে, ইশ দাদা! কী অসভ্য! তোমাদের ওসব ট্যাকটিক্স আমার জানা আছে। মেয়েরা যে-অনাত্মীয় পুরুষকে প্রেমের চোখে দেখে, তাকে কখনওই ভাইফোঁটা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করে না। যাদের কাটাতে চায়; তাদেরই দাদা পাতায়, ফোঁটা দেয়।

অরা ক্রমশই মানুষটার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ক্ষমতাতে, অরিজিনালিটিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল। মনে মনে প্রার্থনা করছিল, কখন বড়দি আসবে।

বনবাসা চা নিয়ে এল।

কথামতন পরদেশিয়া নিজেই প্রথমে অরাকে চা করে দিল, অরার নির্দেশ মতন।

তারপর কাপটা হাতে তুলে দিয়ে বলল, ফর আ চেঞ্জ, একজন পুরুষ একজন মহিলাকে চা করে দিল। ভারতীয় পুরুষদের অধিকাংশই জানোয়ার; ভদ্রলোক নয়।

হেসে ফেলল অরা, পরদেশিয়ার কথার ধরনে।

মুখে বলল, থ্যাংক ইউ। আশাকরি নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও এমন ব্যবহার করবেন।

স্ত্রী আগে হোক তারপরই দেখা যাবে।

থ্যাংক ইউ বলবে না। এই আরেক বিপদ। কোটি কোটি ভারতীয়রা তাদের চোখের ভাষা দিয়ে নিঃশব্দে থ্যাংক ইউ বলে। এই আমাদের ট্র্যাডিশন। মহান ট্র্যাডিশন। কতগুলো সাদা চামড়ার বানিয়াদের সবকিছুই নেবার প্রয়োজন যে নেই এই কথাটা শিক্ষিত মানুষেরাও যে কেন বোঝেন না, বুঝতে পারি না। এখন সব বাচ্চাই ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। তাদের শেখানো হয় : 'ভদ্রতা জানো না? আংকলকে 'থ্যাংক উ' বল। টা টা করে দাও'। আমার লজ্জা করে। তেতাল্লিশ বছর হল দেশটা স্বাধীন হল অথচ ন্যাশনাল ক্যারেকটার, ন্যাশনাল প্রাইড বলে কিছু মাত্রই গড়ে উঠল না। তোতাপাখির মতন ইংরেজি 'বুলি কপচানো' আর 'শিক্ষা' ব্যাপারটা সমার্থক হয়ে গেল। রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা ফেলে দিয়ে আমরা সেলসম্যানশিপকেই জীবনের একমেবাদ্বিতীয়ম অর্জিত জিনিস বলে মেনে নিলাম।

বলেই বলল, যাগগে যাক, কথা বলতে শুরু করলে, থামি না আমি। তাছাড়া, তুমি ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ, তোমাকে আনন্দ দেওয়াই আমার কর্তব্য।

আনন্দ কাকে বলে?

সে প্রসঙ্গ থাক। সে প্রসঙ্গে গেলে, আবারও অনেক কথা বলতে হবে।

স্টেশনে আজ সকালে যখন আনতে গেছিলেন তখন তো ভিজেবেড়ালটি হয়ে ছিলেন। মুখচোরা। মনে হচ্ছিল যে, ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানেন না। এখন তো সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি।

পরদেশিয়া হেসে বলল, আমার গুরু বলেছিলেন, প্রথমেই খাপ খুলতে হয় না। প্রথমে দেখে নিতে হয় জমি কেমন, যোদ্ধা কেমন; লড়াই করা ঠিক হবে কি না! তাই চুপ করে ছিলাম।

আপনার গুরুটি কে? তাছাড়া আপনি কি সকলের সঙ্গেই লড়াই করেন?

আমার মধ্যে কমপিটিটিভ স্পিরিটটা বড়োই প্রবল। যা কিছুই করি তাতে একজনও আমাকে হারিয়ে দিক তা আমি চাই না। মেনে নিতে পারি না। তাছাড়া, যাঁরা প্রকৃত মানুষ, তাঁরা সকলেই

জানেন লড়াইয়ের আরেক নামই তো জীবন। তাই বলতে পারো, করি। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ। লড়াই কতরকমের হয় তা কি তুমি জানো?

আমি ছেলেমানুষ?

তাই তো!

আপনার চেয়ে বড়োজোর তিন-চার বছরের ছোটো হব।

বয়স, বয়সে হয় না অরাদেবী।

তবে কিসে হয়?

বয়স হয় অভিজ্ঞতায়। আমার জন্মদিনের হিসেবে বয়স বেশি না হতে পারে, কিন্তু আসলে আমার বয়স দুশো সাতান্ন বছর।

জোরে হেসে উঠল অরা।

ও ভাবছিল, ভাগ্যিস এসেছিল বিলাসপুরে! আর ভাগ্যিস বড়দি বড়োজামাইবাবু পরদেশিয়ার কথা ভেবেছিলেন। পরদেশিয়া এখানে না থাকলে, যে কী হত। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল ও। পরক্ষণেই গভীর দুঃখে ওর মন শ্রাবণের দুপুরের মতো ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এল।

পরদেশিয়া প্রশ্ন করেছিল ওকে, আনন্দ মানে কী?

উত্তরে ও কিছুই বলেনি। কিন্তু অরা জানে যে, সমস্ত আনন্দেরই বুকের কোরকের মধ্যে দুঃখের বীজ সুপ্ত থাকেই। মানুষের প্রত্যেক আনন্দকেই মানুষখেকো বাঘেরই মতন অনুসরণ করে দুঃখ। আনন্দ-খেকো দুঃখ।

চা খাওয়া হয়ে গেলে, পরদেশিয়া বলল, ট্রেন থেকে নেমে সেই যে এসে বসেছ, বাড়ি থেকে বেরোওইনি আর?

নাঃ।

তবে তো বেড়ানো ভালোই হচ্ছে। চলো, অন্তত হেঁটে আসবে একটু।

বনবাসা চায়ের বাসন নিতে এসেছিল। যে বলল, হ্যাঁ দিদি। যান একটু ঘুরে আসুন। আমিই নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু বাড়িতে যে কেউই নেই। ফোন-টোন এলে ধরতে তো হবে। রাতে তুমি কী খাও দিদি? ভাত, না রুটি?

কিছুই খাব না রাতে। দুপুরে যা খাওয়া হয়েছে। তার পরে দুপুরের ঘুম। তারও উপরে, চায়ের সঙ্গে এতসব 'টা' খাওয়া হল। সত্যিই কিছু খাব না।

তা কি হয়। বনবাসা বলল। তারপর বলল, ঠিক আছে। যা বলবে, তাই করে দেওয়া যাবে পাঁচ মিনিটে। তাছাড়া রাতের খাওয়ার আগে মেমসাহেব তো এসেই পড়বেন।

চলো। একটা পাতলা কিছু নিয়ে নাও গরম। কলকাতার লোক। অভ্যেস তো নেই। হঠাৎ ঠান্ডা লেগে যাবে।

গরম? গরম যে কিছু আনিনি।

পরদেশিয়া বনবাসাকে বলল, বউদির কোনো গরম চাদরটাদর দে তো বনবাসা, তোর দিদিকে।

বনবাসা একটা বেগনি-রঙা লেডিজ চাদর এনে দিলে, পরদেশিয়া উঠল। তারপর, আগে আগে গিয়ে, গেট খুলে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে বলল, এসো।

গেট পেরুতে পেরুতে অরা ভাবল, মানুষটা ম্যানার্স জানে। মেয়েদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, জানে তা।

বাইরে একটা ছাই-রঙা অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে ছিল।

এটা আপনার গাড়ি?

হ্যাঁ। এটাকে বিদায় করে একটা মারুতি নেব। পেট্রলের যা দাম বাড়ল তাতে এদিকে-ওদিকে বেড়াতে যাওয়া এক সমস্যা হল। অথচ এখানে চারধারেই এত বেড়াবার জায়গা। অনেক সময়ে কাজেও যেতে হয়। তখন অবশ্য কোম্পানির গাড়িতেই যাই।

এখানে কাজের লোকজন, ড্রাইভার পাওয়া যায়? কলকাতাতে তো সকলেই কমপ্লেইন করেন।

পাওয়া যায়। তবে মাইনে দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। তবে ওয়ার্ক-কালচারটা এখানে আছে। ছত্তিশগড়িয়া মেয়ে-পুরুষ কেউই কাজকে হারাম বলে ভাবে না। পয়সা নেয় বটে তবে কাজও পুরো করে। কী কারখানা, কী বাড়িতে। আমাদের কোম্পানির গেস্ট হাউস বা অফিসে গেলেই একথার যাথার্থ্য বুঝতে পারবে। জমাদার, ঝাড়ুদার, বেয়ারা, পাহারাদার, মালি প্রত্যেকেই যে যার কাজ নিঃশব্দে করে। কারখানার শ্রমিকেরাও।

কলকাতাতেও যদি এরকমটি হত!

ভাবল অরা। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কলকাতায় কাজের সংস্কৃতি যে একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে, কী অফিসে, কী কারখানাতে; তা অরার মতন এবং কলকাতার বাঙালিদের মতো আর কেউই জানে না। জ্যোতিবাবু এবং তাঁর দল অমর রহে। তবে একদিন তাঁদের বিচার অবশ্যই হবে। কিন্তু কলকাতার নিন্দা করতেও যে বুকে বাজে। অরা যে বাঙালি!

ভারি সুন্দর কিন্তু আপনাদের কলোনিটি। এমন চমৎকার, চওড়া, ফাঁকা, পল্যুশান-ফ্রি রাস্তার কথা কলকাতাতে আজ চিন্তাও করা যায় না। এরকম রাস্তা পেলে, প্রতিদিন সকাল-বিকেল হাঁটতাম। তবে রাস্তার দু পাশে কিন্তু আরও অনেক বেশি গাছগাছালি লাগানো উচিত ছিল।

লাগানো হয়েছে। তবে, বড়ো হতে সময় নেবে। এই কলোনি খুব বেশিদিন হল হয়নি।

তাই?

এমন সময়ে পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল।

অরা দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনে তাকাল। বড়দি আসছে কি না দেখতে। তারপর দেখল, না। সাদা-রঙা নয়, কালো-রঙের অ্যামবাসাডর একটা। পরদেশিয়াও অরার দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাল।

গাড়িটা ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই হঠাৎ থেমে গেল। একজন বেঁটে মোটা ফরসা ভদ্রলোক গাড়ি থেকে মুখ বের করে বললেন, আরে মিত্রা। ক্যায়সে হ্যায় তুম? শাদি ভি কর লিয়া? কব কিয়া! কোই বাতায়াহি নেহি মুঝে! তুমভি দাওয়াত নেহি দি।

পরনাম স্যার! হাউ আর উ্য? কব আঁয়ে হেঁ?

আয়া তো আজহি সুব্বে। দামাদ হামারা ক্যায়সি কাম কর রহা হ্যায় মিত্রা? তুমহারি চার্জমে হ্যায় না?

জি স্যার। আচ্ছাহি কাম কর রহা হ্যায়। লাইক ফাদার-ইন-ল লাইক সান-ইন-ল।

নাম কেয়া হ্যায় ইনকি?

ভদ্রলোক অরার দিকে চেয়ে শুধোলেন।

অরা।

ক্যা?

অরা।

অরা? অজীব নাম হ্যায় ভাই। কোই আওরতকি অ্যায়সি নাম হোতি হ্যায়? সচমুচ অজীব হ্যায় তুম! আচ্ছা! মজেমে রহো। একরোজ আনা ঘর পর। ম্যায় তিনরোজ হ্যায় হিঁয়া।

আউঙ্গা স্যার।

বলে, নমস্কার করল পরদেশিয়া।

গাড়িটা চলে যেতেই, অরা ভীষণ চটে উঠে গাল লাল করে বলল, এটা কী হল?

কী?

আমি কি আপনার স্ত্রী?

তাই কি আমি বলেছি? প্রশ্নটার দুটো অংশ ছিল। প্রথমটার জবাব দিইনি। দ্বিতীয়টার দিয়েছি।

রায়সাহেবকে তোমার পুরো পরিচয় দিতে হলে অনেকই সময় লাগত এবং তুমি কে, তাও ওঁকে বলতে হত। উনি এখন যাচ্ছেন মহানদী ক্লাবে। পুরো ক্লাবই জেনে যেত যে, অরা-নাম্নী মহিলা কে? এবং কাকে আমি বিয়ে করেছি। আগামীকাল যদি কেউ আমাকে অফিসে জিজ্ঞেসও করে, তো বলব, দুসরাকা বিবি থা সাথমে। হামনে শাদি থোড়ি কিয়া!

কি জানি বাবা! আপনার মতন অদ্ভুত লোক আমি দেখিনি কখনও।

ভূত দেখে দেখেই যারা অভ্যস্ত অদ্ভুতে তারা অস্বস্তি বোধ করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া আমি কী বলেছি, না বলেছি তা কেউই বিশ্বাস করবে না। সকলেই আমাকে পাগল বলেই জানে।

পাগল?

ইয়েস ম্যাম। পাগল সেজে থাকার মতো সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ আর দুটি নেই। তুমি কি প্রমথনাথ বিশীর 'পাগলা গারদের কবিতা' পড়েছ?

না তো। সেটা কী?

প্রমথনাথ বিশীর মতো সেন্স অব হিউমার সম্পন্ন এবং ভালো লেখকের যতখানি কদর হওয়া উচিত ছিল, তেমন হল না মৃত্যুর পরেও, এটা দুঃখের কথা।

আপনি বাংলা পড়েন নাকি?

যে বাঙালি বাংলা সাহিত্যের খোঁজ না রাখেন, তাঁর শিক্ষার সব গুমোরই বৃথা। অনেক বাঙালি বিদ্বান-বুদ্ধিমানদেরই দেখি যে বলেন, 'বাংলায় কিসসুই লেখা হস্‌সে না, তা আবার পড়বটা কী?' 'যাচাই' না করেই 'বাতিল' করার এমন সহজ প্রবণতা শুধুমাত্র বাঙালি পণ্ডিতম্মন্যদের মধ্যেই দেখি। বাংলা কোনো বইই যাঁরা পড়েন না, তাঁদের বাংলা সাহিত্যের উপরে মন্তব্য করার অধিকাব কোত্থেকে আসে, তা কে জানে!

বাংলা, আজকাল দক্ষিণ কলকাতার উচ্চবিত্ত বাঙালিরাও পড়েন না। আর প্রবাসী বাঙালিদের দোষ দিয়ে কী লাভ?

তাঁদের কথা ছাড়ো। যাঁরা ট্যাঁস হয়ে গিয়ে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সংগীতের স্বাদ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়েই রইলেন, তাঁরা জীবনে কে কী হলেন, কত বড়ো তালেবর; তা নিয়ে আমার অন্তত কোনো মাথাব্যথা নেই! তাঁদের প্রতি আমার অনুকম্পা ছাড়া আর কিছুই নেই। তুমিও কি বাংলা পড়ো না, না কি?

পরদেশিয়া বলল, অরাকে।

পড়ি। পড়ি না তা নয়। কয়েকজন প্রিয় লেখকের বই পড়ি। অ্যাভারেজ বাঙালি সাহিত্যিকদেব শিক্ষা-দীক্ষা, মানসিকতা, বুদ্ধিমত্তার উচ্চতা সবই ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। আর তাঁদের সাহিত্যও তাই। সাহিত্য, লেখকের জীবনও মানসিকতারই প্রতিচ্ছবি। নয় কি?

বুদ্ধদেব গুহ-র লেখা পড়ো কি তুমি? পরদেশিয়া হঠাৎ বলল।

সেরকম পড়ি না। 'কোয়েলের কাছে' পড়েছি। যখন স্কুলে পড়তাম। আর 'হলুদ বসন্ত'।

সে তো প্রায় পঁচিশ বছর আগের লেখা। একজন লেখককে জানতে হলে তার সব বই-এর প্রতিই ঔৎসুক্য রাখতে হয়।

আপনি পড়েন?

কয়েকটি পড়েছি। সব পড়ে উঠতে পারিনি। বিমল মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, নরেন মিত্র, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্রর পরের প্রজন্মের বেশি লেখককে আমি পড়িনি। তবে একে একে আধুনিক লেখকদের প্রত্যেককেই শেষ করব। আমি খামচে-খামচে পড়াটা পছন্দ করি না। তাতে, না হয় লেখকের প্রতি ন্যায় করা; না নিজের প্রতি।

শেষ করবেন মানে?

উদ্বিগ্ন গলাতে শুধোল অরা।

মানে, নিজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে প্রত্যেকটি বই আনিয়ে রাখব, পড়ব, একটি একটি করে। কারণ যে-কোনো লেখকেরই বেশ কিছু বই না পড়ে তাঁর সম্বন্ধে কোনো ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এবং উচিতও নয়। কোনো লেখক ভালো না লিখলে, তাঁকে ভালো লেখক বলে মানতে রাজি নই আমি। এবং নিজে না পড়ে, অন্যের মুখে ঝাল খেতেও আদৌ রাজি নই।

আপনি সুমনের গান শুনেছেন? সুমন চ্যাটার্জির?

অরা বলল।

না।

না কেন?

বড়ো বেশি কম সময়ের মধ্যে ভদ্রলোককে নিয়ে যে রকম মাতামাতি হচ্ছে এবং ভদ্রলোক যেমন রাজনৈতিক ফয়দা ওঠাতে আরম্ভ করেছেন, তাতেই আমার ইন্টারেস্ট চলে গেছে। এই ধুলোর-ঝড় থেমে যাক। তারপরেই যদি লোকে সুমন-সুমন করেন তখনই শুনে দেখা যাবে। সকলেই যা করে, আমি তা করি না। কোনোদিনই করিনি। এবং নিজ কানে না শুনে, ভালো বা মন্দ কিছুই আমি বলতে রাজি নই। লেখক সম্বন্ধেও যে কথা, গায়ক সম্বন্ধেও একই কথা। তাছাড়া বাঙালি জাতের মতো আনস্টেবল-ইকুইলিব্রিআমের জাত আর পৃথিবীতে নেই। যাঁকে মাথায় তোলে, তাঁকে শিব বানায়, আর যাঁকে টেনে নামায়, তাঁকে বাঁদব বানায়। দোষে-গুণে মেশানো 'মানুষ' হিসেবে আমরা কারোকেই জানতে শিখিনি।

যাকগে। ওই ভদ্রলোক কে?

কোন ভদ্রলোক?

ওই যাঁর কাছে আমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন?

ওঃ হো। উনি রায়সাহেব।

রায়সাহেব? বাঙালি? উনি? মনে তো হল না।

বাঙালি কেন হতে যাবেন? উনি বিহারের মানুষ।

বিহারি আবার রায় হবেন কেন?

বিহারি হলেই কি বিহারিই হতে হবে এ কী কথা! রায় পদবি বাঙালি ছাড়াও বহু প্রদেশের মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। যেমন বিহারি এবং ওড়িয়া। পাঞ্জাবিদের মধ্যেও রায় আছে। বড়ো অফিসার ছিলেন উনি। আমার বস। কিন্তু ভারতের সরকারি এবং আধা-সরকারি অগণ্য প্রতিষ্ঠানে যে কিছু সংখ্যক সৎ অফিসার আছেন, তাঁদের মধ্যে একটা বড়ো অংশই চাকরির সমস্তটা জীবনই নেতিবাচক ছাড়া কোনো একটা 'পজিটিভ' সিদ্ধান্তই না-নেওয়াটাকেই যোগ্যতার পরম পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচনা করেন, মানে মানে গ্র্যাচুইটি নিয়ে রিটায়ার করে সুখে পেনশন ভোগ করার নিশ্চিত এবং নির্বিঘ্ন গন্তব্য পৌঁছেই মোক্ষ লাভ করেন। ওই রায়সাহেব সেই 'পতুপুতু প্রজাতির' একজন সদস্য। প্রাইভেট সেক্টর হলে, চাকরির প্রথম বছরেই তাঁর চাকরি যেত।

বলেই বলল, রায়সাহেবের প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে এল।

কী?

আমাদের এক কলিগ, চাকরিতে ঢুকেই একটি রিপোর্ট তৈরি করে বলল, রায়সাহেব আমার সি. সি. আর. লিখবেন, আমার বস; রিপোর্টটা একবার ওঁকে দেখিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে আনি।

আমরা পাঁচজন তখন এক ঘরেই বসতাম। চারজনই বললাম, দেখিয়ে কোনোই লাভ নেই।

তবুও সে নাছোড়াবান্দা। তখন একটা কাগজে কিছু লিখে, তা খামে বন্ধ করে খামটা তাকে দিয়ে আমার এক অন্য কলিগ বলল যে, রায়সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এসে খামটা খুলে পড়ো।

তারপর?

সে তো চলে গেল রায়সাহেবের ঘরে।

তারপর?

অরা বলল।

অরার খুব মজা লাগছিল। এই বিলাসপুরে এসে, একদিনের মধ্যেই পরদেশিয়ার মাধ্যমে ও এক সম্পূর্ণ নতুন জগতে ঢুকে পড়েছে যেন। ওর ছোটো পৃথিবীর পরিধিটা যেন ক্রমশই বড়ো হয়ে যাচ্ছে।

পরদেশিয়া বলল, তারপর আর কী? সে তো বেগুন-প্যাঁচা মুখ করে ফিরে এল।

আমরা সমস্বরে বললাম, কী হল? কী বললেন রায়সাহেব? অ্যাপ্রুভ করলেন আপনার রিপোর্ট?

সে বলল, ওই! আপনারা যা বলেছিলেন।

এবারে খামটা খুলুন। আমার কলিগ বলল।

বলতেই, তিনি খামটা খুললেন।

আমরা সমস্বরে বললাম, এবারে পড়ুন।

তিনি বিড়বিড় করে পড়ছিলেন। আমরা বললাম, জোরে জোরে পড়ুন।

এবারে তিনি জোরে জোরে পড়লেন।

'ভঁয়স কে আগে বীণ বজায়ে
ভঁয়স রহে পাগুরায়
রায়সে "রায়" মাঙ্গে যো জন
সো জন ধোখা খায়'।

মানে কী হল?

অরা বলল। হেসে।

মানে হল, মোষের সামনে গিয়ে যদি কেউ বীণা বাজায় তো মোষ যেমন জাবর কাটছিল, তেমনি জাবর কাটতেই থাকে। আর রায়সাহেবের কাছে যে ব্যক্তি 'রায়' চাইতে যায়; মানে, ডিসিশান বা মতামত নিতে যায়, সে ধোঁকাই খায়।

অরা হিহি করে হাসতে লাগল নির্জন পথের মধ্যে ফুলে ফুলে।

পরদেশিয়াও হাসতে লাগল ওর সঙ্গে। আবারও অরার মনে হল যে, বহুদিন, বহুবছর, এমন নির্দোষ আনন্দের উৎসারিত হাসি হাসেনি। এক দিনেই মনে হচ্ছে, ওর বয়স কমে যাচ্ছে। এত যে খেয়ে এল একটু আগে আবারও যেন খিদে খিদে পাচ্ছে।

হাসি থামলে, অরা বলল, এবার পাগলা গারদের কবিতা শোনান একটা, প্রমথনাথ বিশীর। বললেন যে, শোনাবেন।

হ্যাঁ একটাই মনে আছে। মানে, আবৃত্তি করতে পারি।

আহা! বলুনই না। গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে।

শোনা তবে :

'আমি ভজহরি ভঞ্জ
নিবাস আমার ময়ূরভঞ্জে
সেথা পড়ে রয় আমার মন যে
ঘুম চোখে দেখি
আরে একি একি
এ কোন নূতন গঞ্জ?

আঙ্গিনায় মোর সোনার খাঁচায়
বিমনা যে পাখি পুচ্ছ নাচায়
এক চড়ে আমি করে দিয়েছিনু
তারি এক ঠ্যাং খঞ্জ,
আমি. ভজহরি ভঞ্জ।'

আবারও হিহিহি করে হাসতে লাগল অরা, বেঁকে গিয়ে; পেটে হাত দিয়ে।

পরদেশিয়া, কপট রাগের সঙ্গে বলল, একি, পড়ে যাবে যে, রাস্তার মধ্যে!

রাতে খেতে বসে বড়দি বলল, দ্যাখ এজন্যেই বলে 'মিসফরচুন নেভার কামস এলোন'।

কেন একথা বলছ?

অরা বলল।

চুমকির খুব দেমাক ছিল। সকলেই বলত ওকথা। অবশ্য আমার সঙ্গে কখনও দেমাকি ব্যবহার করেনি। জানি না, তোর জামাইবাবুই চুমকির স্বামী মিস্টার দাশের বস ছিলেন বলে কি না। কিন্তু মিস্টার দাশের মৃত্যুতে চুমকি যে কেমন হয়ে গেছে, কী বলব। একেবারে ঝড়ে-পড়া, ডানাভাঙা পাখিরই মতন। ও-ও এখন বাঁচে কি না দেখ। শুনতে তো পাচ্ছি সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক। এত অল্পবয়সে হার্ট-অ্যাটাক হলে, তা নাকি ফ্যাটালই হবার সম্ভাবনা থাকে।

তোমাদের এখানে ভালো হাসপাতাল আছে?

নেই? বলিস কী? তোদের কলকাতার যে-কোনও হাসপাতাল থেকেই ভালো।

তারপর বলল, একটাই মেয়ে। এখনও ছোটোই আছে। দেরি করে বিয়ে। তার উপরে দেরি করে সন্তান এসেছে। বিয়েটিয়ে যদি করতেই হয়, তবে মাড়োয়ারি, বিহারিদের মতন তাড়াতাড়ি বিয়ে করার অনেকই সুফল। তোর মতলবটা কী? চাকরি করে কি দেশোদ্ধার করবি?

তা নয় বড়দি! তোমার বিয়ে হয়েছিল উনিশ বছর বয়সে। সে বয়সে বিয়ে নামক একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপারের মধ্যে চোখ-নাক বুজে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। আগে মেয়েরা সতী হত স্বামীর চিতাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এখনকার বিয়েটাও তেমনই! একরকমের আগুনে ঝাঁপানোই। ত্রিশ বছর বয়সে চোখ বেঁধে কান বন্ধ করে বিয়ে আর করা যায় না বড়দি। তাছাড়া, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একজনের বিয়ের পরে ইতিমধ্যেই ডিভোর্স হয়ে গেছে যে বিয়ে করতে সাহসই হয় না। সত্যিই সাহস হয় না। তাছাড়া এ কথাও সত্যি যে, বিয়ে করা যায় এমন পুরুষ একজনও চোখে পড়ল না এখনও। নিজের রুচি, নিজের মানসিকতা, নিজের মতামত, নিজের ইগো এত সব নিজস্ব ব্যাপার এসে বিয়ের পথ আগলে দাঁড়ায়, যে বিয়ে করতে বড়ো ভয় করে।

বড়দি বলল, এখনও নয়? জানি না বাবা তোদের ব্যাপার-স্যাপার। একজনকেও ভালো লাগল না?

বলেই, বলল, আর একটু মাছ নে। এখানের মাছ সব টাটকা। রুই কাতলা তো বটেই, কই, মাগুর, সিংগি, পাবদাও পাওয়া যায়। পশ্চিমবাংলা থেকে চারাপোনা এনে এখানে সে মাছ বড়ো করে তারপর আবার কলকাতাতেই চালান যায়। তোদের পশ্চিমবঙ্গে এখন কিছুই হয় না বলেই

শুনতে পাই। সেখানকার বাঙালিরা শুধু সারা ভারতবর্ষের সব পণ্যর মস্ত 'মার্কেট'। মাড়োয়ারিরাই নাকি মালিক হয়ে গেছে এখন তোদের কলকাতার?

সে কথা ঠিক বড়দি। কাজের সংস্কৃতি, ডিপিপ্লিন, সেন্স অব প্রাইড লস্ট হয়ে গেলে একটা জাতের আর বাকি থাকে কী? যা শোনা, তার অনেকটাই সত্যি। কিন্তু জামাইবাবু কী করছেন বলো তো? কোনো মানে হয়? ঠিক এই সময়েই এমন কাজ পড়ল?

কী করবে বল? ওদের কাজের রকমটাই এরকম। তবে তোর সঙ্গে ফোনে কথা বলবে রোজ। একটু পরেই ফোন করবে। আর কটা দিন থেকে যেতে পারতিস না কি?

অসম্ভব। নতুন চাকরি। বিয়ে-টিয়ে তো করা হল না। এখন চাকরিই একমাত্র ভবিষ্যৎ। চাকরি নিয়ে হেলাফেলা করতে পারে বড়োলোকের মেয়েরা আর বিবাহিত মেয়েরা।

জানি না বাবা! এত মেয়ের বিয়ে হয়, আর তোর মতন রূপ গুণের মেয়ের কেন বিয়ে হয় না বুঝি না। ছেলেগুলো কি কানা?

না, তারা কানা নয়; পদ্মলোচন। দোষ তাদের নয়। তারা তো আমার উপরে গুড়ের হাঁড়ির উপরে মাছির মতো থিকথিক করেই। কিন্তু নজরটা যে আমার বড়োই উঁচু। অরাও বিয়ে করতে পারে এমন ছেলে যে আজ অবধিও চোখে পড়ল না। ভালোই লাগল না কাউকে আজ অবধি।

কাউকেই নয়? এত গুমোর কি ভালো?

থাকার মধ্যে তো গুমোরটুকুই আছে দিদি! তাও ছাড়তে বলো? এই তো একমাত্র নিজস্ব নির্মাণ। গুমোরও ত্যাগ করলে বাঁচব কী নিয়ে? তবে কাউকেই যে ভালো লাগেনি আজ অবধি তা বলতে পারব না। তবে মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমার যাকে বা যাদের ভালো লাগল বড়দি, তাদের আমাকে ভালো লাগল না। ভালো হয়তো লাগল, বা লেগেছিল; কিন্তু বিয়ের কথা কেউই বলেনি। আর ছেলেরা না বললে কি 'আমি তোমাকে বিয়ে করব' এই কথা বলা যায় কারোকে! ছিঃ।

কী করলি? সারা বিকেল আর সন্ধে? তুই আর পরু? ক্লাবে গেছিলি?

তুমি যে কি বলো? সে কি আমার জামাইবাবু না বর যে, প্রথম দিন বিলাসপুরে পা দিয়েই একজন অপরিচিতর সঙ্গে হুট করে ক্লাবে চলে যাব? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

গেলে, কেউই কিছু মনে করত না। আমরা নিঃসন্তান। আর পরুরও বাবা-মা কেউই নেই। একমাত্র দাদা আছেন, তিনি থাকেন স্টেটস-এর বস্টনে। ভাই অন্তপ্রাণ। তিনিই ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। 'মানুষ' করেছেন। সত্যিই মানুষের মতন মানুষ করেছেন। সেই দাদা পরুর চেয়ে বয়সে অনেকই বড়ো। তোর সঙ্গে আমার যেরকম বয়সের তফাত ওর সঙ্গে ওর দাদারও সেরকমই। তবে, বিদেশে থাকেন তো! দেখে, বয়স বোঝা যায় না, অনেকই কম মনে হয়। দুবছরে একবার করে দেশে আসেন। দেশ বলতে, পরুর কাছেই। আমার আর তোর জামাইবাবুর জন্যে যে কত কী প্রেজেন্ট নিয়ে আসেন তা কী বলব! তিনিও বিয়ে করেননি। তাঁর ছোটো ভাইও তাঁর রাস্তাতেই হাঁটছে।

তাঁর ভাইয়ের 'কন্যার' অভাব কী? রাজকন্যাও পেতে পারেন।

কার কথা বলছিস?

মানে, তোমাদের নয়নমণি পরুর কথা। যে দেশে সুলক্ষণা মেয়েরা শোনপুরের হাটের গোরুব মতন গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে অনাদিকাল ধরে, কোনো পুরুষ এসে তাদের গলাতে মালা পরিয়ে সুধন্য করবে বলে; সেই দেশে তোমাদের পরুর কি বিয়ে করার মতন মেয়ের অভাব?

তা ঠিক। মেয়ের কোনোই অভাব নেই। এখানে এমন একটিও বাঙালি পরিবার নেই যারা পরুর মধ্যে একটি পোটেনশিয়াল জামাই না দেখে বা দেখেছে সকলেরই যে মেয়ে আছে, এমনও নয়। কারও বোন আছে, কারও শালি, কারও বোনের বন্ধু বা বন্ধুব বোন। পরুর মতন ইউনিভার্সালি ডিজায়ার্ড পাত্র এখানে আর একজনও নেই। সকলেই আকারে-ইঙ্গিতে, নানাভাবে

পরুকে বোঝায়। বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। যখন তাদের পাত্রীরা বিলাসপুরে আসে, বিশেষ করে তখন। কিন্তু এই সবে পরু আরও বিগড়ে গেছে। কারও বাড়িতেই আজকাল বিশেষ যেতে চায় না। ক্লাবে গেলেও টেনিস খেলেই চলে আসে।

কিন্তু বড়দি, আমিও তো জামাইবাবুর শালি। তুমি সব জেনেশুনে আমাকে তো বটেই, তোমাদেরও এমন করে অসম্মানিত করলে কেন? এর চেয়ে বড়ো অপমান একজন শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে আর কী হতে পারে?

আরে, তোর কথা আলাদা।

কেন? আলাদা কিসে?

অ্যালবামে তোর ছবি দেখে, ওই তো তোর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিল। আর বলেছিল, বিয়ে যদি কখনও করি বউদি, তবে তোমার মতো কাউকেই করব। তোমার বোনটোন কি নেই?

তুমি কী বলেছিলে? তার উত্তরে?

অরা বলল, খাওয়া থামিয়ে।

আমি কী বলব? তোর তো তখন আভাসের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার সব ঠিকই হয়ে গেছিল।

তো?

তো, আমি বলেছিলাম, আমার তো একটিই মাত্র বোন আছে, অবিবাহিত। ওই যার ছবি দেখলে তুমি। সবচেয়ে ছোটো। কিন্তু আমার চেয়ে সে অনেকই সুন্দরী, অনেকই অ্যাকমপ্লিশড। কিন্তু সে তো চুটিয়ে প্রেম করছে একজনের সঙ্গে। তার নাম আভাস। আই. এ. এস. ছেলে। এখন জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। খুব হ্যান্ডসাম দেখতে। অ্যানথ্রোপলজির ছাত্র ছিল। চমৎকার বাংলা ও ইংরেজি লেখে। দীপক রুদ্রর নাম শুনেছ? ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের? এখন ইউকো ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান? আভাস ছিল অনেক দিক দিয়েই দীপকেরই মতন; যদিও বয়সে অনেকই ছোটো। দীপু আমাদেরই সমবয়সি হবে। ভেরি হ্যান্ডসাম, ইংরেজি বাংলা দুইই দারুণ লেখে, ভালো গান গায়; 'চৌকশ' ছেলে যাকে বলে তারই কনসেপ্ট একেবারে। আভাসও তাই।

অরা একটুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল খেতে খেতে।

বলল, তা শুনে তোমাদের ব্লু-আইড বয় পরু কী বলল? অতসব না বললেও পারতে। আভাস জানতে পেলে কী ভাববে?

স্মৃতি বললেন, আমার কথা শুনে পরু হেসে বলল, আজ থেকে অ্যানথ্রোপলজির ছাত্র আর ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের সব আমলাদের আমার জানী-দুশমন বলেই জানব।

খেতে খেতে, খুব জোরে হেসে উঠল অরা।

বলল, বাবাঃ। ফোটো দেখেই এত প্রেম!

তারপর বলল, তুমি যা ভাবছ, তা নয় বড়দি। তোমাদের পরু অত্যন্ত ঘোড়েল ছেলে। আমি তো কোন ছার, বড়ো বড়ো জাঁবাজ মেয়েও তাকে খেলিয়ে তুলতে পারবে না। মুখে বঁড়শি নিয়ে ছিপ এবং হুইল সুদ্ধু তলিয়ে নিয়ে নাকানিচুবোনি খাওয়াবে তাকে অতি সহজেই তোমাদের পরু। অনেক ছেলে দেখেছি, এমনটি দেখিনি!

স্মৃতি একদৃষ্টে বোনের চোখে চেয়ে রইলেন। তার মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর সহোদরাটিও যে কিছু কম 'ঘোড়েল' নয়, তা বুঝলেন।

চামচে করে, একটু পুডিং তুলে নিয়ে স্মৃতি বললেন, কী জানি বাবা! কে কার ছিপ আর হুইল তলিয়ে নিয়ে যাবে তা তুইই জানিস। তবে, তোকে এটুকুই বলতে পারি আমি আর তোর জামাইবাবু পরুকে আমাদের ছেলের মতনই ভালোবাসি। একধরনের শ্রদ্ধাও করি। তোর জামাইবাবু তো বলেন, আমরা এই মাতৃপিতৃহীন ছেলেটিকে স্নেহ করতে পেরেছি যে, এটাই আমাদের সৌভাগ্য। মানে, ও যে আমাদের স্নেহের বাঁধনে ধরা দিয়েছে। ওকে তো সকলেই

ভালোবাসে। তাছাড়া, ওর মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যে ও একদিন সি. এম. ডি. তো বটেই কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হলেও আশ্চর্য হবার নয়। চৌধুরীসাহেবও সে কথাই বলেন।

চৌধুরীসাহেব কে?

সুভাষ চৌধুরী। এস. ই. সি. এল-এর চিফ অব করপোরেট ম্যানেজমেন্ট। টেকনিক্যাল সেক্রেটারি টু সি. এম. ডি.। উনি যে কতবছর ধরে বিভিন্ন সি. এম. ডি-র টেকনিক্যাল সেক্রেটারি আছেন তা বলার নয়। খুবই পণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী মানুষ। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তোর জামাইবাবু চৌধুরীসাহেবের প্রশংসাতে পঞ্চমুখ। আলাপ হলে দেখবি, তোরও ভালো লাগবে। চৌধুরীসাহেবের স্ত্রী মঞ্জু, এখানের মেয়েদের কলেজের লেকচারার।

কোন সাবজেক্টে?

ইকনমিক্সের। ওঁদের একটিই ছেলে। বছর বারো-তেরোর হবে। নাম বুলেট। সে আবার ইংরেজিতে গোয়েন্দা গল্প লেখে। ভালো গানও গায়। দেখিস, চৌধুরীসাহেবকে তোর খুবই ভালো লাগবে।

ও। এঁর কথাই তুমি চিঠিতে লিখেছিলে? তোমাকে যিনি এরিক বার্ন এর বই পড়িয়েছিলেন? ‘‘What do you say after you say hello!’’, ‘‘I am ok you are ok’’ এবং ‘‘Games people play?’’

হ্যাঁ। হ্যাঁ তবে তো জানিসই। তাঁর কথা তো তোকে লিখেইছি।

সত্যি! বইগুলো খুবই ভালো। আমিও এরিক বার্ন-এর বই আগে পড়িনি। তোমার চিঠি পাবার পরই জোগাড় করে পড়ি। দারুণ।

স্মৃতি বললেন, নে। এবারে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। জামাইবাবু নেই। তুই আমার সঙ্গেই শো না। আর সে থাকলেই বা কী? বহুবছর হল আমাদের সম্পর্ক তো ভাইবোনেরই।

তোমাদের তো এখন ভাই-বোনের সম্পর্ক। আমার বিবাহিত ছেলে এবং মেয়ে বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনি যে তাদের এখনই নাকি ভাইবোনের সম্পর্ক। কেরিয়ার, জব, প্রফেশান, অ্যাম্বিশন ‘এ সবের’ সঙ্গে নাকি ‘ওসব’ ‘যায় না’, লাল শাড়ির সঙ্গে যেমন নীল ব্লাউজ যায় না।

তাই? তোদের বয়সি ছেলে-মেয়ে? বলিস কী?

স্মৃতি বললেন।

তারপর বললেন, সত্যি! পৃথিবীটা অনেকই বদলে গেছে।

বদলানোই তো ভালো বড়দি।

বদলালেই যে তা ভালোরই জন্যে, তা তো জানা যাচ্ছে না এখনও। ভালোর জন্যেই হলে, আমার কোনো অভিযোগ নেই। থাকার কথাও নয়। তবে, শুধুমাত্র বদলের জন্যেই যদি বদলটা হয় তাহলে আমি তা ভালো বলে মানতে রাজি নই। চল, এবারে ওঠ। হাত ধুয়ে নে।

অরা বলল, কাল কখন বেরোবে? এখনই তো বেশ ঠান্ডা লাগছে। সকালে কি ঠান্ডা থাকবে?

এখানে আর কি ঠান্ডা! অমরকণ্টকে খুবই ঠান্ডা হবে। সাড়ে তিনহাজার ফিট উঁচু। তাছাড়া, গভীর জঙ্গলের মধ্যে নির্জন জায়গা বলে, ঠান্ডা থাকে সব সময়েই। মে মাসে লোকে হিলস্টেশনের মতন সেখানে চেঞ্জে যায়, যাদের ধর্মে-কর্মে মতি নেই তোর মতন। আর পুণ্যার্থীরা তো সবসময়েই যায়।

কটায় বেরোবে বলবে তো? সেই মতো অ্যালার্ম দেব।

অ্যালার্ম দিতে হবে না। বনবাসা চা দিয়ে তুলে দেবে। তাছাড়া তুই যখন তৈরি হবি তখনই বেরোব। তোর জন্যেই তো যাওয়া। পরুকে ফোন করলেই সে গাড়ি নিয়ে আসবে। এখানে ব্রেকফাস্ট করবে। ন-টা নাগাদ বেরুলেই হবে।

কতঘণ্টা লাগবে যেতে?

অতশত আমার মনে থাকে না। ও সব কাল পরুর কাছ থেকে জেনে নিস। একবারই গেছিলাম। তাও বছর পাঁচেক আগে।

তোমার স্টকে কি পরু ছাড়া, দ্বিতীয় কোনো এলিজিবল ব্যাচেলর নেই? দেখালে বটে বড়োদি! একাধিক থাকলে, নেড়েচেড়ে দেখা যেত।

থাকবে না কেন? তোকে ক্লাবে নিয়ে যাব একদিন। তোর জন্যে একেবারে স্বয়ংবর সভা বসিয়ে দেব। কিন্তু পরু, পরুই।

তুমি কি আমাকে এই জন্যেই এতবার করে আসতে লিখেছিলে বিলাসপুরে? যখন ফোন করলে পরপর তিনদিন তখনই বুঝেছিলাম যে কোনো চক্রান্ত করেছ। এটা কিন্তু আমার পক্ষে খুবই অসম্মানের। তুমি যে আমাকে এ জন্যেই এখানে আনিয়েছ, এমনকী তাকে আভাসের কথাও বলেছ এসব জানলে, আমি কখনই আসতাম না। আমি কারও দয়া করুণার ভিখারি নই। কাল সকালে আমি তোমাদের পরুর সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে মিশতেই পারব না। এসব কথা আমাকে যদি না জানাতে তাহলেই অনেক ভালো হত বড়দি। তোমরা আমার ভালো চাও তা জানি কিন্তু সেই ভালোটা যদি আমার অসম্মানের হাত ধরে আসে তবে সেটা কি তোমাদের পক্ষেও সম্মানের হবে? তুমিই বলো?

স্মৃতি হাত ধুতে ধুতে, গাঢ় গলায় বলল, অতশত ভাবিনি রে অরা। তাছাড়া, একটা কথা তোর জেনে রাখা উচিত, আমার এবং তোর বড়ো জামাইবাবুর অন্তরের কথা এটা। আমরা তোর ভালো তো চাই-ই কিন্তু হয়তো পরুর ভালোটা বেশি করে চাই। গত পাঁচ বছরে নিঃসন্তান আমাদের কাছে ও সন্তানেরও বেশি হয়ে গেছে। তোর জামাইবাবু বহুবার ওকে আমাদের সঙ্গে এসে এই বাংলোতেই থাকতেও বলেছেন পাকাপাকিভাবে। কিন্তু ওই রাজি হয়নি। বলেছে, কাছে সবসময়ে থাকলে ভালোবাসাটা কমে যাবে। আমার গুণটাই আপনাদের চোখে পড়েছে; দোষগুলো পড়েনি। সেগুলো সব প্রকট হয়ে উঠবে একসঙ্গে থাকলে।

অরা চুপ করে বেসিনের একপাশে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছিল।

স্মৃতি আবার বললেন, তাছাড়া একটা কথা ভুলে যাসনি অরা যে, তোর যেমন সম্মানবোধ আছে, পরুর সম্মানবোধও তোর চেয়ে কিছু কম নেই। ও 'পর' হয়েও নিজের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে শুধু আমাদেরই কথাতে তোর চাকরের ভূমিকাতে, খিদমতগারের ভূমিকাতে নেমেছে। কই? সে তো আমাদের কাছে তার সম্মানের প্রশ্ন তোলেনি একবারও? মিশলেই যে বিয়ে করতেই হবে এই শর্তে তো পরুকেও আমরা বাঁধতে পারি না। সে পর বলেই আরও পারি না। তা করলেই আমাদের সম্মানহানি হবে। সম্মানজ্ঞান থাকা ভালো কিন্তু সবসময়েই যারা সম্মান হারানোর ভয় করে, তাদের সম্মানজ্ঞানের রকমটা নিয়েই প্রশ্ন জাগে মনে।

আমি তা, মানে, আমি...

অরা কিছু বলতে গেল কিন্তু স্মৃতি মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, যাক, তুই যা বললি তাতে এটাই প্রাঞ্জল হল যে, প্রথম রাউন্ডেই আমাদের পরু তোকে হারিয়ে দিয়েছে। অমন মহৎ, সরল, রসিক; আত্মাভিমানহীন ছেলে সত্যিই কম দেখেছি এ জীবনে।

খাওয়াদাওয়ার পরেই দুই বোনে শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়িই।

সে রাতে অরা ঘুমের মধ্যে বারেবারেই পরুকে দেখল স্বপ্নে। পরু হাসছে, ওকে হাসাচ্ছে। আর রায়সাহেবকেও দেখল স্বপ্নে। 'কব শাদি কিয়া তুমনে মিত্রা? ইনকি নাম ক্যা হ্যায়? ইনকি নাম?'

জবাবে, পরু বলছে, অরা।

অরা। অরা। অরা।

সকালে উঠে চা-খাওয়ার পরে অরা বারান্দাতে বসেছিল। পায়ে মোজা, গায়ে চাদর দিয়ে। বেশ ঠান্ডা আছে। অথচ দুপুরে ঠান্ডা ছিল না। সন্ধের পরেই একটা হিম হিম ভাব আসে। সকালে তো রয়েছেই! উঠেছেও একটু দেরি করেই। কলকাতাতে তো সাড়ে-পাঁচটায় ওঠে। একটু যোগব্যায়াম করে। তারপর সাহায্যের কোনো দরকার না থাকলেও, বড়োবউদির মন রাখতে ঠাকুর-চাকর থাকা সত্ত্বেও একবার রান্নাঘরে যায়। তারপর তৈরি হয়ে, যা রান্না হয়, তাই খেয়ে ঠিক আটটা কুড়িতে বেরোয় যাদবপুর থেকে, যাতে সাড়ে ন-টার মধ্যে অফিসে পৌঁছোতে পারে। তার বস নিজে আসেন কাঁটায় কাঁটায় ন-টাতে।

অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফিন্যান্স সবই অন্য ডিরেক্টরদের হাতে। তাঁরা সকলেই ভেতো এবং গেঁতো বাঙালি। অফিসে বসে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করেন। পরনিন্দা-পরচর্চা করেন। খবরের কাগজ পড়েন। টেস্ট খেলা দেখতে না গেলে, নিজেদের চেম্বারে বসেই ট্রানজিস্টারে রিলে শোনেন। একজনের ঘরে তো ছোটো টি. ভি. সেটও আছে একটা। খেলাতে ওঁদের দারুণই উৎসাহ। যদিও জীবনে প্রায় কোনোরকম খেলাই খেলেননি। অর্থাৎ নিজেদের কাজ ছাড়া আর সবকিছুই করেন। অরাদের অফিস, ছুটির দিক দিয়েও দারুণ ভালো। প্রতি শনিবার ছুটি আমেরিকান কায়দায়। যে সব অফিসে ফাইভ-ডে-উইক সেখানে ন-টা থেকে ছ-টা অফিস। কিন্তু অরাদের অফিসে সাড়ে এগারোটা-বারোটাতে এলেও চলে কিন্তু যাওয়ার সময়ে কাঁটায় কাঁটায় ছ-টা। একজন ডিরেকটর তিনটের আগেই চলে যান। অফিসসুদ্ধ লোকে অরার বস আর অরাকে গালমন্দ করে, টিটকিরি দেয়। গায়ে মাখে না অরা। অন্য ডিরেক্টররা কোটিপতির ছেলে। ওঁদের প্রয়োজনই বা কী? জীবনটা উপভোগ করতেই ওঁদের এই ধরাধামে আসা।

কিন্তু অরার বসও কিছু গরিবের ছেলে নন এবং বয়সে অন্যদের থেকে অনেকই বড়ো কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা, সেন্স অব ডিউটি, সময়জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে শেখার আছে। সব বাঙালি শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী ওঁর মতন হলে আজ পশ্চিমবাংলার অবস্থা কখনই এমন হত না। কাজ করতে অরা ভয় পায় না তাই এই রকম বসের অধীনে কাজ করতে পেরে ও খুবই খুশি।

অরার বস, বাসু চ্যাটার্জি সাহেব বলেন, জীবনে উন্নতি করতে হলে খুব বেশি গুণের দরকার হয় না। আত্মসম্মানজ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা এবং কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা অত্যন্তই দরকার। যে-কোনো কাজই আমি যতখানি ভালো করে পারি, আর কেউই তেমন ভালো করে করতে পাবে না বা পারবে না। এই জেদটা, জীবনে বড়ো হতে হলে খুবই দরকার।

এই নামী কোম্পানিতে কাজে ঢোকার আগে কাজও যে আনন্দের ব্যাপার, চাকরি যে শুধুমাত্র মাসশেষে মাইনে পাবার জন্যেই করা নয়, কাজ করার আনন্দ এবং গর্বর জন্যেই কাজ করাটা দরকার, এই সত্যটা আবিষ্কার করে জীবনের যেন এক নতুন মানে খুঁজে পেয়েছে ও। ইতিমধ্যেই সে তার এই কড়া কিন্তু ভালো বসের সুনজরে পড়ে গেছে এবং তাকে নানাভাবে শেখান। উৎসাহিত করেন। 'জব স্যাটিসফ্যাকশন' শব্দ দুটি এতদিন শুধু শুনেই এসেছিল। এখন শব্দ দুটির মানে তার কাছে প্রাঞ্জল হয়েছে। আর পিছন ফিরে তাকাবার প্রয়োজন নেই মনে হয় ওর জীবনে।

মাইনেটা আর একটু বাড়লেই ও কোনো লেডিস অথবা ওয়াই-ডাব্লু-সি-এ মেসে চলে যাবে।

ওর তিনজন বন্ধু মিলে একটি ছোটো বাড়ি ভাড়া করে থাকে চেতলাতে। এখনও একা মেয়ের পক্ষে একা থাকার অনেকই অসুবিধে, যদি তার আয় প্রচুর না হয়। তা হলেও আবার অন্য অসুবিধা। পুরুষের প্রকৃতই সমান হতে এ দেশের মেয়েদের অনেকই দেরি আছে। ওর নিজের জীবদ্দশাতে সেই স্বাধীনতার আনন্দ দেখে যেতে পারবে বলে মনে হয় না।

বড়দার বাড়ির অশিক্ষিত, টাকা-সর্বস্ব টি. ভি-সর্বস্ব পরিবেশ তার একটুও ভালো লাগে না। বড়োদার ছেলে ও মেয়েটাও বউদির অশিক্ষা আর টাকার দম্ভে একেবারেই বাজে হয়েছে। বাড়িতে অরা ওর একজন বন্ধুকেও আনতে পারে না। পুরুষ বন্ধু তো নয়ই! অথচ ঘরের অভাব নেই, সাচ্ছল্যের অভাব নেই।

পরিবেশটা মস্ত বড়ো জিনিস মানুষের জীবনে। এই পরিবেশে থেকেও বহু কষ্ট করে তার নিজস্বতাকে অরা বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন অফিসের পরিশ্রম ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের পরে একটু নির্জনতা, একটু ভালো বই পড়া, ভালো গান শোনা, নিজের ইচ্ছে মতো ও নিজের সময়মতো খাওয়াদাওয়ার বিলাসিতার জন্যে মন বড়ো উচাটন হয়। অমন সুরুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত বাবার যে বড়দার মতন ছেলে কী করে হয়েছিল; তা কেন জানে! ভেবে পায় না অরা।

নানারকম পাখি ডাকছিল বাইরে। নাম জানে না ও। জানতে ইচ্ছে করে। গাছের নাম কিছু কিছু জানে, বাবার জন্যে। ভোপালে তাদের বাড়ির মধ্যেই অনেক গাছ ছিল। তাছাড়া বাবার সঙ্গে জঙ্গলেও যেত। এই বাড়িতে অনেকগুলো স্থলপদ্মের গাছ আছে। বড়ো বড়ো। স্থলপদ্ম ফুটবে গরমে। সকালে আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলবে আর বিকেলে আবার আস্তে আস্তে পাপড়ি বন্ধ করবে। কত রঙ্গই না জানে প্রকৃতি।

প্রজাপতি উড়ছে। দুটি মৌটুসকি পাখি আর একটি ছোটো সবুজ সানবার্ড সমানে ডেকে চলেছে। একজোড়া বুলবুলি কোত্থেকে উড়ে এসে সুন্দর শিস দিতে লাগল। পিঠের উপরে রোদ এসে পড়েছে। ভারি ভালো লাগছে অরার। স্বপ্নের মতো এক আবেশে ভরে গেছে ও সানবার্ডদের ডাকের মধ্যে বসে।

ফোনটা বাজল এমন সময়ে। বনবাসা রান্নাঘরে, নাস্তা বানাতে ব্যস্ত; বড়দি চানে গেছে। অতএব অরা উঠে বসবার ঘরে গিয়ে রিসিভারটা ওঠাল।

বউদি?

না। আপনি কে বলছেন?

আমি চক্রবর্তী।

আপনি কে?

আমি বউদির বোন।

ও। নমস্কার। বউদির সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

উনি চানে গেছেন।

ও। তাহলে আপনাকেই বলি। আমার নাম পরিতোষ চক্রবর্তী। পরদেশিয়াকে সকালেই সি. এম. ডি. ডেকে পাঠিয়েছেন এমনই একটা জরুরি কাজে যে, বেচারি ফোন করার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি। আমাকে খবর দিতে বলেছে যে; অমরকণ্টক ওর পক্ষে আজ যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ও চিরিমিরিতে চলে গেছে ইতিমধ্যেই। কয়লা খাদে একটা ঝামেলা হয়েছে। আপনারা যদি আজই যেতে চান তাহলে আমি যেন আপনাদের নিয়ে যাই এ কথা আমাকে বলে গেছে মিত্রা।

মিত্রা কে?

ওই। মানে, পরদেশিয়া মিত্রা। ওকে সকলে এখানে মিত্রা বলেই ডাকে। তবে ও কাল রাতেই ফিরে আসবে। পরশু সকালে আপনাদের নিয়ে যেতে পারে। আজই গেলে আমিও নিয়ে যেতে পারি। বউদি বাথরুম থেকে বেরুলে আমার সঙ্গে একটু কথা বলিয়ে দেবেন দয়া করে। নমস্কার।

পরিতোষ চক্রবর্তী আমার নাম। সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর পাবলিক রিলেশনস ডিপার্টমেন্টের। বউদির কাছে নাম্বার আছে আমার।

রিসিভারটা নামাতে-না-নামাতেই বড়োদি বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল, কে রে অরা? কী হল? দেরি করে আসবে বলল পরু? ব্রেকফাস্ট এখানে খাবে না বুঝি? ওর জন্যে ডালপুরি আর আলুর দম করতে বললাম বনবাসাকে, খেতে ভালোবাসে, আর...

আর ডালপুরি করার দরকার নেই। সে কিড়িমিড়ি গেছে আমার উপরে দাঁত কিড়িমিড়ি করতে করতে।

কিড়িমিড়ি? সেটা আবার কোথায়?

তা আমি কী করে জানব বলো? পাবলিক রিলেশনস ডিপার্টমেন্টের শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী ফোন করে জানালেন যে সি. এম. ডি. না কে যেন সকালেই তোমার পরুকে ডেকে পাঠিয়ে কিড়িমিড়িতে পাঠিয়েছেন, সেখানের মাইনসে কি গোলমাল হয়েছে, তাই। আজ অমরকণ্টক যাওয়া হবে না। মানে হবে, তবে তিনি যেতে পারবেন না। পরিতোষবাবু নিয়ে যেতে পারেন। পরু পরশু সকালে যেতে পারে। কাল রাতেই ফিরে আসবেন। হোপফুলি।

সে কী? ওর টুর্নামেন্টের খেলা যে আজই ছিল।

বাবাঃ। তুমি সে খবরও রাখো দেখছি। আচ্ছা বড়দি তুমি আর বড়ো জামাইবাবু তোমাদের পরুকে অ্যাডপ্ট করো না! ছেলে করে নাও। তারপর মনোমতো বউ দেখে আনো তার। আমিও বাঁচি এমবারাসমেন্টের হাত থেকে।

হ্যাঁ। ছেলে যদি হিরের টুকরোও হয় একটি হাড়জ্বালানি বউ, সে সোনার সংসারে আগুন জ্বালাতে পারে পনেরো দিনের মধ্যে। 'বউ আনো' বললেই বউ আনা যায় না। বড়োবউদিকে চোখের সামনে দেখছিস না।

যাকগে, তুমি ফোন করো পরিতোষবাবুকে। ভদ্রলোক বাঙালি নাকি? কিরকম অ্যাফেক্টেড বাংলা বলেন যেন।

বাঙালি তো বটেই, এমনকী বাঙালও। ওর বউ প্রীতিও বাঙাল। দুজনেই বরিশালের। অথচ ওদের পূর্বপুরুষের অন্তত তিন পুরুষ বরিশাল দেখেননি। প্রীতি, চক্রধরপুরের মেয়ে আর পরিতোষ এখানকারই ছেলে। খুব ভালো লেখে পরিতোষ। তবে, হিন্দিতে লেখে। ছত্তিশগড়িয়া সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। নিজেকে ছত্তিশগড়িয়া বলে সগর্বে পরিচয়ও দেয়। ভারি ভালো ছেলে।

কথা বলো ওঁর সঙ্গে।

হ্যাঁ। কিন্তু কী বলব? তোর কী ইচ্ছা?

আমার আবার কী ইচ্ছা? তুমি যা বলবে তাই হবে।

কথা বলল বটে অরা কিন্তু ওর গলার স্বরে এবং মুখের ভাবেই বুঝলেন স্মৃতি যে পরুর সঙ্গেই অমরকণ্টক যেতে চায় সে। মনে মনে খুশি হলেন খুব। মুখে, পাকা অভিনেত্রীর মতন নির্দল, নিস্পৃহ ভাবে ফুটিয়ে বললেন, আজ তাহলে তোকে নিয়ে রতনপুরের মহামায়া মন্দিরে ঘুরে আসি। কাল রেস্ট করে পরশুই না হয় অমরকণ্টক যাওয়া যাবে পরুর সঙ্গে।

যা ভালো বোঝো তুমি।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল অরা।

তাহলে সেই মতোই বলছি পরিতোষকে। দশটা নাগাদ বেরুলেই চলবে। ত্রিশ কিলোমিটার মতো পথ। সেখান থেকে আরও কুড়ি কিমি মতো গেলে পালিতে অন্য একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও আছে।

হিন্দু মন্দির?

হ্যাঁ। মুসলমানদের আসার আগের মন্দির এসব। মহাদেব মন্দির। গায়ে কোনারকের মতন মিথুন মূর্তি আর নগ্নিকা মূর্তি আছে অনেক। ভারি সুন্দর। সামন্তরাজ মল্লদেব-এর পুত্র বিক্রমাদিত্য ওই মন্দির বানিয়েছিলেন বারোশো শতাব্দীতে। তারপরে সেই মন্দিরের সংস্কার করেন রতনপুরার হাইয়াহায়া ডাইন্যাস্টির রাজা প্রথম জজল্লাদেব।

আর পালিতে কী আছে?

পালিতে হিন্দুরাজাদের কিছু ঘরবাড়ি ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে।

ছত্তিশগড়ের গড়?

না, না। ওগুলো ছত্তিশগড়ের গড় নয়।

এ সব জায়গাকে ছত্তিশগড় বলে কেন?

বিলাসপুর আর রায়পুর আঠারোটা করে দুর্গ ছিল একসময়ে। দুর্গ মানে গড়। তাই এই দুই এলাকা নিয়ে ছত্তিশগড়।

একটাও দুর্গ নেই এখন?

নাঃ।

কেন নেই?

তা আমি বলতে পারব না। পরিতোষ বলতে পারে। ও খুব পড়াশুনো করে।

আমি ভাবছি, আজই চলে যাব ফিরে কলকাতায়।

অরা বলল হঠাৎ।

কেন? কী হল?

বড়ো জামাইবাবু কাল রাতেও ফোন করলেন না, আজ সকালেও নয়।

করবে করবে। হয়তো লাইন খারাপ।

বলতে বলতেই ফোনটা বাজল।

স্মৃতি বললেন, ওই যে। ধর ফোন। নিশ্চয়ই তোর জামাইবাবুর।

দৌড়ে গিয়ে ফোনটা তুলেই অরা গদগদ গলায় বলল, জামাইবাবু?

ওপাশ থেকে কে যেন বললেন, ভেরি সরি। আমি জামাইবাবু নই। মানে এখনও হইনি। তবে কখনও হতেও বা পারি। বাঙালি হয়ে জন্মেছি, আর জামাইবাবু হতে পারব না, তা কি হয়। সেটাই যে সহজতম কাজ।

অরা চিনতে পারল গলাটা এতক্ষণে।

বলল, বড়দিকে দেব?

না। বউদির সঙ্গে তো রোজই কথা বলি। তোমার গলাটা ফোনে দারুণ শোনায় তো!

দারুণ মানে?

অপর্ণা সেনের মতন। সেক্সি। 'বেস' এ।

আপনি কি সকলের সঙ্গেই এমন ফ্লার্ট করেন?

আমি করি কোথায়? রাজ্যের যত মেয়ে, তারাই সকলে আমার সঙ্গে ফ্লার্ট করে।

আর আপনি?

আমি তাদের স্কোয়াশের বল-এর মতন জোরে দেওয়ালে মেরে রিটার্ন পাঠাই।

কোন দেওয়ালে?

তাদের পোড়াকপালের দেওয়ালে।

আপনি বড়ো গর্বিত মানুষ।

যে-মানুষের ন্যায্য কারণে কোনো-না-কোনো গর্ব নেই, সে মানুষই নয়। গর্বটা আকাশ থেকে পড়ে না। তাকে তিলে তিলে তৈরি করতে হয়। তার যোগ্য করতে হয় নিজেকে অনেক মূল্য দিয়ে। আমার গর্ব আছে বলে আমি গর্বিত।

এখন কাজের কথা বলুন।

এই তো কাজের কথা!

তার মানে?

অরাদেবীর সঙ্গে কথা বলাটাই এখন আমার সবচেয়ে জরুরি কাজ।

কিড়িমিড়িতে কী করতে গেছেন? আর সি. এম. ডি.-টা কী ব্যাপার? সেন্ট্রাল মাইনিং ডিপার্টমেন্ট?

না, মশাই। তুমি তো দেখছি আমার চাকরিটাই খাবে। জঙ্গলে বাস করেও বাঘ চেনো না? উনিই তো আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেকটর। সি. এম. ডি.।

কোথাকার? কোল ইন্ডিয়ার?

বিপদ! কাল যে সব বললাম তোমাকে! কোল ইন্ডিয়া হল গিয়ে হোল্ডিং কোম্পানি। যদিও সেনগুপ্ত সাহেব, চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট বলেন যে, হোল্ডিং কোম্পানি আর নেই আজকাল সেই অর্থে; মানে ব্যালান্সশিট নাকি হয় না আগের ফর্মাটে তবে যে-কোম্পানির অন্য কোম্পানিতে কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট থাকে, সেই কোম্পানিই হোল্ডিং কোম্পানি। কোল ইন্ডিয়ার শুধুই চেয়ারম্যান আর সবসিডিয়ারিগুলোর সি. এম. ডি। যেমন মালটিন্যাশানাল কোম্পানিগুলোর এন. সি. ই।

সেটা আবার কী?

ন্যাশনাল চিফ এগ্‌জিকিউটিভ। এন. সি. ই.। বোঝা গেছে?

হ্যাঁ।

সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর হেডকোয়ার্টার্স বিলাসপুরে। আমাদের এখনকার সি. এম. ডি হচ্ছেন শ্রীউপেন্দ্র কুমার। কাল তো বললামও।

এসব কে মনে রাখে! আপনার বস-এর নাম আপনি মুখস্থ করুন গিয়ে। আমার বয়েই গেছে। নিন, বড়দির সঙ্গে কথা বলুন।

দাঁড়াও। দাঁড়াও। ছেড়ো না।

হই হই করে বলে উঠল পরদেশিয়া।

স্মৃতি, পরুর ফোন বুঝতে পেরে, ইচ্ছে করেই রান্নাঘরে চলে গেলেন।

অরা বলল, কী হল আবার?

কাল রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

নতুন জায়গাতে, প্রথম রাতে, ভালো ঘুম হয় না। তবে হয়েছিল মোটামুটি।

আমার কিন্তু একদমই হয়নি।

কেন?

মনে মনে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে এবং ডেঞ্জারাস টাইপের পুরুষ মানুষের দুষ্টুমি কত রকম হতে পারে তা জানতে খুব ইচ্ছা করলেও গলার স্বরে নির্লিপ্তি এনে অরা বলল, কেন? আপনার তো আর নতুন জায়গা নয়।

তা নয়। তবে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল তো!

তার সঙ্গে ঘুমের কী সম্পর্ক?

নেই? আমার প্রতিবেশী চন্দ্রসাহেব যেদিন তাঁর বুল-টেরিয়ার কুকুরটা নিয়ে এলেন রাউরকেল্লা থেকে, মানে, যেদিন সেই 'বিল'এর সঙ্গে প্রথম দেখা হল, সেদিনও ঘুম হয়নি। সারা রাত দেখি সে দাঁত-খিঁচোচ্ছে স্বপ্নে।

তারপর বলল, তুমি কি কোনো স্বপ্নে দেখেছিলে?

আপনি বড়ো বাজে কথা বলেন। এবং বেশি কথা।

সকলের সঙ্গে বলি না। বউদিকে জিজ্ঞেস করো।

কারোকেই জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আগামীকাল রাতে আসবেন তো? আমি কিন্তু রবিবার কলকাতায় চলে যাবই। একদিনও বেশি থাকার উপায় নেই।

দেখি। আজ রাতে ফিরতে পারি কি না! চাকরি আগে। তারপরে তো সুন্দরী নারীর সঙ্গ।

পরদেশিয়া বলল।

বড়দি। তোমার ফোন।

বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে স্মৃতিকে ডাকতে গেল অরা।

স্মৃতি এসে ফোন ধরলেন। বললেন, হ্যাঁ। পরিতোষ বলেছে। ভাবছি, ওর সঙ্গে আজ বতনপুরটা ঘুরে আসি। সারাদিন এখানে বসে থাকলে অরা রেগে যাবে।

রেগে যাবে কি? সবসময় তো রেগেই আছে তোমার বোন। কথা শেষ হবার আগেই দুম করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। তোমার বোন কিন্তু তোমার মতন সভ্যভব্য, নির্জীব নয় বউদি। সে একটি বিষধর সর্প।

তা তুমি তো সব সাপের ওঝা। পারবে না কি পোষ মানাতে?

উঁহুঃ। ইনি হলেন আফ্রিকার হাতি। না খেয়ে মরে যাবেন তাও ভি আচ্ছা। পোষ উনি কারওরই মানবেন বলে মনে হয় না।

আগামীকাল চৌধুরীসাহেবদের, পালসাহেবদের, পরিতোষ, পীযূষ মুখার্জি, সুজি মিত্র ওদের সকলকেই সস্ত্রীক ডেকে আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ভাবছি। একটা ছোটা গেটটুগেদার। কী বলো? তারপর পরশু সকালের...ক-টা বললে? ন-টা? হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমরা একেবারে তৈরিই থাকব। ব্রেকফাস্ট খেয়েই আসবে? ঠিক আছে। তবে, এই কথা রইল। তোমার দাদা একটা ফোন পর্যন্ত করল না শালিকে। কী আর বলব! জামাইবাবু মাত্রই শালিবাহন হন, তোমার দাদা এক অজীব মানুষ হচ্ছে।

তাই? নিশ্চয়ই ভালোমতো ফেঁসে গেছেন দাদা। আচ্ছা! আমি লাঞ্চের সময়ে দেখব কোরবার গেস্টহাউসে ফোনে ধরতে পারি কি না! পেলে, ফোন করতে বলব। ভালো থাকবেন। কোনোরকম অসুবিধে হলে সুজিত অথবা পরিতোষকে বলবেন। তাছাড়া চৌধুরীসাহেব তো আছেনই। আচ্ছা। ছাড়ছি বউদি।

আচ্ছা। বলে স্মৃতি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

মেমসাহেব অরাদিদিকে নিয়ে পারুসাব আর করিমবক্স ড্রাইভারের সঙ্গে সকালেই চলে গেছেন অমরকণ্টকে। আগামী কাল রাতে আসবেন।

বাংলোটা ফাঁকা। সাহেবও তো নেই।

নিজের নিজস্ব জন বলতে সংসারে বনবাসার কেউই নেই। এই পরিবারই তার নিজের পরিবার হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে ছিল ছোটো বোন হাসিন। সে তো এখন...।

অনেকের সহোদরা সতীনও হয়। এমন অনেকেই আছে। নিজচোখে ও দেখেছেও। কিন্তু মহাভারতের দ্রৌপদীর উলটো ছবি হতে চায় না ও। তাছাড়া, অন্য সতীনকে সহ্য করা গেলেও বা সহ্য করা যায় কিন্তু নিজের ছোটোবোনকে সতীন হিসেবে কল্পনা করতেও গা ঘিনঘিন করে।

একা নিজের জন্যে রান্নাবান্না করতে আর ইচ্ছে করে না। তিরিশেই যেন সে বিবাগি হয়েছে। শরীর মনের অনেক এবং অনেক রকম অভিজ্ঞতাই হল। তাছাড়া, বয়স তো আর বয়সে হয় না, হয় অভিজ্ঞতাতেই।

গতকাল দিনে ও রাতে অনেক কিছুই রান্না হয়েছিল। ভাতও আছে। এ সবই একটু গরম করে খেয়ে নেবে। একা বসে বসে কুয়োতলিতে তেল মাখছিল ও সারা শরীরে। বাইরের গেটে তালা মেরে দিয়েছে উজ্জ্বল, উদ্‌বেল, রোদকণা-ওড়া সকালে তেল মাখছে ও কুয়োতলিতে।

মেমসাহেব থাকলে, চানটা তাড়াতাড়িই সেরে নেয় ও সাত সকালে। গরমের দিনে 'অন্ধকারে' কুয়োতলিতে রাতের বেলাটা জামাকাপড় খুলে ভালো করে সাবান মেখে চান করে, যখন সাহেব-মেমসাহেব ঘুমিয়ে পড়েন তখন। কিন্তু এখনও শীত আছে। এখন তা করা যায় না। মাসে এক-দুদিনের বেশি শরীরে তেল মাখাও হয় না। রুখু হয়ে যায় শরীর। বিশেষ করে শীত শেষে খড়ি উঠছে এখন সারা শরীর থেকে। ও যেন সর্পিণী। তাই আজ ও নিজেকে নিয়ে পড়েছে।

কুয়োর চারধারে গাছগাছালি। নগ্ন হয়ে কুয়োতলিতে বসে থাকলে বা চান করলে পথ থেকে বা অন্য বাড়ি থেকেও কারোই দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া, গেটে তো তালা মারাই আছে। তবুও দিনমানে নগ্ন হলে রোদভরা আকাশের নিচে কেমন গা-ছমছম করে। শীত শেষের হাওয়া নগ্ন শরীরে শিহরন তোলে।

ভারি ভালো লাগছে উপোসি রুখু শরীরে পরতের পর পরত তেল লাগাতে। মানুষ-জন নেই কিন্তু একটা বারোমাস-ফুল-ফোটা ঝাঁকড়া জবাগাছে একজোড়া বুলবুলি বসে তার নগ্ন শরীরের দিকে চেয়ে রয়েছে। নড়ছে চড়ছে আর চাইছে। চাঁপাগাছ থেকে একটা অসভ্য দাঁড়কাকও। তার দেখার ধরনটা ভারি নির্লজ্জর মতো। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে দাঁড়কাকটা। অস্বস্তি লাগে। মেয়েদের নিরাবরণ শরীর তাদের নিজের কাছেই বড়ো লজ্জার। কেন, যে, তা কে জানে! হয়তো বহুজন্মের সংস্কার। হয়তো কোটি কোটি লোভী পুরুষের চোখ যুগযুগান্ত ধরে মেয়েদের নগ্ন শরীরের চারধারে এক অদৃশ্য অস্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করে দিয়েছে। সেই অস্বস্তিই অদশ্য পর্দার মতো নড়েচড়ে ওঠে কাকের চোখের চাউনিতেই।

তবে কাঠবিড়ালি কি বুলবুলি কি দাঁড়কাকে ভয় নেই। ভয় হনুমানদের। মাঝে মাঝেই হনুমান চলে আসে এ তল্লাটে। পুরুষ হনুমানগুলো পুরুষ মানুষদের মতোই অসভ্য হয়। অনেক সময়ে তো শুধু ভয় দেখানোই নয়, রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরের ওপরে। বাঁশপাতিয়া নামের এক বান্ধবী ছিল বনবাসার, যখন ওরা কোট্টাতে থাকত। তার ওপরে একটি হনুমান বলাৎকার করেছিল। নির্জন নদীর বালির ওপরে। বাঁশপাতিয়াকে একা পেয়ে গেছিল। তাকে হাসপাতালেও থাকতে হয়েছিল কয়েকদিন। বস্তিসুদ্ধু মানুষ তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। বিশেষ করে পুরুষেরা বলত, আমাদের বললি না কেন? অতই যদি গরম লেগেছিল তো আমরাই তোকে শান্ত করতাম শেষে কিনা ওই দুর্গন্ধ লোমে ভরা ল্যাজ-তোলা হনুমানের লিঙ্গে তোর সতীত্ব খোয়ালি। ছ্যাঃ ছ্যাঃ

সেই সময় থেকেই বনবাসা হনুমান দেখলেই আতঙ্কিত বোধ করে। বাঁশপাতিয়ার এখন বিয়ে হয়েছে। দুই ছেলে মেয়ে। কিন্তু হনুমান দেখলেই ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায়।

এই রকম অনন্ত অবসরে বনবাসার মন, না-হেঁটেও বহু দূরে দূরে হেঁটে যায়। সময় লাগে না সেই পথ চলাতে। এই মুহূর্তে নর্মদার পাড়ে বসে থাকে তো পর মুহূর্তেই চলে যায় অচানকমারের জঙ্গলের পাশে একফালি জমি নিয়ে ঘর বানিয়ে বসবাস করত। খেতি জমিনও ছিল। তবে অতি

সামান্য। সাঁওয়া ধান বুনতো কিছু। মকাই, চিনেবাদাম, তুর ডাল। তবে যা কিছুই হত তা খরগোশ, চিতল, শম্বর আর বারাশিঙাতে খেয়ে যেত। তবুও করত।

বনবাসার এই তিরিশ বছর বয়সেই ও বুঝেছে যে, মানুষমাত্রই, কী পুরুষ, কী নারী; জীবনের খেতে যা কিছুই বপন করে, সেই সব বীজ যখন ফলে তার খুব কম অংশই ফসল হিসেবে নিজের শরীরে মনের ঘরে, নিজের বাসস্থানে তোলা যায়। অধিকাংশই ফেলা যায়, পচে যায়। কাকে, সুগাতে, বাগারীতে খরগোশে, শজারুতে, শুয়োরে, হরিণে, অন্য মানুষে খেয়ে যায়। যতটুকু খায়, তার চেয়ে বেশি নষ্ট করে। সব ফসলেরই অতি সামান্যটুকুই নিজেদের ভোগে লাগে। কী বনে, কী মনে। অথচ তবুও যুগযুগান্ত ধরে নারী ও পুরুষ বীজ বুনেই চলে। খেতে, শরীরে, মনে। সম্ভবত অভ্যাসে বোনে। সংস্কারে বোনে। অন্ধ বলেই বোনে। নয়তো, বোনে না-বুনে থাকতে পারে না, তাই। ভারি অজীব জানোয়ার এই মানুষ জাত!

হাসিন-এর কথা মনে পড়ে বনবাসার। মনে পড়ে, মনটা খারাপ হয়ে যায়। তার উপরে কোনো রাগ নেই ওর। সে তার প্রাক্তন স্বামী পাগলুর স্ত্রী। শিশুকালে এই হাসিনকেই নিজে হাতে চান করিয়ে দিত বনবাসা। যেদিন দুপুরে একটি মস্ত জামগাছতলিতে এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতে হাসিন ঋতুমতী হল সেদিন বনবাসাই ওকে মায়ের মতোই সব হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। কারণ, তাদের মা তখন মামাবাড়িতে গেছিল সিঙ্গারেনিতে।

কে জানে! এখন ভাবে বনবাসা যে, তার সেই পাঠ দেওয়াতে হয়তো কোনো ত্রুটি ছিল। নইলে বোন, বনবাসার স্বামী পাগলুর ভোগ্য করে তুলবে কেন নিজেকে! অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, শারীরিক ব্যাপারে বনবাসারই কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল পাগলু অসুখী ছিল ওকে নিয়ে।

পুরুষগুলোর মধ্যে অধিকাংশই শুয়োর। এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্রই সন্দেহ নেই। তারা মেয়েদেরও যে মন বলে একটা দারুণ নরম প্রজাপতির মতো, হলুদ বসন্ত পাখির মতো ব্যাপার আছে, থাকে; তা বোঝে না। বোঝে, শুধুই শরীর। তাদের কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতিও নেই। তারা পীড়ন-ঘর্ষণের জগতেরই বাসিন্দা। যে সব পুরুষ অন্যরকম, সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন, সেই সব পুরুষকে অন্য পুরুষে তাচ্ছিল্য করে। মনের প্রেম অথবা শরীরের মিলন যে অত্যন্ত নরম, নাজুক, পরম ব্যক্তিগত নিভৃত কোমল ব্যাপার, ঘুঘুর গলাতে হাতে বোলানোরই মতো রেশমি অনুভূতির; এ কথা শুয়োরের জাত পুরুষদের মধ্যে অতি কম পুরুষেই বোঝে। পুরুষদের প্রতি বনবাসার ঘেন্না ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিন্তু এই পরুসাব মানুষটা অন্যরকম। তার ভাবনা, বনবাসার মনে, নানা কল্পনা, কল্পনার নানা:বিধ ফুলকে বসন্তের কুসুমগাছের নতুন কোমল লালচে-খয়েরি পাতাদেরই মতো পল্লবিত করে। তার মনের বনকে উদ্‌বেল এক বাসন্তী উদ্ভাসে উদ্ভাসিত করে। অথচ বনবাসা জানে, পরুসাবকে সে জীবনে পাবে না। পাবে না, কারণ, তারা অন্য জাতের। এই জাত, ব্রাহ্মণ, শুদ্র, কাহার, চামার, ভূমিহার, ঠাকুরের জাত নয়। এই জাতের নাম শিক্ষিত আর অশিক্ষিত। বড়োলোক আর গরিব।

ইংরেজি না জানলেই কি মানুষ অশিক্ষিত হয়? ভাবে বনবাসা। বনবাসার সহবত তো অনেক শহুরে মানুষকেও লজ্জা দিতে পারে। পারে যে, এ কথা বনবাসা ভালো করেই জানে। তার মতো সহজাত ভব্যতা, সৌজন্যবোধ, সংযমবোধ সমবয়সি খুব কম তথাকথিত শিক্ষিত এবং বড়োলোক মেয়ের মধ্যেই আছে। কিন্তু ও যে ইংরেজি-মাধ্যমে পড়াশুনো করেনি। ছেলেবেলাতে কাঁচা হলুদ আর করৌঞ্জ আর নিমের তেল ছাড়া অন্য প্রসাধনের কথা তো সে জানেনি। পোশাক বলতে, গোড়ালির উপরে তোলা বস্তির মানুষদেরই হাতেবোনা তাঁতের ডুরে শাড়ি অথবা হাটে-কেনা

শস্তা একরঙা মিলের শাড়ি আর আঁটসাঁট ছিটেন ব্লাউজ। কিন্তু তাতেই যে পারিপাট্য ছিল তার তাতো দামি দামি শাড়ি-গয়না-মোড়া লম্বা লম্বা চুলের 'বড়োলোকের বিটিদের' কখনওই ছিল না। ছিল না যে, তা বড়োলোকের ব্যাটাদের চোখের চাউনিতেই বুঝত বনবাসা। আঁটসাঁট কবুতরের মতো পাখসাট এর আওয়াজ তুলে ইচ্ছে করে উড়ে যেত সেই বাবুদের সামনে। তাদের চোখের ভাষা পড়তে কোনোই অসুবিধে হত না বনবাসার। কিন্তু তাদের ঘৃণা করত মনে মনে ছেলেবেলা থেকেই। সেই সব বাবুরা আর তাদের ছেলেরা সকলেই ভাবত বনবাসার হাতে পাঁচ-দশ টাকা গুঁজে দিলেই শাড়ি খুলে শুয়ে পড়বে বুঝি সকলের সঙ্গে। তা হয়নি কখনও। ওরা ছত্তিশগড়িয়া। গরিব হতে পারে। কিন্তু আত্মসম্মানজ্ঞানহীন নয়। ইংরেজি না জানতে পারে কিন্তু অশিক্ষিত নয়। যে বাবু বা তার ছেলেই বনবাসাকে আঁটসাঁট কবুতর ভেবে হুলোবেড়ালের মতো খেতে আসত সেই বাবুরই বউকে বা মাকে বলে দিত গিয়ে বনবাসা, প্রাণের মায়া না করে। আর সেই ক্ষণ থেকে তাদের অপমানিত মা-বউয়েরাই তার রক্ষক হত।

কিন্তু এত যত্নে যা রক্ষা করে এল তা শুধু তার শরীরের পবিত্রতাই তো নয়, তার মনেরও পবিত্রতা যে! পাগলু তার শরীরকেই শুধু দলিত পিষ্ট করেনি করেছে তার মনের গভীরের সব সৌকুমার্যকেও। এবং তারপরেও সে পুরুষজাতের প্রতিভূ হয়ে তার একটিমাত্র বোনের শরীরের প্রতিও হাত বাড়াল। ছিঃ।

না, না। বনবাসা পুরুষ জাতকে আর কোনোরকম শ্রদ্ধা করে না। একজনকেও নয়। এক পরুসাব ছাড়া। পরদেশিয়া!

কত বসন্তের উজলা রাতে, গন্ধে ম-ম করা হাওয়াতে মাতাল হয়ে ও মনে মনে পরুসাহেবের আদর খেয়েছে। কত শীতের রাতে পরুসাবকে কল্পনাতে পাশবালিশ করে জড়িয়ে ধরেছে। অস্ফুটে বলেছে, কাছে এসো, আরও কাছে; খুব কাছে। আমার কী নেই? যা অন্য মেয়ের আছে।

আসলে এই শরীরকে ঘেন্না করলেও শরীরকে অস্বীকার যে করা যায় না সে কথা বনবাসা বুঝেছে। নইলে শরীরে সে পরুসাবকে চায় কেন?

অরাদিদি আসার পরে পরুসাবের হাবভাব বদলে গেছে। দিদি বলছে বটে কিন্তু বয়সে অরা বনবাসারই বয়সি হবে। কিন্তু পরুসাব বনবাসাকে কুকুরি বা কাকাতুয়া বা বেড়ালনি বলে মনে করে। এটা অবশ্য সত্যি যে, পরুসাব চকোলেট এনে দেয় মাঝে মধ্যে। গায়ে-মাথার সাবান। ভালোবাসে পরুসাব তাকে, কাজের মেয়ে হিসেবেই; প্রেমিকা হিসেবে নয়। বনবাসা জানে যে, প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যেও জাতপাত আছে। পরুসাবকে পাওয়ার ওর কোনো যোগ্যতাই নেই। অথচ ওর মেয়েলি বুদ্ধিতে ও প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারছে যে অরাকে মেমসাব আনিয়েছেনই পরুসাবের গলাতে লটকে দিতে। কত ঢং-ঢং দেখল এই কদিনে। পরুসাবও যেন বদলে গেছে। তার মুখে চোখেও যে বসন্তের কুসুমগাছের পাতার রং লেগেছে। তার মন যেন বসন্তশেষের শিমুলের বীজফাটা মসৃণ সাদা তুলো হয়ে আলতোভাবে চারধারে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ পরুসাবের এমন বিবর্তন সে নিজচোখে আর সহ্য করতে পারছে না।

গতকাল সারাদিন পরুসাব একবারও পূর্ণদৃষ্টিতে বনবাসার দিকে চায়নি। যদিও সকালে, দুপুরে, এবং রাতেও এসেছিলেন। পরশু মেমসাহেবরা পাল সাহেবের সঙ্গে মন্দির দেখতে গেছিলেন। চক্রবর্তী সাহেব নয়, জি. সি. পাল সাহেবের সঙ্গে, পারচেজ ডিপার্টমেন্টের। ওঁদের বাড়িতেও একটা মেয়ে কাজ করে, যদিও ঠিকে কাজ; তার নামও বনবাসা।

আজ এই নির্জন শীতশেষের দুপুরে তেল মেখে চান করতে করতে অরার প্রতি এক তীব্র গভীর বিদ্বেষ জমা হতে লাগল বনবাসার মনে। একবার ভাবল, অরার দুধের গ্লাসে রাতে বিষ মিশিয়ে দেয়। অরা যখন আজ সকালে গদগদ হয়ে গাড়িতে উঠল তখন তার আহ্লাদ দেখে প্রচণ্ড হিংসা হচ্ছিল বনবাসার। পরুসাবও যেন তাকে দেখতেই পেল না। অন্যদিন সবসময়ে যাওয়ার আগে

বলে যায়, চলিরে বনবাসা। একা থাকবি, সাবধানে থাকিস। কিছু দরকার হলেই সুজিতকে খবর দিস। সুজিত মিত্রা সাবকে।

বনবাসা হেসে বলত, কোনো দরকার হবে না। আপনারা নিশ্চিন্তে যান তো। বনবাসা নিজেই নিজেকে দেখতে পারে।

শুধু বনবাসাই নয়, হয়তো অনেকেই নিজে নিজেকে দেখতে পারে কিন্তু জীবনে প্রত্যেকেরই একটা সময় আসে যখন নিজেরই আর নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে, অন্য কেউ তাকে দেখুক। তার রূপকে, তার সাজকে, তার নগ্নতাকেও। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যর ভার নিক অন্যে এসে। মনে হয়, নিজে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার একটা সময়সীমা আছে। সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলে সব নারী এবং হয়তো পুরুষেরও অন্য একজন পুরুষ ও নারীকে প্রয়োজন হয়। পরিপূরণের জন্য। একা থাকাটা বোধহয় ঈশ্বরের, মানব-প্রকৃতির মনোনীত নয়।

এত যে সব ভাবনা ভাবল বনবাসা, তা তার নিজের ভাষায়, নিজের বয়ানে। কিন্তু তা তার পরুসাব বা অরাদিদির ভাষাতে তর্জমা করলে যেমনটি শোনাত তেমন করেই লেখা হল এখানে। কারণ, বনবাসার কথা যাঁরা পড়ছেন তাঁরা তো বনবাসার ভাষাভাষী নন! তার সমাজেরও নন। তাঁরা অন্য জাতের।

এই জাতপাতকে একাকার করা কি যায় না কোনোমতেই?

চুল ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবছিল বনবাসা।

রোদকণার মধ্যে ও চুলের জলকণা উড়ছিল। বাগানের শিমুল আর জবাগাছের গায়ের গন্ধ ভাসছিল বাতাসে। বুকের গভীর থেকে, নাভিমূল থেকে উঠে এসে একটা গভীর শ্বাস পড়ল বনবাসার।

যেমন করে, শরতে শিউলি ঝরে। শব্দ না করে।

বিলাসপুর থেকে কাঁটায় কাঁটায় নটা বেজে পাঁচ মিনিটে ওরা বেরিয়েছিল। করিম বক্স গাড়ি চালাচ্ছে। পরদেশিয়া নিজের গাড়ি নেয়নি। সঙ্গে দুজন মহিলা। তাই দ্বিতীয় পুরুষ থাকা ভালো। গাড়িটাড়ি খারাপ হলে যাতে একজনকে গাড়িতে রেখে অন্যজনে ট্রাক বা বাস ধরে গিয়ে পার্টস বা মিস্ত্রি জোগাড় করে আনতে পারেন।

বাঃ কী সুন্দর পথ! তোমাদের বিলাসপুরে কেন যে আগে আসিনি! কী চওড়া রাস্তা। ট্রাফিকও কম। দশমিনিটেই শহরের বাইরে চলে এলাম। ভাবা যায় না। আমার টাকা থাকলে এখানেই একটুকরো জমি কিনে থেকে যেতাম।

অরা বলল। গদগদ গলাতে।

তা আগে আসিসনি, তার জন্যে তো তুইই দায়ী। আমি তো প্রতিবছরই আসবার জন্যে বলেছি তোকে।

বোকারা নিজের টাকায় বাড়ি বানায়।

পরদেশিয়া বলল।

মানে?

মানে; বাড়ি বানাবে অন্যে, ভোগ করবে তুমি। এই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

আপনার বুদ্ধি আপনারই কাছে রাখুন।

এখনও পনেরো মিনিটও হয়নি, এর মধ্যেই তোরা ঝগড়া শুরু করলি?

একে ঝগড়া বলে না বউদি। এর নাম খুনশুটি। গভীর প্রেম থাকলে এরকম করে একে অন্যের সঙ্গে। পরদেশিয়া বলল।

হ্যাঁ। আর লোক নেই যেন! ভারি একটা জায়গা বিলাসপুর আর তার বাঁশবনের শেয়াল রাজা।

অরা বলল।

তারপর বলল, বলুন, এই পথটা কোথায় গেছে?

পথ কোথাওই যায় না। পথ পথেই থাকে। পথিক যায়।

ওই হল।

এই পথ গিয়ে পৌঁছেছে কোট্রায়।

কোটা তো রাজস্থানে। তাই নয়?

হ্যাঁ। সেটা কোটা। এটা কোট্রা। পেটকাটি আর পেটকাট্রি কি এক? তাছাড়া, আমাদের এই বিরাট দেশে একই নামের বহু জায়গা দেখতে পাবে তুমি যদি ঘুরে বেড়াও।

এরই মধ্যে তুমি হয়ে গেছে নাকি সম্পর্ক? বাঃ। তোমরা তো দেখছি বেশ ফাস্ট ওয়ার্কার।

স্মৃতি বললেন।

গায়ের জোরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে 'তুমি' বললে আমি কি আর মারামারি করব? আমি তো আপনিই বলব। বলছিও। অরা বলল।

সম্মানিত ব্যক্তিকে আপনিই তো বলা উচিত। সকলেই তাই বলে।

পরদেশিয়া বলল।

ও। আমার বুঝি সম্মান নেই?

সম্মান একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ভিক্ষা চেয়ে পাওয়া যায় না। Respect has to be commanded। বুঝেছ?

কোট্রার পরেই বেশ জঙ্গুলে জঙ্গুলে ভাব এল।

বাঃ দারুণ জঙ্গল তো।

অরা বলল।

জঙ্গলের এই চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে, এখানে কাঠ চুরি হয় না। নতুন নতুন প্ল্যান্টেশন লেগেছে। বিহার বা ওড়িশা বা পশ্চিমবাংলার মতন অবস্থা নয়। যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক নয়। অনেকেই টাইগার প্রজেক্টের মধ্যের এলাকাতেও সব কাঠ চুরির মহোৎসব লেগেছে। বনবিভাগের অফিসারদের নবনির্মিত বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় চুরির বহরটা কি রকম। দোষ পড়ছে ঝাড়খণ্ডীদের উপরে। চোরাশিকারিদের উপরে। বাঘ বাঁচাবার অছিলাতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের কোটি কোটি টাকা আসছে। বাঘ তো বাড়ছেই না, উলটে জঙ্গলও সাফ হয়ে যাচ্ছে।

এরকম কথা আপনি কী করে বলছেন ইরিসপনসিব্‌ল এর মতন?

অরা বলল।

যদি ইরিসপনসিব্‌ল-এর মতোই বলি তবে আমলারা কেস ঠুকে দিন না আমার বিরুদ্ধে। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। সে সাহস তাঁদের নেই। যারা চোর, তাদের মেরুদণ্ড থাকে না। ওই মানুষগুলো ক্রিমিনাল। একজন মানুষ খুন করলে যদি ফাঁসি হয়, তবে মাইলের পর মাইল জঙ্গল সাফ করলে তাদের প্রকাশ্যে বেত মেরে গায়ে নুনের ছিটে দেওয়া উচিত। শরিয়তি আইনই তাদের শিক্ষা দেওয়ার একমাত্র পথ। আমাদের আইনে হবে না। সেই কবে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছিলেন, 'আইন'

সে তো তামাশা মাত্র। বড়োলোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।' আমাদের দেশের আইন তেমনই রইল।

তারপর বলল, আমার বয়স কম হলে, আমি নিজে হাতে লোকগুলোকে গুলি করে মারতাম। তবে অসৎপথে যারা বড়োলোক হয়, তারা সুখী কোনোদিনও হবে না। রাতে ঘুম হবে না। ছেলেমেয়ে মানুষ হবে না, টাকা রোজগার হয়তো করবে তাদের বাবারই মতন। কিন্তু বড়োলোক হওয়াতে আর 'মানুষ' হওয়াতে অনেকই তফাত।

পরদেশিয়া রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে গেছিল।

বুঝল অরা যে, ও বনজঙ্গলকে সত্যিই ভালোবাসে। ওর উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যেই বলল, বাঃ। আমরা এবারে কী গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।

বলল, স্বগতোক্তির মতন।

হ্যাঁ। এবার থেকে সারাটা পথই জঙ্গলে জঙ্গলে। সামনে পড়বে অচানকমার। মানে, কোট্টার পরে।

অচানকমার? অবুঝমারের নাম তো জানিই। পড়েওছি বুদ্ধদেববাবুর 'ম্যাগনাম ওপাস' 'মাধুকরীতে'। বাইসন-হর্ন-মারিয়াদের দেশ বস্তারে নাকি দারুণ কম্বল পাওয়া যায়? হাতে বোনা? তাই?

হ্যাঁ। পরদেশিয়া বলল।

অচানকমারে কৌশল্যার দোকানে দারুণ শিঙাড়া আর কালাজামুন খাওয়াব।

মেয়েটির নিজের দোকান?

দোকানটা আসলে ওর বাবার।

এখানকার লোক?

না, না। সে রেওয়ার লোক। রেওয়ার নাম শুনেছ তো? সাদা বাঘের রেওয়া? সেই রেওয়া ছেড়ে অচানকমারে এসে চায়ের দোকান করেছে বহুদিন হল। এখন তার মেয়ে তাকে সাহায্য করে। বিবাহিতা মেয়ে।

আর জামাই?

কোন বুদ্ধিমানে বড়োলোকের জামাই হবার পরও কাজ করে? জানি না, সে কী করে! তাকে দেখিনি কখনও।

ভালো তেলে ভাজা হবে তো? শিঙাড়া?

স্মৃতি বললেন।

এই তো তোমাদের দোষ বউদি। ট্রাকের ইঞ্জিনের পোড়া মবিল-অয়েলে ভাজা না হলে কি শিঙাড়ার কোনো স্বাদ হয়! তবে, কৌশল্যার দোকানের তেল ভালো। সেই জন্যেই শিঙাড়ার স্বাদ যতখানি ভালো হবার কথা ছিল ততখানি ভালো নয়।

অচানকমারের পরে কী? মানে, কোন জায়গা?

অরা বলল।

তারপর মাট্টিনালা। একটি পাহাড়ি নদী এসেছে পাহাড় থেকে নেমে। ভারি সুন্দর। মাট্টিনালা চেক-নাকার কাছে গেলে দেখতে পাবে নদীর দু পাশে একরকমের ঝোপ লাগিয়েছে, সম্ভবত ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টই; তার স্থানীয় নাম বারকাণ্ডা। কদমফুলের মতো গোল গোল ফল ধরে তাতে। ঠিক কদমফুলও নয়, ডিম আর কদমফুলের মাঝামাঝি।

খায়? সেই ফল?

যতদূর জানি, খায় না! ওই ঝোপটার বটানিক্যাল নাম জানবার অনেকই চেষ্টা করেছি কিন্তু জানতে পারিনি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসারেরা জানবেন হয়তো।

আপনি তো মাইনিং এঞ্জিনিয়ার। এই সব গাছগাছালি পাখপাখালি সম্বন্ধে এত জানলেন কী করে?

জানি না কিছুই। জানবার চেষ্টা করি মাত্র। যে সব ব্রিটিশ, আইরিশ, জার্মান, বেলজিয়াম মিশনারিরা ভারতে বা আফ্রিকাতে বা অন্য দেশে ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রচারের জন্যে এসেছিলেন ও গেছিলেন, যেসব ব্রিটিশ আই. সি. এস. এদেশ শাসন করতে এসেছিলেন, তাঁদের কারোরই তো অ্যানথ্রোপলজি, বা অর্নিথোলজি বা বটানিতে ডক্টরেট ছিল না। কিন্তু তাঁদের সব বিষয়ে ইন্টারেস্ট ছিল। মোটামোটা বই মুখস্থ করে উগরে দিয়ে ভালো ফল করে একটা চাকরি বা জীবিকার সংস্থান করাটা আর শিক্ষাটা সমার্থক নয়। প্রকৃত শিক্ষার আরম্ভ ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পাবার পরই হয়। ব্রিটিশ আই. সি. এস-রা যেসব 'গেজেটিয়ার' লিখে গেছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জেলাওয়ারি, সেসব পড়লে সত্যিই চমৎকৃত হতে হয়। সেই তুলনায়, দিশি আই. এ. এস-দের অধিকাংশকেই অশিক্ষিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। জানার ইচ্ছাটাই তো শিক্ষার চরম উৎকর্ষ। আমি মাইনিং এঞ্জিনিয়র বা কেউ লখনউয়ের ম্যারিস কলেজের সংগীতবিশারদ, তাতে জীবনের, পৃথিবীর, অন্যান্য ক্ষেত্রের জ্ঞানের পথে কাঁটা পড়ে না কোনো। যার জানার ইচ্ছা জাগরুক আছে, সে জানতে চায়ই; মৃত্যুক্ষণ অবধিই জানতে চায়।

অরা ভাবল একবার, যে বলে; আপনি বড্ডই জ্ঞান দেন মশাই।

পরক্ষণেই বড়দির মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ল ওর। নিজেও ভাবল, কথাগুলো একটু ভারী শোনাল বটে, কিন্তু আসলে কথাগুলো খাঁটি সত্যও। সব কথা ভারী হলেই যে তার ভার থাকবে এমন নয়। পরদেশিয়ার কথাগুলোর ভার আছে। খাঁটি সত্যর সবসময়ে ভার থাকেই, মেকি সত্য সবসময়েই হালকা। এই পরদেশিয়া নামক আনকমন মাইনিং এঞ্জিনিয়রের তুলনাতে নিজেকে অরার বড়ো ছোটো, অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হল। কম্পিউটারের ট্রেনিং নিয়ে সে একটা কম্পিউটার কম্পানিতেই চাকরি করে। ভেবেছিল, ও বুঝি আধুনিকতার অগ্রদূত। এখন পরদেশিয়াকে দেখেই বুঝছে যে, আধুনিকতা কম্পিউটারের মধ্যে নেই। তা আছে, কোনো কোনো মানুষের মনে। তাদেরই জ্বলন্ত জিগীষার প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই কম্পিউটারের উদ্ভাবন। সেই জিগীষা না থাকলে কম্পিউটারের কোনোই দাম নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে অরা দ্রুত-ধাবমান গাড়ির জানালা দিয়ে পথের দুপাশে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। বাঁদিকে সুন্দর দুটি ফরেস্ট বাংলো। ইচ্ছে হল থামে। কিন্তু পরদেশিয়া তার ইচ্ছেশক্তিকে অবশ করে দিয়েছে। মানুষটা সাংঘাতিক। ভয়াবহ। তাকে মান্য না করে উপায় নেই। মনে মনে নার্ভাস হয়ে পড়তে লাগল অরা।

অরা কিছুক্ষণ পরে বলল, অচানকমারের পরে কী? মানে, কোন জায়গা?

কেঁওচি।

বাঃ। ভারি অদ্ভুত নাম তো।

হ্যাঁ। কেঁওচি থেকে আমরা বাঁদিকের পথ ধরে অমরকণ্টকের দিকে যাব। পুরোটাই চড়াই। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। অমরকণ্টক একটা মালভূমির উপরে। অনেকখানি সমান জায়গা সেখানে।

সোজা রাস্তাটা কোথায় গেছে?

সোহাগপুর হয়ে নানা জায়গাতে। সোহাগপুরেও আমাদের কলিয়ারি আছে।

সোহাগপুরের ম্যানেজার কি বাঙালি?

না। বাঙালি ক্রমেই সবজায়গা থেকে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা আছেন বড়ো বড়ো পদে বা ভবিষ্যতে বড়ো বড়ো পদে যাবেন তাঁরাও সবাই প্রায় প্রবাসী বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের আর কোথাওই প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। মাঝে-মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের

নেতা ছাড়া। পশ্চিমবাংলার যে অবনতি, তা পূরিত হতে একশো বছর লাগবে। কী যে ঘটেছে এবং ঘটছে তা তাঁরা যখন বুঝবেন, তখন বড়োই দেরি হয়ে যাবে। একশো বছর লাগবে তোমাদের পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের পুনরুত্থানে। কথাটা লিখে নিতে পারো।

ম্যানেজারের নাম জিজ্ঞেস করলাম আর বাঙালির শ্রাদ্ধ করতে শুরু করলেন।

সোহাগপুরের জি. এম-এর নাম, এম. জি. কে. মূর্তি। মানে ওই জোনের যিনি জেনারেল ম্যানেজার। বাঙালির শ্রাদ্ধ আমি করিনি। পশ্চিমবাংলার রাজনীতির কথা বলছিলাম। আমি শ্রাদ্ধ করতে যাব কোন দুঃখে। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পিণ্ডি দিয়ে এসেছেন গয়াতে গিয়ে।

বাঃ, এগুলো কী গাছ?

সবই শাল। প্রাচীন শাল। বাঁশের ঝাড়ও আছে। অন্যান্য হরজাই গাছ। এই বাঁশগুলোকে ওড়িশাতে বলে কণ্টা বাঁশ।

এর আগে যে বড়ো বড়ো পাতার গাছগুলো দেখলাম সেগুলো কী গাছ?

সেগুলো সব সেগুন। নতুন প্ল্যানটেশন হয়েছে মধ্যপ্রদেশের বনবিভাগ ভারতের অন্যতম ভালো বনবিভাগ। এখানের জঙ্গলে পরিকল্পিত নতুন প্ল্যানটেশন দেখেও ভালো লাগে। আমাদের ছত্তিশগড়েও ওয়ার্ক কালচার আছে। সব স্তরের কর্মচারীরাই নিজের নিজের কাজটা করে। সেটাই তো শেষ কথা।

অমরকণ্টকে কী দেখার আছে?

নর্মদা নদের উৎস আছে। নর্মদা উদগম। শোন নদের উৎসও আছে। তাকে বলে শোনমুড়া। কত উঁচু পাহাড়ের উপরের মালভূমিতে মাটির নিচ থেকে একটি কুণ্ডের মধ্যে জল উঠছে। সেই হচ্ছে 'নর্মদা উদগম'। সেই জল অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে গেছে নর্মদার খাত বেয়ে। এখন নর্মদার খাতে জলই দেখতে পাওয়া যাবে না। বর্ষা শেষে হয়তো দেখা যায়। আমি কখনও আসিনি বর্ষাতে। যেখানে উদগম, সেখানে মস্ত মন্দির হয়েছে। সামনেই বসন্তপঞ্চমী, তার পরের পূর্ণিমাতে মস্ত মেলা বসবে এখানে। অনেক সাধুসন্তদের মঠও আছে। রামকৃষ্ণ মিশনেরও আছে।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে পরদেশিয়া বলল, ভেবে দেখেছি, আমাদের দেশে প্রকৃতি যেখানেই বিশাল, যেখানেই পরম সুন্দর, যেখানেই ভয়াবহ, তা পর্বতচুড়োই হোক কি নদীর উৎস, কি সমুদ্রতীর কি গভীর জঙ্গল সেখানেই হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দিব আছে।

আপনি দেবদেবী মানেন?

নাঃ। তবে আমাদের উপরে যে কোনো শক্তি আছেন, যিনি আমাদের শুভাশুভবোধকে নিয়ন্ত্রণ কবেন, চালিত করেন, আমাদের ভালো হতে, ভালো কাজ কবতে অনুপ্রেরণা দেন, তাঁকে মানি। তিনি তো নিরাকার। তিনি তো আকাশে বাতাসে পাহাড়ে জঙ্গলেই থাকেন। তাঁকে খুঁজতে অন্ধকার মন্দিরের গহ্বরে গিয়ে পাণ্ডাদের বা পুরোহিতদের সাহায্যের জন্যে উমেদারির তো কোনো দরকার নেই।

বাঃ এতক্ষণে একটা দামি কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি একমত।

এতক্ষণ যে এত কথা বললাম, সবই কি শস্তা?

আর চুপ করে রইল।

পরদেশিয়া বলল, করিম, কৌশল্যার দোকানে দাঁড়িয়ো কিন্তু অচানকমারে।

করিম বলল, অচানকমারে এই কদিন আগে বাঘে মানুষ নিয়ে গেছে।

তাই?

পরদেশিয়া বলল, তাই-ই।

''When a man kills a tiger he calls it sport and when a tiger kills a man he calls it ferocity.''

অরা বলল।

পরদেশিয়া বলল, অচানকমারে শিঙাড়া-কালাজামুন খেয়ে তারপর কেঁওচিতে গিয়ে ধাবাতে রুটি আর আণ্ডা-তড়কা দিয়ে লাঞ্চ খাব।

সে কি! আমি যে হট-বক্সে করে ভেজে চিকেন ফ্রাই, আর চিজ স্যান্ডউইচ নিয়ে এলাম। ফ্লাস্কে করে কফিও।

সে সব তোমরা খেয়ো। যস্মিন দেশে যদাচারঃ। আমি ওসব খাব না। ও সব তো রোজই খাই।

এরকম অয়েলি জিনিস খেয়ে হার্ট অ্যাটাক হবে যে।

একদিন খেলে কিছুই হবে না। আর আমার দেশের নিরানব্বুই ভাগ মানুষই তো বারোমাস এই সবই খাচ্ছে। কজন আর পোস্টম্যানের রান্না খেতে পারে বলো? তাদের যা হবে, আমারও তাই হবে। এও একধরনের সোসালিজম। এই ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড-এর জন্যেই আমরা ডুবলাম। পৃথিবীর কোনো সভ্য ও উন্নত দেশে গরিবদের জন্যে আর বড়োলোকদের জন্যে আলাদা খাবার হয় না। পরম ক্যাপিটালিস্ট দেশেও কয়লা খাদের কুলিও যা খাবার খায়, কয়লা খাদের মালিকও সেই খাবারও খায়। খাবার, ওষুধ, জামাকাপড় সবই স্ট্যান্ডার্ডাইজড। যারা বাহুল্য করতে পারে তারা করে, কিন্তু গরিবদের জন্যে পোড়া মবিলের পকৌড়া আর বড়োলোকদের জন্যে পোস্টম্যান এই নিয়ম কোনো উন্নত সভ্য দেশেই নেই। অথচ আমরাই সোসালিজম এর বুলি কপচাই, আমাদেব দেশেই খাবারে ভেজাল, তেলে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, শিক্ষাতে ভেজাল, সবকিছুতেই ভেজাল। সবচেয়ে বড়ো কথা, মানুষে ভেজাল।

এবার একটু থামুন। আমাদের বেড়াবার আনন্দটাই আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন।

অরা বলল।

থামলাম। কিন্তু কোনো সময়ে তো আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে, কোনো সময়ে! সবসময়েই 'আনন্দ' করে চোখ ঢেকে থাকলে তো আজকে যাকে 'চলা' বলে জানছ সেই চলাটাই থেমে যাবে চিরদিনের মতন।

অরা উত্তর দিল না। চুপ করে রইল। ভাবছিল, পরশু এক পরদেশিয়া মিত্রকে জেনেছিল আজ অন্য পরদেশিয়া মিত্রকে জানল। 'মাধুকরীর' পৃথু ঘোষ ঠিকই বলত বোধহয় যে, একজন মানুষের মধ্যে অনেকজন মানুষ থাকে।

দূর থেকে অচানকমার দেখা যাচ্ছিল। করিম বক্স গাড়ির গতি কমিয়ে আনল।

আমরা কোথায় উঠব অমরকণ্টকে? পরু?

স্মৃতি শুধোলেন।

কেন? আমাদের এস. ই. সি. এল-এর গেস্টহাউস-কাম হলিডে-হোমে। চমৎকার। দোতলাতে একটিই ঘর আছে অবশ্য। সামনে এবং ডানদিকে গভীর জঙ্গল। সামনে দিয়ে নর্মদার খাত বয়ে গেছে। ডানদিকে কিছুটা গেলে একটা জলপ্রপাত আছে। দোতলার ঘরে আপনি আর আপনার বোন থাকবেন। আমি থাকব পায়ের কাছে, একতলাতে। সারারাত পায়ের নিচে বসে জপ করেব "দেহিপদপল্লবমুদারম্"

দেহিপদবল্লভমুদারম্।

ওখানে খাওয়াদাওয়ার কী বন্দোবস্ত পরু?

ওখানে কুক-কাম-কেয়ারটেকার নাইয়ার আছে। এমন মুচমুচে গরম গরম দোসা রসম আর সম্বরম খাওয়াবে আপনাদের কাল ব্রেকফাস্ট-এ যে, মনে থাকবে বহুদিন। নাইয়ার হচ্ছে 'পুরুষ সিংহর' অমরকণ্টক এডিশন। ভার্সেটাইল লোক। ওর বউকেও এনেছে কিছুদিন হল। এবং শালাকেও আজ থেকে দশ বছর পরে অমরকণ্টক যদি দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তোরাঁতে ভরে যায়

তাহলে আশ্চর্য হবেন না বউদি। ওর শালা সদ্য এসেছে। হিন্দি বলতে, সর্বসাকুল্যে অতি কষ্ট করে বলতে পারে—"হামারা হিন্দি নেহি আতা"। একেই বলে অ্যাডভেঞ্চারিজম। এরাই যুগে যুগে নতুন দেশ আবিষ্কার করে সেখানে রাজত্ব বিস্তার করেছে।

তারপর অরার দিকে ফিরে বলল পরদেশিয়া, আচ্ছা এই নাইয়ারদের দেখেও কি তোমাদের কলকাতার বাঙালিরা কিছু শিখতে পারল না? বলো? অরা।

অচানকমারে গাড়ি থেকে নেমে কৌশল্যাদের দোকানের বেঞ্চে বসেছিল অরা ও স্মৃতি।

অরা চুপ করে অচানকমারের দোকানের মালিকের মেয়ে কৌশল্যার দিকে চেয়েছিল। তারই বয়সি হবে। জিজ্ঞেস করে জানল যে কৌশল্যার দুই ছেলে, চার মেয়ে।

মনে মনে বলল, মেরি ভারত মহান। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার কি টি. ভি-র পর্দাতে আর ইংরেজি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেই থেমে থাকবে? খাদ্য, পণ্য, বাসস্থান, পোশাক এই সমস্ত ক্ষেত্রে যতই উৎপাদন বাড়ুক না কেন মানুষের উৎপাদন না কমাতে পারলে এই দেশের যে কোনোই ভবিষ্যৎ নেই এই কথাটা কি গদিতে-আসীন মানুষগুলোর একজনও ভাবেন না? আজও যদি না ভাবেন তবে কবে ভাববেন? নেহরু পরিবার দেশের যা ক্ষতি করার তো করেছেনই চল্লিশ বছর ধরে। এখনও কি তার সংশোধন হবে না?

অমরকণ্টকে, বিকেলে পৌঁছোল। ওদের জন্যে বরাদ্দ ছিল দোতলার একটি মাত্র ঘর। সঙ্গে লাগোয়া বারান্দা। কিন্তু সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর বাংলোতে ঢুকতে গিয়েই দেখা গেল বহু জিপ গাড়ি, পুলিশ, এবং মানুষের ভিড়।

এ কী ব্যাপার?

পরদেশিয়া আপন মনে বলল।

ড্রাইভার করিম বক্স বলল, কোই অফিসার আয়া হুয়া লাগতা হ্যায়।

পুলিশদের রাগি রাগি চোখের দৃষ্টি পার করে বাংলোতে তো কোনো মতে পৌঁছোনো গেল। কিন্তু গাড়িটা গেটের কাছে দাঁড় করাতেই কে একজন বললেন, আররে! কেয়া কর রহা হ্যায় ড্রাইভার? হিঁয়া নেহি, আগে কিজিয়ে গাড়ি, আগে কিজিয়ে!

আরে! নিজেদের বাংলোতে ঢুকে নিজেরাই চোর! হলটা কী?

পরদেশিয়া, করিম বক্সকে গাড়ি এগিয়ে নিতে বলে বলল, ব্যাপারটা দেখে আসছি। তোমরা গাড়িতেই বসো বউদি, পাঁচ মিনিট।

পাঁচ মিনিট পরেই পরদেশিয়া ফিরে এল। সঙ্গে লম্বা, কালো, সুদর্শন, সপ্রতিভ একজন দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক। পরনে ফুলহাতা সোয়েটারের উপরে কোট।

পরদেশিয়া আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, এই যে ফেমাস নাইয়ার। যার কথা বলছিলাম পথে।

নাইয়ার বলল, নমস্তে মেমসাব।

পরদেশিয়া বলল, ডিভিশনাল কমিশনার এসেছেন। তাই দুজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও আসবেন। উপরের ঘরে উনি থাকবেন। কালকের দিনটাও থাকবেন। কারণ এখানে কনফারেন্স আছে। সোহাগপুর থেকে আমাদের জি. এম. মূর্তিসাহেব এবং এস্টেট ম্যানেজার শংকরণ সাহেবদেরও আসবার কথা। আসবেনও। কিন্তু তাঁদেরও জায়গা হবে না এই বাংলোতে।

তবে? তাঁরাই বা কোথায় থাকবেন?

তাঁরা খবর পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই। তাই সম্ভবত আজ না এসে, কাল ভোরেই রওনা হয়ে এসে পৌঁছে মিটিং করে আবার ফিরে যাবেন বিকেলে।

তবে আমরা কোথায় থাকব?

পরদেশিয়া শুধোল।

চলুন এক সেকেন্ডে আমি পাশের রামকৃষ্ণ ধামে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। খাওয়াটা এখানে এসেই খেয়ে যাবেন। তবে ওখানের বাথরুম এত ভালো না। গিজারও নেই। ঠান্ডাতে খুবই কষ্ট হবে আপনাদের, কিন্তু কী করব বলুন?

না। তুমি আর কী করবে?

করিম বক্স নাইয়ারকে বলল, রামকৃষ্ণধাম আমার দেখা আছে। আপনি এখানে সামলান। আমিই নিয়ে যেতে পারব।

অরা বলল, আমাদের রিজারভেশন আগে করে রাখেননি বড়ো জামাইবাবু?

তা করবেন না কেন? পনেরোদিন আগে করা ছিল। এটা তো আমাদের কোম্পানিরই হলিডে হোম। গতকালও পরিতোষ কনফার্ম করেছে।

পরদেশিয়া বলল।

তবে?

তবে আর কী? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডিভিশনাল কমিশনার; এঁরাই তো দেশের রাজা। আর মন্ত্রীটন্ত্রী হলে তো কথাই নেই!

মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেন্টের কোনো থাকার জায়গা নেই অমরকণ্টকে? মানে বাংলা টাংলো?

থাকবে না কেন? অনেকই আছে, কিন্তু মানুষও যে অনেক। এই মিটিং তো আমাদেরও স্বার্থে, মানে কোম্পানির। মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজমের বাংলোও আছে। তাছাড়া ভারত অ্যালুমিনিয়াম, হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম সকলেরই বাংলো আছে সার্কিট-হাউসও আছে।

তবে?

তবে আর কী? সব জায়গাতেই এঁদের লোক ভর্তি হয়ে আছেন। তহশিলদার, এসডিও. বিডিও। অফিসারের অভাব আছে কি কোনো? সূর্যের পাশে তো অগণ্য অন্য উপগ্রহ থাকবেই।

নাইয়ার, মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, মেমসাব একতলার একটা ঘর আপনাদের দিতে পারতাম, পরদেশিয়া সাহেব না হয় অন্য কোথাও শুতেন রাতে, কিন্তু সেখানেও কলকাতা থেকে এক গন্ডারমার্কা রাইটার এসে জাঁকিয়ে বসে আছেন। তিনিও ভি. আই. পি.। তাঁকেও তো বের করে দেওয়া যায় না।

কোন লেখক? কলকাতার লেখক? কোম্পানির গেস্ট?

পরদেশিয়া জিজ্ঞেস করল। নাম কী?

নায়ার বলল, গুঁইয়া সাব।

গুঁইয়া?

অবাক হয়ে বলল পরদেশিয়া।

গুঁইয়া বলে তো কোনো লেখক নেই কলকাতায় ওরকম কোনো পদবিই নেই বাঙালিদের।

অরা বলল।

কে এল? বলতো?

পরদেশিয়া বলল।

অচানকমারের জঙ্গলের বড়োকা বাইসনের মতন জবরদস্ত মোটা ষণ্ডা-গুন্ডা রাইটার স্যাব বুধিদেও গুঁইয়া।

বুদ্ধদেব গুহ কি?

ভুরু তুলে অরা শুধোল।

হোনে সকতা।

তাই নাকি? চল চল অরা, গিয়ে আলাপ করি। একটা অটোগ্রাফ তো নিই গিয়ে।

স্মৃতি বললেন, উৎসাহের গলাতে।

ওর মধ্যে আমি নেই।

অরা বলল।

কেন? অটোগ্রাফ নিবি না? এমন সুযোগ!

স্মৃতি বললেন।

না।

না কেন?

লেখা পড়ি। ভালোই লাগেও না। ঠিকই আছে। তবে, লেখকের সঙ্গে পাঠকের দেখা না হওয়াই ভালো। মনের মধ্যে যে ছবি থাকে, তার সঙ্গে না মিললেই মুশকিল। তারপর অচানকমারের বাইসনের মতন দেখতে হলে আমি তাঁকে দেখতে আদৌ ইন্টারেস্টেড নই।

তারপর অরা পরদেশিয়াকে বলল, তার চেয়ে চলুন, দিন থাকতে থাকতে এখানে যা দেখার আছে তা ঘুরে দেখেই নিই। যেখানে থাকতে হবে, সেখানে বাথরুম যদি ভালো না হয় তবে রাতারাতিই রওয়ানা দেব। থাকবই না এখানে।

নাইয়ার বলল, ভেরি ভেরি সরি ম্যাডাম। হামলোগ সব হেল্পলেস হ্যায়। আজহি সুব্বে খব্বর মিলা। উ রাইটার ভি কালহি চল জায়েগা হিঁয়াসে।

আয়া কব উনোনে?

পরদেশিয়া শুধোল।

আজহি না আয়া! এহি তো আধোঘণ্টা পহিলে আর চুকা। উনকাভি ইতনা হল্লা-গুল্লা, পুলিশ, জিপ বুটকা খটাখট আওয়াজ ইকদম না-পসন্দ। উনোনে লিখনেকি লিয়ে আয়া থা। সাতদিন ঠারনেকা বাত থা। ঠাহরনেসে, কোই কিতাবমে হামারা ভি নাম আ যানে শকতা থা। মেবি বদনসিবি। ক্যা করুঁ?

করিম বক্সকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বাইরে যেতে বলল, পরদেশিয়া।

অরা বলল, সব জায়গাই সমান। পশ্চিমবঙ্গেও কটা ভালো ট্যুরিস্ট লজ আছে, সেখানেও বুকিং করা-না-করা সমান। যে-কোনো মুহূর্তেই কোনো মিনিস্টার বা আমলা যাবেন বলে বুকিং ক্যানসেল হয়ে যাবে। মুকুটমণিপুর জায়গাটা এ জন্যে আমার দেখাই হল না। অনেক সময়ে ঘরে লোক থাকলেও তাঁকে ঘর খালি করে দিতে হয়। 'পাবলিক সারভেন্টসরা' কোথায় জনগণের চাকর হবেন, না, তাঁরাই জনগণকে চাকরের মতন ট্রিট করেন। এমন ঘটনা ইংল্যান্ডে, ক্যানাডাতে, স্টেটসে ঘটার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

পরদেশিয়া বলল, আমার দাদার বন্ধু ডা. কান্তি হোড় টরন্টো থেকে চিঠি লিখেছিলেন বছর দুই আগে যে, রাতে পুলিশ একজনকে অ্যারেস্ট করেছিল। এক মিনিস্টার তাঁর পরিচিত থাকাতে, থানাতে ফোন করে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, মানুষটির বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? মানে, আইনের কোন ধারায় তাঁকে আটক করা হয়েছে? উনি তাকে ছেড়ে দিতেও বলেননি বা অন্য কোনোরকম অনুরোধ বা জোরও খাটাননি। কিন্তু ফোন যে করেছিলেন থানাতে এই অপরাধেই পরদিন পার্লামেন্টে হইচই। এবং তার ফলে সেই মিনিস্টারকে রেজিগনেশন দিতে হয়েছিল। গাধা উল্লুদের ভোটে যে দেশে মানুষে ক্ষমতাতে আসে সেই দেশে ক্ষমতাসীন নেতা ও আমলারা দেশের আসল মালিক যারা, তাদেরই গাধা উল্লুর মতোই ট্রিট করে। ক্ষমতা কি কেউ কাউকে দেয়? ন্যায্য ক্ষমতা ও প্রাপ্য সম্মান আদায় করে নিতে হয়। আমরা কেউই কোনো অন্যায়েরই প্রতিবাদ করে আঙুল তুলেও করি না। আর করি না বলেই, অন্যায়টাকেই ন্যায় বলে মান্য বলে মেনে নেয় সবাই। যে হাত তুলে প্রতিবাদ করতে হবে সেই হাতটিও যে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। অন্যায়কারী আর অন্যায় সহ্যকারী দুইয়ের চরিত্রই যদি সমান হয়, তবে আর কী হবে!

অরা বলল।

যে-লেখক এই অন্যায়ের সাক্ষী রইলেন তিনি তো এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারেন? লেখকদের কি কোনো দায়িত্ব-কর্তব্যই নেই? তাঁরা তো আমার মতো সামান্য কর্মচারী নন আধা সরকারি কোম্পানির?

পরদেশিয়া বলল।

বুধিদেও গুঁইয়া না কি নাম বলল নাইয়ার, তিনি এবং তাঁরাও অচানকমারের বাইসনদের মতনই নিজেদের সুখ ও প্রতিপত্তি, সম্মান এবং টাকা নিয়েই ব্যস্ত। দেশের-দশের কথা ভাবেন ক-জন লেখক আর? বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মুনশি প্রেমচাঁদের মতন লেখক আজকাল হচ্ছে কোথায়? তাঁরাও তো ওই উল্লু-পাঁঠাদেরই একাংশ। যেমন জনগণ, তেমনই লেখক পয়দা হচ্ছে আজকাল।

শুধু তাঁদের দোষ দিয়েই বা লাভ কী? আমি তো তো আজকাল বাংলা বই এখানে পাই না বলে, ভালো করে বাংলা পড়তেই পারি না। বাংলা বই বা কাগজ যাঁরা ছাপান তাঁদেরও প্রবাসী বাঙালিদের জন্যে কিছুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে তো একটুও মনে হয় না। অথচ এ বাবদে তাঁদের প্রত্যেকেরই অনেকই করণীয় ছিল। আমি তো বাঙালিদের কাছে সচমুচ পরদেশিয়াই হচ্ছি। আমার কোনোই এক্সপেকটেশন নেই কোনো বাঙালি লেখকের কাছে। কিন্তু বাঙালিদের তো আছে। যাঁরা দুইবাংলার বাঙালি। তাঁরাই বা চুপ করে থাকেন কেন?

অরা, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তাঁদেরও নেই। এখনকার অধিকাংশ লেখকের সঙ্গে পাটের বা কয়লার বা কাস্টিংয়ের ব্যবসাদারেরও কোনো তফাতই নেই। বুধিদেও গুইয়াও হয়তো ব্যতিক্রম নন।

এসব খুবই ডিসটার্বিং কথাবার্তা। তোরা চুপ কর তো একটু অরা।

যা কিছু সত্য, যা কিছুই কঠিন তা অবশ্যই ডিসটার্বিং। সবকালে; সবদেশে। আমরা নিজেদের বিন্দুমাত্র ডিসটার্ব করতে চাই না বলেই তো আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের মন্ত্রীদের, আর আমলাদের এবং আমাদের ইলেক্টোরেটেরও প্রকৃতি আজ এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই এর জন্যে দায়ী। অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহ্য করে; তারা দুজনেই সমান অপরাধী। দুই দলের কেউই একটুও কম অপরাধী নয়।

স্মৃতি বললেন, হালকা কথা বল, হালকা কথা! আমার মাথা ধরে যাচ্ছে পরু।

অরা বলল, বড়দি, ওই গভীর জঙ্গলের নির্জন পথ দিয়ে রাতে ফিরবে? ফিরতে ফিরতেও তো গভীর রাত হয়ে যাবে।

অচানকমারের জঙ্গলে বাঘ বাইসন ভাল্লুক সন্ধের পরেই বেরোবে। আমি কতবার সামনাসামনি পড়েছি মুখে মুখেই। আর গভীর রাতের তো কথাই নেই।

করিম বক্স বলল।

আরে, আগে রামকৃষ্ণ ধামটা দেখে নাও। বিছানা-টিছানা কি আছে? রাতে ঠান্ডা লাগবে কি না? অনেক উঁচু জায়গা তো! জার্নি করে এসেছ, অচানকমার আর কেঁওচিতে খেয়ে দেয়ে, সইয়ে এসেছ, তাই ঠান্ডাটা বুঝতে পারছ না। যদি থাকো তো রাত নামলেই বুঝতে পারবে ঠান্ডার রকম।

আসল হল বাথরুম। বাথরুমগুলো যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তবেই অন্য সব কষ্টই স্বীকার করতে পারি। আর গিজার? গিজার না থাকলে কী হবে?

অরা বলল।

সে, বালটি করে গরম জল দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাবে।

তবে চল পরু। আগে দেখেই নেওয়া যাক।

তাই চলুন।

কিছুক্ষণ পথের এবং সামনের নর্মদার খাতের দৃশ্য দেখে ওরা গিয়ে হর্ন দিল। অনেকগুলো ঘর। এলাহি বন্দোবস্ত। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের নয় এটি। নামটিই রামকৃষ্ণদেবের। একটি ছেলে দৌড়ে এল! পেছন থেকে একটি নোলকপরা মেয়ে ডাকল তাকে, 'মুন্না' 'মুন্না' বলে।

পরদেশিয়া হেসে বলল, দেখেছ বউদি। আমাদের নাইয়ার ইতিমধ্যেই ওয়ান-ফোর্থ অমরকণ্টককে তামিলনাড়ু বানিয়ে ফেলেছে।

ওদের প্রেম আছে নিজেদের জাতের উপরে। সবাই তো বাঙালিদের মতন নয়। যাও। এবারে নামো তোমরা। মুন্না, মেমসাব লোগোঁকি কামরা দিখলাও।

করিম প্রায়ই আসে। চেনে মুন্নাকে। প্রথমেই একটা পাঁচ টাকার নোট ওর হাতে ধরিয়ে দিল। মৃতসঞ্জীবনী সুরা। পকেটভর্তি টাকা থাকলে এদেশে সাদাকে কালো, কালোকে সাদা, শূন্যকে ভর্তি, ভর্তিকে শূন্য করা যায়। টাকাই এখন সবচেয়ে বড়ো ম্যাজিশিয়ান।

করিম কিছুটা গিয়ে, ওদের সঙ্গে ফিরে এল। এতখানি পথ এসেছেন গাড়িতে, মহিলাদের বাথরুমে যাওয়ারও প্রয়োজন।

কিছুক্ষণ পরেই ওঁরা ফিরে এলেন। নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে করতে।

তোর এটা বাড়াবাড়ি অরা। একটা রাতও কি থাকা যেত না?

ইমপসিবল বড়দি। ওই বাথরুমে আমি যেতেই পারব না। চান তো আউট অফ কোয়েশ্চেন।

কেন? খারাপটা কী? কলে জল আছে। দিব্যি, নতুন লেপ-তোশক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে না থেকে, রাতে কি বাঘের মুখে পড়বি?

তুমি যাই বলো, গুহার বাঘ অথবা বুধিদেও গুঁইয়া, কারও খপ্পরে পড়তেই আমি ভীত নই, কিন্তু ওই রকম। বাথরুমওয়ালা ঘরে আমি থাকতে পারব না। প্লিজ বড়দি, আমাকে ক্ষমা করো। আমার জীবনে ওই একটিই বিলাস।

এক রাতের জন্যেও কি বিলাস ত্যাগ করা যায় না?

না বড়দি! রাগ কোরো না। মাপ করো। আমার পক্ষে ইম্‌পসিবল। সঙ্গে ড্রেসিং রুম-টুম তো কলকাতাতেও নেই বড়দার বাড়িতে। কিন্তু কমোড আছে; গিজার আছে। বাথরুম ভিজে থাকে না।

হুঁ। তোরা দেশ দেখবি, না, আরও কিছু।

দেশ দেখে মানুষে, চাক্ষুষ দেখা আর কল্পনা মিশিয়ে। সবকিছুকেই কি ঘষে ঘষে দেখতে হয়? অমরকণ্টকে যা দেখার তা আমার দেখা হয়ে গেছে। তুমি বলো তো, আমি একটি বই লিখেও দেখিয়ে দিতে পারি। তা, তোমাদের বুধিদেও গুঁইয়ার বইয়ের চেয়ে কিছু খারাপ হবে না।

যাক। তোর সঙ্গে আর তর্ক করব না।

পরদেশিয়ার কানে গেছিল সবই। কিন্তু দুইবোনের বাথরুমের মান-সম্পর্কিত মতবিরোধ নাক গলানো এবং স্বামী-স্ত্রী ঝগড়াতে নাক গলানো একই ব্যাপার। পরে মিলমিশ হয়েই যাবে। কিন্তু দুজনেরই কাছে মন্দ হবে শেষে ভলন্টিয়ারি করতে-যাওয়া আর্বিট্রেটরই!

পরদেশিয়া গলা তুলে বলল, কি সাব্যস্ত হল বউদি? তাহলে?

তুমি তো সবই শুনেছ। শুনেও ড্রামা করছ?

তাহলে, এখুনি দ্রষ্টব্য স্থান সব দেখে নিয়েই রওনা হওয়া?

পরদেশিয়া আর কথা না বাড়িয়ে বলল।

রাতের খাওয়াদাওয়া?

সঙ্গে তো কিছু আছেই। তা তো ধরাই হয়নি।

কেঁওচির ধাবাও হয়তো খোলাই পাব। যদি এখানে খুবই দেরি না করো। তবে কেঁওচিতেও বেশি দেরি করাটার ঠিক হবে না।

পরদেশিয়া বলল।

খাওয়ার দরকারই বা কী, পথে চা খেলেই হবে। একেবারে বাড়ি গিয়ে, বনবাসাকে বলব, ডালে-চালে খিচুড়ি চাপিয়ে দেবে।

খিচুড়িই যদি হয়, তবে আমার কিন্তু তার আগে দুটো 'রাম' খেতেই হবে। নইলে মুখে স্বাদই লাগবে না।

রাম-শ্যাম আমি জানি না। তোমার দাদার সেলারের চাবি দিয়ে দেব। তুমি দেখে নিয়ো। তা, এতই যদি নেশা! সঙ্গে নিয়ে এলেই তো পারতে।

বউদি, নেশা আমার কিছুই নেই। তবে পান খাই, জরদা খাই, সুজিত মিত্রের শ্বশুরমশাই ভালোবেসে দিলে, নস্যিও নিই। মাঝে মধ্যে মদও খাই। রবীন্দ্রনাথের 'রবিবারের' নায়ক সেই অভীক বলেছিল না? "আমি কোনো নেশাকে পেতে পারি কিন্তু কোনো নেশা আমাকে পাবে। সেটি হচ্ছে না।" বা এইরকম কিছু? রবীন্দ্রনাথের নায়ক না হয়েও আমি তা মেনে চলি।

বক্তৃতা ছাড়ো। অরার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে আনোনি বুঝি?

স্মৃতি বললেন।

অরা টিপ্পনী কেটে বলল, আপনার সব গুণই আছে দেখছি!

পরদেশিয়া বলল, আজ্ঞে অরাদেবী, তা আছে। সত্য গোপন আমি করি না। কিন্তু গাড়িতে জার্নি করতে হলে, ডিম আর 'রাম' কখনওই সঙ্গে রাখতে নেই।

কেন?

আপনাদের ওই বুধিদেও গুঁইয়ারই একটি গল্প পড়েছিলাম, শারদীয়া আনন্দমেলাতে; মিসেস পাল পড়তে দিয়েছিলেন, নাম 'ডিমেংকারী'। মানে, কেলেঙ্কারির ডিমজ ভার্সন। তাছাড়া, নিজস্ব অভিজ্ঞতাও আছে।

বলেই বলল, চল করিম, সময়ে নষ্ট করা নয়। প্রথমেই কি নর্মদা উদগমে যাবে? তারপর যাবে কপিল-ঝোড়াতে? কপিলমুনির আশ্রয় কিন্তু অনেক নিচে। অনেকই সিঁড়ি ভাঙতে হবে। অথচ না নামলে তো দেখতেও পাবে না নর্মদার ধারা। এমনিতে তো নর্মদা অন্তঃসলিলাই এখানে।

করিম গাড়ি স্টার্ট করল।

এই অমরকণ্টক কিন্তু বিন্ধ্যপর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু চুড়োতে, তা জানো কি বউদি? এই পর্বতের নাম এক সাহেবের নামে ; 'মেকলে'। যদিও দেখছো পুরো জায়গাটাই সমান। আসলে মালভূমি। সেই যে অগস্ত্যমুনি বলেছিলেন, মাথা নিচু করতে, সেই থেকে বিন্ধ্য মাথা নিচু করেই আছেন।

বলেই, অরাকে উদ্দেশ করে পরদেশিয়া বলল, জানো নিশ্চয়ই, এই পৌরাণিক কাহিনি, তুমি!

পৌরাণিক কাহিনি? না তো!

উ্যা শুড বি অ্যাশেমড অব ইয়োরসেল্‌ফ। না জানো নিজের দেশের বেদ উপনিষদ-পুরাণের কিছু না জানো অন্যদেরও কিছু। এখন তো তোমাদের কলকাতাতে স্টার-টিভির 'বোল্ড অ্যান্ড দ্য বিউটিফুল' সিরিয়াল এইড্‌স-এর চেয়েও মারাত্মকভাবে সংক্রামিত হয়েছে বলে শুনি। সত্যি!

তোমরা না-ঘরকা, না-ঘাটকা। মাধুরী দীক্ষিত, মাইকেল জ্যাকসন, 'চোলিকে পিছে ক্যা হ্যায়' আর 'গুটুর গুটুর' একই সঙ্গে বেটে খাও তোমরা। তোমাদের প্রত্যেকেরই THATS CHASTISEMENT-এর প্রয়োজন। কিন্তু করছে কে? করাচ্ছে কে? THATS THE QUESTION!

অরা বলল, থামুন তো! বড্ড বাজে বকেন আপনি। আসবার সময়ে যে একটি বাঁধানো জায়গা দেখলাম, সেটার নাম কী? তাই বলুন।

কখন দেখলে?

আহা! অমরকণ্টকে ঢোকবার সময়েই।

ও! ঢোকার কিছু আগে বলো। ওই তো কবির-চবুতরা। সন্ত কবিরসাহেবের পীঠস্থান। ওই জায়গার কাছাকাছি আমিও সাধনায় বসব। নাম হবে পরদেশিয়া চবুতরা।

কেন? কিসের সাধনা?

সেটা উহ্যই থাকুক।

এই জায়গাটার হাইট কত?

প্রায় এগারোশো মিটারের মতন। হিলস্টেশন হিসেবে দেখে অমরকণ্টককে, তোমার মতন পাতি মেমসাহেবরা। আর বউদিরা দেখে, তীর্থস্থান হিসেবে। যার যেমন চোখ। তপস্বী মহাদেবের পা থেকে নর্মদার উদগম।

তারপর পরদেশিয়া বলল, জানো তো। তপস্বী মহাদেবের পা থেকে দেবী নর্মদার আবির্ভাব। দেবীর গায়ের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম থেকেই নর্মদা নদী সৃষ্টি।

কি জানি বাবা! এই হিলস্টেশানে এত ঘাম হয় কোত্থেকে! তাছাড়া নর্মদাকে তো চিরদিন 'নদ' বলেই জানতাম। নর্মদা, 'দেবী' হলেন কী ভাবে? আমাদের হিন্দুদের এই দোষ। বৈষ্ণবেরা বিনয়ের অবতার হলেও উপাস্য দেবতা তাঁদেরও একজন পুরুষই। শাক্তরা তো মহাদেবেরই ভক্ত। কিন্তু অন্য হিন্দুদের উপাস্যদের মধ্যে অধিকাংশ 'দেবী' হওয়াতেও যেন যথেষ্ট হল না, নর্মদা নদকেও দেবী বানানো কেন জোর করে? এই জন্যেই আমরা এমন ম্যাদামারা।

পরদেশিয়া এই প্রথমবার বিপদে পড়ল।

বলল, ভেরি পার্টিন্যান্ট কোয়েশ্চেন। এই প্রশ্নটার উত্তর, জেনে শুনে নিয়ে তবেই দেব তোমাকে পরে।

কিন্তু দেবেন তো?

শিয়োর।

কোনদিকে চললে করিম বক্স?

উত্তেজিত হয়ে বলল পরদেশিয়া। গাড়ি ঘোরাও। আগে শোনমুড়াটা ঘুরে আসি। শোনের উৎস। ঝরনা হয়ে জল পড়ছে অনেক নিচে। তারপর অন্য সব জায়গাতে যাওয়া হবে'খন।

জি সাব।

করিম বক্স বলল।

শোনমুড়ার কাছে দেখবে মাথার উপরে কেবল-কার এর লাইন। বাক্সে করে বক্সাইট যায় মাইন থেকে নিচের লোডিং পয়েন্টে। ভারত অ্যালুমিনিয়ামের একটা চমৎকার গেস্টহাউসও আছে। আমরা শর্টে বলি 'বালকো'। যেমন বলি, 'হিন্ডালকো' হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়ামকে। তাদেরও মাইনস আছে। যে পথ দিয়ে আমরা অমরকণ্টকে এলাম, সেই দুপাশের পাহাড়ে বক্সাইট ছাড়া মাইকাও আছে। মানে, অভ্র। রাতে, লক্ষ্য করলে দেখবেন, গাড়ির হেডলাইটে চিকচিক করছে।

তাই? স্মৃতি বললেন।

ও আরেকটি কথা বলে দিই বউদি তোমাদের।

পরদেশিয়া বলল।

কী?

বিশেষ করে অরাদেবীকে।

কী?

এবারে অরা বলল।

নর্মদা উদগমের মন্দিরে ঢুকে এগারোকোণা মার্কণ্ডেয় কুণ্ড তো দেখতে পাবেই। তারই বাঁদিকে ছোটো একটা কুণ্ড, 'নর্মদা উদগম'। সেখানেই নিচ থেকে জল উঠছে। এবং সেই কারণেই অমরকণ্টক-অমরকণ্টক। কিন্তু সেখানে লেখা আছে 'কেবল আচমনকি লিয়ে'। অরাদেবী আবার পা-টা ধুয়ো না যেন সেখানে। বা ছোটো-বাইরে করতে বোসো না। মারধোর খাবার মধ্যে আমি নেই!

স্মৃতি হেসে উঠলেন জোরে।

পরদেশিয়ার কথা শুনে।

অরা খুব রেগে বলল, এতে হাসির কী হল বড়দি তোমার? যত্ত বাজে কথা। ব্যাড টেস্ট!

শুধু পাঁচিল দেওয়া নর্মদা উদগমের মন্দিরের ভেতরেই ঢুকেছিল ওরা। অন্য কোনো মন্দিরের ভিতরে ঢোকেনি। তবে কপিলধারা ও কপিলাশ্রমে নামতে উঠতে অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়েছিল। চারদিকে শুধু গভীর জঙ্গল আর পাহাড়। বিন্ধ্য রেঞ্জ।

অরা ভাবছিল ছেলেবেলাতে বেনারসের কাছের বিন্ধ্যাচলে গিয়ে ভেবেছিল, ওটাই বুঝি বিন্ধ্যরেঞ্জ। বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির আছে বলে ওই নাম হয়তো। কে জানে! মধ্যপ্রদেশের এই বিন্ধ্যরেঞ্জই হয়তো উত্তরপ্রদেশ অবধি চলে গেছে। ভারতের রিলিফ ম্যাপ দেখলে বোঝা যাবে। সবজান্তা পরদেশিয়া মিত্রও জানতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করল। ওকে বোকা বলে খ্যাপাবে। যে মানুষগুলো ওকে বোকা বানাবার মতন বেশি জানে তাদের মোটেই পছন্দ করে না অরা।

নর্মদাদেবীর মূর্তিটা কালো কষ্টিপাথরের। এক হাতে তাঁর বরাভয়, অন্য হাতে কমণ্ডলু। বড়দি দেখিয়ে দিলেন। অন্যদিকে দেবতা নর্মদেশ্বর মহাদেব। মহাদেবের পায়ের থেকে জন্ম নর্মদার তাই মহাদেবের আরেক নাম নর্মদেশ্বর। শংকর ও নর্মদার যুগলমূর্তিও রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে পার্বতী, বালাসুন্দরী, শ্রীদুর্গা, রোহিণী, গোরক্ষনাথ, কার্তিক, মনসা ইত্যাদি নিজের নিজের মন্দিরে। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সামান্য কজনই আছেন এখানে।

বড়দি বললেন, প্রতিবছর শিবরাত্রি আর নাগপঞ্চমীর দিনে বিরাট মেলা বসে এখানে। কত তীর্থযাত্রীই না তখন আসেন!

নাগপঞ্চমীটা কোন সময়ে?

এই তো। বেশি দেরি নেই। বসন্তপঞ্চমী তো এসেই গেল। এর কিছুদিন পরই। নর্মদা, জানিস তো, পশ্চিমবাহিনী। কাশীর কাছের গঙ্গা যেমন উত্তরবাহিনী।

তাই?

অরা বলল।

বড়দি বললেন, কাল রেস্ট করে নে। পরশু তোকে আরেকবার মহামায়ার মন্দির আর পালিতে মহাদেবের মন্দির দেখাব। মহামায়ার মন্দিরে দুর্গাপুজোর আগের থেকে সকলে 'জোত' জ্বালায়। জোত মানে জ্যোতি আর কি! আগুন জ্বালায়, যজ্ঞের মতো। এলে, দেখতে পাবি দেওয়ালে হাজার হাজার নাম লেখা। এখানের কোনো মন্দিরের পাণ্ডারা বা পুরোহিতেরাই কিন্তু পুরী বা দেওঘর বা কালীঘাটের বা গয়ার মতন নয়। কোনোরকম জোরজার বা অত্যাচারই এঁরা করেন না। দেখলেও ভালো লাগে।

সব দেখে শুনে ওরা রওনা হতে হতে বেলাও পড়ে এল।

চা খাবে না বউদি?

খেলে তো ভালোই হত। ভালো চা এখানে পাবে?

আমার সঙ্গে টি-ব্যাগ আছে। গরম জলে দুধ আর চিনি দিয়ে দিতে বলছি কোনো দোকানে, টি ব্যাগ ডুবিয়ে চামচে দিয়ে নাড়িয়ে খেলেই হবে।

আমার চায়ে কিন্তু দুধ চিনি থাকবে না।

অরা বলল।

কেন? ডায়াবেটিস হয়েছে নাকি?

না, তা নয়। অ্যাসিডিটি হয়। অম্বল।

হবেই। মাঝে মাঝে পোড়া মবিলে ভাজা শিঙাড়া; নর্মদার জলের, পুরোনো মোজাতে ছাঁকা চা-টা না খেলে ইমিউনিটি বাড়বে কী করে? অত পুতুপুতু করে বাঁচলে অমনই হয়।

চা খাওয়ার পরে যখন করিম বক্স গাড়ি স্টার্ট করল তখন পশ্চিমে সূর্য হেলে গেছে। দেখতে দেখতে গাড়ি গহন গভীর শাল-জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ অবধি কমলারঙা আলোর রেশ ছড়িয়ে রইল পথে। তারপরই সেই রেশকে, তুলির ডগাতে করে শিল্পী যেমন রং ওঠান তেমনি করে কোনো অদৃশ্য হাত তুলে নিয়ে, গাছেদের মাথায় মাথায় লাগিয়ে দিলেন। তারপরই গাড়িটা একটা বাঁক নিতেই ঘনান্ধকার গ্রাস করে ফেলল দু পাশের জঙ্গলকে। হেডলাইটের আলোটা শুধু অন্ধকারকে আলো দিয়ে চিরে, গাড়িটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

বেশ ঠান্ডা আছে। অরা শালটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিল। মোজাকেও ব্যাগ থেকে বের করে পায়ে পরে নিল। বড়দি তো সেই সকাল থেকেই পরে রয়েছে। একটু বেশি শীতকাতুরে আছে বড়দি। পরদেশিয়া মিত্রেরই ঠান্ডা-টান্ডা লাগে না মনে হল। করিম বক্সেরও তাই। এখন রোজা চলেছে করিমের। সারা দিন থুথুও গেলা বারণ। সন্ধের পরে খাবে। পরদেশিয়া বলেছেন, কেঁওচিমে ডাটকে খিলায়গা তুমকো করিম, মোরগা আচ্ছা বানাতা উওলোগ।

অরা বলল, যাদের গাড়ি নেই, তারা কী করে আসে এখানে?

কেন? বাসে আসে। তবে অধিকাংশ যাত্রীরাই আসেন পেণ্ড্রা রোড হয়ে। রেল স্টেশন আছে তো পেণ্ড্রা রোডে। সম্ভবত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল হবে। অনেকে বিলাসপুর থেকেও আসেন বাসে করে। গাড়ি আর কজনের আছে? তার উপরে পেট্রলের যা দাম বাড়ল।

স্মৃতি বললেন, এখানে যদি যে-কোনো কলোনিতে হেঁটে বেরোস, তাহলে দেখবি প্রত্যেক গ্যারাজে একটি করে অ্যামবাসাডর আর একটি করে স্কুটার। সকলে এমনিতে স্কুটারেই কাজ সারেন, অফিসে যান: খুব সিনিয়র অফিসারেরা ছাড়া। শনি-রবিবারে গাড়ি বের হয়। অবশ্য যাঁদের মারুতি, তাঁরা স্কুটারে না চড়ে মারুতিতেই চড়েন।

কী করে রোজ গাড়ি চড়ব বউদি? ট্রান্সপোর্ট অ্যালাউন্স তো মোটে ছশো টাকা। ছশো টাকাতে কি গাড়ি মেইনটেইন করা যায়? ড্রাইভার তো কারোরই নেই। নিজে চালিয়েও চোখে অন্ধকার।

পাঁজাসাহেব যখন এলেন চেপে ধরলে না কেন সকলে মিলে?

কোন পাঁজাসাহেব?

আহা! অজিত পাঁজা।

ও তাই তো। কয়লামন্ত্রী, না? আমি ওঁর ছোটো ভাইকে চিনি, ড. রঞ্জিত পাঁজা। ওঁর স্ত্রী এবং কন্যাকেও। কখনও দেখা হয়ে গেলে বলব তো অজিত জেঠুকে।

অরা বলল।

খবরদার। ওই কর্মটা করবে না। মধ্যে দিয়ে চাকরিটিই যাবে আমার। অন্য কোনো ভাবে যদি খবরটা ওঁর কানে তোলা যায় তো অন্য কথা। উনি কি আর এ সব খুঁটিনাটির খবর রাখেন? রাখা সম্ভবও নয়। ওঁরা মাথা যে ঠিক রাখেন কী করে তা কে জানে!

ঠিক আছে।

অরা বলল।

এখন বুধিদেও গুঁইয়া কী করছেন কে জানে! উনিও তো কাল নেমে আসবেন।

হাঃ। যেন স্বর্গে উঠেছেন! পাতালে নামবেন। ভালোই বলেছ তুমি! কী আবার করবেন? লিখছেন হয়তো।

হয়তো।

অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল ক্রমশ। গাঢ় অন্ধকার আকাশে ক্ষীণ চাঁদ, প্রথমবার চাঁদ। অন্য জায়গায় অনেক রাতে ওঠে। এখানে কেন এখন দেখা যাচ্ছে?

ভাবল অরা।

তারপর বলল, কটা বেজেছে?

পরদেশিয়া তার হাতের টাইমেক্স ইনগ্রো ঘড়িটার সুইচ টিপে দেখে বলল, সাড়ে-সাত।

সাড়ে-সাত? এত রাত?

বাঃ একি কলকাতা না কি? এখানে তো সূর্যও ওঠে দেরি করে। তাছাড়া ছিলাম যে আমরা বিন্ধ্যরেঞ্জের চূড়োতে। কতক্ষণ অবধি আলো ছিল! আমাদের মধ্যপ্রদেশের মতন জায়গা হয় না। মাইকাল, বিন্ধ্য, সাতপুরা পার্বতশ্রেণি। অপরূপ সুন্দর। ভয়াবহ গভীর বন। নর্মদার মতো চমৎকার নদ। ভোঁর আর ছিঁর ঘাসের মাঠ। আর ছত্তিশগড়ের তো তুলনাই নেই। এখানকার মানুষেরা এখানের মাটিরই মতন। কথাটা অবশ্য পরিতোষ চক্রবর্তীর। পরিতোষও তো আমারই মতো পরদেশিয়া। আরও বেশি বরঞ্চ। হিন্দি সাহিত্যকও হচ্ছে বটে ও। ওরা প্রায় একশো বছরের উপরে আছে ছত্তিশগড়ে। পরিতোষের স্ত্রী চক্রধরপুরের মেয়ে। যেহেতু, মাচ ক্লোজার টু ক্যালকাটা সেইহেতু ও বেশি বাঙালি।

অরা বলল, শুনেছি দিদির কাছে।

বরিশালের মানুষেরা তো খুব অ্যাডভেঞ্চারাস বলতে হবে। কোথা থেকে কোথায় আসা।

স্মৃতি বললেন।

অরা শুধোল, পরিতোষবাবু কী বলেন তা তো বললেন না এখানের মানুষদের সম্পর্কে?

পরিতোষ বলে, এখানের মানুষেরা এখানের মাটির মতন। রোদ লাগলে ফেটে যায় আর একটু বৃষ্টি পড়লেই ভিজে যায়। মানে, ভালো না বাসলে ভালোবাসে না, একটু ভালোবাসলেই গলে যায়। এখানের ভাষাও ভারি মিষ্টি। তোমরা হাবিব তনবিরের 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' দেখেছ তো কলকাতায়?

দেখেছি।

ও তো এই ছত্তিশগড়িয়া ভাষাই পোশাকআশাক সবই।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ।

তা ভাষাটা কেমন? মিষ্টি বলছেন কেন? একটু বলুন না?

পরদেশিয়া বলল, কী বলব? এখানে পুরুষদের সম্বোধন করে 'গা' বলে আর মেয়েদের বলে 'বাই'। কুমারী মেয়েকে বলে 'ননী'। ছেলেবেলাকে বলে 'ছুটপন'।

বাঃ। একটু সেনটেন্স করে বলুন না।

ধরুন একজন শুধোল :

কাঁহা বৈঠেলা গ্যায় রহস?

উত্তরে অন্যজন বলল : ওঁকার বুতাকে বারেমে পুছ লাগহি রহুঁ।

আবার শুধোল : বুতা নেহি মিলস গা?

উত্তরে বলল : নেহি মিলস। ম্যায় লওটকে আ গ্যায়ে।

এই রকম আর কি। আমি মৈথিলি ভাষা জানি না। অনেকে বলেন, অনেক মিল আছে নাকি। ছত্তিশগড়িয়া ভাষার সঙ্গে মৈথিলি ভাষার।

তাই?

অরা বলল, উৎসুক হয়ে।

এখানের চালের যেমন সুগন্ধ তেমনই সুন্দর নাম।

পরদেশিয়া বলল।

কি রকম?

দুবরাজ, ঝিল্লি কী সফরি। মামুলি চাল-এর নাম লোচাই।

এখানের মানুষেরা শুধু চালই খায়? আটা খায় না?

খায় বইকী। তবে গেঁহু বড়োলোকদের খাদ্য। জংলি ধান হয় একরকমের, নাম সাঁওয়া, বুধিদেও গুঁইয়ার 'কোজাগর' উপন্যাসে একটি কবিতা আছে ওই সাঁওয়া আর গোঁলদনি ধানের উপরে। এছাড়া জওয়ার, মকাই। ছত্তিশগড়ে বাংলারই মতনই ভুট্টা বলে মকাইকে। তিল্লি (তিল), জাগনি (মানে, বিহারে যাকে বলে সরগুজা, সরষের মতন হলুদ ফুল হয়, তেল হয় যা থেকে), রাই (সরষে বা বিহার পাঞ্জাবের সরষু), কুটবি, কোদো। ডালের মধ্যে, একটা ডাল হয় মটর ডালের মতন, তাকে এরা বলে তেওড়া। একটু ঘি ছেড়ে কড়াইতে ছাড়লে তেওড়ার তালে লাফাতে থাকে। আরও একটা ডাল হয়, মটর ডালের মতন, তাকে বলে বাটরা। অড়হর, মসুর, মুংগ তো আছেই।

আপনি এত জানলেন কী করে? আপনি কি নিজে রান্না করেন নাকি?

স্মৃতি বললেন, বলিস কি? পরদেশিয়ার মতন রাঁধুনি বসন্তভিহারে দ্বিতীয় নেই।

তাই?

হ্যাঁ রে।

স্মৃতি বললেন।

অরা বলল, কালকে দয়া করে একটা লিস্ট বানিয়ে দেবেন আমাকে।

লিস্ট কিসের?

অবাক হয়ে বলল পরদেশিয়া বা মিত্রা।

আপনি কী কী করতে জানেন না, অথবা কোন কোন গুণ অপনার...

ঠিক সেই সময়েই জোরে ব্রেক কষল গাড়ির, একটা বাঁকের মুখে করিম। আর প্রকাণ্ড একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নির্লিপ্তমুখে চেয়ে কিছুটা দূর দিয়ে পথ পেরিয়ে যেতে লাগল।

বাবাঃ। এযে দেখি কানহা বা বান্ধবগড়।

দেখলি তো! ভাগ্যিস এসেছিলি বিলাসপুরে।

তারপরে বাঘটা একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেলে, অনেকক্ষণ বাঘটার চেহারা, চলন, চরিত্র, মুখের ভাব ইত্যাদি নিয়ে জোর আলোচনা চলল।

রোজই দেখা যায় নাকি?

রোজ থোড়িই দেখা যায়! তুমি লাকি। একে বলে টাইগার-লাক। কত মানুষে এ পথে একশোবার গেছেন, একবারও দেখেননি। কথায় বলে না বাঘের দেখা, সাপের লেখা।

এই স্ট্রেচটাতে তো সন্ধের পর গাড়ি বা ট্রাক বিশেষ চলেই না। তাই নাইয়ার তো বলে, রাতে আমাদের গেস্টহাউসের কাছেও বাঘ চলে আসে। আসাটা কিছু বিচিত্রও নয়। কেঁওচির সামনে দিয়ে সোহাগপুর আর বিলাসপুরের মধ্যে তাও কিছু ট্রাফিক আছে।

কিসের ট্রাফিক?

মানে?

পরদেশিয়া বলল।

মানে আর কী? পাঁচ ঘণ্টার পথে দশটি গাড়ি বা ট্রাকের সঙ্গে হয়তো দেখা হয়েছে। একে কি ট্রাফিক বলে! কী আনপল্যুটেড, নির্জন আছে এখনও এসব জায়গা। আমাকে একটা চাকরি দেখে দিন না মশায় এখানে। এখানেই সেটল করে যাব। বুঝলে বড়দি। বড়ো জামাইবাবুকেও বোলো।

তাহলে তুমিও ছত্তিশগড়িয়া হবে বলছ, আমার মতন, পরিতোষের মতন, পীযূষের মতন।

পীযূষ কে?

পীযূষ মুখার্জি। নবভারত টাইমসের রিপোর্টার। খুব ভালো ছেলে। ওর বাবা হীরালাল মুখার্জি এখানের একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত সজ্জন বাসিন্দা। সাতাশি বছরেও জওয়ান। সাহিত্যরসিক, গুণগ্রাহী।

কোন কলোনিতে থাকেন ওঁরা?

ওঁরা কোন দুঃখে কলোনিতে থাকতে যাবেন। ওঁরা থাকেন টিকরাপাড়াতে। বাঙালি পাড়া। বিলাসপুরে তো প্রচুর বাঙালি থাকেন। রেল কলোনিতেও। সাহিত্যিক বিমল মিত্র তো এখানেই কাজ করতেন রেলে।

তাই?

অরা বলল অবাক হয়ে।

কলকাতার বাঙালি হয়েও তোরা কোনো খবরই রাখিস না। লজ্জার কথা!

স্মৃতি বললেন।

বিমল মিত্রর 'সরসতিয়া' নামের একটা লেখা পড়েছ?

না।

অরা বলল।

কট্টর ছত্তিশগড়িয়া পরিতোষের মতে ওই লেখাটি না কি ছত্তিশগড়িয়ার মানুষদের সেন্টিমেন্ট হার্ট করেছিল।

কী ছিল লেখাটিতে?

তা আমি জানি না, শুনেছি পরিতোষের কাছে ওইটুকুই!

তারপরই বলল, কি বউদি? খিদে পেয়েছে?

কেন?

সামনের মোড়টা ঘুরলেই কেঁওচির ধাবার আলো দেখা যাবে।

না না। আর থেমো না এই রাতে। বারোটার মধ্যে পৌঁছোনো যাবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ! আরামসে।

বাড়ি গিয়েই তাহলে বনবাসার খিচুড়ি খাব।

না। আজ অরাদেবীর খিচুড়ি খাব।

কত্ত সখ! পেটে কিল দিয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

অরা বলল।

সে কিরে? খিচুড়ি রাঁধতেও শিখিসনি? বিয়ে হলে, কী করবি? এই বিলাসপুরের মতন জায়গাতেও লোকজনের মাইনে কত জানিস? সাত-আটশো। অবশ্য, সুখা।

পাঁউরুটি আর মাখন খাব। ডিম সেদ্ধ। জ্যাম। সসেজ। কলা। ফলমূল।

পরদেশিয়া বলল, তোমাকে কিন্তু গাছে থাকলেই মানত ভালো। ফলমূল পেতেও কোনো অসুবিধে হত না।

তারপর বলল, বনবাসা তো খিচুড়ি রাঁধবে কিন্তু রামভক্ত আমি একটু গলা ভেজাতে পারব তো?

ড্রিংক করা আমি একদম পছন্দ করি না।

অরা বলল।

তাহলে খাব না।

পরদেশিয়া বলল।

তারপর বলল, বউদি, দুই বোন দুই মেরুর। নর্থ পোল, সাউথ পোল।

স্মৃতি হেসে বললেন, বোনই তো। মেরুমিলন ঠিকই হয়ে যাবে। চিন্তা নেই।

সব সুন্দর এবং মধুর সময়ও এক সময়ে শেষে হয়ই। আরম্ভর মধ্যে সমাপ্তির বীজ নিহিত থাকেই: প্রত্যেক যাত্রার মধ্যেই প্রত্যাবর্তনের। তবু যে মন মানতে চায় না। জন্মের মধ্যেই মৃত্যু নিহিত আছে জেনেও প্রত্যেক মানুষই অমর হতে চায়। অবিসংবাদী মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। চাইতে অবশ্যই পারে কিন্তু পারে না। পারে না বলেই সবকিছুই যখন শেষ হবার মুখে আসে তখন মন বড়ো ভারী হয়ে ওঠে। তা সুদিন, সুসময় অথবা সুজীবন যাই হোক না কেন!

কদিন আগে যখন বিলাসপুরে এসে নামে সকালে ট্রেন থেকে, তখন ওর একবারও মনে হয়নি যে, বিলাসপুর কোনো বিশেষ একটি জায়গা। মানে, কোনো মাহাত্ম্য আছে এর। আগামীকাল রাতে চলে যাবে যে, একথা ভাবতেই মন সত্যিই বড়ো ভারী হয়ে আসছে। অথচ কী এমন জায়গা! আশ্চর্য! এসেছে মাত্র পাঁচদিন হল অথচ মনে হচ্ছে যেন এখানেই সে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ছিল। তবে? চলিতার্থে যাকে আমরা জ্ঞান হওয়া বলি তা কি জ্ঞান হওয়া নয়? কে জানে!

আসলে কোনো জায়গার মধ্যেই কিছু থাকে না! যদি না কোনো মানুষ পাগল হয় অথবা আধপাগলা অথবা একসেন্ট্রিক। তীব্র এবং আত্মস্থ প্রকৃতি-প্রেমিক। সাধারণ সুস্থ মানুষের কাছে জায়গা নয়, সেই জায়গার মানুষই হয় তার বিশেষ আকর্ষণ। এতদিন বোঝেনি কথাটা। এখানে এসেই বুঝল প্রথম অরা। বুঝল আরও অনেক কিছুই। নিজেকে বুঝল। এতদিন জীবনের ভারের বেগে ছুটে চলেছিল অন্ধের মতো। জীবনে থামারও যে এক বিশেষ ভূমিকা আছে সে সম্বন্ধে অবহিত হল। না থামলে, রোদ-চাঁদ দেখা যায় না, পাখির ডাক যে শোনা যায় না! কে যে তার মনের দিকে অনিমেষে চেয়ে আছে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় না! অথবা সে নিজে কার

দিকে? সেই জন্যেই জীবনে গতির মধ্যে যতির ভূমিকাও যে মস্ত বড়ো তা জেনে উল্লসিত যেমন হল তেমন দুঃখিতও হল খুব!

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। বড়ো জামাইবাবু তখনও আসেননি অফিস থেকে। দিদিও গেছেন মিসেস দাশের বাড়িতে। সেখান থেকে নাকি হাসপাতালে যাবেন। পরদেশিয়া এসেছে অফিস থেকে, তার বাড়িতে ফিরে, জামাকাপড় পালটে। জানে না অরা, দিদি-জামাইবাবু হয়তো ইচ্ছে করেই দেরি করে ফিরছেন। পরদেশিয়াকে রাতে খেতে বলে দিয়েছেন দিদি আজও। এখানে এসে অবধিই ওর নিজেকে অভয়ারণ্যের প্রাণী বলে মনে হচ্ছে। যেন বাঘিনি ও। এখানে ও অন্য প্রাণীকে নির্বিচারে খেতে পারে। কিন্তু ও নিজে নির্ভয়।

বেচারি পরদেশিয়া! সে কি জানে যে তার বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত চলেছে?

অমরকণ্টক থেকে রাত এগারোটাতে ফিরে খিচুড়িটা অরাই রেঁধেছিল। কী করে যে রেঁধে ফেলল তা এখনও বুঝতে পারছে না। স্কুল জীবনে ডোমেস্টিক সায়ান্স-এর কারিকুলামে খিচুড়ি রান্না করাও পড়ত। ওর মনে আছে, এক রাতে; স্কুলের পরীক্ষার আগে ও দুই বিনুনি ঝুলিয়ে পড়ার টেবিলে বসে খিচুড়ির 'প্রকার' মুখস্থ করছিল। মাথা নাড়িয়ে, বেণি দুলিয়ে বলছিল, 'খিচুড়ি তিন প্রকার! খিচুড়ি তিন প্রকার! ভুনি খিচুড়ি, মসুর ডালের খিচুড়ি, বুটি খিচুড়ি।' ছোড়দা তাই শুনে ওর পেছন থেকে সজোরে বেণি ধরে একটান লাগিয়ে বলেছিল, আরও আছে রে গাধি। আরও এক প্রকার।

সেটা কী? অরা বলেছিল।

মিছিমিছি খিচুড়ি। ইয়েস! যে একপ্রকার খিচুড়িও রাঁধতে জানে না তার আবার খিচুড়ি কয়প্রকার তা জেনে লাভ কী? মিছিমিছি? সে যাই হোক কোনো ইনসপিরেশানে ইনসপায়ার্ড হয়ে যে অরা সেই রাতে খিচুড়িটা অমন রেঁধে ফেলল মুগ ডালের তা ভেবে ও নিজেই এখনও চমৎকৃত হচ্ছে। অবশ্য বনাবাসা হাতের কাছে থেকে সব কিছুরই জোগাড় দিয়েছিল ভাবাবেগহীন কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ ভঙ্গিমায়। বনবাসা মেয়েটা যেন কেমন বদলে গেছে অরা আসার পর থেকে। স্মৃতি তো লক্ষ্য করেছেনই, অরাও করছে। কেন? কে জানে! বড়দি কিন্তু সাহায্য করেননি কোনোই। অরা যখন রান্নাঘরে তখন পরদেশিয়া বড়োজামাইবাবুর সেলার খুলে 'রাম' খাচ্ছিল আর বড়দি তার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন।

বেচারি বনবাসা! ওরা যখন হঠাৎই ফিরে এল, সে তো খেয়ে দেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়েই ছিল! তখুনি ঘুম-চোখে উঠে পড়েই লেগে গেছিল ওদের খিদমতগারিতে। ভাবি ভালো মেয়েটা। যদি অরা কোনোদিন বিয়ে করে, ঘর সংসার করে; তবে এমনই একটি মেয়েকে রাখবে বাড়িতে। তবে কলকাতাতে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে-বসে, কিছু করেই শান্তি নেই। এই বিলাসপুরেরই মতো অথবা অন্য কোনো শান্তির জায়গাতেই বিয়ে করে থিতু হতে হয়। প্রকৃতির ছোঁয়া যেখানে, জীবনকে অনুক্ষণ চটকে দেবার জন্যে, কানে তালা ধরবার জন্যে, চোখে লোভ ধরাবার জন্যে হাজারো চাকচিক্যময়, বাহ্যিক, শূন্যগর্ভ আয়োজন নেই। জীবনকে যেখানে মরা নদীর সোঁতার মধ্যের ডিঙির মতো ঠেলে ঠেলে পার করাতে হয় না। জীবন চলে আপনারই বেগে, সহজ খুশিতে; স্বাভাবিকতায়।

কে জানে! কী হবে! ওর জীবন ওকে কোথায় নিয়ে যাবে? চাকরিতে যে মন বসে গেছে সেটাও হল আরেক বিপদ। যে করেই হোক তাকে স্বাবলম্বী হতেই হবে! আজকাল স্বাবলম্বী না হয়ে মেয়েদের কোনো উপায়ই নেই! পুতুলখেলার বয়সেই যাদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের কথা আলাদা। বর-পুতুল বউ-পুতুল খেলতে পারে শুধু তারাই। তাও আজকাল সেই পুতুলদের সংসারেও অঘটন ঘটছে আকছার। কোনো বিয়ে, কোনো ঘরই আর সুরক্ষিত নেই। দাম্পত্যের উপরে কোনো অপদেবতার করাল ছায়া পড়েছে। বিশেষ করে সচ্ছল সমাজে। কারও বিবাহিত জীবনই আর নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত নয়। বেঁচে থাকাটা, বিয়ে করাটা, ছেলেমেয়ের মা হওয়াটা, সুখী ও

পূর্ণা স্ত্রী হওয়াটা এখন কেমন একটা স্বপ্নময় ব্যাপার হয়ে গেছে। উপরে উপরে সব ঠিকঠাক মনে হয়। ফ্ল্যাট, গাড়ি, ছেলেমেয়েদের স্কুল, পড়াশুনো, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং মেইনটেইন করার জন্যে গলার দড়ি-ছেঁড়া বকনা বাছুরের মতো অনুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি অথচ সবসময়েই আগ্নেয়গিরির উপরে বসে থাকতে হয় এখন জীবনে। কখন যে অগ্ন্যুৎপাত হবে, কখন যে জীবনের ভিত নড়ে উঠে যা কিছু সযতনে গড়ে তোলা গেছিল তার সবকিছুই হুড়মুড় করে ভেঙে দেবে, তা কেউই বলতে পারে না।

এই প্রেক্ষিতে, এই পরম অনিশ্চিতির বাতাবরণের মধ্যে তাই বিলাসপুরে এই পাঁচটি দিন কাটিয়ে যাওয়াটা অরার জীবনের পরম প্রাপ্তি হয়ে থাকবে।

কী করবেন?

পরদেশিয়া বলল।

হালকা ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার পরেছে। তার উপরে নেভি-ব্লু-রঙা হাফহাতা সোয়েটার। কাঁধ আর হাতের সংযোগস্থলে ব্লাউজের মেগিয়া হাতার মতো হাতা। অরা সেদিকে তাকিয়েছিল। এই পাঁচদিনের শীতটা যেন হঠাৎই বলবান হয়ে গেল। যদিও কামড় আলগা করে মরে যাবে সরস্বতী পুজোর পরই।

পরদেশিয়া বলল, মানুষ হিসেবে আমরা যে কত বোকা তা হাফহাতা সোয়েটারের এই নতুন ধবনের হাতাই তার প্রমাণ।

তা মানে?

মানে হচ্ছে, ছেলেবেলা থেকে মা, ঠাকুমা, দিদি, বউদি, গার্লফ্রেন্ডরা পুরুষদের যে সোয়েটার বুনে দিয়েছেন হাফহাতা, তা যত ভালোই হোক না কেন, দুই বাহু এবং কাঁধের সংযোগস্থলের কাছে বড়োই ঠান্ডা লাগত। অথচ 'হাফহাতা সোয়েটার' বলতে অমন সোয়েটারই বোঝাত। হঠাৎই এত বছর পরে কারও মাথাতে এই ব্যাপারটি ঢুকেছিল যে, আসল শীত যেখানে লাগে সেইখানটি ঢাকারই কোনো বন্দোবস্ত নেই চিরাচরিত 'হাফহাতা' সোয়েটারে। তার মানে কি এই হল না যে, আমাদের চোখ থেকেও চোখ ছিল না। বোধ থেকেও বোধ ছিল না? মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ যে অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকেন ভাবনা চিন্তাতে, অরিজিনালিটিতে, এই দুইবাহুর সংযোগস্থল ঢাকা সোয়েটারই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই সামান্য ব্যাপারটা এতকাল কোনো নারী-পুরুষের মাথাতেই এল না! আশ্চর্য লাগে না, ভাবলে? তাহলে আমরা বোকা না তো কী?

সত্যি!

বলল, অরা।

এমন ভেবেও অরা আশ্চর্য হল যে, হাফহাতা সোয়েটারের ডিজাইনে এই যে হঠাৎ জগৎব্যাপী বদলটা এল, সে সম্বন্ধও পরদেশিয়ার মতো করে ও ভাবেনি। শুধু ওই বা কেন, কম মানুষই ভেবেছেন হয়তো। পুরোনো যা, তা তো মান্যই কিন্তু তার ব্যতিক্রমও অবশ্য মান্য। অন্যের মেনে নেওয়া মেনে নিয়ে ব্যতিক্রমের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতেও উৎসুক নয় অধিকাংশ মানুষেরই মন। পরদেশিয়ার দারুণ আশ্চর্য একটি মন আছে। চোখ আছে ব্যতিক্রমী।

কী হল? চলো একটু হেঁটে আসি। খিদে না পেলে ফেয়ারওয়েল-ডিনার খাবে কী করে? তোমার জামাইবাবু তো আবার ইমদাদকে বলে তোমার জন্যে পাক্কি বিরিয়ানিও নিয়ে আসবেন।

ইমদাদ কে?

দাদের ওষুধের কারবারি।

তিনি বিরিয়ানি রাঁধবেন?

হ্যাঁ।

বলেই বলল, তোমার নিশ্চয়ই কখনও দাদ হয়নি?

ছিঃ! ভদ্রলোকদের আবার দাদ হয় নাকি? কী যে বলেন।

কজন ভদ্রলোককে তুমি জানো? সুটেড-বুটেড টাই-ঝোলানো কত মানুষের দাদ আছে। 'যে যাতনা বিষে বুঝিবে যে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।' এতলোকের আরামের যিনি কারণ তাঁর বিরিয়ানি স্বাদু হবে না তো কার বিরিয়ানি হবে?

বলেই বলল, তার উপরে বাড়িতে বউদি আর বনবাসা মিলে নিশ্চয়ই অনেকই পদ রান্না করেছেন। বনবাসাটাকে তো দেখতেই পেলাম না। কারও পউষমাস, কারও সর্বনাশ। সে বেচারি রান্নাঘরেই দমবন্ধ হয়ে মরছে সকাল থেকে।

মলিদাটা গায়ে দিয়ে বেরুল অরা। অমরকণ্টকের সেই শীতটা যেন হাড়গোড় ভেদ করে ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, কলকাতাতে ফিরে যাওয়ার আগে আর তাকে টেনে বের করা যাবে না।

গেট খুলে দাঁড়িয়ে রইল পরদেশিয়া।

ভালো লাগল অরার।

এই ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোও একজন পুরুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিয়ে দিয়ে যায় একজন নারীকে।

গেট থেকে বেরিয়ে অরা বলল, বনবাসা কিন্তু আপনাকে খুব পছন্দ করে।

তাই?

আমার তো তাই মনে হয়।

কী বলতে চাইছ তুমি? হঠাৎ?

কী বলতে চাইব? আপনি হচ্ছেন গিয়ে রমণীমোহন।

সব রমণীর মনোহরণে আমার রুচি নেই। মিস্টার কেষ্টকে আমি ওই জন্যেই একদম পছন্দ করি না।

মিস্টার কেষ্টটি কে?

তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ।

হেসে ফেলল অরা, পরদেশিয়ার কথার ধরনে।

আপনি তাহলে কী? রমণীমোহন হয়েও রমণী ভ্রূ-কুঞ্চন?

আমি ওয়ান-মাস্টার ডগ এর মতো ওয়ান-উওম্যান ম্যান।

হ্যাঁ। সোনার পাথরবাটি!

বলল, অরা।

তার মানে?

অমন পুরুষ কি হোমো-স্যাপিয়েন স্পেসির মধ্যে একটিও আছেন? সন্দেহ হয় আমার।

তুমি আর কতটুকু জেনেছ বলো জীবনের? ক-জন মানুষকে দেখেছ?

যা দেখেছি ও জেনেছি তাই যথেষ্ট। আর বেশি দেখা কোনোরকম ইচ্ছে নেই। যা জেনেছি, তাই যথেষ্ট। ক্ষীরম অম্বুমধ্যাৎ। জানতে-বুঝতে হলে সমুদ্রে ঝাঁপাঝাঁপির প্রয়োজন নেই। যার বোঝার, সে ঠিকই বোঝে।

তাই?

হুঁ।

কাল থেকে তো আপনার হাতে অনেকই সময় বাঁচবে। কী করবেন তখন? বেঁচে যাবেন। কী বলুন? আমি তো স্টেশনে নামার পর থেকেই আপনার স্কন্ধারূঢ় হয়ে রয়েছি।

বাবাঃ। তুমি দেখি খুব সুকঠিন বাংলা শব্দ বলো। সংস্কৃত এ শব্দটি শুনলেই আমার সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পর কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা। তা যে সংস্কৃত বা উর্দু বা ফারসির জারজ সন্তান নয় তা প্রমাণ করার ভার কি প্রত্যেক বাঙালিরই নয়? তৎসম শব্দ কি ব্যবহার করা উচিত?

তৎসমকে পুরোপুরি বাদ দিলে তো তদ্ভবকেও বাদ দেওয়া উচিত। তা কি দিতে পারবেন?

কিছু লেখক আছেন, তাঁরা; কিছু কবি বাংলা ভাষাতে পরিমার্জন বর্জন করে যে শুদ্ধতা এনেছিলেন তা প্রায় নষ্টই করতে চলেছেন। অন্য ভাষার মিশেল দিয়ে বাংলাকে অপবিত্র করছেন। তোমাদের বুদ্ধদেব গুহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বুদ্ধদেব গুহ কী জানেন? উনি তা অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বাংলাতে বি. এ. পর্যন্ত নন। আমি জানি, উনি ওঁর সপক্ষে বলেন যে, ভাষার ব্যাপারে রক্ষণশীলতা বা শুচিবায়ুগ্রস্ততার কোনো মানে হয় না। দরজা জানলা খুলে রাখতে হয়। দরাজ দিল হতে হয় ভাষার ব্যাপারে। ইংরেজি ভাষার মধ্যে কত অজস্র বিদেশি শব্দ ঢুকে গেছে! আরও কত দেশের ভাষা সমৃদ্ধ করেছে তাকে। কিন্তু পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়। উনি না ভাষাবিদ, না বৈয়াকরণ? না, বাংলাতে বি. এ, এম.এ? ওঁর কথা শোনার কোনো দরকার আছে বলে তো মনে করি না আমি।

জানি না। হয়তো তুমিই ঠিক। তবে ভাষাবিদ বা বৈয়াকরণ মাত্রই যে কলম ধরলেই লেখক হবেন এমনও নয়। অনেক বৈয়াকরণ ভাষাবিদ এবং পণ্ডিতম্মন্যদের জানি, যাঁরা অশ্বর জননেন্দ্রিয়ের মতো বাংলা লিখে আহ্লাদ এবং শ্লাঘাতে ডুবে থাকেন। তাঁদের বাংলা, পাঠকের হৃদয়ে গিয়েই পৌঁছয় না। ভাষা তো জাদুঘরে রক্ষণীয় তিমি মাছের কঙ্কাল নয়। ভাষা, ভাবের বাহন। মনের ভাব যদি পাঠক-পাঠিকার অন্তরে সঞ্চারিতই না করে দেওয়া যায় ভাষার মাধ্যমে তবে সেই সব পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য পান্তাভাতের সঙ্গে শুকনো লংকাপোড়া দিয়ে ছোটো ছোটো দিশি পেঁয়াজ এবং গেঁড়ি-গুগলি দিয়ে চিবিয়ে খাওয়াই উচিত।

অরা বলল, আমরা কি এই সব নিয়েই আলোচনা করব? আর কিছু কি নেই আলোচনার?

শিক্ষিত মানুষেরা যা নিয়ে আলোচনা করবেন তার সঙ্গে তো অশিক্ষিতদের আলোচনার তফাত থাকবেই। মনের এই পরিধিই কিন্তু এই মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের পৃথকীকরণের একমাত্র উপায়। এই ব্যবধানটাই আসল ব্যবধান, এক এবং অন্যের মধ্যে। ডিগ্রি নয়, অর্থ নয়, যশ নয়; ক্ষমতাও নয়। কী করে বোঝাব তোমাকে জানি না। এক কথায় বলতে পারি যে এই ব্যবধানটুকু না থাকলে হয়তো বনবাসাকে বিয়ে করতে পারতাম। তার মতো ভালো মেয়ে, দুঃখী মেয়ে কমই হয়। ওই ব্যবধানের জন্যে যদিও আমাদের সমাজই দায়ী। সে নয়। আমরা যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছি তা ও পায়নি।,কিন্তু তা বলে ওর বুদ্ধি, ওর সহজাত ঔৎসুক্য, ওর সহবত আমাদের কারও চেয়েই কম নয়। দার্জিলিং, মুসৌরি, ডালহাউসি আর দেরাদুন ইত্যাদি জায়গার পাবলিক স্কুলে পড়লেই হনুমানের ল্যাজ কিছু খসে যায় না। যারা হনুমান তারা হনুমানই থাকে। অর্থ, তথাকথিত-শিক্ষা, ডিগ্রি পাকানো কাগজ, তাদের দম্ভ; কোনো কিছুই অমানুষকে মানুষ করে তুলতে পারে না। বনবাসার জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়। তোমার মতো আধুনিকাদের চেয়েও ভালো খিচুড়ি রাঁধতে পারেও অবশ্যই। শিক্ষিতাদের চেয়ে অনেক বেশি সহ্যশক্তি ওর। প্রয়োজনে এক-আধদিন অত্যন্ত বাজে বাথরুম ব্যবহার করতে হলে ও তাদের মতো Fuss করবে না। মানিয়ে নেবে। কোনোদিনও আমার মুখে মুখে কথা বলবে না। কিন্তু এই যেমন আমি তোমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলছি তেমন তো ওর সঙ্গে বলা যাবে না। আর তা না গেলে, শুধুই সুন্দর শরীর পেয়ে আব দারুণ রান্না খেয়ে তো একজন শিক্ষিত পুরুষের দিন কাটে না। শিক্ষিত নারীরও কাটে না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল অরা। পথ-পাশে গাছগাছালি থেকে নানা মিশ্র ফুলে গন্ধ আসছে। ফুল না থাকলেও গন্ধ ওঠে, গন্ধ ভাসে। নারী-পুরুষের শরীরে যেমন পারফ্যুম ছাড়াও একটা নিজস্ব গন্ধ থাকে, গাছগাছালির গায়েও থাকে। সকলের সেই গন্ধ নেওয়ার নাক থাকে না তাই সে গন্ধ পায় না বোধহয়।

পরদেশিয়ার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে ওই নির্জন অথচ চওড়া পিচ-বাঁধানো পথে ভেসে যেতে থেকে ভারি ভালো লাগত লাগল অরার।

হঠাৎই পরদেশিয়া বলল, তুমি গান জানো?

চমকে উঠে অরা বলল, গান?

মনে মনে বলল, এবারে কি চুল খুলতে বলবে নাকি? দেখবে, চুল কত লম্বা? খোঁপাটা ফাঁপানো কি না? বুক ছুঁয়ে দেখবে না তো! বুকে আর্টিফিশিয়াল কাপ আছে কি নেই? তাদের পাড়ার নলিনীবাবুর বাড়ি মেয়ে দেখতে এসে পাত্রপক্ষর একদল মহিলা তাই করেছিলেন মাত্র তিনমাস আগে। কলকাতাতে। যাঁদের অর্থ নেই তাঁদের আজও সব অপমান অসম্মান নীরবে সহ্য করে নিতে হয়। পাত্র সেলট্যাক্সের ইন্‌স্পেকটার। অনেক উপরি-টুপরি আছে নাকি! সে কারণেই পাত্রের আত্মীয়স্বজনের এই উপরি-টুপরি!

গানের কথাতে আশ্চর্যও হল অরা। পথে বেরিয়েই সন্ধেবেলার হংসধ্বনি রাগের একটা ধুন বাজছিল নিঃশব্দে ওর মাথার মধ্যে। সেই নৈঃশব্দের শব্দ শুনতে পেল কি পরদেশিয়া?

কী হল। বললে না?

গান জানি না। তবে ভালোবাসি।

কখনও গাওনি?

সেই ছেলেবেলায়।

কিছু কিছু জিনিস থাকে যা একবার শিখলে কেউই ভোলে না।

যেমন?

সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, গান এবং সঙ্গম করা।

ভীষণ অসভ্য আপনি।

মেনে নিচ্ছি। আমার সভ্যতার সংজ্ঞাটা অন্যরকম। তবে গাইলে পারতে একটি গান। এই অল্প চাঁদের, অল্প শীতের, অল্প আলাপের রাতে। তাছাড়া, গানের ব্যাপারে লজ্জা করতে নেই। আমার মায়ের ডায়ারিতে মায়ের একজন প্রিয় মানুষ লিখে দিয়েছিলেন যে, "লজ্জা নারীর ভূষণ কিন্তু গানের বেলা নয়।"

তাই?

হ্যাঁ।

হঠাৎই থেমে, একটা মস্ত অগ্নিশিখা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পড়ে, অরা ধরে দিল একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত।

> "তুমি আমার ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে,
> তখন ছিলেন বহু দূরে কিসের অন্বেষণে॥
> কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্তরবির শিখরশিরে
> চাইল রবি শেষ চাওয়া চার কনকচাঁপার বনে।
> আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।
> তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে..."

এই অবধি গেয়েই থেমে গেল অরা।

কী হল? অন্তরাটা গাইবে না?

আপনি গান জানেন?

না।

তবে।

ভালোবাসি খুব। গাও। তুমি তো দারুণ গাও। তোমার সিরিয়াসলি গান করা উচিত। আর কথা নয়, ধরো...

> "লিখন তোমার বিনিসুতোর শিউলিফুলের মালা,
> বাণী সে তার সোনা-ছোঁওয়া অরুণ-আলোয় ঢালা—
> এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল ঝরানো শীতের রাতে

কুহেলিকায় মন্থর কোন মৌন সমীরণে।
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে,
তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে...”

সত্যি!

পরদেশিয়া বলল, আরও কত যুগ যে রবীন্দ্রনাথের গানকে অবলম্বন করে আমাদের না-বলা সব কথা বলতে হবে, আমাদের সব বোধ; সব অনুভূতিকে বয়ে বেড়াতে হবে!

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অরা বলল, জানি না।

তারপর বলল, রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন এমন গায়ক-গায়িকাদের সম্পত্তি হয়ে যাচ্ছে যাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং জীবন দর্শনের কণামাত্রও মিল নেই। এই সব অশিক্ষিত গায়ক-গায়িকাদের হাতে শুধু রবীন্দ্রনাথই নিগৃহীত হচ্ছেন না আমরা পুরো বাঙালি জাতটাই হচ্ছি। যে বা যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে পড়েননি, তাঁরা তাঁর গানের মানে এবং ভাব ফোটাবেন কী করে! স্বরলিপি পড়তে পারলেই আর গলায় সুর থাকলেই শুধুমাত্র তার জোরেই রবীন্দ্রনাথের গানের গায়ক-গায়িকা হয়ে উঠতে পারলে তো কথাই ছিল না!

তুমি নিধুবাবুর গান ভালোবাসো?

ভালোবাসি বলতে পারি না। কারণ, তেমন বেশি শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি!

তোমাকে শোনাব। কলকাতাতে আমার এক দাদাস্থানীয় আছেন তিনি ওই সব গান ভারি ভালো গান। আমার বন্ধু দেবজিৎও ওই সব গান নিয়ে গবেষণা করে। তার ঠিকানাও তোমাকে দিয়ে দেব।

ঠিক আছে।

নিধুবাবুও কিন্তু মস্ত বড়ো কবি ছিলেন।

শুনেছি।

বলেই বলল, আকাশটা কী চমৎকার দেখাচ্ছে, না? কী ঝকঝকে। যেন শরতের দুপুরের দিঘি। এখানে পল্যুশান বলতে কিছুমাত্রই নেই। কত গাছগাছালি। কত তারা, আকাশে। ইচ্ছে করে এখানেই থেকে যাই সারাজীবন।

ইচ্ছাপূরণের পথে বাধাটা কোথায়?

বাধা?

চমকে উঠল যেন অরা।

পরক্ষণেই বলল, আছে আছে। অনেকই বাধা।

অরার বুকের গভীর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। সেটাকে ও পথপাশের গাছপালার নিশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

ওঁরা সবাই বিলাসপুর স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অরার বড়ো জামাইবাবু পরশু এসেছেন। একটা দিন যে কী করে ঝড়ের মতন কেটে গেল বোঝা পর্যন্ত গেল না।

অনেকেই এসেছেন স্টেশনে। পরদেশিয়া মিত্রা তো আছেই, পরিতোষবাবু ও তাঁর স্ত্রী, সুজিত মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা, বড়ো জামাইবাবু, বড়দি। এমনকী চৌধুরীসাহেবও এসেছেন এবং তাঁর অধ্যাপিকা স্ত্রী মঞ্জু চৌধুরী। চ্যাটার্জিসাহেব অন্য কাউকে তুলতে আসাতে তাঁর সঙ্গেও দেখা

হয়ে গেল। পীযূষ মুখার্জিও এসেছেন। মুখে পান। এবং স্মিত হাসি। যথারীতি।

এই অল্প ক-টি দিনে যে কত উষ্ণতা; তা ভেবেই বুকের কাছে একটা কষ্ট অনুভব করছিল অরা। সে সুভাষ চৌধুরী মানুষটির মতন একজন ভার্সেটাইল, রসিক এবং সুপণ্ডিত কমই দেখেছে। তাঁর সঙ্গে অরার বস বাসু চ্যাটার্জিসাহেবের অনেক ব্যাপারে মিল আছে। উনি ন-টা অবধি অফিস করেন তা সত্ত্বেও যে অরাকে ছাড়তে এসেছেন আজ সন্ধেবেলা সস্ত্রীক; তাতে অরা একেবারে অভিভূত।

বাড়ি থেকে খবর নিয়েই বেরিয়েছিল। ট্রেন আধঘণ্টা লেট। তবে দূরগ্ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। বড়ো জামাইবাবু আদর করে এ. সি-ফার্স্টক্লাসের টিকিট কেটে দিয়েছেন অরাকে। তার রিজার্ভেশান আবার দূরগ্-এ লোক পাঠিয়ে কনফার্ম করা হয়েছে। বড়ো জামাইবাবু বলেছেন পাঁচটা নয়, দশটা নয়, আমার একটামাত্র শালি তাও জীবনে একবার মাত্র বিলাসপুরে এল! তাই এই খাতিরদারী। বারে বারে এলে কি আর এ. সি. ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটব!

অরা বলেছিল, তার মানে, আপনি চান না যে আবার আসি?

আমি তো চাই-ই। কোন বুড়ো জামাইবাবু না চান যে, তাঁর তরুণী শ্যালিকা বার বার আসুক। কিন্তু আমার চাওয়াতেই কি তুমি আসবে?

তবে কার চাওয়াতে আসব?

বিব্রত হয়ে বলল, অরা।

তা আমি কী করে জানব?

এই কথার মারপ্যাঁচ যাঁদের বোঝার শুধু তাঁরাই বুঝলেন।

অন্যেরা ভাবলেন জামাইবাবু শালির সঙ্গে এমন রসিকতা তো করেই থাকেন।

পরদেশিয়া, প্ল্যাটফর্মেই একজন রেলের লোককে ধরে জিজ্ঞেস করল, একেবারে টি.ভি-তে যেরকম হিন্দি বলে, তেমন ভাষায়, আভি বম্বে মেইল কি স্থিতি ক্যা হ্যায়?

উনি বললেন, দূরগ্ ছোড় দিয়া। আহি যানা চাইয়ে এনি মিনিট।

ট্রেনটা এসে গেল। শোরগোল বাড়ল প্ল্যাটফর্মে। যদিও বিলাসপুরে পনেরো মিনিটের স্টপেজ। বড়ো জাংশন। ডাউন বম্বে মেইল-এর প্যাসেঞ্জারদের ডিনার এখানেই দেওয়া হয়। বম্বে মেইল দুটি আছে। একটি যায় এলাহাবাদ হয়ে, অন্যটি যায় নাগপুর হয়ে। বিলাসপুরে যেতে হলে নাগপুর হয়ে যেটা যায় তাতেই চড়তে হয়।

দুটি মিনারাল ওয়াটারের বোতল, ন্যাপকিন, কাগজের প্লেট, প্লাস্টিকের ছুরি-কাঁটা সব বেতের বাস্কেটে গুছিয়ে দিয়েছে বড়দি। ক্যাসারোলের মধ্যে গরম পরোটা আর অরার প্রিয় ঝালঝাল আলুর তরকারি। আর বিলাসপুরের 'বেঙ্গল সুইটস' এর মিষ্টি।

ক্যাপেতেই পাওয়া গেছে টিকিট। একজন মারাঠি মহিলা আসছেন নাগপুর থেকে। তাঁর উপরের বার্থ।

ট্রেনে উঠে পরদেশিয়া সব মালপত্র গোছগাছ করে রেখে এল।

বলল 'ই' কম্পার্টমেন্ট।

বড়ো জামাইবাবু চৌধুরীসাহেবকে বললেন, ডিগরেশকার সাহেবের পাত্তাই করা গেল না, করা গেলে, অরার কুষ্ঠিটা একবার দেখিয়ে নিতাম। বিয়ে কবে হবে?

তিনি তো নাসিকে না কোথায় গেছেন শুনলাম। সেখানে অ্যাস্ট্রোলজিকাল সোসাইটি না কিসের কনফারেন্স হচ্ছে। ডিগরেশকার সাহেব তো প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কি না!

ও তাই! আমি ভাবলাম কোথায় হাপিস হয়ে গেলেন মানুষটা।

মদনবাবু বললেন।

বড়দি বললেন, এবার মায়া কাটিয়ে উঠে পড়। আমরা জানালা দিয়ে সি-অফ করব ছোটকু।

চৌধুরীসাহেব বললেন, মিত্রা, তুমি গিয়ে ওকে কম্পার্টমেন্টে বসিয়ে দিয়ে এসো। দেরি করো না, আর মিনিট পাঁচেক আছে ছাড়তে।

না, দেরি কিসের?

পরু বলল, চলুন অরাদেবী।

হ্যাঁ।

বলে, অরা সকলকে হাতজোড় করে নমস্কার করে দিদি জামাইবাবু আর চৌধুরী সাহেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর অস্ফুটে বলল, চলি।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে পর্যন্তও বুঝতে পারেনি। কথাটা যেন হঠাৎই বুঝল অরা। এই ক-টা দিনে কী যে ঘটে গেছে ওর মধ্যে। মনে হচ্ছে যেন ও বিলাসপুরেই থাকে। বিয়ে হয়ে যেন নতুন শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে কলকাতাতে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে, এয়ারকন্ডিশানড করিডরে ঢোকার আগে অরা ফিরে দাঁড়িয়ে গলা তুলে সকলকে বলল, আমি কিন্তু সত্যিসত্যিই এখানে সেটল করতে চাই। আপনাদের সক্কলকে বলে গেলাম আমার একটা চাকরির জন্যে। জামাইবাবুর কাছে অনেকগুলো বায়ো-ডাটা পাঠিয়ে দেব গিয়েই।

শেষের দিকে গলা ভারী হয়ে এল ওর।

পরদেশিয়া ওকে নিয়ে গিয়ে ক্যুপেতে বসিয়ে বলল, দেখো, সব ঠিক আছে কি না। কিচ্ছু ফেলে যাচ্ছ না তো?

অরা মুখটা নামিয়ে নিল।

ওর হঠাৎ ভীষণই কান্না পেল।

পরদেশিয়া ক্যুপের অন্য প্যাসেঞ্জার মিসেস কেরকারকে শুধোল, আর উ্য ট্রাভেলিং টু হাওড়া?

ইয়া।

বয়স্কা কিন্তু সপ্রতিভ মহিলা বললেন।

ভেরি ওয়েল। দেন উ্য বোথ ক্যান লক দ্যা ডোর অ্যান্ড গো টু স্লিপ পিসফুলি।

ওক্কে। ডোন্ট ওয়ারি। আই উইল লুক আফটার হার। আই অ্যাম আর রেগুলার ট্রাভেলার। উ্য সিম টু বি আ বিট নার্ভাস। ইজ শি ইয়োর ওয়াইফ?

পরদেশিয়া বোকার মতো হেসে বলল, নো নো। শি ইজ নট।

অরার খুব অভিমান হল। সেই রায়সাহেবের কাছে বউ সাজাল আর এখন...

এবারে কি ছুটি পাবে সেবাদাস? খিদমতগার? অরাদেবী, তোমার?

অরার বুকের মধ্যে চারটি শব্দ ঠেলে এল, ছুটি দেব না তোমাকে।

কিন্তু ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল শুধু দুবার।

মাথা হেলিয়ে, ইতিবাচক ভঙ্গি করল শুধু।

খিদমতগার কি কিছু পেতে পারে?

কী?

বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠল অরার।

আবারও বলল, কী?

কোনো বকশিশ টকশিশ। পৌঁছে, একটা পৌঁছসংবাদ?

অরার বুকের মধ্যে আমজাদ খানের সরোদে পরজ বসন্ত ধুন বাজছিল। হঠাৎ কে যেন ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিল। কত ডেসিবল আওয়াজ হচ্ছে কে জানে! বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। অথচ কেউ সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে না।

ওর মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

অরা বলল, জবাব পাব তো?

নিশ্চয়ই! আমি ভদ্রলোকের ছেলে। চিঠি পেয়ে জবাব দেব না এমন হবে না। আমিই আগে লিখব। আজ রাতেই।

বড়ো করে তো?

বড়ো করে।

প্রমিস?

প্রমিস।

এমন সময়ে ট্রেনটা নড়ে উঠল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মোটা কাচের ওপার থেকে ওরা কাচে থাপ্পড় মেরে পরদেশিয়াকে নামতে বললেন।

যাই!

বলেই, পরদেশিয়া দৌড়ে গেল।

অরাও সঙ্গে সঙ্গে এল। দরজা অবধি। হাতটা বাড়িয়ে দিল।

পরদেশিয়া ওর হাতটা ছুঁয়েই চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

অরা বলতে চেয়েছিল, 'যাই' বলে না, বলে আসি।

কিন্তু কিছু বলার আগেই ওর চোখের বিলাসপুর, ইন্দিরা-ভিহার, বসন্ত ভিহার, মহানদী ক্লাব, অচানকমার, কেঁওচি, অমরকণ্টক আর এত জন মানুষের উষ্ণ, আশ্চর্য ভালোবাসা, সবই প্ল্যাটফর্মের নানা-রঙা আলোর দ্রুতগামী চলন্ত রেখাতে হুসেনের আঁকা জ্বলন্ত কোনো তেলরঙা ছবিরই মতো অপসারিত হয়েই পরমুহূর্তে অন্ধকারে ভরে গেল।

মাথা নিচু করে বসে রইল অরা।

কী লিখবে চিঠিতে পরদেশিয়া, কে জানে!

ট্রেনটা খটাখট খটাখট করে গতি বাড়াতে লাগল।

আবার কলকাতা। ধোঁয়া, ধুলো, আওয়াজ, মানুষ, চিৎকার; বন্‌ধ। নকল নৈঃশব্দ। নক্কাল। নক্কাল! কলকাতা নক্কালদের শহর।

আবার কলকাতা।

ওর মন বিলাসপুরের জন্যে কাঁদতে লাগল।

কী লিখবে পরদেশিয়া?

অরার চোখ দুটি ভিজে এল।

ওর বুকের ভেতর থেকে একটি নাম নিঃশব্দে ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল : পরদেশিয়া।

✸

ধুলোবালি

সকাল এগারোটা।

জিষ্ণু আর পরী বেরিয়ে গেছে অফিসে। কাক ডাকছে আলসেতে। হেমপ্রভা বারান্দাতে বসে আছেন চা খাওয়ার পর। এমন সময় ফোনটা বাজল।

'হ্যালো।"

"কেমন আছ?"

ওপাশ থেকে হীরুবাবু বললেন।

"ভালোই। তবে আজ একাদশী তো! পায়ের বাতের ব্যথাটা বেড়েছে। তুমি কেমন আছ?"

"আর থাকা! চলে যাচ্ছে। রোজ সকালে আমার পায়ের পাতা দুটো আর ডান পা-টা গোল হয়ে ফুলছে।"

"ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?"

"দেখাব। হিতেন ডাক্তারকেই তো দেখাই। তবে ও আজকের আর কালকের দিনটা একটু ব্যস্ত থাকবে তো। অবশ্য গোদা কম্পাউন্ডারকেও দেখিয়েছি। ওর ওখান থেকেই করছি ফোন। জাইলোরিক ট্যাবলেট দিয়েছে। ইউরিক অ্যাসিডের জন্যে। সারাজীবন খেতে হবে। সকাল বেলা একটি করে।"

"কম্পাউণ্ডারের ওষুধ খাওয়ার কী দরকার! ডাক্তার ব্যস্ত থাকবে কেন?"

"বাঃ। কাল শনিবার নয়? ঘোড়দৌড়ের দিন! আজ তারই প্রস্তুতি।"

"সে কি! রেসুড়ে ডাক্তার জোটালে কোত্থেকে?"

"আরে ও রেস খেলে থোড়ি! ও যে ঘোড়ার ডাক্তার। শুক্র আর শনিবারে মাঠে ওকে যেতেই হয়।"

"তাই বলো! এতদিনে ঠিক ডাক্তারই ধরেছ। তুমিও তো ঘোড়া-ই।"

কথাটা গায়ে না মেখে হীরু বললেন, "শ্রীমন্ত কোথায়? তুমি একলা হবে কখন?"

"আজ ও নেই-ই। দেশে গেছে।"

"কেন?"

"কুকুরে কামড়েছে ছেলেকে।"

"আর মোক্ষদা?"

"সে তো মাসের প্রথম শুক্রবারে এই সময়ে থাকে না। জানোই তো!"

"মোক্ষদাও নেই এবং শ্রীমন্তও নেই আর তুমি এতক্ষণে আমাকে একটা ফোন করতে পারলে না। বেশ লোক তো!"

"আমার বয়েই গেছে। যত বয়স বাড়ছে তোমার এসবও আরও বাড়ছে।"

"বয়স কী বয়সে হয় হেম! বয়সকালে স্বধর্মকে বেশি গলাটিপে রাখলে অসময়ে তা প্রকট হয়। এই নিয়ম। যা ভবিতব্য তাই ঘটছে। বুঝেছ হেম।"

"বুঝছি কী আর না! ভয় হয়, কোন্‌দিন জিষ্ণু আর পরীর কাছে ধরাই না পড়ে যাই। ইতিমধ্যেই পড়েছি কী না কে জানে? পরীর হাবভাব আমার ভালো লাগে না আজকাল। বড়োই উদ্ধত হয়েছে। আমাকে বিশেষ রকম তাচ্ছিল্য করছে। ভয়ে জিজ্ঞেসও করতে পারি না কিছু। মুখের ওপর যদি বলে দেয় খারাপ কিছু? ভয় করে বড়ো।"

"আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি।"

হঠাৎ অচেনা গলা বলে উঠল ফোনে।

হীরু বললেন, "কে? কে? কী বলছেন?"

হেম চুপ করে গেলেন। বিপদের গন্ধ মেয়েরা অনেকই আগে পায়।

"কে?"

আবার বললেন হীরু।

"বুড়ো বয়সে কী প্রকট হয় বলছিলি রে বুড়ো?"

"কে আপনি?"

"আমি তোমার যম। সবাইকে বলে দেব।"

"কী? কী বলে দিবিরে ছোঁড়া? বাঁদর কোথাকার।"

হীরু অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন।

অপর প্রান্ত বলল, "যা বললে ফাঁসবি তোরা বুড়োবুড়ি।"

"কী। কী ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"ইয়ার্কি নয় বাপ। সব সত্যি! তুমি আমাকে না চিনলে কী হয়, আমি তোমাকে চিনি। দেখো কী করি! মা-ন-তু।"

"ধ্যাত।"

বললেন, হীরু।

হেমপ্রভা নীরব।

"আমি ছেড়ে দিচ্ছি। বুঝেছ! কোনো চ্যাংড়া ছোঁড়ার সঙ্গে ক্রস-কানেকশন হয়েছে।"

হীরু বললেন।

"হ্যাঁ গো কেষ্টঠাকুর। আমি হলাম গিয়ে চ্যাংড়া আর তুমি তো ভ্যাংড়া হয়েও রসের বন্যা বওয়াচ্ছ।"

"চোপ। এক চড়ে দাঁত ফেলে দেব।"

বলেই, রিসিভার নামিয়ে রাখলেন হীরু। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়েছিলেন। কপালের শিরাগুলো দপদপ করছিল। হীরু ফোন করছিলেন গোদা কম্পাউন্ডারের ডাক্তারখানা থেকেই। হিতেন ডাক্তার বিকেলে এখানেই বসেন ছ-ঘণ্টা। গোদা কম্পাউন্ডারবাবুকে নিজের সি এ বি-র সিজন টিকিটখানা প্রতি ক্রিকেট মরশুমে দিয়ে দেন হীরুবাবু। তাতেই বন্ধুত্ব অটুট আছে। ছিপছিপে কম্পাউন্ডারবাবুর নাম গোদা। হীরুর চেয়ে একটু ছোটোই হবে বয়সে। আজকাল লাল-নীল মিক্সচার কলকাতাতে আর বানানোর চল নেই। আজকালকার ডাক্তারেরা তেমন প্রেসক্রিপশন লিখতেই জানে না। তাই কাজের মধ্যে ইনজেকশান দেওয়া, ড্রেসিং করা; এই। কিছু রেগুলার বুড়ো রসিক পেশেন্ট আছেন। হর্মোন ইনজেকশান নিতে আসেন। নিউমার্কেট থেকে চড়াই পাখি কিনে নিয়ে এসে ভেজে খান। তাতে নাকি "ফাকিং-পাওয়ার" বাড়ে।

চক্কোত্তি সাহেব বলেছিলেন গোদাকে।

রোজ সল্ট লেক থেকে ইনজেকশান নিতে আসেন চক্কোত্তি সাহেব। নিজে কাকে ইনজেকশান দেন তা অবশ্য জানা নেই গোদার। নিজের স্ত্রীকে নিশ্চয়ই নয়। স্ত্রীকে দেখলে মনে হয় চক্কোত্তি সাহেবের ঠাকুমা। তিনি এসব রিপুমুক্ত হয়ে গেছেন অনেকদিন আগেই। সাঁইবাবাই এখন তাঁর সব কিছু।

গোদা বলল হীরুকে, "আরে চটো কেন? তাও তো বেঁচে গেছ যে, বে-থা করোনি। আমার বাড়িতে জ্যাঠতুতো দাদার মেয়েটা কলেজে যায়। তাকে যে কত চ্যাংড়ায় ফোন করে তা কী বলব! আব তাদের কথার কী ছিরি! শুনলে গা গরম হয়ে যায়। আমরা কোনো কথা বলার আগেই ঝড়ের মতো বলে দেয়। শালার কী দিনকালই যে হল।"

আমি বলি, "হ্যালো"—

উত্তরে সে বলে, "দুর শালা! খ্যাঁচা বাপটা ধরেছে মাইরি। ফোন করার পয়সাই জল!"

হীরু হাসেন। গোদার কথা শুনে। তারপর বলেন, "পুলিশে খবর দাও না কেন?"

"ভালোই বলেছ। আস্ত মেয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাই পুলিশ কিছু বলে না আর ফোন। কাল বিকেলে মহাসমারোহে পাড়ার সবকটা রিকশাওয়ালাকে ধরে নিয়ে গেল। তাদের কী অপরাধ জানা গেল না। হল্লা এসেছিল। আজ সকালেই দেখি তারা নিজের জায়গাতে ডিউটিতে।"

"কী ব্যাপার?"

"ওরা বলল, জন প্রতি একশো টাকা করে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

"কিসের টাকা?"

"বড়োবাবুর মেয়ের বিয়ের প্রেজেন্ট। বড়োবাবুর ছোটো মেয়ের নাকি বিয়ে ঠিক হয়েছে।"

গোদা কম্পাউন্ডার বলল, "কী হবে এসব দেখে মন খারাপ করে। তার চেয়ে চলে যাও দাদা যেখানে যাচ্ছ। আমাকে তো একদিনটির তরে দেখালেও না মাইরি তোমার সোনার মূর্তিটিকে। কী যেন-নাম? হেম না কী যেন! আমি কি তোমার ভাগে ভাগ বসাতুম? তবে চালিয়ে তো গেলে! প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল। কী গো? এবারে ইনজেকশানটান লাগলে বলো। প্রবলেমটা বললেই হল। সল্যুশান তো আমারই হাতে।"

হীরু চিন্তান্বিতভাবে আবার ফোনটা ওঠালেন। ডায়াল ঘোরালেন। বললেন, "হ্যালো।"

"আনন্দবাজার। কাকে চাইছেন? ও। দয়া করে এট্টু ধরুন, একটু ধরুন। লাইন এনগেজ আছে।"

"শুনুন, শুনুন, কত নম্বর? নম্বরটা কত?"

"এক্সটেনশান নাম্বার দিয়ে কী হবে? এই নিন। দিনু, 'দেশ'-এর ঘরে।"

"হ্যালো। বলুন, আমি সঞ্জীব বলছি।"

"সঞ্জীববাবু? মানে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়?"

"হ্যাঁ।"

"সঞ্জীববাবু, আমার কী সৌভাগ্য।"

হীরু রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বললেন।

"আমারও খুব সৌভাগ্য। আপনার জন্যে কী করতে পারি?"

রসিক সঞ্জীববাবু বললেন।

গদগদ হয়ে হীরুবাবু বললেন, "আজ্ঞে আপনাকে কিছুই করতে হবে না। রং-কানেকশানের দৌলতে আপনার সঙ্গে আজ কথা হয়ে গেল। ভালো থাকবেন স্যার। ভালো লিখবেন। আমি আপনার একজন গ্রেট অ্যাডমায়রার। অবশ্য অগণ্যজনের মধ্যে একজন।"

"অনেক ধন্যবাদ।"

"নমস্কার।"

"নমস্কার।"

গোদা বলল হীরুবাবুর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, "হলটা কি তোমার?"

"আজ দিন খুব খারাপ। আবার খুব ভালোও। ভালো কারণ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে কথা বলতে পারলাম। পড়েছ, ওঁর শ্বেতপাথরের টেবিল? অন্য কোনো বই?"

গোদাবাবু লেখাপড়ার ধার ধারেন না বিশেষ। তবে খবরের কাগজ পড়েন। বললেন, "ওঁঃ 'মেক্সিকো' পড়ছি আনন্দবাজারে। রবিবারে রবিবারে। দারুণ লাগছে।"

বলেই বললেন, "এ কলকেতা শহর। আর টেলিফোন ফেলিফোনের চেষ্টা না করে দুগগা বলে বেরিয়ে পড়ো তো দাদা। শুভ কাজে বিলম্ব করতে নেই। রোদও চড়া হচ্ছে ক্রমশ।"

হীরুবাবু যখন ট্যাক্সি ধরে পৌঁছোলেন গিয়ে হেমপ্রভার বাড়িতে তখন বেলা সাড়ে-এগারোটা পৌনে-বারোটা। হেমই দরজা খুললেন।

"বাঃ। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।"

হীরু বললেন।

"তুমি তো রোজই সুন্দর দেখছ আমাকে গত তিরিশ বছর ধরেই।"

"তা দেখি। মিথ্যে বলব না।"

"মিথ্যে এই একটা ব্যাপারে না বললে কী হয়। মিথ্যেতে তো আপাদমস্তকই মোড়া তুমি মোড়া আমাদের এই সম্পর্কও। যার বিয়ে করার সাহস হল না আমাকে সমাজের ভয়ে, তাকে আর যাই বলি, সাহসী তো বলতে পারি না।"

"ভয় শুধু আমার কারণেই নয়। যদি সকলে জানত যে পরী আমারই মেয়ে, স্থিরব্রতর মেয়ে নয়, তবে যে সম্মান আজ তুমি পরী এবং জিষ্ণুর কাছে পাও তা কি পেতে?"

গম্ভীর মুখে হেমপ্রভা বললেন, "সেই সম্মানেই টান পড়েছে এখন। ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি যদি সত্যিই ওরা জেনে যায় তবে ইহকালও গেল, পরকালও। তাছাড়া ওরা তো চিরদিন আমার থাকবে না। জিষ্ণুর বিয়ে হলেই সে পর হয়ে যাবে। আজকালকার মেয়েদের তো দেখছিই। হয়তো এ বাড়ি ছেড়ে দিয়েই চলে যাবে বউ-এর হাত ধরে নতুন ফ্ল্যাটে। পরীও চলে যাবে স্বামীর সঙ্গে তখন?"

"তখনও যদি আমি বেঁচে থাকি তখন তোমার কাছে এসেই থাকব। মরার সময়ে যেন তোমার কোলে মাথা দিয়ে মরতে পারি।"

"বাজে কথা থাক। আমাকে যে অজুহাতে দেখিয়ে গেলে সারাটা জীবন সে অজুহাত তোমার আর টিকবে না। সোনার মূর্তিও কালো হয়ে যায়। সময় বড়ো বলবান। ধুলোবালি সব জায়গাতেই পৌঁছোয় হীরু।"

তারপর হেম একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কী খাবে? খেয়ে যাও আজ আমার সঙ্গে। ফিরে গিয়ে তো গদাধরের ওই ঠান্ডা খাবার গিলবে। বড়ো অবহেলা করে ও তোমাকে।"

"আমিও তো কম অবহেলা করিনি ওকে। তিরিশ বছর কাজ করছে আমার কাছে। কিন্তু কী দিয়েছি ওকে? মুখের কথা ছাড়া? তাছাড়া এ বয়সে যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো।"

"সংযম বুঝি কেবল খাবারই বেলায়?"

"হ্যাঁ।"

হেসে ফেলে বললেন হীরু।

"চলো, ঘরে বসবে তো!"

"বসবার জন্যে কি এসেছি? না কি খেতে?"

"আসো নি?"

ধরা-পড়া হাসি হাসলেন হীরু। লজ্জার হাসি।

বললেন, "স্বীকার করতে লজ্জা নেই।"

"তা জানি। তোমার মতো নির্লজ্জ কমই আছে।"

বিছানাতে গিয়ে বসলেন হেমপ্রভা। বয়স চল্লিশের কোঠার শেষে। কিন্তু শরীরের গড়ন-পেটন এতটুকু নষ্ট হয়নি। পরী ওঁর শরীরের বাঁধনটি পেয়েছে এবং হীরুর নাক-চোখ এবং দৈর্ঘ্য। স্থিরব্রত

বেঁটে ছিলেন। তাই পুরুষের চোখ একবার পরীর উপরে পড়লে আর নড়ে না। পরী ডানা-কাটা পরীরই মতো সুন্দরী। কিন্তু হেমপ্রভার মুখের আলগা সৌন্দর্যটি পায়নি সে। অবশ্য যা পেয়েছে, তা খুব কম বাঙালি মেয়েই পায়।

"জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।"

"সব?"

"সব। বৃষ্টি আসছে।"

"ঘরে, না বাইরে?"

হেম হেসে বললেন, "ঘরে-বাইরে।"

তারপর শাড়িটা ছেড়ে রাখলেন চেয়ারের উপরে। শায়া আর ব্লাউজ পরেই বিছানাতে গিয়ে শুলেন।

"ব্লাউজটা খুলবে না? ভিতরের জামা?"

"না! অত শখে আর কাজ নেই! দিনের বেলা। কখন কে এসে পড়ে!"

"আহা! রাতের বেলা কবে যেন আদর খেয়েছ আমার! পরীও তো এসেছিল দিনের বেলাতেই।"

"হ্যাঁ। দিনের পরী বলেই আসল পরী হল না।"

জানালা বন্ধ করতে থাকা হীরুকে বললেন হেম।

হীরু বিছানাতে গিয়ে যেই বসলেন অমনি নিচে কলিংবেল বাজল।

"দেখলে! বলেছিলাম! কথা শোনো না তুমি।"

বিরক্ত ও উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন হেমপ্রভা।

"তুমি থাকো। আমিই বরং দেখে আসি।"

"না, তুমি খাওয়ার ঘরে গিয়ে বসো। আমিই দেখছি।"

খাওয়ার ঘরে যেতে যেতে হীরুবাবু ভাবছিলেন ছোটো স্টেশানের স্টেশানমাস্টারেরা যেমন রাতের বেলার মেল ট্রেনকে বাতি দেখাতে হয় বলে দিনের বেলাতেই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন নিরুপায়ে, ওঁর দশাও তেমনই।

নিচে গিয়ে দরজা খোলার আগে আরও দুবার বেলটা বাজল।

দরজা খুলেই হেম দেখলেন তারিণীবাবু। রঙ-জ্বলে যাওয়া নীল-রঙা প্যান্টটার দু জায়গাতে তালি। সাদা সুতো দিয়ে। জামাটাও ছেঁড়া। কাঁধের কাছে। হাতে একটা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ছাতা। মুখটা গরমে তেতে বেগনি হয়ে উঠেছে। হাঁপাচ্ছিলেন বৃদ্ধ তারিণীবাবু।

"কী ব্যাপার? না বলে-কয়ে এমন অসময়ে?"

বিরক্ত গলায় ভুরু কুঁচকে বললেন হেম।

"কোনো সময়ই তো আপনার সুসময় নয়। এদিকে আমিও আর পারি না যে হৈম দেবী।"

তারিণীবাবু এ বাড়ির বাড়িওয়ালা। তিরিশ বছর আগে তিরিশ টাকায় এ বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন। তারিণীবাবুর দুই ছেলেই ভালো চাকরি করে। কিন্তু বিয়ে করে অনেকদিনই আলাদা হয়ে গেছে। অবশ্য চাকরির কারণেও। একজন থাকে ইংল্যান্ডে। পাঁচ বছরে আসে একবার। অন্যজন জামশেদপুরে আছে। সে আসেই না। হয়তো কলকাতার খুব কাছে বলেই। মেয়ের বিয়ে হয়েছে চিত্তরঞ্জনে। জামাই নবকুমার অতি সাধারণ চাকরি করে লোকোমোটিভ ফ্যাক্টরির স্টোর্স-এ। ছেলেমেয়ে নিয়ে তারা একেবারে ল্যাজেগোবরে। মেয়ে কাছে থাকলে হয়তো দেখত কিন্তু তারিণীবাবুকে দেখার সামর্থ্য সে রাখে না। বৃদ্ধ এখন তিনশো টাকা পেনশান পান। পেনশানের এখনকার রমরমা তখনকার দিনে ছিল না। বাড়ি ভাড়া তিরিশ বছরে তিরিশ থেকে বেড়ে হয়েছে একশো তিরিশ। আর বাড়েনি। হেমপ্রভাই বাড়াননি। অনেকবারই বলেছেন তারিণীবাবুকে, কোর্টে যান, অসুবিধে হলে।

"হৈমদেবী। একটু জল পেতে পারি কি?"

তারিণীবাবু বললেন।

হেমপ্রভাকে তারিণীবাবু চিরদিনই হৈমদেবী বলেন। হেমপ্রভা কোনোদিনও আপত্তি করেননি।

শুকনো গলায় হেমপ্রভা বললেন "আসুন। ভিতরে এসে বসুন।"

ওঁকে একতলার বসার ঘরে বসিয়ে হেমপ্রভা খাবার ঘরে এলেন দোতলাতে।

হীরু বললেন, "কোন আপদ?"

"বাড়িওয়ালা তারিণীবাবু। আপদেরও বাড়া। সেই ঘ্যানঘ্যানে আবদার। ভাড়া বাড়াও।"

"বাড়ি তো তোমাদেরই হয়ে গেছে। পাঁচ-দশ হাজারে কিনে নাও এখন। কত ভাড়াটে করছে। এখন তো ভাড়াটেদের দিকেই আইন। পুরোনো বাড়িওয়ালারা কেঁদে কূল পাচ্ছে না।"

তাড়া ছিল, তাই কথার উত্তর না দিয়ে ট্রে-তে করে ঠান্ডা জলের বোতল আর গেলাস নিয়ে গেলেন হেম। দুটি রসমুণ্ডি ছিল ফ্রিজে কেষ্ট ঠাকুরের জন্যে তাও নিলেন একটি প্লেটে।

রসমুণ্ডিটা খেলেন না তারিণীবাবু। বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে পুরো বোতলের ঠান্ডা জলই খেয়ে ফেললেন।

"আঃ। বড়ো পিপাসা পেয়েছিল। মে মাসের গরম।"

"বলুন, কী বলতে এসেছেন।"

রুক্ষস্বরে হেম বললেন।

"আমি তো একা। জানেনই তো। স্ত্রী তো গত কুড়ি বছর গত হয়েছেন।"

"সে তো কুড়ি বছর হলই জানি।"

"এখন থাকবার মধ্যে আছে একটি কুকুর।"

"কী কুকুর? অ্যালসেশিয়ান?"

"আজ্ঞে না। মালিকই খেতে পায় না তা অ্যালসেশিয়ান রাখব কী করে। সে একটি নেড়ি কুত্তা।"

"অ!"

"আমি আর সে খাই। দুটি পেট। তিনশো পেনশান আর একশো তিরিশ ভাড়াতে কত হয়?

"চারশো তিরিশ।"

"ভাগের বাড়িতে দেড়খানা ঘর পেয়েছি। তাতেই আছি গত পনেরো বছর। তাও করপোরেশান ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিলে চলে যায় মাসে তিরিশ, মানে গড় হিসেবে ধরলে। চারশোতে কি চলে বলুন? বাতের ওষুধ ব্লাড-প্রেশারের ওষুধ আছে, হার্টের ওষুধ আছে। এ সবেই তো চলে যায় একশো।"

"সংক্ষেপে বলুন। আমার তাড়া আছে। একজন অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে।"

"তা তো হতেই পারে। ভাড়াটা কি আর অন্তত একশো বাড়ানো যায় না? মাসে?"

"টাকা কি খোলামকুচি?"

"জানি, তা নয়।"

"কিন্তু আজ এবাড়ি ফাঁকা হলে কম পক্ষে এক হাজার টাকা ভাড়া হত।"

"তা হত। কিন্তু এক বছরে বারোমাস। তিরিশটি বছর ধরে যে ভাড়া পেয়েছেন তা আজ জমিয়ে ব্যাংকে রাখলে কত সুদ পেতেন? হাজার টাকার উপরে। সেই সুদের টাকাটা আমার লস।"

কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকলেন তারিণীবাবু হেমপ্রভার দিকে। ছাতাটা দিয়েই মুখের ঘাম মুছলেন। বুড়োরা শিশুদের মতো ইল-ম্যানারড হয়। জীবনের শেষে এসে ম্যানার্স-এর মতো ওইসব বাড়তি ফালতু আড়ম্বরের অসারতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ হয়ে যান বলেই হয়তো।

একটু দম নিয়ে তারিণীবাবু বললেন, "হৈমদেবী, জিষ্ণুর অফিসের ঠিকানাটা দিতে পারেন?"

"অফিসটা তো কাজের জায়গা। উমেদারির নয়। তাছাড়া আপনার ভাড়াটে তো আমি। জিষ্ণুর কী বলার থাকতে পারে এ ব্যাপারে? আপনারও তো তাকে বলার কিছুই নেই।"

"তা জানি। তবে কোন সময়ে এলে ওকে বাড়িতে পাব?"

"এসে লাভ কী? ওর কাছে? তাছাড়া কখন থাকে না থাকে তা ঠিক বলতে পারি না। আজকালকার ছেলে।"

"তবে হীরুবাবুর বাড়িতেই কি যাব?"

"হীরুবাবু? তিনি আমাদের কে?"

হেম অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললেন।

"কেউই নন?"

অবাক এবং আহত গলায় শুধোলেন তারিণীবাবু।

"কেউই নন তা বলব না। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মতো। বন্ধুও বলতে পারেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপারে আপনি তাঁকে বিব্রত করবেন কেন? তাছাড়া তাঁর কথা আমি শুনবই বা কেন?"

"তাও তো বটে। তবে কী করি?"

"বাড়িটা আমাকে বিক্রি করে দিন।"

"বিক্রি? কত টাকায়?"

"দশ হাজার টাকায়।"

"মাত্র দশ হাজার টাকায়? আজকাল যে ছারপোকার মতো গাড়িগুলো বেরিয়েছে, মারুতি; তার দামই তো একলাখ বারো হাজার।"

"তা আমি জানি না। তাহলে আমার আর কিছুই করার নেই। আপনার ছেলেমেয়েরা আপনাকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু তার দায়িত্ব তো আমার নয়।"

"তা ঠিক, আমার দায়িত্ব আপনার কেন হতে যাবে?"

একটু চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন, "তবে কী করব বলতে পারেন হৈমদেবী?"

"তা আমি আর কি করে বলব? বেলা বাড়ছে। আমার কাজ আছে। এবারে আপনি আসুন। এই অসময়ে কখনই আসবেন না। মিছিমিছি আসেন কেন? বলেইছি তো কেস করে দিন। এমন উত্যক্ত করলে রেন্ট-কন্ট্রোলে ভাড়া জমা দেব এবার থেকে। তা কি ভালো হবে?"

"না। না। আমি চলি। ঠিক আছে। আমাকে সেই বাগবাজারের খাল পাড় থেকে আসতে হয় তো। মিনিবাস চড়ার বিলাসিতাও আজ আর করতে পারি না। যা গরম পড়েছে।"

"আপনার ছেলেমেয়েরা আপনাকে দেখে না কেন? নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে আপনার।"

'কী করে বলব বলুন? কপালের দোষ। তবে হ্যাঁ, দোষই তো। দোষ বলতেই পারেন। যৌবনের প্রথম থেকে আমার একমাত্র চিন্তা ছিল তাদের ভালো করা; তাদের ভবিষ্যৎ। নিজের দিকে একবারও তাকাইনি। সব কিছু তাদেরই দিয়েছি। তাদের লেখাপড়ার জন্যে। তাদের বিয়েতে। এটাই দোষ। মস্ত দোষ হৈমদেবী।"

"তা নয়। তাদের ঠিক করে মানুষ করতে পারেননি। ছেলেমেয়ে মানুষ করা কি চাট্টিখানি কথা? ক-জন তা পারে?"

"মানুষ তো করেছিলামই। বড়ো জন এঞ্জিনিয়ার, ছোটো জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাদের মানুষ করে তোলার চেষ্টা তো আমার বৃথা হয়নি। একে কি মানুষ করা বলে না হৈমদেবী? আমি তো সামান্য টিকিট কালেক্টারের চাকরি করতাম। তাদেরই জন্যে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কম্যুট করেছিলাম সেই কতদিন আগে। আমার সাধ্যের বাইরে গিয়েও পড়িয়েছিলাম তাদের একটু চুপ করে থেকে তারিণীবাবু বললেন, আমার জ্ঞাতিরাও আপনি যা বললেন তাই-ই বলেন। সবই নাকি আমার দোষে। বলেন, টিকিট কালেক্টার হয়ে ঘুষের টাকায় ছেলেদের লাট-বেলাট বানিয়েছ

এখন ছেলেরাই তোমাকে না দেখলে আমরা কী করতে পারি? ভগবানের হাত তো দেখা যায় না হৈমদেবী। তাঁর মার আসে ঠিক সময়ে। কারোরই নিস্তার নেই। পাপ করলে শাস্তি পেতেই হয়। আজ আর কাল।"

বুড়ো হলে মানুষ বড়ো বেশি কথা বলে। অসহ্য একেবারে। ভাবছিলেন, হেম।

একটু ঢোঁক গিলে তারিণীবাবু বললেন, "আসলে আমার জ্ঞাতিদের কারও অবস্থাই তো ভালো নয়। নুন আনতেই পান্তা ফুরোয়। এই বাড়িটিই বাবা আমাকে আলাদা করে দিয়ে গেছিলেন। প্রথম থেকেই আমি এখানে এসেই থাকতে পারতাম। কিন্তু তখন তিরিশ টাকারও যে অনেক দাম ছিল আমার কাছে হৈমদেবী!"

"দাম ছিল বইকী! আপনার কাছে যেমন ছিল আমার মতো একজন প্রায় অসহায় সদ্য-বিধবার কাছে তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল। কথাটা মানেন তো?"

অতীতের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে হেমপ্রভা বললেন—

"আমি তো সেই কথাই বলছি আপনাকে। আপনি বুঝতেই চাইছেন না। আমি বুঝি।"

"জানেন, বড়ো খোকার জন্যে প্রাইভেট টিউটার-এর দরকার ছিল। খুকির গানের মাস্টার। তাই ভাবলাম, বাড়িটা ভাড়াই দিয়ে দিই।" তারিণীবাবু বললেন। "বড়ো খোকা এখন কভেন্ট্রিতে আছে ইংল্যান্ডে।"

"তাই? কবে গেল? দিল্লিতে ছিল না?"

"হ্যাঁ। ওখানে যাওয়ার আগে ছিল!"

হেমপ্রভা এবারে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

বললেন, "আপনার চাকরিতে ঘুষ-ঘাষও তে ছিল একটু-আধটু। জ্ঞাতিরা যা বলেন তার সবটাইতো আর মিথ্যে নয়।"

তারিণীবাবু একটুও লজ্জিত হলেন না।

বললেন, "মফস্‌সলেই পোস্টিং ছিল চিরদিন। কলাটা-মুলোটা জুটত। একেবারে শেষের দিকে বড়ো স্টেশন পেলাম। তা হৈমদেবী মিথ্যে বলব না আপনাকে; রিটায়ার করার সময় হাজার তিরিশেক জমিয়েও ছিলাম ক্যাশ। শেষ জীবনের রোজগার। হার্ড-ক্যাশ। আমাদের সময় ঘুষখোরদের, সমাজে মাথা নিচু করেই হাঁটতে হত। আজকের মতো দিনকাল ছিল না। হাঁসের বাচ্চারা ডিম ফুটে বেরিয়েই যেমন সাঁতার কাটে, এখনকার দিনের ছেলেরা প্রায় সেরকমই মায়ের পেট থেকে বেরিয়েই ঘুষ খায়। স্তন্যপায়ী জানোয়ারদের দুধ খাওয়ার মতো। এদের মধ্যে বিবেক-টিবেক বলে কোনো গোলমেলে ব্যাপারই নেই।"

হেমপ্রভা বৃদ্ধর প্রলাপ থামিয়ে বললেন, "কি করলেন সেই টাকা? তিরিশ হাজার?"

"সেই তিরিশ হাজার?"

"হ্যাঁ।"

"সঞ্চয়িতা।"

"সঞ্চয়িতা? মরুন তাহলে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। ছত্রিশ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট। তখন বাগবাজার আর শ্যামবাজারের বাজারে যারাই গলদা চিংড়ি বা ইলিশ কিনত তারা সবাই কিনত সঞ্চয়িতার সুদের টাকায়। ওঃ কী গরমই না হয়েছিল মানুষের। বেশ হয়েছে। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।"

"আমি কী করব?"

"যা ভালো মনে করেন।"

"জিষ্ণুর ফোন নাম্বারটা?"

"না। দেওয়া যাবে না। জিষ্ণু কে? বলেইছি তো! আপনি কোর্টে কেস করুন বরং তারিণীবাবু।

কুকুরটাকে ওয়ারিশ করে যাবেন। আপনার যা অবস্থা দেখছি, খুব বেশিদিন যে আছেন তাও তো মনে হচ্ছে না।"

"আঃ। তাই-ই আশীর্বাদ করুন হৈমদেবী। তাই আশীর্বাদ করুন। যত তাড়াতাড়ি যাই ততই মঙ্গল।"

তারিণীবাবু চেয়ার চেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎই বললেন, "আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যেদিন আপনি হীরুবাবুর মধ্যস্থতায় এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন তখন আপনার মন এবং মুখের চেহারাও কিন্তু অনেকই নরম ছিল। সদ্য-বিধবা আপনাকে দেখে আমার দয়া হয়েছিল। তাই ওই ভাড়াতে...। নইলে, তখনও এ বাড়ির ভাড়া ইজিলি একশো টাকা হতে পারত মাসে। কী হত না?"

"হ্যাঁ। তারিণীবাবু আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এক কথাই অনেকবার হল। এবার—"

"আপনার মনের ভাব আর মন নরম ছিল না?"

হেম বললেন, "তখন অনেকই নরম ছিল আমার মন। শুধু মনই কেন, অনেক কিছুই নরম ছিল। বাইরেটা এই তিরিশ বছরে যেমন শক্ত হয়ে গেছে, ভিতরটাও হয়েছে। নিশ্চয়ই হয়েছে। আপনারও কি হয়নি?"

এই কথাটা তারিণীবাবুকে অফ-গার্ড করে দিল মুহূর্তে। তারিণীবাবু উঠে পড়ে দরজার দিকে এগোলেন। এগিয়ে গিয়ে নিজেই দরজার খিল খুললেন।

বেশ ঝুঁকে হাঁটেন এখন। আগে কেমন টানটান চেহারা ছিল। পেছন থেকে লক্ষ্য করলেন হেম। ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "এ বাড়ির সব দরজা-জানালা বার্মা টিক-এর। জানেন? বাবা, বার্মার বিখ্যাত সেগুন কাঠের কারবারি স্যালউইন টিম্বার থেকে আনিয়েছিলেন এই কাঠ। ল্যাজারাস কোম্পানিরও রেঙ্গুন থেকে কাঠ আনাত এই স্যালাউইন টিম্বার কোম্পানি থেকেই। বার্মার স্যালউইন নদীর দুপাশে ছিল নিবিড় সেগুনের জঙ্গল। ব্রিটিশ আর্মির জেনারেল উইংগেটের নাম শুনেছে কখনও হৈমদেবী? যিনি শুধুই পেঁয়াজ খেয়ে থাকতেন? তাঁর আর্মির অসাধ্যসাধনের ক্ষমতায় হেড কোয়াটার্স-এ আর্মির অফিসারেরা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'উইংগেটস সার্কাস'। জানেন?"

বুড়ো হলে মানুষ বড়োই বাজে বকে। ভাবছিলেন হেম। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছিলেন।

"জানি না। আপনি এবারে এগোন তারিণীবাবু।"

দরজা খুলেই, তারিণীবাবু বললেন, "উরে বাবাঃ মেঘ গজরাচ্ছে। জোর বৃষ্টি হবে।"

হেমপ্রভা মাথা নাড়লেন।

চলে যেতে যেতেও তারিণীবাবু একবার হেমের দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, "আমাকে দেখে সাবধান হবেন হৈমদেবী।"

"কেন? কীসের সাবধান?"

"আপনি যেমন ভাসুরপো আর মেয়ের জন্যে করছেন, আমিও নিজের ছেলেমেয়ের জন্যে তার চেয়েও বেশি করেছি। নিজের দিকে তাকাবেন। কিছু আশা করবেন না সংসারে কারও কাছ থেকেই। আমার মতো বোকা হবেন না।"

হেমপ্রভা বেশ ধাক্কা খেলেন কথাটিতে।

তারিণীবাবু চলে গেলে, দরজায় খিল দিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে উপরে এসে দেখলেন যে হীরুর আর তর সয়নি। হৈমর বিছানাতে প্রায় বিবস্ত্র হয়েই পাখাটি "অন" করে দিয়ে শুয়ে আছেন।

হেম গম্ভীর হয়ে গেছিলেন। তারিণীবাবুর শেষ কথাটি তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

"কী এত আসল-সুদের কারবার করছিলে এতক্ষণ?"

রসিকতা করে বললেন হীরুবাবু।

হেমপ্রভা কথা না বলে হাসলেন।

জানালা-বন্ধ প্রায়ান্ধকার ঘরে তাঁর দিকে তাকিয়ে হীরুবাবুর মনে হল এখনও হেম যুবতীই আছেন। হারায়নি কোনো কিছুই। হেমের মতো সুন্দরী, জেদি এবং স্বয়ম্ভর নারী তিনি কমই দেখেছেন জীবনে। নইলে আর নিজে সারাজীবন বিয়ে না করে কেন...

হেমপ্রভা বললেন, "বোলো না আর! জ্বালাল ওই বাড়িওয়ালা তারিণীবাবু।"

"বেচারা। তোমার ঢলডলে মুখখানি দেখে মাসে মাত্র তিরিশ টাকায় এ বাড়িটি ভাড়া দিয়েছিলেন। আজ তার কী দুর্গতি। চার কাঠার উপরে বাড়ি। এ বাড়ির দাম আজকে চার-পাঁচ লাখ হবে।"

"তা হবে। সবাই তো তোমার মতো চালাক নয়। বেশিরভাগ পুরুষই তারিণীবাবুর মতোই বোকা। ঢলঢলে মুখ আর ঝরঝরে শরীর দেখে যে ভুল করেছিলেন, সারাটা জীবনই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হল। এবং হবেও তাঁকে।"

"আমি তো এক নম্বরের বোকা।"

হীরুবাবু বললেন।

"বোকাই বটে। কড়ায়-গণ্ডায় উশুল করে নিয়েছ সব কিছুই। এখন দেনা হয়ে গেছে আমাব কাছে পাওনার বদলে।"

"মিটিয়ে দেব। মিটিয়ে দেব, এখনও যদি সব মিটে গিয়ে না থাকে। পরীর বিয়েও আমিই দিয়ে দেব। ভেব না কিছু।"

"পরী হয়তো ভাবতেই দেবে না আমাদের। তবু পরীর বিয়ে হয়ে গেলে আমি আর তুমি তীর্থে চলে যাব। তখন লোকে কে কী বলল তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা থাকবে না। আমার অন্তত থাকবে না। তোমারও থাকা উচিত নয়। লোকভয় বুকে করে আর বাঁচতে পারি না। বড়ো কষ্ট।"

"আজ তুমি বড়ো কথা বলছ হেম। এসো তো এবারে।"

প্রথমবারের অনুরোধ "না" করেছিলেন। তাই হীরুকে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষায় রাখার খেসারত হিসেবে নিরাবরণ হয়েই এলেন এবারে হেমপ্রভা। আয়নাতে তাঁর শরীর অন্ধকারে ঝিলিক মারল। এখনও কোথাওই একটু বাড়তি মেদ নেই। তলপেটে অতি সামান্য ছাড়া। ওখানে না থাকলেও খারাপই দেখাত। খুশি হলেন হেমপ্রভা নিজেকে দেখে।

হীরু অধৈর্য দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন মেহপ্রভার ঠান্ডা, মসৃণ, উজ্জ্বল, কোমল শরীরকে। হেমপ্রভার শরীরে কোনদিনও কোনো দুর্গন্ধ পাননি তিনি। চূড়ান্ত গরমেও না। অথচ হেমপ্রভা মাথায় লক্ষ্মীবিলাস তেল ছাড়া সর্বাঙ্গে কোথাওই কোনোদিন প্রসাধন তো দূরের কথা পাউডার বা তেলও ব্যবহার করেন নি। পদ্মিনী নারী।

মনে মনে বলেন হীরু।

হেমপ্রভা সবে নিজের শরীরটাকে যেই আলগা করে দিয়েছেন হীরুকে গ্রহণ করবেন বলে নিঃশব্দ আড়ম্বরে অমনি কলিং বেলটা আবার বাজল।

হীরু দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন।

হেমপ্রভা বললেন, "দাঁড়াক গে! যে এসেছে সে। যত্ত আপদ অসময়ে।"

হীরু এক সেকেন্ড সময় নিলেন ভাবতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বেলটা বেজে উঠল একই সঙ্গে বারবার। আবার ঝনঝন করে। হীরুবাবুর গড়ে তোলা ইমারত ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

হেমপ্রভা উঠে পড়ে জামাকাপড় পরতে পরতে বললেন, "নিশ্চয়ই পরী। ও ছাড়া এমন অধৈর্যর মতো বেল আর কেউই দেয় না। তোমার যে এত ধৈর্য তার কি ছিটেফোঁটাও পেতে পারত না মেয়েটা?"

হীরু উঠে পড়ে বললেন, "তুমিই তো বলে এলে চিরদিন যে ও আমারই মেয়ে। কার যে মেয়ে তা স্থিরব্রতও জানতো না হয়তো। আমি তো জানিই না। ছেলেমেয়ে যে আসলে কার তা মায়েরাই জানে।"

"তাড়াতাড়ি করো তো। কথা বোলো না এত।"

রাগ ও বিরক্তির গলায় বললেন হেমপ্রভা।

"কী বলবে? দোর খুলতে দেরি হওয়ার কারণ?"

চিন্তান্বিত গলায় হীরু শুধোলেন হেমপ্রভাকে।

"বলব, বাথরুমে ছিলাম। তারিণীবাবু আসতে চানে যেতে দেরি হয়ে গেছিল।"

"আমি কোথায় থাকব?"

ধরা-পড়ে চোরের মতো হীরুবাবু বললেন।

"তুমি জিষ্ণুর ঘরের লাগোয়া বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে থাকো।"

"দুসস, পরকীয়ায় বড়ো ফ্যাচাং। এই বয়েসে আর পোষায় না।"

"তিরিশ বছর পরে বুঝলে বুঝি? বিয়ে করার মুরোদ থাকলে তো পরকীয়া করতেই হত না।"

"বিয়ে করা লোক দেখে ঘেন্না হয়ে গেছে। পরকীয়া মানুষকে নতুন রাখে।"

হীরু গিয়ে জিষ্ণুর ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে খবরের কাগজটা নিয়ে বসলেন। বেলটা বেজেই চলেছে। ঝনঝন ঝনঝন। হীরুবাবুর মাথার মধ্যে অতীত ভাঙছে কাচের বাসনের মতো। হীরুবাবু ভাবছিলেন, পরী এসে এক্ষুণি কলকল করে কথা বলতে বলতে বারান্দাতে ঢুকবে। মাঝে মাঝে বড়ো ব্যথা বোধ করেন। নিজের হয়েও মেয়েটা নিজের হল না। পরীকে দেখলেই বুকের মধ্যে নানা গভীর বোধ উথালপাতাল করে। অপত্য। অথচ সমাজ তাঁকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করল।

পরী কিন্তু এল না। আসেনি। শ্রীমন্তর গলা শুনলেন একটু পরেই হীরুবাবু।

শ্রীমন্ত বলেছিল হেমকে, "আর বোলোনা গো মা। মিছিমিছি হয়রানিটা করালে। মদনাটা চিবকালই অমনই বে-আক্কেলে। কুকুরে কামড়েছে বটে, ছোটো ছেলেকেও বটে; তবে আমার ছেলেকে নয়।"

"তবে?"

"আমার যে জ্যাঠতুতো ভাই, গোবর্ধন, বাবার ধানজমি যে মেরে দিলে গত বছর পঞ্চায়েতকে ঘুষ খাইয়ে, সেই তারই ছেলেকে। ছেলেটা মরলে বাঁচি। খামোখা গরমের মধ্যে হাঁচোড়-পাঁচোড় কবে গেলাম। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পাপ করেচো, পাচিত্তির করবে না?"

"তোমার রান্নাও তো করিনি। তাড়াতাড়ি যা হোক দুটো ফুটিয়ে নাও তোমার জন্যে।"

বিরক্তির গলায় হেমপ্রভা বললেন।

"আর হীরুবাবু এসে বসে আছেন বাড়িওয়ালা আসবেন বলে। তিনিও তো এলেন না।"

"বাবু কোথায়?"

"দ্যাখো কোথায়? বোধহয় দাদাবাবুর বারান্দায় আছেন।"

ইতিমধ্যে হীরু এসে দাঁড়ালেন।

"এত বেলা যখন হল দুটি খেয়েই যাও। গিয়ে তো ঠান্ডা খাবে। গদাধরকে কিন্তু তাড়ানো দবকার। বড়োই অযত্ন করে ও তোমায়। এ বয়েসে এত সইবে কেন?"

"না, না চলেই যাই।"

"সে কি বাবু!" এবাব শ্রীমন্ত বলল। "এই রোদে চলে যাবেন কি? আমি খাবার বেড়ে দিচ্ছি।"

"তোমায় বাড়তে হবে না শ্রীমন্ত। তুমি আগে চান-টান করো। গরমে এসেচ। আমিই বেড়ে দিচ্ছি।"

হেমপ্রভা বললেন।

"তাই করি।"

শ্রীমন্ত বলল।

শ্রীমন্ত তার পুঁটুলি নিয়ে ছাদে নিজের ঘরে গেল। ছাদেই চান করবে। মোক্ষদা যখন থাকে, দোতলাতেই থাকে। তখন নিরিবিলি হওয়া হেম-এর পক্ষে আরও মুশকিল।

হেমপ্রভা হীরুর চোখে চিরন্তন পুরুষের অধৈর্য কাম দেখতে পেলেন। মুখে বললেন, "আজ থাক। শ্রীমন্ত হুট করে নেমে আসবে। বাধার পর বাধা আসছে আজ।"

হীরু বললেন, "যাই হোক। আমি আজ তোমাকে চাই-ই।"

হেমপ্রভা আস্তে শব্দ না করে দুয়ার দিলেন। ঠিক সেই সময়েই দরজায় ধাক্কা দিল শ্রীমন্ত। বলল, "মা, বাবুকে তো খুঁজে পাচ্ছি না। চলে গেলেন না কি? আপনি কি পুজোয়?"

হেমপ্রভা ভাবলেন, পুজো নিশ্চয়ই। তবে তিনি এখন দেবীর ভূমিকায়। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বিরক্তিতে বললেন, "হ্যাঁ। পুজোয়।"

শ্রীমন্ত নিচে নামতেই নিঃশব্দে আবার দরজা খুলে হেমপ্রভা হীরুকে বললেন, "তুমি শিগগির পরীর ঘরে চলে যাও। শ্রীমন্তকে বলবে যে, আমি পুজো করছি। আসছি দু মিনিটে। কী যে করো না! তোমার জন্যে আমার সর্বস্ব যাবে।"

আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে হেমপ্রভা ভাবছিলেন, মিথ্যার এই দোষ। একটা মিথ্যা বললে দশটা মিথ্যা দিয়ে তা ঢাকতে হয়।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েই হেমপ্রভা দেখলেন শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তরও এ বাড়িতে কুড়ি বছর হল। আর মোক্ষদার প্রায় পঁচিশ বছর। শ্রীমন্তর চুলের প্রায় সবই সাদা। সাদা চুল ওর কাটা-কাটা মুখকে এক সম্ভ্রান্ততা দিয়েছে। মোক্ষদার বয়স শ্রীমন্তর চেয়ে বেশি হলেও ওর কপালের দুপাশটুকুই সাদা হয়েছে শুধু।

শ্রীমন্ত হেমপ্রভার চোখে তাকাল। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

শ্রীমন্ত বলল, "দরজা তো ভেতর থেকেই খিল দেওয়া ছিল।"

"দিদিমণির ঘরে দ্যাখতো। সেখানেই আছেন তাহলে।"

"দিদিমণির ও দাদাবাবুর ঘর—বারান্দা দেখেই তবে আপনার ঘরে ধাক্কা দিয়েছিলুম মা। বাবু তো কোথাওই নেই।"

হেমপ্রভার চোখ জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্যে শ্রীমন্তর চোখে তাঁর চোখ পড়তেই। শ্রীমন্তর চোখে দুঃখ-মিশ্রিত বিস্ময় ছিল। হেমপ্রভাকে শ্রীমন্ত সম্মান করত। আজ...

হেমপ্রভা বললেন, "এ দু ঘরেই আবার দ্যাখো, পাবে নিশ্চয়ই। জলজ্যান্ত মানুষটা তো উপে যাবে না।"

এমন সময় পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে হীরু বললেন, "ব্যাপারখানা কী? তোমরা কি পুলিশে ফোন করবে নাকি? এই তো আমি!"

হেমপ্রভা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবছিলেন যে আজ হীরুকে বাধা দেওয়া উচিত ছিল। খুবই উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর ভেতরেও এক তাগিদ বোধ করছিলেন যেন। সবদিন এমন করেন না। বিপদের ঝুঁকি আর নেই বলেই মাঝে মাঝে আজকাল শরীরকে প্রবলভাবে বোধ করেন। আগুন বাধা পেলে জোর হয় বোধহয়। ভাবছিলেন মোক্ষদার কাছে তো বহুবারই দিনে এবং রাতে ধরা পড়েছেন। আজ প্রথম শ্রীমন্তর কাছেও পড়লেন। মেঘলা আকাশে দুপুরের কলকাতায় ঘুরে ঘুরে চিল উড়ছিল। স্টেইনলেস স্টিল-এর বাসনওয়ালি আর ডাবওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল নির্জন দগ্ধ গলিতে। খাবার গরম করতে করতে হেমপ্রভা ভাবছিলেন যে মোক্ষদা সব জেনেও তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছে। অবশ্য একথা মোক্ষদা জানে না যে পরীর বাবা হীরুই। স্থিরব্রতকে মোক্ষদা চোখেও

দেখেনি কখনও। মোক্ষদাও বাল্যবিধবা। তার বাঁ গালে একটা কাটা দাগ। এবং কটি তিল। দুশ্চরিত্রর লক্ষণ। ছেলেবেলায় আম চুরি করতে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়ায় লেগে গাল চিরে গেছিল। নইলে চেহারাটা ভারি স্নিগ্ধ। হিজল বনের ছায়ামাখা মুখখানি। এ বাড়িতে যে পুরুষই আসে মোক্ষদার মুখে তার চোখ আটকাবেই। শরীরের বাঁধনও চমৎকার। বাদার নোনা-নোনা গন্ধ লেগে আছে যেন। মোক্ষদা বালবিধবা বলেই হয়তো হেমপ্রভার দুঃখের কিছুটা বোঝে। এবং হয়তো বোঝে বলেই ওঁর দুঃখপূরণের অপরাধটাকে খাটো করে দেখে। অবশ্য হেমপ্রভাও ওকে ছাড় দেন। ওর এক গ্রামতুতো দাদা প্রায়ই দুপুরবেলা আসে ছুটির দিনে ওর সঙ্গে দেখা করতে। কোনো কোনো দিন হেমপ্রভা এই বাজারেও তাকে খেয়ে যেতে বলেন। রান্নাঘর, সংলগ্ন বারান্দার ছায়াচ্ছন্ন ভাঁড়ার ঘর এসবই মোক্ষদার রাজত্ব। সেই গ্রামতুতো দাদা রামু এলে হেমপ্রভা শব্দ করে কপাট বন্ধ করে নিজের ঘরে ঢুকে যান। বলে যান, চারটের সময় চা দিয়ো মোক্ষদা। তার আগে আমাকে তুলো না। আমি ঘুমোব। ফোন এলে তুমিই ধোরো। যেই করুক, বোলো যে চারটের পরে করতে।

মোক্ষদা বুদ্ধিমতী। বোঝে তার খেলার বেলার আয়ুষ্কাল। এবং তার নির্বিঘ্ন।

হেমপ্রভা দরজা খোলার অনেক আগেই খেলা সাঙ্গ করে মোক্ষদার গ্রামতুতো দাদা ফিরে যায়। খেলাটা যে কী প্রকারের তা জানার কোনো কৌতূহল হেমপ্রভার ছিল না কখনই। ওরা দুজনে হয়তো মুখোমুখি বসে গল্পই করে। যাই-ই করুক মোক্ষদা, হেমপ্রভা জানেন অন্তরে অন্তরে যে কোনো মানুষের পক্ষেই একা দীর্ঘদিন থাকা বড়ো কষ্টের। মন তো বটেই, শরীরও দোসর চায়। হেমপ্রভা পাপী। তাঁর এই পাপ যৌবনেই এবং স্বামীকে বঞ্চনা করেই। বিয়ের অত অল্পদিনের মধ্যেই পরী গর্ভে আসে তাঁর অথচ সে সন্তান স্থিরব্রতর নয়। স্থির জানেন এ কথা হেমপ্রভা এবং হীরু, হীরেন্দ্র অধিকারী।

কেন, কী করে এসব ঘটল সে সব অনেক কথা। অনেক দিনের কথাও। মনে আনতে চান না হেমপ্রভা। শুধু একটি কথা ভেবে এখনও দুঃখ পান। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে স্থিরব্রত একটিই কথা বলেছিলেন : পরী কোথায়? আমার পরী? ওকে আনো।

বহু বছর হয়ে গেছে। অপরাধবোধ এখন ভোঁতা হয়ে এসেছে। এমন কী মাঝে মাঝে মনে হয়, ব্যাপারটা মিথ্যা।

দুঃস্বপ্ন একটা।

হীরু বললেন, "চলি হেম।"

"হ্যাঁ যাও। ও খেয়ে যাও। নইলে শ্রীমন্ত কি মনে করবে?"

"কিছু মনে করবে না। যাই।"

একতলায় নেমে হেমপ্রভা দরজা খুলে দিলেন।

হীরু বললেন, "আসি। হেম।"

বলে, দুহাতের পাতা দিয়ে হেমপ্রভার দুটি গাল ছুঁলেন।

মাথা নাড়লেন হেম। মাথা নেড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে হঠাৎই তারিণীবাবুর কথাকটি মনে পড়ে গেল হেমপ্রভার। এবং মনে পড়ে ভয় হল খুব। আকাশ কালো করে তো ছিলই।

খুব জোরে বৃষ্টি নামল। পায়রারা ছটফট করে উঠল আলশেতে। ডানা ঝটপট করে উঠল আলশেতে। ডানা ঝটপট করতে লাগল। কে জানে, হীরু বাস স্টান্ডে পৌঁছোতে পারলেন কি না। ট্যাক্সি পেলেন কিনা? একটি মারুতি বুক করেছেন হীরু। পাবেন শিগগিরই।

ভেবে আর কি করবেন হেমপ্রভা? কিছু বৃষ্টি নিজেকে ভেজায়, কিছু বৃষ্টি অপরকে। আরও কিছু বৃষ্টি আছে যা সকলকেই ভেজায়। মাথার উপরের আশ্রয় ছেড়ে যাওয়া মানুষকে সেইসব বৃষ্টি

থেকে বাঁচানো যায় না। কে জানে তারিণীবাবুও হয়তো ভিজে গেলেন! সকলের জন্যই এক ধরনের চাপা কষ্ট বোধ করেন হেম বুকের মধ্যে। নিজের জন্যেও করেন না যে তাও নয়।

আরও জোরে বৃষ্টি নেমে এল অন্ধকার করে চারদিক। মন খারাপ লাগে বড়ো একা মানুষের এমন এমন দুপুরে।

"একটা গান গাও না পরী?"

"পুষি থাকতে আমি কেন?"

"পুষির গান তো শুনতেই পাবে জিষ্ণু সারাজীবন।" পুষি বলল।

"আমার গান কেন শুনতে পাবে না?"

"বাঃ রে। তুমি কি চিরদিনই কুমারী থাকবে। এ বাড়িতেই থাকবে?"

"যদি থাকি? তোমার আপত্তি?"

"এমন করে কথা বলছ কেন তুমি পরী?"

জিষ্ণু এবার বলল মাঝে পড়ে, "আহা বলুকই না। আমরা আমরা কথা বলছি, তুমিই বা এর মধ্যে কথা বলতে এলে কেন?"

"ঠিক আছে।"

"তোমার গলাটা কিন্তু সত্যিই ভালো। একটু চর্চা করলে..."

পুষি বলল, "আমার সবই ভালো। কিছুরই চর্চা যখন করলাম না তখন আর শুধু গানেরই ক কেন?"

"তোমরা কি ঝগড়াই করবে না কি গান শুনতে পাব একটা।"

"আমি গাইব না। পুষি গাইলে, গাক। শুনব আমি। আমার ইচ্ছে করছে না আজ।"

"তাহলে পুষিই গাও। গাও পুষি।"

জিষ্ণু বলল।

"কী গান? 'হৃদয়নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে' গাইব?"

"আবার সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত! তোমরা পারোও বাবা। কথাগুলো, সুরগুলো তো সব পচে গেল. উনিশশো নব্বই পেরুলে বাঁচা যায়।"

পরী বলল।

"কেন?"

"তখন আমি আমার সুরে, আমার তালে, আমার রাগেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব। এখন যেসব রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুল আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেল্ফ-অ্যাপয়েন্টেড সমালোচকরা, স্বরলিপির অথরিটিরা, নিজেদের খেয়াল-খুশি ও নিজ নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের কারণে সকলের মাথাতেই চাঁটি মেরে বেড়াচ্ছেন তা আর করতে পারবেন না। দে উইল বি কাট টু দেয়ার ওন সাইজেস। যাঁরাই এতদিন যা-নয়-তাই করে গেছেন মনের সুখে, তাঁদের ভাতে হাত পড়বে। সুখে কাঁটা।"

"আহা! কারোরই ভাতে হাত-পড়ার চিন্তা না করাই ভালো।"

জিষ্ণু বললে, "তা বললে হবে কেন? তেমন তেমন সমঝদার শ্রোতা সমালোচকদের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনাদর কখনই হবে না। যে যাই বলুক রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন জনগণের সঙ্গীত হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তা আসলে কোনোদিনও ছিল না।"

"তবে ভূসিমালেরা সব ফুটে যাবে। তুমি যাই বলো জিষ্ণু, রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার অনেক ক্ষতি করেছে।"

পরী বলল, "ও বাবাঃ, তুমি তো সেই সব সাহিত্যিকদের মতোই বলছ দেখছি।"

জিষ্ণু হেসে বলল, "কী বলেছিলেন তাঁরা?"

"বলেছিলেন না যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার ক্ষতি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ না লিখতে পারতেন ছোটোগল্প না উপন্যাস। শরৎ চাটুজ্জে লেখকই নন।"

"খারাপটা কী বলেছিলেন? আমারও তো তাই মত। তবে আমি বলব, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড়ো ঔপন্যাসিক আর জীবনানন্দও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বড়ো কবি ছিলেন।"

পুষি আহত গলায় বলল, "বলছ রবীন্দ্রনাথ তা হলে কিছুমাত্রই ছিলেন না।"

"পস্টারিটি তাই প্রমাণ করবে।"

পরী বলল।

"থাকবে হয়তো গানটুকুই থাকবে।"

জিষ্ণু বিব্রত হয়ে বলল, "প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। গানটা কি হবে পুষি?"

"আজ গান থাক। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো নয়ই। তার চেয়ে মাইকেল জ্যাকসন বা হুইটলি হ্যুস্টনের কোনো গান শোনাও পরী।"

পরী পুষির কথার উত্তর দিল না। ঠোঁট উলটে অনিচ্ছা প্রকাশ করল।

তারপর দীর্ঘ নীরবতা। তিন জন তিন দিকে চেয়ে রইল।

পরীর দিকে চেয়ে পুষি বলল, "কম্পিউটার ব্যাপারটা কি পরী? অনেকদিন ধরে অনেককেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু লজ্জায় পারিনি।"

"লজ্জা কেন?" পরী শুধোল।

"বাঙাল ভাববে।"

"বাঙালদের বাঙালত্ব সম্বন্ধে লজ্জা থাকা উচিত নয়। আমরা যে কলকাতার লোক তাতে গর্বিতই বোধ করি আমরা। লজ্জা আসে ইনফিরিয়োরিটি কমপ্লেক্স থেকে।"

"আমি প্রচুর গর্বিত বাঙালদের চিনি। এবং তাদের গর্ব করার কারণও আছে।"

"সকলের সে লজ্জা থাকে না।"

পরী হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল কথাটা মুখ কালো করে। কথাটা ও নিছক রসিকতার জন্যেই বলেছিল।

জিষ্ণু বলল, "আজ তোমার কি হয়েছে পরী?"

"কই? কিছু না তো!"

অপমানটা গায়ে না মেখে পুষি বলল, "আমার কম্পিউটারের প্রশ্নটা কিন্তু এখনও উত্তর দিলে না।"

পরী বলল, "কম্পিউটার হচ্ছে তোমাদের রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার রাজ্যের যন্ত্র। যেখানে মানুষের নাম থাকে না, ফুলের নাম থাকে না, পাখির নাম মুছে দেওয়া হয়। সব কিছুকেই সংখ্যায় এনে ফেলা হয় যে রাজ্যে। সংখ্যাতেই ডিটারমিনড হয় সব কিছুর আইডেনটিটি। কোডিফায়েড হয়ে যায় সবাই। যেই ড্যাটা ফিড করে বোতাম টিপে দেবে কম্পিউটারে, চিচিং-ফাঁক-এর মতোই, যে যাই জানতে চাইছে তার উত্তর, দরজাখোলা সংখ্যায় এসে দাঁড়াবে স্ক্রিনের উপরে। তার পরে তাকে ডি-কোডিফাই করে নাও। অ্যাজ সিম্পল, অ্যাজ দ্যাট। ইয়েস।"

বলেই, পরী কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল বাঁ হাতের এক ঝটকাতে।

"আর ড্যাটা ফিড করবার সময়ই যদি গণ্ডগোল হয়ে যায়?"

বুদ্ধিদীপ্ত চিকন চোখ তুলে পুষি শুধোল।

"তবে তো গেলই সব। গার্বেজ ফিড করলে গার্বেজই বেরোবে।"

"শুনেছি, কম্পিউটারের জন্যে এয়ার-কন্ডিশানড ঘর লাগে?"

"হ্যাঁ। ধুলোবালি একেবারেই সহ্য করতে পারে না কম্পিউটার। আমারই মতো। অ্যালার্জি।"

"আর যে মানুষ তাকে অপারেট করে সে যদি ধূলিমলিন হয়?"

"তার বাইরেটার কথা বলছ?"

দীঘল গভীর চোখ তুলে পরী শুধোল, পুষির চোখে চোখ রেখে।

"না। মানে তা নয়। আজকালকার মানুষেরা তো বাইরে অন্তত, সব সময়ই ফিটফাট।"

"ও। মনের ময়লার কথা বলছ?"

বলেই, রহস্যজনক ভাবে হাসল পরী।

হয়তো পুষির প্রশ্নের মধ্যে কিছু রহস্য ছিলও।

"হ্যাঁ। তাই।"

"হয়তো তাতেও আপত্তি থাকার কথা ছিল কম্পিউটারের এবং আমার তো বটেই। কিন্তু ফরচুনেটলি মন তো দেখা যায় না।" পরী বলল।

"ভাগ্যিস যায় না।"

"যে যুগ এসেছে তাতে বাইরেটাই সব। অন্তঃসারশূন্য যুগ এ।"

পুষি বলল হেসে।

কিন্তু পরী এবং জিষ্ণু বুঝল সে হাসিটা হাসি নয়।

"আসি।"

বলেই, চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল পুষি, "আজ!"

"চলো, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসি।"

বলেই, জিষ্ণু ডাকল, "শ্রীমন্তদা, নিচের ঘরটা খোলো তো, স্কুটারটা বের করি।"

"না থাক। আমার বড়ো ভয় করে স্কুটারে চড়তে। এখন যা ভিড় থাকবে পথে। তাছাড়া খোঁড়াখুঁড়ি আছে সার্কুলার রোডে।"

"আবার কবে আসবে পুষি?"

পরী শুধোল হেসে। এবারে আন্তরিকভাবেই।

"তুমি যেদিন বলবে।"

হেসে বলল পুষিও। এবারে বাসি হাসি নয়। টাটকা হাসি।

"কাকিমাকে বলে আসি।"

পুষি আবার বলল।

"মা নেই তো! তোমাকে বলেই তো বেরলেন, ভুলে গেলে?"

"ও হ্যাঁ।"

ওরা সকলে মিলে নিচে নেমে এল বাইরের দরজা অবধি। ওরা নেমে গেলে মোক্ষদা ঘরের বারান্দায় গেল কফির পেয়ালার ট্রে-টা নিয়ে আসতে।

জিষ্ণু বলল, "চলো পুষি তোমাকে ট্যাক্সি ধরিয়ে দিই।"

আসলে কিছু কথাও ছিল জিষ্ণুর পুষির সঙ্গে। পরীর ব্যবহারের জন্যে ক্ষমাও চাওয়ার ছিল। জিষ্ণু বুঝতে পারে না কেন তার খুড়তুতো বোন পরী বেজির মতো আক্রমণ করে পুষিকে দেখতে পেলেই। আর পুষি যেন লাজুক চিকন কোনো সাপ। লড়াই না করে মাথা নিচু করে পালিয়ে যায় বারবার।

জিষ্ণু ভাবছিল, পুষির সঙ্গে ওর বিয়ের পর এ বাড়িতে আর থাকা যাবে না। পরী হয়তো বিষ খাইয়েই মেরে রাখবে কোনোদিন পুষিকে। পরী যদিও জিষ্ণুর আপন বোন নয়, খুড়তুতো বোন, তবু আপনের চেয়েও বেশি। পরীকে বুঝতে পারে না জিষ্ণু। ভাবী ননদের পক্ষে ভাবি বউদিকে যতখানি ঈর্ষা বা হিংসা করা সম্ভব তার সব সম্ভাব্য মাত্রাই ছাড়িয়ে যাচ্ছে পরী। পুষিকে ও এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারে না। গত ছ-মাস, যেদিন থেকে পুষির সঙ্গে ওর আলাপ এবং বাড়িতে নিয়ে আসা, সেদিন থেকেই ও এটা লক্ষ্য করছে। অথচ পুষি কোনো দিক দিয়েই পরীর যোগ্য নয়। তবু কেন যে পরীর এতো রাগ পুষির ওপর কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না জিষ্ণু।

"তুমি ফিরে যাও। তুমি তো রোজই ট্যাক্সি ধরাও পুষিকে। আমিই ধরিয়ে দিচ্ছি আজ। পথে এক জায়গায় নেমেও যাব। কাজ আছে আমার একটু।"

পরী বলল।

একটু অবাক হল জিষ্ণু। বলল, "ফিরবে কখন পরী? কাকিমার তো নেমন্তন্ন। খাব তো শুধু আমি আর তুমিই।"

"আমার দেরি হতেও পারে। তুমি সময়মতোই খেয়ে নিয়ো। শ্রীমন্তদা আর মোক্ষদাদিকে বসিয়ে রেখো না।"

"না। আমি অপেক্ষা করব। বেশি দেরি কোরো না তুমি।"

পরক্ষণেই বলল, "যাচ্ছটা কোথায়? রাত প্রায় ন-টা তো বাজে।"

জিষ্ণুর গলাতে একাধিক কারণে বিরক্তি ছিল একটু।

পবী বলল, "জাহান্নম।"

তারপরই বলল, "বলতে বাধ্য নই। আমরা স্বাধীন জেনানা। কী বলো পুষি?"

বলেই, হাসল পরী। পুষিও হাসল লাজুক লাজুক মুখে।

মাথাময় রেশমি কালো চুল ঝাঁকিয়ে পুষির হাত ধরে ঢেউ তুলে পথে নেমেই ঘাড় ঘুরিয়ে পরী বলল, "কোথায় যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি? কখন ফিরব? ফিরব কি না আদৌ? এসব প্রশ্ন তুমি আমাকে কোনোদিনও কোরো না। আমি কি তোমার বউ? বউ যদি হতাম তাহলেও এসব প্রশ্ন করলে উত্তর দিতাম না। আমি অন্যরকম। আমার নাম পরী, আমি আশমানের পরী। তুমি কি জানো না তা? এতদিনেও?"

পুষি হেসে উঠল পরীর কথাতে এবং কথা বলার ভঙ্গিতেও।

"তুমি কি জানো না তা? এতোদিনেও।" এই প্রশ্নটা পুষিকে ভাবিয়ে তুলল। এমন অদ্ভুত ভাই-বোনের সম্পর্ক কখনও দেখেনি ও।

জিষ্ণু বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

পুষি যাবার সময় হাত তুলল জিষ্ণুর দিকে। তার উত্তরে হাত তুলতেও ভুলে গেল জিষ্ণু।

দরজা বন্ধ করে দোতলাতে উঠে নিজের ঘরের বারান্দায় এসে বসল ও আলো নিভিয়ে।

এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে একটা। গানুবাবুদের বাড়ির লন-এর বিভিন্ন গাছগাছালি থেকে মিশ্রফুলের গন্ধ উড়ে আসছে। গন্ধটা ঝাঁকাঝাঁকি করছে বারান্দায়। হাওয়ার সঙ্গে বারান্দার এ প্রান্ত এবং ও প্রান্তের সীমা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়েই ধাক্কা খেয়ে ঝুরঝুরে হয়ে ঝরে যাচ্ছে নিঃশব্দে। হরজাই গন্ধ, কোনো অদৃশ্য তরলিমার মতো; চুঁইয়ে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে বারান্দাময়।

পরী জিষ্ণুর চেয়ে তিন বছরের ছোটো। দুজনের দুজনকে তুইতোকারি করাই উচিত ছিল ছেলেবেলা থেকেই। জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো পিঠোপিঠি ভাইবোন। কিন্তু শিশুকাল থেকেই পরীর ব্যক্তিত্বটা এমনই যে ওকে "তুই" কখনই বলা যায়নি। জিষ্ণু তো দূরের কথা, কাকিমা, মানে পরীর গর্ভধারিণী মা, অথবা বাড়ির বহু-পুরোনো কাজের লোকেরাও কেউই শিশুকালেও ওকে "তুই" বলে ডাকতে সাহস পায়নি। জিষ্ণু তো নয়ই!

অথচ এই পরীই সেদিন জিষ্ণুকে শুনিয়ে কাকে যেন বলছিল যে, "অন্য সেক্স-এর কাউকে 'তুমি' সম্বোধন করতে নেই কখনও। তাতে সম্পর্কটা প্রেমের হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে। 'আপনি' অথবা 'তুই' বলাই ভালো।"

যাকে বলেছিল, সে শুনে বলেছিল, "প্রেমের হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নয় কেন? আশঙ্কা কেন?"

"কিছু প্রেম হয়তো থাকে, যা আনন্দের নয়, দুঃখের। সুন্দর সম্ভাবনার নয়, আশঙ্কারই।"

হেসে বলেছিল পরী।

বড়ো স্বাধীনচেতা, অদ্ভুত স্বভাবের মেয়ে এই পরী। পড়াশুনোতে চিরদিনই ভালো ছিল, জিষ্ণুর চেয়েও। ম্যাথমেটিকস-এ এম. এসসি করে ছ-মাসের জন্যে স্টেটস-এ গেছিল স্কলারশিপ নিয়ে। ফারস্ট-ক্লাস-ফার্স্ট হয়েছিল এম. এসসিতে। ফিরে এসে একটি খুব বড়ো মালটিন্যাশনাল কোম্পানিতে কম্পিউটার ডিভিশানের হেড হয়ে চাকরি করছে। অবশ্য ক-টি মালটিন্যাশনাল কোম্পানিই আর এখন বিদেশি আছে? শুধু 'ফেরা' আইনের আওতাতে পড়ছে বলেই নয়, বেশিই কিনে নিয়েছে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

দেশের সব জায়গায়ই ব্রাঞ্চ আছে পরীদের কোম্পানির। ওকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয় দিল্লি, বোম্বে, ম্যাড্রাস, ব্যাঙ্গালোর। জিষ্ণুর চেয়ে অনেক বেশি মাইনেও পায় পরী। পরীর চরিত্রে এমন কিছু আছে যে মাঝে মাঝেই জিষ্ণু এবং অন্য সকলেরই মনে হয় যে ও পুরুষ, মেয়ে নয়। অথচ যখন ও মেয়ে হতে চায় তখন ও সব মেয়ের চেয়েই বেশি মেয়ে।

যেদিন পুষিকে প্রথমদিন নিয়ে আসে জিষ্ণু এ বাড়িতে সেদিন থেকেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করছে ও পরীর মধ্যে। ও যেন কেমন হিংস্র, অসভ্য প্রকৃতির হয়ে উঠছে। পুষির সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও অভদ্র ব্যবহার করছে।

লজ্জিত হয়ে একদিন জিষ্ণু বলেছিল পুষিকে "এ বাড়িতে তুমি আর এসো না। আমিও তোমাকে কোনোদিনও সঙ্গে নিয়ে আসব না।"

পুষি হেসে উঠেছিল জোরে। বলেছিল, "বলো কী? তোমাকে বিয়েই যদি করব বলে মনস্থ করেছি তবে তোমার একমাত্র কাজিন বলো, বোন বলো আমার একমাত্র ননদিনি বলো, তার সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পারলে চলবে কেন? আই বিলিভ ইন উইনিং ওভার মাই অ্যাডভার্সারিজ। নট টু ফাইট উইথ দেম। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারি না। অনেক ভেবেছি জিষ্ণু এ নিয়ে, রাতের পর রাত। পরীর আমার প্রতি যে বিরূপতা সেটা কিন্তু তোমারই কারণে। তোমাকে ভালোবাসে বলেই ও আমাকে সহ্য করতে পারে না। ভাইবোনের ভালোবাসা নয়। এ এক বিশেষ ভালোবাসা। একজন মেয়ের চোখে অন্য মেয়ে ধরা ঠিকই পড়ে।"

"বাঃ।"

লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে জিষ্ণু বলেছিল, "একসঙ্গে বড়ো হয়ে উঠেছি একই বাড়িতে। কাকিমাও কখনও কোনো তফাত করেননি আমাদের দুজনের মধ্যে। আমার যে মা-বাবা নেই তা এক মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে দেননি কাকিমা। তাই পিঠোপিঠি বলেই শুধু নয়, একমাত্র সঙ্গী, আমার একমাত্র কাজিন, একমাত্র সঙ্গী ওই পরী। তা ছাড়া জানো, আমাদের ছেলেবেলায় কাকিমার খুব কড়া শাসন ছিল। আমাদের কারোরই কোনো বন্ধু-বান্ধব বাড়িতে আসাটা মানাও ছিল। আমরাও কোথাওই যেতাম না। ওই আমার সব ছিল আর আমিও ওর তাই। আমাকে ভালো তো বাসবেই। আমরা অন্য দশজনের মতো করে বড়ো হয়ে উঠিনি। তাই হয়তো কিছুটা অস্বাভাবিক লাগে তোমার চোখে।"

পুষি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল! তারপর বলেছিল, "তা তো ঠিকই। কিন্তু তুমি কিছু মনে কোরো না, আমার প্রতি পরীর ঈর্ষাটা ঠিক যে ধরনের তা কিন্তু ভাই-বোনের ভালোবাসাজনিত নয়। বুঝেছ তুমি? কী বলতে চাইছি।"

"না, বুঝিনি।"

রেগে গিয়ে বলেছিল জিষ্ণু, "তোমার কথা সত্যিই বুঝিনি। তুমি বলতে চাও কী?"

"ভুল বুঝো না। তোমাকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। তোমার সম্বন্ধে আমার চিন্তা করা ও চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। তোমার দিক দিয়ে যে কিছুমাত্র দুর্বলতা নেই পরীর প্রতি, মানে ভাইয়ের যতটুকু ও যে রকম দুর্বলতা বোনের প্রতি থাকার কথা সেটুকু ছাড়া নেই যে, তা আমি জানি। কিন্তু পরীর দিকের ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ নই।"

"তুমি কি পাগল হলে পুষি?"

"দ্যাখো জিষ্ণু, আমরা যে যুগে, যে পল্যুশান-এর মধ্যে, যে টেনশানে এবং যে শহরে বাস করছি তাতে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ তো পাগলই। পুরো পাগল না হলেও, আংশিক পাগল। এক একজনের পাগলামির প্রকাশ একেকরকম। সুস্থ বাকি আর কেউই নেই। থাকা সম্ভব নয় জিষ্ণু এত বক্রতা, ভান, ভণ্ডামি এবং মিথ্যাচারের মধ্যে! বড়ো ময়লা, আবর্জনা, ধোঁয়ো, ধুলো চারদিকে। যেখানে নিশ্বাস নেওয়াই কষ্টের সেখানে মানুষ সুস্থ থাকেই বা কী করে! কতরকম বিকৃতিই দেখি চারপাশে যে, সুস্থতাকেই এখন বিকৃতি বলে মনে হয়।"

বারান্দাতে একা বসে বসে নানাকথা ভাবতে ভাবতে সময়ে চলে যাচ্ছিল।

গানুবাবুদের লনের মার্কারি ভেপার ল্যাম্পটা দুলছিল হাওয়ায়। সমস্ত বাগানটাই যেন দুলছিল।

পরী ওর খুড়তুতো বোন, ওকে ভালোবাসে?

হাঃ! পাগলের কথা! নিজের মনেই হেসে উঠল জিষ্ণু। পরীর অফিসেই তো কত হ্যান্ডসাম, ওয়েল-সেটলড, ভালো পরিবারের এক্সট্রিমলি ওয়েল-অফ ছেলে আছে। তারা মাঝে মাঝে ফোন করে বাড়িতেও পরীকে। তাদের গলার স্বর শুনেই বোঝে জিষ্ণু যে, পরীর প্রেমে তারা ডগমগ। বাড়িতে আসে না যদিও কেউই। পরী বলে, আমরা বড়ো হয়েছি যদিও বেশ আরামেই কিন্তু এই গলিতে, এই বাড়িতে কোনো ডিসেন্ট রেসপেক্টেবল বাইরের লোককে আনা যায় না।

জিষ্ণু শিগগিরই ফ্ল্যাট বুক করবে একটা। ওদের কোম্পানি থেকেই অফিসারেরা কো-অপারেটিভ করে করছে। পরীকে তো কোম্পানি থেকেই সানি পার্ক-এ ফ্ল্যাট অ্যালট করেছিল। নেয়নি ও। তবে যে কোনোদিন চাইলেই ও সাউথের পশ এলাকাতে মনের মতো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে শিফট করতে পারে। গাড়ি অবশ্য পেয়েছে তবে বাড়িতে গ্যারাজ নেই, কাছে পিঠেও পায়নি ভাড়াতে। তাই গাড়ি আটঘণ্টা ডিউটি করে চলে যায়।

একদিন জিষ্ণুকে বলেছিল পরী, "কবেই চলে যেতাম। যাইনি শুধু তোমার জন্যে।"

"আর কাকিমা?"

"ওঃ আই হেইট দ্যাট লেডি।"

জিষ্ণু কথা বাড়ায়নি। কেন জানে না কাকিমাকে পরী মায়ের সম্মান ও মর্যাদা আদৌ দেয় না। বছর দুযেক হল ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে ও। জিষ্ণু যতখানি শ্রদ্ধাভক্তি করে তাঁকে নিজের মায়েরই মতো পরী তা আদৌ করে না। কাকিমাও যেন পরীকে ভয় পান। এ বাড়িতে পরীই শেষ কথা। পরীকে কিছু বলতে হলে কাকিমা জিষ্ণুকে দিয়েই বলান। সাম্প্রতিক অতীত থেকে।

কতক্ষণ কেটে গেছে বারান্দায় বসে হুঁশ ছিল না জিষ্ণুর। এমন সময় হালকা পায়ে পরী এল। এসে, বারান্দার দোলনাটাতে বসল দুপা তুলে আসন করে। কোলের কাছে একটা তাকিয়া নিয়ে। পুরো পাড়াটা নির্জন হয়ে গেছে। উঠে গিয়ে ঘড়ি দেখার আগেই গানুবাবুদের বাড়ির পেটা ঘড়িতে এগারোটা বাজল।

কোথায় গেছিলে?

বলতে গিয়েও থেমে গেল জিষ্ণু।

বলল, "খাবে তো এখন?"

"বলে এসেছি মোক্ষদাদিকে।"

পরী বলল।

তারপরই বলল, "চারটে খেয়ে এলাম।"

"কী?"

"জিন।"

"তাই?"

সোজা হয়ে বসল জিষ্ণু। পরী বলল, "নেশা হয়ে গেছে আমার। অফিসের পর বাড়ি ফি চানটান করে তিন চারটে খাই রোজ।"

"বাড়িতেই?"

"হ্যাঁ। আকাশ থেকে পড়ছ কেন? আমার অফিসের, আমার স্টেটাসের পুরুষরা তো বাড়ি বার মেইনটেইন করে। বার-এ বেয়ারা পর্যন্ত উর্দি পরে টুপি পরে মজুত থাকে আটটা থেকে কোম্পানির পয়সাতে। আর আমি কি মেয়ে বলে..."

"না। তা নয়। তবে আমাকেও নিয়ে গেলে না কেন?"

"দূর। পাবলিক বার-এ একা একা বসে মদ খেতে দারুণ লাগে। তুমি মেয়ে হলে বুঝতে পার মজাটা কেমন? অনেক কিছুই মিস করলে এ জীবনে! এ দেশে ক-টা জন্তু আর জঙ্গলে ব চিড়িয়াখানায় আছে? সবাই ভিড় করেছে এসে শহরগুলোতে। কত হতকুচ্ছিত ক্যাডাভেবা মানুষেরা যে কাছে আসতে চায় আলাপ করতে চায়। সুন্দরী হওয়ারও দরকার নেই। শুধুমাত্র মে হলেই চলবে। সবচেয়ে এনজয় করি আমি তাদের চোখের দৃষ্টি। জিন-এ আর কতটুকু নেশা হয় জিন খাই আমি সিপ করে করে ওরা খায় আমাকে চোখ দিয়ে চেটে চেটে। তুমি আমা পারভার্টেভ বলতে পারো। হয়তো আমি তাই। কিন্তু কে নয়? চারদিকে চেয়ে দ্যাখোতো, নয় কে মিথ্যুক ভণ্ড বিকৃত নয় কে আজ?"

"কাল থেকে বাড়িতেই খেয়ো পরী। আমি এনে রেখে দেব। বার-এ যেয়ো না।"

"তাহলে তোমার ঘরে এসে খাব। আমার একা খেতে ভালো লাগে না।"

"আমি রাম খাই।"

জিষ্ণু বলল।

"তুমি তাই খেয়ো।"

"কিন্তু কাকিমা? মোক্ষদাদি? শ্রীমন্তদা?"

"লোকভয়? হিঃ। মাই ফুট। জিষ্ণু, আমাদের একটাই জীবন এবং তারও প্রায় অর্ধেক শেষ ক এনেছি। ভুল করে ফিফটি পারসেন্ট লস্ট হয়েছে।"

"তার প্রায়শ্চিত্ত কি রোজ মদ খেয়েই করতে হবে।"

"ছিঃ। তা নয়। এখনই, যা যখন খুশি হবে তাই করতে হবে। পরে করার সময় আর না পাওয়া যেতে পারে। কে কী ভাববে বা বলবে তা নিয়ে ভেবে নষ্ট করার মতো সময় আর নেই সত্যিই নষ্ট করার সময় নেই। যা করতে চাই, তাই করব এখন।"

"কিন্তু কাকিমা!"

"তুমি চুপ করো জিষ্ণু।"

"আমার না হয় কাকিমা, তোমার যে মা পরী! আমাদের বুকে করে মানুষ করেছেন। কাকা কর্তব্যও উনি একাই করেছেন। ভুলে যেয়ো না কখনও।"

"স্টপ ইট জিষ্ণু। মিশনারি ফাদারের মতো জ্ঞান দিয়ো না। আই অ্যাম সিক অফ ইট। আ শুনতে ভালো লাগে না।"

"কাকিমা যদি কখনও ঘরে ঢুকে এসে কিছু বলেন?"

"আসবেন না, বলবেন না। মা আমাকে ভালো করেই চেনেন। শি উড নট ডেয়ার টু ডু ইট।"

"যদি আসেন? তুমি এত স্যাংগুইন হচ্ছ কী করে?"

"আই উইল ফেস হার। তবে তুমি জেনে রাখো যে, মা আসবেন না। আই নো ইট ফর সার্টেন।"

"কথা বোলো না কিন্তু, আরও খেতে ইচ্ছে করছে আমার। এই আমার দোষ। খেলে আর থামতে পারি না।"

"খাওয়াতে বাহাদুরি নেই। সমাজের সব স্তরের মানুষেরাই, ভালোমন্দ, চোরবদমাস, স্মাগলার-খুনি সব লোকই মদ খায়। থামতে জানাটাই শিক্ষা।"

"আমি থামতে চাই না। জানি না। পাজি লোকেরা গুনে গুনে মদ খায়। তার মিন। তোমার মতো।"

"অকেশনাল পার্টি-টার্টিতে অনেকেই খায়। আমিও খাই। তুমিও নিশ্চয়ই খেতে। কিন্তু এমন নেশা করলে কবে থেকে যে সন্ধেবেলা না হলেই চলে না?"

"নেশা।"

"হ্যাঁ।"

"কবে থেকে?"

"পনেরোই আগস্ট উনিশশো পঁচাশি।"

শ্রীমন্তদা এসে বলল, "দাদাবাবু, দিদিমণি মোক্ষদা, খাবার সাজিয়ে দিয়েছে টেবলে।"

জিষ্ণু বলল, "চলো। আমরা যাচ্ছি। চলো, পরী।"

"চলো।"

খেতে খেতে জিষ্ণু বার বার মনে করার চেষ্টা করছিল পনেরোই আগস্ট, উনিশশো পঁচাশি। ওই তারিখটি খুব চেনা, চেনা লাগছে। অথচ মনে করতে পারছে না চেনা কেন?

"কি ভাবছ?"

পরী বলল, খাওয়া থামিয়ে।

ভালো করে পরীর মুখে চেয়ে দেখল জিষ্ণু। পরী অত্যন্তই সুন্দরী।

দাদারা ভাইয়েরা অন্য চোখে বোনেদের দিদিদের মুখে চায়। এই চোখ কি অন্য চোখ? এত বছর কেন লক্ষ্য করেনি পরীকে এমন করে কে জানে! অথচ পরীর সঙ্গেই বড়ো হয়েছে। কত খেলা, স্মৃতি, প্রথম কৈশোরের গা-শিরশির করা নানা অনুভূতি। মনে পড়ে।

"কী ভাবছ জিষ্ণু?"

বলল, পরী।

"নাঃ। কিছু না।"

"ভাবা খুব ভালো। ভাবনা শুধু মানুষেরই প্রেরোগেটিভ। এমন করে ভাবতে তো আর কোনো প্রাণীই পারে না।"

"জানি।" জিষ্ণু বলল।

খেয়ে উঠে বেসিনে হাত ধুতে ধুতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল জিষ্ণুর যে এইট্টি ফাইভের পনেরোই আগস্ট সকালে চানচানির বাড়িতে ওদের প্রতিবেশী পুষির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল জিষ্ণুর।

হঠাৎ হেসে উঠল জিষ্ণু।

"হাসলে যে?"

"কুইজ-এর আনসার পেলাম।"

"কী?"

"মনে পড়ে গেছে। এইট্টি ফাইভের ফিফটিনথ আগস্ট পুষির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল আমার।"

"তাই? স্ট্রেইঞ্জ! তার সঙ্গে আমার ড্রিংক করার কী সম্পর্ক?" পরী বলল। ক্যাজুয়ালি।

"না। সম্পর্ক থাকবে কেন?"

তারপর তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে জিষ্ণু বলল, হোয়াট আ কো-ইনসিডেন্স।

চৌমাথাতে মিনি থেকে নামতেই প্রায় গায়ের পাশ দিয়েই একটি স্কুটার চলে গেল।

পিনিয়নে বসে আছে যে মেয়েটি, কালো চুড়িদার এবং সাদা কুরতা পরে তার গায়ের পারফ্যুমের গন্ধ এসে নাকে লাগল জিষ্ণুর।

ছেলেটি লম্বা চওড়া। সুগঠিত চেহারা। কালো গেঞ্জি আর সাদা ট্রাউজার পরা। মেয়েটি যেন কী বলল ছেলেটিকে। ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে ফুটপাথে দাঁড়ানো জিষ্ণুর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল, জেব্রা-ক্রসিংটা পেরিয়ে জিষ্ণু রাস্তা পেরোবে কিনা। জিষ্ণুর মুখের উপরে চোখ রেখেই ছেলেটি হেসে উঠল মেয়েটির কথাতে। জিষ্ণুর কানে না পৌঁছোনো কথাতে।

পুরো হাসি নয়। ঠোঁট দুটি কাঁপল শুধু। মেয়েটিও মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। দেখতে ভালোই। কিন্তু জিষ্ণুর চোখে ভালো লাগল না। ভালো হলেই কি সকলকেই ভালো লাগে?

ওরা কি জিষ্ণুকে নিয়ে ঠাট্টা করছে? ওই কি ওদের হাসির খোরাক।

আজকাল জিষ্ণুর কেবলই এরকম মনে হয়। অফিসে, বাড়িতে, পাড়ায়, পথে-ঘাটে। মনে হয়, ওকে নিয়ে সকলেই ঠাট্টা করছে, মুখ টিপে হাসছে। প্রত্যেকটি পরিচিত, অর্ধপরিচিত মানুষ এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে ওর বিরুদ্ধে।

এরকম ছিল না জিষ্ণু। পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিল নিজের উপরে। পুষি হঠাৎ চলে যাবার পর রোজই ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে। আগে এক মিলিগ্রাম করে খেত। আজকাল দুই মিলিগ্রাম করে খেতে হয়। নইলে ঘুম আসে না কিছুতেই। সমস্ত সকালটা ঘোর ঘোর লাগে। বাসের দরজার হ্যান্ডেল পিছলে যায় হাত থেকে, যদি কখনও বাসে ওঠে। পিছলে যায় কলম। চান করার সময় হাত পিছলে সাবান পড়ে যায় বার বার। দাড়ি কামানোর সময় গাল কেটে যায়। কেউ যদি পেছন থেকে ডেকে ওঠে নাম ধরে পথে, কী বাসে, কী অফিসে, অনেকক্ষণ সময় লেগে যায় ঘাড় ঘুরিয়ে উত্তর দিতে। তারপর তাকে অথবা তার গলার স্বরকে চিনতেও অনেক সময় লাগে। চেনা-অচেনা সব মানুষের গলাকেই ডাস্টবিনের উপরে-বসা দাঁড়কাকের গলা বলে ভুল হয়।

জিষ্ণু আর সেই জিষ্ণু নেই। অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

স্কুটারে-বসা ছেলেটি জিষ্ণুর চেয়ে দু এক বছরের বড়ো হলেও হতে পারে। মেয়েটি একেবারে পুষিরই সমবয়সি।

ট্রাফিকের লাল আলোটা হলুদ হল। জিষ্ণুর মনে হল চিরদিনই হলুদ হয়ে থাকলেই ভালো হত। "ফর এভার অ্যাম্বার" নামের। অনেক দিনের পুরোনো প্রিন্টের একটি ইংরিজি ছবি দেখেছিল। কিন্তু ওর মনে হওয়া-হওয়িতে কিছুমাত্রই এসে যায় না সংসারের। হলুদ, সবুজ হল। আবারও হলুদ হবে। তারপরে লাল।

ছেলেটি খুব জোরে স্কুটার ছুটিয়ে চলে গেল। জিষ্ণু নিজেও একদিন যেত। ও অনেকখানি পথ ফুটপাথের ভিড় ঠেলে দৌড়ে গেল ওদের পেছনে পেছনে। হাত তুলে চেঁচিয়ে বলতে গেল, না না। এই যে শুনছেন! এরকম করবেন না, প্লিজ।

কিন্তু স্কুটারের পেছনের লাল আলোটা যানবাহনের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল এক মিনিটের মধ্যে। একটা ভয়মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল ও মোড়ে।

স্যাঙ্গুভ্যালিতে যখন ঢুকল তখন কেউই আসেনি। অনেকই বছর পরে এল। আজ শনিবার। জিষ্ণুর ছুটি। সকলের তো নয়! অফিসে যাদের আছে, তারা বাড়ি ফিরে চানটান করে কিছু খেয়ে-দেয়ে তবেই হয়তো আসবে।

বছর দশেকের পুরোনো দলটা আর নেই। এখন যা আছে তা নিছকই ভগ্নাংশ। সুমিত মারা গেল হঠাৎ এন্‌কেফেলাইটিস-এ। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে। এতো ভালো চাকরিটা! বিয়ে করেছিল সুমিতাকে ভালোবেসে। ওদের ছেলেটার বয়স তখন তিন মাস। দুজনের নামে নাম মিলিয়ে ছেলের নাম রেখেছিল স্মিত।

সুমিত, সুমিতা এবং স্মিতর কথা মনে পড়ায় কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ও সান্ত্বনা পেল। সুমিতা টেলিফোন অপারেটরের কাজ করে একটি কমার্শিয়াল ফার্ম-এ।

জিষ্ণুদের স্যাঙ্গুভ্যালির দলটা ভেঙে গেছে কিছু সুখের ও কিছু দুঃখেরও কারণে। নরেন, পিণ্টে, চিনু, ঋতেন, যথাক্রমে প্যারিস, মিজৌরি, লানডান এবং অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেছে। যারা গেছে, তারা কেউ এঞ্জিনিয়ার কেউ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কেউ ডাক্তার অথবা আর্টিস্ট। যারা থেকে গেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ লেখালেখি করে। দু একজন গদ্য। বেশিই কবিতা। চলে যাওয়ার দল ওয়েল-সেটলড ইন লাইফ। কালার্ড ছবি পাঠায় ওদের নতুন বাড়ি-গাড়ির। কেউ কেউ বা তার বাড়ির বাথরুমের বাথটাব-এ পাইপ-মুখে শুয়ে আছে, তার ছবি। বস্তিবাসীর হঠাৎ লানডানে পৌঁছোনো আদিখ্যেতার দলিল। গার্লফ্রেন্ডদের ছবিও পাঠত কেউ কেউ। যখন হাভাতেপনা ছিল। এখন গার্লফেন্ড, সাদা চামড়া মেয়েমানুষ, জল-ভাত হয়ে যাওয়াতে আর পাঠায় না। বাথটাব-এ পাইপ মুখে শুয়ে থাকার ছবিও নয়। এক-একজন মানুষ কী আশ্চর্যরকমভাবে পালটে যায়। আর তাদের পালটাবার রকমটাই বা কত বিভিন্ন জিষ্ণু ভেবে অবাক হয়।

জিষ্ণুও কিছু বড়োলোক নয়। তবে সচ্ছল। কিন্তু ওর রক্তের মধ্যে কোনো বদগন্ধ হীনম্মন্যতা থেকে জন্মানো কোনোরকম আদিখ্যেতাই ছিল না। ছিল না যে, তা জেনে, গর্ব বোধ করে।

পিণ্টে লিখেছিল : "সাদা মেয়ে অনেকই হল। বিয়ে করতে হবে দিশি মেয়েকেই দিশি বউ-এর কোনো বিকল্প নেই। সাতদিনের জন্যে যাব দেশে। আর এবারে বিয়ে করেই ফিরব। মেয়ে দ্যাখ। অন্য সবাইকে বল। শহরে ট্যাঁড়া পেটা।"

জিষ্ণু উত্তরে লিখেছিল যে, "সাতদিনের নোটিশে ভালো তেলওয়ালা চিতলমাছের পেটি অথবা বড়ো কইও পাওয়া যা না যে ধনেপাতা কাঁচালংকা দিয়ে ঝোল খাবি। বিয়ে করার মতো মেয়ে তো দূরের কথা।"

উত্তরে পিণ্টে লিখেছিল খুব রেগে গিয়ে : "এই জন্যেই বাঙালিদের কিসসু হল না। বিয়ে করার মতো মেয়ে মানে কি? মেয়ে মাত্রই তো এক। একই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শুধু পিগমেনটেশান আর চুলের রঙেই যা তফাত! আর মন? মেয়েদের মন দেবতারা বোঝে না আর আমি কোন দুঃখে তা বোঝাবুঝির মধ্যে যেতে যাব?"

পিণ্টে আবারও লিখেছে : "ওরে লেথার্জিক বঙ্গসন্তান! উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি করে আমার বউ দ্যাখ। যেন ইংরিজিটা একটু জানে, কথা চালাবার মতো, বাকিটা আমি শিখিয়ে নেব। ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড-ট্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এ যুগে কে বস্তি থেকে এসেছে আর কে পথের ফুটপাথে মানুষ হয়েছে তাতে যায় আসে না কিছুই। কার কাছে মাল আছে, ক্ষমতা,

লোকের ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা, সেটাই বড়ো কথা। আমার সবই আছে। আমার বউ-এর কিছুমাত্র না থাকলেও চলে যাবে। তার মা-বাবা না থাকলেই ভালো। থাকলে তো শেষে তারা আমার ঘাড়েই চাপবে। মেয়ে এবং তার মা-বাবা তো এখানের এত সাচ্ছল্য দেখে ওভারহোয়েলমড হয়ে যাবে।

চেহারাও চাই সাদামাঠা। মামাবাড়ি কাকার বাড়ি মানুষ হওয়া মেয়ে হলেই ভালো। অপ্রেসড থাকবে মোটামুটি। চাহিদা-ফাহিদাও কম থাকবে। দেখতে বেশি ভালো হলে বিদেশে বিপদ। ফাঁকা বাড়ি। নিজে সারাদিন বাইরে। বউ চরতে চরতে শেষে অন্য ভিটেয় গিয়ে উঠবে। মেয়েদের সঙ্গে ছাগলদের মানসিকতার খুব মিল আছে। যাহা পায় তাহাই খায়। অন্যর বউ ভাগাবার এলেম অনেকেরই আছে এদেশে দিশিদের। কারও বা তা হোলটাইম অকুপেশান। নিজের বউকে ঠেকিয়ে রাখার এলেমও খুব বেশি লোকের নেই। আমার জন্যে মেয়ে দেখছিস যে এ কথা আমার মাকে কিছুই বলবার দরকার নেই। বাবাকেও নয়। আমার পেছনে স্কুল কলেজে পড়াশুনো করার জন্যে যা খরচ করেছে বুড়ো, মানে আমার বাবা, তা অনেকদিন আগেই ফেরত দিয়ে দিয়েছি। আমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই। বিজয়াতে চিঠি-ফিঠি লিখি কিন্তু টাকাপয়সা আর একটুও দিতে পারব না। তুই হয়তো জানিস না যে বুঁচির বিয়ের সমস্ত খরচও আমি দিয়েছিলাম। আমাদের মা-বাপেরা স্রেফ ছেলেমেয়ে পয়দাই করেছিল। আর কোন কম্মটা করেছে বল, ছেলেমেয়ের জন্যে? সাত টাকা মাইনের স্কুলে পড়াশুনা শিখে গর্দভ হয়েছি। এ দেশের টেলিগ্রাফের তারে নুন ছিটিয়ে বরফ গলিয়ে প্রথম জীবন আরম্ভ করেছি। আমাকে তখন কেউই দেখেনি। আমিও কাউকে দেখব না। অনেকই কষ্ট করেছি। অনেক। ব্যাপারটা অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট।

একা বসে থাকলেই জিষ্ণুর মাথার মধ্যে একটা নিঃশব্দ কম্পিউটার চলে। মানুষজন, চেনা-মুখ, আর ভালো লাগে না। অথচ বেশিক্ষণ একা থাকলে জিষ্ণুর মনে হয় যে, পাগল হয়ে যাবে।

এক কাপ চা নিয়ে বসে রইল মিনিট পনেরো।

কেউই এল না। জুনিয়ার ব্যাচ ও তস্য জুনিয়র ব্যাচের অনেকেই এল। হাসল। তারপর নিজেদের তুমুল হই-হল্লাতে ডুবে গেল। জিষ্ণুর মনে হয় প্রতিদিন যে-পরিমাণ জীবনশক্তি কলকাতার রেস্তোরাঁ ও কফি হাউসগুলোতে নষ্ট হয়, তার এক কণাও চ্যানেলাইজ করতে পারলে এবং তা দিয়ে থার্মাল বা হাইড্যাল স্টোন চালাতে পারলে কলকাতায় কোনোদিনও লোডশেডিং হত না।

জিষ্ণুরাও অবশ্য সময় নষ্ট করেছে ওদের বয়সে। অনেকেই জীবনশক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেও এখনও যেটুকু বাকি আছে তা দিয়েই বা কী করে? খরচ করার সুস্থ ও স্বাভাবিক পথ না থাকলে জীবনীশক্তি নিজেকেই খেয়ে ফেলে অনুক্ষণ কুরেকুরে। কখনও ড্রাগ। এই নিরুপায় যৌবনকে, জীবনীশক্তিকে চুষে চুষে খেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কখনও ক্যানসারের মতো নিঃশব্দে খায়, কখনও বা আত্মরতির গোপন উৎসারে; আবার কখনও বোমার সশব্দ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিভিন্ন পথ আছে, প্রকৃতি আছে, রকম আছে। কেউ স্বেচ্ছায় সেই পথ বেছে নেয়; কেউ অনিচ্ছায়। কেউ অন্যের ইচ্ছায়।

এখনও ওরা একজনও এল না। টিভিতে বোধহয় ভালো কোনো ছবি আছে। আর বসে থেকে লাভ নেই। দোষ তো ওরই। যার দেওয়ার মতো সময় নেই তার কোনো বন্ধু থাকে না। নষ্ট করবার মতো সময় না থাকলে আড্ডাও মারা যায় না। নিয়ত আড্ডাবাজরা ব্যস্ত মানুষদের পছন্দ যে করে না শুধু তাই নয়; এক ধরনের ঘৃণাও করে!

চায়ের দাম মিটিয়ে বাইরে এল জিষ্ণু।

জনস্রোত বয়ে চলেছে অবিরত। পানের দোকানে, সিগারেটের দোকানে ভিড়। ভিড় ম্যাগাজিন আর কাগজের দোকানেও। মুহূর্তে মুহূর্তে বাস যাচ্ছে, ট্রাম, মিনি, ট্যাক্সি, গাড়ি। কত স্ত্রী-পুরুষ,

নদীর উজান-ভাঁটার মতো পথের উজান-ভাঁটা বেয়ে, কত জায়গায় চলে যাচ্ছে, কত জায়গা থেকে বাদুড়-ঝোলা হয়ে ফিরছে কত লোক! অথচ শুধু জিষ্ণুরই এই মুহূর্তে কোথাওই যাবার নেই। সমস্ত পৃথিবীর উপর এক তীব্র অসূয়া আর বিরক্তি এসে গেছে এবং সেই বিরক্তির স্বাদ সর্বক্ষণ জিভে লেগে থাকে।

জিষ্ণুর কোথাওই যাবার নেই।

বহুবছর আসতে পারেনি এই "আড্ডায়"। ও কোনোদিনই আড্ডাবাজ নয় তবে এলে, স্কুল-কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হত বলে কখনও কখনও আসত। আজ এল। অথচ আজ কেউই নেই। গত তিনটে বছর পুষির সঙ্গেই প্রত্যেকটি অবসরের মুহূর্ত কেটেছে। হয় পুষিদের বাড়িতে, নয় জিষ্ণুদের বাড়িতে, রবীন্দ্রসদনে, বইমেলাতে, নন্দনে।

যেদিনই একা থাকতে ইচ্ছে করে না ঠিক সেদিনই পৃথিবী চারপাশ থেকে সরে গিয়ে তার একাকিত্বর গহ্বরকে গভীতর করে।

প্রমোশনটা আটকে ছিল। তাও এসেছে দুমাস আগে। খুবই বড়ো লিফট। এখন স্কাই ইজ দা লিমিট। জিষ্ণুর প্রোমোশনের পর পুষির মা আর জিষ্ণুর কাকিমা দুজনে মিলেই এনগেজমেন্টের দিন ঠিক করেছিলেন আগামী বুধবার। দু পক্ষেরই আত্মীয়স্বজন আসবেন বলে কথা ছিল জিষ্ণুদেরই বাড়িতে। সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান হয়ে যাবারও কথা ছিল। গজেন কেটারারকেও বলে দিয়েছিল জিষ্ণু। পরীই মেনু ঠিক করেছিল সেদিন রাতের খাবারের। অবশ্য পুষির ইচ্ছে ছিল শীতকালেই বিয়েটা হোক।

জিষ্ণু বলেছিল, "ভালোই তো হত। বসন্তে হলে তোমাব মা তো আর লেপ দিতেন না।"

"কী অসভ্য!"

বলে, হেসেছিল পুষি।

"সমস্তটুকু আমার মা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছেন আর একটা লেপের দামই বেশি হল তোমার কাছে?"

"লেপ কি শুধু লেপই? নতুন-গন্ধ লেপের নিচে কিছু না-পরা নতুন-গন্ধ বউ নিয়ে শোওয়ার মজাটাই আলাদা। ভাবলেই তো আমার গা শিরশির করে।"

জিষ্ণু হেসে বলেছিল।

"আনকোরা নতুন আর রাখলে কোথায়? লেবেল-টেবেল তো ছেঁড়া হয়েছেই। শুভদৃষ্টির সময় যাবা নতুন বউ-এর মুখ দেখে প্রথমবারে তারাই যথার্থ নতুন-বউ পায়।"

সাঙ্গুভ্যালির সামনে দিয়ে খুব জোরে আরও একটা স্কুটার গেল। পেছনে বসা মেয়েটি হয়তো ছেলেটির বান্ধবীই হবে। জোরে জাপটে ধরে আছে চালককে। কিছুটা প্রয়োজনে, বেশিটা সান্নিধ্য এবং উষ্ণতার জন্যে। সাদার উপর হালকা বেগনি রঙা ছাপার কাজ করা একটি শাড়ি পরেছে মেয়েটি। ছেলেটির মাথায় হেলমেট।

হেলমেট তো জিষ্ণুও পরেছিল। তাই বেঁচে গেছিল অবশ্য। পুষির মাথায় হেলমেট ছিল না। হেলমেট ছিল না, কিন্তু মিনিবাসটা অন্যায়ভাবে, জোরে, বেআইনি করে ওভারটেক না করতে গেলে...

মিনিবাসের ড্রাইভারদের মুখগুলো দেখা যায় না। সবগুলো মুখকেই একইরকম মনে হয়। ওদের মায়াদয়া নেই। দায়িত্বজ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর, অনভিজ্ঞ, অনিয়মানুবর্তী যূথবদ্ধ পুলিশ ও প্রশাসনের মদতপুষ্ট একদল খুনি ওরা। কত পরিবারকে যে অভুক্ত রেখেছে, কত মানুষকে যে জিষ্ণুরই মতো ঘর বাঁধতে দেয়নি নিজেদের হঠকারী সমাজবিরোধিতায় তা যদি ওরা জানতো! ওদের বিবেক, টায়ারের কাদারই মতো ধুয়ে ফেলেছে ওরা। কত রক্তচাপের রোগীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে যে মেরেছে ওরা, পঙ্গু করেছে যে কতজনকে আর লেখাজোখা নেই। হয়ত জেনেশুনেই করে।

"জনগণের" নাম করে সবকিছুকেই করা সম্ভব এখন। এই শহরে ট্রাফিক আইন বলে যদি কিছু মাত্রও থাকত! যদি রিভলবার পিস্তল চালাতে পারত জিষ্ণু তবে যে ড্রাইভার স্কুটার থেকে পড়ে-যাওয়া পুষিকে চাপা দিয়েছিল, সেই ড্রাইভারকে খুঁজে বের করে নিজে হাতেই গুলি করে মারত।

জিষ্ণু শুনেছে, যে-মিনিবাস চাপা দিয়েছিল পুষিকে সেই মিনিবাসের সেই ড্রাইভার জামিন পেয়ে গেছে অনেকদিনই। একই মালিকের অন্য মিনিবাস চালাচ্ছে। নাকি এখন কমফার্মড খুনি। পোটেনশিয়াল খুনিওও। আবারও স্টিয়ারিং হাতে অ্যাকসিলেরাটরে পা দিয়ে মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

থুথু ফেলল রাস্তায় জিষ্ণু।

ও কোথাওই কখনও থুতু ফেলে না। ফেলল তবু, ঘৃণার সঙ্গে। ওর মতো কোটি কোটি অসহায় মানুষের প্রতিবাদের এই-ই রকম। কিন্তু ফেলেই লজ্জা পেল খুব।

পুষি তো ফিরবে না।

দারুণ একটি ময়ূরকণ্ঠী রঙা কাঞ্চিপুরম শাড়িতে পুষিকে সাজানো হয়েছিল শ্মশানযাত্রার আগে। এনগেজমেন্টের দিন যে শাড়ি পরার কথা ছিল সেই শাড়িটাতেই। কাজল, চন্দন দিয়ে সাজিয়েছিল ওর বন্ধুরা নববধূর মতো। মুখে একটুও বিকৃতি ছিল না। মনে হচ্ছিল, যে হাসছে। যেন জিষ্ণুকে এক্ষুণি বলে উঠব, "অ্যাই অসভ্যতা কোরো না।"

সে পর্যন্ত সবই সুন্দর ছিল। তারপর ইলেকট্রিক ফারনেসের সামনে ওকে খাট থেকে নামিয়ে বাঁশের একটি ফ্রেমের উপর শোয়ানো হল। ফারনেসের লোহার দরজাটা যেন যমদুয়ারের দরজাটা খুলছে এমন প্রচণ্ড ঝনঝন শব্দ করে উঠে খুলে গেল। শ্মশানের কর্মচারীরা ভাবলেশহীন মুখে ঠেলে দিল পুষিকে সেই লাল উত্তপ্ত গুহাতে। তখন বৈদ্যুতিক আগুনের সেই লাল আভাতে পুষির বুদ্ধি-প্রসারিত মাজা মুখটি ক্ষণিকের জন্য এক অসামান্য সৌন্দর্য পেল যা ওকে ফুলশয্যার রাতে জিষ্ণুর আদরও হয়তো দিতে পারত না। তারপরই অদেখা আগ্নেয়গিরির জীবন্ত জ্বালামুখের মতো ফারনেস তাকে সহসাই গ্রাস করে নিল। একেবারেই সহসা। পুষি ক্রমশ লাল হতে হতে লাল আভা মণ্ডিত হয়ে হঠাৎ লাল আগুনের সঙ্গে মিলে গেল। দড়াম শব্দ করে যমদুয়ারের লোহার দরজা পড়ল। আগুন মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষে কেড়ে নিল ওকে।

মিনিবাসের ড্রাইভারটাকে পেলে জিষ্ণু অমনি করেই একদিন ঠেসে দিত শালাকে খোলা ফারনেসের মধ্যে একেবারেই জ্যান্ত অবস্থায়। তবুও কি কমত জ্বালা!

ভাবছিল, জিষ্ণু।

কী করবে, কোথায় যাবে ভাবছিল জিষ্ণু, এমন সময় পিকলুর সঙ্গে দেখা। পিকলু একটা লাল মারুতি গাড়ির সামনে বাঁদিকের সিট থেকে মোড়ে নামল।

"কী রে! কেমন আছিস?"

পিকলুকে দেখেই জিষ্ণু শুধোল।

"এই!"

নিরুত্তাপ গলায় বলল, পিকলু।

"কবে এলি? কৃষ্ণনগর থেকে? তোর না আজকাল ওখানেই ডিউটি?"

"প্রতি সপ্তাহেই তো আসি উইক-এন্ডে।"

খবরটা জিষ্ণু রাখে না বলে একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই যেন বলল পিকলু।

"খুসি কেমন আছে? কন্যা।"

"জিষ্ণু, তোর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। তোর বাড়িতেই হয়তো যেতাম কালকে সকালে। এখানে এসেছিলাম, ভাবলাম যদি ওদের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দরকারটা জরুরি।"

পিকলু বলল।

তারপরই বলল, "কোথাও বসবি? যাচ্ছিলি কোথাও? তুই?"

"নাঃ। আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।"

কথাটার মধ্যে যে শূন্যময় হাহাকার ছিল সেটা পিকলুর কানে গেল না। ও নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিল মনে হল।

পিকলু ভাবলেশহীন চোখ জিষ্ণুর চোখে মেলে বলল, "সন্নিসী-টন্নিসী হবি নাকি? কী এমন ঘটল তোর পানা-পড়া পুকুরের জীবনে।"

কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। উদ্দেশ্যহীনভাবে জিষ্ণু পথের দিকে চেয়ে রইল।

"তবে চল আমাদের বাড়িতেই যাই।"

পিকলু হঠাৎ বলল। জিষ্ণু যে যাবে না, তাই জেনেই।

"হ্যাঁ। গেলে অবশ্য মন্দ হত না। খুসির সঙ্গে দেখা হয়নি বহুদিন।"

পিকলু মনে মনে বলল, বহু বছর।

"আজ থাক। আজ এখান থেকে আমাকে অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে। ভুলেই গেছিলাম।"

জিষ্ণু বলল।

"যাবি কোথায়? পরী কেমন আছে? সেদিন দেখলুম শ্যামবাজারের মোড়ে একটি সিড়িঙ্গে লোকের গাড়ি থেকে নামতে নামতে একেবারে তার গায়ে গড়িয়ে পড়ে হাসছে। কী র‍্যা!"

"হাসতেই পারে।"

জিষ্ণু বলল।

"হাসির উপর ট্যাক্স তো বসেনি এখনও। তবে যে-কোনোদিন বসিয়ে দেবে কলকাতা কর্পোরেশন। গলায় গামছা দিয়ে ট্যাক্স আদায় করার ব্যাপারে তাঁদের জুড়ি নেই। বদলে কিছুমাত্র করুন আর নাই করুন।"

"লোকটা কে? বিয়ে করবে নাকি? পরীকে?"

পিকলু পুরোনো কথার জের টেনে বলল।

"কী করে বলব? সেটা ওর, মানে ওদের পার্সোনাল ব্যাপার। তাছাড়া, বিয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবা সম্ভব হল না নাকি তোর পক্ষে?"

"খুড়তুতো বোন কার সঙ্গে প্রেম করছে খবর পর্যন্ত রাখবি না তা বলে?"

"কারও গাড়ি থেকে হেসে নামলেই যদি প্রেম হয়ে যেত তবে তো... তাছাড়া, পরী স্বাবলম্বী। নিজের যোগ্যতাতে সচ্ছল। বয়সও হয়েছে প্রেমের, বিয়েরও; ওর যা-খুশি তাই করতে পারে ও।"

"বাবা। তুই যে খুব মডার্ন গেছিস আজকাল দেখতে পাচ্ছি।"

"চিরদিনই ছিলাম। তুই খোঁজ রাখিসনি হয়তো। মানুষের মানসিকতাও গাছেদেরই মতো! আলোর হদিস পেলেই ডানা ছড়ায় সেদিকে, পাতা ছাড়ে।"

"এই শুরু হল তোর ভ্যাদভ্যাদে কাব্যি।"

তারপরই বলল, "তোর প্রোমোশন হয়েছে শুনেছি। কী রে জিষ্ণু?"

"কার কাছে শুনলি?"

"মদনের কাছে।"

"কে মদন?"

"তোদের কোম্পানিতেই কাজ করে রে। তবে ভেরি স্মল ফ্রাই। অন্য ডিপার্টমেন্টে। তোকে কে না চেনে তোর অফিসে।"

"চেনাই স্বাভাবিক।"

"ও।"

বড়ো রাস্তা ধরে ওরা হাঁটতে লাগল দুজনে। জিষ্ণু ভাবছিল যে পিকলুও বদলে গেছে অনেকই পিণ্টেরই মতো। জিষ্ণু নিজেও হয়তো বদলেছে অনেক। কে জানে!

"পুষির কী খবর জিষ্ণু?"

জবাব দেবে কি না ভাবল জিষ্ণু একবার। পিকলু ওর ছেলেবেলার বন্ধু। তাকে এই দুঃখের খবর বলে হালকা হতে পারবে একটু নিশ্চয়ই। সব কথা তো সকলকে বলাও যায় না। বলাও উচিত নয়। কিন্তু...

"কী রে? কথা বলছিস না যে!"

"পুষি মারা গেছে গত মাসের প্রথম শনিবার। অনেকদিনই হল।"

"সে কি রে? কী করে?"

"আমার স্কুটারকে ধাক্কা মেরেছিল মিনিবাস। আমার হেলমেট ছিল বলে বেঁচে গেছি। ও..."

"ভেরি স্যাড।"

পিকলু বলল মেকানিক্যালি।

জিষ্ণু বুঝল যে, পুষির চলে যাওয়ার খবরটা ওর হৃদয়ের কতখানি গভীর থেকে উঠেছিল, কথাটা পিকলু হৃদয়ের ততখানি গভীরে আদৌ গিয়ে পৌছোল না।

পিকলু সম্বন্ধে জিষ্ণু চিরদিনই অন্ধ ছিল। এবং পিকলু হয়তো অন্ধ ছিল জিষ্ণুর হৃদয়ে ওর প্রতি যে উষ্ণতা আছে সে সম্বন্ধে। মানুষ বলে, বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। পিকলুদের অবস্থা জিষ্ণুদের তুলনায় চিরদিনই খারাপ ছিল। কিন্তু জিষ্ণু সকলকেই বলত সমানে সমানে ছাড়া বন্ধুত্ব হয় না ওসব বাজে কথা। বলত, পিকলুর মতো উদার হৃদয়ের ছেলে ও দেখেনি। পিকলুর মনে কোনোই মালিন্য নেই। ওর কোনো হীনম্মন্যতাও নেই। বরং ওর ঔদার্যের পাশে জিষ্ণুই সবসময় হীনম্মন্যতা বোধ করে। মানসিকতার, রুচির, মতামতের সমতা থাকাটাই বড়ো কথা। প্রত্যেককেই বলত জিষ্ণু। পিকলুর মতো বন্ধু ওর আর একজনও নেই।

পিণ্টে কিন্তু বলত চিরদিনই যে, পিকলু শালা কিন্তু তোকে তেল দেয়। তোর মোসাহেবি করে। হি ইজ আ স্নেক ইন দ্যা গ্রাস।

জিষ্ণু এ কথা শুনে খুব রেগে যেত। বলত, ওর আর আমার সম্পর্ক এতদিনের এবং এতই পুরোনো যে তুই সেই বন্ধুত্বের সততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলিস না কোনোদিনও। পিকলুকে তুই কতটুকু জানিস?

জিষ্ণুর কথাতে পিণ্টে চুপ করে যেত।

সম্পর্ক অনেকই পুরোনো হয়ে গেলে, সে দাম্পত্য সম্পর্কই হোক কী বন্ধুত্ব; সেই সম্পর্ক যে বালির উপরেই গাঁথা হয়েছিল এই নির্মম সত্য স্বীকার করার সাহস এবং ইচ্ছা সম্পর্ক-সম্পৃক্ত দুজনের কারোই হয় না। অবশ্য জিষ্ণু আর পিক্‌লুর সম্পর্কটি অনেকদিন হয় সময়ের পরীক্ষা পাশ করে গেছে।

হেদোয় এসে ওরা ঘাসেই বসল। কোনো বেঞ্চিই খালি ছিল না।

পিকলু বলল, "স্কুটার আনিসনি।"

"নাঃ। স্কুটারটা বিক্রি করে দিচ্ছি। গ্যারাজে দিয়েছি। মেরামতের জন্যে। ওরাই খদ্দের দেখে বিক্রি করে দেবে।"

"কত দাম ধরেছিস?"

"জানি না। সাত-আট পাব বোধহয়।"

"আমাকে দিবি? আমি কিন্তু পাঁচের বেশি দিতে পারব না। তাও পাঁচটি ইনস্টলমেন্টে দেব। এবং পাঁচ বছরে। ভেবে দ্যাখ, তোর লস হবে কি না?"

"নিতে পারিস, কিন্তু!"

"কিন্তু কি?"

"ওই স্কুটার তোর কাছে থাকলেও তো আমার চোখ পড়বেই। পুষির কথা মনে হবে তাছাড়া, আনলাকিও তো বটে। নিবি? অ্যাকসিডেন্টের স্কুটার।"

"প্রেম থাকা ভালো। তবে এতখানি সেন্টিমেন্টাল হওয়াটা ঠিক নয়। আসলে তোর মানসিকতাটাও তোর লেখারই মতো। ভ্যাদভ্যাদে। মেদবহুল। মেইনস্ট্রিম-এ আয় জিষ্ণু। সবাই যা করে তাই কর। নদী হয়ে যা, দ্বীপ হয়ে থাকিস না।"

একটু চুপ করে থেকে পিকলু বলল, "তোর লেখা-টেখা কেমন চলছে?"

"এই।"

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল জিষ্ণু।

জিষ্ণু একটু অবাক এবং আহত হয়েছিল, পুষির মৃত্যুর আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া হল না বলে পিকলুর উপর! আশ্চর্য!

পুজোয় কোথায় লিখছিস এবারে?

"সুরজিৎ ঘোষ তাঁর 'প্রমা'-তে একটি উপন্যাস লিখতে বলেছেন। আর সমরেন্দ্র সেনগুপ্তও বলেছেন ওঁর 'বিভাব'-এর জন্যে। ধূর্জটি চন্দ বলেছেন "এবং"-এ লিখতে। জামশেদপুর থেকে কমল চক্রবর্তীও 'কৌরব'-এ একটি প্রবন্ধর কথা বলেছেন। কিন্তু কোথাওই লেখা হবে কি না জানি না। এবারে হয়তো কোথাওই লিখব না। লেখালেখি আনন্দ-নির্ভর। সবসময়ই লিখতে হলে তা শাস্তি বলেই মনে হয়।"

"তোর লেখার মতো এতো সেন্টিমেন্টাল লেখা আজকাল চলে না। আজকাল টানটান এবং বীর্যবান গদ্যর দিন। একটিও বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ থাকবে না তাতে। টেলেক্স মেসেজ আর সাহিত্যে কোনো তফাত নেই আর আজকাল। বুয়েচিস। সেন্টিমেন্ট-ফেন্টিমেন্ট ছাড়। ফালতু।"

জিষ্ণু একটুক্ষণ চুপ করে থাকল।

বলল, "সেন্টিমেন্ট ব্যাপারটাতো মানুষেরই একচেটিয়া। এই শব্দ তো জানোয়ারদের অভিধানে নেই। আমার তো মনে হয়, মানুষ যেদিন পুরোপুরি সেন্টিমেন্ট-বর্জিত হবে সেদিন মানুষ আর মানুষই থাকবে না। তুই হয়তো বলতে পারিস যে, সেন্টিমেন্টের প্রকাশটাই আধুনিকতার পরিপন্থী। এ কথা আমিও জানি। যদিও আংশিকভাবে। কিন্তু আমি তো শ্যামবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে লাউডস্পিকারে আমার দুঃখের বা সেন্টিমেন্টের কথা জানাচ্ছি না। সেন্টিমেন্টোল লেখামাত্রই খাবাপ এ কথা বলা বোধহয় যায় না।"

"তাহলে তো তুই শরৎ চাটুজ্জেকেও বড়ো লেখক বলবি।"

"আমি তো বলিই। সবসময়ই বলি। তবে আজ এসব প্রসঙ্গ থাক পিকলু। লেখা নিয়ে আলোচনা করার মতো মনের আবস্থাও আমার নেই এ মুহূর্তে। সেইজন্যেই বলছিলাম, এবার পুজোয় কোথাওই নাও লিখতেও পারি।"

পিকলু জিষ্ণুর উষ্মা বুঝতে পেল তার কথায়।

সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল, "বয়স তো আর পার হয়নি। তোর মতো ছেলের মেয়ের অভাব নাকি রে জিষ্ণু। এক পুষি গেছে তো কত পুষি আসবে।"

কথাটাতে ধাক্কা খেল জিষ্ণু।

"তুই বড়ো ক্রুড হয়ে গেছিস পিকলু।"

"জীবন। জীবনই করেছে রে।"

দু কাঁধ শ্রাগ করে পিকলু ফিলজফিক্যালি বলল।

"সকলেই তো তোর মতে টু-পাইস কামাচ্ছে না। দুধে-ভাতে তো নেই। তুই কি বুঝবি আমাদের কথা। কত বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ। তুই কেন ক্রুডনেসের কথা

বললি বুঝলাম না। জীবনে অনেক কিছুকেই মেনে নিতে হয়। না মেনে উপায় নেই বলে।"

জিষ্ণু জবাব দিল না কোনো।

যাদের তর্ক করার যুক্তি থাকে না, তারাই এমন বলে। পিকলু সত্যিই বদলে গেছে অনেক। আজকাল দেখাও হয় ন-মাসে ছ-মাসে। বিয়ের পর থেকেই ও অনেক বদলে গেছে। হয়তো জিষ্ণুও যাবে। যখন বিয়ে করবে।

এক মুহূর্ত পরেই পিকলু বলল, "আমি কথাটা উইথড্র করছি। তোকে আহত করে থাকলে আমি দুঃখিত। তবে যাই বলিস, ভগবান যা করেন মঙ্গলেরই জন্যে। পুষি ওয়জ নো ম্যাচ ফর উ্য।"

"এ প্রসঙ্গ থাক পিকলু। বরং তুই যে কাজের কথা বলার জন্যে এখানে নিয়ে এলি আমাকে সেকথা বল।"

জিষ্ণু বলল আহত গলায়।

ওর মুখেও রাগ ছিল।

"হ্যাঁ। কন্যার মুখে ভাত দিচ্ছি আগামী সপ্তাহের শনিবার। মানে আজ থেকে বারো দিন পরে।"

"এই রে।"

জিষ্ণু বলল।

"আমি যে থাকছি না। সেই শনিবার দিঘা যাব। সুধাংশু আর প্রণব হোটেল করেছে। খুব সুন্দর নাকি হোটেল। একেবারেই সমুদ্রের উপরে। ওর জোর করেই নিয়ে যাবে, আমারও মন ভালো নয়। তাই ভাবলাম।"

"কী নাম? হোটেলের?"

"হোটেল ব্লু-ভিউ।" সাহিত্যিক শংকর নামকরণ করে দিয়েছেন।

"সুধাংশুটি কে?"

"ও আমার ভাইয়ের মতো। দে'জ পাবলিশিং-এর। আমার একটি উপন্যাস ছেপেছে। প্রথম বই।"

"আর প্রণব।"

"প্রণব কর। ওই অঞ্চলের বনেদি বড়োলোক। দিঘাতেই বাড়ি।"

"তাহলে ওদের একটু বলে আসিস না খুসিকে আর কন্যাকে নিয়ে দিঘাতে যাব একবার। তোর জানা যখন, ডিসকাউন্ট দেবে নিশ্চয়ই। বিনা পয়সাতে থাকতে পারলে তো আরও ভালো হয়। কী রে! মনে করে বলবি তো!"

"দেখব।"

জিষ্ণু বলল।

"এবার কাজের কথাটা বল।"

"বাবাকে তো জানিসই। ক্যান্টাংকারাস ক্যারাক্টর। মানুষ বুড়ো হলে যা হয় আর কী! তারপর বাজে মানুষ বুড়ো হলে হয় শঙ্খচূড় সাপ। একেবারেই অবুঝ এবং মতলবি হয়ে গেছেন। কন্যার মুখেভাতে আমার শ্বশুরবাড়ির একগাদা লোক নেমন্তন্ন করে দিয়েছেন। মানা করেছিলাম। কিন্তু কে শুনছে বল? এদিকে আমার কি পৈতৃক জমিদারি আছে? না আমি ত মতো বড়ো চাকরি করি? তুই-ই বল।"

"তোর কথার মানে ঠিক বুঝলাম না।"

জিষ্ণু বলল।

তারপর বলল, "ভালোই তো। প্রথম নাতনির মুখেভাত। বলবেনই বা না কেন।"

"তা বলুন। কিন্তু তার আগে নিজের ছেলের রেস্ত সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া দরকার ছিল।"

জিষ্ণু চুপ করে রইল।

"এদিকে আমি পড়েছি মহা বিপদে। বুঝলি। প্রভিডেন্ট ফান্ডে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। লোনটা স্যাংশানও হয়েছে। কিন্তু পাওয়া যাবে সেই তোর গিয়ে মুখে ভাতের পরের সপ্তাহে। এখন তুই আমার মুখ রক্ষা না করলে চলবে না।"

"আমি?"

"কী করতে হবে?"

"পাঁচ হাজার টাকা কালই চাই।"

"আমি? কিন্তু কাল তো ব্যাংক বন্ধ।"

"ও। তাহলে পরশু সকালেই তোর বাড়ি যাব।"

"চেকবই যে অফিসেই থাকে। অফিসেই আসিস।"

"তাই যাব। তাড়া করছি এইজন্যে যে, আমাকে আবার মঙ্গলবার একবার বর্ধমানে যেতে হবে খুসিকে নিয়ে। সেখানে আবার গিয়ে ছোটো শালাজের সাধ। লোক বলতে তো আমি একা। দাদার কথা তো জানিসই। আলাদা থাকে। সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে আসবে। কোনো কাজেই তাকে দিয়ে হবার নয়। সাহায্য তো দূরের কথা।"

"আমি উঠি।"

হঠাৎই জিষ্ণু বলল, উঠে পড়ে।

"বুজলি জিষ্ণু, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা পেলেই আমি তোকে এসে দিয়ে যাব। স্টপগ্যাপ হিসেবেই তোর সাহায্য চাইছি। ওঃ। আর একটা কথা। ওই পাঁচটা হাজার, সাড়ে-সাত যদি করিস তো খুবই ভালো হয়। এত লোককে বাবা বলে ফেলেছেন। একেবারে সেনাইল হয়ে গেছেন মানুষটা। আর যা বাজার! টাকার কি কোনো দাম আছে?"

"সাড়ে-সাত হাজার দিতে হলে তো দু ব্যাংকে চেক কাটতে হয়। লিকুইড ফান্ডস তো বেশি থাকে না। আমার এক ব্যাংকে অত টাকা নেই। এফ. ডি বা অন্য ইনভেস্টমেন্টেই থাকে। যতটুকু আছে।"

"তাই না হয় কাটবি। গরজ বড়ো বলাই। দরকার যখন আমার তখন দুই ব্যাংকেই আমাকে ছুটতে হবে।"

"যা ভালো মনে করিস।"

"কাল, মানে পরশু তোর বাড়ি, সরি, অফিসে কখন যাব বল?"

"ন-টা নাগাদ আয়। সাড়ে ন-টায় আমার মিটিং আছে একটা। ব্যাঙ্গালোর থেকে কাস্টোমার আসছেন।"

"পৌনে-দশটায় গেলে হয় না? আমার মেজ সম্বন্ধী আবার আসবেন সোনারপুর থেকে। তার শালির বিয়ে সম্বন্ধে আলোচনা করতে। আমারই গিয়ে যত ঝামেলা। শ্বশুরবাড়ির সকলের আমিই যেন লোকাল গার্জেন। তাকে বিদেয় করে তাবপর তো আসতে হবে।"

"ঠিক সাড়ে ন-টায় কিন্তু আমাকে মিটিং-এ বসতেই হবে।"

"দেখি। তা হলে ন-টায় যাওয়ারই চেষ্টা করব। আমি তা হলে চলি। এই কথাই রইল। কিন্তু সাড়ে-সাত। সাত দিনের জন্যে। এবং স্কুটারটা।"

বলেই, বড়ো রাস্তায় পৌঁছেই একটি মিনি ধরে, পিকলু চলে গেল।

জিষ্ণু ভাবছিল যে, পিকলুর শ্বশুরবাড়িতে পিকলু একজন কেওকেটা। এই বা কম কী! কার আদর-যত্ন ভাগ্য যে কোন ঘরে ঠিক করা থাকে বিধাতাই জানেন। তবে জামাই যতই করুক শ্বশুরবাড়ির জন্যে, শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা তাকে কোনোদিনই মনে রাখে না। কৃতজ্ঞতাবোধটুকুও থাকে না তাদের। এই কথা বলেন জিষ্ণুদের অফিসে নগেনদা। বড়ো ভালো মানুষ। সত্যিই

শ্বশুরবাড়ির জন্যে অনেকই করেছেন তিনি এক সময়। ওঁর ভিতরে যে এক গভীর দুঃখ এবং অভিমান কাজ করে তা বোঝে জিষ্ণু। অন্যর দুঃখ কম মানুষেই বোঝে। টাকাপয়সা দিয়ে করাটা বড়ো কথা নয়। হৃদয় নিংড়ে যা দিয়েছিলেন তার সবই ফেলা যে গেল ওঁর দুঃখ এটাই।

পুষির কারণে আজ সন্ধেবেলায় জিষ্ণুর যে বিষণ্ণতা ছিল তা আরও গভীর হল পিকলুর জন্যে। পুষি কোনোদিনও জিষ্ণুর কাছে কিছুই চায়নি। কিছুমাত্র নয়। কফি খেলেও পয়সা পুষিই দিয়েছে জোর করে। ওরা খুব যে অবস্থাপন্ন ছিল এমনও নয়। পুষির চাকরিটাও তেমন বড়ো কিছু ছিল না। পুষি ওর উচ্ছ্বাস আর জীবনীশক্তি দিয়েই সব অভাব পুষিয়ে নিত।

পুষি একদিন বলেছিল, আমি "উইমেন্স লিব"-এ বিশ্বাস করি না। বিয়ের পর চাকরি ঠিক ছেড়ে দেব। দেখো। তখন তো তোমার পয়সাতেই খাব-পরব কিন্তু তাতে আমার সম্মানে একটুও লাগবে না। তোমাকে এত ভালোবাসব, তোমার জন্যে এত কিছু করব যে, তুমিই ভাববে ঈসস! কী লজ্জার কথা।

বলেছিল, আমাকে মাসে দুশো টাকা করে পকেট-মানি দেবে কিন্তু।

বাস স্টপেজ এসে দাঁড়াল জিষ্ণু নানা কথা ভাবতে ভাবতে। একটা মিনিবাস কর্কশ আওয়াজ করে এগিয়ে গেল। পুষির হাসি মুখটি ভেসে উঠল জিষ্ণুর সামনে। কনডাকটার শূন্যে লাথি ছোঁড়ার মতো পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে লাগল। মাথায় রক্ত চড়ে গেল জিষ্ণুর। ভাবল, পা-টা ধরে ফেলে এক টানে তাকে নিচে নামিয়ে তার কলার ধরে মাথাটা ঠুকে দেয় ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা নাৎসি জার্মানির কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের বন্দিদের মতো মিনিতে গিয়ে উঠে, মাথা নিচু করে হাতল ধরে দাঁড়ালেন।

কনডাক্টরকে মারার স্বপ্ন উবে গেল জিষ্ণুর। কলকাতার মানুষের মতো সহ্যশক্তি-সম্পন্ন, আত্মসম্মানজ্ঞাহীন; নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত মানুষ বোধহয় শুধু ভারতবর্ষের কেন, পৃথিবীর কোনো বড়ো শহরেই নেই। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ একজন মহিলার হাওয়ায় চাবুক মারার শব্দেই ত্রস্ত হয়ে নতজানু হয়ে বসে তাঁর পদলেহন করেন সেই দেশের মানুষদের এর চেয়ে বেশি কিছু পাওয়ার যোগ্যতাও অবশ্য নেই। দুচোখ জলে ভরে আসে জিষ্ণুর এই ক্ষুন্নিবৃত্তির বৃত্তে ঘূর্ণায়মান নিরুপায়, সর্বংসহ, প্রতিবাদহীন, পরনির্ভর অগণ্য নারী-পুরুষের দিকে চেয়ে।

পিকলু যেদিন আসবে বলেছিল সেদিন আসেনি। ওর জন্যে অপেক্ষায় থেকে থেকে মিটিং প্রায় আধঘণ্টা দেরি করে আরম্ভ করেছিল।

জিষ্ণু অফিসে কাজ করছিল। আজকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আসার কথা বম্বে থেকে। বম্বে থেকে কলকাতার ফ্লাইট খুব ভোরেই ছাড়ে। কিন্তু মাড়োয়ার টেলেক্স এল এখুনি যে "টেকনিক্যাল ফল্ট"-এর জন্যে ফ্লাইট চার ঘণ্টা ডিলেড। দশটাতে যদি বম্বে থেকে ছাড়ে তবে বারোটা দশ নাগাদ দমদম-এ নামবে প্লেন এবং সেখান থেকে অফিসে পৌঁছোতে আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট। রিজিয়োন্যাল ম্যানেজার এবং লোকাল পি. আর. ও এয়ারপোর্টে বসে আছেন সকাল

পৌনে আটটা থেকে। ওঁদের সঙ্গেও কথা হয়েছে জিষ্ণুর। এখন বারোটা বাজে। এম. ডি যে-কোনো মুহূর্তেই এসে পৌঁছোতে পারেন। কাজপাগলা মানুষ। খাওয়াদাওয়ার কথা মনে থাকে না। এসেই কাজে বসবেন। ওয়ার্কহলিক!

ঠিক সেই সময়ই বেয়ারা স্লিপ নিয়ে এল পিকলুর। খুবই বিরক্ত হল জিষ্ণু। যেদি ওর আসার কথা, আগের দিন রাতে ঘুম না হওয়া সত্ত্বেও কোনোক্রমে কাঁটায় কাঁটায় নটার সময় পিকলুর জন্যেই এসে পৌঁছেছিল। অথচ সেদিন পিকলু আসেতোনি-ই একটা ফোন পর্যন্ত করেনি আসতে পারছে না জানিয়ে। মধ্যে সাত দিন কেটে গেছে। ওর মেয়ের মুখেভাতও হয়ে যাবার কথা। এরকম "কুডনট কেয়ার-লেস", অ্যাটিচুডের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব তো দূরের কথা সম্পর্ক রাখাও মুশকিল কোনো ব্যস্ত মানুষের পক্ষে।

পিকলু ঢুকতেই জিষ্ণু বিরক্ত গলায় বলল, "এক্ষুনি এম. ডি. আসছেন। বড়ো টেনশানে আছি। কী ব্যাপার হল তোর?"

"আর বলিস না। বর্ধমানের শালা। এমন ইরেসপনসিবল। দে দে চেকটা কেটে দে। মনে আছে তো। সাড়ে-সাত বলেছিলি? বলেছিলি দু ব্যাংকের চেক কাটবি।"

"তোর মেয়ের মুখে ভাত তো হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ।"

"তবে কি? কোনোক্রমে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে ধার নিয়ে ম্যানেজ করলাম।"

"আমাকে নেমন্তন্ন করলি না? টাকাটা দিতে পারিনি বলে কি নেমন্তন্ন থেকেও বাদ দিলি?"

"আরে নেমন্তন্ন আর কী। গরিবের ব্যাপার! অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকেই বলেছিলাম। আর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। বাবার ইরেসপনসিবল কাণ্ড সব। জানিসই তো। দে টাকাটা দে।"

"আমি বুঝি ঘনিষ্ঠদের একজন নই? আমি শুধুই তোর ব্যাংকার?" জিষ্ণু বলল।

ঠিক এই ভাবে জিষ্ণু কোনোদিনও কথা বলেনি পিকলুর সঙ্গে। পিকলু সেটা লক্ষ্য করে অপ্রতিভ গলায় বলল, "মানে না, না। তুই ভুল বুঝছিস।"

"তোর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা পাসনি? যার জন্যে অ্যাপ্লাই করেছিলি?"

জিষ্ণু জানবার জন্যে স্টাবর্ন হয়ে বলল।

"আরে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কথা আর বলিস না। ইনএফিশিয়েন্সির চূড়ান্ত।"

জিষ্ণুর এবারে পিকলুর ওপর একটু রাগ হল। বলল, "নো ওয়ান্ডার। তুই যদি সে অফিসের একটি স্পেসিমেন হোস। কাজটা করিস কখন তোরা?"

"আরে আমার তো ঘুরে বেড়ানোই কাজ। কাজ না করলে সরকার কি এমনিতেই চলছে। চাকা বন্ধ হয়ে যেত তো! আমার জবটাই এইরকম। রোদে-বৃষ্টিতে ঘুরতে কার আর ভালো লাগে বল?"

জিষ্ণু বলল, মনে মনে, কেমন যে চলছে সরকারি চাকা তা বেসরকারি সকলেই হাড়ে হাড়েই জানে।

বলল, "আমার আজ সত্যিই খুব টেনশান।"

বলেই ডানদিকের ড্রয়ারটা খুলে একটি খাম দিল পিকলুকে।

"নেমন্তন্নই যখন করলি না, আমি যখন তোর ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে পড়িই না তখন তোর বাড়িতে তোর মেয়ের মুখে ভাত উপলক্ষে আর এখন যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এতে তিনশো টাকা আছে। খুসিকে বলিস পছন্দমতো কিছু কিনে দেবে কন্যার জন্যে।"

"আর চেকটা?"

"আজ আমার সময় নেই পিকলু। সত্যিই বলছি। তুই রাতে একটা ফোন করিস বাড়িতে বরং।"

"রাতে? কোথায়?"

"বাড়িতে। বললামই তো।"

"বাড়িতে তো চেক বই থাকে না।"

"তা থাকে না। আমার একটা কমিটমেন্ট আছে। সেটা ছিল না তোর সঙ্গে যেদিন স্যাঙ্গুভ্যালির সামনে দেখা হয় তখন। গত বুধবার সেটা অ্যারাইজ করেছে।"

"কী ব্যাপার?"

"সেটা তোকে জানাতে পারছি না। কিন্তু খুবই জরুরি।"

"এমন কথাও আছে যে তুই আমাকেও জানাতে পারিস না।"

"থাকবে না কেন? আমি তো তোর ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে পড়ি না।"

কথাটা বলে, বলতে পেরে খুশি হল জিষ্ণু।

এত বছরের অন্তরঙ্গতম বন্ধুর ব্যবহারটা ওর কাছে এই প্রথমবার যেন কেমন ঠেকল। যতখানি ব্যথিত হল, ততখানি ক্রুদ্ধ হতে পারল না। কিন্তু পিকলু সম্বন্ধে জিষ্ণু যা ভাবছে তা যদি সত্যি হয় তা হলে এ পৃথিবীতে আর কারও সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে পারবে না ও। এত বড়ো দুর্বিপাক একজন পুরুষের জীবনে আর হতে পারে না।

"তুই ব্যাপারটাকে বেশি সিরিয়াসলি নিচ্ছিস।"

অ্যাপোলজিটাকালি বলল পিকলু।

"বেশি আদৌ নয়। ঠিক যতখানি সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত ততখানি সিরিয়াসলিই নিচ্ছি।"

"বাঃ বাঃ। খুব রেগেছিস দেখছি?"

পিকলু বলল।

জিষ্ণু চুপ করে থাকল।

"তা রাগ না হয় হয়েছে কিন্তু চা তো খাওয়াবি এক কাপ? না তাও নয়।"

"দ্যাখ আজকের দিন এবং ঠিক এই সময়টা আমার আতিথেয়তা করাব নয়। তোকে বলেছি যে এম. ডি. যে-কোনো মুহূর্তে ঢুকে পড়তে পারেন। এমন একদিনও কি হয়েছে যে তুই আমার অফিসে এসেছিস আর চা খাওয়াইনি তোকে?"

পিকলু এবার উঠে দাঁড়াল।

বলল, "তুই একটা চাকর হয়ে গেছিস। আ রিয়্যালি চাকর। পাতিবুর্জোয়া।"

"চাকর তো বটেই। চাকরি যখন করি। আর সব বুর্জোয়াই সমান। পাতি আর রাজা। চাকরি করি। খেটে খেতে হয়। মনিবকে ভয় করতে হয়। কী করব বল?"

মৃদু হাসল পিকলু। টিভি সিরিয়ালের ভিলেনের মতো। তারপর গোল্ডফ্লেক সিগারেট টান দিয়ে ধোঁয়াটা উপরে ছুঁড়ে দিল। এয়ার কন্ডিশানারের এগজস্ট ধুঁয়োর কুণ্ডলিটাকে ঠেলে পিকলুর দিকেই ফিরিয়ে দিল।

দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগে পিকলু বলল, "বুর্জোয়াদের কাছে কাজ করে তুইও একটা রিয়্যাল বুর্জোয়া হয়ে উঠেছিস। একটা শ্রেণি তোদের কখনও মেনে নেবে না।"

"কোন শ্রেণি যে মানল তা তো আজও বুঝলাম না। ভূমিহীন কৃষকেরই মতো আমিও একজন শ্রেণিহীন মানুষ। নিজের জন্যেই কষ্ট হয় আমার নিজের। তোর তো হবেই। আশ্চর্য হই না।"

পিকলু বলল, "তবে ওই কথাই রইল। ফোন করব রাতে। আজ অবশ্য হবে না। কৃষ্ণনগরে চলে যাচ্ছি। ফিরেই করব।"

ও চলে যেতেই চানচানি ঘরে ঢুকে বলল, 'চলো ইয়ার বাহারসে লাঞ্চ করকে আয়েগা।"

"এম. ডি?"

উৎকণ্ঠিত গলায় শুধল জিষ্ণু।

"মাড়োয়া হ্যাজ সেন্ট আ টেলেক্স জাস্ট ন্যাউ। দ্যা টেকনিক্যাল স্ন্যাগ। মাই ফুট! দ্যা ফ্লাইট ইজ ক্যানসেলড। ট্যুওর প্রোগ্রাম উইল বি ইন্টিমেটেড লেটার।"

"আজ ব্যাঙ্গালোরে চলে গ্যায়ে বড়াসাব। হুঁইয়েসে হায়দারাবাদ। মে বি, উইল কাম হিয়ার নেকসট উইক ফ্রম হায়দারাবাদ। নাউ দেয়ারস আর রেগুলার ফ্লাইট টু অ্যান্ড ফ্রম ক্যালকাটা। নাথিং টু ওয়ারিবাউট!"

জিষ্ণুর মনটা এম. ডি-র আসন্ন ভিজিট এবং পিকলুর আসার কারণে খুবই টেন্স হয়ে ছিল। বলল, খুশি হয়ে; "লেটস গো।"

"কাঁহা যায়ে গা?"

"কোয়ালিটিমে চলো। নজদিকমে পড়েগা।"

চানচানি বলল, 'স্কাইরুমমে খানা কব খিলায়গা? পিংকি দো দফে ইয়াদ দিলায়া।"

"যো রোজ তু ফিক্স করোগে। মেরি খুশনসিবি!" জিষ্ণু বলল।

এই মালটিন্যাশনাল কোম্পানিতে জয়েন করে ওর হিন্দি এবং ইংরেজি দুই-ই একটু ইমপ্রুভ করেছে।

"চলো।"

বীয়ার অর্ডার করেছিল চানচানি। গত এক সপ্তাহ হল সকাল সাড়ে আটটাতে অফিসে আসছে আর যাচ্ছে রাত নটাতে। শনি-রবিও বাদ যায়নি। নতুন এম. ডি.-র এই প্রথম ভিজিট। সক্কলেই টেন্স হয়ে আছে।

মানুষটা নাকি ভালো কিন্তু সবসময়ই হাইপারটেন্সড হয়ে থাকেন এই দোষ। প্রাইভেট সেক্টরের এই দোষ। কেউ কুড়ি হাজার টাকা মাইনে পেলেও নো বডি নোজ হু উইল গেট দ্যা স্যাক? অ্যান্ড হোয়েন?

বিয়ার যখন আনল বেয়াবা তখন চানচানির বন্ধু মাইক মিনেজিস তাকে ডাকল। সে অন্য কোনাতে বসে লাঞ্চ খাচ্ছিল। আই. টি. সি.-তে আছে। একাই ছিল।

চানচানি বলল, "তুম অর্ডার কর দো ইয়ার ম্যায় আভভি আয়া। মেরি কলেজকি দোস্ত। তুমসে মিলাযগা বাদমে।"

এমন সময় টেবল থেকে উঠে এসে মাইক মিনেজিস জিষ্ণুকে উইশ করে গেলেন। ভদ্রলোক। চানচানি বলল মাইকও আমারই মতো চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। চানচানি বলে গেল, কলেজকি দোস্ত। বড়ো দুঃখের সঙ্গে ভাবল জিষ্ণু যে, স্কুলকলেজের কোনো বন্ধুব সঙ্গেই মিলিত হবার সাধ আব নেই ওর। কোনো বন্ধুর সঙ্গেই নয়। পিকলু আজ অফিস থেকে মেয়ের প্রেজেন্ট তিনশো টাকা নিয়ে চলে যাবার পরই পুরো ব্যাপারটা এবং তারপর অনেকগুলো পুরোনো ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক হয়েছিল। মরমে মরে ছিল জিষ্ণু।

পিকলুর এক বোন ছিল। একমাত্র বোন। ওরা এক বোন এক ভাই। পিকলু বোনের বিয়ের পাঁচ বছর আগে থেকেই চাকরি করেছিল। যদিও পিকলুর অবস্থা জিষ্ণুর চেয়ে অনেকই খারাপ ছিল তবুও চিরদিনই পিকলু জিষ্ণুর চেয়ে ভালো জামাকাপড় পরেছে, ভালো সিগারেট খেয়েছে, নিজের খরচে কোনদিনই কোনো কার্পণ্য করেনি।

বোন চম্পার বিয়ের সময় পিকলুকে জিষ্ণু জিজ্ঞেস করেছিল, "কী দিচ্ছিস তুই চম্পাকে? টাকাপয়সা জমিয়ে রেখেছিস তো কিছু?"

পিকলু ননশালান্টলি বলেছিল, "কী বলব তোকে জিষ্ণু, এক পয়সাও সেভিং নেই আমার।"

অবাক হয়ে গেছিল জিষ্ণু বন্ধুর অভাবনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দেখে।

একটু ভেবে বলেছিল, "এই কথা কাউকে বলবি না।"

তারপর পিকলুকে বউবাজারে নিয়ে গিয়ে তখনকার দিনে পাঁচ হাজার টাকার একটি গয়না

কিনে দিয়েছিল চম্পার জন্যে। নিজে যা দেবার তা তো দিয়েই ছিল। বারবার করে বলে দিয়েছিল পিকলুকে, দ্যাখ পিকলু, কেউই যেন না জানে যে আমি দিয়েছি ওটা। জানলে, তোকে সকলেই অমানুষ ভাববে।

অমানুষ কেউই ভাবেনি।

পিকলুর নিজের বিয়ের সময়ও পিকলু এসেছিল জিষ্ণুর কাছে। জিষ্ণু তখন একটা এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে কাজ করে। এই কোম্পানিতে জয়েন করেনি তখনও। পিকলু তখনও বলেছিল, "পাঁচ হাজার টাকা ধার দিবি, প্রভিডেন্ট ফান্ডে অ্যাপ্লাই করেছি। বউভাতের খরচের জন্যে। বাবা ও মামাই সব করছেন। তবু আমারও তো কিছু দিতে হয়। টাকাটা পেয়ে নিশ্চয়ই যাব তবে দু একদিন দেরি হবে। টাকাটা পেলেই তোকে আমি শোধ করে দেব।"

জিষ্ণুকে ঈশ্বর পিকলুর চেয়ে বেশি দিয়েছিলেন। শুধু অর্থই নয়, হৃদয়ও। অনেকই বেশি। অনেকই দিকে। তাছাড়া পিকলু ছিল জিষ্ণুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ওর জন্যে ওর প্রয়োজনে এটুকু করতে পেরে ভালো লেগেছিল খুবই। খুশি মনেই দিয়ে দিয়েছিল টাকাটা।

কিন্তু পিকলুর বিয়ের পর সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে গেছিল। জিষ্ণু পথ চেয়ে বসেছিল পিকলুর। টাকাটার জন্যে নয়; টাকাটা পিকলু দিতে এলে সে বলবে, "মার খাবি তুই। টাকাটা রেখে দে। ফেরত দিতে যে চেয়েছিস, এতেই ফেরত দেওয়া হয়ে গেছে।" ভেবেছিল জিষ্ণু, যে এইটুকু আনন্দ থেকে অন্তত বঞ্চিত হবে না ও। শ্রদ্ধা না করতে পারলে একে অপরকে; বন্ধুত্ব তো নিশ্চয়ই, অন্য কোনো সম্পর্কই টেঁকে না এ পৃথিবীতে। কিন্তু টাকা ফেরতই দিতে আসেনি পিকলু। এবং জিষ্ণুকেও ওই কথাটা বলার সুযোগ দেয়নি। কোনোদিনই কোনো টাকা ফেরত দিতে আসেনি সে।

তার পর যখন মেয়ে হল পিকলুর? বর্ধমানের বেস্ট নার্সিং হামে ভর্তি করাল পিকলু খুসিকে। কাকাবাবুর, মানে পিকলুর বাবার সঙ্গে কী নিয়ে যেন মনান্তর ঘটেছিল পিকলুর। কলকাতায় ডেলিভারি হবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ির সূত্রে বর্ধমানেই সব ঠিকঠাক করল পিকলু। খুসি, পিকলুর স্ত্রী, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এই খবর পেয়ে সবচেয়ে আগে যে ট্রেন পেল, তাই ধরে বর্ধমানে পৌঁছেই সোজা নার্সিংহোমে পৌঁছেছিল জিষ্ণু। গিয়ে দেখে, পিকলু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে একা। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। শ্রাবণ মাস ছিল। মনে আছে।

পিকলু বলল, ইয়োর শালা খেতে গেছে। ফিরলেই ও খেতে যাবে!

শালা ফিরলে, জিষ্ণু পিকলুকে নিয়ে ওর অফিসের কোলিগ ঝণ্টুদার বাড়ি গেছিল। বউদি সেদিন অনেক রান্না করেছিলেন সকাল থেকে। কাদের যেন খেতে বলেছিলেন। অনেক পদ দিয়ে ওই অবেলাতে খাইয়ে দিলেন। খেয়ে, সাইকেল রিকশা করে ফেরার সময় পিকলুকে আবারও জিজ্ঞেস করেছিল জিষ্ণু, কোনো সাহায্যর দরকার আছে কি না?

পিকলু বিষণ্ণ মুখে বলেছিল, "সিজারিয়ান হবে। টাকা পয়সার জোগাড় নেই।"

কথাটা শুনে খুবই অবাক লেগেছিল জিষ্ণুর। কিন্তু অবিশ্বাস হয়নি। না। এর আগে কোনোদিনও অবিশ্বাস করেনি পিকলুকে। ওর প্রাণের সখাকে। তখনও বিশ্বাস অটুট ছিল। তবে দুঃখ হয়েছিল বন্ধুর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে রিকশা ফিরিয়ে নিয়ে ঝণ্টুদার বাড়ি হয়ে জিষ্ণু তিন হাজার টাকা ধার করে পিকলুকে দিয়েছিল। সেই টাকাও পিকলু শোধ করেনি। শোধ করার কথা বলেওনি কখনও। ঝণ্টুদাকে শোধ করে দিয়েছিল সেই টাকা জিষ্ণু, নিজের অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও। ছ মাসের মধ্যে।

বন্ধুর সম্বন্ধে, বিশেষ করে বাল্যবন্ধুর সম্বন্ধে এসব কথা ভাবলেও বুকের মধ্যে কষ্ট হয়। তাছাড়া জিষ্ণুর বন্ধুবান্ধব তো কোনোদিনই বেশি ছিল না। যতটুকু সময় পেত ও পড়াশোনা, গানবাজনা, ছবি আঁকা নিয়েই থাকত। পুরোপুরিই ইনট্রোভার্ট ছিল। তাই তার ছেলেবেলার বন্ধু

পিকলু যে এইরকম ব্যবহার করবে তার সঙ্গে বারবার, জেনে শুনে, একথা বিশ্বাস করতে বড়োই কষ্ট হচ্ছিল ওর। সত্যি কথা বলতে কী, এই মুহূর্তেও এই তঞ্চকতা যে সত্যি সে কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না ও।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটাত সত্যি সত্যিই অভাবনীয়! বিশ্বাস চিড় সহজে ধরে না অন্তত জিষ্ণুর। বহুভাবে নিশ্চিত না হয়ে কখনও সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করে না ও। পিকলুর মেয়ের মুখেভাতও হয়ে গেছে। সবই মিটে গেছে। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা যেদিন পাওয়ার কথা, সেই দিনটিও অনেক দিন পেরিয়ে গেছে, অথচ পিকলুকে সে টাকাটা দিতে পারেনি বলে জিষ্ণুকে পিকলু নেমন্তন্ন পর্যন্ত করল না এবং সব মিটে যাওয়ার পরেও টাকা চাইতে এল। জবরদস্তি করল। মিথ্যে করে কাবুলিওয়ালার কথা বলল। যেন পিকলুর নিজের জীবনের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে ওর শ্বশুরবাড়ির মানুষদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর সবটুকু দায়িত্ব শুধু জিষ্ণুরই। এত বড়ো চক্ষুলজ্জাহীন, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন মানুষকে বন্ধু বলে মানা আর সম্ভব নয়। রাগ নয়; দুঃখে জিষ্ণু মরে যাচ্ছিল।

বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে মুখটা তেতো লাগছিল। বন্ধু যে, যে উষ্ণ হৃদয়ে তার বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের হৃৎপিণ্ড কেটেও একদিন দিতে পারত যাকে, সেও এমন তঞ্চকতা করল জিষ্ণুর সঙ্গে! জিষ্ণুর মতো বন্ধুর সঙ্গে? জিষ্ণু ভাবছিল, একদিন পিকলুর মেয়ে খুকিও বড়ো হবে। খুসির কানেও কীভাবে কথাটা পৌঁছেছে পিকলু তার নিজস্ব কায়দায় তাও জিষ্ণু জানে না। হয়তো জিষ্ণুকেই ভিলেইন সাজিয়ে রেখেছে নিজেকে হিরো বানাতে। পিকলুর খলবৃত্তির কারণে খুসি এবং খুকির সঙ্গেও হয়তো জিষ্ণুর সম্পর্ক চিরদিনেরই মতো খারাপ হয়ে যাবে। অথবা হয়তো থাকবেই না।

কান্না পাচ্ছিল জিষ্ণুর। বুক ভেঙে যাচ্ছিল এই কথাগুলি ভাবতে অথবা বিশ্বাস করতে।

এমন সময় চানচানি ফিরে এল।

বাঁচল জিষ্ণু।

"হ্যাভনট উ্য প্লেসড দ্যা অর্ডার ফর ফুড?"

"নো।"

বলল, অন্যমনস্ক গলায় জিষ্ণু।

"আজিব আদমি তু ইয়ার। অফিস কব লোওটেঙ্গে?"

"স্টুয়ার্ড! স্টুয়ার্ড!"

বলে, ডাকল চানচানি।

রাত অনেক হয়েছিল। গানুবাবুদের বাড়ির পেটা ঘড়িতে একটা বাজল। জিষ্ণুদের গলিতে গানুবাবুদের বাড়ি আর পেটা ঘড়ি এখনও মধ্যযুগীয় আবহাওয়াকে মরতে দেয়নি। বেশ লাগে।

জানালার পাশে লেখার টেবলে বসেছিল জিষ্ণু। টেবললাইটের পাশেই ওর শোওয়ার খাট। বইপত্র, তানপুরা, হারমোনিয়ম, ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই সারা ঘরে ছড়ানো ছিটানো। হাঁটতে গেলে বই সরিয়েই হাঁটতে হয়। আর শ্রীমন্তদা শুচিবাইগ্রস্ত মানুষ। সবকিছুই ঝকঝকে

তকতকে করে পরিষ্কার না করতে পারলে তার খিদে হয় না। রোজ ডাঁই-করা কাপড় কেচে ইস্ত্রি না করলেও। এই ঘর পরিষ্কার করা নিয়ে বহু পুরোনো কাজের লোক শ্রীমন্তদার সঙ্গে মারামারি লাগে। জিষ্ণু তাকে ঘরে হাত দিতে দেয় না পাছে সব জিনিস এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু শ্রীমন্তদা হাত দেবেই দেবে। তার "গোছানো" মানেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু শ্রীমন্তদা হাত দেবেই দেবে।

ইনকরিজিবল।

জিষ্ণু লিখছিল। এমন সময় কাকিমা ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকলেন ওর ঘরে।

"কী কাকিমা? ঘুমোওনি?"

"পরী যে এখনও ফিরল না।"

"এখনও ফেরেনি?"

"না। তুই তো বাইরে খেয়ে এসেছিস আজ। নইলে খাওয়ার টেবলেই জানতিস।"

"গেছে কোথায়?"

"কোনোদিনও কি বলে যায়? অন্য লোকের কথা ভাবা তার চরিত্রেই নেই। অফিস থেকে গেছে নিশ্চয়ই কোথাও। তবে মনে হচ্ছে রিহার্সালেই গেছে। তাদের অফিসের অফিসার্স ক্লাব থিয়েটার করছে না!"

পুরো পাড়াটা নিঝুম। কুকুরগুলো মাঝে-মাঝেই চিৎকার করে উঠেছে। ট্রাম-বাসের আওয়াজও আর নেই। এই কলকাতাকে কলকাতা বলে চেনা যায় না।

লেখা বন্ধ করে চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসে জিষ্ণু বলল, "বোসো কাকিমা! চিন্তা কোরো না। এসে যাবে। কোথাও রিহার্সাল তার ঠিকানা জানা থাকলেও না হয় হত।"

"কী করে বলব বল? আমাকে জানালে তবে না জানব।"

"আর একটু দেখ তারপর বেলিকে ফোন করে দেখব। এত রাতে মিছিমিছি ফোন করা ঠিক নয়।"

"যা ভালো মনে করিস কর। এই মেয়ের চিন্তা আমি আর করতে পারি না। দিনে দিনে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।"

জিষ্ণু কাকিমাকে অন্যমনস্ক করার জন্যে বলল, "বলো, আজ সারাদিনের খবর বলো।"

"বহুদিন পর আজ পতু এসেছিল ওর মেয়ে ফুলকিকে নিয়ে।"

"পতু কে?"

"আরে তোর কাকার কোয়ার্টারের উলটোদিকে থাকত না নীলুবাবুরা। তাঁর স্ত্রী পতু। আর মেয়ে ফুলকি। ফুলকি। এম. এ. পড়ছে এখন। ভারি চমৎকার মেয়ে হয়েছে।"

"তাই?"

"হ্যাঁ। ওদের অবস্থাও ভালো হয়েছে এখন। বড়ো কষ্ট করে থাকত সেই সময়।"

"সকলেই ভালো থাক। আজকে মুড়িঘণ্টটা বড়ো ভালো খেলাম।"

"আমিই রেঁধেছিলাম।"

কাকিমা বললেন।

"সে তো আমি খেয়েই বুঝেছিলাম। মোক্ষদাদির হাতের রান্না ভালো কিন্তু তোমার মতো ভালো নয়।"

"শ্রীমন্তদা কবে ফিরবে?"

"আরও দিন সাতেক পর।"

"আর মোক্ষদাদি?"

"সে তো কালই ফিরবে।"

তাবপর বললেন, "রান্না-বান্না আজকাল ভালো করে করা যাবে কী করে? মোক্ষদার কী দোষ? মাপা জিনিসে ভালো রান্না হয় না। আমিও পারতাম না। সে দিনকাল কি আর আছে! সেই মাছ নেই, সেই তেল নেই, সেই মনই নেই যে রাঁধে তার এবং যে খায় তারও।"

"একদিন ভেটকি মাছের কাঁটা-চচ্চড়ি কোরো তো কাকিমা। তোমার হাতের কাঁটা-চচ্চড়ি বহুদিন খাইনি। সেদিন হীরুকাকাকেও খেতে বলো।"

"বাঁধানো দাঁতে আর কাঁটা-চচ্চড়ি কি খাবে? দু পাটি দাঁতই তো বাঁধানো। শুনেছি ওঁর মা-বাবা কারও দাঁত ভালো ছিল না। করলে তোর একার জন্যেই কবতে হবে। পরীটা তো কাঁটা খায়ই না। মাছের মধ্যে এক রুই আর পাবদা। আর সব মাছেই নাকি তার কাঁটা লাগে। মেয়েরা আর পবীই পুরুষ। কই মাছের কাঁটা-মাথা খায় না কুড়মুড়িয়ে, পাবদা বা ট্যাংরা মাছের কাঁটা-মাথাও খায় না, সে তোর তেলকইই রাঁধি কী পেঁয়াজ বেগুন কাঁচালংকা দিয়ে ট্যাংরার চচ্চড়িই। অদ্ভুত মেয়ে হয়েছে এক। আমার ভালো লাগে না। বিয়েথাও করল না। চোখ বোজার আগে শান্তিতে চোখ বুজতে পারব না। শান্তির কপাল করে তো আসিনি।"

"অনেক দেরি আছে তোমার চোখ বোজার। তাছাড়া পরী শুধু স্বাবলম্বীই নয়, একজন কেওকেটাও। তোমার চিন্তা কি?"

"না রে। মানুষ যখন এখানে আসে তখনই হিসেব হয় শুধু। আগে পরের যাওয়ার বেলা কোনো হিসেব থাকে না। সবচেয়ে ছোটো যে, সেই সবচেয়ে আগে যেতে পারে। বড়ো, সবচেয়ে পরে মেয়েমানুষ, স্বাবলম্বী হলেও বিয়ে না হলে পূর্ণতা পায় না।"

জিষ্ণু চুপ করে থাকল। পুষির কথা মনে পডল ওর।

"পুষিদের বাড়িতে গেছিলি?"

কাকিমা শুধোলেন।

"নাঃ।"

পুষির মায়ের কথা মনে হতেই মনটা বড়ো খারাপ হয়ে যায়।

জিষ্ণু চুপ করে রইল।

এমন সময় গলিতে একটি গাড়ি ঢোকার শব্দ হল। এ গলিতে গাড়ি আছে শুধু ভড়বাবুদেব। তেলের কলের মালিক। তাঁর গাড়ি অনেকক্ষণ গ্যারাজ বন্ধ হয়ে গেছে। গানুবাবুদের অবশ্য অনেকই গাড়ি। অনেকরকম। তবে সেসব গাড়ি যতটা দেখাবাব জন্যে, চড়াব জন্যে ততটা নয়। গাড়ি সাজানো থাকে দিশি বিদিশি। কখনও কখনও অ্যান্টিক শোয়েব জন্যে অ্যান্টিক হয়ে যাওয়া গাড়ি বের হয়। নানা বিচিত্র সাজে সেজে বেরোন বাবু-বিবিরা। গানুবাবুদের দেখে এ রাজ্যে যে মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ, নকশাল আন্দোলন, দার্জিলিঙের অশান্তি, মিছিল-মিটিং বন্ধ-এর প্রভাব আছে কোনো তা বোঝার উপায় নেই। ছেলেদের ধাক্কা পাড়ের ধুতিতে কাছা দেওয়ার রকমটা বদলায়নি একটুও এবং বদলায়নি মেয়েদের প্রমাণ সাইজের গামছা পরে দিনের মধ্যে বার পাঁচেক মারবেলের চওড়া বারান্দা দিয়ে বাথরুমে চান করতে যাওয়া।

এই গলির চাঁপাবউদির স্বামী ছোটুদার আছে এনফিল্ড মোটর সাইকেল। সকালে গলি গমগমিয়ে বেরিয়ে যায়। সন্ধে আটটা নাগাদ আবার গলি কাঁপিয়ে ঢোকে। লেদ মেশিন আছে কয়েকটা ছোটুদার। হাওড়ার কদমতলাতে। এক সময় মণি খাঁর রাইস মিলে কাজ করত। হরিমতি বাইস মিলে। মেদিনীপুর জেলার ডেবরাতে। কলেজের ছাত্র ছিল যখন তখন সেখানে একবার মাছ ধরতে গেছিল জিষ্ণু ছোটুদের সঙ্গে। মণিখাঁ ফিনফিনে গা দেখা যাওয়া আদ্দির পাঞ্জাবি, চুনোট ধুতি, হালকা নীলাভ রিমলেস চশমা, আর চকচকে পাম্পশু পরতেন। ঠোঁটে সবসময় থাকত স্টেট

এক্সপ্রেস সিগারেট। খুব রসিক মানুষ ছিলেন। খাদ্য পানীয় এবং জীবন-রসিক। অনেক যত্নআত্তি করেছিলেন জিষ্ণুদের।

নকশালরা তাঁকে নৃশংসভাবে মারে কদমতলাতেই, সকালে যখন হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। চিঠি দিয়েছিল আগে। পকেটে রিভলবার ছিল। কিন্তু রিভলবারে হাত দেওয়ার আগেই ভোজালির এক কোপে ডান হাতের কবজির কাছ থেকে আধখানা হাত কেটে দেয়। তারপর...

ওঁর ডেডবডি দেখেছিল জিষ্ণু ছোটুদার সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে। নকশালদের হুমকিতে রেসিডেন্ট সার্জন বা অন্য কেউই মণিবাবুকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই করেননি বলে শুনেছিল। সে বড়ো বীভৎস মৃতদেহ!

গাড়িটা এসে দাঁড়াল মনে হল জিষ্ণুদের বাড়িরই সামনে!

কাকিমা উঠছিলেন।

জিষ্ণু বলল, "আমি যাচ্ছি। তুমি বোসো।"

দরজা খুলতেই দেখল, গাড়ি থেকে পরীকে দুজন ভদ্রলোক হাত ধরে নামালেন। পরী বেঁকে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাত নাড়িয়ে বলল, "গুড নাইট।"

গাড়ি থেকে কে যেন বললেন, "স্লিপ টাইট।"

গাড়িটা আর না দাঁড়িয়ে জোরে ব্যাক করে চলে গেল গলি থেকে। হেডলাইটের তীব্র আলোটা জিষ্ণুর দুচোখ ধাঁধিয়ে দিল। আলোটা সরতেই জিষ্ণু দেখল পরী ভিতরে না ঢুকে দরজার সামনে রক-এর উপরেই বসে পড়েছে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে।

জিষ্ণু নিচু গলায় ডাকল, "পরী।"

পরী জড়ানো গলায় বলল, "ঠিক আচি, ঠিক আচি।"

জিষ্ণু ব্যাপারটা আঁচ করেই, পাছে গলির জানালাগুলির পেছনে গভীর রাতের কৌতূহলী চোখগুলি সব জেগে ওঠে সেই ভয়ে পরীকে তাড়াতাড়ি পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করল।

পরী হাঁটতে পারছিল না। প্রচণ্ড মদ তো খেয়েছিলেই, মানসিক ভারসাম্যও ছিল না ওর। হুইস্কির গন্ধ বেরুচ্ছিল মুখ থেকে।

কাকিমা দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন।

মুখে কালি ঢেলে দিয়েছিল কাকিমার। বললেন, "কী হয়েছে? জিষ্ণু? কী হয়েছে ওর?"

জিষ্ণু বলল, "কিছু নয়। তুমি একটু লেবু দিয়ে শরবত করে দিতে পারো কাকিমা ওকে? সঙ্গে একটু নুনও দিয়ো।"

"কীসের গন্ধ এমন বিটকেল?"

কাকিমা বললেন।

"ওষুধ-টষুধের হবে।"

জিষ্ণু মিথ্যে বলল।

"ওষুধ? কীসের ওষুধ? ও মদ খেয়ে এসেছে। রাত সোয়া একটার সময় অচেনা লোক ওকে গাড়ি থেকে মাতাল অবস্থায় নামিয়ে দিয়ে গেল! এ মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দে। বের করে দে জিষ্ণু।"

"আঃ কাকিমা। রাত হয়েছে। কেন চ্যাঁচামেচি করছ। শরবতটা খাইয়ে ওকে শুইয়ে দাও।"

"ওকে মারব আমি।"

"তিরিশ বছরের মেয়েকে মারবে তুমি? ছিঃ।"

"ও আমার মেয়ে নয় জিষ্ণু। ওর মুখ দেখতে চাই না আর আমি। দুশ্চরিত্রা। ছিঃ।"

"আঃ! কী বলছ কাকিমা! সরো, সরো, ওকে ওর ঘরে নিয়ে যাই। তুমি শরবতটা করে নিয়ে এসো।"

ঘরে পৌঁছোবার আগেই পরী জিষ্ণুর গায়ের উপরেই ওয়াক ওয়াক বমি করে দিল। জিষ্ণু হাত কাটা গেঞ্জি পরে ছিল একটা। তার মধ্যে দিয়ে গলে সারা বুক-পেট-গা বমিময় হয়ে গেল।

তারপর বেসিনের সামনে নিয়ে যেতেই হুইস্কি, মাংসর কাবাব এবং পরোটার টুকরো মাখামাখি করে আবার ওর গায়েরই উপরে উগরে দিল পরী। জিষ্ণু লক্ষ্য করল যে, পরীর শাড়ি ব্লাউজ বিস্রস্ত। চুলও। ব্লাউজের একটিমাত্র বোতাম লাগানো। ভিতরের ব্রেসিয়ার খোলা। তার মধ্যে পুষ্ট সোনা-রঙা একটি স্তন যৌবনের সব যন্ত্রণায় প্রতিভূর মতো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বড়ো, পাকা কাবুলি আঙুরের মতো কালো বোঁটা।

শরীরটার মধ্যে কীরকম যেন করে উঠল জিষ্ণুর। চোখ সরিয়ে নিল। তারপর নিজে বাথরুমে গেল পরিষ্কার হতে। পরীকে মুখ-ধোওয়া বেসিনটার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে।

যাবার সময় বলল, "কাকিমা, ওকে ধরো। ও অসুস্থ। কিছু বোলো না। আরও বমি করতে বলো গলায় আঙুল দিয়ে! শরীর ভালো লাগবে। আমি জানি, এমন হলে শরীর খারাপ লাগে। একদিন বাউরকেল্লায় এরকম হয়েছিল আমার একবার অফিসের পার্টিতে।"

"আরে তুই ছেলে জিষ্ণু। এসব মাঝে মাঝে তোদের অফিসের ডিউটি হিসেবেই না করলেই নয়। তোর বাবা-কাকারাও করেছে। কিন্তু ও যে মেয়ে। ছিঃ ছিঃ। এর চেয়ে সোনাগাছিতেই ঘর নিক না। বেশি দূরও তো নয় এ বাড়ি থেকে।"

"ছিঃ কাকিমা। কী যা-তা বলছ তুমি! ওকে ধরো। আমি পরিষ্কার হয়ে আসছি। বাথরুমে যেতে যেতে বিরক্তির গলায় বলল, "ও—ও তো চাকরি করে। আমার চেয়ে বড়ো চাকরি। ছেলেদের বেলাই দোষ হয় না। আর মেয়েদের বেলাই যত দোষ।"

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখল বেসিনটা একেবারে ভরে গেছে পরীর বমিতে। নানা-রঙা জিনিস থকথকে হয়ে ভাসছে তাতে। আর প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। কাকিমা মুখ বিকৃতি করে পরীর মুখে চোখে এক হাতে জল দিচ্ছেন এবং অন্য হাতে কপালের কাছে ধরে আছেন। সন্তান তো!

পরী বলল, "মা! ও মা!"

পরীকে কোনোদিন বাবা ডাকতে শোনেনি জিষ্ণু। হয়তো বাবাকে মনে নেই বলেই ডাকে না।

কাকিমা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "তুই গিয়ে শুয়ে পড় জিষ্ণু। ভাগ্যিস আজ শ্রীমন্ত নেই আর মোক্ষদাও ডায়মন্ডহারবারে গেছে। নইলে ওদের সামনে! কী কেলেঙ্কারিটাই..."

বলেই, এবার রাগের স্বরে বললেন, "তুই বা জিষ্ণু। কী দেখছিস? তোকে যেতে বলছি, আমি এখান থেকে। আমি সব পরিষ্কার-টরিষ্কার করে তারপরে শোব।"

"ঠিক আছে।"

বলেই, জিষ্ণু নিজের ঘরে চলে গেল।

"কী দেখছিস?" কথাটা দ্ব্যর্থক কিনা ভাবছিল।

মায়ের চোখ! কিন্তু জিষ্ণুর চোখে বিস্ময় ছাড়া আর কিছু তো ছিল না।

একবার ভাবল, নিজের ঘরের বারান্দাতে গিয়ে বসে। তারপরই ভাবল, এই গ্রীষ্মে গানুবাবুদের গাছগাছালির পাতা অনেকই ঝরে গেছে। যদি অন্য কেউ দেখে ফেলে জিষ্ণুকে? যারা গাড়ির শব্দ শুনেছে? সেই সব বাঙালিদের মধ্যে কারও কারও উৎসাহ চেগে উঠতেও বা পারে। কেউ কি পরীকে নামতেও দেখেছে গাড়ি থেকে। রক-এ বসে পড়তে? নাঃ কিছুই বলা যায় না। বারান্দাতে আজ রাতে যাবে না।

টেবল-লাইটটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল জিষ্ণু।

অনেক কথা ভিড় করে এল ওর মাথাতে। পরী যখন ছোটো ছিল তখনকার কথা। তখন ওরা কাকার কোয়ার্টারে থাকত। হাওড়ার মধ্যেও অতখানি বাগানওয়ালা মস্ত কোয়ার্টার তখনও দেখা যেত না বেশি। জিষ্ণুর বাবা চিরব্রত বিয়ের তিন বছর পরই ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। ওর মাও মারা যান জন্ডিসে। ঠিক তার দু বছর বাদেই। তখন জিষ্ণুর বয়স মাত্র আড়াই। কাকা স্থিরব্রতকে জিষ্ণুর বাবাই চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে যান। কাকার চাকরি টাকরিতে মন ছিল না। নাটক করতে খুব ভালোবাসতেন। 'হংসেশ্বরী' নামের একটি দলে ভিড়ে তিনি বছরের মধ্যে তিনমাস যাত্রা করে বেড়াতেন। যে বছর বাবা মারা যান, সে বছরই কাকার বিয়েও দিয়ে যান। পিতৃমাতৃহীন জিষ্ণুকে কাকিমা হেমপ্রভা নিজের সন্তানের মতোই মানুষ করে তোলেন। পরী জিষ্ণুর চেয়ে তিন বছরের ছোটো।

চাকরিটা ওর কাকা স্থিরব্রত টিকিয়ে রাখতে পারতেন কি না সন্দেহ ছিল ঘোরতর। কিন্তু মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনিও তিনদিনের জ্বরে মারা যান। মরে গিয়ে নিজে বেঁচে যান। কিন্তু মেরে রেখে যান কাকিমাকে। তখন থেকেই এই অভিশপ্ত পরিবারের হাল ধরেন শক্ত হাতে সুন্দরী ব্যক্তিত্বসম্পন্না হেমপ্রভাই। যদিও খুব বেশিদিনের কথা নয়, তবুও একজন যুবতীর পক্ষে দুটি ছোটো ছেলেমেয়ে জিষ্ণু আর পরীকে নিজের স্বামী ও ভাসুরের সঞ্চিত অর্থের উপর ভর করে মানুষ করে তুলতে কম বেগ পেতে হয়নি কাকিমাকে। যখন ওঁরা সঞ্চয় করেছিলেন তখন হয়তো তার কিছু দাম ছিল। কিন্তু যখন শুধুমাত্র সেই সঞ্চয়েব উপরই নির্ভর করতে হয়েছিল তখন ইনফ্লেশানের কল্যাণে তার মূল্য কিছুই ছিল না আর। সেসব ভারি কষ্টের দিন গেছে। তখনই এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি, মাসে তিরিশ টাকাতে। আর ছাড়েননি। ভাড়া অবশ্য তিরিশ বছরে বেড়ে একশো তিরিশ হয়েছে বাড়িওলা এক সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ। তাকে ঠকানো কঠিন হয়নি হেমপ্রভার পক্ষে।

হেমপ্রভা নিখুঁত সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। কিন্তু যৌবনে তো কুকুরিও সুন্দরী হয়। কাকিমার মুখে একটি আলগা শ্রী ছিল যার কিছু আজকেও অবশিষ্ট আছে। তাছাড়া, আর যা ছিল তা ব্যক্তিত্ব। খুব কম নারীর মধ্যেই অমন ব্যক্তিত্ব দেখেছে জিষ্ণু।

কাকার এক বন্ধু হীরুকাকাও অনেক করেছিলেন ওদের জন্য। হীরুকাকা না থাকলে কাকিমার নিজের পক্ষেও হয়তো ভেসে যাওয়াটা ওই বয়সে; ওই অসহায়তায় পড়ে, বিচিত্র কিছুই ছিল না।

আজকে হীরুকাকার বয়স বাষট্টি। রিটায়ার করেছেন। কিন্তু আজও কাকিমা যে তাঁর উপরে অনেকখানি নির্ভর করেন তা জিষ্ণু জানে। হীরুকাকা বিয়ে করেননি। রাজা নবকৃষ্ণ লেনে নিজের ছোটো পৈতৃক বাড়িতেই থাকেন। পুষির সঙ্গে জিষ্ণুর বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের বন্দোবস্তও যা করার তা হীরুকাকাই কাকিমার সঙ্গে বসে করেছিলেন। পুষির দুর্ঘটনার খবর শোনামাত্রই দৌড়ে এসেছিলেন হাসপাতালে। তারপর মর্গে। পোস্ট-মর্টেম করার সময় সমস্তক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্মশানেও উপস্থিত ছিলেন এবং পুষির অদগ্ধ নাভি আর সাদা-সাদা হাড়ের টুকরো-টাকরা পুষির ছোটো ভাই নিমতলার পাশের গঙ্গাতে বিসর্জন দেওয়া পর্যন্ত নীরবেই

ডিয়েছিলেন জিষ্ণুর পাশে। হীরুকাকার এক ছেলেবেলার বন্ধু, পুলিশের ডি-আই-জি সাহায্য না বলে অনেকেরই মতো পুষির শরীরও পচে গলে যেত মর্গ থেকে বেরোতে বেরোতে। সেদিন রুকাকার প্রতি কৃতজ্ঞতা আরও একটি কারণে গভীরতর হয়েছিল জিষ্ণুর। শ্মশানযাত্রী পুষির াত্রীযবা কেউই শুধোননি যে, ভদ্রলোক কে? স্বল্পজন অবশ্য জানতেন যে উনি জিষ্ণুর কাকা। াপন কাকা যে নন, তাও জানতেন। আপনার চেয়েও যে অনেক বেশি আপন সেটা কিন্তু ানতেন না।

শিশুকাল থেকেই দেখে আসছে জিষ্ণু। হীরুকাকার চিরদিনই একই পোশাক। পায়ে কলেজ ্রটেব বাদু কোম্পানির পাম্পশু। আজকাল খুব কম লোকই পরেন। মিলের শস্তা ধুতি এবং লহাতা পপলিনের শার্ট। তাও একই রঙের। ফিকে হলুদ। অনেকটা বাফতা রঙের মতো দেখতে। ক পকেটে একটি পুরোনো রং-জ্বলে যাওয়া লাল-রঙা পার্কার ডুয়োফোল্ড কলম। ডান পকেটে ানেব বাটা; পেতলের। বাঘের মতো চওড়া কবজিতে পুবোনো মডেলের একটা ওমেগা ঘড়ি। টলেব ব্যান্ড লাগিয়েছিলেন সম্প্রতি। সাদা ডায়ালের নিচে বড়ো বড়ো রোম্যান অক্ষরে এক থকে বারো অবধি লেখা। চোখে গোলাকৃতি নিকেল ফ্রেমে চশমা। তাও দেখছে জিষ্ণু, জ্ঞান ওযার পর থেকেই। ক্ষয়ে গেছিল সেটা ব্যবহারে ব্যবহারে। চুল, মাঝখান দিয়ে সিঁথি করা। াজকাল পাম্পশু যেমন কেউ পরে না, চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথিও কেউ করে না। আতরও াজকাল কেউ মাখে না। কিন্তু হীরুকাকা আতরও মাখতেন। বসন্ত থেকে বর্ষা, খস্। শরৎ এবং াতে অম্বর। বর্ষায় হাতে থাকত একটি পশুপতি পাল কোম্পানির লম্বা ডাঁটির ছাতা। শীতে, শযাল-রঙা একটি র‍্যাপার চড়ত গায়ে। কোনো ব্যাপারেই কোনোরকম আধিক্য বা উচ্ছ্বাস ছিল া হীরুকাকার। চাকরি করতেন একটি সাহেব কোম্পানিতে। বড়োবাবুর। অনেক রাত অবধি াটতে হত, যতদিন কাজ করেছেন। হীরুকাকার কথা আজ গভীর রাতে বারবার মনে পড়ছে এই নোই যে, এই রাতের সংকটে হীরুকাকা পাশে থাকলে নিশ্চিন্ত হত জিষ্ণু এবং শান্ত থাকতেন াকিমাও।

কাকাকে বা বাবাকে মনেই নেই জিষ্ণুর। কিন্তু ওদেব ওই ছোটো এবং একসময়কার হায়-সম্বলহীন পরিবারে হীরুকাকাই তার এবং পরীর বাবা-কাকা-জ্যাঠার অভাব একসঙ্গে িয়েছেন। কাকিমাকেও একদিনের জন্যেও বুঝতে দেননি যে, তিনি একা।

পবী এবং জিষ্ণুর মামার বাড়ি ছিল মধ্যপ্রদেশের উমেরিয়াতে। মা ও কাকিমা দুই মেয়েই াদেব বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তখনকার দিনে এমন বড়ো একটা দেখা যেত না। সব কথা, ৈনা-পরম্পরা এখন ভাবলে মনে হয় বানানো গল্পই বুঝি। কিন্তু জিষ্ণুদেব পারিবারিক ইতিহাসের র্বলতা এবং বল দুইই গল্প হলেও সর্বাংশেই সত্যি ছিল।

হীরুকাকা কাকিমাকে ভালোবাসেন কী বাসেন না তা জানে না জিষ্ণু। তবে এটুকু এখন বোঝে য কাকিমা আর হীরুকাকার মধ্যে এক ধরনের একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই ছিল এবং আছে। কিন্তু াধুনিকার্থে 'প্রেম' বলতে যা বোঝায় ওই একটি মাত্র শব্দ দিয়ে, হীরুকাকা আর কাকিমার সম্পর্কর াখ্যা করা হয়তো যায় না।

জিষ্ণুর সঙ্গে পুষির প্রেম ছিল, যে-প্রেম পরিণতি পায় বা পেত ওদের বিয়েতে। হীরুকাকা আর াকিমার সম্পর্কটা যদি কখনও কোনো পরিণতি পায় তবে হয়তো পাবে শুধুমাত্র দুজনের মধ্যে েকজনের মৃত্যুতেই।

সমাজের হাতে, নিজেদের বিবেকের হাতে, নিজেদের সংস্কারের হাতে, নিজেদের সংযমের াতে বড়ো নির্মমভাবেই নিগৃহীত হতেন ওঁরা। হয়তো কিছুটা স্বেচ্ছা এবং কিছুটা ৈপাযহীনতাতেও। সেই নিগ্রহর স্বরূপ উপলব্ধি করার মতো গভীরতা হয়তো জিষ্ণু বা পরীদের প্রজন্মর আদৌ নেই। জানত জিষ্ণু।

মাঝে মাঝে কাকিমা আর হীরুকাকাকে খুব বোকা বলেও মনে হয় জিষ্ণুর। ওঁদের দুজনের সমস্ত সুখের মধ্যে দেয়াল হয়ে ও আর পরীই যে দাঁড়িয়েছিল সেকথাও বুঝতে পারত ও। বড়ো হওয়ার পর থেকেই ভারি অবাক লাগত এবং এখনও লাগে। হীরুকাকা আর কাকিমার সম্পর্কের প্রকৃতিটা বোঝার চেষ্টা করে জিষ্ণু বারবার। কিন্তু সম্যক বুঝতে পারে না।

দেওয়ালের দু-পাশে সারাটা জীবন দুজনে দাঁড়িয়ে থেকেও সুখের ঘরে একটুও কম পড়েনি বুঝি দুজনের কারই! শরীর ছাড়া প্রেম যে হয়, থাকতে পারে; সেকথা ভাবতে কষ্ট হয়। ভাবতে কষ্ট হলেও হয়তো তেমন প্রেম সংসারে অবশ্যই থাকে।

ভাবছিল জিষ্ণু।

কিন্তু মাঝে মাঝে অবিশ্বাস হয়। অল্প কদিন আগেই একটি পত্রিকাতে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইন্টারভ্যু দিয়েছিলেন এই বিষয়ে। উনি বলেছিলেন ঃ "যাঁরা বলেন যে শরীর ছাড়াও প্রেম হতে পারে তাঁদের তিনি 'ঘৃণা' করেন।"

পরীই দেখিয়েছিল কাগজটি জিষ্ণুকে।

জিষ্ণু বলেছিল, "পৃথিবীতে কোনো মানুষের অভিজ্ঞতাই তো সার্বিক হতে পারে না। এখানে অভিজ্ঞতামাত্রই খণ্ডিত। সর্বজ্ঞ কেউই নন। তাছাড়া, সকলের বিশ্বাসও যে একইরকম হতে হবে তারই বা মানে কি? উনি যা বিশ্বাস করেন অথবা ওঁর অভিজ্ঞতা ওঁকে যা শিখিয়েছে, উনি তাই লিখেছেন।"

পরী বলেছিল, "তা নয় বোঝা গেল। কিন্তু 'ঘৃণা' শব্দটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়? তিনি নিজে একজন কবি। শব্দ ব্যবহারের আগে তার তাৎপর্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ভাবনা-চিন্তা করেছেন।"

জিষ্ণুর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। তাই নানা এলোমেলো ভাবনা মাথাতে ভিড করে আসছিল। স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোয় বলে ঘুমের মধ্যে কোনো স্বপ্ন বা ভাবনা ওকে আর ছোঁয় না। সবকিছু থেকেই ছুটি তখন; সেই ক-ঘণ্টা। গানুবাবুদের বাড়ির পেটা ঘড়িতে আড়াইটা বাজল। জিষ্ণুর ঘর থেকে গানুবাবুদের মস্ত বাড়ি এবং বাগানটা দেখা যায়। পুরো পাড়ার এইটুকুই সম্পদ। গাছগাছালি, পাখি; সবুজ। বসন্তে ও গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া আর অমলতাসের সমারোহ, কোকিলের দাপাদাপি, বর্ষায় মহানিমগাছের ফিশফিশে বৃষ্টি ভেজা পাতার আড়ালে মাথা-বাঁচানো কাকেদের কলরোল। শীতের প্রকৃতির রুক্ষ মলিন খড়ি-ওঠা রূপ। পুরো গলিটা যেন বেঁচে আছে গানুবাবুদের বাড়ির এই বাগানটুকরই জন্যে। তারই মুখ চেয়ে। চতুর্দিকের ঘুমিয়ে পড়া ধুলো নোংরা দারিদ্র্য সাধারণ্যের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে স্নোসেম রং-করা সৌধটি চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এই গভীর রাতে ব্যতিক্রমের সংজ্ঞা হয়ে।

বিকেলের রোদ পড়লেই দেখা যায় ময়দার বস্তার মতো ফরসা গোল-গাল স্থূলকায়া মহিলারা পাছাপেড়ে শাড়ি পরে বাগানে ও মারবেলের চওড়া বারান্দায় গজেন্দ্রগমনে চলাফেরা করছেন এক-একজন তেকোণা, চারকোণা, পাঁচকোণা বাবুদের পেছনে একেকজন করে খিদমতগার ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্টিভেডরিং আর শিপচ্যান্ডেলারিং-এর পয়সায় কোনোদিনও টান পড়েনি। কখনও খিদমতগারদের হাতে রঙিন ছাতা, কখনও বেহালা, কখনও পানের বাটা কখনও বা ট্রের উপরে বসানো জিন এবং বরফ; অ্যাঙ্গোস্টার্স বিটার্স। গরমের বিকেলে পেস্তা দিয়ে বাটা সিদ্ধির, নয়তো কাগজিনেবুর পাতা-ফেলা কাঁচা-আম-পোড়া শরবৎ, শীতের সন্ধ্যায় স্কচ-হুইস্কি। সান-ডাউনার বেনারস থেকে আনানো অম্বুরি তামাকে-সাজা আলবোলা। অথবা ডানহিলের পাইপে ডানহিল টোব্যাকোর ধোঁয়া।

এখনও গানুবাবুদের বাড়িতে সবুজ যেমন অনেকই আছে, পয়সাও অনেক আছে। বুঝুন আর না বুঝুন; হয়তো কেউ কেউ বোঝেন, কিন্তু গান-বাজনারও ওঁরা মস্ত সমঝদার। এখনও প্রায়ই ম্যায়ফিল বসে। কখনও ক্লাসিক্যাল, কখনও পুরাতনী বাংলা গান। কখনও কর্তামার অনুরোধে

কীর্তন। পাড়ার লোকে বিনিপয়সাতে শোনে। অবশ্য বাইরে থেকেই। শীতের রোদ, চাঁদের আলো, বর্ষায় ভেজা স্নিগ্ধ চেকনাই-এর পুরো ভাগ পায় এ গলির প্রত্যেক বাসিন্দা গানুবাবুদের বাড়ি আর বাগানেরই কল্যাণে। ময়না, কাকাতুয়া ডাকে; 'বল গোবিন্দ, বল রাধে।' ম্যাকাও ডাকে কর্কশ স্বরে। একটা কাকাতুয়া মাঝে মাঝে বলে "কটা বাজে রে?"

তার দোসর সাড়া দেয় : "ক-টা চাই?"

তবে গানুবাবুদের বাড়ির কেউই প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন না। মনুষ্যেতর প্রাণী বলে গণ্য করেন ওঁদের বোধহয়। তাতেই সকলে খুশি। তবু তো গানুবাবুরা আছেন! ওই বাড়িটার জন্যেই এখনও নিশ্বাস ফেলা যায়; প্রশ্বাস নেওয়া যায়।

পুষি একদিন জিষ্ণুর ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বসে বলেছিল, "আমরা চাঁদনি রাতে সারারাত বসে থাকব এই বারান্দাতে। হ্যাঁ? ঘুমোব না কিন্তু।"

শ্রাবণের পর থেকে শীতের শেষ অবধি এই বারান্দার আবরু পুরো থাকে। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো অস্পষ্ট হয়ে বারান্দায় পৌঁছোয়। যেন, পরিস্রুত হয়ে। তখন বারান্দায় বসে থাকলে, পাশের বাড়ি বা গানুবাবুদের বাড়ি থেকে দেখাই যায় না কিছুমাত্র। অথচ বাইরের সবকিছুই দেখা যায় এখানে বসে।

পুষি বলেছিল, বিয়ের পরে এই বারান্দায় বসে থাকবে সারারাত।

ভীষণ রোম্যান্টিক ছিল ও।

এখন জিষ্ণুদের বাড়ির ভেতরের সব শব্দও মরে গেছে। পরীর বাথরুমের দরজা খেলার শব্দ হয়েছিল অনেকক্ষণ আগে। কিন্তু তারপর তার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটা আর হল না। কাকিমা সম্ভবত পরীর কাছেই আজ শুলেন। অনেকক্ষণ একটানা প্রলাপের মতো নিচুগলার স্বগতোক্তি ভেসে আসতে লাগল। পরীর, না কাকিমার তা বোঝা গেল না। তারপর আরও নিচু গলার স্বগতোক্তির মতো কিছু।

পরীর?

ভুল শুনল হয়তো।

তারপর পুরো বাড়ির আলো নিভে গেল। কাকিমার চাপা গলার ধমক। পরী আরেকবার বাথরুমে গেল। এবারে আলো না জ্বেলেই।

প্রত্যেক নারীর জীবনে কিছু কিছু জমি বা এলাকা থাকে, অন্য কোনো পুরুষ, সে যত কাছেরই হোক না কেন; কখনওই পৌঁছোতে পারে না। এমনকী ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে পারে না। সেখানে সেই এলাকা সম্বন্ধে। এই জন্যেই হয়তো একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে পূর্ণ-বন্ধুত্ব হওয়া অসুবিধের। মানে বন্ধুত্ব যতই নিবিড় হোক না কেন, বিবাহিত না হলে; মধ্যে এক অদৃশ্য ফাঁক থেকে যায়ই। আমাদের এদেশে অন্তত। এখনও। না থাকলে জিষ্ণুকে এখন তার নিজের অন্ধকার ঘরে শুয়ে পরী সম্বন্ধে আশঙ্কা আর অনুমানের পাশবালিশ জড়িয়ে এপাশ-ওপাশ করতে হত না।

গানুবাবুদের পেটা ঘড়িতে তিনটে বাজল। ভোজপুরি দারোয়ান হাঁকল : 'সাবধান'।

কাল অফিস আছে। একবার বাথরুমে গেল জিষ্ণু। তারপর ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আর এল না পরী তার সহোদরারই মতো। তবু পরীর বোতাম-খোলা, ব্লাউজ আর খোলা ব্রেসিয়ার ঠেলে বেরিয়ে-আসা তামারঙা বুকের কথা বারবার মনে হল জিষ্ণুর। পাকা কাবুলি আঙুরের মতো কালো বোঁটাটির কথাও। এবং মনে পড়ে যেতেই, পুষির বুকের কথাও মনে হল অবশ্য। একদিনই দেখতে দিয়েছিল পুষি। বলেছিল, আর নয় এখন। সব তোলা রইল তোমারই জন্যে। আজ বাদে কাল বিয়ে, তর সইছে না ছেলের।

বিছানা ছেড়ে উঠে টেবল-লাইটটা জ্বালল। স্লিপিং ট্যাবলেটটা খেলো। এলার্মটা সেট করল আটটাতে। সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেই এক কাপ চা খেয়েই বাথরুমে যাবে সোজা। কাগজও

পড়বে না। সাড়ে আটটার মধ্যে আফিসের গাড়ি রোজই এসে দাঁড়িয়ে থাকে। পনেরো মিনিটে পৌঁছে যাওয়া উচিত অফিসে। বেঁচে গেছে স্কুটারে চড়তে হয় না বলে। মিনিবাসেও।

গাড়িতে যখন অফিসে যাওয়া-আসা করে তখন পাশ দিয়ে যাওয়া অথবা ইদানীং উলটোদিক থেকেও আসা মিনিবাসের মধ্যে নির্বিকার মুখে যে সব যাত্রী বসে থাকেন, যাঁরা ড্রাইভার কনডাকটরদের বেনিয়ম বা অভদ্রতা করতে দেখেও কিছুমাত্রই বলেন না, তাঁদের প্রতি এক গভীর অসূয়া জন্মেছে ওর। মানুষ নিজেরটা ছাড়া বোধহয় আর কিছুই বোঝে না। যেদিন যে-মিনিতে যিনি যাতায়াত করেন সেই মিনিরই নিচে তাঁর ভাই বা স্ত্রী বা মেয়ে যেদিন চাপা পড়ে মরবে সেদিনই শুধু সৎ-নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য চেগে উঠবে। যাঁরা নির্বিকার মুখে মিনিবাসের ড্রাইভার এবং কনডাক্টরদের তাঁদের নীরবতা এবং অপ্রত্যক্ষ সায়ে যা খুশি করাতে প্রশ্রয় দেন শুধুমাত্র নিজে সময়ে অফিসে পৌঁছবার বা বাড়ি ফেরার জন্যেই তাদেরও কলার ধরে নামিয়ে এনে মিনিবাসের ড্রাইভার কনডাক্টরদেরই মতো ভালো করে মার দেওয়া উচিত।

কিছুদিন হল জিষ্ণুর কেবলই মনে হয়, মার ছাড়া এখন আর এদেশে কিছুই হবে না। সব মানুষ গন্ডারের চামড়া পরে বেড়াচ্ছে।

খিদিরপুরে যে স্মাগলড মালের দোকান আছে তাদেরই একটি দোকানে বিশেষ একজনকে দিয়ে খোঁজ করিয়েছে একটি আন-লাইসেন্সড পিস্তলের জন্যে। পয়েন্ট থ্রি-টু। এলে হাতটা ঠিক করে নিয়ে, নিজের হিসাব-কিতাব নিজেই করে নেবে। দোরে দোরে ঘুরে, সম্পাদকীয় স্তম্ভে জ্বালাময়ী কিন্তু অফলপ্রসূ চিঠি লিখে, মিনিস্টারদের পি.এ-দের, সেক্রেটারিদের, পাড়ার এম. এল এ-দের পায় তেল মাখাবার মধ্যে ও আর নেই। অনেক হয়েছে। পুষির অ্যাকসিডেন্টের পরই মোহভঙ্গ হয়ে গেছে। এই গণতন্ত্রের স্বরূপ প্রশাসনের পরিকাঠামো, পুলিশের কর্মধারা এসবের কোনো কিছুর আর বিন্দুমাত্রও ভরসা নেই জিষ্ণুর। ও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। দিনেকে দিন হচ্ছে। কোথায় গিয়ে থামবে জানা নেই। জিষ্ণু এখন সত্যিই বিশ্বাস করে যে, বন্দুকের নলই হচ্ছে সমস্ত শক্তির উৎস। বিশেষ করে যেখানে অন্য সমস্ত সভ্য উপায়ই বিফল হয়। দেখতে পাচ্ছে, চোখের সামনেই এ পথ যারাই নিচ্ছে, তারাই জিতে যাচ্ছে। এখানে সকলেই শক্তের ভক্ত নরমের যম।

গানুবাবুদের বাড়ির আলো-ছায়া ঘেরা রহস্যময় বাগানের গভীর থেকে প্যাঁচা ডাকল দুরগুম দুরগুম।

ঘুমিয়ে পড়ল জিষ্ণু।

তাড়াহুড়োতে যখন অফিসে বেরিয়েছিল তখন কাকিমা পুজোর ঘরে এবং পরীর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ঘুম তখনও ভাঙেনি বোধহয়।

অফিসে থেকে ফিরলে শ্রীমন্তদা খাবার ও চা দিল। শ্রীমন্তদা আজই দুপুরে ফিরেছে দেশ থেকে। কাকিমা ও পরী বাড়ি ছিল না। শ্রীমন্তদা বলল, "কালীবাড়িতে গেছে।'

পাড়াতে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বছর পনেরো আগে সেলস-ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের এক কর্মচারী। এখন তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। সেই মূর্তি নাকি খুবই জাগ্রত। শনি-রবিবারে বহুলোক লাইন দিয়ে মানত করেন ও পুজোও দেন। পথে যেতে

আসতে দেখে জিষ্ণু। ভালো লাগে দেখে যে, এখনও অসংখ্য মানুষ নিজেদের দুঃখ কষ্ট, দায়-দায়িত্ব প্রতিমার পায়ের কাছে কী নিশ্চিন্ত সমর্পণে নামিয়ে রেখে নিজের হালকা হতে পারেন। বিশ্বাসের ফল কি হয় না হয় তা জানার ঔৎসুক্য ওর নেই। বিশ্বাসে যে বিশ্বাস এখনও অগণ্য লোকে রাখেন এইটে জেনেই ভালো লাগে। ওঁর তবু আঁকড়ে থাকার আছে কিছু।

কাকিমা নাকি পরীকে নয়ে ওই কালীবাড়িতেই গেছেন।

চা খেতে খেতে জিষ্ণু ভাবছিল পরী নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছাতে যায়নি। কাকিমাই ধরে নিয়ে গেছেন। পরীকে জানে জিষ্ণু।

শ্রীমন্তদা চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট নিয়ে যাবার সময় বলল, 'কী হয়েছে বলো তো দাদাবাবু? মোক্ষদা বলছিল ভাইরাস জ্বর। তাই?"

"কী?"

"আমি আজ দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে দেখছি সারা বাড়ি থমথম করছে। দিদিমণি অফিসে যায়নি। এগারোটা নাগাদ একটা ফোন এল, দিদিমণি অগ্নিশর্মা হয়ে অনেক কথা বলল।"

"ফোনটা অপিস থেকে এসেছিল?"

"তাতো বলতে পারব না। মোক্ষদাদিও খুব চিন্তিত। মা কাউকেই কিছু বলেননি। আমাদের পক্ষেও জিগেস করা উচিত নয়। তবে এমনতো কখনই হয়নি। কাল কী হয়েছিল দাদাবাবু? আমবাও তো বাড়িরই লোক হয়ে গেছি এখন। তোমাদের ভালোমন্দে জড়িয়ে গেছি।"

জিষ্ণু চোখটা সরু করে মিথ্যে কথাটা বলল, "বলল কিছুতো জানি না শ্রীমন্তদা। আজ আমি উঠেছিলাম দেরি করে। এক কাপ চা খেয়েই অফিসে দৌড়েছি।"

"ও বাড়ির চাঁপা বউদি শুধোচ্ছিল আমায়, যখন বাজার থেকে ফিরছিলাম..."

"কখন?"

"এই তো একটু আগে গো।"

"কী জিজ্ঞেস করছিলেন?"

"বলছিলেন, কাল নাকি পরী দিদি অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল আর তুমিই দরজা খুলেছিল। পরীদিদি নাকি বেহুঁশ হয়ে রক-এর ওপরই বসে পড়েছিল।"

"আমি? আমি?"

লজ্জিত, মিথ্যাবাদী জিষ্ণু থতোমতো খেয়ে বলল।

"তুমি কী বললে? শ্রীমন্তদা? চাঁপা বউদিকে?"

আমি বললাম, "মেয়ে তো জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ফিরেছিল। কালকে তো প্রাণটাই যেত! কী যে ভাইরাস জ্বর এসেছে শহরে।"

"আন্দাজে ঠিকই বলেছ।"

জিষ্ণু বলল।

তারপরই কথা ঘুরিয়ে শ্রীমন্তদাকে বলল, "কাকিমার আজকে পরীকে নিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত হয়নি। এই জ্বর ভালুকের জ্বরেরই মতো। হঠাৎ আসে, আবার হঠাৎ ছেড়ে যায়। একশ পাঁচ উঠে যায় যখন আসে।"

"ছেড়ে গেলেও আবারও তো আসতে পারে?"

"তা তো পারেই।"

"ছেড়ে গেলেও শরীর তো দুর্বল করে দেয়ই।"

"তা আর করে না।"

"এই তো মোক্ষদাদি বলছিল। তার দাসুদা একদিন তাকে দেখতে এসে এই রান্নাঘরের দাওয়াতেই প্রায় টেঁসে গেছিল। ঘ্যাচা ডাক্তারকে ডেকে এনে কোনোক্রমে বাঁচায়। যাই বলো তাই

বলো, ঘ্যাচা ডাক্তার রিকশোওয়ালাদের ফুঁড়ে ফুঁড়ে সল্ট লেক-এ বাড়ি করে ফেলল বটে কিন্তু ডাক্তার সে ভালো। কোনোদিনই এলোপাতাড়ি চিকিচ্ছে সে করেনি।"

"হুঁ। তা ঠিক।"

চিন্তান্বিত গলাতে জিষ্ণু বলল।

শ্রীমন্তদার কাছে জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বলে এবং বলার পর ধরা পড়ে যাওয়াতে বড়ো ছোটো লাগছিল খুবই। ভাবছিল, মিথ্যে বলেন না, বা বলতে হয় না যাঁদের এমন মানুষ হয়তো কমই আছেন, কিন্তু পরের কারণে মিথ্যেবাদী সকলকে হতে হয় না ওর মতো। পরী অবশ্য তার পর নয়। পরীর কারণে ও একটা কেন, দশটা মিথ্যে বলতে পারে। মিথ্যে যারা হরদম বলে তাদের চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপে না। মনের পেশি একটুও শক্ত হয় না। সে সব মানুষ বোধহয় খুনও করতে পারে অন্যকে ঠান্ডা মাথায়।

"পায়জামা পাঞ্জাবি দিব তো। চান করতে যাবে না?"

"হুঁ।"

জিষ্ণু বলল।

"মা বলে গিয়েচেন যে, ওনাদের ফিরতে দেরি হলে তুমি খেয়ে নিয়ো।"

"তুমি তো আবার ঘুমের ওষুধ খাবে।"

"হুঁ।"

"কোনো চিঠি এসেছিল? ফোন?"

জিষ্ণু শুধোল।

"চিঠি একটা এসেছে বটে। বলতে ভুলে গেছিলাম। আর ফোন করেছিল। পুষিদের বাড়ি থেকে। মা ধরেছিলেন। আবার করবেন বলেছেন। আহা! পুষিমায়ের মুখটা মনে পড়লেই বুকটা হু হু করে ওঠে গো দাদাবাবু।"

"চিঠিটা আনো শ্রীমন্তদা। আমি চান করতে যাব!"

"হ্যাঁ নিয়ে আসছি।"

একটা খাম। কাঁপা-কাঁপা হাতে লেখা। হাতের লেখাটা অচেনা।

পেপার-কাটার দিয়ে কেটে চিঠিটা পড়ল জিষ্ণু।

কলিকাতা, বুধবার

বাবা জিষ্ণু
পরম কল্যাণীয়েষু,

তুমি আমার পুত্রসম তাই "বাবা" সম্বোধন করিলাম। কিছু মনে করিয়ো না।

আমাকে হয়তো তুমি চিনিবে না। আমি তারিণীবাবু। তোমাদের অতি-মন্দভাগ্য বাড়িওয়ালা। গত মাসে আমি তোমার কাকিমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বাড়ির ভাড়া যদি কমপক্ষে একশত টাকা বাড়াইয়া দেন, সেমত আরজি লইয়া। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। তাঁহাকে রাজি করাইতে পারিলাম না। বারংবার তোমার অফিসের ফোন নম্বর এবং ঠিকানা চাহিয়াও ওঁর নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না! সে কারণেই তোমাকে উত্যক্ত করিতেছি।

বাবা, আমাকে মার্জনা করিয়ো।

বর্তমানে তোমরা আমাকে মাসে একশত তিরিশ টাকা ভাড়া দাও। আমি পেনশান পাই তিনশত টাকা। গ্রাচুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ড সমস্তই পুত্র কন্যাদিগের প্রয়োজনে কম্যুট করিয়া লইয়াছিলাম।

তিরিশ টাকা ভাড়ায় আজ হইতে তিরিশ বৎসর পূর্বে এই বাটী তোমার কাকিমাকে দিয়াছিলাম, হীরালালবাবুর মধ্যস্থতায়। হীরালাল অর্থে হীরুবাবু। টাকার তো আজ কোনো মূল্যই নাই। তাহা

কাগজই হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া আর বাঁচিবার ইচ্ছা রাখি না। দেশ তো দেউলিয়াই হইয়া গেল বাবা।

তোমার কাকিমা হৈমদেবী আমাকে কোর্টে কেস করিতে বলিলেন। তাঁহার পক্ষে নাকি কিছুই করণীয় নাই। হীরুবাবুর নিকটও গিয়াছিলাম। উঁহার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাটী। আমাকে প্রায় গলাধাক্কা দিয়াই বাহির করিয়া দিলেন। অথচ উঁহার ভৃত্য গদাধরের সহিত পানের দোকানে দেখা হওয়ায় সে কহিল, হীরুবাবুর নিজবাটীর একতলার ভাড়াটিয়ার ভাড়া গত তিরিশ বছরে দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিরিশ বৎসর পূর্বে খাওয়া লইয়া একজনের মেসে থাকিবার খরচ পড়িত সাকুল্যে সাতাশ টাকা, আর তাহাই আজ সাড়ে-চারিশত টাকাতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। কতগুণ বৃদ্ধি পাইযাছে তাহা একবার বিবেচনা করিয় দেখিবে বাবা। আমাদের এজমালি বাটীর পার্শ্বস্থ মেস হইতেই আমি এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

তোমরা যে বাটীতে আছো, তাহা চার কাঠা জমির উপর আমার পিতৃদেব তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। একতলায় তিনখানি ঘর। এইরূপ মাপের ঘর আজকাল উত্তর কলিকাতার আধুনিক কোনো বাড়িতেই দেখা যাইবে না। এতদ্‌ব্যতীত রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাওয়ার ঘর, ঠাকুর ঘর, মস্ত ছাদ; ছাদে চিলেকোঠা। পশ্চাতে ছোটো একটি বাগানও আছে। সেই বাগানে আজ হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি যে রক্তকরবী, জবা, কাঁঠাল, গোলাপজাম এবং আঁশফলের গাছ নিজ হস্তে গ্লোব নার্সারি হইতে আনিয়া লাগাইয়াছিলাম তাহারা আজ মহীরুহ হইয়াছে। গাছগুলিকে একবার দেখিবার সুযোগ পর্যন্ত পাইলাম না বাবা। নিজবাটী শুধুমাত্র বাটীই নহে তাহা রক্তকণিকারই অংশ। ভাড়াটিয়ার পক্ষে সেই বোধ, যে ঠিক কেমন তাহা কল্পনা করাও সম্ভব নহে।

তোমার কাকিমা পনেরো হাজার টাকায় বাটী কিনিয়া লইতে চান কিন্তু ভাড়া, বিনা মামলায় একপয়সাও বাড়াইতে তিনি রাজি নন। হৈমদেবীর ন্যায় চেনা মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করিবার মতন মানসিকতা আমার নাই। আর্থিক অবস্থাও নাই।

আমি তোমার বাবা এবং কাকাকে চর্মচক্ষে দেখি নাই। তোমাদের অভিভাবক বলিয়া তোমার কাকিমা ও হীরুবাবুকেই আমি জানি ও চিনি। হীরুবাবু, আমাদের পাড়ার ডাক্তারখানার বহু পুরাতন কম্পাউন্ডার গোদাবাবুর বন্ধুবিশেষ। গোদাবাবুই তোমাদের সহিত হীরুবাবু মারফত আলাপ করাইয়াছিলেন। এ সংসারে আজ আমার "আপনার জন" বলিতে একটি নেড়ি কুত্তা (ভুলো) ছাড়া আর কেহই নাই। তোমাকে কয়েকবার আমি দেখিয়াছি গত পনেরো বৎসরে। কেন জানি না, মনে হইযাছে। তুমি সজ্ঞানে কাহাকেও ঠকাইতে অপারগ। আমার কাছে তুমি পুত্রবৎ। নিজ পুত্ররা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াও কেহই আমাকে দেখে না। কন্যা দেখিতে চায়, কিন্তু তাহার নিজের অবস্থাই শোচনীয়। কলিকাতাতেও থাকে না। তাই অনন্যোপায় হইয়া তোমারই নিকট আমার আর্জি জানাইলাম। যদি দয়া করিয়া উপবাসে মরিবার হাত হইতে রক্ষা করো আমাকে এবং ভুলোকেও তাহা হইলে তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

করুণাময় ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

বাত, প্রেশার ও হার্টের ঔষধ কিনিতেই মাসে প্রচুর টাকা চলিয়া যায়। নিজের খাইবার ও ভুলোকে খাওয়াইবার নিমিত্ত আর কিছুই থাকে না। বৃদ্ধ হইলে মানুষে বাচাল হইয়া পড়ে। আমাকে ক্ষমা করিয়ো। বাঁচিলে তোমার দয়াতেই বাঁচিব।

ইতি—

আশীর্বাদক, তারিণীকুমার চক্রবর্তী।

পুনশ্চ : তোমরা যে বাটীতে আছো সে বাটীর দলিল আমার নিকটই আছে। তুমি যদি ওই বাটী যথার্থই কিনিতে চাও, ভাড়া বাড়াইতে যদি তোমার প্রকৃতই অসুবিধা থাকে; তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তাহা লইয়া যাইও। তুমি যাহা দিবে তাহাই ন্যায্য বলিয়া জানিব এবং গ্রহণ করিব।

দলিল দস্তাবেজে যেখানে যেখানে সহি করিতে বলিবে সেখানে সহি করিয়া দিব।

বাবা, জিষ্ণু, জীবনে বহির্জগতের মানুষকে, নিজের স্ত্রীকে, নিজের সন্তানদের বিশ্বাস করিয়া বড়ো মর্মান্তিকভাবে ঠকিয়াছি। তাহাদের নিমিত্তই আজ আমি পথের ভিখারি। কিন্তু তবুও বিশ্বাস করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি নাই। তোমার কাকিমাকে যখন প্রথম দেখি এবং গোদা-হীরুবাবুর নিকট হইতে তাঁহার অসহায়তার কথা সব শুনি, তোমার পিতামাতার দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথাও, তখন মন বড়োই দ্রব হইয়াছিল। তাহা না হইলে সে যুগেও ওই বাটীর ভাড়া মাত্র তিরিশ টাকা কখনওই হইত না। যাউক। তাহার নিমিত্ত খেদ নাই। সংসারে কিছু মানুষ ঠকিতে আসে, আর কিছু মানুষ ঠকাইতে। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যে ঠকিল, তাহার কিছুমাত্রই যায় আসে না। যে চিরদিনই ঠকিয়াছে তাহার ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রকৃত, না মিথ্যা; তাহা যাচাই করিবার নিমিত্তই বোধহয় ঈশ্বর আমার ন্যায় বিশ্বাসী মানুষকেও এমত পরীক্ষায় ফেলিয়া যাচাই করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহারই শরণাগত। শেষ বয়সে মিথ্যা বা তঞ্চকতার আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চাহি না। তাহা হইতে অনাহারে আমার মৃত্যুও শ্রেয়।

তোমার কাকিমা হৈমদেবীকে আমার ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানাইয়ো। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। তোমার খুল্লতাতজাতা ভগিনীকেও জানাইয়ো।

আমি গোদা কম্পাউন্ডারের নিকট হইতে জানিলাম যে তুমি অত্যন্তই ব্যস্ত থাকো এবং অফিসের কাজে প্রায়ই বিলাত, আমেরিকা যাইতে হয়। যদি সময় সুযোগ করিয়া আমার এই নিবেদন দয়া করিয়া বিবেচনা করিয়া আমাকে জানাও, তাহা হইলে তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

ইতি—

আঃ তারিণীকুমার চক্রবর্তী।

বাথরুমে যাবে জিষ্ণু এবারে।

তারিণীবাবুর চিঠিটা পড়ে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল। গলির মধ্যে হলেও এত বড়ো বাড়ির ভাড়া উত্তর কলকাতাতেও আজকে হাজার দুই হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল। কাকিমা যখন ওদের মানুষ করে তুলেছিলেন তখন তাঁর হিসেবি হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিল কিন্তু এখন জিষ্ণু যখন আশাতীত ভালো রোজগার করে এবং পরী করে তার চেয়েও বেশি, তার উপরে বাবা ও কাকার এফ. ডি. কোম্পানির কাগজও নেই নেই করে কিছু আছে তখনও, কাকিমার এইরকম মানসিকতা ঠিক বোধগম্য হয় না জিষ্ণুর। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে জিষ্ণু অনেকেরই মধ্যে যে প্রথম জীবনে যেসব মানুষকে আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বা অর্থের অভাবে নানারকম অপমান অসম্মানের শরিক হতে হয় তাঁরাই পরে লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অনুদার হয়ে ওঠেন। এটা কেন হয় বুঝতে পারে না জিষ্ণু। ওর মনে হয়। এর ঠিক উলটোটাই তো হওয়া উচিত ছিল।

বাথরুমই যা কম এ বাড়িতে। তখনকার দিনে অ্যাটাচড-বাথ অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হত তাই প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম নেই। একতলায় একটি আছে। সেখানে শ্রীমন্তদা ও মোক্ষদাদি যান। দোতলার একটি বাথরুম ব্যবহার করে জিষ্ণু আর অন্যটি পরী ও কাকিমা।

বাথরুমে যাবে, ঠিক সেই সময়ই ফোনটা বাজল।

শ্রীমন্তদা ধরে বলল, "এট্টু ধরুন দয়া করে। উনি স্নানে যাচ্ছিলেন। গেলেন কী না দেখি।"

রিসিভার টেবিলে নামিয়ে রাখবার আগেই জিষ্ণু গিয়ে ফোনটা ধরল।

ঘড়িতে দেখল ঠিক ন-টা। এবারে সময়ের ব্যাপারে আর ভুল করেনি পিকলু।

পিকলু বলল, "কী রে? খুব ক্লান্ত? চান তবে সেরেই নে। আমি পরে ফোন করব। ফোন করার দরকারই বা কি? কাল তোর অফিসে কখন যাব বল?"

"কাল আসিস না।"

"কবে? কবে যাব?"

"আমার অসুবিধা আছে।"

"কী? ও সপ্তাহে?"

"না।"

"তবে?"

"তোকে টাকাটা দিতে পারব না আমি পিকলু। এর আগে কোনোদিনও তো 'না' করিনি। কোনোদিনও না। তুই না চাইতেই জোর করে দিয়েছি কতবার। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে করিস। মনে পড়বে। আর চাস না। আমি পারব না।"

"কী বলছিস তুই জিষ্ণু। আমি যে ডুবে যাব রে! কাবলিওলার কাছ থেকে ধার করেছি।"

"তুই মিথ্যা কথা বলছিস আমাকে। পিকলু, তুই আমাকেও মিথ্যে বলছিস।"

"বাই গড বলছি। আগে যে সব টাকা দিয়েছিস তা ফেরত দিতে পারিনি বলে তোর রাগ হয়েছে জিষ্ণু? দুঃখ পেয়েছিস?"

"কীসের দুঃখ?"

সিঁড়ির মুখের ল্যান্ডিং-এ পরী এসে দাঁড়াল এমন সময়। ফোনে কথা বলতে বলতে কখন যে বেল বাজল, কখন শ্রীমন্তদা গিয়ে দরজা খুলল, খেয়ালই করেনি জিষ্ণু।

পরী একটি উজ্জ্বল তুঁতে-রঙা শাড়ি পরেছে। সাদা ব্লাউজ। দু বিনুনি করেছে। ঝলমল করছে পুরো ল্যান্ডিংটা। পরী, পুষির চেয়ে অনেকই বেশি সুন্দরী। পুষির সৌন্দর্যে স্নিগ্ধতা ছিল, পরীর সৌন্দর্যে তীব্র এক জ্বালা আছে। গা জ্বলতে লাগল জিষ্ণুর। পরী ওর খুড়তুতো বোন না হলে, কেউ না হলে খুব ভালো হত। এ এক অন্য জ্বালা।

"কীসের দুঃখ? জিষ্ণু?"

পিকলু আবার বলল।

"কিসের দুঃখ যদি বুঝতেই পারতিস তবে তুই আজও মানুষই থাকতিস। প্লিজ পিকলু। রাগ করিস না। তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই রে। কোনো বন্ধু ছিল না। নেই।"

"খুসিও ঠিক নেই কথাই বলে। বলে, আমাদের থাকবার মধ্যে আপনজন একজনই আছে। সে জিষ্ণু।"

জিষ্ণু চুপ করে থাকল। উত্তর দিল না পিকলুর কথার।

পিকলু বলল, "ছেড়ে দিচ্ছি আজকে। তোর রাগ হয়েছে পরে ফোন করে একদিন যাব। বাড়িতেই যাব। তাড়িয়ে দিবি না তো? আর সেদিন টাকাটা রেডি করে রাখিস। আমার দরকারটা মিথ্যে নয়। বিশ্বাস করিস।"

"না। তুই আর আসিস না আমার কাছে। তোকে আমি বিশ্বাস করি না।"

"তবে পরীর কাছেই আসব। টাকাটার খুব প্রয়োজন আমার।"

"পরীর কাছে কেন আসতে যাবি? প্রয়োজন থাকলেই যে সেই প্রয়োজন মিটবে তার তো কোনো মানে নেই। আমারও তো অনেক কিছুর প্রয়োজন। মেটাতে পারিস তুই?"

"আমার সাধ্য কতটুকু যে তা দিয়ে তোর প্রয়োজন মেটাব? তবে আমি যাব। সত্যিই দরকার আছে পরীর সঙ্গে।"

"কী দরকার? ওর উপরেও কি দাবি আছে তোর? আমার উপরে যেমন আছে? আমার কাজিন বলেই কি?"

"না। দরকার আছে। বললামই তো।"

"তোর দরকার ও মেটাতে যাবে কেন?"

"হয়তো মেটাবে। সে-ও বুঝবে। তুই যদি না দিস তো ও দেবে। ও তো রোজগার করে।"

"এলে, ফোন করে আসিস।"

"সে আমি বুঝব। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না যা দেখছি।"

"মানে?"

"বললামই তো সে পরী বুঝবে। বললেই বুঝবে। পরী বাড়িতে আছে? ফোনটা দে না!"

"না।"

"ঠিক আছে। যেদিন যাবও, টাকাটা রেডি রাখিস।"

কট করে লাইনটা কেটে দিল জিষ্ণু।

পরী বলল, "কে জিষ্ণু?"

"পিকলু।"

"কী বলছিল আমার সম্বন্ধে?"

"ও বলল, বাড়ি আসব। তোমার সঙ্গে কথা আছে। তোমার উপরেও ওর দাবি আছে। আমার কাছে টাকা চেয়েছিল। দিইনি।"

"তো?"

"জানি না। দেব না বলতেই বলল, তোমার সঙ্গে দরকার আছে।"

"ওঃ।" পরী বলল।

"ব্ল্যাকমেইল করতে চায় বোধহয়। তোমার সঙ্গে...?"

জিষ্ণু বুঝতে পারল, ল্যান্ডিং-এর সিঁড়ির সামনের অত আলোর মধ্যে দাঁড়িয়েও পরীর মুখটা কালো হয়ে গেল।

পরী বলল, "তোমার বন্ধুটি ভালো নয়। তোমাকে অনেকদিনই বলেছি জিষ্ণু।"

"জানি। মানে, এখন জানি।"

পরী নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। পরী যদি জিষ্ণুর খুড়তুতো বোন, আপন কাকার মেয়ে, পরীকে দেখলেই ওর শরীরের ভিতরে কত কী ঘটে যায়।

ও জানে, এ খুব অন্যায়, তবু...।

পেছন থেকে ডেকে বলল, "কাকিমা কোথায় গেলেন কালীবাড়ি থেকে?"

"কালীবাড়ি?"

"হ্যাঁ। শ্রীমন্তদা যে বলল তোমরা কালীবাড়ি গেছিলে?"

"না তো। কে বলেছে? মা?"

"হ্যাঁ।"

"মায়ের আরেকটা মিথ্যে। আমরা নার্সিং-হোমে গেছিলাম।"

"কাকে দেখতে?"

"কাউকে দেখতে নয়।"

"তাহলে—"

"আমাকে দেখাতে।"

"তোমাকে?"

"হ্যাঁ। আমাকে।"

"তোমাকে? কেন? তোমার কী হয়েছে?"

"আমাকে দেখাতে।"

আবারও বলল পরী।

বলে, পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জিষ্ণুর দিকে।

এরপর আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না জিষ্ণু। বুঝল।

"কাকিমা?"

"মা হীরুকাকার সঙ্গে একটু হেঁটে ফিরবে। পৌঁছে দেবে হীরুকাকা।"

জিষ্ণু আর কথা বাড়াল না।

বাথরুমে নগ্ন হয়ে শাওয়ারের ঠান্ডা জলের ধারার নিচে দাঁড়াতেই কাল রাতের এক ঝলক দেখা পরীর ঠেলে বেরোন উজ্জ্বল তামা রঙের স্তন এবং পাকা কাবুলি আঙুরের মতো বোঁটাটি ভেসে উঠল। চোখ বুজে ফেলল জিষ্ণু। ভারী খারাপ ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে জিষ্ণু। পুষির মৃত্যুর পর থেকেই ও কেমন যেন হয়ে গেছে। ও এখন যাকে-তাকে খুন করতে পারে। রেপ করতে পারে নিজের খুড়তুতো বোনকেও। সারাদিন এয়ারকন্ডিশানড ঘরে থেকে অফিস থেকে বেরিয়েই সারা শরীর যেন জ্বলতে থাকে। মিনিবাসের ড্রাইভারটাকে খুন না করতে পারলে ওর শরীর ঠান্ডা হবে না।

কে জানে! সত্যি সত্যি যদি খুন করতে পারে তাহলে এই অস্বাভাবিক তাপ আরও বেড়ে যাবে হয়তো। নিজেকে বুঝতে পারে না জিষ্ণু। শ্রীমন্তদার ভাষায় ও-ও এখন এক ভাইরাস জ্বরে ভুগছে।

ভীষণই অসুখ ওর।

মে মাসের মাঝামাঝি হতে চলল। এখনও এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। কয়েকদিন ধবে বিহারের 'লু'-এর মতো হাওয়া চলেছে কলকাতায়। তার উপরে লোডশেডিং হযে গেছে প্রায় আধঘণ্টা হল।

তারিণীবাবুর ভাগে এই আদি বাড়ির যে অংশটা পড়েছে তা একটেবে এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট। সাকুল্যে দেড়খানা ঘর। একফালি বারান্দা অবশ্য আছে। এ বাড়ির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম জীবন বয়ে যায়। কোনো অংশর বাইরে স্নোসেম রং করা। কোনো অংশের জানালার লিনটেল-এ এযারকন্ডিশনার চাপা গলায গোঁ গোঁ কবে। কোনো অংশে আবার দিনই যেন আব চলে না। তাবিণীবাবুর চেয়েও সেইসব শরিকদের অবস্থা খারাপ।

মেজো শরিকের পাঁচুবাবু কড়াইশুঁটির চপ আব বেগুনির দোকান দিয়ে বেশ টুপাইস করেছেন। উপবন্ত করপোরেশনে একটা চাকরিও করেন। চাকরিব মাইনেটা বিনা খাটুনিতেই জোটে আর দোকানের রোজগারের গ্রস-কামাইই বলতে গেলে নিট মুনাফা। নিঃসন্তান পাঁচুবাবুব টাকার বড়ো গবম। তাঁর গিন্নি দিনরাত ভিডিয়ো দেখেন আর পটাটো চিপস খান। ইনকামট্যাক্স-ফ্যাক্সের কোনো বালাই নেই। তিনি মাঝে খুবই গরম হয়ে বলেছিলেন যে পুরো বাড়ি একরঙা করে দেবেন। সব জানালা দরজারও এক রং করবেন। যাতে বাইরে থেকে কোনো শালায় বুঝতে পর্যন্ত না পারে যে বাড়িটা আর তাদের বাসিন্দাদেব মধ্যে এত এবং এত রকমের তফাত। কিন্তু এই ঔদার্য অন্যরা তাঁকে চরিতার্থ করতে দেননি। ন'শরিকের অবস্থা খারাপ নয়। কিন্তু তিনি পকেটে হাত ঢোকান না নিজের প্রয়োজন ছাড়া। কিন্তু তাতেও সব শরিক রাজি হয়নি। মেজো শরিকের বউ-এর সঙ্গে সেজ শরিকের বউ-এর কথা তো নেইই, মুখ দেখাদেখিও পর্যন্ত নেই। ছোটো শরিক বলেছিলেন যে, চিড যে লেগেছে এ পরিবারে তা গোপন নেই। দেওয়াল ফাটিয়ে দিকে দিকে বট-অশ্বত্থের চারাদের পাতায় পাতায় সেই চিড়েরই পতাকা উডছে। তাকে মেজোবাবুর পয়সা আছে বলেই যে

ধামাচাপা দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এক শরিকে যখন এয়ারকন্ডিশানের হাওয়া খান অন্য শরিকের মেয়ে-বউ তখন দেওয়ালে ঘুঁটে দেয়, এটাই যখন "ফ্যাক্টো", তখন "অ্যাক্টো" করবার দরকার কী? ঢের হয়েছে। আব 'থ্যাটার' ভালো লাগে না।

অনেকই ভেবেটেবে দেখেছেন তারিণীবাবু যে বড়োলোক আত্মীয়ের মতো আপদ বাঙালির আর দুটি নেই। গরিব আত্মীয়ের মতোও নেই। তবে বাঙালি হয়ে জন্মালে, গরিব থাকাই শ্রেয়। যারা বড়োলোক, তাদের পা নাচাতে নাচাতে মনের সুখে শালাবাঞ্চোত বলে গালাগালি দেওয়া যায়।

আজ এই এজমালি বাড়িতে এমনিতেই উত্তেজনা প্রবল। কারণ ন'শরিকের বড়ো ছেলে আজ বিলেতে যাচ্ছে। না না, কিছু পড়তে-টড়তে নয়। নিছক দেশ দেখতে, ন্যাংটো মেম দেখতে, ফুর্তি মারতে। সেইটেও তো অ্যাচিভমেন্ট! সারা জীবনে পোস্টিং-এর জায়গাগুলি ছাড়া আর কোথাওই যেতে পারেননি তারিণীবাবু। যাওয়া হয়ে ওঠেনি। জীবনটা যে কী করে এমন শেষ-অধ্যায়ে পৌঁছে গেল তা ভেবে নিজেই অবাক হয়ে যান। একবার গয়া গিয়েছিলেন শুধু। তাও কর্তব্য করতে। মা-বাবার পিণ্ডি দিতে।

তক্তপোশে সতরঞ্চির উপর খালি গায়ে শুয়ে হাতপাখার বাতাস করতে করতে এই সব ভাবছিলেন তারিণীবাবু। তাও তো বিলেত গেল নিজের ছেলে ছাড়াও গুষ্টির কেউ! এতদিনে একজন বি. জি. এস। মানে বিলেত গিয়ে সাহেব। গর্বই হচ্ছে একরকম। ওঁর চক্রবর্তী গুষ্টির কারও কিছু ভালো হলেই তারিণীবাবু কেবল একটি কথাই বলেন, বাঃ। ঈশ্বরের কাছে বলেন মনে মনে, সকলেরই ভালো হোক। সকলেই সুখে থাকুক।

খাটের তলায় শুয়ে থাকা নেড়ি-কুত্তা ভুলো খুব জোরে একটা প্রশ্বাস ফেলে। যেন সায় দেয় তারিণীবাবুর কথায়! ওর নাকের ডগায় বসে-থাকা একটা কাঁটালে মাছি ফুৎকারে উড়ে যায়। আবার ফিরে এসে নাকে বসে।

সকলেই ভালো থাকুক, ভালো খাক; ভালো পরুক। সকলের ছেলেমেয়েই মানুষ হোক। এ ছাড়া চাইবার আর কিছুই নেই তাঁর। একটা ব্যাপারে যে দুঃখ হয় না তা নয়। উনি চাকরিতে যখন ছিলেন সে জামশেদপুর-গুয়া-খরশুয়া লাইনেই হোক কী গোমো-ডালটনগঞ্জ লাইনেই হোক কোনো নিকট এবং দূরের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে তাঁর কাছে শীতের ছুটি বা গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাননি এমন বড়ো-একটা হয়নি। তখন যতটুকু পেরেছেন যত্নআত্তি করেছেন তাঁদের। মাছ-মাংস তখন খুবই শস্তা ছিল। যদিও মাছ পাওয়া যেত না সব জায়গায়। দুধও শস্তা ছিল। টাটকা তরিতরকারি। আত্মীয়রা এককে দলে দশ-বারোজন করেও আসতেন। বেশি ছাড়া কম নয়। পাহাড়-জঙ্গল দেখে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা। সকালে বিকেলে দল বেঁধে হেঁটে বেরিয়েছেন। খিদে হয়েছে খুব। কলকাতায় যা না খান তার তিনগুণ খেয়েছেন তৃপ্তি করে। তৃপ্তি তারিণীবাবুও কম পাননি খাইয়ে। জল সব জায়গারই ভালো ছিল। বিকেলের মধ্যেই সব খাবার হজম হয়ে গেছে। রাতে আবার সবাই মজা করে খেয়েছেন।

এইসব পুরোনো কথা। স্মৃতি। ভাবতেই ভালো লাগে। যাঁরা যেতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ আর নেই। অনেকে আবার আছেনও। কিন্তু তারিণীবাবু যখন হাত পুড়িয়ে স্টোভে সেদ্ধ ভাত চাপিয়ে একচড়া খান তখন একদিনও কেউই শুধোননি তাঁর সেদ্ধ দেবার মতো তরকারিটুকু আছে কি নেই? সংসারের এই অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য অকৃতজ্ঞতা এবং কৃতঘ্নতা তারিণীবাবুকে বড়োই ব্যথিত করে। কেন যে এমন হয়, তা বুঝে উঠতে পারেন না। অবশ্য সবাই এক রকম, এ কথা বললে মিথ্যা বলা হয়। তাঁর খোঁজ করে ছোটোর ছোটো মেয়ে মামণি। ভারি ভালো মেয়েটা। অথচ এই ছোটো, ছোটো বউমা এবং তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যেই কিছুমাত্র করেননি তিনি। মানে, সুযোগ পাননি। কিন্তু স্বভাবে মামণি একেবারেই মা-লক্ষ্মী। পড়াশুনাতে ও গানেও খুবই ভালো

সে। যে ঘরে যাবে সে ঘরই আলো করবে রূপে গুণে সেবা যত্নে। স্কুলফাইন্যাল অবধি পড়েছে ও। তারপর আর পয়সার অভাবে পড়া হয়নি। তিনটি বিষয়ে লেটার পেয়েছিল। স্কলারশিপও পেয়েছিল কিন্তু কলেজের বিলাসিতা করার সামর্থ্য ছিল না। যাতায়াতের ভাড়া, টিফিন, বই, এসব জোগাবার কেউই ছিল না। তারিণীবাবুর জ্বর হলে মামণিই এসে সেবা-যত্ন করে। বার্লি জ্বাল দিয়ে আনে, থিন অ্যারারুট বিস্কুট। অথচ মামণির নিজের আর তার মায়ের যে দিন চলে কী করে তা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন।

কাঠের তক্তপোশের উপর তেলচিটে একটি পাতলা শতরঞ্চি। তারই উপরে তারিণীবাবু পাশ ফিরে শুলেন। ঘামে গা জবজব করছিল দুপুর বেলায়। এখন হাওয়াটা শুকিয়ে গিয়ে পাক খাচ্ছে ঘূর্ণির মতো। ডালটনগঞ্জে বা চিপাদোহরে যেমন হত। কলকাতাটা কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। হাওয়াটা বেমক্কা উড়োচ্ছে কলকাতার ধুলোবালি। শরিকের বাড়ির পাঁউরুটির মোড়ক। পায়রার পালক। কাকের গু। ঈর্ষা আর মনস্তাপ। ঠিক এই রকম গরম হাওয়া বইত মহুয়ামিলন স্টেশানে। তিন মাস সেখানে পোস্টেড ছিলেন তিনি। ঝরঝর করে শুকনো শালপাতা ঝড়ের আর ঝরনার মতো বয়ে যেত পাথরে মাটিতে। ভেসে আসত দূর পাহাড় থেকে মহুয়া করৌঞ্জ আর আরও কত নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ। সুন্দরী আদিবাসী মেয়েরা রঙিন শাড়ি পরে কলকল করতে করতে চলে যেত। গিন্নি, তারিণীবাবুর অপলক দৃষ্টি দেখে বলতেন, টিকিট তো ওদের কারওই চেক করো না। বদলে দেয় কী ওরা?

তারিণীবাবু খুব জোরে হেসে উঠতেন। বলতেন : ওগো, ওদের একটি হাসির দামে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর টিকিট পাওয়া যায়।

তবে সে সময়ে এই দেশ তো আর এই পরিমাণ স্বাধীন হয়নি। কিছু কড়াকড়ি, চক্ষুলজ্জাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা তখনও ছিল। টিকিট চাইতে হত নিশ্চয়ই কারও কারও কাছ থেকে। যারা ডেইলি-প্যাসেঞ্জার, তারা কলাটা, মুলোটা, একজোড়া ডিম, দূর থেকে আনা লেবু বা নারকোল, কখনও বা হাঁসটা-মুরগিটাও দিয়ে যেত। হাসি তো দিতই। উপরি।

কোনোই খেদ নেই তারিণীবাবুর। এমনই অলস নিদ্রাহীন প্রহরে পুরোনো সেসব দিনের কথা ভেবেই কখন যে দিন শেষ হয়ে আসে খেয়ালই থাকে না আর আজকাল।

তারিণীবাবুর দুই ছেলে পরেশ আর সুরেশ মানুষ হয়েছে। কেউকেটা হয়েছে। সুখে আছে বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে। এর চেয়ে আনন্দর আর কী হতে পারে। ন-শরিকের ওখান থেকে পরেশের ঠিকানা চাইতে এয়েছিল। ঠিকানা, ফোন নাম্বার সবই দিয়ে দিয়েছেন। পরেশের মেমসাহেব বউ ছিল। ফোটো পাঠায় ওরা বছর বছর। নতুন নতুন বাড়ির, গাড়ির। বাড়ি-গাড়ি পালটানোটা ওদের একটা ফ্যাশান। বউও পালটায় আবার কেউ কেউ বছর বছর। শুনেছেন। পরেশ পালটেছে দুবার। এখন তৃতীয় বউ। এ বউ পাঞ্জাবি। তার বাপ সেদিন মারা গেল টেররিস্টের গুলিতে অমৃতসরে। তারিণীবাবু একটি ফরেন-লেটার জোগাড় করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। কলকাতার নকশাল আন্দোলনের কথা লিখেছেন।

ভুলো হঠাৎ ভুক ভুক করে ডেকে বাইরের ঘরে দৌড়ে গেল।

কড়া নাড়ল কে যেন।

এই অসময়ে মানে সাড়ে তিনটের সময়ে কে এল?

মামণি অবশ্য আসে মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে। তবে সে এলে, ভেতরের দরজা দিয়েই এসে টোকা মারে। তাতেই অন্য শরিকেরা সকলে বলেন তারিণী বুড়োর বাড়িখানা হাতিয়ে নেওয়ার জন্যেই নাকি এতো ভালোবাসার "শো"। মামণির "শো"।

বালিশের নিচ থেকে হাতঘড়িটি তুলে দেখলেন সাড়ে তিনটে। কী করে সময় যায়।

কড়াটা আবারও নাড়ল কেউ।

ভুলো ভুক ভুক করে পেছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের দু পায়ে দরজায় খচখচ আওয়াজ করতে লাগল।

লুঙিটা ভালো করে বেঁধে নিয়ে তারিণীবাবু দেওয়ালে ঝুলিয়ে-রাখা গেঞ্জিটা গলালেন পাঁজর-সার শরীরে। তারপর হাতঘড়িটা পরে খড়ম পায়ে গলিয়ে এগোলেন দরজা খোলার জন্যে। এগোতে গিয়েই আবার পেছিয়ে এসে দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাতে চুলটা ঠিক করে নিলেন। টাকের উপর একত্রিশ গাছি চুল আছে এখন কুল্লে। এবং মাত্র একত্রিশ গাছি আছে বলেই ভারী মায়া পড়ে গেছে ওদের উপর। পনেরো দিন আগেও ছিল তেত্রিশ গাছি। চিরুনিটা একবার বুলিয়ে নিলেন টাকের উপর সস্নেহে।

আবার কড়া নাড়ল কে যেন। এবার অধৈর্য হাতে।

দরজা খুলতেই তারিণীবাবু অবাক হলেন।

বললেন, "এ কী। হৈম দেবী যে! এ অসময়ে? কী সৌভাগ্য আমার। এ জীর্ণ দীন বাসে?"

হৈমপ্রভা তারিণীবাবুকে যাত্রার ডায়ালগে জল ঢেলে দিয়ে বললেন, "ভেতরে আসতে পারি কি?"

"আসুন, আসুন। নিশ্চযই।"

বলে, আপ্যায়ন করে তাঁকে নিয়ে দেড়খানি ঘরের আধখানিতে বসালেন। একটি নেয়ারের ইজিচেয়ার। তাতে নীল-রঙা চাদর পাতা। সেখানেই তারিণীবাবুর বিশ্রাম। মধ্যে একটি ছোটো টেবল, ল্যাজারার্স কোম্পানির বানানো। ইটালিয়ান মারবেল-এর টপ। এই টেবলে তারিণীবাবুর বাবা-কাকারা তাস খেলতেন বসে। এখন তার দু-দিকে দুটি কাঁঠাল কাঠের চেয়ার। মেহগনির চেয়ারগুলো সব ন-বাবু নিয়ে নিয়েছেন। শ্যালদার রথের মেলা থেকে কেনা এই কাঁঠাল কাঠের চেয়ার দুটি। দেওয়ালে লাল কাপড়ের উপর নীল সুতো দিয়ে কাজ করা তারিণীবাবুর স্ত্রীর দুটি সূচিকর্ম। "গড ইজ গুড"। এবং "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।" বিয়ের পরে পরেই তোলা সুরেন বাঁড়ুজ্জে রোডের "বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড" ফোটোগ্রাফারের দোকানের একটি ফোটো জোড়ে। বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের পাশেই ছিল হোয়াইটওয়ে অ্যান্ড লাডলোর দোকান। সে কী দোকান। ইস্টার্ন রেল কোম্পানির বড়ো সাহেব সেই দোকান থেকে পাইপ আর টোব্যাকো কিনেছিলেন একদিন। বড়ো সাহেবের পি.এ-র কাছ থেকে শুনেছিলেন তারিণীবাবু। দোকানময় শুধু লাল মুখ, সাঁতরাগাছির ওলের মতো শরীর। গাঁক-গাঁক করা ইংরিজি। ভয় লাগত রীতিমতো।

"আপনার সঙ্গে কথা ছিল।"

হেমপ্রভা বললেন।

"বলুন, হৈম দেবী।"

"এই চিঠি কি আপনিই লিখেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"কত বড়ো সাহস আপনার?"

"আজ্ঞে?"

"আপনার সাহস তো কম নয়।"

"আজ্ঞে, তা নয়। এক সেকেন্ড! চশমাটা নিয়ে আসি? আপনাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না হৈম দেবী। আমার আবার বাইফোকাল তো। কাছে দূরে কোনোটাই ভালো করে দে..."

"আমি স্বয়ম্বর সভা করতে আসিনি তারিণীবাবু। অত ভালো করে আমাকে না দেখলেও চলবে।"

"আঁজ্ঞে!"

"দলিলটা কোথায়?"

"কিসের দলিল হৈম দেবী?"

"ন্যাকামি করবেন না। এই চিঠিতে জিষ্ণুকে আপনি যে দলিলের কথা লিখেছিলেন।"

"ও। সে দলিল আছে।"

"কোথায়? এক্ষুনি আমাকে এনে দিন।"

"আঁজ্ঞে, আমার কাছে মানে, আমার বন্ধু কাবুল মুখুজ্জের কাছে আছে।"

"তাঁর কাছে কেন?"

"আজ্ঞে সেই যে আমার সলিসিটর।"

হেসে ফেললেন হৈমপ্রভা।

বললেন, "এত বড়ো এস্টেট আপনার। সলিসিটর নইলে কি চলে?"

"আজ্ঞে!"

কথার খোঁচাটা না বুঝেই বললেন, তারিণীবাবু।

"দলিলটা আনিয়ে রাখবেন। আমি একটা দলিল নিয়ে আসব। সেটিতে সই করে দেবেন। তারপর সলিসিটররাই করবেন যা করবার।"

"বাড়িটা তাহলে আপনি কিনবেন?"

"হ্যাঁ। কুড়ি হাজারই পাবেন। পুরো কুড়ি। একসঙ্গে অত টাকা কখনও দেখেছেন তারিণীবাবু?"

"কুড়িতে তো আমি দেব না।"

তারিণীবাবু, নিজের গেঞ্জির তলাটা ধরে টান মেরে বাড়তি সাহস সঞ্চয় করে বললেন।

"সে কী? এতো বড়ো আশ্চর্য কথা। সেদিন আপনিই না বললেন তারিণীবাবু যে, বাড়ি বিক্রি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন শুধু আপনার পেনশানকেই সাপ্লিমেন্ট করার জন্যে?"

"তাই তো ছেলো। মানে আইডিয়া তখন সেরকমই ছেলো। কিন্তু একটি বাড়তি প্রয়োজন জুটেছে। আমার মামণির বিয়ে দেওয়ার টাকা চাই।"

"কে মামণি?"

"সে আমার রূপে-গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সরস্বতী অথচ টাকার জন্যে মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না।"

"অ। তার কত টাকা হলে আপনি বাড়িটা আমায় দেবেন?"

"ঠিক করিনি। মামণির মায়ের সঙ্গে বসে পরামর্শ করতে হবে।"

"কবে জানতে পারব?"

"কী কী ওঁর দেওয়ার ইচ্ছে। অমন মেয়েকে তো আর ন্যাংটোপোঁদে চেলি পরিয়ে বে' দেওয়া যায় না। মেয়ের মতো মেয়ে যে সে! সাতটা দিন সময় দিন। ভেবে দেখি।"

তারিণীবাবু বললেন।

"দেব।"

হৈমপ্রভা বললেন। ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে।

"আপনি আমাকে চিঠি না লিখে জিষ্ণুকে চিঠি লিখেছিলেন কেন?"

"আমি মানুষটা বুঝি খারাপ?"

"আমি তো তা বলিনি।"

"ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে যা আলোচনার তা শুধুমাত্র আমার সঙ্গেই করবেন এবং জিষ্ণু যদি আপনার কাছে আসে তাহলে ঘুণাক্ষরেও জানাবেন না যে আমি নিজে আপনার কাছে এসেছিলাম। এই চিঠিও আমি জিষ্ণুর ড্রয়ারেই রেখে দেব। যেখানে পেয়েছিলাম।"

"আপনি জিষ্ণুকে ভয় পান?"

"আমি সকলকেই ভয় পাই তরিণীবাবু। আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু আমার অবস্থা আর আপনার অবস্থায় বিশেষ তফাত নেই। এ সংসারে আপনজন বলতে আমার কেউই নেই, যাদের জন্য জীবনপাত করলাম তারা আজ আমার কেউই নয়।"

"আমি আছি।"

তারিণীবাবু হৈমপ্রভাকে আস্তে করে বললেন।

তারপর বললেন, "এখানে সকলেরই একা-আসা একা-যাওয়া। বুঝলেন হৈম দেবী। আগে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতাম না। এখন সার বুঝেছি। সব সময়েই এই কথাটা মনে রাখা উচিত। দুঃখকে প্রশ্রয় দিলেই পেয়ে বসে। কচুরিপানারই মতো। আপনি কুকুর পুষবেন? আমার ভুলোরই বাচ্চা হয়েছে একটা। দেখবেন, নিজেকে আর একা মনে হবে না একটুও।"

"ভুলো কি মাদি কুকুর?"

"না। ভুলো সহবাস করেছিল। তার ইস্ত্রিরির নাম পেঁচি। রাস্তার উলটোদিকের গ্যারাজ ঘরের ছেঁড়া-খোঁড়া পাটের রাশির মধ্যে সে আঁতুড় করেছে। তবে কুকুর পুষলে সবসময়ই তা মালিকের অপোজিট সেক্স-এরই পুষতে হয়। তবে তারা আরও বেশি ভালোবাসে।"

"তাই? ভেবে দেখব। পুষলেও নেড়ি-কুত্তা পুষব কি না ভেবে দেখতে হবে।"

"কুকুররা সবই এক। মেয়েদেরই মতো।"

"কী বললেন?"

"মানে, গায়ের রং, চুল, সাইজ, এমন কী...। পেডিগ্রিতেই যা তফাত। নইলে সবাই একইরকম।"

"আপনি বড়ো বাজে কথা বলেন।"

"জল খাবেন হৈম দেবী? বড়ো গরম বোধ হচ্ছে বোধহয় লোডশেডিং-এ। এ ঘরে তো পাখা নেই। ভুলো, হাতপাখাটা।"

বলতেই, ভুলো ভেতরের ঘরে গিয়ে হাতপাখার ডাঁটাটা মুখে করে নিয়ে এল।

তারিণীবাবু চট করে পাখাটা তুলে হৈমপ্রভাকে হাওয়া করতে লাগলেন।

উনি বললেন, "থাক থাক। আমি এখুনি যাব।"

"যাবে তো সকলেই। এই তো পরশু বাঘাকে ইলেকট্রিক ফারনেসে ঢুকিয়ে এলাম। জর্জকে কবর দিলাম গত সোমবারে। এঞ্জিনড্রাইভার ছিল। সেই কানাডিয়ান এঞ্জিন যখন প্রথম এল ভারতবর্ষে তখন জর্জই প্রথম তা চালিয়ে ছিল। মনে হয়, এই তো সেদিন। যাবার কথা বলবেন না। মন খারাপ হয়ে যায়। সকলকে চলে যে যেতেই হবে এর চেয়ে বড়ো সত্য আর নেই।"

"জল খাবেন একটু?"

আবার বললেন তারিণীবাবু।

"আমি জল ফুটিয়ে দু বার ফিলটার করে খাই। জন্ডিস হবে না তো! কত্তরকম ব্যাকটেরিয়া! কোথাকার জল?"

হৈম চিন্তিত গলায় বললেন।

"ওই তো! রাস্তার ফুটপাথের। দেখাই যাচ্ছে। কোনো লুকোচাপা নেই। চমৎকার স্বাদ। পারগেটিভের কাজ করে। পায়খানা চমৎকার হয়।"

"ইস! আপনি বড়ো বাজে ভাষায় কথা বলেন।"

"তাই? মাফ করে দেবেন। জীবনে বিলাসিতা থাকলে তবেই না ভাষার বিলাসিতা থাকে! আপনি কি চা খাবেন? চায়ের সময়ও তো হল।"

"কোত্থেকে আনবেন?"

"কেন? ঘন্টের দোকান থেকে।"

"ভালো স্টেইনার আছে? কি চা? টি-ব্যাগ কি?"

"না, না কোনো ব্যাগ-ট্যাগ নয়। পুরোনো মোজা দিয়ে ছেঁকে দেয়। সে-চায়ের স্বাদই আলাদা।"

এবারে হেমপ্রভার মুখটি শক্ত হয়ে এল। বললেন, "আমি উঠছি এবারে। চায়ের ঝামেলা আর করবেন না আপনি। কিন্তু বলুন আমি তাহলে কবে আসব আবার?"

"বলেছি তো, সাতদিন পরে। দলিলটা আনিয়ে রাখি। আর মামণির মায়ের সঙ্গে একটু কথাও বলে নিই। কত খরচা তিনি করতে চান সেটা জানা দরকার। জানেন হৈম দেবী, আমার উপর কারও দাবি নেই যেমন, তেমন আমারও কারও উপরে কোনোরকম দাবি নেই। কেউ যদি কিছু দাবি করে এখন আমার কাছে, আমাকে আপন মনে করে; ভারি ভালো লাগে। যতক্ষণ দাবিদারেরা থাকে ততক্ষণ উৎপাত বলে মনে হয়। আর যখন থাকে না, তখন নিজেকে বড়ো অদরকারি, অপ্রয়োজনীয় লাগে। অন্যর কাজে-লাগারই আর-এক নাম যে জীবন, তা রিটায়ার না করলে জানতেই পেতাম না বোধহয়।"

কিছুক্ষণ হেমপ্রভা একদৃষ্টে অনবরত পাখার বাতাস করে-যাওয়া বৃদ্ধ তারিণীবাবুর মুখে চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলি।"

"আজ্ঞে। যাওয়া নেই আসুন। আর পরে যেদিন আসবেন ভাড়ার ব্যাপারটাও একটু বিবেচনা করে আসবেন। বাড়িটা বিক্রি, আমি না-ও করতে পারি।"

আজকে একটা মিটিং ছিল অফিসেই। জিষ্ণুর কাছে সাতটাতে পার্টি এসেছিল। রিজিওনাল ম্যানেজার ফ্রি হতে আরও দশ মিনিট লাগাবেন। তার পর বললেন, ওল অফ আস আর টায়ার্ড টু আওয়ার বোনস। চল, স্যাটারডে ক্লাব-এ যাই।

ক্লাবে গিয়ে এক কোণায় বসে মিটিং হল। বলতে গেলে খালিপেটেই অনেকগুলো হুইস্কি খেতে হল। কাজের সঙ্গে মদ খাওয়াটা আজকাল ফ্যাশান। কে কত বেশি মদ খেতে পারে তা নিয়েও একটা বাহাদুরির ব্যাপার থাকে। এই চাকরির সবই ভালো কিন্তু মালটিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন খাতের অপচয় চোখে দেখা যায় না। হরির লুট চলে এখানে।

স্যাটাবডে ক্লাব থেকে যখন বেরুল তখন প্রায় সাড়ে নটা। আর এম এবং চানচানি রয়ে গেলেন। আর. এম-এর মেজাজ খুব ভালো। এম. ডি. এসেছিলেন এবং জিষ্ণুদের ব্রাঞ্চের খুবই প্রশংসা করে গেছেন। বলে গেছেন, "কিপ ইট আপ ইয়াং বয়েজ, অ্যান্ড ডোন্ট ওয়ারি, ইউ উইল বি ওয়েল লুকড-আফটার।"

"ইয়াং বয়েজ" বলে গেলেন বটে। তাঁর নিজের বয়েসই চল্লিশের বেশি হবে না। আজকাল এই ট্রেন্ড। আম্বানি, পারেখ, গোয়েংকা, কল, কানোড়িয়া এমনি অগণ্য মানুষ চল্লিশের কম যাদের বয়স, তারাই বিরাট বিরাট মালটিন্যাশনাল কোম্পানির কর্ণধার। অনেকেই অবশ্য পৈতৃক সাম্রাজ্য পেয়েছেন, কিন্তু আজকের দিনের প্রেক্ষিতে ব্যবসা চালাবার যোগ্যতা না থাকলে তাঁরা ওই আসন পেতেন না পরিবার থেকেও। আর কিছু আছে মেধাবী, পুরোপুরি প্রফেশনাল ম্যানেজারস। তারাই আস্তে আস্তে টেক-ওভার করে নেবে এই ম্যানেজারিয়াল পোস্টগুলো। যাদের ব্লক শেয়ার হোল্ডিং

তারা গল্ফ খেলবে, হুইস্কি খাবে, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করবে। তাদেরই হয়ে, দুধে-ভাতে-বাঘ প্রফেশনালসরা তাঁদের সাম্রাজ্য চালাবেন।

ক্লাব থেকে বাড়িতে এল গাড়িতেই। পরীও অবশ্য অফিস থেকেই ট্রান্সপোর্ট পায়, যাতায়াতের কিন্তু গাড়ি দিলেও নিতে পারেননি ওই একই কারণে। শ্যামবাজারের এই গলিতে আর থাকা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। সাউথে যেতে হবে। এখানে প্রত্যেকটি মানুষের জন্ম তারিখ, ঠিকুজি, বাবার নাম, ঠাকুরদার নাম, পারিবারিক পটভূমি অন্যেরা জানে। কিন্তু নতুন-বড়োলোক-হওয়াদের, অতীতকে গুলি-মারা মানুষদের ভিড় যেখানে, সেই প্রায়শই অতীত-লুকোনো বুদ্ধিজীবী দুর্বুদ্ধিজীবী নির্বুদ্ধিজীবীদের 'সাউথ'-এ একবার গিয়ে ভিড়ে গেলে নিজেই কিছুদিন পর নিজেকে আর চিনতে পারা যায় না। নিজেকে মনে হয় স্বয়ম্ভু। আত্মীয়-পরিজন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কথা তো বেমালুম ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করাও যায়। খোঁজ চলেছে। পরীও খোঁজ করছে। সে-ও ফ্ল্যাট কিনবে কোম্পানি থেকে মোটা অ্যাডভান্স দেবে! জিষ্ণুকেও দেবে। ফ্ল্যাট হাতে এলেই গাড়িটাও নিতে পারবে। তবে পরীর মাইনে জিষ্ণুর চেয়ে অনেকই বেশি। প্রায় হাজার আষ্টেক পায় পরী। ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস-এ পরীর ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে।

কিন্তু পুষি?

পুষির চলে যাওয়াটা জিষ্ণুর ভবিষ্যৎ-এর সব পরিকল্পনাই গোলমাল করে দিয়ে গেছে। বড়োই নিশ্চেষ্ট লাগে। কাজ করতে হয়, করে। খেতে হয়, খায়। পড়াশুনো-টড়াশুনো সব মাথায় উঠেছে। লেখালেখিও তাই। রাতে ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুম হয় না। বুকের ভেতরে যে এঞ্জিনটা ফুলস্পিডে টপ-গিয়ারে চলতে আরম্ভ করেছিল সে যেন কোনো রাক্ষসের হাতের ছোঁওয়ায় হঠাৎই ফ্রিজ করে গেছে। মাঝপথে। আর কোনোদিন ওতে গুঞ্জরন উঠবে বলে মনে হয় না।

পুষির মৃত্যুর পর পরী একেবারেই বদলে গেছে। পুষির সঙ্গে জিষ্ণুর আলাপ হবার পর তিনটে বছর যেমন মনমরা হয়েছিল পরী, তেমনই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে আবার ফুলে-ফেঁপে, বর্ষার নদীর মতো। ওর ভাবভঙ্গি, আচার-ব্যবহার বড়ো অবাক করে জিষ্ণুকে। কী যে বলতে চায় ও বোঝে না। যা বলতে চায় তা বোঝার কাছাকাছি এলেও অস্বস্তি বোধ করে ও। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে। ওর নিজের খুড়তুতো বোন। শিশুকাল থেকেই একসঙ্গে বড়ো হয়েছে। প্রথম যৌবনে এরকম অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যায় বলে শুনেছে, দেখেছে; পড়েতোছেই। কিন্তু এই পরিণত যৌবনে?

জিষ্ণু শুয়ে পড়েছিল খেয়েদেয়ে সেদিনের রাতে। পরী চান করে সুগন্ধী মেখে নাইটি পরে এসেছিল ওর ঘরে। দুটি গ্লাস এবং একটি রাম-এর বোতল নিয়ে।

বলেছিল "তুমি ভালোবাসো, তাই।"

নাইটির ভেতর দিয়ে এক অন্য পরীকে দেখেছিল জিষ্ণু। অচেনা, অভাবনীয়, অনাঘ্রাত, রোমহর্ষক। অপরাধবোধে জর্জরিত হয়ে জিষ্ণু উঠে বসেছিল বিছানাতে। পেছন থেকে আলো পড়ায় পরীর হালকা সবুজ সিল্কের নাইটিটাকে স্বচ্ছ দেখাচ্ছিল। মেয়েদের শরীরে অসীম রহস্য থাকে যা হয়তো কোনোদিনও পুরোনো হয় না। প্রচণ্ড লোভ জেগেছিল এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই হুঁশ ফিরে এসেছিল ওর। বুঝেছিল যে, সে অনুভূতির নাম লোভ নয়, কাম। প্রথম রিপু।

রাম-এর গ্লাসে নিট রাম ঢেলে দিয়ে পরী উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপরই ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে বলেছিল, "বাইরে অনেক চাঁদ। কলকাতা করপোরেশনের উচিত দশমী থেকে পূর্ণিমা অবধি শুক্লপক্ষে পথের সব আলো নিভিয়ে রাখা।"

জিষ্ণু বলেছিল, "হ্যাঁ। তাহলে চোর-ডাকাত-রেপিস্ট-মার্ডারারদের তো পোয়াবারো।"

"ভালো দেখাতো কত। কত্ত ঠান্ডা, স্নিগ্ধ হত শহরটা।"

বলেই, বাইরের বারান্দার দরজাটা পুরো খুলে দিয়েছিল। সত্যিই গানুবাবুদের বাড়ির গাছপালা

চাঁয়ানো সবুজ জ্যোৎস্না এসে ভরে দিয়েছিল মারবেলের বারান্দাটা। তারপরই চুঁইয়ে এসেছিল ঘরে।

পুষি একদিন এই চাঁদের আলো ভরা বারান্দাতে বসে জিষ্ণুকে বলেছিল, বিয়ের পর সারারাত এই বারান্দাতে বসে থাকব।

পরী এসে বিছানাতে বসল জিষ্ণুর পাশে। বাঁ হাতে রাম-এর গ্লাসে বড়ো একটা চুমুক দিয়ে ডান হাতটা জিষ্ণুর স্লিপিং স্যুটের বুক খোলা জামার মধ্যে গলিয়ে ওর বুকে হাত বোলাতে লাগল।

ভেঙে পড়ছে ইমারত। ভেঙে পড়ছে ওর শৈশব-লালিত মূল্যবোধ। কলকাতার সব পুরোনো বাড়ি ধসে যাচ্ছে। চারিধারে খসে-যাওয়া পলেস্তারা, খুলে নেওয়া সেগুন কাঠে কড়িবরগা, জানালা-দরজা। ধুলো উড়ছে চারদিকে, বালি। পুরোনো সবকিছু ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ধুলোবালিতে ভরে যাচ্ছে শহরটা। এ শহরেব মানুষেরা। নতুন হয়ে যাচ্ছে জিষ্ণু আর পরীরা। নতুন হচ্ছে কলকাতা।

কিন্তু ভালো হচ্ছে কি?

এক সময়ে জিষ্ণু ঘুমিয়ে পড়েছিল। আরামে, বাধা দেওয়াব অপারগতার গ্লানিতে এবং শ্রান্তিতেও।

এমন ঘুম এর আগে কখনও ঘুমোয়নি জিষ্ণু।

কখন পরী চলে গেছিল স্বপ্নে-আসা পরীরই মতো, তা জানে না জিষ্ণু।

হঠাৎই ওর ঘুম ভেঙে গেল এক তীব্র তীক্ষ্ণ অপরাধবোধে বিদ্ধ হয়ে। ছিঃ ছিঃ। ও কি মানুষ!

পবী বিড বিড় করে কী একটা কথা বলছিল বারবাব। আমি তোমার বন্ধু। আমি তোমাকে বিয়ে করব। অ্যান্ড উই উইল লিভ মেরিলি, হিয়ারআফটাব।

কী বলছ! তুমি আমার বোন।

জিষ্ণু ঘোরের মধ্যে বলছিল গরম প্রশ্বাস ফেলে।

বাজে কথা। তুমি জানো না। ড্য ডুন্নো।

কাকিমা?

শ শ শ। ডোন্ট আটার দ্যাট নেম। শি ইজ আ বিচ।

নিজের জন্মদাত্রী মাকে 'কুকুরি' বলে গালাগালি দেয় এ কেমন শিক্ষার রকম? কী হল? এত ভালো ইংবিজি মিডিয়াম স্কুলে পড়াশুনো করে?

কী যে ঘটে যাচ্ছে কিছুদিন হল এ-বাড়িতে, কলকাতায়; কিছুই বুঝতে পারছে না জিষ্ণু। তারিণীবাবুর এই পৈতৃক বাড়ি অভিশপ্ত হয়ে গেছে। শুধুমাত্র এই কারণেই এ-বাড়ি জিষ্ণুর ছেড়ে যাওয়া দরকার। জ্বর জ্বর লাগছে জিষ্ণুর। যদি কাকিমা এসে ঢোকেন ঘরে? যদি শুধোন, তোরা কী করছিলি?

মাথার কাছে হাত বাড়িয়ে আরেকটা ঘুমের ওষুধ টেনে নিল জিষ্ণু। ট্রাপেক্স টু মিলিগ্রাম খায় ও পুষিকে ইলেকট্রিক ফারনেসে ঢুকিয়ে আসার রাতের পর থেকেই। একটা শোওয়ার আগেই খেয়েছিল। পরী এসে ঘুম ভাঙাল। আরেকটা খেতে হবে। কাল ন'টায় পৌঁছোতে হবে অফিসে।

একটা ভিসাস-সার্কল হয়ে গেছে যেন পুরো জীবনটা। কোনো বৈচিত্র্য নেই। বন্ধু নেই। নির্মল আনন্দ নেই। অফিস বাড়ি-স্লিপিং ট্যাবলেট-ঘুম-অফিস-বাড়ি-পরী-অপরাধবোধ। তীব্র ছুরিকাঘাতের মতো তীক্ষ্ণ শারীরিক আনন্দ। অবসাদ। অপরাধবোধ। ঘুম থেকে জেগে-ওঠা। অফিস।

বন্ধু যে নেই তার, সে দোষ তার একার নয়। বন্ধুদের দেবার মতো সময় জিষ্ণুর কোনোদিনও বেশি ছিল না। আর শুধুই প্রত্যয়হীন এবং গন্তব্যহীন রাজনীতি, খেলা; সাহিত্য অথবা অশেষ পরচর্চাব দিন কাটাতে তার ভালো লাগত না। ওইসব আড্ডা নিছকই বাঙালি-আড্ডা। তা থেকে

শেখার কিছুই নেই। নিজেকে উন্নত করার কিছু নেই। বাড়ি বসে লিখেছে, পড়েছে, গান গেয়ে
ছবি এঁকেছে এবং তাতেই চিরদিন ও আনন্দ পেয়েছে। ও একা। চিরদিনের। একাকীত্বতে
ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত আছে।

কাছের বন্ধু বলতে একমাত্র ছিল পিকলুই। একটা সময়ে পিকলু আর জিষ্ণু অভিন্নহৃদয় ছি
পিকলুকে ও ওর হৃদয়ের সব উষ্ণতাই নিংড়ে দিয়েছিল। বড়োই চোট পেয়েছে হৃদয়ের সবচে
নরম জায়গাটাতে জিষ্ণু। গুলি লেগেছে হৃদয়ে। কিন্তু ওই চোটের পর জায়গাটা পাথর হয়ে গে
আর সেখানে কোনো ঘাসও জন্মাবে না। বন্ধুত্ব কথাটাতেই ওর বিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে নষ্ট ক
দিয়েছে পিকলু। সেই তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকে মাতাল সুশোভনের ডায়ালগ ছিল ন
"আই হ্যাড মাই মানি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড : আই লেন্ট মাই মানি টু মাই ফ্রেন্ড। আই লস্ট মাই মা
অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড।"

এটা অনেকই আন্ডার-স্টেটমেন্ট! বন্ধু যখন তঞ্চক হয়ে ওঠে, তখন টাকার শোকটা শো
নয়, তিলতিল করে গড়ে তোলা একটি জীবনের সমস্ত বিশ্বাস তখন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যা
বিশ্বাস নিজের বুকে একটুও না থাকলে কি কারও পক্ষেই এই অবিশ্বাসী পৃথিবীতে বেঁচে থা
সম্ভব? না। জিষ্ণুর পক্ষে অন্তত সম্ভব নয়।

পুষিটা যদি থাকত! পরীর মধ্যে বড়ো জ্বালা, দহন, তীব্র ধার তার স্পর্শে। ধারালো ছুরির উ
স্পর্শে সে কেটে ফালা-ফালা করে জিষ্ণুর শরীর, চেতনা; সব। পরীকে ও যদি না মারতে পা
তবে পরীই ওকে মেরে ফেলবে। শিগগির। ও রোগগ্রস্ত হয়েছে। বাড়ি ফিরে আসতে ভয় ক
ওর। পরীর গলার স্বর শুনলে ভয় করে।

পরী যখন ছোটো ছিল, জিষ্ণুও ছোটোই; কাকিমা ও হীরুকাকার সঙ্গে দেওঘরে বেড়া
গেছিল একবার পুজোর সময়ে। নন্দন পাহাড়ের কাছে ছোটো একটা বাড়িতে উঠেছিল। কে জা
কাদের বাড়ি? আজ মনে নেই আর।

সকালের মিষ্টি মিষ্টি রোদে ওরা দু ভাই বোন নতুন জামা-জুতো পরে লাল ধুলোকাঁকরের কাঁ
পথে হাঁটতে যেতে গুটি-গুটি পাহাড়ের দিকে। একদিন পরী একটা লাল আর হলুদ আর কা
গরম স্কার্ট পরেছিল। আর লাল ফ্ল্যানেলের ব্লাউজ। পায়ে হলুদ মোজা আর কালো জুতো। কাকি
খুবই শৌখিন ছিলেন। ওঁর শখের লকলকে গাছটি ফুলফলন্ত হত পরী আর জিষ্ণুর মাধ্যমে। দুজ
হাতে-হাত ধরে ওরা হাঁটছিল।

পরী বলেছিল, "জিষ্ণু, তোমাকে খুব ভালো লাগে আমার।"

জিষ্ণু বলেছিল, "আমারও খুব ভালো লাগে তোমাকে।"

"বড়ো হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব।"

"দূর পাগলি। তুমি তো আমার বোন।"

"তাতে কী হয়! আমি তো মেয়ে। হবে না বিয়ে?"

"পাগলি। তুমি একটা পাগলি পরী।"

"পাগলিই হই আর যাইই হই। আমি তোমাকে বিয়ে করবই। দেখো তুমি।"

কলকাতার বাইরে কাজে না গেলে পরী আজকাল রোজই আসে। স্বপ্নের পরীরই মতো।
রাত কেটে যায় স্বপ্নেরই মতো। আশ্চর্য হয়ে যায় একথা ভেবে জিষ্ণু যে, কাকিমা কেন আসেন
এদিকে? উনি কি জানেন?

একজন সাইকিয়াট্রিস্ট খুবই দরকার জিষ্ণুর। কালই অফিস থেকে ডা. কিশলয় কুমার অথ
ডা. নন্দীকে ফোন করতে হবে। এক গভীর অপরাধবোধে সবসময়ই ক্লিষ্ট থাকে জিষ্ণু। মুষ
থাকে মানসিকভাবে, শারীরিক আনন্দের মধ্যেও। পুষির মৃত্যুতেও ও এতখানি মুষড়ে পড়েনি।

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুম ঘুম পেতে লাগল জিষ্ণুর। ঘুমোনো সহজ ছিল না। জীবনে

কখনও সম্পূর্ণ নগ্না কোনো নারীকে আগে দেখেনি। না। পরীর মতো কারোকে তো নয়ই! তার বোন। কিন্তু এত সুন্দরী ও জ্বালাময়ী হয় কি প্রত্যেক নগ্না নারীই? কোনো ধারণাই ছিল না। পুষিকেও কি এরকমই দেখাত? যদি দেখার সুযোগ পেত?

বারান্দা থেকে চুঁইয়ে-আসা চাঁদের আলোয় পরীর মসৃণ উষ্ণ শরীরের স্পর্শনে, স্পন্দনে জিষ্ণুর এ কদিনই মনে হয়েছে নিবিড় সহানুভূতি, পরম নির্ভরতা এবং অনভ্যস্ত উত্তেজনার মধ্যে যেন রঁদ্যার দুটি মূর্তি প্রাণ পেয়েছে হঠাৎ। জীবনের প্রথম নারী সংসর্গর বিবশতা কামানের গোলার আঘাতের চেয়েও বেশি মারাত্মক। পরীর সঙ্গে ওর রঁদ্যার প্রদর্শনী দেখতে যাওয়া একটুও উচিত হয়নি। প্রায়ই ভাবে জিষ্ণু।

জিষ্ণুদের অফিস শনিবার বন্ধ থাকে। ফাইভ-ডেইজ উইক। কিন্তু মাঝে মাঝেই শনিবারে শনিবারে ম্যানেজারিয়াল লেভেলের অফিসারদের মিটিং থাকে। যেতে হয়। লাঞ্চ অবধি মিটিং চলে। সেই সব দিনে দুপুরে বাড়ি এসেই লাঞ্চ খায়।

আজ মিটিং-এর পর আর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছিল না। কাকিমার ও পরীর খাওয়া হয়ে যায় এতক্ষণে। পরীর অফিস শনিবারে পুরোই বন্ধ থাকে। মোক্ষদাদি ও শ্রীমন্তদা বসে থাকে ওর জন্যে। তবু বলাই আছে যে, শনিবারে একটা বেজে গেলে ও বাড়িতে খাবে না। ওয়ালডর্ফ-এ গিয়েই খেয়ে নিল আজকে। তারপর পৌনে তিনটে নাগাদ ট্যাক্সি নিয়ে বেরোল। আজ ও তারিণীবাবুর বাড়ি যাবেই। বৃদ্ধর চিঠিটি ওর মধ্যে এক আলোড়ন এনেছিল। বৃদ্ধের প্রতি এক ধরনের সমবেদনা আর কাকিমার প্রতি এক ধরনের অসূয়ার জন্ম দিয়েছিল সেই চিঠিটি।

বাড়িটা আর বাড়ি নেই। পরীর ব্যবহার এবং চালচলনও দিনে দিনে বড়োই অদ্ভুত হয়ে উঠছে। তাছাড়া, ইদানীং না-বলে-কয়ে অসময়ে বাড়ি ফিরলে প্রায়ই দেখে হীরুকাকু আর কাকিমা কাকিমার ঘরে বসে গুজগুজ ফুসফুস করছেন।

হীরুকাকু অনেকই করেছেন এক সময়। তাঁর অথবা কাকিমার কোনোরকম সমালোচনা করা জিষ্ণুর ইচ্ছা নয়। তাতে অধিকারও নেই। তবে এমন এমন সব ঘটনা ঘটত না আগে। বদলে যাচ্ছে পুরোনো যা কিছু ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস। যা দেখেনি, তাই দেখছে। ধাক্কা, তাই লাগে বইকী।

হীরুকাকু আর কাকিমা না থাকলে পিতৃমাতৃহীন জিষ্ণু হয়তো ভেসেই যেত। কিন্তু বড়ো হয়ে ওঠার পর ও যেন ক্রমশই বুঝতে পারছে ওর তেমন আপনজন একজনও নেই। পুষির মধ্যে ও ওর হারানো এবং পুরোপুরিই ভুলে-যাওয়া মা এবং প্রেমিকাকে পেয়েছিল। পুষির মা-বাবার কাছ থেকেও যে স্নেহ পেয়েছিল তা বলার নয়। যার দাবিতে ওর সব জোর ছিল ও-বাড়িতে সেই মানুষটিই চলে যাওয়াতে এখন সেখানে যেতে বড়োই লজ্জা করে! মনে হয়, ধোঁকা দিয়ে ও ওঁদের ভালোবাসা এখনও চাইছে। যা চিরদিনের নয়, তা পেয়ে লাভই বা কি? তাছাড়া তা পেতে ওর আত্মসম্মানেও লাগে। পুষির ছোটো বোন হাসি। মাঝে মাঝেই ফোন করে, যেতে বলে। জিষ্ণুই যায় না। নতুন করে কোনো বাঁধনে পড়তে চায় না আর ও।

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে ঠিকানাটা আরেকবার দেখে নিল। বহুদিন আগে একবার হীরুকাকুর সঙ্গেই এসেছিল। চিঠিটি তো পেয়েছে বেশ কদিনই হল। তারিণীবাবুর এস. ও. এস।

তারিণীবাবুর কাছে ও অনেক আগেই আসত। কিন্তু অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে চিঠিটি ওর লেখা-পড়ার টেবলের ডানদিকের ড্রয়ার থেকে হারিয়ে গেছিল।

কোনো ড্রয়ারেই, এমনকী আলমারিতেও চাবি দেওয়া অভ্যেস নেই ওর। চাবি দিলে মনে হয় শ্রীমন্তদা আর মোক্ষদাদিকে অপমান করা হচ্ছে। না দিয়ে দিয়ে, চাবি দেওয়ার অভ্যাসই চলে গেছে। চিঠিটা আবার হঠাৎ খুঁজে পেয়েছিল গত বুধবার। হয়তো ভুলোমনের কারণে ও নিজেই অসাবধানে রেখেছিল বা অন্য কাগজপত্রর সঙ্গে মিশে গেছিল।

ট্যাক্সিটা মোড়েই ছাড়ল। কারণ, যাদের অবস্থা ভালো নয় তাদের বাড়ির সামনে গাড়ি ব ট্যাক্সিতে গিয়ে পৌঁছোতে বাধো বাধো ঠেকে, লজ্জা করে। মনে হয়, বড়োলোকি দেখানো হচ্ছে

মোড়টা ঘুরতেই চোখে পড়ল একটি বড়ো স্টেশনারি দোকান। ভাবল, ওই দোকানে ঠিকানাট বলে একবার ডিরেকশানটা জিজ্ঞেস করে নেবে। পথেব উলটোদিক থেকে একটি মেয়ে হেঁটে আসছিল। অতি সাধারণ একটি তাঁতের শাড়ি পরা। মুখে-চোখে সাচ্ছল্যর অভাব ফুটে রয়েছে কিন্তু তার চলা, চোখ-চাওয়া, শাড়ি পরার সভ্য ভঙ্গিটির মধ্যে থেকে এমন একটি শালীন সম্ভ্রান্তত উপচে পড়ছে যে, যার চোখ আছে তার ভুল হবার কথা নয় যে সে মেয়ে অসাধারণ।

অসাধারণত্ব থাকতে পারে বংশ-পরিচয়ে, কৌলীন্যে এবং সাচ্ছল্যে। এবং দারিদ্র্যেও অসাধারণত্বর কারণটা ঘনিষ্ঠ হলেই তবে জানা যায় কিন্তু অসাধারণত্ব এমনই এক জিনিস য লুকিয়ে রাখা যায় না। পাঁচশো মানুষের মধ্যে থাকলেও তা প্রকাশিত হয়ে পড়েই।

মেয়েটি একবার জিষ্ণুর দিকে চাইল। ছাই-রঙা একটি বিজনেস-স্যুট পরেছিল জিষ্ণু। সঙ্গে লাল-কালো টাই। লাঞ্চ খাওয়ার সময় টাইয়ের নটটা খুলে গলার বোতামটাও খুলে দিয়েছিল এখন মনে হল, না খুললে পারত। মনে হতেই, নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসে ফেলল মনে মনে।

মেয়েটিও ওই দোকানেই ঢুকেছে। সে ঢোকার তিরিশ সেকেন্ড পর গিয়ে ঢুকল জিষ্ণু।

"কী দেব?"

দোকানি বললেন।

"কিছু না। তারিণীবাবু, মানে তারিণী চক্রবর্তী কোথায় থাকেন বলতে পারেন?" এই ঠিকানা

দোকানি হাসলেন।

বললেন, "ভালো সময়েই শুধোলেন। এই যে এঁদের বাড়িতেই থাকেন তারিণীবাবু। ওঁর জ্যাঠামশাই হন সম্পর্কে।"

মেয়েটি মিষ্টি প্রতিবাদ করে উঠল। বলল, "এ কী অন্যায় কথা। জ্যাঠামণি আমাদের বাড়িতে থাকতে যাবেন কোন দুঃখে? উনি নিজের বাড়িতেই থাকেন। আমরা থাকি সে বাড়িরই এক অংশে।"

তারপরই জিষ্ণুকে বলল, "আপনার খুব তাড়া নেই তো? একটি জিনিস নিয়েই আমি যাচ্ছি। আমার সঙ্গে চলুন। একেবারে জ্যাঠামণির হাতেই সমর্পণ করে দেব আপনাকে।"

বৃদ্ধ দোকানি খুব রসিক। হেসে বললেন, "দয়া করে তাই করো মামণি। ভদ্রলোকের যা চেহারা—ছবি মাঝপথেই না ছেনতাই করে নেয় অন্যে।"

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। তারপরই মুখ তুলে হাসল। জিষ্ণু দেখল, হাসলে, গালে টোল পড়ে তার।

মেয়েটি বৃদ্ধ দোকানিকে বলল, "রবিকাকা, অচেনা ভালো মানুষের পেছনে লাগার স্বভাব কবে যাবে তোমার বলোতো?"

'স্বভাব কি যায় মামণি? স্বভাব যায় না ম'লে। তাছাড়া তুমি এতো তাড়াতাড়ি মানুষকে ভালো বলে ঠাহর করে ফ্যালো নাকি? বাঃ। তবে কথাটাতো শুধু অচেনা ওকেই বলিনি মা! চেনা

তোমাকেও বলা। তাছাড়া অচেনা চেনা হতে কতক্ষণ লাগে বলো তো? চিনতে যদি কাউকে চায়ই কেউ?"

"জানি না।"

মেয়েটি বলল।

লজ্জা পেয়ে, অপ্রতিভ মুখ নামিয়ে।

তারপর বলল, "কই? দিয়েছ?"

"এই নাও!" বলেই ঠোঙাটা এগিয়ে দিলেন।

ঠোঙায় কী ছিল তা বোঝা গেল না।

দোকানী রবিবাবু বললেন, "তাহলে লিখেই রাখছি। দাদাকে..."

বলেই, জিষ্ণুর দিকে তাকিয়েই থেমে গেলেন।

মেয়েটির মুখ মুহূর্তের জন্যে লাল হয়ে গিয়েই আবার স্বাভাবিক চাঁপা-রঙা হয়ে গেল।

কৃতজ্ঞতা-মাখা গলায় বলল, "যাচ্ছি তবে রবিকাকা।"

"এসো মামণি। যাওয়া নেই।"

পথে বেরিয়ে মেয়েটি বলল, "আপনি আমার জ্যাঠামণিকে চেনেন?"

"হুঁ।"

"কীভাবে? ধার আদায় করতে এসেছেন বুঝি। কালকে এক কাবুলিওয়ালা এসেছিল।"

"তাই?"

হেসে বলল জিষ্ণু।

"আমার কথার উত্তর দিলেন না যে।"

"কোন কথার?"

"ধার আদায় করতে এসেছেন কি না?"

"ও। ওই, একরকমের তাই বলতে পারেন।"

কালো হয়ে গেল মুখ, মেয়েটির।

কষ্ট হল জিষ্ণুর, রসিকতাটি করেছে বলে।

মেয়েটি বলল, "আমার জ্যাঠামণি ভারি ভালো মানুষ, ভারি সরল। আপনি কতটুকু জানেন ওঁর সম্বন্ধে?"

অনেকখানিই। তবে সব নিশ্চয়ই নয়। সব জানলে আপনার কথাও জানতাম।

মেয়েটি কথা না বলে হাঁটতে লাগল। জিষ্ণু দেখল, তার চটির একটি পাটির, যেখানে বুড়ো আঙুল ঢোকে; সেখানটা ছিঁড়ে গেছে। একটি রাবার-ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা রয়েছে জায়গাটি।

"আপনার জ্যাঠামণির ধার আমার কাছে নয়। আমি অধমর্ণ। ধার শোধ করতে এসেছি।"

মেয়েটি চমকে উঠে পূর্ণ দৃষ্টিতে জিষ্ণুর মুখে চাইল, মুখ ঘুরিয়ে। গলির ফাঁক-ফোকর দিয়ে বিকেলবেলার নরম আলো এসে তার মুখে পড়েছিল। ভারি ভালো লেগে গেল জিষ্ণুর। সেই মুখখানিকে। পুষিকেও ভালো লেগেছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে। একে ভালো লেগে গেল প্রথম দেখাতেই। ঠিক এমন অনুভূতি ওর আগে হয়নি কখনও। নিজের অপ্রাপ্তবয়স্ক, হঠকারী অপরিণামদর্শী মনকে খুব করে বকে দিল মনে মনে জিষ্ণু।

"ঠাট্টা করছেন আপনি?"

অবিশ্বাসী গলায় মেয়েটি বলল।

"না। চলুন তারিণীবাবুর কাছে। তখনই জানবেন।"

"এই মোড়ে বাঁদিকে গেলেই আমাদের বাড়ি? আমি জ্যাঠামণির অংশটুকু দেখিয়ে চলে যাব।

আপনারা কাজের কথা বলুন! আজ আমার মায়ের জন্মদিন। আমার মামা আসবেন। দাদা আসবেন অফিস থেকে। সামান্য একটু ব্যস্ত থাকতে হবে রান্নাঘরে।"

"আমাকে আপনি নেমন্তন্ন করবেন না?"

"আপনি বড়ো ছেলেমানুষ। হয়তো ভালোমানুষও। বয়স কত আপনার?"

"আপনার চেয়ে মনে হয় ন-দশ বছরের বড়োই হব।"

"মনে হয় না তো কথা শুনে। আরেকটা হতে পারে। আপনি সরল। আমার জ্যাঠামণির মতো। নইলে জ্যাঠামণির কাছেও অধমর্ণ হন! হাসিরই ব্যাপার।"

মেয়েটি চলে গেল। তারিণীবাবুর অংশতে ঢোকার জায়গাটি দেখিয়ে দিয়ে।

জিষ্ণু গিয়ে বেল দিতেই ভেতর থেকে একটি কুকুর সিংহবিক্রমে তেড়ে এল। তারপর বন্ধ দরজায় দু পা দিয়ে খচর-মচর শব্দ করতে লাগল। তারিণীবাবু এসে দরজা খুললেন। একটি খাকি ফুলপ্যান্ট, ইস্ত্রিবিহীন এবং অন্য কারও ব্যবহার করে দিয়ে দেওয়া সাদা রঙের একটি বেঢপ সাইজের টেনিস খেলার গেঞ্জি এবং ডান পায়ে, কড়ে আঙুলের কাছে ছেঁড়া একটি লালচে কেডস পরে দরজা খুললেন। বাঁ পা-টা খালি ছিল।

কালো শীর্ণ কুকুরটা লাফাতে লাফাতে ডাকতে লাগল।

"কে? আমি তো ঠিক চিনতে পারলাম না। একটু দাঁড়ান। চশমাটা। এই ভুলো! চশমা!"

মুহূর্তের মধ্যে ভুলো নামক কুকুরটি ডাঁটি কামড়ে চশমাটা নিয়ে এল ভেতর থেকে।

চশমাটা পরে, ভালো করে দেখে তারিণীবাবু বিপদ্‌গ্রস্ত মুখে বললেন, "আই খেয়েছে! চশমা পরেও যে চিনতে পারলুম না। আপনি কে স্যার?"

জিষ্ণু বলল, "আমি জিষ্ণু। আপনার ভাড়াটে।"

"ওঃ। জিষ্ণু। এসো এসো বাবা। কী চমৎকার চেহারা করেছ। আমি যখন রিটায়ার করি তখন আমাদের ডেপুটি ডিভিশনাল ম্যানেজার ছিলেন চ্যাটার্জিসাহেব। ঠিক তাঁর মতো চেহারা। উনি একদিন রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার হবেন। আমাকে বলে গেছিলেন গুহসাহেব। এস. আর. গুহ দিল্লির ডিরেক্টর অফ ওয়াগন এক্সচেঞ্জ আর রেলওয়ে কনফারেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ছিলেন গুহসাহেব। তুমিও খুব উন্নতি করবে। তোমার চেহারাই বলছে। দেখে নিয়ো আমার কথা ফলে কি না!"

"বসব?"

"আরে দ্যাখো। বসবে বসবে বইকী। নিশ্চয়ই বসবে। কিন্তু এ ঘরে তো পাখা নেই বাবা। তুমি তো এমনিতেই ঘেমে গেছ। তা চলো ভিতরের ঘরেই গিয়ে বসি। তক্তপোশে বসতে পারবে তো?"

"কেন পারব না?"

"তোমার স্যুটটা আমার ঘামেভেজা শতরঞ্চিতে নষ্ট হয়ে যাবে। ঘেমে তেলচিটে হয়ে রয়েছে। তবু চলো, চলো, ভেতরেই চলো বাবা।"

জিষ্ণু গিয়ে বসল। তারিণীবাবু পাশে বসলেন। ভুলো মেঝেতে শুয়ে পড়ল ওদের দিকে মুখটি করে নিজের সামনের দু থাবার মধ্যে রেখে।

জিষ্ণু বলল, "জুতোটা পরে ফেলুন বাঁ পায়ে।"

"ও হ্যাঁ। পরব'খন। কিছু তো করার নেই। বিকেলে একটু বেড়িয়ে আসি। ফেরার সময় হাফ-পাউন্ড একটা রুটি কিনে নিয়ে আসি। আমার আর ভুলোর রাতের খাওয়া। তবে আজ আমাদের দুজনেরই নেমন্তন্ন আছে।"

"তাই? কোথায়?"

"এই এ বাড়িতেই।"

"ও।"

"তুমি জীবনে খুব উন্নতি করবে তা কী করে বললাম বলো তো?"

"কী করে?"

"তোমার ঠোঁট দুটি দেখে। দৃঢ় প্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাস ফুটে আছে তোমার ঠোঁটে, চোয়ালে। আমাকে একজন খুব বড়ো জ্যোতিষী চিনিয়ে দিয়েছিলেন। অনিল চাটুজ্জে মশায়। তিনি বেঁচে থাকলে তোমার ঠিকুজিটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতাম তাঁর কাছে।"

এইটুকু বলেই বৃদ্ধ ক্লান্ত হয়ে বাঁ পা-টি কষ্ট করে ডান পায়ের উপরে তুলে মোজা পরতে লাগলেন। মোজা পরতে পরতেই বললেন, "দাঁড়াও। জুতোটা পরে তোমার জন্যে একটু চা নিয়ে আসি। আমিও খাইনি। ওই একেবারে বিকেলে বেরিয়ে ঘণ্টের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিই এক কাপ।"

জিষ্ণু 'না' করল না। কেন যে করল না-তা ও বুঝল না। জিষ্ণু ভাবছিল, যে মানুষ অমন করে চিঠি লেখেন তিনি এতক্ষণ পরেও নিজের প্রয়োজনের কথা একবারও উচ্চারণ করলেন না।

তারিণীবাবু ভাঁড়ে করে চা আর দুটো লেড়ো বিস্কুট এনে দিলেন জিষ্ণুকে।

জিষ্ণু যখন চা খাচ্ছে তখন উনি বললেন, "তুমি কেন এসেছ বাবা তা তো বললে না!"

জিষ্ণু অবাক হয়ে গেল। বৃদ্ধের স্মৃতিশক্তির গোলমাল হয়েছে বিলক্ষণ।

"বাঃ। আপনি চিঠি লেখেননি?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তোমার মা তো এসেছিলেন; থুড়ি তোমার কাকিমা, তোমাকে লেখা চিঠিখানি নিয়ে। বলে গেলেন সাতদিন পর আবার আসবেন। আমিও দলিলটা ইতিমধ্যে নিয়ে আসব। তবে বাড়ির দাম আমি বলতে পারিনি। আমার মামণির বিয়ের খরচটা এই বাড়ি বিক্রির টাকা থেকেই আমার জোগাড় করতে হবে। এটা নতুন ডেভেলাপমেন্ট। বিশ্বাস করো, আমি মিথ্যে বলছি না।"

বলেই বললেন, "আই যাঃ। তোমার কাকিমা যে তাঁর আসার কথা তোমাকে বলতে মানা করেছিলেন। আমি যে বলে ফেললাম!"

জিষ্ণুর বুকের মধ্যে কাকিমার কারণে বড়ো রাগ ও দুঃখও হচ্ছিল। এই বৃদ্ধকে সামান্য কটি টাকার জন্যে এতদিন উপবাসে রেখেছেন তিনি। তার উপর জিষ্ণুকে লেখা চিঠি নিয়ে ওঁকে ঠকিয়ে বাড়িটি পর্যন্ত কিনে নিতে চান কাকিমা! সম্ভবত পরীকেও না জানিয়ে। ওঁর কিসের এত লোভ? নিরাপত্তার অভাববোধ কেন এত? কাকিমাকে তো ছেলেবেলা থেকেই সে মায়ের মতোই দেখে এসেছে। তবু কেন?

জিষ্ণু বলল, "মনে করুন আপনি আমাকে বলেননি। আমিও ওঁকে জানাব না।"

"তাই? তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী হওয়া থেকে বাঁচাব তো? মুখ রেখো বাবা। তোমাকে বলা আমার উচিত হয়নি। বুড়ো হয়েছি। সব কথা মনে থাকে না।"

তারপর বললেন, "তোমার কাকিমার কথা তো আমি শুনেছিই। তুমি কি নতুন কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমি যা বলব এবং করব তা কিন্তু সত্যি সত্যি, কাকিমার কাছে গোপন রাখতে হবে। না রাখতে পারলে, আপনার নয়, আমারই অসম্ভব ক্ষতি হয়ে যাবে।"

"না, বাবা না! তুমি ছেলেমানুষ। চমৎকার মানুষ। তোমার ক্ষতি হবে এমন কিছু আমি করতে পারব না। আমার ক্ষতি হলে হোক।"

জিষ্ণু কোটের বুকপকেট থেকে পার্স বের করে এক হাজার টাকা দিল তারিণীবাবুকে। দশটি একশো টাকার নোট।

"এ কী! এ কী বাবা! এত টাকা? কেন?"

বলেই বললেন, "ওই দ্যাখো, ওই ব্যাটা ভুতোর চোখও লোভে চকচক করছে। টাকা বড়ো স্বস্তির বাবা, কিন্তু বেশি টাকা আচমকা এলে স্বস্তির বদলে আক্রমণ হয়ে ওঠে। আবুল বাশার,

তরুণ সাহিত্যিক বলেছিলেন। কাগজে পড়েছিলাম। বড়ো ভালো বলেছিলেন হে কথাটা। লা
কথার এক কথা।"

"এই টাকা জানুয়ারি মাস থেকে মে মাস অবধি পাঁচ মাসের বাড়ি ভাড়া। দুশো টাকা ক
মাসে। আপনি একশো টাকা করে চেয়েছিলেন। মানে, বাড়তি ভাড়া। আপাতত জানুয়ারি থে
দুশো করে বাড়ালাম। জুন থেকে তিনশো করে বাড়াব।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি তো মোটে একশোর কথাই বলেছিলাম তোমার কাকিমাকে।"

"সে তো কাকিমার সঙ্গে আপনার কথা। এও তো ন্যায্য নয়! তবে পরে আরও অনেক বাড়া
যাতে ন্যায্য হয়।"

"কেন বাড়াবে বাবা? এখন কলকাতার সব ভাড়া-বাড়িই তো ভাড়াটেদের হয়ে গে
ভাড়াটেরাই তো আসল মালিক। আমি তো তবু পুরুষমানুষ। ভাড়াটে হলেই যে গরিব হবে তে
কোনো কথা নেই। ভাড়াটেদের যেমন অসুবিধে থাকে, বাড়িওয়ালাদেরও থাকে বাবা। কত বিধব
সংসার চলে না, মেয়ের বিয়ে হয় না আর ভাড়াটেরা ভাড়া-বাড়িতে থেকেই ফ্ল্যাট কিনে সে ফ্ল্য
চার হাজার পাঁচ হাজারে ভাড়া দিয়ে রেখেছে। পাঁচ-ছটি কেস তো আমি নিজেই জানি। যেখা
অবস্থা নেই, সত্যিই অন্যত্র থাকার জায়গা নেই; সেখানে অন্য কথা! কিন্তু তা তো নয়! তা
রেন্ট-কন্ট্রোলে ভাড়া জমা দিয়ে দেয়। নিঃসহায় মানুষকে বলে, মামলা করতে। এক বছর
বছরের ভাড়ার টাকায় পুরো বাড়ি কিনে নিতে চায়।"

"কাকাবাবু।"

জিষ্ণু বলল।

"হ্যাঁ বাবা? তুমি আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকলে? আমি তো তাগাদা-দেওয়া বাড়িওয়াল
শুধু। আমাকে অনেক সম্মান দিলে বাবা।"

"বলছিলাম, আইনের কথা আমি বলছি না। ন্যায়-অন্যায়, বিবেকের কথা বলছিলাম।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও। রসিদ বইটা আবার কোথায় ফেললাম।"

"রসিদ লাগবে না কাকাবাবু।"

"সে কী? এর মানে আইনে আবার অন্য কিছু বলবে না তো?"

"আপনার সঙ্গে সম্পর্ক আইনের নয়।"

"তবে? সম্পর্কটা বেআইনি বলছ?"

জিষ্ণু হেসে ফেলল। বলল, "ধরুন তাই-ই।"

একটু চুপ করে থেকে জিষ্ণু বলল, "আরেকটা কথা।"

"কী" তারিণীবাবু বললেন।

"কাকিমা বাড়ি কিনতে এলে আপনি বলে দেবেন যে, বাড়ি বিক্রি করবেন না বলেই আপ
মনস্থ করেছেন।"

"তাহলে আমার মামণির বিয়ে আমি দেব কী করে?"

"অনেক বেশি দাম দেবে এমন ক্রেতা আমিই ঠিক করে দেব। টাকাটা কি খুব শিগগি
দরকার? বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে?"

"আরে, না না বাবা। চেষ্টা-চরিত্তির চলছে। গরিবের মেয়েকে আর কে এই পোড়া বাড়ি থে
উদ্ধার করতে আসবে বলো? টাকা যার নেই তার তো কিছুই নেই।"

"কেমন ছেলে খুঁজছেন আপনারা?"

"আরে আমাদের আবার চাওয়া-চাওয়ি। আজকাল লোকে হয় বড়োলোকের মেয়ে চায়;
চাকুরে মেয়ে চায়। সোজা কথা। আরে আমি তো আর তার জন্যে তোমার মতো রূপেগু
রাজপুত্র খুঁজছি না। মোটামুটি ছেলে। তবে হ্যাঁ। অনেস্ট। যে যাই বলুক, ইন দ্যা লং রান অনে

ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। তোমার কাকিমাকে বলে এসেছিলাম সেদিন। ডিসঅনেস্টি করেই ছেলেদের কেউকেটা করেছিলাম আমি। আর দ্যাখো, আজকে সেই তারাই বুড়ো বাপের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে। বড়োটা শেষ যেবার এসেছিল, আমাকে বলে গেল : "বুড়ো, একটা ম্যাটাডর ভ্যান কিনে দিচ্ছি, চালিয়ে খাও; খেটে খাও। বিদেশে কোনো বাপই ছেলের দয়ায় বাঁচে না।"

কথাটা শুনে জিষ্ণুর দুঃখও হল আবার হাসিও পেল। কোনো ছেলে নিজের বাবাকে এমন করে বলতে পারে যে, এ কথা ভেবেই।

"আরে বাবা, বিদেশে কোনো ছেলেও কি বুড়ো বয়স অবধি বাপের হোটেলে খায়? না কোনো ছেলের কেরিয়ার বাবারা চুরি-ডাকাতি করে, কী পেটে না খেয়ে গড়ে দেয় বলো? অনেক ভেবে-টেবেই ডিসাইড করেছি আমার মামণির জন্যে আমি ডিসঅনেস্ট ছেলে চাই না।"

"দেখব আমি। আপনার মনোমতো ছেলেই দেখব। এই যে রইল আমার কার্ড। অফিসের ঠিকানাতেই একটু যোগাযোগ করবেন।"

"আমার আজকাল হাত কেঁপে যায়। আমি শিবুকেই বলব। মানে মামণির দাদা। তুমি যদি সাক্ষাৎ দেখতে চাও তো মামণিকে এখুনি ডেকে আনছি একবার।"

"না, না কাকাবাবু। আমি তো আর পাত্র নই। মিছিমিছি বেচারিকে এমবারাস করে লাভ নেই।"

"যা ভালো বোঝো বাবা।"

"আমি তবে উঠি আজকে। প্রতি মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমি টাকাটা পাঠিয়ে দেব। আর মাসে যে টাকা, কাকিমা শ্রীমন্তদাকে দিয়ে পাঠান তা তো উনি পাঠাবেনই।"

তারিণীবাবু গলির মোড় অবধি পৌঁছে দিলেন জিষ্ণুকে। সঙ্গে ভুলো। জিষ্ণু ভুলোর জন্যে এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে দিল। ভুলো লেজ নাড়িয়ে বিদায় দিল ওকে।

গলির মোড়ে যখন এসে একটা ট্যাক্সি খোঁজার জন্যে দাঁড়াল তখন একাধিক কারণে ওর মনটা বড়ো খুশি খুশি লাগতে লাগল। বড়ো অনাবিল খুশি। অনেক অনেকদিন এত খুশি হয়নি ও পুষির মৃত্যুর পর।

বাড়ি পৌঁছে চান করে তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। পরী ট্যুরে গেছে ব্যাঙ্গালোরে আজ। কাল রাতে ওকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়ে বলেছিল "ভালো ছেলে হয়ে থাকবে। এবারে ফিরে এসে রেজিস্ট্রেশান করব আমরা তারপর চলে যাব ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস-এর ফ্ল্যাটে।"

"কাকিমা?"

"স্টপ ইট। ও নাম তুমি মুখে আনবে না।"

আজকে খাওয়ার একটু আগেই ট্রাপেক্স টু মিলিগ্রামের দুটি ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছিল। রোজই রাত একটা দুটো অবধি জেগে থাকার কারণে আর অপরাধবোধে ঘুম হয় না কদিন। চোখের কোণে কালি পড়েছে। অথচ দেরি করে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে সকাল নটা-দশটা অবধি ঘোর থাকে। রিফ্লেক্স ঢিলে হয়ে থাকে। কলকাতার সব মানুষই কি ঘুমের ওষুধ খায়? অনেককেই কেমন ঘোরাচ্ছন্ন, নেশাগ্রস্ত দেখে লাঞ্চ অবধি। কে জানে! এরা সবাই বোধহয় ঘোরের মধ্যে হাঁটে, ঘোরের মধ্যে মিছিল করে; স্লোগান দেয়, বেঁচে থাকে।

দেখতে দেখতে গভীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল জিষ্ণু। মামণির মুখটা ভেসে উঠল একবার চোখের সামনে। তারপর পুষির মুখ। পুষি হাসছিল, মুখটা একপাশে ঘুরিয়ে।

পুষি...

গভীর ঘুম এখন জিষ্ণুর। গভীর ঘুম।

নাসিরুদ্দিন বললে, "আপনাকে বলেছিলাম স্যার থ্রি-টু বোর না নিয়ে থ্রি-এইট নিন।"

"থ্রি-এইট বোরের পিস্তলগুলো প্রহিবিটেড বোর। গুলি পাব কোত্থেকে।"

জিষ্ণু বলেছিল।

নাসিরুদ্দিন হাসল।

বলল, "নকশালরা কোত্থেকে পাচ্ছিল স্যার? পাঞ্জাবে কী করে পাচ্ছে? দার্জিলিংয়ে? পাওয়ার ইচ্ছে থাকলেই পাওয়া যায়। "গুলি, কুড়ি রাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে। যথেষ্ট। ভাড়া নেবেন? না কিনবেন? যদি আমার নাম বলে দেন তাহলে আপনার ফেমিলির কেউ আর আস্ত থাকবে না স্যার।"

"ভাড়া কত?"

জিষ্ণু বলল।

"প্রাইভেট ট্যাক্সির চেয়ে একটু বেশি। দিনে পাঁচশো।"

"গুলি?"

"গুলি পঁচিশ টাকা করে রাউন্ড।"

"গুলিও কি ভাড়া?"

"হ্যাঁ। ফেরত দিলে টাকা ফেরত দেব। খরচা হলে ওই গচ্চা।"

"দাও।"

খালপাড়ের মিনিবাসের টার্মিনালে তখন ভিড় কমে এসেছে। কোমরের সঙ্গে বাঁধা আছে বেলটে জিনিসটা। মোড়ের কাছে চা আর অমলেট আর মাটন রোল-এর দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে আছে জিষ্ণু জিনিসটা পাওয়ার পর থেকেই। যাকে খুঁজছে, তাকে কিন্তু পাচ্ছে না। গল্প করেছে ও নানা ড্রাইভার, কনডাক্টর ও ক্লিনারদের সঙ্গে। এ একটা অন্য জগৎ। অন্য পরিবেশ।

"ভোতকা এখন কোন গাড়ি চালাচ্ছে রে এখন? মিনিই চালাচ্ছে তো?"

একজন কনডাক্টর শুধোল অন্যকে।

"আর কি চালাবে?"

"ওর মালিকের তো পাঁচখানা গাড়ি। তবে সবই মিনি। ম্যাক্সি একটাও নেই। তারই মধ্যে চালাচ্ছে কোনো একটা। তবে এসে পড়বে এক্ষুনি। ওর সাঁটুলি এসে একবার খোঁজ করে গেছে ইতিমধ্যেই। গরজ জোর।"

"তুই জানিস যে ও জামিন পেয়েছে?"

"কব্বে! কোন ড্রাইভারের কী হবে র‍্যা? সব কেস ফিট করা আছে সব জায়গাতে।"

"ফুলরেণু গুহকে যে চাপা দিয়েছে সে ঠিক শ্বশুরবাড়ি যাবে।"

"ওই। শ'য়ে একজনের কপাল খারাপ থাকে। যারা চাপা পড়ে তারা সকলেই তো আর ফুলরেণু গুহ নয় যে কংগ্রেস, সি পি এম দুজনেরই দরদ উথলে উঠবে? হেঁজিপেজিদের জন্যে কোন শালা কী করে র‍্যা?"

"সেই মেয়েটা, যেটা স্কুটারের পেছনে বসেছিল, তার বোধহয় সোর্স আছে ভালো।"

"কী করে বুঝলি?"

"একটা টিকটিকি মাইরি রোজই একসময় আসছিল। বোধহয় ডি. ডি-র লোক হবে। হারামিকে দিন কয় দেখছি না।"

"চিনতে পারলে বলিস তো! বাঞ্চোতের টেংরি খুলে নেব। লাশ ফেলে দেব খালে।"

"কেসটার কী হবে?"

"আরে কী আর হবে?" তারিখ পড়বে। যা হয়।"

"তারপর?"

"তারপর আবার তারিখ পড়বে।"

"তারপর?"

"তাপ্পর আবারও তারিখ পড়বে।"

"তাপ্পর আবার।"

"মেয়ের জন্যে, বউয়ের জন্যে ভালোবাসা কার কদ্দিন থাকে রে শালা বাঙালি জাতের? সোডার বোতলের জাত শালারা! বারো ঘণ্টা যদি মরার পর তোকে মনে রাখে কেউ, তবে জানলি বাপ্পোত কিছু করলি লাইফে।"

"উরিঃ শালা। চার হাজার পঁয়ত্রিশ কী রকম ঝিং-চ্যাক লাইট লাগিয়েছে দ্যাখ। ওই যে আসছে গুরু।"

জিষ্ণুর চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। গায়ে জ্বর। মিনিটা এসে দাঁড়াতেই ড্রাইভার বলল, "বেসি দুধ, বেসি চিনি দিয়ে চা দেত নেপো ভালো করে এক গ্লাস। আর শোন। একটা মোগলাইও। জলদি দিবিরে শ্লা।"

বলেই, ড্রাইভিং সিট থেকে নামল। গাড়িটা লাগানোর সময়েই একজন লাঠি হাতে বৃদ্ধ চাপা পড়ছিলেন প্রায় মিনির তলাতে।

অকথ্য খিস্তি করল তাকে ড্রাইভার। বলল, এই যে ঘাটের মড়া! এখুনি তো ইলেকটিরি ফাবনেসে যেতে হত।"

মিনির ড্রাইভারটাকে দেখতে যে-কোনো অন্য মানুষেরই মতো। রোগা-পটকা। বাজারের ফলওয়ালা কী মাছওয়ালা কী চানাচুরের দোকানি বা তাদের সামনে পায়জামা শার্ট পরে থলে হাতে দাঁড়ানো যে-কোনো স্বল্পবিত্ত খদ্দেরেরই মতো। তফাতের মধ্যে তার ডান হাতে সরদারজির মতো একটি স্টেইনলেস স্টিলের বালা। লোকটার চোখ দুটো দেখে মনে হয় লোকটা প্রচণ্ড ধূর্ত। পৃথিবীকে ডোন্টকেয়ার ভাব তার মুখে-চোখে।

ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে পিঠের ঘাম শুকুনো সে জামাটা একটু তুলে ধরে হাওয়া লাগিয়ে।

বলল, "কী বে নেপো? কেউ আমার খোঁজ করেছিল?"

পাশের ড্রাইভারটি বলল, "তোমার সাঁটুলি দু-দুবার ঘুরে গেছে গুরু।"

"এই কী মাইরি। ছোকরাদের সামনে একটু রেসপেক্ট দিয়ে কথা কইতে পারিস না। তোরা না, মাইরি! তা, কখন আসবে বলেছে আবার!"

"বলেছে আসবে না। নাগ করেছে নাগুনি। উলটোদিকে বসে থাকবে। তুমি চা খেয়ে লিয়েই সাঁকো পেরিয়ে চলে যাও। হাতে গরম পেরেম পাবে।"

"লেহশালা। তা আগে বলবি তো মাইরি! তালে অত জম্পেস করে চা-ফা খেতাম না।"

"চা-টা খেয়ে মোগলাইটা নিয়ে যাও। দুজনে পেরেমের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ো।"

"তোমার কেসের কী হল গুরু? ওই স্কুটারের মেয়েটার!"

"সে তো সঙ্গেই চলে গেছে। ক্লিন। ভোতকা লাইফে কাউকে কখনও ভোগলা দেয়নি।"

"তা নয় হল, কিন্তু পুলিশ কেস তো করেছে। সে কেসের কী হবে?"

"সে থানার মক্কেল, আর মোটর ভেহিকেলস আর ইনশিয়োরেন্স কোম্পানি বুঝবে। আমার গায়ে হাত দেয় কোন শালা? গায়ে হাত দেওয়ার জন্যে বুঝি মালিক মাসমাইনে করে এত লোক রেখেছে?"

"তোমার মালিককে তো দেখিই না আজকাল। মেলা রেলা হয়েছে, না? শুনছি, দশখানা প্রাইভেট খাটাচ্ছে?"

"আমিও শুনেছি। আজ তো তার আসবার কথা। শ্বশুরবাড়িতে বিয়ে তাই তিনটে বাস উইথড্র করতে হবে। এখানে এসেই বলে যাবে। এল বলে। এও শুনছি যে আগামীবার এম. এল. এ-র জন্যে দাঁড়াবে ইলিকসানে।"

"তা'লে তো মাল প্রচুর জমেছে র‍্যা!"

"মাল তো জমেছেই। তাছাড়া ইলিকসানে দাঁড়ালে গাড়ি ধরতে পারবে না ইলিকসান ডিউটির জন্যে! ওই সময়ে গাড়ি কম থাকায় ভাড়াও বেড়ে যায় অনেক। এক ঢিলে দুই পাখি।"

জিষ্ণুর সব অঙ্ক গুলিয়ে গেল। মালিক? না কর্মচারী। কাকে দেবে দাওয়াই? তারপরই ঠিক করল, না, এখানে ব্যতিক্রম। মালিক নয়, কর্মচারী। যে পুষির মাথাটা থেঁতলে দিয়েছে তাকেই দেবে দাওয়াই। লেট দেয়ার বি অ্যান এগজাম্পল।

ভোতকা চা আর মোগলাই খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে গুনগুন করে হিন্দি গান গাইতে গাইতে হঠাৎ পিছন ফিরে বলল, "আরে নেপো। কাল গাড়ির চাকা ভালো করে ধোয়াবি। হেস্টিংস-এর ফাঁকা রাস্তায় এক শালা ট্যালা মাল নিচে চলে এল। চাকায় রক্ত লেগেছে। প্যাসেঞ্জাররা বুঝতেই পারেনি।"

একজন বলেছিল, "কী দাদা?"

বলে দিলুম কুকুর। পথও অন্ধকার ছেলো। গড ইজ গুড বুয়েছিস শালা। আমরা এই বাঙালিরা সেন্টিমেন্টেই মল্লুম!

ভোতকা এবারে এগোচ্ছে তার সাঁটুলির দিকে। জিষ্ণুও উঠে পড়ে এগোচ্ছে। এখন খালের সাঁকো পেরচ্ছে ভোতকা। বড়ো বড়ো গাছ এখানে, জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন, নির্জন, শুধুই প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভিড়। ধারে কাছে কেউ নেই। জায়গাটা খুবই নির্জন। কলকাতা বলে মনে হয় না। জিষ্ণু গিয়ে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে বলল, "দাদা আগুন হবে!"

ভোতকা ঘুরে দাঁড়াল জিষ্ণুর এক হাতের মধ্যে। দেশলাইটা বাড়িয়ে দিতে গেল আর জিষ্ণু পিস্তলটা কোমর থেকে খুলে নিয়েই গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম করে পর পর তিনবার গুলি করল।

"ওরে বাবা!"

বলেই, ভোতকা মাটিতে পড়ে গেল।

জিষ্ণুর রাগটা তখন মরেনি, বরং ঝড়ের পাখির ডানা সাপটানোর মতো প্রবলতর হয়ে ফিরে এসেছে। পুষির মুখ। ইলেকট্রিক ফারনেসের লালিমা। আঁচ। সব ফিরে এসেছে জিষ্ণুর মস্তিষ্কে।

আরও দুটো গুলি করল জিষ্ণু।

পালিয়ে যাবে বলে ও আসেনি। ধরা পড়ার ভয়ে ও ভীত ছিল না। ওকে কাঠগড়ায় যখন দাঁড় করানো হবে তখন মাননীয় বিচারপতিরা ভোতকাকে না তাকে, কাকে বড়ো খুনি বলে রায় দেন তা দেখার ইচ্ছা আছে ওর। জজসাহেবদেরও বিবেকের পরীক্ষা হবে। আইনের কেতাব জিতবে? না জজসাহেবদের মানসিকতা? জানতে চায় জিষ্ণু।

"দাদাবাবু! দাদাবাবু! কী হয়েছে তোমার? জল খাও। জল।"

শ্রীমন্তদা জিষ্ণুকে খাটের উপর উঠিয়ে বসল। বলল, "বোবায় ধরেছে তোমাকে। বুকে হাত দিয়ে শুতে মানা করি এতবার।"

জিষ্ণুর মনে হল, শুধু ওকেই নয়। বোবায় ধরবে কলকাতার সব মানুষদেরই। বুকে হাত দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে যারা সকলে।

"জল খাও। বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল দাও।"

জিষ্ণু বাথরুমে গিয়ে মাথায় থেবড়ে থেবড়ে জল দিতে দিতে ভাবছিল, এই স্বপ্নটা যদি সত্য হত ওর জীবনে, হয়তো মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন অন্তত কিছুটা সার্থক হত। কুকুরের মতো লাথি খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকাকে বাঁচা বলে না।

"কাকিমা কোথায়?"

"ঘরে।"

"হীরুকাকা এসেছিলেন। খেয়ে গেছেন?"

"খেয়েছেন। তবে যেতে পারেননি। শরীরটা খারাপ। রয়ে গেছেন মায়ের ঘরে। কম্পাউন্ডারবাবু এসেছিলেন।"

"কে? গোদা কম্পাউন্ডার?"

"হ্যাঁ।"

"পরী?"

"সে তো ব্যাঙ্গালোরে গেছে?"

"ও। তাইতো! মনে ছিল না।"

"এখন কটা বাজে?"

"আড়াইটে"

"নাও, এবারে শুয়ে পড়োতো দেখি।"

স্বপ্নটাও ভেঙে গেল। এখন দুঃস্বপ্ন; জেগে থেকে।

হাত বাড়িয়ে আরেকটা স্লিপিং পিল খেল জিষ্ণু।

কাকিমার ঘরে হীরুকাকা রাত কাটাচ্ছেন? নাঃ। তারিণীবাবুর কাছে আবার কালই যাবে জিষ্ণু। বাড়িটা সত্যিই অভিশপ্ত হয়ে গেছে। কী যেন নাম মেয়েটির? আশর্বাদী ফুলের মতো মেয়েটির? মামণি?

জিনিভা থেকে টেলেক্স এসেছে যে জিষ্ণুদের কোম্পানির প্রোডাক্টের সবচেয়ে বড়ো ইমপোর্টারের রিপ্রেজেনটিটিভ ভারতে আসছেন। প্রথমে বম্বেতে হেড অফিসে আসবেন। সেখান থেকে এম. ডি-র সঙ্গে যাবেন কোম্পানির সব কটি ব্রাঞ্চেই। ওই ইমপোর্টারই ওদের এক্সপোর্ট বিজনেসের সবচেয়ে বড়ো ক্লায়েন্ট। তাই অফিসে একেবারে সাজোসাজো রব পড়ে গেছে।

বম্বে পৌঁছেই মিস্টার শরবেংকো, সুইস-ফ্রেঞ্চ; গোয়াতে যাবেন এম. ডি-র সঙ্গে উইক এন্ড কাটাতে। সেখান থেকে যাবেন দিল্লি। সেখান থেকে কলকাতা। কলকাতা হয়ে ম্যাড্রাস। কলকাতায় থাকবেন না। তিনি তাজ গ্রুপের হোটেল ছাড়া থাকবেন না। আর কলকাতার তাজ বেঙ্গল তো এখনও খোলেনি। তাই ম্যাড্রাস থেকে আবার ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোর থেকে সেদিনই বম্বে হয়ে ফিরে যাবেন জিনিভা। তাঁর হেডকোয়ার্টার্সে।

চানচানি জিষ্ণুর ঘরে এসেছিল এক কাপ কফি খেতে। কফি খেয়ে পাইপটা ধরিয়ে বলল, "যাই বলো, জিষ্ণু আপ্তে কিন্তু বম্বে থেকেই একটি প্যাঁচ মারবার চেষ্টায় আছে।"

"কীসের প্যাঁচ?"

"ঠিক ব্যাপারটা কী তা জানতে পারলে তো হয়েই যেত! বাট আই অ্যাম অ্যাপ্রিহেন্ডিং সামথিং। ও গুগলি বোলার। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে খেলত ক্রিকেট। লোকাল টিম-এর হয়ে। ওর বল খেলবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায় না। ওর সঙ্গে যারা খেলত তারাই বলেছে।"

জিষ্ণু হেসে বলল, "সেই কবে শেষ ক্রিকেট খেলেছি। চাকরি করতে এসেও প্রতি মুহূর্ত এমন উইকেট গার্ড করে থাকা আমার পোষাবে না।"

"না-পোষালে চাকরিও থাকবে না। শুধু চাকরির বেলাতেই বা কেন? মৃত্যুদিন পর্যন্ত উইকেট গার্ড করে প্যাড ও হেলমেট পরেই বেঁচে থাকতে হবে। আজকের জীবনে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই একমুহূর্ত ওফফ-গার্ড হওয়া মানেই আউট হয়ে যাওয়া। হয় খেলো, নয় খেলতে এসো না। কিন্তু খেলতে যদি আসো তাহলে এমন না করলে মাথা নিচু করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতেই হবে। ইনবিটুইন কোনো ব্যাপার নেই।"

বলেই, হঠাৎ উঠে পড়ে পাইপ থেকে ছাই অ্যাশট্রেতে ঝেড়ে ফেলেই বলল, "চলি। এক্সপেক্টিং আ কল ফ্রম কাশবেকার ফ্রম ব্যাঙ্গালোর।"

"ম্যানিলা যাচ্ছ নাকি? কনফারেন্সে?"

জিষ্ণু শুধোল।

"আমি তো ভাবছি এবারে তোমাকেই পাঠাতে বলব।"

দুটি হাত দুদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "আই অ্যাম টায়ার্ড অফ ট্রাভেলিং। রিয়্যালি টায়ার্ড।"

"ম্যানিলাতে আমি ইন্টারেস্টেড নই।"

জিষ্ণু বলল।

"তবে কি ব্যাংককে?"

জিষ্ণু হেসে ফেলল। বলল, "না। আমি এবার কন্টিনেন্টে যেতে চাই। স্টেটস আর ইংল্যান্ড তো অনেকবারই গেলাম। নর্ডিক কান্ট্রিজ হলেও মন্দ হয় না।"

"ডান। আই উইল পুট আ ওয়ার্ড টু কাশবেকার।"

চানচানি বলল।

জিষ্ণু হেসে বলল, "থ্যাংক উ্য।"

চানচানি চলে গেলে, ইন্টারকম-এ ওর সেক্রেটারি পিপিকে ডাকল একটা নোট ডিক্টেট করার জন্যে। পিপি এসে ঢোকামাত্র বেয়ারা এসে একটি ভিজিটিং স্লিপ দিল। বিরক্ত মুখে স্লিপটা তুলে দেখল জিষ্ণু। বাংলাতে লেখা আছে . "পিকলু। ফাঁকা হলে ডাকিস। আমার কোনো তাড়া নেই।"

বিরক্তিটা আরও বাড়ল জিষ্ণুর। বেয়ারাকে বলল, "ভিজিটার্স রুমমে বৈঠাও সাহাবকো।"

বেয়ারা চলে গেলে পিপিকে বলল, "ডিক্টেশানটা নেওয়া হয়ে গেলে এই ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দেবেন। পাঠাবার আগে বলে দেবেন যে, আমরা সবাই জিনিভার পার্টির আসার ব্যাপারে কীরকম ব্যস্ত আছি। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না। প্লিজ ট্রাই টু ইমপ্রেস হিম অ্যাবাউট দিস। কেন যে আসবার আগে একবার ফোন করেও অসে না, বুঝি না। সবাইকেই এরা নিজেদের মতো ভ্যাগ-বন্ড বলে মনে করে।"

পিপি জানে যে, পিকলু জিষ্ণুর বন্ধু। জানে বলেই অভিব্যক্তিহীন মুখে জিষ্ণুর মুখে চেয়ে বলল, "ইয়েস স্যার।"

"হোয়াট ড্যু উ্য মিন বাই ইয়েস স্যার?"

"আই উইল টেল হিম প্রিসাইসলি হোয়াট উ্য ওয়ান্টেড মি টু টেল হিম।"

"গিভ হিম দ্যা মেসেজ ওনলি; দ্যা হিন্ট। আই ডোন্ট ওয়ান্ট উ্য টু রিপিট ভার্বটিম হোয়াট আই টোল্ড উ্য।"

"ইয়েস স্যার। আই আন্ডারস্ট্যান্ড।"

পিপি ডিক্টেশান নিয়ে চলে যাবার পরই পিকলু এসে ঢুকল।

পিকলুর মুখের দিকে চাইল জিষ্ণু। ফার্স্ট-ইয়ারে পড়া পিকলুর মুখটা মনে পড়ে গেল। নীল টুইলের ফুল হাতা গুটোনো শার্ট আর ধুতি পরা কালো ছিপছিপে পিকলু যে দাঁড়িয়ে আছে বইখাতা হাতে কলেজের গেটে জিষ্ণুরই অপেক্ষায়। জিষ্ণু এলে তারপর ঢুকবে একসঙ্গে।

কত্ত ভালোবাসা, কত্ত গল্প, কত্ত কল্পনা, কত্ত সাহিত্যালোচনা, নাটক সিনেমার আলোচনা ছিল সেইসব দিনে। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' দেখে কী তুমুল উত্তেজিত হয়েছিল দুজনে। ফিল্ম "লা দোলসে ভিতা!" "টু ডাই উইথ আ ব্যাঙ্গ অ্যান্ড নট উইথ আ হুইস্পার।"

তখন দুজনে দুজনকে একদিনও না দেখে থাকতে পারত না। না দেখা হলে ফোনে কথা অবশ্যই হত। একাধিক বন্ধুরা বলত, তোরা কি হোমো-সেক্সুয়াল?

হাসত জিষ্ণু। শব্দটি শুনলেই গা-ঘিনঘিন করত।

আজ জীবনের এবং জীবিকার বিভিন্নমুখী চোরাস্রোত দুজনকে কতখানিই না আলাদা করে দিয়েছে। পরিবেশ, রুচি, পরিচিতের পরিধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনযাত্রা অনেকই পালটে গেছে দুজনেরই। একদিন যে তারা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল সে কথা পিপিরই মতো কেউই আর বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করবে না হয়তো ওরা নিজেরাও। মানুষ, নদীস্রোতে ভেসে যাওয়া কুটোরই মতো অসহায়। এক অনুষঙ্গ ছেড়ে তাকে অতি দ্রুত অন্য অনুষঙ্গে ছুটে যেতে হয়। পিকলু অবশ্য অ্যাডভান্টেজই নিয়ে গেছে জিষ্ণুর কাছ থেকে সব রকমের। কিন্তু নিয়েও জিষ্ণুকে তার 'ইনার সার্কল' বের করে দিয়েছে পিকলু নিজে এবং তার বৃত্তের অন্য মানুষেরাও। "আ ম্যান ইজ নোন বাই দ্যা কোম্পানি হি কিপস।' ওরা দুজনে দুরকম হয়ে গেছে। এ জীবনে বোধহয় একে অন্যর সার্কল-এ আর ঢুকতে পারবে না।

জিষ্ণুর একমাত্র দোষ ও বড়ো চাকরি করে। ওকে বড়োই ব্যস্ত থাকতে হয়। নষ্ট করার মতো সময় ওর একেবারেই নেই। সত্যিই নেই। জীবনের যে-সময়টা কেরিয়ার তৈরি করবার, পরিশ্রম কববার; সেই সময়টুকুতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে এবং করেছে। বারো ঘণ্টা কাজ করেছে। পিকলুর চোখে এই সবই জিষ্ণুর দোষ।

পিকলুর মতো সুখী, সাধারণ, গায়ে-হাওয়া-লাগিয়ে-বেড়ানো বন্ধুরা সকলেই একে একে ত্যাগ করে গেছে জিষ্ণুকে। আস্তে আস্তে। প্রথমদিকে মনে হত বুক ভেঙে যাবে। তারপর সয়ে গেছে আস্তে আস্তে। সময়াভাবে, কিছুটা অভিমানে এবং দুঃখেও আর ফিরে ডাকেনি তাদের। বিপরীতমুখী স্রোতে ভেসে গেছে ওরা ধীরে ধীরে।

উষ্ণতা তবুও ছিল। কিছু ছিল। উষ্ণতা সবসময়ই যে নৈকট্য-নির্ভর হবে এমন কোনো কথা নেই। এ-কথা অল্প কয়েকবছর আগে অবধি ওরা দেখা হলেই বুঝেছে। উষ্ণতা সহজে মরে না। তাপ থেকে যায় অনেকদিনই, একবার সঞ্চারিত হলে। কিন্তু আজ সেইটুকু উষ্ণতাও আর নেই। পিকলুর শেষ তঞ্চকতার পর জিষ্ণু এই পুরোনো সম্পর্কটাকে গলা টিপে মেরে ফেলে নিজে বিবেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ সম্পর্ককে গলা টিপে মারতে কতখানি যে কষ্ট পেয়েছিল তা জিষ্ণুই জানে। কিন্তু যা থাকার নয়, তাকে না রাখাই ভালো। যে সম্পর্কর মধ্যে সত্য নেই, আন্তরিকতা নেই; তা তো নেই-ই। আর যা নেই, তা আঝে বলে মনে করে আনন্দিত হবারও কিছু নেই। যথেষ্ট বয়স হয়েছে জিষ্ণুর। একটা মিথ্যা এবং দুষ্ট সম্পর্ককে খুন করতে ও এখন আর অপারগ নয়। ফালতু সেন্টিমেন্ট রাখে না ও আর কারো জন্যই। সে পিকলুই হোক আর যেই হোক। শুধু পরীকে নিয়ে কী করবে সেটাই ঠিক করে উঠতে পারেনি।

কিন্তু যদিও জিষ্ণু ভেবেছিল পিকলুকে তার জীবন থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে পেরেছে, কিন্তু পিকলু ঘরে ঢুকতেই তার মুখের দিকে চেয়েই ওর বুকের মধ্যেটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। ও জানত না যে পুরোনো সম্পর্কর শিকড় বটের শিকড়ের মতোই বুকের বড়ো গভীরে গিয়ে বাসা বাঁধে চুপিসাড়ে।

আন্তরিকভাবে বলল, "কী রে! ভালো আছিস?"

"ভালোই তো আছি। নাথিং টু কমপ্লেইন বাউট।"

"খুশি কেমন আছে? আর তোর কন্যা?"

"তুই কেমন অছিস বল?"

কথা ঘুরিয়ে পিক্‌লু বলল।

"আমি? ভালোই।"

"দাড়ি কামাসনি কেন?"

জিষ্ণু শুধোল।

"এমনিই। ভাবছি রাখব।'

"চা খাবি?"

"নাঃ। তুই খুব ব্যস্ত শুনলাম। এমনিতে তো ব্যস্ত থাকিসই। জানি। আমি উঠি এবারে।"

"তাহলে এসেছিলি কেন?"

"জাস্ট এমনিই তোকে অনেকদিন দেখিনি। এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, দেখে যাই তোকে।"

বলেই জিষ্ণুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই উঠে দাঁড়াল পিক্‌লু।

বলল, "চলি রে।"

বলে, সত্যি সত্যিই চলে গেল।

পিক্‌লু চলে যেতেই মনটা হঠাৎই খারাপ হয়ে গেল জিষ্ণুর। ব্যস্ত ছিল ঠিকই তবে এমন কিছু ব্যস্ত ছিল না যে ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গেও দুটো কথা বলা যায় না। চাকরিতে অনেকই সুবিধে বিশেষ করে মার্কেন্টাইল ফার্মের চাকরিতে। ডাক্তার বা উকিল বা সলিসিটার হলেও না হয় কথা ছিল। মক্কেলদের গোপন কথা থাকে। নিজস্ব পেশায় খাটুনি অনেক বেশি। চাকরি, সে যে-কোনো চাকরিই হোক না কেন, তাতে বন্ধুকেও দিতে না-পারার মতো সময়ের অভাব কোনোদিনই হয় না। 'কনফারেন্স' 'মিটিং' ইত্যাদি গালভরা শব্দ অপারেটর বা সেক্রেটারিকে দিয়ে অন্যকে বলিয়ে নিজের ইম্পর্ট্যান্স বাড়িয়েও সহজে আড্ডা মারা যায়। প্রাইভেট সেকটরের অফিসারেরা যতখানি ব্যস্ত থাকেন বলে ভাব দেখান, ততখানি আদৌ থাকেন না যে, তা জিষ্ণু নিজেও জানে।

কী যেন নাম ছিল পাহাড়টার? ডিগারিয়া? মনে পড়েছে। একবার দেওঘরে গেছিল বিকাশ আর পিকলুর সঙ্গে। এই দেওঘরেই গেছিল অনেক ছেলেবেলায় প্রথমবার পরী আর কাকিমার সঙ্গে।

এপ্রিল বা মে মাসে গেছিল ওরা। তিন বন্ধু। বিকাশদের বাড়ি ছিল নন্দন পাহাড়ের রাস্তাতে। মস্ত বাগানওয়ালা বাড়ি। নানারকম ছোটো বড়ো ফুলের গাছ ছিল। পাশের বাড়িতে দুটি অল্পবয়সি মেয়ে বেড়াতে এসেছিল তাদের দাদু দিদিমার কাছে। তাও মনে আছে। সন্ধ্যাবেলা সে-বাড়িতে গানটান হত। পিক্‌লুর গানের গলা ছিল ভারি সুন্দর। আর জিষ্ণু যেরকম লাজুক ছিল ঠিক তার উলটো। যে-কোনো মানসিক স্তরের স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গেই ও পাঁচ মিনিটে ঘনিষ্ঠ হতে পারত।

ডিগারিয়া পাহাড়ে গেছিল, দেওঘর শহরের দোকান থেকে দুটো সাইকেল ভাড়া করে। সাইকেল ভাড়া করেছিল বড়োলোকের ছেলে বিকাশও। কিন্তু জিষ্ণুরা গিয়ে পৌঁছোবার পর পেছনে তাকিয়ে অনেক দূরে ওরা দেখল যে একটি টাঙার উপরে সেই ভাড়া-করা সাইকেলটিকে উঠিয়ে জমিদারি পোজ-এ হাতের উপর থুতনি রেখে ঝুমঝুমি-বাজানো দুলকিচালে নাচতে নাচতে আসা টাঙাতে চড়ে বিকাশ আসছে।

খুব ঘূর্ণি হাওয়া ছিল সেদিন। পথের লাল ধুলো আর শুকনো পাতা উড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রায় দশ মিটার মতো উঁচু এক স্তম্ভর সৃষ্টি করেছিল ঘূর্ণি হাওয়াটা। পিকলু আর জিষ্ণু দুই কলকাতার ছেলে অবাক বিস্ময়ে দেখেছিল।

একবার বর্ষাকালে দেওঘরে যাবার অনেকদিন পরে তোপচাঁচিতে গেছিল ওরা। তখন জিষ্ণুর পড়াশুনো শেষ করে চাকরিতে সবে ঢুকেছে, পিকলুও একটি স্কুলে পড়ায় অন্য একজনের

বদলিতে। ধানবাদ শহরের কাছেই তোপচাঁচি। ঝরিয়া ওয়াটারবোর্ডের বাংলোতে ছিল। বিরাট বিরাট ঘরওয়ালা বাংলো, তোপচাঁচি হ্রদের কাছেই। পিকলু গান গাইত গলা ছেড়ে। জিষ্ণু লেখালেখির চেষ্টা করত। সকালে বিকেলে তোপচাঁচি হ্রদের পাশের রাস্তা ধরে পুরো হ্রদটি প্রদক্ষিণ করত দুই বন্ধুতে পায়ে হেঁটে, যৌবনের অশেষ জীবনী শক্তিতে ভেসে। পিকলুই জিষ্ণুকে হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল সেই বিখ্যাত ইতালিয়ান চিত্র পরিচালকের ছবি 'লা দোলসে ভিতা'র কথা। বার্গম্যান, কুরোসাওয়া, ফেলিনি, আন্তেনিয়োনি, ত্রুফো ইত্যাদি কত পরিচালকের ছবি নিয়ে আলোচনা হত। সত্যজিৎ রায়ের ছবিও।

পিকলুর এক মামাতো ভাই ছিল, যে যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে এম.এ. পাস করেছিল। তখন বুদ্ধদেব বসু নেই। নরেশ গুহ ছিলেন। সেই বন্ধু কত জানে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য সম্বন্ধে তার কী গভীর জ্ঞান সেই সব বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলত পিকলু। আর জিষ্ণু শুনে ভাবত জীবনটাই বৃথা গেল তুলনামূলক সাহিত্য ছাত্র না হতে পেরে।

পিকলু চলে যাওয়ার পর একা ঘরে বসে অনেকই পুরোনো কথা ভাবছিল জিষ্ণু। কোনো টেলিফোন কল দিতেও মানা করে দিয়েছিল। এক সময় হঠাৎই পিপি ইন্টারকমে বলল, "মে আই কাম ইন স্যার?"

"ইয়েস।"

পিপি ঘরে এসে বলল, "আমি কি চলে যাব স্যার? আমাকে কি দরকার হবে আপনার?"

"কেন? ক-টা বেজেছে?"

"সাড়ে-পাঁচটা বেজে গেছে স্যার।"

"সাড়ে-পাঁচটা? মাই গুডনেস। কখন? কী করে?"

পিপি সিজনড সেক্রেটারি। বস-এর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

দেওয়ালের কোয়ার্টজ ঘড়িটার দিকে চেয়ে জিষ্ণু দেখল পৌনে ছ-টা বাজে প্রায়। ও তাড়াতাড়ি বলল, "আপনি চলে যান। আজকে আর কোনো দরকার নেই। ফাইল পড়তে পড়তে খেয়ালই ল না।"

পিপি বলল, "স্যার।"

"কি?"

"যে ভিজিটর আপনার কাছে এসেছিলেন, মানে আপনার বন্ধু, তিনি একটা চিঠি দিয়ে গেছেন আমাকে।"

"হাউ ফানি! এতক্ষণ দেননি কেন আমাকে?"

"উনি বলে গেছিলেন যে আমি চলে যাবার সময়ই যেন দিই। আগে দিতে মানা করেছিলেন।"

"হুম ড্যু উ্য সার্ভ হিয়ার মিসেস সেন? হিম? অর মি?"

"আই অ্যাম ভেরি সরি স্যার। এমন করে অনুরোধ করলেন যে 'না' করতে পারলাম না।"

"দিন চিঠিটা।"

মিসেস সেন ওঁর হ্যান্ডব্যাগটি থেকে একটি খাম বের করলেন। বেশ বড়ো খাম। এবং রীতিমতো ভারী। খামের উপরে পিকলুর দুর্বোধ্য হাতের লেখায় জিষ্ণুর নাম।

ওর হাতের লেখা নিয়ে ঠাট্টা করলেই পিকলু জিষ্ণুকে বলত : "এফিশিয়েন্ট মেন হ্যাভ ব্যাড হ্যান্ড-রাইটিং। রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ ওয়ান অফ দ্যা ফিউ একসেপশানস।"

পিপি বলল, "আমি তাহলে আসছি স্যার?"

"হ্যাঁ। আসুন।"

পিকলুকে জিষ্ণু মুছেই ফেলেছে তার জীবন থেকে। সম্পর্ক একবার মরে গেলে তাকে ঝাড়ফুঁক করে জাগানো যায় না। গেলেও, সে সম্পর্ককে মনে হয় রক্তাল্পতায় বা ন্যাবায়-ধরা

রোগী।

পেছন-ফেরা মিসেস সেনের দিকে চেয়ে রইল জিষ্ণু। বেশ মেয়েটি প্রিটি। অ্যান্ড শি নোজ হাউ ট্যু ক্যারি হারসেল্ফ। কিন্তু পিকলুর চিঠিটা এতক্ষণ না দেওয়াতে রেগেছিল ও। চিঠিটা এত বড়ো যে পড়া যাবে না অফিসে বসে। কী লিখেছে পিকলু কে জানে? পিকলুর চেহারাটা অবশ্য বেশ খোলতাই দেখাল আজকে। কী ব্যাপার কে জানে?

পিপি মেয়েটিকে দেখে বাইরের কেউই বুঝতে পারে না বিবাহিতা কি না! আজকালকার কম মেয়েকে দেখেই বোঝা যায়। জিষ্ণু অবশ্যই জানে। অফিসেরই বিভিন্ন জনের কাছে শুনেছে জিষ্ণু যে, পিপির স্বামীর জীবিকা হচ্ছে পৌনঃপুনিক বেকারত্ব। প্রচণ্ড মদ্যপ এবং রেসুড়ে লোক। নাম সুমন্ত্র। একটি বাচ্চাও আছে ওদের। মেয়ে। পিপির উপরেই সব কিছু। মদ, রেস, সিগারেট। বিবেক বলে কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই সুমন্ত্রর। ধুয়েমুছে ফেলেছে অনেকেই দিন আগে। বেশ আছে বিবেকের মতো ইনকনভিনিয়েন্ট ব্যাপার আর নেইও দুটি।

লোকমুখে শুনেছে কাজের মধ্যে সুমন্ত্র তিনটি কাজ করে। সকালে উঠে কেতুরচোখে বাসিমুখে সিগারেট ধরিয়ে মাদার ডেয়ারির ডিপো থেকে দুধ এনে দেওয়া এবং মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসা। এবং স্কুল থেকে নিয়েও আসা। মেয়েটা মাকে কম পায় বলেই বাবা-ন্যাওটা। সুমন্ত্রও মেয়েকে এক মুহূর্ত চোখ-ছাড়া করতে চায় না। পিপি যথেষ্ট সুন্দরী, সপ্রতিভ এবং বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুদ্ধি থাকলেই মানুষ তাকে কাজে লাগায়।

জিষ্ণু এও শুনেছে যে, পিপি ডিভোর্স চেয়ে কেস ফাইল করেছে সুমন্ত্রর বিরুদ্ধে। এবং হয়তো পেয়েও যাবে। সুমন্ত্র নাকি বিশ্বাস করেনি একথা। নোটিশ ছিঁড়ে ফেলেছে। সবাইকে বলেছে, বাজে কথা। পিপিতো আর পাগল হয়নি!

সুমন্ত্রকে কোনোদিন আগে চোখেও দেখেনি জিষ্ণু। দেখার কৌতূহলও ছিল না। একদিন একটি প্রাইভেট ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরছিল সেনগুপ্ত সাহেবের সঙ্গে। শর্ট-কাট করতে ড্রাইভার যখন একটি সরু গলিতে ঢুকিয়ে গাড়ি, তখনই সেনগুপ্ত সাহেব বললেন, "ওই দেখুন চাটুজ্জে সাহেব আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারির স্বামী।"

যে-মানুষটাকে দেখেছিল জিষ্ণু তার সঙ্গে পিপির কোনোরকম মিলই ছিল না। মোড়ে জ্যাম. ট্যাক্সিটার স্পিড ঠিক সেই মুহূর্তেই আস্তে হয়ে গিয়ে প্রায় থেমেই গেছিল। একটি মলিন বাড়ির একতলার খোলা দরজার সামনে ছোট্ট তিন-ধাপ কেটে যাওয়া লাল-সিমেন্টের সিঁড়ির উপরের ধাপে একজন মানুষ বসে ছিল। তার পরনে লালরঙা একটি স্লিপিং-সুটের পাজামা। গায়ে, নোংরা হলুদ-হয়ে-যাওয়া বোতামহীন একটি সাদা পাঞ্জাবি। নিচে গেঞ্জি নেই। বুকের কাঁচাপাকা চুল দেখা যাচ্ছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ের রঙ কালো। মুখটি কুৎসিত না হলেও, শ্রীহীন। জুলপির দু-পাশের চুলে পাক ধরেছে। দুটি পা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে জগতের তাবৎ নির্লিপ্তি নিয়ে সে বসে বসে হলদে-রঙা ছোট্ট বই থেকে ঘোড়াদের কুলজি-ঠিকুজির সুলুক-সন্ধান করছিল। আগামীকাল শনিবার। ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে একটি সিগারেট দ্রুত পুড়ে যাচ্ছিল বিকেলের উথাল-পাথাল হাওয়ায়।

যেন তার ভবিষ্যতেরই মতো!

কিন্তু মানুষটার মুখে চেয়েই জিষ্ণুর মনে হয়েছিল যে, মানুষটা সম্ভবত ভালো। সে মদ্যপ হতে পারে, বেকার হতে পারে, রেসুড়ে হতে পারে কিন্তু মানুষটা দুষ্ট নয়। খল, ইতর বা কুচক্রী নয়। তঞ্চক নয়। তার মুখে এবং কপালে এই কথাটি বড়ো বড়ো করেই লেখা ছিল। পৃথিবীর কারো বিরুদ্ধেই, এমনকী সম্ভবত পিপির বিরুদ্ধেও সুমন্ত্র নামক মানুষটির বোধহয় বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। দুবেলা দু মুঠো খেতে পেলেই, চার প্যাকেট সিগারেট এবং প্রতি শনিবারে পঞ্চাশটি টাকা ঘোড়ার মাঠের জন্যে; সে প্রচণ্ড সুখী।

এত সব ডিটেইলস অবশ্য সেনগুপ্ত সাহেবের কাছেই শুনেছিল। তবে মানুষটিকে দেখে জিষ্ণুর বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল যে, এর স্ত্রীই ভুরু প্লাক-করা, স্লিভলেস ব্লাউজ-পরা, আপাদমস্তক নিখুঁতভাবে ডি-ওয়াক্সিং করা সুবেশা, সুগন্ধী পিপি। তার সেক্রেটারি। কী অমিল স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে। ভাবা যায় না। মানুষটির আশ্চর্য নির্লিপ্তি এবং অসাধারণ অসাধারণত্ব নাড়া দিয়েছিল ভীষণভাবে জিষ্ণুকে।

গাড়ির স্পিড বাড়তেই সেনগুপ্ত সাহেবকে বলেছিল জিষ্ণু, "বুঝলেন, এই ধরনের মানুষেরাই খুব বড়ো মাপের দার্শনিক হয়ে উঠতে পারে। সমাজে থেকেও সমাজের প্রতি এদের যে ঔদাসীন্য এটা সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করার নয়।"

"মাই ফুট!"

বলেছিলেন সেনগুপ্ত সাহেব।

"হি ইজ আ স্কাউন্ড্রেল। ওর স্ত্রী যে সপ্তাহে তিনদিন অন্য লোকের সঙ্গে শুয়ে আসছে তা ও জানে।"

কথাটাতে খুব ধাক্কা লেগেছিল জিষ্ণুর।

একটু থেমে সেনগুপ্ত সাহেব বললেন, "আই নো ফর সার্টেন যে পিপি একটি রেসপেক্টেবল 'হোর' হয়ে উঠেছে। শি টেকস ওয়ান থাউজ্যান্ড ফর বিয়িং ডাগ ওয়ান্স। নট আ ম্যাটার অফ জোক। মাসে দশ হাজার এক্সট্রা ইনকাম করে। অবশ্য অমন অ্যাকমপ্লিশড সফিস্টিকেটেড মেয়ের পক্ষে ওই তো মিনিমাম 'রেট'। সুমন্ত্রর মতো স্বামী পেয়েছিল বলেই তো সম্ভব হল এমন। এজন্য পিপির অবশ্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সুমন্ত্ররই কাছে। এত এক্সপেনসিভ শাড়ি, জুয়েলারি, মাসের একটি উইক-এন্ডে কোথাও-না-কোথাও যাওয়া। বছরের ছুটিতে গোয়া, কাঠমাণ্ডু, কাশ্মীর একথা কী আর এমনিতে হত? তাও তো সঙ্গে ক্লায়েন্ট নিয়ে যায়। এক পয়সাও খরচ নেই। সঙ্গে সুমন্ত্র আর মেয়েটাও যায়। সুমন্ত্রর মনে সুমন্ত্র থাকে। রাতে মেয়েকে নিয়ে শোয় অন্য ঘরে। আর পিপি ক্লায়েন্টের সঙ্গে। সত্যি। কত রকম জীবনই থাকে মানুষের। মুখোশ। ভাবা যায় না। মানুষটার কোনো আত্মসম্মান আছে বলে ভাবেন আপনি? মানে এই সুমন্ত্রর?"

"এত খবর আপনি জানলেন কী করে?"

"জানতে হয়।"

"মানে?"

"কাউকে বলবেন না, রিজিওন্যাল ম্যানেজারকে এম. ডি রাতে ফোন করেছিলেন কাল। আর. এম আমাকে ডেকে বললেন।"

"কী?"

"যে ক-দিন ওঁরা কলকাতায় থাকবেন সে ক-দিন পিপি ইভনিং-এ যেন ফ্রি থাকে। ওকে ওখান থেকে ম্যাড্রাস এবং ব্যাঙ্গালোরেও যেতে হতে পারে।"

"বলেন কী? আমার পি. এস?"

"হ্যাঁ। সে ক-দিন আপনার কাজ করে দেবে আর. এম-এর পি. এসই। আজকে ওর কাছ থেকে ছুটির অ্যাপ্লিকেশান পাননি? মানে, কপি? পার্সোনেল ম্যানেজারকে অ্যাড্রেস করা?"

সেনগুপ্ত সাহেব সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর মতো বলেছিলেন।

জিষ্ণু বলেছিল, "হ্যাঁ পেয়েছি।"

"আগে থেকেই ব্যাপারটাকে ক্যামোফ্লেজ করে রাখা হচ্ছে। বুঝলেন না? অন্য কালার দেওয়া হচ্ছে। আমার এসবের মধ্যে থাকতে আর ভালো লাগে না মশাই। বুয়েচেন।"

"আপনি এর মধ্যে কোথায় থাকছেন?"

"জানছিতোরে বাবা! জানলেও পাপ লাগে। মিডল ক্লাস মরালিটির মানুষ আমরা। রক্ষণশীল ভদ্র শিক্ষিত বদ্যি পরিবারে জন্ম আমার। লজ্জা লাগে মশায়। এসব জেনেও লজ্জা লাগে।"

"তাই?"

"না তো কী। একটি সুন্দরী অল্পবয়সি মেয়ে, আফটার অল বাঙালি মেয়ে। স্বামী আছে। মেয়ে আছে। চোখের সামনে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে আর তা আমাদের দেখতে হবে? এটা ভেবে খারাপ লাগেই।"

"চোখের সামনে একটি পুরো জাত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে জন্যেই বা কী করতে পারছেন? তাছাড়া আপনি যা বলছেন তাতে নষ্ট তো সে হয়ে গেছেই; যারা নষ্ট হবার প্রবণতা নিয়ে জন্মায় তাদের নষ্ট হতে কোনো কষ্টই নেই, বরং বোধহয় একধরনের আনন্দই আছে।"

"তাই? কী জানি মশায়। আপনারা কবি মানুষ আপনাদের দেখার চোখই আলাদা।"

সেনগুপ্ত সাহেব বললেন।

হয়তো আপনিই ঠিক বলছেন। হয়তো পিপি ইজ এনজয়িং হারসেল্ফ। চমৎকার সব এয়ার কন্ডিশানড গেস্ট-হাউস, দিল্লি-বম্বে-ম্যাড্রাস-ব্যাঙ্গালোরের ফাইভ স্টার হোটেলের এফেক্টিভলি এয়ার-কন্ডিশানড ঘরের নরম মসৃণ বিছানা। রথী-মহারথী সব শয্যাসঙ্গী। ও তো সুখেই আছে। ওর সুখের জন্যে আমরা দুঃখ পেয়ে মরতে যাই কেন?"

বলেই, বিবেক-দংশন মুক্ত হয়ে একটি সিগারেট ধরালেন।

পাশে দাঁড়ানো একটা স্টেটবাস। এমন ডিজেলের ধোঁয়া ছাড়াল আর তার সঙ্গে দমকা হাওয়ায় উড়ে-আসা আন্ডার-কনসট্রাকশন একটি মালটিস্টোরিড বাড়ির ধুলো থেকে বাঁচতে দু চোখ বন্ধ করে ফেলল জিষ্ণু।

সেনগুপ্ত সাহেব নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, "এ শালার শহরে আর থাকা যাবে না। চারদিকের এই অবস্থা, নোংরা, ধোঁয়া, কালির মধ্যে মানুষের মতো নিশ্বাস নিয়ে বাঁচাই ভাবি মুশকিল মশায়। জ্যোতিবাবুদের লাজ-লজ্জা কি সবই গেছে? একেবারেই দু কান কাটা হয়ে গেছে ওরা মশাই!"

বলেই, সেনগুপ্ত সাহেব আবার সঙ্গে সঙ্গে নাকে রুমাল চাপা দিলেন।

উনি পথে বেরুলেই রুমাল চাপা দিয়ে রাখেন নাকে। ধোঁয়া, ধুলো, জীবাণু, বালি এই সবে ওঁর খুব ভয়। তারা যেন শুধুমাত্র ওঁকেই আক্রমণ করছে সবসময় এই রকম বিশ্বাস আছে ওঁর। জিষ্ণু ভাবছিল, সেনগুপ্ত সাহেবের চোখে কি বাইরের ধুলোবালিটুকুই পড়ে শুধু? এই শহরের মানুষদের বুকের মধ্যের, মস্তিষ্কের মধ্যের ধুলোবালি কি ওঁকে পীড়িত করে না? জিষ্ণুকে কিন্তু করে। প্রতিমুহূর্তেই করে।

ইন্টারকম পিঁ পিঁ করল।

আজ কী হয়েছে জিষ্ণুর কে জানে! শুধু ভাবনাতে পেয়েছে। কোনো কাজও হল না চানচানি ওর ঘর থেকে চলে যাবার অথবা পিকলুর চলে যাবার পর থেকে। ইন্টারকম আবার পিঁ পিঁ করে উঠল।

সেনগুপ্ত সাহেব ইন্টারকম-এ বললেন, "ক্লাবে যাবেন নাকি? আই নিড আ স্টিফ ড্রিংক।"

"না আপনিই যান। আমার একটু কাজ আছে।"

"পার্সোনাল অ্যান্ড প্রাইভেট?"

"ওয়েল, সর্ট সফ।"

"ফাইন। উইশ উ্য ওল দ্যা বেস্ট।"

বিরক্ত হয়ে ইন্টারকম-এর রিসিভারটা নামিয়ে রাখল জিষ্ণু। লাল আলোটা দুবার ব্লিঙ্ক করে নিভে গেল। সব সময়ে বোকাবোকা রসিকতা ভালো লাগে না।

কলিগদের মধ্যে সেনগুপ্ত সাহেবের মতোই বেশি। ওঁরা রোজ ড্রিংক করেন না। বৃষ্টি যেদিন পড়ে সেদিন করেন এবং আর যেদিন পড়ে না সেদিন। এবং কোনো সমস্যা, কোনো সমাধান, কোনো আনন্দ অথবা দুঃখ সবেতেই ওঁদের একটি 'স্টিফ-ড্রিংক'-এর দরকার হয়ই। বেশিরভাগেরই একই কথা, একই রসিকতা, একই অ্যাম্বিশান, একই পরচর্চা। পরচর্চাব বৃত্তটিরও কোনোই হেরফের নেই। টোটালি মানভেন।

অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল জিষ্ণু। ওকে একটি এয়ারকন্ডিশানড মারুতি দিয়েছে অফিস থেকে। শস্তাতে। পুষির দুর্ঘটনার পর থেকেই আর. এম. বারবার বলেছেন, যতদিন ফ্ল্যাট না পাও, গাড়ি আমাদের রিপেয়ারারের গ্যারাজেই থাকবে। কিন্তু তোমাকে স্কুটারে আর চড়তে দেব না আমি। তোমাকে কন্টেসাও দিতে পারতাম। কিন্তু তোমার গলিতে তো তা ঢুকবে না। বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে ড্রাইভার তোমাকে। আবার ছেড়ে দিয়ে আসবে। গাড়ি চালানোটা শিখে নাও। আজকাল ড্রাইভারদের যা বোলচাল আর ওভারটাইম তাতে ছুটির দিনে নিজে না চালালে মাবিলিটিই থাকবে না।

ফেরবার সময় গাড়ি বেশিরভাগ দিনই নেয় না জিষ্ণু। প্রথমত অফিসের ড্রাইভার। ওভারটাইম দিতে হয় পাঁচটার পরই। নিজের দিতে হয় না যদিও। তবু গায়ে লাগে। একটু হাঁটাহাঁটি হয়। তাছাড়া, জিষ্ণু পুরোপুরি গাড়ি-নির্ভর হতে চায় না। সব ক্যাপিলিস্টদের ওই এক কায়দা। যার যোগ্যতা দুশো টাকার তাকে দু হাজার দেয়, যার দু হাজারের তাকে দশ হাজার। ফ্ল্যাট, গাড়ি, আরাম ছুটি সব। তারপর তাকে দিয়ে পা-ও চাটিয়ে নেয়, হামাগুড়ি দেওয়ায়, অন্যায় কাজ করাতে বাধ্য করে সব রকম। মানুষগুলোর বিবেকগুলোকেও পোষা কুকুরের মতো করে ফেলে। জিষ্ণু দেখছে, দ্যাখে চারদিকে এমনই অনেক মানুষকে। তাই পুরোপুরি পরনির্ভর হতে চায় না ও। এটা না হলে চলে না, ওটা না হলে চলে না-তে বিশ্বাস যাতে না করতে হয়, তারই চেষ্টা করে ও। এখনও করে। অবশ্য বিয়ে করলে, মানুষ হিসেবে হয়তো বদলে যাবে। অনেককেই বদলে যেতে দেখেছে। সপ্তাহে গড়ে তিনদিন হেঁটে বা অন্যভাবে বাড়ি ফেরে ও। পথের জনপ্রবাহের সঙ্গে মিশে সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে হাঁটতে ওর খুব ভালো লাগে। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে, চকিত-চাউনি, চলে-যাওয়া বা এগিয়ে-আসা নারী ও পুরুষের মুখের এক এক ঝলক। এক ধরনের একাত্মবোধ নিমেষে সঞ্চারিত হয়ে যায় তখন ওর মধ্যে।

আজ পথে যখন বেরোল তখনও আলো ছিল। ওদের অফিসের কম্পাউন্ডের মধ্যেই গেটের পাশের দুটি বড়ো কদমগাছে ফুল এসেছে অজস্র। ঝিম-ধরা গন্ধ পায় একটা। গাছগুলির কাছে গেলেই। ফোটা কদম নিচে পড়ে রয়েছে। এই কংক্রিটের শহরে এর দাম নেই। কদম ফুল চেনেই বা এখানে কজন?

আকাশে তাকিয়ে আজ হঠাৎই বাড়িওয়ালা তারিণীবাবুর কন্যাসমা মামণির মুখটি মনে পড়ে গেল। আজকের বিকেলবেলার আলোর মতোই স্নিগ্ধ সেই মুখ। অথচ এই ভরা-ভাদরের গরমেরই মতো এক ধরনের আর্দ্র জ্বালাও যেন মিশে আছে। এবারের চলে যাওয়া গরমের মতো পাগল করা এলোমেলো হাওয়ার মতোই কিছু। কলকাতার বাইরের চেহারটাই শুধু বদলায়নি, বদলায়নি স্কাইলাইন, ভিন-রাজ্যের বাসিন্দাদের ভিড়ে এই শহরের বাঙালিত্ব বদলে গেছে, বদলে গেছে আবহাওয়াটাও পুরোপুরি। কলকাতায় আজন্ম বসবাসকারী কোনো বৃদ্ধও এই গ্রীষ্মের মতো এমন

দিনরাত এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া দেখেননি। মে মাসে দেখেননি শ্রাবণের বৃষ্টি। সব ওলট-পালট, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

পুরো নামটি কি মামণির? কে জানে? তার ছবি ও অন্যান্য বিবরণ, আশা করছে জিষ্ণু, আজকালের মধ্যেই এসে যাবে। এসে যাওয়ার পর কী করবে তা ও জানে না। তখনই ভেবে দেখবে।

টাইয়ের নটটা আলগা করে দিল। বড়ো গরম। কোটের বাঁ পকেটে পিকলুর চিঠিটা। ভারী চিঠি। বড়ো খামে। পিকলুর কী এমন বলার থাকতে পারে যা ও মুখে বলতে পারল না জিষ্ণুকে? আশ্চর্য!

পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওয়ালডর্ফ-এর সামনে দিয়ে যেতে যেতে সেখানেই ঢুকল। এখন ভিড় নেই। দোতলায় উঠে একটি শার্কস-ফিন স্যুপ, আমেরিকান চপ-স্যুই এবং চাইনিজ টি-র অর্ডার দিয়ে চিঠিটা বের করল পকেট থেকে। বাড়ি গিয়ে আজ আর খাবে না। পরী এখনও ফেরেনি ব্যাঙ্গালোর থেকে। বাড়িটা আর বাড়ি নেই। শিশুকাল থেকে মাতৃ-পিতৃহীন হওয়া সত্ত্বেও পরী আর কাকিমার জন্যে মা-বাবার অভাব কখনও বোধ করেনি। পুষির মৃত্যু এবং কাকিমা ও পরীর এই হঠাৎ বিপরীতমুখী পরিবর্তন ওকে বড়ো একলা করে দিয়েছে। পিকলুর খলতাও। পিকলুই বলতে গেলে ওর একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এই মুহূর্তে জিষ্ণু যতখানি একলা ততখানি একলা ও কোনোদিনই ছিল না।

মামণির নামটি জানলে আজ একটি চিঠি লিখত তাকে। নাম দিত না নিচে। আজকের এই উজ্জ্বল কদমফুল ফোটা বিকেলের মতোই হত সেই চিঠি।

পিকলুর চিঠিটা খুলল জিষ্ণু।

জিষ্ণু প্রিয়বরেষু,

ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে একলা কোথাও বসে, পুরোনো দিনের মতো অনেক অনেক গল্প করব। তোকে অনেক কিছু বলারও ছিল। যা বলার, তা তুইই সেদিন আমাকে বলেছিলি। একতরফা। আমার কথা শোনার ধৈর্য তোর ছিল না। বলার মতো মানসিক অবস্থাও অবশ্য আমার ছিল না।

একথা সত্যি যে আমি রেস-এর মাঠে যেতাম নিয়মিত। কিন্তু তোর কাছে যতবার ধার চেয়েছিলাম রেস-এর মাঠের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না। বিয়ের পর পরই খুসির গয়না বন্ধক দিয়ে আমি রেস খেলতাম। এই আশাহীন পৃথিবীতে হয়তো রেসুড়েরাই একমাত্র বিশ্বাস করে যে, আশা আছে। তোর সেক্রেটারি পিপির স্বামী সুমন্ত্রও তাই করে। বড়ো ভালো ছেলে সুমন্ত্র। তোর মতো বা তার স্ত্রীর মতো "সাকসেসফুল" নয় জীবনে। প্রত্যেক রেসুড়েই বিশ্বাস করে যে একদিন, একদিন কোনো বিদ্যুৎগতি চিকন ঘোড়া স্বপ্নের পক্ষীরাজের মতো তাদের জীবনে সব কিছু স্বপ্ন সফল করে তুলবেই তুলবে।

জিষ্ণু, তোর কাছে টাকা ধার করেছিলাম বহুবার। কতবার যে তা তুই নিজেই ভুলে গেছিস। বার বার মিথ্যে কথা বলেই নিয়েছিলাম। খুকি হওয়ার সময়ে তুই নিজেই টাকা দিয়েছিলি। আমি চাইনি। তোর কাছে আমি চিরঋণী। কিন্তু টাকা মিথ্যে কাজে লাগেনি। তোর টাকা দিয়েই খুসির যে ক-টি গয়না বন্ধক দিয়েছিলাম তা ছাড়িয়ে এনে ওকে ফেরত দিয়েছিলাম। দিতে যে পেরেছিলাম তা আজকে মনে করে ভারি ভালো লাগে। খুসিকে খুশি করার মতো খুব বেশি কিছু করতে তো পারিনি। ওকে শুধু কষ্টই দিয়েছি।

তুই আমাকে যতখানি ভালোবাসতিস সেই স্কুলের দিন থেকে অতখানি ভালোবাসা এ জীবনে খুব কম মানুষের কাছ থেকেই পেয়েছি। তোর কাছে মিথ্যে বলার প্রয়োজন আমার ছিল না। কারণ আমি জানতাম যে তোর কাছে চাইলে এবং তুই দিতে পারলে কখনও 'না' করবি না।

তাছাড়া, জিষ্ণু, তুই বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমি ভাবতাম তুই ছাড়া আমার বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াবে এমন আর কেই-বা আছে? তোর উপর আমার যতখানি জোর ছিল বলে জানতাম ততখানি জোর এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কারো উপরেই ছিল না। তাই তোর কাছে কোনো কিছু চাইতে কখনওই কোনো সংকোচ বোধ করিনি। তোর বন্ধু যদিও আমি ছিলাম একমাত্র কিন্তু তুই জানিস যে আমার বন্ধু ছিল অগণ্য। কিন্তু তারা ছিল আমার ফুটবলের বন্ধু, তাসের বন্ধু, আড্ডার বন্ধু, রেস-এর মাঠের বন্ধু। তাদের কাছে কিছু চেয়ে যদি না পেতাম তাহলে নিজেকে বড়োই ছোটো লাগত। তাই কখনও চাইতে যাইওনি। তোর উপরে আমার দাবি সম্বন্ধে আমার কোনোদিনই কোনো দ্বিধা ছিল না। সংশয় ছিল না।

তোর কাছেও নিজের সম্মান যে বিকোতে পারে সেকথা সত্যিই ভাবিনি কোনোদিনও।

আমার বিয়ের পর থেকেই খুসিও কিন্তু ব্যাপারটা বুঝত। বলত, "থাকবার মধ্যে তো আছে এক জিষ্ণুদা। তাকে ছাড়া আর কাউকেই আমি ভরসা করি না। বিপদে-আপদে সে যা করেছে, করে তোমার জন্যে, তা আমার কী তোমার বাপের বাড়িরও কেউই করেনি। করবেও না।"

যতবার তোর কাছ থেকে আমি টাকা নিয়েছি, ততবারই ভেবেছি যে সময়ে না হলেও পরে তোকে টাকাটা শোধ করে দেব। শোধ করতে যে পারতাম না এমনও নয়। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি ভেবেছিলাম, সত্যিই ভেবেছিলাম যে, তোকে টাকা ফেরত দিতে গেলে তুই খুব রাগ করবি। বলবি, "রাখ, রাখ ওস্তাদি করতে হবে না।"

একবারের জন্যেও বুঝতে পারিনি, ভাবিতোনি-ই যে; আমার নিজের আত্মসম্মানবোধের কারণেও টাকা প্রতিবারই তোকে ফেরত দেওয়ার কথা আমার বলা উচিত ছিল। তোর আছে বলেই যে সহজে নিতে পারি এই বোকা-বিশ্বাসে ভর করে তোর সমস্ত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাও যে হারিয়েছি এখন তা বুঝতে পারি।

ভুল সকলেরই হয় জিষ্ণু। আমার যেমন হয়, তেমন তোরও নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সকলের একভাবে করতে হয় না। তুই যে জিষ্ণুই, অন্য কেউ নোস; এই ভাবনাটাই আমাকে প্রথম ভুল করাল।

শেষবার তোর কাছে যে টাকাটা চেয়েছিলাম তা কিন্তু খুকির মুখে ভাতের জন্যে চাইনি। সত্যিই তুই বড়ো ব্যস্ত থাকিস। ওর মুখে ভাত হয়ে গেছিল গত বছরই। ও কবে যে জন্মেছিল তাও তোর মনে ছিল না। সেই সুযোগটা আমি নিয়েছিলাম। আসলে তুই শেষ কবে আমাদের বাড়ি এসেছিলি তাও আমার মনে পড়ে না। আট-দশ বছর তো হবেই। তুই তোর অফিসে কী বাড়িতেই তো আমাকে ডাকতিস। চিরদিন যেমন ডেকেছিস, গেছি। কখনও অভিমান করিনি। তোকে বলিনি যে, আমি তোর মোসাহেব বা চামচে নই। আমি তোর বন্ধু। বন্ধুত্ব হয় এবং থাকে সমতলেই দাঁড়িয়ে, হাতে হাত রেখে, সসম্মানে। বলিনি যা বলতে চাইলেও পারিনি একথা ভেবে যে, তুই হয়তো দুঃখ পাবি সেকথা ছেড়েই দিলাম। ভালোবাসা তো ইনট্যাঞ্জিবল ব্যাপার। তার আয়তন কল্পনায় বা অনুমানেই থাকে শুধু।

অনেকদিন আমার বা খুসির কোনো খবর করিসনি বা আমাদের বাড়িও আসিসনি বলেই হয়তো তোর এই ভুল হয়েছিল। আমার বিয়ে হয়েছে সাত বছর। খুকির বয়স হল এক বছর দশ মাস। আমার মেয়ের নাম যে চুমকি তাও হয়তো তুই জানিস না। যদিও বাড়িতে খুকি বলেই ডাকি। তুই সে জন্যেই বোধহয় সব সময় 'কন্যা' বলে উল্লেখ করতিস। আমার বউভাতের পর একদিন

মাত্র তুই এসেছিলি আমাদের বাড়িতে। মনে আছে? খুসির গান টেপ করে নিয়ে গেছিলি? তারপর আর নয়।

যা বলতে এই চিঠি শুরু করেছিলাম, সেটাই বলতে পারছি না। চিঠিটা বড়োই এলোমেলো হয়ে গেল।

এপ্রিলের পাঁচ তারিখে খুসি চলে গেছে। ব্রেস্ট-ক্যানসার হয়েছিল। আমি একদিন আদর করার জন্য একটি লাম্প-এর মতো অনুভব করি।

খুসি বলল, ওটা তো বিয়ের আগে থেকেই ছিল। ব্যথাট্যথা তো কিছুই নেই। ও নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন?

তবু প্রায় জোর করেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। মনীষ রে! আমাদের সঙ্গে পড়ত। মনে আছে? ও দেখেই বলল, ডা. সেনের কাছে নিয়ে যেতে হবে। পরদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল। পরদিন যখন নিয়ে গেলাম, বোঁচা সেন বললেন, অপারেশান করতে হবে অবজার্ভেশানে রেখে। নার্সিংহোমে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করে নিলেন।

খুসিকে ভর্তি করেই উদভ্রান্তের মতো টাকার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম। এবং সেই উদ্দেশ্যেই সেদিন বহুদিন পর সাঙ্গুভ্যালির আড্ডায় গেছিলাম। পথেই তোর সঙ্গে দেখা হল, তুই যখন পুষির মৃত্যুর কথা বললি, আমি রি-অ্যাক্ট করিনি। কারণ সঙ্গে-সঙ্গেই আমার নার্সিং-হোমে ভর্তি-করানো খুসির কথা মনে হয়েছিল। কেন যে আমি তোকে খুকির অন্নপ্রাশনের গল্পটা বানিয়ে বললাম তাও জানি না। টাকাটা যখন তুই দিলি না তখন তো আর অন্য গল্প বানানো যেত না! তাছাড়া, পুষির মৃত্যু তোকে কেমন আঘাত দিয়েছিল তা লক্ষ্য করেই খুসির অসুস্থতার খবর তোকে দিতে চাইনি। বিশ্বাস কর আর নাই কর।

মনীষ বলেছিল, বম্বেতে নিয়ে যেতে অথবা দিল্লিতে। তার জন্যে অনেক টাকার দরকার ছিল। আমার না হয় অবস্থা ছিল না কিন্তু খুসির দাদাদের অবস্থা খারাপ নয় তা তুই জানিস। কিন্তু দাদাদের মধ্যে খুসির বিয়ের সময় কে কত খরচ করবেন তা দিয়ে মনোমালিন্য হয়েছিল, খুসি দাদাদের কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য নিতে রাজি ছিল না। গয়না বিক্রি করতেও রাজি ছিল না। মেয়ের জন্যেই রেখেছিল সব। খুকির বিয়ের সময় লাগবে বলে। খুসি আবারও বলেছিল, জিষ্ণুদাকে বোলো। সে ছাড়া আমাদের আপনজন আর কেইই বা আছে।

অনেকটা উলটোপালটা লিখলাম তোকে। খবরটা তোকে আগে দিতে পারিনি। আমার জন্য যেসব বন্ধু, অন্য জগতের, তাদের তুই চিনিস না। তারাও তোকে চেনে না। চিনলে তাদের কাছ থেকে আমি পুষির খবর পেতাম, তুইও পেতিস খুসির খবর. এ খবরে আজ তোর আর কোনো ইন্টারেস্ট আছে কি না তাও জানি না।

শ্রাদ্ধর সময়ও ইচ্ছে করেই তোকে চিঠি পাঠাইনি। কারণ, তোর উপরে খুসির বিশ্বাস বড়ো আহত হয়েছিল শেষ মুহূর্তে। মৃত্যুর আগে। যদি তুই একটু সাহায্য করতিস তবে হয়তো ওকে বম্বে-দিল্লি নিয়ে যাওয়া যেত। নিয়ে গেলেই বাঁচত এমন নয়। তবে সান্ত্বনা পেতাম কিছুটা।

যাকগে, তুই জানতিস না যখন, তোকে একটুও দোষ দিতে পারি না। দেইওনি। তুই যে আমাকে আহত করেছিলি সে জন্যেও মনে কিছু করিনি। মনে হয়, এ জীবনে যা হবার তা হয়ে গেছে। আর কোনোদিনও তোর কাছে টাকা চাইব না। এবং কথা দিচ্ছি। আস্তে আস্তে আজ অবধি তুই যত টাকা আমাকে দিয়েছিলি তার সবই শোধ করে দেব। অবশ্য সুদ দিতে পারব না। এটা আমার ঔদ্ধত্য বলে ভুল করিস না। খুসি যেহেতু শেষ মুহূর্তে মস্ত আঘাত পেয়েছিল তার আত্মার শান্তির জন্যেই আমাকে তোর সব টাকা ফেরত দিতেই হবে।

তবে আমি জানি যে, টাকা ফেরত দিলেই সব হবে না। টাকাটা কিছুই নয়। তোর কাছ থেকে এ জীবনে যা পেয়েছি তা শোধ করা সাধ্য আমার নেই। কখনও হবেও না।

তুই আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার হয়তো কখনও আর করবি না। আমিও হয়তো নাও করতে পাবি। তবু এক সময়ের বন্ধুত্বের প্রমাণ হিসেবে ভেঙে পড়া শ্রদ্ধার পাঁচিল টাকার বান্ডিল দিয়ে মেরামত করার অসফল কিন্তু সিরিয়াস চেষ্টা করব যে, শুধু এইটুকুই বলতে পারি তোকে।

ভালো থাকিস।

ইতি—তোর একসময়ের একমাত্র বন্ধু। —পিকলু

চিঠিটা যখন খুলছিল এবং প্রথম কিছুটা পড়েছিল তখন মনে হয়েছিল কেঁদে-টেদে ফেলবে হয়তো জিষ্ণু, চিঠিটা শেষ অবধি পড়ে। কিন্তু চিঠিটা পড়া শেষ হলে চিঠির প্রভাব যে তার উপর এমন প্রলয়ঙ্করী হল না, তা লক্ষ্য করে নিজেও কম অবাক হল না।

পিকলুটা "জালি" হলে গেছে। "দু নম্বর"। ওর চিঠির মধ্যে একশোটা আপাতবিরোধী কথা। মিথ্যে কথা। হবেই। মিথ্যার এই দোষ। একটা বললে দশটা আরও বলে তা ঢাকতে হয়।

জিষ্ণুর কাছে পিকলু সত্যিই মরে গেছে। আজকে পিকলু যাই বলুক ও লিখুক, ও যে একজন মিথ্যেবাদী, ঠক, তঞ্চক এবং ও যে এতগুলো বছর ধরে জিষ্ণুর হৃদয়ের উষ্ণতার বিনিময়ে তার সঙ্গে এই রকম প্রবঞ্চনা করে গেছে সেই সত্য জিষ্ণুর বুককে ভেঙে দিয়েছে। যে তঞ্চক, যে প্রবঞ্চক বন্ধুত্বের মুখোশ পরে কাছে আসে, এবং শুধু আসেই না, অতি দীর্ঘদিন তাকে জড়িয়ে থাকা স্বর্ণলতার মতো সেই লাউডগা সাপের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখার মতো মানসিকতা জিষ্ণু অন্তত আর রাখে না।

না। তবে ও এক গভীর দুঃখ বোধ করল খুসির জন্যে। মেয়েরা এদেশে স্বামী-নির্ভর জীবনেই যাপন করে। এখনও যার যেমন স্বামী, তার তেমন জীবন।

জিষ্ণুকে যারা ভালোভাবে চেনে তারাও আসলে ওকে পুরোপুরি চেনে না। ওর নরম বহিরাবণের মধ্যে একটি অত্যন্ত কঠিন কোরক আছে। সেই কোরকের মধ্যে যখন তার মনকে সে লুকোয় তখন সেখানে পৌঁছোনো কোনো ভূত বা ভগবানের পক্ষেও সম্ভব নয়।

"খুসি চলে গেছে" এই কথাটাও আশ্চর্য! জিষ্ণুকে তেমন আলোড়িত করল না। করবেই বা কেন? বন্ধুর স্ত্রী। এই পর্যন্তই। কোনোরকম মেলামেশা বা আন্তরিকতা তো ছিল না। হতও না তা জিষ্ণুর সঙ্গে। বউভাতের দিনেই তা বুঝেছিল। পিকলুর "বুড়ো" বয়সের এই ভুলকে ক্ষমা করতে পারেনি জিষ্ণু। পিকলুর বিয়ের পর দিন থেকেই জিষ্ণুর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল পিকলু অতি দ্রুত। দেখা হলেই পিকলুর মায়ের নিন্দা আর তার স্ত্রীর গুণগান। একটা জলজ্যান্ত শিক্ষিত পুরুষ মানুষ যে কী করে এমন মেয়েমানুষ হয়ে উঠতে পারে তা ভাবতে পর্যন্ত পারত না জিষ্ণু। আজকে ওর অফিসের বেয়ারা রামদীন বা পিপি বা চানচানির সগে ও কতখানি ঘনিষ্ঠ, পিকলু বা খুসির সঙ্গে গত সাত বছরে তার এককণাও ছিল না। উলটে ক্রমাগত মিথ্যাচারের আর পৌনঃপুনিক নগ্ন স্বার্থপরতায় পিকলু নিজেকে জিষ্ণুর কাছ থেকে অনেকই দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

বিল মিটিয়ে ফুটপাথে নেমে ট্রাউজারের দু পকেটে দুটি হাত ঢোকার আগে পিকলুর চিঠিটিকে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে পথের ডাস্টবিনে ফেলে দিলে জিষ্ণু। হাওয়ার তোড়ে দু-এক কুচি উড়ে গিয়ে পড়ল পথে। সারিবদ্ধ গাড়ি তাদের চাপা দিয়ে চলে গেল। একটি গাড়ির টায়ারের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে একটি কুচি চলে গেল পার্কসার্কাসের দিকে।

শুধু কলকাতা শহরটা বদলায়নি। বদলেছে জিষ্ণুও। অনেকখানিই। একটু অবাকই লাগছিল ওর। এই জিষ্ণুকে, শক্ত নিষ্ঠুর জিষ্ণুকে আবিষ্কার করে।

কী মনে করে আবার ফিরল ওয়ালডর্ফ-এর দিকে।

বলল "মে আই ইউজ ইয়োর ফোন?"

"ইয়েস স্যার।"

পিকলুর ফোন নম্বরটা কোনোদিনও ভুলবে না জিষ্ণু। এত সহস্রবার ডায়ালে সেই নম্বরটা ঘুরিয়েছে। সেই স্কুলের দিনগুলি থেকে। এক্সচেঞ্জ বদলেছে বটে, নাম্বার একই আছে।

পিকলুর সেনাইল বাবা ধরলেন। উনি বড়ো ভালোবাসতেন জিষ্ণুকে। মা-ও। এখন অবশ্য পিকলু তাকে কোন রঙে রাঙিয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত করে রেখেছে জানা নেই। রাখলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিছুদিন হল এই বেপরোয়া, "ক্যুডন'ট কোয়ারলেস" অ্যাটিচুডটা এসেছে জিষ্ণুর মধ্যে। ভালো থাকা, "ভালো" বলে নাম কেনা, কে কী ভাবল, কে কী বলল, তা নিয়ে মাথাব্যথা ওর আর একটুও নেই। ভালো হয়েও তো এই পুরস্কারই জুটল।

কাকাবাবুই ধরলেন ফোনটা। বললেন, "হ্যাঁ। দিচ্ছি পিকলুকে।"

"তুমি কেমন আছে বাবা? শুনেছ তো সবই।"

কাকিমা ধরলেন তারপর, পিকলুর মা।

বললেন, "আমার হয়েছে মুশকিল। সঙ্গীহারা হলাম বাবা। ভেবেছিলুম এক। আর হল আর এক।"

পিকলু এসে ফোন ধরল।

"কী রে? খবরটা জানাতেও পারলি না সময় মতো?"

জিষ্ণু বলল।

"কী হত?"

"তা ঠিক। আমি তো তোর ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে পড়ি না।"

পিকলু চুপ করে থাকল।

"শোন, খুকি কী পড়ছে? এখনও দিসনি নিশ্চয়ই কোথাও। আমার দ্বারা কোনো রকম উপকার হলে জানাস। আরও একটা কথা তোকে বলা দরকার। তুই লিখেছিস আমাদের বন্ধুত্ব "সমতলের" ছিল না। তা নিশ্চয়ই ছিল না। কোনোদিনই নয়। কিন্তু উষ্ণতা ছিল অনেক। অসমতলে দাঁড়িয়ে বন্ধুত্ব বাঁচিয়ে রাখার কৃতিত্ব তোর যেমন ছিল, আজকে বলি যে, আমারও কম ছিল না। তোর হীনম্মন্যতায়, তোর তঞ্চকতায় তাকে যদি তুই অস্বীকার করতে চাস তো করিস। আমিও স্বীকাব করব না।'

পিকলু বলল, "আমার ওই মানসিক অবস্থায় তুই এত সব বলছিস কেন আমাকে?"

পুষির মৃত্যুর কথা শোনার পরই তো তুই ধার চেয়েছিলি আর আমার স্কুটারটা শস্তায় কিনতে চেয়েছিলি। আর কিছু বলেছিলি? ভুলে গেছিস?"

"তখন খুসি যে নার্সিংহোমে...আমার অবস্থা..."

"সে কথাটাও তো বলিসনি। তবে আর কেন? তোর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই পিকলু। আর কোনোদিনও টাকা নিতে বা দিতেও তোর আমার কাছে আসার দরকার নেই। তোকে দেখে আমার জীবনে বন্ধুত্বর সংজ্ঞা আমি বদলাতে বাধ্য হয়েছি। সব বন্ধুত্বই, একটা বয়সের পর, ফ্রেন্ডশিপ অফ কনভিনিয়েন্স। বন্ধুত্ব থাকে ঘামে-ভেজা জার্সি পরে দৌড়ে যাওয়া খেলার মাঠেই। তারপরও হয়তো কিছুদিন। কিন্তু তারপর আর নয়। অ্যাকোয়েন্টন্সই সব। নিছক অ্যাকোয়েন্টেন্স। বন্ধুত্ব করতে হলে হাতে নষ্ট করার মতো অঢেল সময়ও চাই। মনোমতো মানুষ না পেলে জোর করে বন্ধুত্ব করার কোনো মানে হয় না। আমি একা থাকতে ভালোবাসি। অসম্পূর্ণ নই আমি তোর মতো যে, 'টাইম-কিল' করতে হন্যে হয়ে রেসের মাঠ, আজেবাজে মানুষের সঙ্গে বসে সময়কে মারতে হবে আমার।"

ওপাশ থেকে পিকলু কট করে লাইনটা কেটে দিল মনে হল।

লাইন কেটে দিয়েছে। জিষ্ণুর কথাগুলো বড়ো দীর্ঘ এবং বক্তৃতার মতো শোনাচ্ছিল নিশ্চয়ই। প্রবন্ধর মতো?

কী করবে? কথা জমে থাকলে অমন হয়ই। ভূমিকম্পর উৎসারের মতো গরম লাভা হয়ে বেরিয়ে আসে। কথা তখন আর ফেরানো যায় না।

জিষ্ণু ফোনের চার্জ দিয়ে পথে বেরিয়ে ভাবল, ভালোই হল পিকলু ফোনের লাইন কেটে দিয়ে জিষ্ণুর সুস্থ বিবেকে যতটুকু প্রাণ বেঁচে ছিল তাকেও মেরে দিল। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। জিষ্ণু এমন ছিল না। নিষ্ঠুর, খুব নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে ও দিনে দিনে।

চতুর্দিকে মালটিস্টোরিড বাড়ি উঠছে। আকাশ দেখা যাবে না ক-দিন পরে। গাড়ি চালানো যাবে না পথে। হাঁটা যাবে না। ক্যামাক স্ট্রিটে আর একটাও কৃষ্ণচূড়া গাছ নেই। অথচ কলকাতায় বসন্ত এসেছে তা বোঝা যেত এই রাস্তার কৃষ্ণচূড়ার বাহারেই। বদলে গেছে কলকাতা। বালিগঞ্জের পুরো এলাকা, ল্যান্সডাউন, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, পুরো পার্ক স্ট্রিট এলাকা, আলিপুর, নিউ-আলিপুর কোনো এলাকাই আর চেনা যায় না। কলকাতা বদলে গেছে একেবারে। বাড়ি তো নয় এক একটা পাহাড়। বিহারের মতো 'লু' বয় এই শহরে। বাঙালি পাড়াতেও বাংলা কথা শোনা যায় না ফুটপাথ দিয়ে হাঁটলে। এটা আর বাঙালিদের শহর নেই। এই বদলের দিনে জিষ্ণু একাই বা একরকম থাকবে কেন? পিকলু যদি এমনভাবে বদলে যেতে পারে, বুকে-জড়ানো বন্ধু যদি তঞ্চক হয়ে উঠতে পারে; তবে সেই-বা তঞ্চকের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে যাবে কেন?

না। কোনো সহানুভূতি, সমবেদনা কিছুই নেই ওর বুকে পিকলুর জন্যে, খুসির জন্যে এবং ওদের অদেখা কন্যার জন্যেও। না। নেই।

কদিন হল মামণির কথা বড়ো মনে হচ্ছে জিষ্ণুর।

ওর এয়ারকন্ডিশনড অফিসের জানালার বাইরে অনেকগুলো পনসাটিয়ার গাছ আছে। হালকা ধূসর ফিল্ম-লাগানো জানালার মধ্যে দিয়ে পনসাটিয়ার ফুল আর পাতাগুলোকে অন্যরকম দেখায়। বাইরে ভ্যাপসা গরম। লোকে ঘেমে নেয়ে গরমে হাঁটছে আর ঘাম মুছছে দেখতে পায়। আর এদিকে ভিতরে আরাম। জানালা দিয়ে তাকালে মনে হয় স্বপ্ন দেখছে। কাজ অবশ্যই বেশি করা যায় এমন পরিবেশে। তবে যারা এমন পরিবেশ পায় না কাজ করার জন্যে তাদের ওপর অনেক সময়ই অবিচার করা হয়ে যায়। শত ঐকান্তিকতা থাকা সত্ত্বেও দরদর করে ঘামতে ঘামতে বেশি কাজ করা যায় না। মেজাজও খারাপ হয়ে থাকে। খিটখিটে হয়ে যায় স্বভাব।

আজ খুবই ভোরে এসেছিল অফিসে। টেলেক্স মেসেজগুলো দেখতে চোখে পড়ল কাশবেকারের মেসেজ আর. এম. এর কাছে। "এম. ডি. অয়ান্টস জিষ্ণু টু মিট কাস্টোমারস ইন দ্যা কন্টিনেন্ট। ট্যুওর এক্সপেক্টেড টু লাস্ট ফর আ মান্থ। হি মে টেক হিজ ওয়াইফ ইফ হি ডেজায়ার্স। দ্যাট ট্যু অন দ্য কোম্পানি।"

এইবারে ইনকামট্যাক্স অ্যাক্টে এক্সপোর্টারদের জন্যে যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাতে কোম্পানির উপরমহল খুবই খুশি। সেই খুশির ছটা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

"ওয়াইফ"-এর কথায় জিষ্ণু একা ঘরে মুখ বিকৃত করল। পুষির কথা মনে পড়ে দুঃখ হল খুব। আর পরীর কথা মনে পড়ায় রাগ।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়াতে খুবই অবাক হল ও। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন-টা বেজেছে। পিপি রোজ জিষ্ণু পৌঁছোবার আগেই ঠিক ন-টাতে এসে মেইল দেখে রেখে যায় জিষ্ণুর টেবলে। সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি নেই তাও দেখে। তারপর ঠিক সাড়ে ন-টাতে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে হেসে বলে, গুডমর্নিং স্যার।

পাঁচ বছর কাজ করছে পিপি ওর কাছে। একদিনও এর অন্যথা হয়নি। পিপির জন্যে এ বছর একটা মোটা ইনক্রিমেন্ট সাজেস্ট করেছে জিষ্ণু বিশেষ করে সেনগুপ্ত সাহেবের কাছে সব শুনে। এখন ও প্রায় সাড়ে তিন মতো পায়। পারকুইজিটসও আছে। তবে কাগজ তো টাকাই হয়ে গেল। সত্যিই।

টেলিফোনটা বাজল। ডায়রেক্ট ফোনটা।

"ইয়েস।"

"স্যার?"

কান্নাভেজা গলা কোনো নারীর।

কিন্তু কার?

"স্যার আমি পিপি।"

পিপি এই প্রথমবার সকালে জিষ্ণুকে গুডমর্নিং বলল না।

"বলো পিপি। আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং। কী হয়েছে? এলে না কেন?"

হঠাৎ পিপিকে "তুমি" করে ফেলল জিষ্ণু, অজানতেই।

"স্যার। আপনি একবার আমার বাড়িতে আসবেন এক্ষুনি?"

"তোমার বাড়িতে? কেন? কী হয়েছে?"

"এখানে কথা বলুন স্যার।"

একজন পুরুষের গলা শোনা গেল। তিনি রিসিভারটা পিপির হাত থেকে নিলেন বোঝা গে

জিষ্ণুর মস্ত দোষ এই যে, ও আগ বাড়িয়ে কথা বলে। ও প্রান্তর কথা না শুনেই বলল, "ে সুমন্ত্রবাবু? আপনার সঙ্গে তো আমার কোনোদিনই আলাপই হল না আজ পর্যন্ত, একদিন..."

পুরুষ কণ্ঠ ঠান্ডা, শান্ত গলায় বললেন, "আমি সাব ইন্‌স্পেকটার ঘোষ বলছি। তালত থানার। সুমন্ত্রবাবু হ্যাজ কমিটেড সুইসাইড। আপনি মিসেস সেনের বস। একবার আপনার আ দরকার।"

টেবল থেকে পেনসিলটা তুলে নিয়ে কামড়াতে কামড়াতে জিষ্ণু বলল, "হোয়াই মি? অফ ং পার্সনস? ঠিকানাটা?"

"আপনার অফিসে নেই?"

"এসব তো পি পি, মানে মিসেস সেনের কাছেই থাকে। আপনি একটু বলুন আমি লি নিচ্ছি।"

একা যেতে ভয় করতে লাগল জিষ্ণুর। শুধুমাত্র থানা পুলিশের জন্যেই নয়। ইলেকট্রি ফারনেস-এর ওই লাল গরম আভা আর মানুষের মাংস-পোড়া গন্ধর কথা মনে হল। এই সেদি তো গেছিল। আবার? এত তাড়াতাড়ি? দাহ করার চেয়ে কবর দেওয়া বোধহয় ভালো। স্মৃ থাকে। গাছ থাকে বড়ো বড়ো। কবরের ওপরে কিছু লেখা থাকে। সেখানে গিয়ে, তাকে ম পড়লে, তার জন্মদিনে একটুক্ষণ বসা যায়; ফুল দেওয়া যায়। ফুল ঝরে পড়ে তার উপ চারপাশের গাছগাছালি থেকে। কিন্তু আগুনে জলজ্যান্ত একটা মানুষকে একেবারে নিশ্চিহ্ন কা দিয়ে আসার কথা ভাবলেও গা-টা কেমন কেমন করে। একবার ভাবল, সেনগুপ্ত সাহেবকেও সা নিয়ে যায়। তাঁর পি. এ-কে শুধিয়ে জানল যে, তিনি তখনও আসেননি। হয়তো ওখানেই গেছে

আর. এম. কে বলে জিষ্ণু বেরোল। বাড়িটা তো গাড়ি থেকে দেখাই ছিল একবার। ঠিকা সঙ্গে নেওয়াতে ড্রাইভার বসন্তর খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। সময়ও লাগল না। বাড়ি সামনে একটা ছোটো জটলা মতো হয়েছে। পুলিশের ভ্যান, ও.সি-র জিপ। তা ছাড়াও তিন প্রাইভেট গাড়ি। গরিব মরে গিয়েই তার প্রতিবেশীর সম্মান কুড়িয়ে যায় শেষবারের মতো ত মৃতদেহ দেখতে আসা আত্মীয় বন্ধুদের গাড়ির সংখ্যার ঔজ্জ্বল্যে। মৃতের জীবদ্দশায়, যে বাড়ি কোনো গাড়ি কখনওই থামেনি, মৃত্যুতে সে বাড়ির দরজাতেই গাড়িব লাইন পড়ে যায়। ব্যাপার একটু বিসদৃশ লাগে জিষ্ণুর চোখে।

"জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল" এমন একটা গ

গাইতেন কাকিমা প্রায়ই। গানটার কথা খাটে না এ ক্ষেত্রে তবু গানটার কথা মনে পড়ে গেল ওর, গাড়ি থেকে নামতে নামতে।

পিপি একেবারে ভেঙে পড়েছিল। হালকা নীলরঙা নাইটির উপরে একটা গাঢ় নীল রঙা হাউসকোট পরা ও জিষ্ণুর হাত ধরে ওকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। দেখে মনে হল ঘরটা কোনো শিশুর খেলার এবং শোওয়ার ঘর।

"এই ঘরে?"

"এই ঘরেই?"

"কেন এমন হল?"

"স্যার ডিভোর্সের রায় পেয়েছি কাল। জজসাহেব ডিভোর্স দিয়েছেন, এবং মেয়ের মালিকানাও আমাকে দিয়েছেন। আমার উকিল খুবই ভালো ছিলেন।"

"মেয়ে কোথায়?"

"মেয়ে?"

বলেই, পিপি একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

চেয়ারে বসা ও.সি বললেন, "মেয়েকে আগে খাইয়ে তারপর নিজে খেয়েছেন। মেয়েকে বুকে জড়ানো অবস্থাতেই ডেড বডি দেখি আমরা।"

"কী? কী খেয়েছিলেন?"

জিষ্ণুর গলাটা শুকিয়ে এল।

"হেভি ওভারডোজ অফ স্লিপিং পিলস। মানে, আমরা তাই সন্দেহ করছি। রোজই নাকি উনি খেতেন। ড্রিঙ্ক করার পরও। তবে পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট...।"

"ব্যাপারটা একটু শর্টকার্ট করা যায় না?"

"কমপ্লিকেটেড কেস। ডিভোর্সের মামলা চলছিল। মেয়েকে কে পাবেন তা নিয়েও।"

পিপি ওর শোবার ঘরে এসে আমাকে বলল, "আমিই ডিভোর্স চেয়েছিলাম মেয়েকেও আমিই চেয়েছিলাম। সুমন্ত্র তো প্রথমে বিশ্বাসই করেনি। আমি নিজে বললেও করেনি। বলেছিল, "তুমি ছাড়া বাঁচলেও বাঁচতে পারি কিন্তু তিতি ছাড়া বাঁচব না। তুমি আমার এমন সর্বনাশ কেন করবে? আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, কোনো কিছুতেই বাধা দিইনি!"

বলেই আবার ভেঙে পড়ল কান্নায়।

"ফোনটা কোথায়?"

"ওই তো?"

জিষ্ণু হীরুকাকাকে ফোন করল পুলিশে হীরুকাকার যে বন্ধু আছেন তাঁকে বলতে। প্রিয় মেয়ে তিতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে ছিল সুমন্ত্র। দুটি শরীরই শক্ত হয়ে গেছিল। মেয়েকে বাবার বুক থেকে ছাড়ানো যাচ্ছিল না নাকি। ও.সি বলছেন স্লিপিং ট্যাবলেট। পিপিও তাই বলছে। রোজ রাতেই খেত ড্রিংকস-এর পরও।

নম্বরটা পেতে সব বলল জিষ্ণু হীরুকাকাকে।

তারপর বলল, "কাকিমাকে একটু পাঠিয়ে দেবে হীরুকাকা এখানে? আমি ওঁকে পৌঁছে দেব। মনে হচ্ছে পিপির আত্মীয়-স্বজন কেউই নেই। প্রতিবেশিনী আছেন অবশ্য দু-একজন।"

হীরুকাকা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমিই হেমকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। কিন্তু এতটুকু মেয়ের আর কেউ কেউ নেই কেন? আপনজনদের সুখের দিনে কাছে না রাখলে দুখের দিনেও কেউই থাকে না।"

তারপর বলল, "ছেড়ে দিচ্ছি। আসছ তাহলে। তোমার বন্ধুকে ফোনটা করেই তারপর বেরিয়ো। আমি মর্গে যাচ্ছি।"

ফোনটা ছেড়ে পিপিকে বলল, "কাজ করবেন ক-দিনে? চোদ্দো দিনে?"

"কাজ করার তো কেউ নেই স্যার? কাজ কে করবে?"

"ছুটি ক-দিনের বলব? অফিসে?"

"ছুটি? ছুটি দিয়ে কী করব? কালই অফিসে যাব আমি। বাড়িই রইল না। এ ফাঁকা বাড়িতে একা থেকে কী করব?"

"কালই?"

"ইয়েস স্যার।"

"আমি তাহলে মর্গের দিকে এগোই।"

"অন্যমনস্ক গলায় বলল জিষ্ণু।

পিপি মাথা হেলাল।

মর্গ-এর দিকে অফিসের ভিড়ের মধ্যে শামুকের গতিতে এগোচ্ছিল গাড়ি। জিষ্ণু ভাবছিল, সত্যিই একজন মানুষও বোধহয় পরিপূর্ণ সুখী নয় এখানে। সুখী হতে দেয় না এই শহর। বড়ো নিষ্ঠুর, ইট কাঠ পাথরের কংক্রিটের পাহাড়ে ভরে গেছে এই কলকাতা।

জিষ্ণু পৌঁছোনোর আগেই হীরুকাকার বন্ধু মর্গ-এ ফোন করে দিয়েছিলেন। কেসেও মার্ডারের কোনো গন্ধ ছিল না। তবু পোস্ট-মর্টেম তো করতে হলই। মর্গ থেকে বেরিয়ে সুমন্ত্রর ছোটো ভাই জয়ন্ত, হীরুকাকা এবং জিষ্ণুও ডেডবডি দুটো নিয়ে সোজাই শ্মশানে এসেছিল। অফিসের কেউ কেউ, জিষ্ণুর যে আরদালি, পিপিরই বলতে গেলে, সে একজন টেলিফোন অপারেটার, এবং আর. এম নিজে এসেছিলেন। আশ্চর্য হল সেনগুপ্তদাকে না দেখে। পিপির মেয়েটি তিতি, ভাবি সুন্দরী একটি পিংক ফ্রক পরেছিল। ফুলের মতো দেখাচ্ছিল তাকে।

পিপিও শ্মশানে এসেছিল। গাড়িতেই বসেছিল, কাকিমার সঙ্গে। যখন টার্ন এল তখন ওকে ডাকা হল। যদি শেষ দেখা দেখতে চায়। পিপি বলল যাবে না ওখানে। স্বামী অথবা মেয়ে কাউকেই সে দেখতে চায় না। সুমন্ত্রর ভাই জয়ন্ত মুখে আগুন দিল।

ইলেকট্রিক ফারনেসের দরজা খোলা হল। লাল হয়ে গেলে জায়গাটা। উষ্ণতা এবং লালিমার ছোপ লাগল গায়ে মুখে। তাপ। সুমন্ত্র এবং তার মেয়ে একটি বড়ো এবং একটি ছোটো বাঁশের চালিতে নতুন চাদরের উপর শুয়ে ডোমেদের এক ধাক্কায় যখন আগুনের মধ্যে চলে গেল তার পরমুহূর্তে জিষ্ণু অপরিচিত সুমন্ত্রর মুখে যেন এক চিলতে হাসি দেখতে পেল। মনে হল, সুমন্ত্র যেন বলছে : "রেস-এ চিরদিন হারলে কী হয়, এ রেস-এ কেমন জিতে গেলাম, পিপি দেখেছ?"

শ্মশান থেকে পিপিকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় কাকিমা জিষ্ণুকে বললেন, "ওর তো কেউই নেই, দেখছি, আমিই থাকি ওর কাছে একটা দিন?"

জিষ্ণু বলল, "থেকে কী করবে? ও তো বলছে অফিস করবে কাল থেকে।"

"সে কীর রে? বলিস কী?"

"এবারে পুজোতে গোয়া যাবার জন্যে ছুটি নিচ্ছে সেটা সেটা কমাতে চায় না। বলছিল আমাকে।"

"কী যে বলিস তুই? আজকালকার মেয়েদের রকম-সকমও আলাদা। বুঝি না ওদের।"

হীরুকাকা বললেন, "ওরা অন্যরকম। সন্দেহ নেই। তা বলে ওরা যে খারাপ সে কথা বলা যায় না।"

"স্বামী-স্ত্রী কি এক ঘরে শুত না। মনে তো তেমনই হল।"

হেম বললেন, কৌতূহলী গলায়।

"শুত না বলেই তো মনে হল।"

জিষ্ণু বলল।

"তবে কি ওদের মধ্যে ভালোবাসা..."

হীরুকাকা বললেন, "ভালোবাসা কি দেখা যায়? না, তা দেখানোর জিনিস?"

"এবার গাড়িটা একটু থামাতে বলো। মুখটা শুকিয়ে গেছে। পান খাব জরদা দিয়ে।" হীরুকাকা বললেন। "কত কিছুই দেখতে হল এক জীবনে।"

"তুমি বোসো। বসন্তই নিয়ে আসবে পান।"

"তা ভালোই। ঠান্ডা গাড়িতে একবার উঠে বসলে আর নামতে ইচ্ছে করে না।"

"তোমাদের দুজনকেই একটা করে দেড়টনের এয়ার কন্ডিশনার কিনে তোমাদের দুজনের বেডরুমে লাগিয়ে দেব। হীরুকাকার বাড়িতে তো দরকারই। তাছাড়া তোমাদেরই তো আরাম করার সময় এখন।"

"পাগল হয়েছিস তুই?" হীরুকাকা বললেন। "এমনিতেই অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাতের ঠ্যালায় বাঁচি না আবার এয়ার কন্ডিশনার। সব কিছুরই সুসময় থাকেরে ব্যাটা। সময় চলে গেলে কোনো কিছুরই দাম থাকে না আর। এই দ্যাখ, তোদের ওই পিপির স্বামী সুমন্ত্র তো মেয়েটাকে পর্যন্ত নিয়ে সময় থাকতে থাকতেই চলে গেল।"

হেম বললেন, "কে বলতে পারে? ওর হয়তো সময় হযেছিল। কখন যে কার সময় আর কার অসময় তা বলা ভারি মুশকিল। মনটা বড়োই খারাপ হয়ে গেছে। আমি ভাবতেও পারছি না যে পিপি কাল থেকে অফিস করবে।"

"করবে। কাজের মতো বন্ধু আর নেই। কাজ সব ভুলিয়ে দেয়। তা ছাড়া এখন থেকে ওর অফিসই তো সব হবে। যতক্ষণ যে মানুষ থাকে তার দাম তো বোঝা যায় না। অতি শস্তা বলে মনে হয়। চলে যাবার পরই বুঝিয়ে দিয়ে যায় তার দাম কত ছিল।" সুমন্ত্রব কথা। মেয়ের কথাও। সকলের কথাই।

"তোমরা তো খাওয়াদাওয়াও করোনি সারা দিন! তোমাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমি একটু অফিসে যাব।"

"এই অসময়ে? সারাদিন তো খাওয়াও হল না তোর।"

"অফিসের ধারে-কাছেই খেয়ে নেব কিছু। তবে আজ খাওয়ার ইচ্ছে নেই।"

গলি থেকে বেরিয়ে জিষ্ণু ভাবল, অফিসে না গিয়ে তারিণীবাবুর বাড়িতেই যায়। এরকম ওর কখনই হয়নি আগে। পুষির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরেও নয়। মামণি নামক মেয়েটি যেন ওকে একেবারেই পেয়ে বসেছে। অথচ তাকে কতটুকুই বা দেখেছে জিষ্ণু? এক ঝলকেরই ব্যাপার।

হঠাৎ কী মনে করে জিষ্ণু বলল, "বসন্ত, অফিসই চলো। বুঝলে!"

তারিণীবাবুর বাড়ি এমনিতেই যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। মাস ঘুরে এল প্রায়। ভাবল, এক শনিবার, ছুটির দিনে যাবে। এই শনিবার রাতে পরী ফিরবে ব্যাঙ্গালোর থেকে। বলছে যদি রেস-এ যায়, তবে রবিবার ফিরবে। ওদের কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস কলকাতাতে হলেও আসল অপারেশনস ব্যাঙ্গালোরে। এখানের যে টপম্যান সে ব্যাঙ্গালোরের রেসিডেন্ট। তবে লোক ম্যাঙ্গালোরের। পি. কুরুভিল্লা। দারুণ হ্যান্ডসাম আর প্রাগম্যাটিক মানুষ নাকি সে। শুনেছে, পরীর কাছে। কিন রেস-গোয়ার।

পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। অফিসে পৌঁছে ডাকটাক দেখে ও একটি ফাইল নিয়ে বসেছিল। সলিসিটরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আজই। যাওয়া হল না। নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বলেছে ল অফিসারকে। এক কাপ কফির অর্ডার করেছে এমন সময় হঠাৎ পিপি কিছু না বলেই ওর ঘরে ঢুকল।

পিপি বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার! আপনি এবং আপনার কাকা-কাকিমা যা করেছেন কেউই করে না তা!"

"আজকে তুমি, আপনি এলেন কেন?"

"আমার পনেরো হাজার টাকা ভারি দরকার।"

"কী জন্যে? শ্রাদ্ধ তো করছেন না।'

"না। সুমন্ত্রের এক রেস-এর মাঠের বন্ধু টাকা চাইতে এসেছিল। দশ হাজার। আবারও আসবে। বলেছে, ফর ওল্ড টাইমস সেক। টাকাটা সুমন্ত্র নাকি আজই দেবে বলেছিল। ওর কাছে নাকি ধার ছিল। টাকাটা আজ তার চাই-ই। ভদ্রলোকটি সাংঘাতিক।"

"আপনার বিপদের চেয়েও তাঁর বেশি বিপদ।"

অবাক হয়ে জিষ্ণু বলল।

"আমার চেয়েও।"

"সুমন্ত্রবাবুর সেই রেসের মাঠের বন্ধুর নাম কী?"

"পিকলু স্যার। আপনারও বন্ধু।"

"পিকলু! সে আপনার স্বামীরও বন্ধু নাকি? কই আমি তো..."

"আরও পাঁচ? সেই পাঁচ দিতে হবে সুমন্ত্রর ভাই জয়ন্তদের তো শ্রাদ্ধ করতে হবে।"

"কী করে এখানে জয়ন্ত?"

"ওদের একটা ছিটকাপড়ের দোকান আছে কলেজ স্ট্রিটের কাছে।"

"আপনাকে পাঁচ হাজার এক্ষুনি দেওয়ার বন্দোবস্ত করছি। সুমন্ত্রর ভাই জয়ন্তকে দেওয়ার জন্যে। আপনি টাকাটা নিয়ে আমার গাড়ি নিয়েই এক্ষুনি চলে যান আর পিকলুবাবু যদি আপনার কাছে আসেন তো এখনই তাঁকে এখানে এ গাড়িতেই আমার কাছে ফেরত পাঠান। ওঁকে আমি নিজে টাকা দেব।"

ইন্টারকম-এ সুব্রহ্মনিয়মকে ডাকল জিষ্ণু।

বলল, "একটা আই. ও. ইউ। আমার নামে ভাউচার করে পাঁচ হাজার টাকা এক্ষুনি আমার ঘরে পাঠিয়ে দিন।"

"কিছু খাবেন পিপি?"

"নাঃ।"

"একটা কোল্ড ড্রিংক?"

"না স্যার। একটু জল খাব।"

জিষ্ণু নিজে উঠে নিজের গ্লাস নিয়ে গিয়ে করিডরের ওয়াটার কুলার থেকে জল নিয়ে এসে দিল পিপিকে। যদিও বেয়ারা ছিল এবং তাকে স্বচ্ছন্দেই ডাকতে পারত। আজ একটি বিশেষ দিন। পিপির জন্যে যে ও দুঃখিত সেটা বোঝাল।

তৃপ্তি করে জলটা খেল পিপি।

সুব্রহ্মনিয়ম নিজেই এল ভাউচার সই করাতে।

জিষ্ণু বলল, "কাল আমি আর. এম.-এর সঙ্গে কথা বলব যাতে মিসেস সেনকে এক্সগ্রাশিয়া কিছু দেওয়া যায়। আফটার অল ওঁর স্বামী তো আর টাইমলি মারা যাননি। বড়োই বিপদে পড়েছেন মহিলা।"

'ও. কে. স্যার।"

বলে, সুব্রহ্মনিয়ম ভাউচার সই করিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

"আমি এবার চলি।"

"যাওয়া নেই। আসুন।"

ঠাকুমা-দিদিমারা যেমন করে বলেন, তেমন করে বলল জিষ্ণু।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পিপি বলল, "স্যার, উ্য আর ভেরি ভেরি কাইন্ড ইনডিড। আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন আজ। কোনোদিনও ভুলব না জীবনে।"

জিষ্ণু ঘর ছেড়ে গাড়ি অবধি এল দরজা খুলে উঠিয়ে দিল পিপিকে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে একটি অতি শস্তা কালো পাড়ের কালো আঁচলার তাঁতের শাড়িতে। চান করে এসেছে। সেনগুপ্ত সাহেবের কাছে সব শোনার পর থেকে পিপির সম্বন্ধে ওর দিকে ভালো করে তাকাবার কোনো ইচ্ছাই হয়নি জিষ্ণুর। আজই প্রথম ভালো করে তাকাল ওর দিকে।

মেয়েটার চোখে তো কোনো পাপ নেই! কে জানে, পাপীদের পাপ কোথায় থাকে?

অফিসে ফিরে নিজের জিনিস গোছগাছ করে নিল। আজকে একটু হাঁটা দরকার। মাথাটা ধরেছে। সুমন্ত্র সেই লালরঙা স্লিপিং পাজামা, আর বোতামহীন নোংরা আদ্দির পাঞ্জাবি আর বাবাবের চটি পরে যে লাল সিমেন্টে বাঁধানো সিঁড়ির উপরে পা ছড়িয়ে বসে রেসের বই দেখছিল সেই ছবিটি জিষ্ণুর চোখে চিরদিনের মতো আঁকা হয়ে রয়েছে। কিছু কিছু অনাত্মীয়র, অতি সাধারণ ঘটনার ছবিও এমনি করে রয়ে যায় মাথার ভেতরে। আমৃত্যু। যেমন আছে, শিববাবুর দোকানের সামনে হেঁটে আসা মামণির ছবিটি। সকাল থেকে রাতে কত কীই তো দেখে রোজ। কিন্তু সে সব ছবির খুব কমই থেকে যায়।

জিষ্ণু আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল। ও জানত যে পিকলু আসবে না। যে-মানুষ এমন সর্বনাশের দিনে কোনো অনাত্মীয় যুবতীর কাছে মিথ্যে ধারের দাবি নিয়ে এসে দাঁড়াতে পারে সে আর মানুষ নেই। ও অনুমান করতে চেষ্টা করছিল, সুমন্ত্রর সঙ্গে পিকলুর যোগাযোগের কথা জেনে যে; ঠিক কতখানি অধঃপতন হয়ে থাকতে পারে পিকলুর। পিপির সঙ্গেও কি ওর...? মিনিবাসের ভোঁতকা ড্রাইভারের মতোই পিকলুকেও বোধহয় এই পৃথিবী থেকে ডিসপোজ-অফ করে দেওয়া দরকার। পিকলু যদি আজ সত্যিই আসে তবে পিকলুর কপালে দুঃখ আছে। জিষ্ণু বড়োই অধৈর্য হয়ে পড়েছে। সহ্যশক্তি আর নেই ওর।

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় ও টেলেক্স মেসেজগুলো দেখে তিনটি ইম্পর্ট্যান্ট টেলেক্সের উত্তর পাঠিয়ে ব্রিফকেস হাতে করে বেরুল। ও যেই অফিস কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়েছে দেখে বসন্ত ফিরছে গাড়ি নিয়ে। পিকলু পেছনের সিটে বসে।

পিকলু দরজা খুলে নেমে বলল, "হাই।"

জিষ্ণু একটু অবাক হল।

বলল, "কী রে!"

পিকলু বলল, "উ্য আর গ্রেট! টাকাটা জলেই চলে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস তুই ছিলি মধ্যে। আমি জানতুম যে পিপির সঙ্গে তোর বেশ একটা ভালো রিলেশন...। অবশ্য এও জানতুম যে সেটাই শেষ পর্যন্ত বাঁচাবে আমাকে।

ড্রাইভার বসন্তকে ছেড়ে দিয়ে জিষ্ণু বলল, "চল এগোই।"

"টাকাটা?"

"আমার ব্রিফকেস-এ আছে।"

"ফাইন।"

"তুই কি ড্রিংক করেছিস, পিকলু? গন্ধ পাচ্ছি।"

"হ্যাঁ। একটু। কেন? ড্রিংক করা কি অপরাধের? দ্যাখ, প্রথম তো এই প্রায় ব্যাড-ডেট হওয়া টাকাটা ফিরে পাবার আনন্দ। তার উপর আজ শিশির মঞ্চে একটি কবি সম্মেলন আছে। আমি কবিতা পাঠ করব সেখানে। একটু খেয়ে না গেলে, পা না-টললে লোকে শালা আজকাল কবি বলে মানতেই চায় না। পাবলিক-এর বড়োই অবনতি হয়েছে।"

"তোর কবিতার নাম কী?"

।।”

“বাঃ। আমার শ্রাদ্ধ করেছিস তাহলে?”

“অবিমিশ্র শ্রাদ্ধ নয়। তবে তোকে নিয়েই লেখা। গুণাবলিও আছে কিছু।”

কথা ঘুরিয়ে জিষ্ণু বলল, “তোর খুকি কী করছে রে?”

“অনেক খুকিরাই যা করে। ইজের পরে ক্যারম খেলছে। লুডো খেলছে। কিশলয় পড়ছে। বড়ো হলে পাড়ার লোকের দেওয়া আইসক্রিম খাবে।”

“থাম তুই।”

জিষ্ণু ধমক দিয়ে বলল।

তারপর বলল, “চল, ট্যাক্সি নিয়ে তোকে শিশির মঞ্চে পৌঁছে দিই।”

“গ্রেট। তা পিপিকে কতদিন কেপ্ট রেখেছিস? আমি শুনলাম তোরই প্ররোচনাতে ও ডির্ভোস চেয়েছিল।”

“তোকে কে বলল?”

“জানি রে জানি। সব জানি।”

“মুখ সামলে কথা বল।”

“তা তুইও তো কাজকর্ম সামলে করলেই পারতিস।”

“দ্যাখ পিকলু, আমার ক্যারাকটার-অ্যাসাসিনেট করে তোর লাভ হবে না কোনো।”

“চরিত্র বলে কিছু আছে এখনও তোর? নিজের বোন, সেক্রেটারি কাউকেই তো ছাড়িস না।”

“পিকলু, তুই আমার কাছে মার খাবি আজ।”

“মারটা নিছকই জান্তব শক্তির ব্যাপার। কবি মারকে ভয় পায় না। মানে, যদি দু নম্বরি কবি না হয়।”

“তোকে একটা কথা বলছি, তুই কোনোদিনও আর পিপির কাছে গিয়ে তাকে বিরক্ত করবি না।”

“কেন? তোর রাঁড় বলে?”

“পিকলু, তোকে আমি সাবধান করছি।”

“চুপ কর। তোকে আমি থোড়াই ভয় পাই।”

“ভয় পাবি, যদি কথা না শুনিস। তোকে আমি জেলে ভরব, স্কাউড্রেল সুইন্ডলার।”

“পুষিকে যে মিনিবাসের ড্রাইভার মেরে ফেলল তাকেই জেলে ভরতে পারলি না তার আমাকে! ও সব বড়ো বড়ো কথা আমাকে বলিস না। আমি স্বাধীন ভারতের নাগরিক। জ্যোতিবাবুর অভয়ারণ্যে আমার বাস।”

বলেই যাত্রার নায়কের মতো হাসল, হাঃ! হাঃ!

“তোকে আমি খুন করে ফেলব পিকলু।”

“কর না। জেলে যাবি। খুসিকেই তুই মেরে ফেললি। আমার আর কোনো ভয় নাই।”

“আমি খুসিকে মেরে ফেললাম?”

“না তো কি?”

“পরগাছা, আত্মসম্মানহীন জানোয়ার!”

“টাকাটা দে। ট্যাক্সি থেকে আমি নেমে যাই।”

“তুই আমার অনেক টাকা মেরেছিস তঞ্চক। তোকে আর এক পয়সাও দেব না। আমার টাকা কি হারামের টাকা? কষ্ট করে রোজগার করতে হয় না তা?”

“ছাড়। ওসব বক্তৃতা অন্যকে দিস। সুমন্ত্রর কাছ থেকে পাওনা টাকা তুই দিবি না তো দেবে?”

"তোকে আমি এক পয়সাও দেব না।"

পিকলু একদৃষ্টে চেয়ে রইল জিষ্ণুর মুখের দিকে।

তারপর হঠাৎ বলল, "তাহলে মাল খাওয়া। চারটে খেয়ে এসেছি। আমার আরও খেতে ইচ্ছে করছে।"

"ঠিক আছে। অলিম্পিয়ায় চল।"

"চল।"

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে অলিম্পিয়ায় ঢুকল ওরা।

"কী খাবি?"

"ডিরেক্টরস স্পেশ্যাল খাচ্ছিলাম। তাই খাব। হুইস্কি।"

"খা।"

"তুই?"

"আমিও খাব।"

"তুই কী খাবি?"

"রাম।"

"কাটলেট খাওয়াবি না? অলিম্পিয়ার কাটলেট-এর জবাব নেই।"

"খা।"

অলিম্পিয়া থেকে যখন ওরা বেরুল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। পিকলু প্রায় আউট হয়ে গেছে। জিষ্ণুও অল্পসময়ের মধ্যে চারটে খেয়ে "হাই" হয়ে গেছে।

ট্যাক্সি নিল একটা।

জিষ্ণু বলল, "তুই শিশির মঞ্চে আজ আর যাস না। বরং আগে চল। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে একটু হাঁটি। মাথাটা ভারী হয়ে গেছে।"

পিকলু বলল, "বাঃ। বেশ পুরোনো দিনের মতো। কী বল? ভালোই বলেছিস। শিশির মঞ্চে না গেলেও হয়। কী হবে গিয়ে? ধ্যুসস...যত জালি কবিদের ভিড়? ভোগলা-দেওয়া আবৃত্তি!"

ট্যাক্সিটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পেছনের গেট ছেড়ে দিয়ে ওরা নামল।

জিষ্ণু বলল, "চল। ওই দিকে চল। নির্জন আছে।"

"চল। তুই আমার ন্যাংটোপোঁদের বন্ধু। তুই শালা যে কোনো গর্তে যেতে বলবি যাবো।"

জায়গাটা বেশ নির্জন। মিনিবাসের ড্রাইভার ভোঁতকা যেখানে গুলি খেয়েছিল তার চেয়েও।

জিষ্ণুর মাথার মধ্যে ভূতটা বলল।

জিষ্ণু বলল, "রিল্যাক্স কর। তুই খুব পেন্ট-আপ হয়ে গেছিস।"

"তুই শালা কমার্শিয়াল ফার্মে কাজ করে ইঞ্জিরিটা পর্যন্ত ভুলে গেছিস। ইংরিজি অবশ্য শিখেছিলি আমার কাছ থেকেই।"

"হয়তো তাই। গাছে হেলান দিয়ে বোস।"

"ঠিক বলেছিস। কিন্তু আমার কবিতা। আমার নম্বর ছিল লিস্টে তেইশ নম্বর। আজকাল কবিরা যূথবদ্ধ হয়ে গেছে। দলে না থাকলেই ওরা একা পেয়ে আমাকে শেষ করে দেবে।"

"চুপ কর। যূথ হয়, গোষ্ঠী হয়, জানোয়ার আর ইতর মানুষদের। কবি চিরদিনই একা। একা ছিল। একা থাকবে।"

"আমি যাই..."

"বাইশজন পড়বেন। তবে না তেইশ।"

"রাইট। ঘুম পাচ্ছে একটু! কিন্তু আমার টাকাটা?"

পিকলু বলল।

"মোটা টাকা পাবার আগে সকলেরই আরামে ঘুম পায়। ক-টা খেয়ে এসেছিলি আমার কাছে আসার আগে?"

"চারটে।"

'তাহলে আটটা খেয়েছিস সবসুদ্ধ।"

"হ্যাঁ।"

জিষ্ণু নিজের গলার টাইটা খুলে পিকলুর গলায় পরিয়ে দিয়ে খেলাচ্ছলে একটা ফাঁস লাগাল। গাছে হেলান দিয়ে শুয়েছিল পিকলু।

"কী করছিস?"

"টাইটা তোকে দেব।"

"আহা! মাঝে মাঝে এমন প্রাপ্তিযোগের দিন আসে। কিন্তু টাকাটা?"

"টাকাটাও দেব।"

টাইয়ের নটটা ঠিকমতো বসতেই জিষ্ণুর যেন কী হয়ে গেল। পুষির মৃত্যু, পরীর পাগলামি, পিকলুর তঞ্চকতা, মামণির মুখ এবং পিপির অসহায়তা সব মিলে মিশে গিয়ে ওর দুটি হাতে কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন জোর জোগাল, আর মাথায় জিঘাংসার আগুন। ওর ব্রিফকেসটা পিকলুর পেটের কাছে রেখে তার উপর নিজের দু পা তুলে জোরে টানল। জোরে।

দমবন্ধ হয়ে গিয়ে পিকলু বলল, "জিষ্ণু আমি কিন্তু শালা মরে যেতে পারি।"

"একদিন যাবি। সকলেই তো মরবে একদিন।"

পিকলু একবার উঁক করে আওয়াজ করল। তারপরই ওর জিভটা বেরিয়ে আসতে লাগল।

জিষ্ণুর, পিপির পিংক-ফ্রক পরা ফুলের মতো মেয়েটির কথা, তিতির কথা মনে হল। পিকলুব মেয়েটাও কি অমনই সুন্দর?

মনে হতেই হাত ঢিলে করে দিল জিষ্ণু। তারপর ছেড়ে দিল পিকলুকে। যে হাত প্রাণ দান করতে এসেছে এখানে, সে প্রাণ নিতে জানে না।

অনেকক্ষণ পর গোঙাতে গোঙাতে অবিশ্বাসের গলায় পিকলু বলল, "তুই আমাকে খুন করছিলি?"

"হ্যাঁ। তুই আমাকে অনেকবার খুন করেছিস। যদিও রক্ত বেরোয়নি বা জিভ বেরিয়ে আসেনি আমার।"

বিস্ফারিত চোখে পিকলু বলল, "তোর বড্ড বাড় বেড়েছে জিষ্ণু। তোকে আমি খুন করব একদিন।"

পিকলু গাছতলাতেই পা ছড়িয়ে বসে রইল। ওর উঠতে সময় লাগবে।

জিষ্ণু যখন উঠে পড়ে চলে আসছে, পিকলু আবারও বলল, "টাকাটা দিবি না তাহলে?"

"না। জীবনেও নয়। কোনো টাকাই নয়। তুই আমার সামনে আসিস না কোনোদিন। কোনোদিনও না। তুই আমাকে নষ্ট করে দিয়েছিস, আমার ভালোত্ব, বিশ্বাস, সব। আমি মরলে তুই শ্মশানেও আসিস না। শুনেছিস?"

"হুঁ।"

পিকলু বলল। বলল, "তোকে আমি খুন করবই। দেখিস।"

জিষ্ণু সারকুলার রোডে এসে একটি ট্যাক্সি ধরল। ট্যাক্সি ধরে পিপির বাড়ির ঠিকানা বলল।

কেন যে, তা ও জানে না। ওর ভয় হল, পিকলু যদি পিপির কাছে যায় এখন? একা বাড়িতে আছে। পিপির জন্যে ভয় হল, অথচ পিপি ওর কেউই নয়। আশ্চর্য!

পিপির বাড়ির সব আলোই প্রায় নেভানো। অথচ রাত মোটে সাড়ে আটটা। একটি মৃদু আলো জ্বলছে বেডরুম থেকে।

কলিংবেল টিপল, লাল সিমেন্টের মেঝের তিন ধাপের উপরের ধাপের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে।

একটু পর পিপি নিজেই এসে দরজা খুলল।

বলল, "আপনি, স্যার? কি বলব, আপনাকে আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম। আমার বড় ভয় করছে আজ রাতে। একা একা। একা থাকতে।"

জিষ্ণু বলল, "পিপি। আমি ভগবান নই। আমি সুমন্ত্রর চেয়েও খারাপ। আমি অনেক মদ খেয়ে এসেছি। আমিও একা পিপি। খুব একা। আমারও বড়ো ভয় করে।"

পিপি বোধহয় আবারও চান করেছিল। ভারি গুমোট গরম আজকে। একটু শুধু পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছিল গায়ে।

পিপি বলল, "পিকলুবাবুকে টাকাটা দিলেন?"

"না। দিইনি। দেব না। আমি খুন করব ওকে।"

তারপরই লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি মাতাল হয়ে গেছি পিপি। আমি এখন...তোমার মানে, আপনার, তোমার এখন বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাকে বিশ্বাস..."

"কী করব? বিশ্বাস কাউকেই না করে যে বাঁচাও যায় না।"

"একটু জল খাব।"

"পাখাটার নিচে বসুন। এনে দিচ্ছি।"

জল খেয়ে জিষ্ণু বলল, "তুমি সারা রাত একা থাকবে। সরি আপনাকে তুমি বলছি। নেশা হয়ে গেছে আমার।"

"তুমিই বলবেন। কেন বলবেন না! না। সারারাত একা থাকব না। একটু পরেই পারুলদি আসবেন দোতলা থেকে। আমিই তো ইনডায়রেক্টলি খুন করেছি সুমন্ত্র ও তিতিকে। পাড়ার লোকে কেউ তো আমাকে ভালো বলেননি। বলবেনও না। পারুলদির স্বামীও আত্মহত্যা করে মারা গেছিলেন পাঁচ বছর আগে। অন্য একটি মেয়েকে ভালোবেসে।

পারুলদি একটু আগেই বলছিলেন, আত্মহত্যা করে ভীরুরা।"

"তাই? কে জানে?"

একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি কি কাকিমাকে নিয়ে এসে তোমার কাছে রেখে যাব।

"না না। আমি আজ পারুলদির সঙ্গেই থাকব। আমার ঘুম তো হবে না। তিতি সুমন্ত্র ওদের সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।"

বলেই বলল, "চমৎকার মহিলা কিন্তু আপনার কাকিমা।"

পাশের ঘর থেকে ফুল, এবং ধূপের গন্ধ আসছিল।

পিপি বলল, "পারুলদি আসা অবধি থাকুন। তাহলেই হবে।"

"ঠিক আছে।"

"আপনাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। কখনও সুযোগ পাইনি। সেনগুপ্ত সাহেব বহুদিন ধরেই আমার নামে সকলকেই যা তা বলে বেরিয়েছেন। প্রতিবাদ করব কার কাছে? কেউ তো জিজ্ঞেস করেনি আমাকে কোনোদিন কিছু। ওই মানুষটা, আপনার বন্ধু পিকলু আর স্বামী সুমন্ত্র—তিনজনে মিলে আমাকে তাদের নানা কাজের টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইত। তাই নিয়েই তো...। সে সব অনেক কথা। আপনাকে বলব সব। মানুষ যখন অমানুষ হয়ে যায় তখন জানোয়ারও তার চেয়ে ভালো। তাই নিয়েই ডিভোর্স। তিতি কোনোদিনই ওর কাছে শুত না। ওকে ভয় পেত তিতি। ও মারত তিতিকে মদ খেয়ে। গতরাতে অনেক অনুনয়-বিনয় করল। ভাবলাম, ডিভোর্স পেয়েছি, তিতিকেও আমিই পাব। ও না হয় পেলই এক রাতের জন্যে। কেন যে..."

এমন সময় বাইরে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। কলিংবেল বাজল।

জিষ্ণু বলল, "পারুলদি?"

"পারুলদি তো দোতলা থেকে আসবেন।"

বলেই, দরজা খুলেই পিপি একটি ভয়ার্ত শব্দ করেই চুপ করে গেল।

পিকলুর গলা। জিষ্ণু শুনল, পিকলু বলছে, "এই টাইটা জিষ্ণু আমাকে দিয়েছে। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি আজ।"

একটি গোঙানির মতো আওয়াজ ভেসে এল।

জিষ্ণু দৌড়ে গিয়ে পিকলুর কলার ধরে ওকে ঘরের মধ্যে টেনে আনল। জিষ্ণুর টাইটা পিপির গলায় চেয়ে বসেছিল। পিকলুকে ঘরে টেনে এনে দেওয়ালে ঠেসে ধরল।

পিকলু বলল, "তোর সময় হয়ে এসেছে রে জিষ্ণু। তোর পিপিকে আর তোকে একসঙ্গেই উপরে পাঠাব। তুই চিনিস না আমাকে!"

পিকলুকে ছেড়ে দিয়ে জিষ্ণু বলল, "বাড়ি যা এখন তুই। গত পঁচিশ বছরে যে তোকে চিনতাম, সে তুইও এই নোস। তুইও চিনিস না আমাকে।"

পিকলু উঠে পড়ে বলল, "ঠিক আছে। আজ যাচ্ছি।"

"বলেই, মাটিতে পড়ে-থাকা টাইটা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

যাবার সময় বলল, "আমার নাম পিকলু। তোরা মনে রাখিস।"

মানসিকভাবে বিধ্বস্ত জিষ্ণু বলল, "ওর স্ত্রী খুসি ক্যানসারে মারা গেছে। তারপর থেকেই বোধহয় ওর এমন মাথার...।" তারপর গভীর অনুশোচনা ও দুঃখের গলায় বলল, "বড়ো কষ্ট হয় দীর্ঘদিন ওই আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল এ কথা ভাবলে।"

পিপি বলল, "খুসিদি মারা গেছে এ কথা আপনাকে কে বলল? মারা গেছে না ছাই! খুসিদিকে পাগল বানিয়ে তো রাঁচিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। খুসিদির বাপের বাড়ির অনেক জমিজমা ছিল। খুসিদির বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী খুসিদির নামে উকিলকে দিয়ে সব দাবিদাওয়া আদায় করিয়ে নিয়ে তারপর খুসিদির সব কিছু সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে তাকে পাগল বানিয়ে রাঁচিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই পাগল বানাবার জন্যেও একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে হাত করে ঘুষ দিয়েছিল। আর আমার স্বামী সুমন্ত্রই পিকলুবাবুকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। আমি সব জানি। এমনকী খুসিদিকে রাঁচিতে পাঠাবার আগে ওদের মেয়েটাকে পর্যন্ত বিষ খাইয়েও মেরেছে। আমি সব জানি।"

"কী বলছ কি পিপি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

প্রায় ভেঙে-পড়া গলায় জিষ্ণু বলল।

"মাথা আমার খারাপ হয়নি। তবে মাঝে মাঝে মনে হয় যে, হয়ে যাবে। আপনি আমার অবস্থাটা অনুমানও করতে পারবেন না স্যার। একজন মহিলার স্বামী এবং মেয়ে চলে গেছে চব্বিশ

ঘণ্টাও হয়নি, অথচ যে স্বামীর শোকে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলতে পারছে না। এমনকী ফুলের মতো মেয়ের জন্যে যে শোক করবে তাও পারছে না।"

"স্যার নয়, জিষ্ণুদা বলো। এত সব কথা তুমি আগে বলোনি কেন? তুমি কাজের জন্যে হলেও তো দিনে আমার সঙ্গে প্রতিদিন দশঘণ্টা কাটাতে।"

"কী করে বলব? সময় আর সুযোগ না হলে বলি কী করে? আপনি যদি বিশ্বাস না করতেন আমাকে তাহলে তো আমার চাকরিটাই যেত। পিকলুবাবু তো আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলেন। চাকরিটা যে আমার কত দরকার জিষ্ণুদা। চাকরিটা চলে গেলে তিতিকে নিয়ে আমাকেই আত্মহত্যা করতে হত।"

"বড়ো দেরি হয়ে গেল পিপি। সব কিছুরই। বড়োই দেরি হয়ে গেল।

জিষ্ণু বলল।

"জানেন! সেদিন পিকলুবাবু আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন। অথচ চিঠিখানার জন্যে আপনি আমাকেই বকেছিলেন। কিন্তু উনি বলেছিলেন, উনি যা বলছেন তা না করলে বিপদ হয়ে যাবে। বিপদের কমই বা কি হল বলুন? এরকম বিপদের ভয় সুমন্ত্র, সেনগুপ্তসাহেব এবং পিকলুবাবু আমাকে প্রায়ই দেখাতেন। বলতেন, আরব-শেখদের কাছে বিক্রি করে দেবেন।"

জিষ্ণু ভাবছিল, ভিক্টোরিয়াতে পিকলুর গলায় লাগানো টাইয়ের ফাঁসটা আলগা করা উচিত হয়নি ওর। ওখানেই বদমাশটাকে শেষ করে দিলে ভালো হত।

পিপিকে শুধোল, "তুমি পুলিশে খবর দাওনি কেন?"

"পুলিশ?"

বলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

"আমাকে জানাওনি কেন? আমার জানাশোনা ছিল ওপরে। অবশ্য হীরুকাকার সূত্রে। অবশ্য জানাশোনা থেকেই বা কী হল? আমার ফিঁয়াসে পুষিকে যে-মিনিবাস ড্রাইভার চাপা দিয়ে মেরে ফেলল তারই তো জেল হল না আজ অবধি।"

পিপি বলল, "সেটা অন্য ব্যাপার। আইনের বিচারে সময় তো লাগেই। এ তো কাজির বিচার নয়। সেটা একটা কেস-এর ব্যাপার। কিন্তু এগুলো? দিনের পর দিন এই ভয়ের মধ্যে দিন কাটানো? আসলে আমি কাউকেই কিছু বলতে পারতাম না তিতির মুখ চেয়েই। সুমন্ত্র একদিন বলেছিল, ওর অনেক টাকার দরকার, তিতিকেও ও আরব-শেখের কাছে বিক্রি করে দেবে। এক লাখ দাম পেয়েছে। বম্বেতে ওর কনট্যাক্ট আছে। আমি ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকতাম। সুমন্ত্র আর পিকলুবাবু মিলে সব কিছুই করতে পারত। ওদের অসাধ্য কিছুই নেই। দেখলেন তো তিতিকে কেমন করে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। বেচারি তিতি।"

বলেই, ডুকরে কেঁদে উঠল পিপি।

"আমি ভাবছি, গুন্ডা-বদমাশই যদি হবে তবে সুমন্ত্র নিজে আত্মহত্যা করল কেন? অমন মানুষরা তো সচরাচর আত্মহত্যা করে না। আত্মহত্যা করে অন্তর্মুখী, গভীর অথচ খুব সেনসিটিভ মানুষেরা।"

"উপায় ছিল না। ডিভোর্স-এর মামলার রায় বেরুনোটা একটা ছুতো মাত্র। ও আর পিকলু আর সেনগুপ্তসাহেব মিলে কোনো একটা খুব বড় গোলমাল করেছিল শিগগিরই, যে জন্যে এক্সাইজ ও কাস্টমস-এর লোকেরা ওদের খুঁজছিল। ব্যাপারটা ঠিক কি তা আমি জানি না। ড্রাগ-টাগের ব্যাপারও হতে পারে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোকেরাও এসে একদিন আমার অফিসে খোঁজখবর করে গেছিল। আমার মনে হয়, ওরা তিনজনেই একটা ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। ভীষণ ভয়।"

হঠাৎ পিপি একবার ওঘরে গেল। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে বলল, "তিতি রোজ ঠিক এই সময়ে খেত। ভোরবেলা স্কুলে যেতে হবে তাই তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিতাম। আর কোনোদিন..."

জিষ্ণুর কণ্ঠার কাছে একটা ব্যথা ঠেলে এল। ওর এই দোষ। পরের ব্যথাকে পরের ব্যথা করেই রাখতে পারে না। পৃথিবীর সব ব্যথা, সব মানুষের ব্যথা, হীরুকাকার ব্যথা, কাকিমার ব্যথা, পবীর ব্যথা, তারিণীবাবুর ব্যথা, মামণির ব্যথা, আর এখন পিপির ব্যথা ওর বুকের মধ্যে জায়গা করে নিল। পিকলুর কথা মনে পড়ল : "আজকাল সেন্টিমেন্টের দিন নয়, টানটান গদ্যর দিন। তুই বড়ো সেন্টিমেন্টাল। তাই মানুষটা যেমন, তোর লেখাও তেমন, ম্যাদামারা। তোর লেখা কেউই পড়বে না।"

জিষ্ণু ভাবছিল, পিপির জলভরা মুখের দিকে তাকিয়ে যে, লেখালেখি ছেড়েই দেবে লেখালেখি করে নাম করার চেয়ে অন্যর ব্যথার ভাগীদার হতে পারাটা অনেকই বড়ো ব্যাপার অনেকে তো ইচ্ছে থাকলেও হতে পারে না। ওই বা কতদিন পারবে? এই কলকাতায়?

জিষ্ণু একবার ঘড়ির দিকে তাকাল।

"আপনার রাত হয়ে যাচ্ছে না?"

"না, এখনও তেমন রাত হয়নি বাড়িতে ভাববার মতো। ভাবলে, কাকিমাই ভাববেন। একটু ব্যাপারে বড়ো বাঁচোয়া। আমাকে নিয়ে তেমন চিন্তা করার কেউই নেই।"

"পারুলদি এসে যাবেন এখনই। আপনি আর একটু বসুন। আমার বড়ো ভয় করছে স্যার।"

"ভয় কিসের। ভয় নেই কোনো। আমি আছি।"

পিপি চুপ করে জিষ্ণুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ ওর দুচোখ জলে ভরে এল।

জিষ্ণু বলল, "তুমি এখন কী করবে পিপি?"

"আমি? তাই ভাবছি।"

"তোমার মা-বাবা ভাই-বোন কেউ নেই?"

"সকলেই ছিল। আমরা জামশেদপুরের লোক। জুগসালাইতে বাড়ি ছিল আমাদের। বিহারী মুসলমান পাড়ার মধ্যে। উনিশ শো উনআশিতে দাঙ্গায় বাবাকে-মাকে, ষোলো বছরের বোনকে এবং দশ বছরের ভাইকে মেরে ফেলে ওরা। আমি সেদিন টেলকো কলোনিতে ছিলাম। মাবার আগে মাকে...বোনকে...। জন্তুরা...কুমিল্লা থেকে ঠাকুর্দা ও দাদুরা একবার উদ্বাস্তু হয়ে আসেন উনিশ শো ছেচল্লিশে। এবং আবারও উদ্বাস্তু হন জামশেদপুরে। উনিশ শো উনআশিতে।"

জিষ্ণু স্বগতোক্তি করে বলল, "ভারতবর্ষে!"

"হ্যাঁ। একদিন হয়তো ভারতবর্ষ থেকেও আমাদের উদ্বাস্তু হয়ে চলে যেতে হবে। তারপর বলল, সুমন্ত্র এবং ওরা সকলেই জানত আমার অসহায়তার কথা। জানত যে, আমার পেছনে আপনার জন বলতে কেউই নেই। একজনও নয়।"

বাইরে বেল বাজল।

পারুলদি এলেন। মাঝবয়সি মহিলা। মুখে গভীর দুঃখের ছাপ। সেই দুঃখের স্থায়ী বাসা এখন তার মুখেই। কতলোকের কতরকম দুঃখ থাকে। তারা সবাই কেন যে জিষ্ণুর সামনে আসেন?

জিষ্ণু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "নমস্কার।"

"নমস্কার।"

পিপি বলল, "আমার অফিসের বস, জিষ্ণু চ্যাটার্জি।"

পারুলদি বললেন, "এতদিন কোথায় ছিলেন? একদিনও তো দেখিনি। আপনার অনেকই আগে আসা উচিত ছিল পিপির কাছে। আপনার কথা কত যে শুনেছি পিপির কাছে। আপনার সব কথাই আমার জানা হয়ে গেছে। পিপি যে আপনাকে কী চোখে দ্যাখে তা আপনি..."

কেন একথা বললেন পারুলদি জিষ্ণু বুঝল না।

পিপি মুখ নিচু করে ছিল।

পারুলদির কথার এবং মুখের ভাবে গভীর আন্তরিকতা ছিল।

বললেন, "তোর খাবার নিয়ে আসছে পিপি, পল্টু। কাল থেকে তো অফিস যাবি?"

"আমি খাব না কিছু।"

"তুই এই একতলায়, এক বাড়িতে থাকবি কী করে? কিছুক্ষণ আগে একটা চ্যাঁচামেচি শুনলাম। কে এসেছিল রে?"

"পিকলুবাবু।"

"এমন একটা দিনেও নিস্তার নেই। বুঝলেন জিষ্ণুবাবু, এ শহরে আইন নেই, পুলিশ নেই, এমনকী ঈশ্বরও নেই। এখানে পিপির মতো পরিবার-পরিজনহীন সুন্দরী মেয়ের একা একা বাঁচার মতো বিপজ্জনক ব্যাপার আর দুটি নেই। ওকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন জিষ্ণুবাবু। এ বাড়িতে তো উপরে আমি আর নীচে ও।"

জিষ্ণু উঠে পড়ে বলল, "আমিও তাই ভাবছিলাম। পিপি তুমি কাল অফিস বেরোবার সময় কিছু জামাকাপড় ও জরুরি জিনিস নিয়েই বেরিয়ো। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তুমি আমার কাকিমার সঙ্গেই থাকবে। কদিন থাকো। যদি ভালো না লাগে তাহলে তোমাকে তারিণীবাবুদের বাড়িতে রাখার বন্দোবস্ত করব। একটু কষ্ট হবে হয়তো সেখানে কিন্তু নিরাপত্তার অভাব হবে না মনে হয়।"

"তারিণীবাবু কে?"

"উনি আমাদের বাড়িওয়ালা। তারিণী চক্রবর্তী। বৃদ্ধ লোক, রিটায়ার্ড। বড় দুঃখী। এবারে আমি উঠব।"

পিপি এসে দরজা খুলে দাঁড়াল।

বলল, "সাবধানে যাবেন।"

ওর মুখের একপাশে ভিতর থেকে আলো এসে পড়েছিল। জিষ্ণুর মনে হল, পিপিকে যেন এই দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে বিদায় দিতে কতদিন থেকেই দেখছে। কতই যেন চেনা তার!

এই পিপি!

হীরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেই হাঁক দিলেন।

শরীর আজকাল বোঝায় যে আগের দিন আর নেই।

হেমপ্রভা সারা সকাল কেঁদেছেন। চোখ মুখ ফুলে গেছে। পরী আজও বম্বে গেছে সকালের ফ্লাইটে। ফ্লাইটটা খুব ভোরে নয়। তার আগে পরী যা বলে গেছে হেমপ্রভাকে তাতে তাঁর আর বেঁচে থাকার কোনোই ইচ্ছা নেই।

ওঁর মুখ দেখেই হীরু বুঝলেন যে সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। হেমপ্রভা নিজের ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে বসেছিলেন বেতের চেয়ারে। এই বারান্দাটা পেছনের দিকে। এতে বসেও গানুবাবুদের বাড়িটা দেখা যায়। তবে এদিকটা অন্য দিক। মারবেলে পাড় বাঁধানো পুকুর। তার চারপাশে নারকেল গাছের সারি। রঙ্গন, জবা, নানারকমের টগর ইত্যাদি গাছ। বেলগাছ আছে একটা মস্ত

বড়ো। তার নিচে ছোট্ট শিবমন্দির। কর্তামা বাঁ হাতটি কোমরে রেখে এখনও দুজন বামুনঝির সাহায্যে ককিয়ে কেঁদে একবার ডাইনে ঝুঁকে আরেকবার বাঁয়ে ঝুঁকে রোজ সকালে এদিকে আসেন। পুকুরে চান করার পর পুজো দিয়ে ফিরে যান।

এদিকেও অনেক পাখি আছে। তারা যদিও পোষা নয় কিন্তু প্রায় পোষাই হয়ে গেছে। তাদের জন্যেও আলাদা করে নানারকম দানা, গম, চাল, ফল ইত্যাদি দেওয়া হয়।

হীরুবাবু কখন যে পেছন থেকে এসে পাশের চেয়ার বসেছেন খেয়ালও করেননি হেম।

মোক্ষদা যখন হীরুকে জিজ্ঞেস করল, চা দেব কি বাবু? তখনই মুখ ফিরিয়ে হীরুকে দেখতে পেলেন উনি। দেখতে পেয়ে, আবারও মুখ ফিরিয়ে বাগানের দিকে উদাস চোখে চেয়ে রইলেন।

মোক্ষদা উত্তর না পেয়ে এবং হেমপ্রভার থমথমে মুখের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

আকাশ মেঘে ঢেকে রয়েছে। হাওয়া দিচ্ছে পুবদিক থেকে। গানবাবুদের বাগানের নানা গাছ থেকে বর্ষার ফুল উড়ে আসছে হাওয়াতে। এখনি বৃষ্টি নামবে।

হীরুকে দেখেই দু চোখ বেয়ে অঝোরে জল নামল আবারও হেমপ্রভার।

"কী হল কি তোমার? হেম?"

হীরু সহানুভূতির গলাতে শুধোলেন।

"পাখিদেরও ঘর থাকে। থাকে ফুলেরও।"

"মানে?"

হীরুবাবু বললেন।

"আজ। পরী...।"

বলেই, কান্নাতে ভেঙে পড়লেন হেম।

"কী? কী করেছে তোমার পরী? দেব না তার ডানা কেটে?"

"সে তো ডানা-কাটাই।"

হেম বললেন।

"কী বলেছে কি?"

গলা নামিয়ে হেম বললেন, "বলেছে, তুমি যে ওর বাবা তা ও জানে। আমি এত বছর আমার-তোমার সম্পর্কটা লুকিয়ে রেখে স্থিরব্রতর জন্মদিনে মিথ্যে করে ওকে দিয়ে তার ছবিতে প্রণাম করিয়েছি। জিষ্ণুকে মিছিমিছি কাকার মেয়ে বলে পরিচয় দিয়েছি ওর। ও জিষ্ণুকে বিয়ে করতে চায়। ওদের দুজনের মধ্যে কোনোরকম রক্তসূত্রের আত্মীয়তা তো সত্যিই নেই।"

হীরু অনেক্ষণ চুপ করে রইলেন, বাগানের দিকে চেয়ে।

অনেকক্ষণ পর মুখ ফিরিয়ে বললেন, "বিয়ে যদি করতে চায় করুক না হেম। তাতে তোমার আপত্তি কিসের?"

"এত বছর এত কষ্ট করে ছেলে-মেয়ের মতো মানুষ করে তুললাম ওদের আর সবই বৃথা যাবে? তোমার কষ্ট? ওরা কেউই নয় আমাদের?"

"আমার কোনো কষ্ট নেই। তাছাড়া, আনন্দও তো কম ছিল না। যখন ছিল। শুধু কষ্টর কথাটাই মনে করলে চলবে কেন বলো?"

"তুমি সায় দিচ্ছ এই বিয়েতে?"

"হ্যাঁ। আমার পূর্ণ মত আছে এতে। আমি দাঁড়িয়ে থেকে এ বিয়ে দেব। আমার মেয়ের বিয়ে আমি দাঁড়িয়ে দেব না তো কে দেবে?"

"লোকে কী বলবে?"

"এই লোকের কথা ভেবেই তো তুমি আমাকেও বিয়ে করোনি হেম। পরীর পিতৃপরিচয় গোপন করেও স্থিরব্রতর মৃত্যুর দু-তিন বছর পরে বিয়ে করলে আজকে তোমার এবং আমার এরকম চোখ

হয়ে থাকতে হত না সমাজের কাছে। তাছাড়া, প্রথম থেকেই সত্যি কথাটা প্রকাশ করে দিলে আজকে পরীকে আমার মেয়ে বলে আমিও তো সম্মানের সঙ্গে দাবি করতে পারতাম। আমাদের সমস্ত জীবনটাই পরের বাড়ি গিয়ে চুরি করে পুতুল খেলা বলে মনে হত না জীবনের শেষে এসে।"

"ঠিকই বলছ তুমি।"

হেম বললেন, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে।

একটু পর হীরু বললেন, "জিষ্ণু জানে?"

"জানে কি আর না? তাছাড়া বিয়ের বাকিই বা কি আছে বলো? মেয়ে তো আদ্ধেকটি রাত জিষ্ণুর ঘরেই কাটায় আজকাল। যখন ফিরে যায় তখন আমি বন্ধ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওর পায়ের শব্দ শুনি। দরজা খুলে কিছু যে বলব, সে সাহস হয়নি আমার এতদিন। কাল রাতে, আর না থাকতে পেরে দরজা খুলে বলেছিলাম "কী হচ্ছে পরী? এসব কী হচ্ছে?"

"হুমম। তাতে কি বলল পরী?"

পরী বলল, "শাট-আপ।"

"বলল, 'চরিত্রগুলো পালটে দিয়ে দেখো। মনে করো হীরুকাকু যখন আমাদের বাড়িতে থাকত তখন হীরুকাকুর ঘরে তুমি যাচ্ছ রাতের বেলা। আমি তখন ছোটো ছিলাম মা। কিন্তু তুমি যতক্ষণ না ফিরে আসতে ভয়ে ঘুমোতে পারতাম না। আজ তুমি ভয়ে ঘুমোতে পারছ না আমি যতক্ষণ জিষ্ণুর ঘর থেকে না ফিরি'।"

"আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম।"

"পরী হাসতে হাসতে এবং জানো, টলতে টলতেও ওর ঘরে গিয়ে দরজা দিয়েছিল। সভ্যতা, সমাজ, লোকভয়, গুরুজনের প্রতি ভয়-ভক্তি সবই উবে গেল কি এমন করে? এই অল্পকটা বছরে?"

হীরুবাবু বললেন, "গেছে বইকী! অস্বাভাবিকও নয়। বদলটাই তো নিয়ম। তাকে মেনে নেওয়াটাই আধুনিকতা!"

বলেই হাঁক দিলেন, "ও মোক্ষদা। মোক্ষদা কোথায় গেলে?"

ভেতর থেকে মোক্ষদা সাড়া দিল। সে এলে বললেন, "আমাদের দুজনকেই একটু চা খাওয়াও দেখি। চিনি দিয়েই দাও ভালো করে আমাকে। আর একটা অমলেটও বানিয়ে দিয়ো।"

মোক্ষদা চলে গেলে, হেম বললেন, "চিনি খাচ্ছ যে?"

"আর কী হবে ভয়-ভাবনা করে? এখন যে কদিন বাঁচব নির্ভয়ে বাঁচব।"

হেম চুপ করে রইলেন।

"তোমার অত চিন্তার কি বলো তো? আমার তো মাথা গোঁজার জায়গা একটা আছে! না কি? তোমার যদি সেখানে যেতে লজ্জা করে তাহলে তোমাকে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়েই নিয়ে যাব। বিয়ে করে, বউই আসলে. তাকে না হয় তিরিশ বত্রিশ বছর পরেই বিয়ে করব। কী বলো বউ?"

হেমের চোখে তখনও জল ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই হেসে উঠলেন।

"কেন?"

মোক্ষদা ভিতরের বারান্দা থেকে গলা-খাঁকরে ট্রেতে বসিয়ে চা ও অমলেট নিয়ে এল।

বলল, "চিনি আলাদা করেই এনেছি, যেমন মায়ের জন্যে আনি। দুধও। কতটা দেব বাবু?"

"আমি নিয়ে নেবখন। আর শোনো মোক্ষদা। শ্রীমন্তকে ডাকো। এখনও বাজার বন্ধ হয়নি। এখানে না পেলে শ্যালদায় যেতে বলবে মিনি ধরে শ্রীমন্তকে। বলবে, দেড় কেজির একটি ভালো বড়ো ইলিশ মাছ নিয়ে আসবে। আর তুমি রাঁধবে। টকদইও আনতে বোলো। একটু কচুর শাক। ইলিশমাছের মাথা দিয়ে। একটু ছোলা দিয়ো তাতে। যাও শ্রীমন্তকে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি আমার কাছে একবারটি।"

শ্রীমন্ত এসে দাঁড়াতেই হীরুবাবু শ্রীমন্তকে টাকা দিয়ে বললেন, "শ্রীমন্ত, তুমি আগে আমাকে দু বোতল ব্ল্যাক-লেবেল বিয়ার এনে দিয়ে যাও তো শা'র দোকান থেকে।"

"সেটা কি বাবু?"

"মদ। গিয়ে বললেই দেবে। ওটা দিয়ে গিয়ে তারপর চট করে বাজার সেরে এসো। একটা বোতল ফ্রিজ-এ রেখে অন্য বোতলটা খুলে একটা গ্লাস দিয়ে আমাকে দিয়ে যাবে। কী বলবে?"

"আপনি বাবু? মদ?"

"হ্যাঁ গো শ্রীমন্ত। আমি। লুকোছাপার দিন আর নেই। পরী খাচ্ছে, জিষ্ণুও বাড়ি বসেই, আমাদের ছেলেমেয়েরা; তা আমি বুড়ো মানুষ একটু না হয় খেলুমই। আজ ভালো করে খেয়ে ঘুম লাগিয়ে জিষ্ণু ফিরলে তার সঙ্গে একবারটি দেখা করে তারপরই যাব। যাও শ্রীমন্ত। দেরি কোরো না আর।"

শ্রীমন্ত চলে গেলে হেম বললেন, "তুমি আবার এসব খেতে নাকি? শীতকালে একটু-আধটু ব্রান্ডি ছাড়া আর তো কোনোদিন কিছুই দেখিনি।"

"তুমি আমার কতটুকু দেখেছ হেম? তাছাড়া, অতীতের কথা ছাড়া, বর্তমানের কথা বলো।"

এমন সময় কড়াক্কড় শব্দে বাজ পড়ল। তারপরেই বৃষ্টি নামল মুষলধারে। চারধার অন্ধকার করে।

"বাঃ।"

হীরুবাবু বললেন, বৃষ্টির দিকে চেয়ে।

"আমি যাই জানলা বন্ধ করিগে।"

"হেম উঠতে গেলেন।

"আহা, চা-টা রসিয়ে রসিয়ে খেয়েই যাও। অ্যাই দ্যাখো। শ্রীমন্তকে পান আনতে বলতে ভুলে গেলুম!"

"পান মোক্ষদার কাছে আছে।"

"জরদা?"

"বাবা? একশো বিশতো? আমার কাছে রাখা আছে।"

"আহা। তবে তো কোনো কিছুরই অভাব নেই।"

"তোমার কচুর শাক হতে সময় নেবে কিন্তু।"

"নিক না। আমার তোমার হাতে এখন সময়ের তো আর কোনো অভাব নেই। অঢেল সময়।"

পরী ব্যাঙ্গালোর থেকে এসেছে তিনদিনের জন্যে।

আজ শনিবার পূর্ণিমা।

পিপি গত দশ-বারোদিন হল এখানেই আছে। কাকিমা খুবই খুশি সঙ্গী পেয়ে। পরী কিন্তু কোল্ড এবং ইনডিফারেন্ট। কুরুভিল্লাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে পরী। কলকাতা থেকে বদলি নিয়ে ও চলে যাচ্ছে সামনের শনিবারই। ব্যাঙ্গালোরেই থাকবে। তবে কোম্পানির বসকে বিয়ে করে সেই কোম্পানিতেই চাকরি করার বিস্তর অসুবিধেও আছে। তাই ওদের গ্রুপেরই একটি সাবসিডিয়ারিতে জয়েন করেছে পরী। অ্যাজ মার্কেটিং ম্যানেজার।

পরীর জীবনে সব ঘটনাই হঠাৎ ঘটে। জিষ্ণুকে ও যেমন হঠাৎই কাছে টেনেছিল তেমনি কুরুভিল্লাকেও টেনেছে। টেনে জিষ্ণুকে দূরে ঠেলেছে।

পরী সেদিন বলছিল জিষ্ণুকে যে, "কুরুকে এ বাড়িতে আনা যায় না। হি ইজ সো ফ্যাবুলাসলি রিচ। লেটেস্ট মডেলের মার্সিডিস ছাড়া চলে না, স্কচ ছাড়া খায় না, আর যে বাড়িতে থাকে সে তোমাকে. কী বলব জিষ্ণু। ভিলা। টেরাকোটা টালির ছাদ। পোর্শিও। টেরাস। গার্ডেন। অর্কিড-হাউস। সুইমিং-পুল। ভাবাই যায় না। কমপ্লিটলি আউট অফ দ্যা ওয়ার্লড প্লেস।"

একটু থেমে শ্বাস ফেলে বলেছিল, "লাইফ ইজ ফর লিভিং জিষ্ণু। নট ফর ব্রুডিং।"

তারপরই বলেছিল, "জানো তোমার মতো আগে কাউকেই দেখিনি, তাই তোমাকেই সবচেয়ে ভালো বলে জানতাম। কিন্তু তোমার চেয়েও ভালো যে কেউ আছে বা থাকতে পারে, তোমার চেয়েও হ্যান্ডসাম, তা চিন্তারই বাইরে ছিল। তাছাড়া পুরুষের সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য কি তা জানো? বিত্ত, সম্পদ এবং ক্ষমতা।"

জিষ্ণু বলেছিল, "যশ?"

"যশও। কিন্তু যশস্বী তো সবাই হতে পারে না।"

পরী নিজে খুশিতে ডগমগ। কিন্তু বাড়ি-সুদ্ধ সবাই পরীর জন্যে দুঃখিত। কুরুভিল্লাকে বলেছে, ওর মা-বাবা নেই। গভর্নেসের কাছে মানুষ।

কুরুভিল্লা নাকি বলেছে যে, সে শুধু পরীর জন্যেই পরীকে বিয়ে করছে। পরীর বংশপরিচয় কুষ্ঠি-ঠিকুজিতে সে আদৌ ইন্টারেস্টেড নয়। শি এলোন ইজ মোর দ্যান এন্যাফ টু ফিল হিজ লাইফ।

পরী বলেছিল, "কুরুভিল্লা মানুষটাও খুব একলা। মাফিয়াটাইপ ব্যবসা চালায়। শনিবারে শুধু একবার একজিক্যুটিভসদের মিট করে। অন্য সময় নিজেকে নিয়েই থাকে। নিজের সুখ, নিজের শখ, নিজের আহ্লাদ। জীবন উপভোগ করতে জানে মানুষটা। অথচ কী অল্প বয়স!"

"সাউথেই চলে যাও তোমরা।"

পরী বলেছিল জিষ্ণুকে, "এবারে সাউথের ফ্ল্যাটটা তুমি নিয়েই নাও জিষ্ণু। দেরি কোরো না। মা তো হীরুকাকার সঙ্গে নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে থাকছেনই। আর যে নতুন আপদটিকে বাড়িতে এনে তুলেছ তাকে অবিলম্বে বিদেয় করো। নইলে, করুণা, দয়া, সমবেদনা, অনুকম্পা এ সবের ককটেল-এ কখন দেখবে যে, 'পেরেম' হয়ে গেছে। বাঙালিদের এই 'পেরেম' ব্যাপারটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কখন যে কোথায়, কার সঙ্গে; কেন হয়ে যায় তা বলা ভারি মুশকিল। আমাকে দেখে বুঝছ না? আজকাল বিয়ে ফিয়ের ঝামেলাতে না যাওয়াই ভালো। যদি করোই, তবে বিয়ে করবে তোমার লেভেলের কমপক্ষে এক বা দু লেভেল উপরে।"

"হুঁ।'

জিষ্ণু বলেছিল।

পরীর সঙ্গে ইদানীং কনভারসেশান চলে না। পরীর সলিলোকিই শুনতে হয় একতরফা।

সেদিন ওর ঘরের লাগোয়া বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল জিষ্ণু। আকাশে মেঘ নেই। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পরীও এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। ওদের বাড়ির সকলেরই মন একটা কারণে খারাপ। খুবই খারাপ। গানুবাবুদের বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে। গাছগাছালি সবুজ, পেটা ঘড়ির আওয়াজ, আমির খাঁ সাহেবের দরবারি কানাড়া, ভীমসেন যোশীর ভূপালি, ছবি ব্যানার্জির কীর্তন, গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের টপ্পা, এ. টি কানন সাহেব আর মালবিকা কাননের গান—এসব আর শোনা হবে না তাঁদের স্বকণ্ঠে দিনরাতের বিভিন্ন প্রহরে। পাখি ডাকবে না আর। পুকুর ভরাট হবে। বৃষ্টিশেষের হাওয়ার বাতাবি ফুলের গন্ধ আসবে না ভেসে।

সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে মালটিস্টোরিড বাড়ির নির্মাতা। সাল্লু অ্যান্ড চৌধুরী। কনট্রাক্টরস অ্যান্ড প্রোমোটারস। আর্কিটেকটস : রহমুতল্লা অ্যান্ড বিসমিল্লা। বড়ো বড়ো সার্চলাইট লাগানো হয়েছে, বাড়ি ভাঙা ও গাছ কাটা শুরু হয়ে গেছে। সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা অবধি রোজ কাজ চলেছে। এতক্ষণ ইলেকট্রিক করাতের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল একটানা। গাছ কাটা হচ্ছে ক্রমাগত। স্নায়ু ঝনঝন করছে এই বাড়ির সকলের, ও বাড়ির মেঝে থেকে মারবেল তোলার ঠকাঠক আওয়াজে।

গানুবাবুরা এবাড়িতে এখন আর কেউই নেই। বাড়ি ভাঙার আগেই সকলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁদের ধনসম্পত্তি, বহুমূল্য হিরে-জহরত, তাঁদের বৈশিষ্ট্য এবং যাবতীয় গর্ব এবং দম্ভমেশা বিনয় নিয়ে সাউথের ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস-এর নবনির্মিত একটি মাল্টিস্টোরিড বাড়িতে তিনটি চার হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের দখল নিয়েছেন তাঁরা। তারপরের হিসেবনিকেশের কথা পাড়ার লোকে কেউ জানে না। এখানকার নতুন বহুতল বাড়ি শেষ হলেও এখানে আর ফিরবেন না তাঁরা। ''সাউথেই'' থাকবেন।

কর্তামা নাকি জীবনে প্রথমবার লিফটে চড়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলেন। ছোটো ছেলে বলেছিল কর্তামাকে—''সাউথে থাকতে অনেক হ্যাপাও আছে। এটুকু না পোয়ালে চলবে কী করে? মানুষ তো এবারে চাঁদে গিয়েও থাকবে শুনছি। সেখানে তো আরও হ্যাপা।''

ওরা চলে যাওয়াতে পাড়ার লোকে কেউই দুঃখিত হননি। কারণ তাঁরা এ-পাড়ার এবং এ-গলির মানুষদের মানুষ বলেই গণ্য করতেন না। সকলেরই দুঃখ হয়েছে অন্য কারণে। দুঃখ, একটা যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে, সবুজের শেষ চিহ্নও নিশ্চিহ্ন হচ্ছে বলে।

বাইরে বোর্ড লেগেছে। ''সেল। সেল। সেল। প্রকৃত বার্মা সেগুনের দরজা, জানালা, কড়িবরগা, ইটালিয়ান মারবেল, অ্যান্টিক ফার্নিচার, ল্যাজারার্স কোম্পানির।''

হঠাৎ গদ্দাম শব্দ করে পাড়া কাঁপিয়ে, মাটির সঙ্গে তার বহু বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে মুখ থুবড়ে পড়ল বিশাল কনকচাঁপা গাছটি।

জিষ্ণু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বর্ষায় ফুলে ফুলে ভরে যেত। গন্ধে 'ম-ম' করত সারা পাড়া। কত বছরের কত সুখ-দুঃখের সাথি এই গাছটি। মনটা বড়োই খারাপ হয়ে গেল।

পরী বলল, ''জানো জিষ্ণু, ব্যাঙ্গালোরে যে বাড়িতে যত গাছ আছে সেই অনুপাতে কর্পোরেশান ট্যাক্সে ছাড় দেয়, আর এখানে মাল্টিস্টোরিড বাড়ির প্ল্যান স্যাংশন করার সময় গাছ না-কাটার বা গাছ লাগানোর কোনো শর্তই আরোপ করা হয় না। পুরো শহরটা মরুভূমি আর কংক্রিটের পাহাড় হয়ে গেল দেখতে দেখতে। কারোরই মাথাব্যথা নেই। আবহাওয়া বিহারের মতো হয়ে গেল।''

''ভালোই করেছ ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে। মানুষের মতো বাঁচতে তো পারবে!''

মোক্ষদাদি এসে ওদের খেতে ডাকল।

খাবার টেবলে পরী ও জিষ্ণুর সঙ্গে খেতে বসে না পিপি। ওদের টুকটাক পরিবেশন করে। বলে, কাকিমার সঙ্গে পরে খাবে। একদিন চিতলমাছ রেঁধে খাইয়েছিল ও। হীরুকাকা সেদিন খেয়েছিলেন। এবং খেয়ে খুব প্রশংসা করেছিলেন। জিষ্ণুও। পরী, মাছের ভক্ত আদৌ নয়।

পিপি অল্প ক-দিনেই কেমন আস্তে আস্তে এ-বাড়ির মেয়ে হয়ে উঠেছে। তবে কুণ্ঠা ও হীনম্মন্যতা এখনও পুরোপুরি যায়নি। মোক্ষদাদির ঘরটায় রং ফিরিয়ে মোক্ষদাদিকে একতলার গেস্ট রুমটি দেওয়া হয়েছে। দোতলাতেই থাকবে ওর নিজের যৎসামান্য ফার্নিচার এনে চার-পাঁচ দিন পর থেকে পিপি। কাকিমাকে বলেছিল, মাসে হাজার টাকা করে দেবে। কাকিমা তাতে বলেছেন, ''অত টাকা দেবে কেন? পাঁচশো করে দিলেই যথেষ্ট। সেটাও তোমার আত্মসম্মানেরই জন্যে। কিছু না দিলেই কিন্তু খুশি হতাম আমি। এত লোক খাচ্ছি আমরা, আর একটা পেটের জন্যে কি আর বাড়তি খরচ?''

পিপি নাকি বলছে, "তা কি হয় কাকিমা? সব কিছুই বার বার করে হারিয়ে এতদিনে নতুন ঘর পেলাম। আপনার কাছে থাকতে পেলাম মা, পেলাম নিরাপত্তা...."

আর, এম-কে বলে পিপির মাইনেও সাড়ে চার করে দিয়েছে জিষ্ণু। কোম্পানির আয় এখন খুবই ভালো। আর. এম. মানুষটিও ভালো। সেনগুপ্ত সাহেবই যা...।

আশ্চর্য! কত রকমের মানুষই না থাকে সংসারে। একটি অসহায় মেয়ের সর্বনাশ করতে না পেরে কী নিপুণভাবে তার চরিত্রহনন করেছিলেন। চরিতখেকো কোম্পানি লিমিটেড বলে একটি কোম্পানি খুললে পারেন ভদ্রলোক। সুমন্ত্রর মৃত্যুর পর জিষ্ণুর চোখে আর চাইতে পারছেন না সেনগুপ্ত সাহেব। জিষ্ণুও চায়নি তাঁর চোখে। খারাপ লোকদের চোখে যত কম চাওয়া যায় ততই ভালো।

রাতে খাওয়ার পরে সে-রাতে পরী জিষ্ণুর ঘরে এল। দু হাতে জিষ্ণুকে জড়িয়ে ধরে আশ্লেষে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল। তারপর বলল, "গুড নাইট। তুমি আমার প্রথম প্রেমিক জিষ্ণু। চিরদিনই থাকবে। কুরু একটু ট্যাঁ-ফোঁ করলেই তোমার কাছে ফিরে আসব। আমার জায়গা যেন খালি থাকে। মনে রেখো একথা।"

জিষ্ণু ভাবছিল, কুরুকুলে না বনিবনা হলে পাণ্ডবের কাছে ফিরে আসবে এ কেমন আবদার!

পরীকে সত্যি সত্যিই রাঁচি পাঠানো দরকার। পিকলুর স্ত্রী খুসির মতো মিথ্যা মিথ্যা নয়।

খুসিকেও সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে যাতে তার সব সম্পত্তি তার হাতেই তুলে দেওয়া যায় তার জন্যে উকিল সলিসিটর ডাক্তার সকলের সাহায্যে নিয়ে যা করা দরকার তার সব রকম চেষ্টাই শুরু করে দিয়েছে জিষ্ণু। জিষ্ণুর সঙ্গে যদি খুসির যোগাযোগ একটু বেশি থাকত তবে হয়তো পিকলুটা এমন করে নষ্ট হয়ে যেত না। পিকলুর উপর প্রচণ্ড রাগ হয় জিষ্ণুর। আবার ভীষণ দুঃখও হয়। ওর একমাত্র বন্ধু ছিল সে। প্রাণের বন্ধু। এরকম তো ও ছিল না। পিকলুর মতো ভালো, সুরুচিসম্পন্ন, নম্র, ভদ্র মানুষ জিষ্ণু কমই দেখেছে এ জীবনে। অথচ পিকলু।

কোম্পানি ওকে দুটি এয়ারকন্ডিশনার অ্যালট করেছে। এখানে এবাড়িতে তা লাগানো যায় না। লাগালে, পাড়ার সকলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাবে। গানুবাবুদের মতোই হয়ে যাবে ওরা। নাঃ, ওকেও সাউথেই চলে যেতে হবে। যেখানে কেউ কাউকে বেশি প্রশ্ন করে না। বম্বের মতো। যে-পাড়া পুরোপুরি কসমোপলিটান। যেখানে অতীত নিয়ে কারোই কোনো বিড়ম্বনা নেই। সাউথে না গিয়ে উপায় নেই আর। যেতেই হবে।

খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে ভাবছিল জিষ্ণু যে, আগামীকাল একবার বিকেলের দিকে তারিণীবাবুর বাড়ি যাবে। পিপির স্বামী-কন্যার মৃত্যুর পর পিপির ব্যাপারে এতখানিই জড়িয়ে পড়েছিল ও যে, মামণির কথা সত্যিই মনে ছিল না যে কাছে থাকে, কাছাকাছি থাকে; তার দাবিই বোধহয় অগ্রগণ্য হয়। কে জানে? জিষ্ণু বুঝতে পারে না নিজেকে। তাছাড়া পিপিকে তো সে অনেক দিন ধরেই জানে। অনেক বছর। যদিও সে জানা অফিসেরই জানা। একজন ব্যস্ত চটপটে কমপিটেন্ট সেক্রেটারি হিসেবেই। ঘরোয়া পিপিকে তো সে চিনত না। অফিসে যে সর্বক্ষণ তার কাছে থাকে, তাকে আড়াল করে রাখে নানা উপদ্রব থেকে; তার মিটিং, কনফারেন্স, লাইফ ইনশিয়োরেন্স প্রিমিয়াম, ককটেইল বা লাঞ্চ বা ডিনারের সব এনগেজমন্টে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং দায়-দায়িত্বর কথা যে মানুষটির মনে করিয়ে দিয়ে এসেছে এত বছর হল তাকেই বাড়িতে কাকিমার পাশে হালকা প্যাস্টেল রঙা তাঁতের ডুরে শাড়ি পরে ঝিঙে-পোস্ত খেতে দেখে অবাক হয়ে যায় জিষ্ণু। প্রত্যেক নারীর মধ্যেই অনেকগুলি নারী থাকে। সাপের খোলস বদলের মতো তারা খোলস বদলে বদলে নতুন চেহারাতে প্রতিভাত হয়। সাপ বদলায় ঋতুতে। নারী বদলায় প্রহরে। এই তফাত।

পাগলি পরী, জিষ্ণুর জীবন থেকে সরে যাওয়াতে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এখন সিরিয়াসলি ভাবার সময় এসেছে জিষ্ণুর। মাঝে মাঝেই ওর সত্যিই একলা লাগে বড়ো। মনের কাছাকাছি কাউকে চায়। যার সঙ্গে বসে একসঙ্গে গান শুনতে পারে, নানা বিষয়ে আলোচনা করতে পারে, ইচ্ছে করলে যাকে আদরও করতে পারে সমাজ বা বিবেকের ভ্রূকুটি ছাড়া; এমন কেউ।

ওর মনোজগতে সাম্প্রতিক অতীতে অনেকই পরিবর্তন এসেছে। পুষির স্মৃতি যেন আস্তে আস্তে ক্রমশই হালকা হয়ে আসছে। তারই আসনে মামণি এবং পিপি, হয়তো বেশি করেই পিপি এসে বসেছে। চোখের আড়ালে গেলে মনের আড়ালেও চলে যায় মানুষ। এই রূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করেছে জিষ্ণু।

সেদিন দোতলার সিঁড়ি থেকে ও আর পিপি যখন অফিস যাবে বলে তৈরি হয়ে নামছিল, তখন কাকিমা সেদিন হীরুকাকাকে বলছিলেন "ওদের দুটিকে ভারি মানায় কিন্তু। পিপি যেমন সুন্দরী, বুদ্ধিমতীও তেমনই। আমার তো ওকে পুষির চেয়েও বেশি পছন্দ।"

"আঃ সেদিন আমায় যা কাঁকড়া রেঁধে খাওয়ালে না! কী ভালো যে রেঁধেছিল হেম।"

হীরুকাকা বলেছিলেন।

দ্রুত নেমে এসেছিল সিঁড়ি দিয়ে জিষ্ণু। কে জানে, পিপি শুনতে পেল কি না!

আজই শ্রীমন্তদার কাছে শুনেছে শ্রীমন্তদাকে সঙ্গে করে, ফাইভ স্টার হোটেলের হাউস-কীপিং স্টাফের মতো জিষ্ণুর ঘরে এসে গতকাল সব গোছগাছ করে গেছিল নাকি পিপি। ঘুমের ওষুধগুলো নাকি ওই শ্রীমন্তদাকে দিয়ে জোর করে ফেলিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, শ্রীমন্তদা তোমার দাদাবাবু রাগ করলে বোলো যে আমিই ফেলে দিয়েছি। তারপরও যদি আমাকে ডাকেন তবে আমিই যা বলার বলব।

জিষ্ণু ডাকেনি পিপিকে। কিন্তু বুঝতে পারছে যে একটু একটু করে ও জমি খোয়াচ্ছে। মেয়েদের যুদ্ধের কৌশলটা এমনই। তলোয়ার বা বন্দুকের হঠাৎ আঘাতে জেতা তাদের ধর্ম নয়। প্রকৃতি যেমন করে মানুষের কাছ থেকে ধীরে ধীরে তার কিশলয়ের পতাকা উড়িয়ে রুক্ষ শূন্যতার উপরে দখল নেয়, মেয়েরাও তেমন করেই নেয় পুরুষের উপরে। প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি করে প্রতিভাত হন তো নারীতেই। সুমন্ত্রর মৃত্যুর পর থেকেই কী যেন একটা ঘটছে জিষ্ণুর মধ্যে। লিউকোমিয়ার মতো কোনো অসুখ। ক্রমশই ও ভীষণ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অথচ জ্বর নেই, পেটে ব্যথা নেই; মাথাধরা নেই। ভালো লাগছে না ওর। ও বড়ো ভয় পাচ্ছে। এ দারুণ এক আনন্দমিশ্রিত ভয়।

পিকলু মাঝে একদিন অফিসে ফোন করেছিল। জিষ্ণু মানা করে দিয়েছে পিপিকে কোনো নন-বিজনেস বা পার্সোনাল কল দিতে। অপারেটরকে বলে দিয়েছে ডায়রেক্টলি যেন সব কল জিষ্ণুকেই দেয়। কিছুদিন অসুবিধা হলে, হবে। মানা করেছে কেবল পিকলুরই ভয়ে। পিকলু আবার পিপিকে কী না কী ভয় দেখাবে, কে জানে!

পিকলু বলল, "কী রে জিষ্ণু? আছিস কেমন?"

"ভালো। তুই?"

"আমি যেমন থাকার তেমনই আছি। খুসি কেমন আছে?"

"কে?"

"খুসি!"

"ইয়ার্কি করছিস?"

"ইয়ার্কি কেন মারব?"

"তোর কথার মানে বুঝছি না!"

"রাঁচিতে তাকে পাগল সাজিয়ে বন্ধ করে রেখেছিস তার সম্পত্তি হাতাবি বলে? তুই কোথায় নেমে গেছিস পিকলু? ছিঃ ছিঃ চিন্তা করতে পারিস?"

"ও। ওই মাগিটা বুঝি তোকে বানিয়ে বানিয়ে এই সব বলেছে? কালনাগিনি ঘরে তুলেছিস তুই। একদিন বুঝবি এখনই বন্ধুর কথা না শুনলে। কলকাতা শহরে এমন লোক নেই যার সঙ্গে ও শোয়নি। কতটুকু চিনিস তুই ওকে?"

"বন্ধুই বটে। কী ভাষার ছিরি! ছিঃ! ছিঃ!"

একদিন যে এই লোকটা ওর বন্ধু ছিল একথা মনে করেও জিষ্ণুর ঘেন্না হয় আজকাল।

"আমার টাকাটা? কী করবি?"

"টাকা তোকে দেব না তো বলেছি। কোনো টাকাই দেব না।"

"শোন, পাঁচ হাজার নয়। তোর কাছে আমি পঞ্চাশ হাজার চাই। নইলে তোর বাড়ির সব কেচ্ছা আমি কলকাতা শহরময় ময়লার গাড়ি করে ছড়িয়ে বেড়াব। তুই কত বড়ো রেসপেক্টবল হয়েছিস তখন বোঝা যাবে।"

"আমার কোনো গোপন কথা নেই। ব্ল্যাকমেইল করে সুবিধে হবে না। বরং জেলে যাার জন্যে তুই তৈরি হ।'

"তৈরি হয়েই আছি। তোর জ্ঞান না দিলেও চলবে।"

"দ্যাখ পিকলু, খারাপ মানুষ পৃথিবীতে চিরদিনই ছিল এবং থাকবে। কিন্তু তুই কী করে এমন হয়ে গেলি? নষ্ট হয়ে গেলি? তুইতো ছিলি না এমন!"

"ভালোই বলেছিস। হাঃ। তুইও যেমন নষ্ট হয়ে গেলি জিষ্ণু। নষ্ট হওয়া নানা রকম হয় তা বুঝি জানিস না?"

"উচ্চাশা! এটাই কারণ বলছিস। তাছাড়া, অত হাঃ হাঃ করছিস কেন? যাত্রা-টাত্রা করিস নাকি আজকাল?"

"সকলেই যাত্রা করে। তুইও করিস। তবে স্টেজে করিস না, এই-ই যা। 'কারণ' না হওয়ার কী আছে? আমার কি ইচ্ছে করতে পারে না তোর মতো এয়ার-কন্ডিশানড মারুতিতে ওয়েল ড্রেসড বিজনেস স্যুট পরে এসে এয়ার-কন্ডিশানড অফিসে বসে কাজ করি? বাড়িতে নিজের কাজিন-এর সঙ্গে শুই। অফিসে সেক্রেটারির সঙ্গে। তিন-চার মাসে একবার করে ফরেন যাই? একদিনের কাজ সাতদিনের ছুটি। বড়ো বড়ো কথা বলি। বন্ধুরা টাকা চাইলে তাদের জ্ঞান দিয়ে ফিরিয়ে দিই। ইচ্ছা করে কি না? বল। এটা কি আমার উচ্চাশা নয়? এটাই তো হাইট অফ উচ্চাশা। তুই তো পড়াশুনোতে আমার চেয়েও খারাপ ছিলি। নেহাত ইংরিজিটা একটু ফরফর করে বলতিস। ইংরিজি বলতে পারলেই যদি মানুষ শিক্ষিত হত তবে তো পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথের ফ্রেঞ্চ-ক্যাপ আর টোব্যাকো বিক্রেতারাও সকলেই শিক্ষিত। আমার টাকা চাই জিষ্ণু। টাকা থাকলে এই সমাজে, এই শহরে, এই দেশে লোকের মুখে থুথু দিয়ে, লাথি মেরে আরামে বেঁচে থাকা যায়। যেমন করেই হোক, আমার টাকা চাই-ই। বাই হুক আর বাই ক্রুক। টাকার চেয়ে বড়ো সুখ আর নেই।"

"তুই বড়ো লম্বা লম্বা সেন্টেন্স বলিস আজকাল। অসহ্য।"

"হাঃ।"

আবারও যাত্রার নায়কের মতো হাসল পিকলু।

অসহ্য। মনে মনে বলল জিষ্ণু।

পাশ ফিরে শুল জিষ্ণু।

পিপি সবকটি ঘুমের ওষুধ ফেলে দিয়ে ঠিক করেনি। হয়তো সবগুলো ফেলেওনি। বলেছিল, দিদি নিজের কাছে বোধহয় রেখে দিয়েছে কিছু।

সত্যিই আজ ঘুম আসছে না। রাত একটা বেজে গেল। পিকলুর কথা মনে হতেই। আরও কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শেষে বিছানা ছেড়ে উঠল ও। কাকিমার ঘরে গিয়ে টোকা দিল।

"কে?"

"আমি জিষ্ণু।"

"কী হয়েছে রে?"

"কাকিমা, পিপিকে বলো না একটা ট্রাপেক্স দিতে। সব ওষুধ নাকি ও নিয়ে রেখেছে। বলেছে, ঘুমের ওষুধ রোজ খাওয়া ভালো নয়। ঘুম আমার কিছুতেই আসছে না।"

"কি ওষুধ বললি?"

"ট্রাপেক্স টু।"

জিষ্ণুর গলা শুনে পরীও দরজা খুলে বেরোল। দাঁড়িয়ে থাকল নিজের দরজারই সামনে জিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে।

পিপিও ততক্ষণে দরজার কাছেই কিন্তু কাকিমার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘর থেকে বেরোয়নি জিষ্ণুর সামনে। রাতে কাকিমা পিপিকে সঙ্গে করে নিয়ে শুচ্ছিলেন কদিন হল। পরীর মধ্যে যা পাননি তা হয়তো পিপির মধ্যে পেয়ে কাকিমা এমন করছেন। কে যে কার মধ্যে কী পায় তা কি অন্যে বলতে পারে?

পরী বলল, "ট্রাপেক্স ছাড়াও অন্য নানারকম ঘুমের ওষুধ তো হয়।"

"আছে তোমার কাছে?"

দোনামোনা করে বলল, জিষ্ণু।

"আছে, ঘরে যাও। আমি যাচ্ছি। গিয়ে খাইয়ে আসছি।"

জিষ্ণু বুঝল যে, কথাটা দ্ব্যর্থক। এবং কাকিমার সামনে পরী এরকম একটি দ্ব্যর্থক কথা উচ্চারণ করবে তা ভাবতেও পারেনি।

পিপি অপরাধীর গলায় বলল, "ওষুধগুলো আমি সত্যিই ফেলে দিয়েছি। তবে বায়োকেমিক ওষুধ দিচ্ছি আমি। আমার কাছে আছে।"

বলেই, ঘরের ভেতরে গিয়ে ক্যালি-ফস সিক্স এক্স-এর একটি শিশি বের করে আনল ওর বালিশের তলা থেকে। বলল, "একটু টেপিড-ওয়াটারে গোটা আষ্টেক বড়ি ফেলে গুলিয়ে খেয়ে নিন। এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বেন। কোনো খারাপ এফেক্টও নেই।"

"টেপিড-ওয়াটার এত রাতে কোথায় পাব?"

"ওঃ। যা গরম, এমনি জলেই হবে। প্লেইন ওয়াটারে আমিই গুলিয়ে দিচ্ছি। তাতেই কাজ হবে।"

পিপি ডাইনিং স্পেসে এল কিন্তু শুধু নাইটি পরে আছে বলে আলো জ্বালাল না। কিন্তু কাকিমার ঘরের খেলা দরজা দিয়ে বেড়লাইটের আলো এসে পড়েছিল সেখানে। বোতল থেকে কাপে জল ঢেলে, ক্যালি-ফস মিশিয়ে একটি চামচ দিয়ে নেড়ে তারপর জিষ্ণুকে দিল।

বলল, "তিতিকে যখন কনসিভ করি তখন পারুলদি বলেছিলেন আমাকে এ ওষুধের কথা। খুব ভালো ওষুধ।"

তিতির কথা মনে পড়তেই ওর নাম উচ্চারণ করতেই পিপি গম্ভীর হয়ে গেল।

পিপি ওর কাছে আসতেই আশ্চর্য হয়ে গেল জিষ্ণু। একেবারেই বোঝা যায় না অন্য সময়ে। কী চমৎকার দুটি জলপিপির মতো বুক পিপির। পুষি বা পরী কারো বুকই পিপির বুকের মতো সুন্দর নয়। পিপির নাইটির নীল স্বপ্নঘেরা বুক দেখে জিষ্ণুর বুকের মধ্যেটা ধক করে উঠল।

পিপিও বুঝতে পেরেছিল জিষ্ণুর চোখের কথা। তাড়াতাড়ি খালি কাপটি নিয়ে চলে গেল। তারপর কাপটি ডাইনিং টেবলে রেখে ঘরে গিয়ে দরজা দিল। কাকিমাও সম্ভবত মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাঁর

র থেকে আসা-আলোতে পিপিকে দেখেছিলেন। পিপি বুঝতে পেরেছে অবশ্যই। মেয়েদের যে নকগুলো চোখ।

পরদিন ঘুম থেকে উঠল বেশ দেরি করে। সারা সকালটাই আলসেমি করে কাটাল। পরী কাতায় থাকলে হীরুকাকা বেশি আসেন না। কেন আসেন না কে জানে!

এ বাড়ির সকলে খাওয়াদাওয়াটা একসঙ্গেই করে। চিরদিন। কাকিমার শিক্ষা। এবং টেবলেই। -জায়গাতে খাওয়া কাকিমার বড়োই অপছন্দ। পরী ব্রেকফাস্টের পরই বেরিয়ে গেল। বলল, নকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। নানা রকম কাজও আছে। অয়াইন্ডিং-আপ প্রসেস চলছে এখন । কলকাতার পাট গুটিয়ে আনছে ও।

অফিস থেকেও গাড়ি এসেছিল পরীর।

পিপি একবার এসেছিল জিষ্ণুর ঘরে। একটি সাদা খোলের মেরুন রঙা পাড়ের শাড়ি পরে। টো হাতার ব্লাউজ। তাও মেরুন-রঙা। এর আগে জিষ্ণুর ঘরে কখনওই আসেনি ও।

বলল, "ঘুম কি হয়েছিল? রাতে?"

"হ্যাঁ। থ্যাংকু উ্য। তবে ওষুধগুলো সব না ফেললেও পারতে।"

ও বলল, "বড়ো ভয় আমার ঘুমের ওষুধকে। আপনি রোজ বরং ক্যালি-ফসই খাবেন। আমি ন দেব, ব্যাড-এফেক্ট নেই।"

ব্রেকফাস্ট সেরে এসে বারান্দায় বসেছিল জিষ্ণু। গানুবাবুদের বাড়ি ভাঙা দেখছিল। এত ধুলো ড়ছে যে বারান্দায় বসা তো যাচ্ছেই না ইদানীং। বারান্দার এবং ঘরের সব দরজা জানালা পর্যন্ত ৷ করে রাখতে হচ্ছে ইদানীং।

পিপিও কিছুক্ষণ সেদিকে উদাস চোখে চেয়ে রইল।

জিষ্ণু বলল, "বসবে না?"

"না। কাজ আছে। মাসিমাকে সাহায্য করতে হয়ে রান্নাতে।"

"কর্তব্য?"

"না। আনন্দ। সব কর্তব্যই তেতো নয়।"

"তা ঠিক।"

তারপর চলে যাবার আগে হেসে বলল, "জানেন? স্লিপিং ট্যাবলেট খাওয়ার অনেক রকম ড-এফেক্টস আছে। তার মধ্যে একটা আমার সবচেয়ে বেশি অপছন্দ।"

"কী সেটা?"

"স্বপ্ন দেখা যায় না। স্বপ্নকে আটকে দেয় ঘুমের ওষুধ।"

"তাই? এটা জানতাম না তো।"

"ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবেন। স্বপ্নও না দেখতে পেলে মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে?"

জিষ্ণু নীরবে একবার পিপির মুখে চাইল। ভাবল, তা ঠিক। সকালবেলার আলোয় আলোকিত রান্দায় ওর সবে-চান-করে-ওঠা আমলা তেলের গন্ধমাখা পিঠময় ভেজা চুল-ছড়ানো স্নিগ্ধ হারা শরতের চিকন দিঘির মতো টলটল করছিল।

পিপি বলল, "আসি।"

নীরবে মাথা নোয়াল জিষ্ণু। ওকে বসার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না। বসতে বলার সময় াসেনি এখনও। চলে-যাওয়া পিপির দিকে পেছন থেকে চেয়ে জিষ্ণু ভাবছিল।

পিপি চলে যেতে যেতে তার নিতম্বে এবং তার ঘাড়ের কাছে কাছে জিষ্ণুর চোখের পরশ নুভব করেছিল। ওর অগণ্য অদৃশ্য অনুভূতি বোধের একটি দিয়ে। পিপি ভাবছিল, পুরুষরা ালোই হোক কী মন্দ, অর্থবান কী দরিদ্র। সাধু কী লম্পট; কিছু কিছু ব্যাপারে তারা সবাই এক।

এটা যেমন দুঃখের; তেমনই সুখের।

লাঞ্চের সময় পরী এসেছিল। কাকিমার অনুরোধে। লাঞ্চ খেয়েই বেরিয়ে যাবে বলে।

দুপুরটাতেও খাওয়ার-দাওয়ার পর খুব ঘুমোল জিষ্ণু।

আজ কেন এত ঘুম পাচ্ছে কে জানে! মেঘলা আবহাওয়া, গানুবাবুদের বাড়ি ভাঙার ফ্রাস্ট্রেশান, এবং কোনো বিশেষ কারণহীন গভীর এক শান্তি। এই শান্তি বেশ কিছুদিন ধরেই অনুভব করছে ও নিজের বুকের মধ্যে। পিপি এখানে আসার পর থেকেই।

দারুণ সরষে-মুরগি রেঁধেছিল পিপি। কাকিমা রেঁধেছিলেন রুই-এর মুড়িঘণ্ট। মোক্ষদাদি ইলিশ মাছের টক। পরী চলে যাবে বলে আয়োজন অথচ সে তো মাছ দেখলেই থুঃ থুঃ করে। বলে, রাবিশ! প্রায় সব মাছই ওয়াক-থুঃ করে শুধু চিকেনটা দিয়ে একটু ভাত খেয়ে উঠে গেল।

পিপিকে বলে গেল, "উ্য রিয়্যালি কুক ওয়েল পিপি। বাই দ্যা ওয়ে, হোয়াট আর উ্য কুকিং"

পিপি একটু অপ্রতিভ হল কথাটাতে! কাকিমা বিরক্ত। জিষ্ণু আহত। কিন্তু পরীর নিজের অ্যাটিট্যুড "ক্যুডনট কেয়ারলেস।"

পরীর এ কথাটাও দ্ব্যর্থকই শুধু নয়, কথাটাতে অপমানও ছিল।

ঘুম থেকে উঠে আয়েশ করে চা খেয়ে কিছুটা হেঁটেই এগোল জিষ্ণু। ভেবেছিল, তারিণীবাবুর বাড়ি পর্যন্ত পুরোটা না হেঁটে, কিছুটা গিয়ে; তারপর ট্যাক্সি ধরবে। আবার কী মনে করে ঠিক করল, পুরোটাই হেঁটে যাবে বাড়ি থেকে। আজকাল হাঁটা বিশেষ হয় না। বেরোবার আগেই পিপিকে বাইরে যাবার পোশাকে দেখেছিল এক ঝলক। শুধিয়েছিল, "কোথায় বেরুবে?"

"হ্যাঁ। কাকিমার সঙ্গে কালীবাড়ি যাব আমি।"

পিপি বলেছিল।

"ও।"

পিপি বাড়িতে একরকম সাজে, একরকম কথা বলে, একরকম হাঁটে, একরকম করে তাকায়, আর ওই যখন অফিসে থাকে ওর হাইহিল জুতো পরে হাঁটা-চলা, কথা-বলা তাকানো সবই আমূল বদলে যায়। চেনাই যায় না সেক্রেটারি পিপিকে বাড়ির পিপি বলে আদৌ। বরং অবাক লাগে জিষ্ণুর। পরীকে দেখে, পিপিকে দেখে বোঝে যে একজন মেয়ের মধ্যে একাধিক মেয়ে থাকে। পুষিকে দেখেও বুঝত।

তারিণীবাবুর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে জিষ্ণু দেখল, মোড়ের কাছে একটি বড়ো জটলা। প্রথমে ভাবল, আজ রবিবার, কোনো রাজনৈতিক দলের মিটিং-টিটিং হবে হয়তো। কলকাতার রাজনীতি মানেই তো গলাবাজি আর বক্তৃতা। কিন্তু যতই এগোতে লাগল ততই বুঝতে পারল যে, কোনো রাজনৈতিক দলের রোদ-দেওয়া কাসুন্দির হাঁড়ির উচ্ছ্বাস নয়, ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা নয়, সত্যিই কোনো কারণে জনতা অত্যন্ত উত্তেজিত। এ বক্তৃতাবাজি শোনার জন্যে জমায়েত হওয়া জনতা নয়। বোমাবাজির জন্যে তৈরি হচ্ছে এরা।

ঠিক সেই সময়েই একটি পুলিশের গাড়িও এসে দাঁড়াল সেখানে। উত্তেজিত জনতা পুলিশের গাড়ির গায়ে চড়-থাপ্পড় মারতে লাগল জোরে জোরে। গাড়ি থেকে একজন অফিসার নেমে জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার গায়েও দু-চার ধাক্কা দিল জনতা।

পা চালিয়ে এগিয়ে গিয়ে একেবারেই স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে গেল জিষ্ণু। ফুটপাথের ঠিক পাশেই তারিণীবাবু পথের উপরে পড়ে আছেন হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে। তাঁর মাথাটা পথের সঙ্গে থেঁতলে এক হয়ে গেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসে এক জান্তব প্রতিবাদের মতো চেয়ে আছে এই শহরের সর্বংসহ মানুষদের দিকে। আর তাঁর এক-দেড় গজ দূরেই তাঁর প্রিয় কুকুর ভুলো। ভুলোর কালো গায়ের ঘন চুলগুলি লাল রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।

"মিনিবাস?"

জিষ্ণু দাঁত চেপে শুধোল "ইসস" "ইসস" করতে-থাকা পাশে দাঁড়ান ভদ্রলোককে।

"না। প্রাইভেট বাস। ড্রাইভার বাস নিয়ে পালিয়ে গেছিল। তারপর কিছুদূর গিয়েই বাস থেকে নেমে ড্রাইভার কনডাক্টর পথের ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেছে।"

"আপনারা কী করছিলেন?"

উত্তেজিত, কিন্তু পরাস্ত স্বরে জিষ্ণু বলল।

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি কি ওই বাসে ছিলাম না কি?"

ভদ্রলোক আর কী বললেন, গোলমালে শোনা গেল না।

"দেড়শোজন যাত্রীর একজনও তাদের ধরবার কথা ভাবেননি।"

"জনতা বাসটাতে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছিল।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললেন।

"ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি এসে আগুন নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে।"

অন্যজন বললেন।

"পুলিশের গাড়ি ডেড-বডি তুলে নিয়ে এখন মর্গে যাবে।"

আরেকজন বললেন।

জিষ্ণু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একজন বললেন, "বারাসতের বাস।"

অন্যজন বললেন, "নম্বরটা লিখে রেখেছি। এই নম্বর। পুলিশকেও দিয়েছি।"

জিষ্ণু নাম্বারটা টুকে নিল পকেটের ছোটো ডায়ারিতে। কিন্তু ও জানে যে, কিছুই হবে না। বেচারী সার্জেন্ট কী করবেন? দেড়শো জন যাত্রীর মধ্যে কারোরই যদি বিবেক বলে কিছু না থেকে থাকে, তাঁদের একজনও যদি বাসটি সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে ড্রাইভারকে পুলিশের হাতে দেবার কথা না ভেবে থাকেন, তবে এমন করে রোজ রোজ মানুষ মরাই ভালো। তারিণীবাবু, পুষি কেউই ওঁদের কেউ নন। কিন্তু একদিন ওঁদের ভীষণ কাছের কেউও এমনি করেই মারা যাবেন। সেদিন হয়তো ওঁরা বুঝবেন যে আমরা সকলেই সকলের। অন্যের বিপদ অন্যের আনন্দও যে ওঁদেরও বিপদ ওঁদেরই আনন্দ। যতদিন একথা সকলে বুঝছেন ততদিন এমনি করেই রাজনৈতিক নেতা, কর্পোরেশন, পাড়ার মস্তান, পিকলুর মতো চোর গুন্ডা বদমাশ এবং পুলিশও এমনি রামরাজত্ব চালিয়েই যাবে। নিজেদের বাঁচালে তবেই ওঁরা নিজেরা বাঁচবেন। এবার স্বপ্নে নয়, বাস্তবেই মারতে হবে ড্রাইভারকে। ভাবল জিষ্ণু। আইন যে দেশে তামাশা আর যে তামাশা শুধু বড়োলোকেরাই পয়সা খরচ করে দেখতে পারে, সেখানে আইন নিজের হাতে না তুলে নিয়ে কোনো উপায়ই নেই। এ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নয়। বাঁচার এখন এই একমাত্র পথ। টেররিজম। টেররিজম ইজ দ্যা ওনলি ওয়ে আউট। কবিতা লেখার দিন আর নেই।

মামণির কাছে কি যাবে একবার? ভাবল জিষ্ণু। কী বলবে গিয়ে। তাকে? কী সান্ত্বনা দেবে? মামণি তার কে? হয়তো হতে পারত। এখন মামণির চেয়েও আরও অসহায় পিপি মামণির জায়গা নিয়েছে। তবে যাবে নিশ্চয়ই। মামণির বিয়ের দায় অনবধানে এখন জিষ্ণুর উপরেই বর্তে গেল। পরে যাবে। কালকে শ্মশানেও যাবে। দুর্ঘটনায় বা অপঘাতে মৃত্যুর ভয়াবহতার চেয়েও লাশকাটা ঘরে যাওয়া আরও ভয়ময় অপঘাত।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে ড্রাইভারকে বলল, "ভিক্টোরিয়া।"

প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে যখন ট্যাক্সিটা এসেছে তখনই হঠাৎ জিষ্ণু লক্ষ্য করল যে, তার ট্যাক্সির ঠিক পেছনে পেছনে অন্য একটা ট্যাক্সি। সেটা আসছিল বেশ কিছুক্ষণ ধরেই। আগে দেখতে পায়নি ও। এখন দেখল, সামনের সিটে পিকলু বসে আছে।

কখন এল ওই ট্যাক্সিটা? তারিণীবাবুর বাড়ির মোড়ের থেকেই কি ওরা পিছু নিয়েছিল? নাকি ওদের গলি থেকেই কেউ ফলো করছিল ওকে।

জিষ্ণু একবার ভাবল, ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলে যে বাড়ি ফিরে যেতে। তারপরই ঠিক করল যে, না। অন্যায়কারীর শরীরে বল থাকতে পারে, বুকে তার বল থাকে না। পিকলু কী করতে চায়, দেখবে ও।

ভিক্টোরিয়ার পেছনের গেটে নেমে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল জিষ্ণু। ও ট্যাক্সি থেকে নামতেই পেছনের ট্যাক্সি থেকে পিকলু এবং আরো দুজন লোক নামল একজন লুঙি-পরা। অন্যজন পাজামা। দেখে মনে হল, বিহারী মুসলমান।

পিকলু হাত তুলে জিষ্ণুকে বলল, হাই! যেন মস্ত সাহেব'

কী রে! ময়ূরপুচ্ছপরা কাক।

মনে মনে বলল জিষ্ণু।

মুখে বলল, "কী ব্যাপার?"

"বেড়াতে এসেছিস তো? আমিও। চল, ভিতরে যাই।"

তখনও বেলা ছিল। দিনের আলোতে অনেক সাহস থাকে। সৎ সাহস তো নিশ্চয়ই।

জিষ্ণু বলল, "চল। তোর সঙ্গে এরা কারা?"

"রমজান আর জাহাঙ্গির। আমার সাকরেদ।"

"রেস-এর মাঠের?"

"রেস-এরও বটে, ডিমলিশনেরও বটে। আজ এরা ডিমলিশনের শাগরেদ।"

রমজান-এর চুল ছোটো করে ছাঁটা। বাঁধানো দাঁত। কাকের মতো কালো গায়ের রং। গায়ে নীল টেরিলিনের শার্ট। দেখলেই মনে হয়, স্মাগলার। আর জাহাঙ্গিরকে দেখতে ঠিক নিউ মার্কেটের মুসলমান ফলওয়ালাদের মতো। এরা দুজনে কি পাকিস্তানের চর? ইদানীং অনেক মানুষকে দেখে, যাদের সঙ্গে ভারতের ভালোমন্দর কোনো যোগাযোগ নেই। এদের সংখ্যা রোজই বেড়ে যাচ্ছে। আতঙ্কিত বোধ করে জিষ্ণু।

ওরা হাঁটতে-হাঁটতে যে গাছতলায় জিষ্ণু পিকলুকে শুইয়ে টাইয়ের ফাঁস লাগিয়েছিল সেই গাছটার কাছেই এল।

পিকলু বলল, "আয় বোস।'

ওর কথায় সম্মোহন ছিল।

"তোর সঙ্গে কথা আছে।"

জিষ্ণু বলল।

এই সময়ে জিষ্ণু একবার ভাবল গলা ছেড়ে লোক ডাকে। তারপরই ভাবল, দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভয়ে নয়, এক আশ্চর্য একরোখা জেদ ওর পা দুটিকে ও কণ্ঠকে অনড় নিঃশব্দ করে দিল। ও মনে মনে বলল, পিকলুর মতো একটা বদমাশের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে ও? না। পালাতে শেখেনি জিষ্ণু।

জিষ্ণু বলল, "তুই এখনও নিজেকে বদলাতে পারতিস। তুই কী করে এমন কী করে হয়ে গেলি রে পিকলু?"

"তুইও যেভাবে।"

পিকলু বলল, মুখে ক্রূর হাসি নিয়ে।

আমি বদলাইনি। কিছু পরিবর্তন হয়েছে আমার পরিবেশে অবস্থায়, এই পর্যন্ত।"

জিষ্ণু বলল।

"আমারও তো তাই-ই।'

বলেই, বলল, "চিনেবাদম খাবি জিষ্ণু? সেই কলেজের দিনের মতো?"

"নাঃ।"

"তোর মনে আছে? 'লা দোলসে ভিতার' সেই কথাটা। টু ডাই উইথ আ ব্যাঙ্গ অ্যান্ড নট উইথ আ হুইস্পার? তুই খুব পছন্দ করতিস কথাটা।"

"এখনও করি।"

"করিস? ফাইন।"

পিকলু ওর সামনে বসল। লোক দুটো দুপাশে। বেলা দ্রুত পড়ে আসছিল। ছোটো ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। তাদের গলার সজীব সুন্দর পাখির মতো স্বর ভেসে আসছিল জিষ্ণুর কানে। পিপির মেয়ে তিতির বয়সি ছেলেমেয়ে সব। তাদের মা-বাবারা কি জানেন কলকাতা এক ভয়ংকর জায়গা হয়ে গেছে? এমনভাবে বাচ্চাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়? খুন হয়ে গেলে, চাপা পড়ে গেলে, যারা চাপা দেয় বা যার খুন করে সেইসব ড্রাইভার এবং খুনিদের কারোরই শাস্তি হয় না এখানে? যেখানে মানুষ পথে মরে পড়ে থাকে আর তার পাশ দিয়ে পাইলট-কারের পিলে-চমকানো আওয়াজ ছাড়াতে ছড়াতে জনদরদি মিনিস্টারের লাল আলো-জ্বালানো সাত লাখ টাকা দামের গাড়ি হুসস করে বেরিয়ে যায়।

অন্ধকার হয়ে গেল। পিকলু ওর ট্রাউজারের পকেট থেকে কী একটা জিনিস বের করল।

বলল, "পারিস চিনতে?"

"কী?"

"তোর টাইটা। আমাকে দিয়েছিলি না?"

"দিয়েছিলাম।"

জিষ্ণু বলল।

বলেই বলল, "এবারে, এই লোকগুলোকে যেতে বল। তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে পিকলু।"

"ওরা যাবে কী করে? ওরা যে ডিমলিশ করতে এসেছে তোকে। ডিমলিশান-এক্সটিংশান ইউনিটের লোক। ওদের আজ অফ-ডে। আজ তো রেস নেই।"

বলেই, হঠাৎ টাইয়ের ফাঁসটা পিকলু জিষ্ণুর গলায় পরিয়ে দিল। রমজান জিষ্ণুর মুখটা চেপে ধরল। সাঁড়াশির মতো হাত। ওরা তিনজনে জিষ্ণুকে তিনদিক দিয়ে এমন করে ঘিরে ছিল এবং স্বাভাবিকভাবে উঁচু স্বরে কথা বলছিল যে দশহাত দূর দিয়ে ইভিনিং-ওয়াক করা কোনো মানুষেরও কোনো সন্দেহ হল না। কেউই তাকাল না ওদের দিকে।

পিকলু ফাঁসটা আস্তে আস্তে শক্ত করতে লাগল জিষ্ণুর গলাতে। তখনও জিষ্ণু দু পা দিয়ে ওর বুকে লাথি মারতে পারত। কিন্তু মারল না।

এই পৃথিবীতে; এই শঠ, তঞ্চক, খুনি, নোংরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মতো কোনো বিশেষ কারণ বা উদ্দীপনা ও সেই মুহূর্তে বোধ করছিল না।

জিষ্ণুর মনে হল হীরুকাকা, কাকিমা, পুষি, পরী, মামণি, পিপি ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছে। দেখছে ভুলোও। আহা! ওরা প্রত্যেকেই জিষ্ণুর উপরে অনেকই মানুষ কমবেশি নির্ভর করেছিল ওর ভালোত্বে। কিন্তু...

হীরুবাবু আর হেমপ্রভা, হেমপ্রভার ঘরের পেছনের বারান্দায় বসেছিলেন।

গানুবাবুদের বাড়ির একদিকের ছাদ ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে-বাড়ি, যে-বাগান তৈরি করতে কত দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, ভালোবাসা, কল্পনা লেগেছিল তা কত সহজে এবং কী কম সময়ে ভেঙে কেটে নষ্ট করে ফেলা হল। শব্দ, ইট, চুন, সুরকি, ধুলো ছিন্নভিন্ন করে দিল স্নিগ্ধ বর্ষা রাতের চাঁদের রাতের শান্তি।

হেম বললেন, "আমার মনটা ভারি খারাপ হয়ে আছে গো। জানো।"

"কেন?"

"পিপি মেয়েটা কালীবাড়িকে গিয়ে আজ দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে এমন কাঁদল যে কী বলব। এতটুকু মেয়ে!"

"কোথায় সে?"

"জানি না, কোথায় বেরুল আবার।"

"ওকে একা বেরুতে দিয়ো না। জানোই তো সব।"

হেমপ্রভা কথা বললেন না কোনো।

ওর মনটা ভালো লাগছিল না বিকেল থেকেই। পটলদের বাড়ির চিলেকোঠা থেকে একটা কালো বেড়াল কাঁদছিল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, তার গায়ে জল ঢেলে তাকে তাড়াতে।

"মেয়েটার কষ্ট চোখে দেখা যায় না গো?"

"কষ্ট কার নেই বলো?" হীরুবাবু বললেন। "কষ্ট দেখা যায় তখনই যখন তা জীবনের উপরে ভেসে ওঠে। কষ্ট, কষ্টই। ভিতরেই তা থাকুক অথবা বাইরেই আসুক। বুকের মধ্যে কষ্ট নেই এমন মানুষ কি একজনও আছে? অন্যের কষ্টকে যে ছুঁতে পেরেছ এই তো ঢের হেম। ক-জন মানুষ তা পারে?"

হেমপ্রভা কথা না বলে কান খাড়া করে কালো বেড়ালটার অলুক্ষণে ডাক শুনতে লাগলেন।

✸

সোপর্দ

১

এক

এখন চারদিকেই রোঁয়া রোঁয়া কাছিমপেঠা পাহাড়ের সারি। কিন্তু একসময় নাকি এ অঞ্চলে এ অত্যন্ত ঘন অরণ্য ছিল। এ রাজ্যের রাজাই এই এক-কামরার বাংলোটি বানিয়ে ছিলেন শিকারের জন্যে। রাজার রাজত্ব চলে যাবার পর আদিবাসীরা চারদিকের এই সমস্ত পাহাড়কে বন-শূন্য করে ফেলেছে।

গাছগাছালি তেমন না থাকলে কী হয়, সন্ধে লাগতে না লাগতেই এই সব ন্যাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চারদিক থেকে হাতির দল নেমে আসে ধান খেতে।

এখন হেমন্ত। খেতে খেতে ধানের রং লালচে হয়ে উঠেছে। বাংলোর পথের সমান্তরালে একটি লাল মাটির পথ চলে গেছে দূরের গাঁয়ে। ঝোপঝাড় ; ক্বচিৎ শাল, সকালের মিষ্টি শীতে চিকন-পাখির ডাকের চমকে এক চিত্রকল্প গড়ে উঠে পরমুহূর্তেই অবহেলায় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

পিচ রাস্তা ধরে বাঁদিকে গেলেই নাকড়া। সেখান থেকে ঝামরার পথ বেরিয়ে গেছে চন্‌সর হয়ে। আর ডানদিকে গেলে হলুদ পাহাড় হয়ে হাতিঝোড়া!

কাল ঠিক সন্ধেবেলা বাস থেকে নেমেছে রাজীব আর মনু। এখানে যে আসবে এবং থাকবে, এসব কিছুই আগে ঠিক করে আসেনি ওরা। প্রতি বছর একবার করে দিন-সাতেকের জন্যে বেরিয়ে পড়ে ছেলেবেলার দু বন্ধুতে। বছরের ঠিক এই সময়টিতেই।

ঝাড়সুগুদাতে এসেছিল পরশু বিকেলে। কাছাকাছি নির্জনে কোনো থাকার জায়গা পায়নি। হোটেলে হয়তো থাকতে পারত, কিন্তু সেসব হোটেলের সামনে কলকাতারই মতো ভিড়-গিসগিস, ডিজেলের ধোঁয়া এবং আওয়াজ। সে কারণে কাল দুপুরে খেয়েদেয়ে রাগ করেই এই অচেনা পথের বাসে উঠে পড়েছিল ওরা দুজন। বাসটা এসে এখানেই থেমে গেল। যে-মোড়ে বাসটা থামল, তার কাছেই ছিল এই ছোট্ট বাংলোটি। এখানে কেউই আসে না মনে হল। খালিই পাওয়া গেল। পুলিশের চেকপোস্ট আছে পিচ রাস্তার উপর। তারই কাছাকাছি, ডানদিকের লালমাটির রাস্তাতে থানা। উলটোদিকে দারোগার কোয়ার্টার, দু-একটি ঘরবাড়ি।

বাংলোটি এক-কামরার। কিন্তু ভালো। তবে খাওয়াদাওয়ার কোনোই বন্দোবস্ত নেই। চেকপোস্টের গায়ে-লাগানো ছোট্ট দোকানটিতে লাল চালের মিষ্টি ভাত, আর তার সঙ্গে নুন, তেল এবং কলাভাজা দিয়ে খাওয়া সেরেছিল ওরা রাতে। ডাল পর্যন্ত ছিল না। তবে দোকানি কথা দিয়েছে, যে আজ দুপুরে ডালের বন্দোবস্ত করবেই।

চারটে লাঠি-বিস্কুট বাংলোর বেসরকারি চৌকিদার, কালো একটা ল্যাংড়া কুকুরকে খেতে দিয়ে, সরকারি চৌকিদার মারফত মনুর জন্যে আবার চা আনতে পাঠিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে দূরে চেয়ে রাজীব বসেছিল বারান্দার এক কোণায় চেয়ার পেতে।

রাজীবের একটা মনোহারী দোকান আছে ঢাকুরিয়াতে। খুব চালু দোকান। ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যপ্রীতি ছিল ওর। লেখাটেখার শখও ছিল। কিন্তু ও অন্য কোনো সাবজেক্টেই বিশেষ ভালো

ছিল না। সাধারণ ভাবে বি এ পাশ করে শুধুমাত্র সাহিত্য ভাঙিয়ে কিছুই করতে না পেরে, পাড়ার এক বন্ধুর বাবাকে বলে তাঁদের গাড়িহীন— গ্যারাজটা ভাড়া নিয়ে, বাবার প্রভিডেন্ড ফান্ডের বেশ কিছু টাকা আর মায়ের দুটি মোটা সোনার বালা বিক্রি করে, ব্যবসা বেশ ভয় ভয়েই শুরু করেছিল। ব্রয়লার চিকেন ডিম, কোল্ড ড্রিংকস এবং আরো নানা জিনিস রাখে ও দোকানে। মাড়োয়ারি কি পঞ্জাবি ফার্মে কেরানিগিরি করে যা পেতে পারত তার চেয়ে বহুগুণ বেশিই রোজগার করে এখন। তবে সারাদিন বড়োই কথা বলতে হয় ; মুখ শুকিয়ে যায়। নানারকম লোকের সঙ্গে, হাসিমুখে নানা অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর কথা। তাই রাজীবের কাছে, কথা না বলাটাই সবচেয়ে বড়ো ছুটি। ও অনেককিছুই ভাবে এই সময়ে। পাড়ার মোড়ের ওনারশিপ মালটিস্টোরিড ফ্ল্যাটের যাদবপুর য়ুনিভার্সিটিতে এম এ পড়া সুন্দরী মেয়েটি, যার নাম শুক্লা—তার কথাই ভাবই ভাবছিল এই সকালে। শুক্লা রাজীবের হবে না কখনও। শুক্লা নিশ্চয়ই টাই-পরা, হাতে ব্রিফকেস ঝোলানো কোনো কোম্পানি-এক্‌জিকিউটিভ বিয়ে করবে।

কোন্ অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দরী শিক্ষিতা, বিদুষী মেয়ে আর মনোহারী, দোকানের দোকানিকে স্বামী করতে চায়! দোকানদার স্বামীর পরিচয় কি একটা পরিচয় ? বাঙালি চিরদিনই চাকরদেরই কদর করেছে, মালিকদের নয়। ব্যবসাদারদের এখনও হেয় করা হয় কলকাতায়।

অথচ রাজীব অনিরুদ্ধদেরও চেনে। অনিরুদ্ধ যাদবপুর থেকে সিভিল এনজিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। চাকরি করবে না পণ করে ঠিকাদারিতে নেমেছিল। তারপর ঘুষ-ঘাসের বহর দেখে ঠিকাদারি ছেড়ে দিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ফুটপাতে মাটন-রেলের স্টল করেছে। মরদেব বাচ্চা! বিয়ে করেছে পুরোনো বন্ধু চুমকিকে। চুমকি একটা কলেজে পড়ায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঁচে থাকলে ওর পিঠ চাপড়াতেন। হয়তো রাজীবেরও।

তবে ব্যবসাতে বড়ো ঝামেলা। আজকাল ছোটো-বড়ো সব ব্যবসাই মহা ঝকমারির। কালকেই রাতে মনু গল্প করছিল ওর মালিকের কথা। গুজরাটি। বিরাট ব্যাবসাদার।

উনি দিল্লি গেছিলেন তদ্বির করতে। কদিন আগে বিদেশে এক কোটি টাকার মাল বিক্রি কবার পর একটা বিশেষ আইটেম ব্যান করে দেওয়ায় খুবই বিপদে পড়েছেন। কনট্রাক্ট হয়ে গেছে, ডেলিভারি হয়নি এখনও। মাল না-দিতে পারলে বিদেশি ক্রেতা ড্যামেজ স্যুট ঠুকে দেবেন। তাই দিল্লিতে মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, মিনিস্টারের খুবই পেয়ারের একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে। মিনিস্টার বলেছিলেন ; সব ঠিক হো যায়গা। দু মাসেও যখন কিছুই ঠিক হল না, তখন একজন জাঁদরেল এম.পি-র কাছে গেছিলেন পারেখসাহেব আবারও মুরুব্বি ধরে, গত সপ্তাহে। গিয়ে হাতজোড় করে বলেছিলেন, দেখুন স্যার ইট ইজ অ্যা ম্যাটার অফ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট। দেশের এক কোটি টাকার ফরেন এক্সচেঞ্জ লস হবে। আইটেমটা ব্যান করেছেন করেছেন ; কিন্তু যে-মালটা অলরেডি বিক্রি করে ফেলেছি, সেটা অন্তত পাঠাতে দিন কৃপা করে।

সেই নেতা তাঁকে অতি হিতার্থীর মতো সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "মিস্টার পারেখ, ডোন্ট টক অফ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইন ডেল্লি। পিপল উইল কনসিডার উ্য টু বি অ্যা ফ্রড। অ্যা টোটাল ফ্রড।"

সেই মহান নেতা বলেছিলেন, তার চেয়ে এক কাজ করুন। কাল দু লাখ টাকা নিয়ে আসুন . আমি পঁচিশ জন এম.পিকে সঙ্গে করে কনসার্নড মিনিস্টারের কাছে যাচ্ছি—দশ মিনিটেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। এখন সব কাজই হয় ইম্পেটাস-এ। পার্সোনাল ইন্টারেস্টে। ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে কোনো কিছুই ঘটে না। বুঝেছেন!

মনু একেবারে চানটান সেরে জামাকাপড় পরে বারান্দায় এল। এসেই রাজীবের দিকে চেয়ে বলল কি রে ? একা বসে হাসছিস সে! বাথরুমে গান গাওয়াটা ব্যক্তি স্বাধীনতারই অভিব্যক্তি

যেমন গানই গাই না কেন! তোর হাসবার কি তাতে ? আমি কি এমনই গাই সে, গান শুনে তোর সব সময় শুধু হাসিই পায়।

রাজীব বলল, তোর গান শুনে নয়, কালকে তুই যা বলছিলি— তোর মালিকের রাজধানীর অভিজ্ঞতার কথা, তাই-ই ভাবছিলাম। কথাটা মনে পড়তেই হাসি পেল।

হাসি পেল ? মনু বলল।

তারপর বলল, আমার হাসি পায় না কারণ আজ দেশে গাইয়ে নন, বাজিয়ে নন, আঁকিয়ে নন, বিদ্বান নন, সাহিত্যিক নন, এই সব লোকগুলোই ভি.আই.পি। স্টেশনের, এয়ারপোর্টের সব ভি-আই-পি লাইঞ্জ শুধুমাত্র এদেরই ব্যবহারের জন্যে। খবরের কাগজেও শুধু এদেরই ছবি, খবর। যে-যখন চেয়ারে, থাকে তখন খুশি রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা! দেশটাকে চেটেপুটে হামলে কামড়ে শেষ করে ছিবড়ে করে দিল, এই নেতার মিলে। কিন্তু কারোরই কিছু বলবার নেই। জনগণের নাম করে জনগণের এমন সর্বনাশ বোধ হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনো ঠগী-ঠ্যাঙাড়েরাও করেনি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো ? একটা লোকও প্রতিবাদ করে না— ? একজনও মাথা তুলে দাঁড়ায় না—সমস্ত জাতটা একটা ক্লীবের জাত হয়ে গেল রে! হানড্রেড-পারসেন্ট ইনাঅ্যানিমেট।

রাজীব আস্তে আস্তে বলল, শোন মনু, তোর মালিকের অভিজ্ঞতা যেন দশ-কান করিস না। বড়ো বড়ো নেতা বলে কথা। পার্লামেন্টারি প্রিভিলেজ কমিটি হয়তো ডেকে নিয়ে গিয়ে জবাবদিহি চাইবে; তারপর জেলে পুরে দেবে।

তাদের নিজেদের আত্মসম্মান বা চক্ষুসম্মান বা চক্ষুলজ্জা কিছুমাত্রও অবশিষ্ট থাকলে হয়তো করবে না। করলে নিজেদের লজ্জা ও অসম্মান শুধু বাড়বেই। তাছাড়া, দিলে দেবে। কি আর করা যাবে ? এদেশে জেল তো নিরপরাধদের বানানো হয়েছে। অত ভাবলে চলে না।

একটু চুপ করে থেকে রাজীব নিজেই পরিবেশটা হালকা করার জন্যে বলল, বেশ তো আছ ! হপ্তায় একটা করে সিনেমা দেখছ, মালতীর সঙ্গে প্রেম করছ, এই বাজারেই উইলস ফিলটার খেয়ে যাচ্ছ,— কেন খামোখা দেশের মামলায় নিজেকে ফাঁসাচ্ছ মানিক ? যে দেশ-এর বাপ-মা নেই; রক্ষরাই ভক্ষক, দিল্লিভর্তি তক্ষক, সেখানে তুমি কে হে হরিদাস ?

তারপরই বলল, কোন অধিকারে তুই আমার শান্তি ভঙ্গ করছিস বল তো ? কলকাতাকে ভুলতে আমরা বেড়াতে এসেছি কি দিল্লিকে সঙ্গে করে ?

মনু লাঠি-বিস্কুট কামড় দিয়ে উদাস গলায় বলল, সরি ঠিকই বলেছিস। আর ওসব কথা না। এ কদিন একেবারে লাফাঙ্গার মতো ঘুরে ফিরে বেড়াব। চল, তুই চান করে নে ; তারপর দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে জায়গাটা এক্সপ্লোর করতে বেরোই। আহা ! রোদটা কী মিষ্টি লাগছে বল তো !

কলকাতায় এখনও পাখা চলছে বাঁই-বাঁই করে নিশ্চয়ই।

—সে আর বলতে!

দুই

মনু সঙ্গে থাকলে ওড়িশার কোথাও ঘুরে বেড়ানো কোনো প্রবলেম নয়। ওর ছেলেবেলা কেটেছে ওড়িশাতেই। কটকের মামাবাড়িতে। পনেরো বছর অব্দি। তারপর কলকাতা এসেছে মামার মৃত্যুর পর। খুব ভালো ওড়িয়া বলে। ওর কথা শুনলে কেউ ধরতেই পারবে না যে, ওড়িয়া ওর মাতৃভাষা নয়।

রাজীব পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেছে তেল মেখে, চান করে। পায়ে কাবলি। কাঁধে ক্যামেরা। মনু জিনস পরেছে, সঙ্গে লাল গেঞ্জি। চেহারাটা মনুর বেশ ভালোই। মালতীকে প্রায় গেঁথেই তুলেছে। মালতী সচ্ছল মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। শুধু সেই জন্যে নয়, ভালো মেয়ে সুন্দরী শিক্ষিতা, সভ্য, মার্জিত-রুচি।

রাবারের চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মনু। দাড়িও কামায়নি। ও কলকাতার বাইরে বেরুলে পাঁচটি নিয়ম রিলিজিয়াসলি ফলো করে।

১। দাড়ি না-কামানো,

২। খবরের কাগজ না-পড়া

৩। রেডিয়ো না-শোনা,

৪। বাড়িতে কোনো ঠিকানা না-রেখে আসা,

৫। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনো ফার্স না-করা।

অবশ্য চতুর্থ নিয়ম এমনিতেই মানতে হয়, কারণ ও নিজেই জানে না কোথায় থাকবে এবং কতদিন থাকবে। পঞ্চম নিয়মও, দায়ে পড়ে।

চেক-পোস্টের পাশের দোকানে বসে ওরা কুচো-নিমকি আর বালুশাই-এর মতো একরকম মিষ্টি দিয়ে চা খেল। ওখানেই শুনল যে, এখানে পাহাড়ের মধ্যে একজন তান্ত্রিক আছেন। চোর-ডাকাতের এলাকাতে, হাতির দল আর হঠাৎ-আসা বাঘ-ভাল্লুককে থোড়াই কেয়ার করে উদোম ন্যাড়া পাহাড়ের কোলে একটি আশ্রম করেছেন। বাবার যে কী জাত তা কেউ জানে না। বাবার সঙ্গে একটি সুন্দরী বিদুষী, যুবতী মেয়েও থাকে। আশ্রমে রাতের বেলা নানারকম ক্রিয়াকাণ্ড হয় নাকি!

মনু বলল, চল যাই। আমার কেসটা তো প্রায় পেকেই এসেছে, এখন তোরও যদি একটা হিল্লে করা যায়।

একটু চুপ করে থেকে বলল, তোর শুক্লাশশীকে তো আমি দেখেছি। তোর দোকানে এসে মাঝে মাঝে কার্নিক মেরে গেলে কী হবে ? ও মেয়ে কোন চাঁদিয়াল ঘুড়ি কাটবে তা ঠিকঠাক করে রেখেছে। তুই যতই কবিতা লিখিস, আমার কাছে শোন, কবিতা টবিতা মেয়েরা একেবারেই বোঝে না। ওদের মতো ম্যাটার অফ-ফ্যাক্ট রসকষহীন জাত ভগবান এ দুনিয়াতে আর দুটি পয়দা করেননি। ওরা কি চায়, তা আমি জানি। গিভ ইট টু দেম গুড, দে উইল স্টিক টু উ্য লাইক বাবলগাম। তোর দ্বারা কিসসু হবে না। নিজের দোকানে একসারসাইজ বুক, কিনতে তো আর পয়সা লাগে না। শুক্লাশশী একঝলক বুক দেখিয়ে যাচ্ছে কখনো সখনো; আর তুই শালা এক্সারসাইজ-বুকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে লাগাতার কবিতা লিখে যাচ্ছিস। এ কবিতা, সে কবিতা নয় দোস্ত।

তুই বড়ো যা-তা কথা বলিস!

রাজীব চটে উঠে বলল।

সবব্যাপারে এই মাত্রা-ছাড়া ইয়ার্কি ভালো লাগে না আমার। তোর রুচিটা আজকাল বিড়িঅলাদের মতো হয়ে গেছে।

খবরদার। ক্লাস তুলে কথা বলবি না। পার্সোনালি আমাকে যা বলার, যা খুশি বলার বলতে পারিস। তোর নামে ডিস্‌ক্রিমিনেশানের অভিযোগ আনব।

তারপর নিজের মনেই বলল, তুই শালা ফেঁসে গেছিস দেখছি। শুক্লাশশীর স সে মি রা-তে। তোর মতো একটা আনপ্র্যাক্‌টিকাল লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা এত বছর যে টিকে রইল কি করে সেটাই একটা মিরাকল।

দোকানদারের নির্দেশমতো পায়ে-চলা-পথে একটা পাহাড়ের মাথায় ওঠার পর ওরা একটা উপত্যকায় নামবে। এমন সময় মনু বলল, ক্যামেরাটা দে তো রাজু, তোর একটা ছবি তুলি। চুলগুলো এলোমেলো, পাঞ্জাবি পায়জামা উড়ছে হাওয়ায়, উদাসী, বিরহী হিন্দি ফিল্মের দিলে চোট-খাওয়া হিরোর মতো দেখাচ্ছে তোকে। দেখি, তোর এই ছবি দিয়েই কাত করতে পারি কিনা শুক্লাশশীকে লাস্ট এফার্ট!

রাজীব প্রতিবাদ করার আগেই মনু ক্যামেরাটা ওর কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ছবি তুলল রাজীবের।

ঠিক এমনি সময় লাল আর কালো ডুরে একটা তাঁতের শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে অতি সুন্দবী একটি মেয়ে ওদের পরিষ্কার বাংলায় বলল, আপনারা কোত্থেকে এসেছেন ? এখানে কী করছেন ?

ওরা দুজনেই চমকে উঠে একই সঙ্গে মেয়েটির দিকে তাকাল।

মেয়েটি যেন মাটি ফুঁড়েই উঠল মনে হল।

এতক্ষণ ওকে দেখতে পায়নি যে কেন, তা ভেবে অবাক হল দুজনেই। মেয়েটির হাতে একটি মাটির কলসি। চান করেছে সবে। এখনও চুল—ভেজা। একরকম তেজী পবিত্রতা চোখে মুখে। রাজীব স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো মেয়েটির দিকে।

মনু কথা বলল, ঘোর কাটিয়ে উঠে।

আপনারা ?

কোথা থেকে এসেছেন ?

কলকাতা থেকে।

কোথায় যাচ্ছিলেন ? এদিকে ?

তান্ত্রিক ? বাবাজির আস্তানার দিকে।

কে বলল ? বাবাজির আস্তানার কথা আপনাদের ?

চেক-পোস্টের দোকানি। আপনার কথাও সে-ই বলল। আপনি নিশ্চয়ই তিনি। তবে, আপনারা যে বাঙালি একথা তো কেউই বলল না।

আমি বাঙালি, বাবাজির জাত নেই কোনো। বাবাজি তান্ত্রিক।

তারপর বলল, চলুন, আমি আশ্রমের দিকেই যাচ্ছি।

যেতে যেতে কথা হল টুকটাক।

মেয়েটি এমনি বেশ ছটফটে। কিন্তু বেশ রাশভারীও।

এই দিকে উপত্যকাতে অনেক গাছপালা এখনও আছে। পিচ রাস্তা থেকে যদিও বোঝা যায় না। শালবনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে মেয়েটি বলল, আপনারা দুজনেই তো ছেলেমানুষ। তন্ত্রসাধনার আপনারা কী বোঝেন ? যাচ্ছেন কেন বাবাজির কাছে ?

মনু বলল, সত্যি বলছি, কিছুই বুঝি না বুঝতে চাইও না। আমরা আসলে আপনাকে দেখতেই এসেছিলাম। তাছাড়া ছেলেমানুষ হলেও, বয়স আপনার চেয়ে বেশিই হবে আমাদের।

মেয়েটি বলল, বয়স কি আর বয়সে হয় ?

তারপরই বলল, দেখতে এসেছিলেন আমাকে ?

বলেই, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, দেখা তো হল। তাহলে আর এগোনো কেন ? ফিরে যান এখন।

মেয়েটির কথার পিঠে মনু বলল, এটুকু দেখাতে কি মন ভরে ? আপনি সত্যিই খুউব সুন্দরী! শিউলি ফুল, কেমন ভুল।

মেয়েটি হাসল।

বলল, সুন্দরী মেয়ে তো আপনাদের কলকাতায় অনেকেই আছে। আপনারা আমার শুধু সুন্দর দিকটাই দেখছেন। অন্য দিকটা দেখেননি আমি ভৈরবী। ভয়ংকরী।

সেকী। আপনি ভৈরবী ? বাবাজি তাহলে আপনার বাবা নন ? মনু অবাক গলায় বলল।

বাবাজি বললেই কি বাবা হতে হবে নাকি ? আশ্চর্য তো!

মনুকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই সে আবার বলল, তন্ত্রসাধনা অনেক গভীর ব্যাপার। আপনাদের মতো অগভীর, অনভিজ্ঞ দুধের দাঁতের ছেলেদের সঙ্গে এ নিয়ে আর আলোচনা করতে

চাই না। আপনারা দয়া করে ফিরে যান। বাবাজি জানতে পারলে বিপদ হতে পারে আপনাদের। উনি দূরে বসেই সব জানতে পারেন। আমিও পারি একটু-আধটু।

মনু জিনস-এর হিপ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরিয়ে ঠাট্টার গলায় বলল, তাহলে ফিরেই যাব বলছেন ?

হ্যাঁ তাই-ই বলছি।

দৃঢ় গলায় মেয়েটি বলল।

রাজীব অবাক হয়ে মেয়েটিকে লক্ষ করছিল! এমন মেয়ে রাজু খুব বেশি দেখেনি। কলকাতার মতো জায়গায় এমন মেয়েরা বোধ হয় থাকে না, থাকলেও অন্যরকম হয়ে যায় দুদিনে। চারদিকের জঙ্গল,পাহাড় উন্মুক্ত প্রকৃতি, পাখি, প্রজাপতি, ফুল সব যেন কেমন এক মুক্তির প্রতিফলন ফেলেছে মেয়েটির মুখে

মনু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক হ্যায়। এখন ফিরেই যাচ্ছি। কিন্তু আমরা আবার আসব। রাত্তিরে। কোন সাধনা করেন আপনি তা দেখতে নিরিবিলিতে।

মেয়েটির চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

বলল, সাবধান করছি আপনাদের।

মনু বলল, চোখ রাঙাবেন না ম্যাডাম। আমরা কিন্ডারগার্টেনের ছাত্র নই। আমরা রাতে এসে আপনার কেসটা আসলে যে কী, তা ইনভেস্টিগেট করব।

মেয়েটি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল মনুর দিকে।

তারপর বলল, তাহলে আসবেন । নেমন্তন্ন রইল আপনাদের।

নেমন্তন্ন নিলাম। বলল মনু।

মেয়েটি চলে গেল।

ওরা ফিরে আসতে লাগল পাহাড় বেয়ে।

রাজীব অনেকক্ষণ পর বলল, তোর মাঝে মাঝে কী হয় বল তো ?

এ রকম ছোটোলোক হয়ে যাস কেন ? কী চাস তুই ? কী পাস এরকম অভদ্রতা করে। অচেনা অজানাদের সঙ্গে ?

মনু দাঁড়িয়ে পড়ে, রাজীবের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমি নিজেই ঠিক জানি না। মালিকের খাতায় কারচুপি করতে করতে—তার ব্যবসা চালানোর গা-গোলানো ফিরিস্তি শুনতে সারা শরীর রি-রি করে। যাদের উপর রাগ, তারা যে অনেক উপরের তলার মানুষ রে রাজু! অনেক দূরেরও মানুষ! তারা যে আমার নাগালের একেবারেই বাইরে। তাই, যাদের হাতের কাছে পাই, যেমন আমার মা, তুই! এই সুন্দরী ভৈরবী মেয়েটা ; তাদের কাছেই বিনা-কারণে অন্যায়ভাবে ফেটে পড়ি। কারণ, জানি যে তারা আমার ক্ষতি করবে না। বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাও তাদের নেই।

রাজীব বলল, তুই এই চাকরিটা ছেড়ে দে।

ইডিয়ট।

বলল, মনু। আমার মালিক বেচারা আমার চেয়ে অনেক ভালো মানুষ। তার অবস্থা দেখেও কান্না পায়। বেচারি পারেখসাহেব। ইটস অ্যা বিগ ভিসাস সার্কল নাউ। অ্যান ইম্মরাল সার্কল। আইদার ড্যু ফিট ইন ইয়োর-সেলফ অ্যাজ অ্যা কম্পোনেন্ট অর ড্যু ফল আউট। দেয়ারস নো চয়েস। কারোই আর কোনো চয়েস অবশিষ্ট নেই। আমারও নেই। এই বাজারে পনেরোশো টাকা মাইনে পাই, হাউসরেন্ট পাই, দুটো বোনাস, ফ্রি-টিফিন। তারপর খাতায় যা কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট তা সব আমিই করি বলে, ক্যাশও পাই বছরে হাজার পাঁচেক টাকা করে। কিন্তু শুনতেই সব। কি হয় ? টাকার দাম কোথায় নেমে গেছে বল। চাকরি ছেড়ে দিলে খাব কী ? বউ-এর পয়সায় বসে খাব ?

রাজীব বলল, তোর মালিকের এত গুণগান করছিস— তা তোর মালিক ট্যাক্স ফাঁকি দেয় কেন ?

মনু হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল, চুপ কর শালা। যদিও মাসে আমার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করিস তুই, কিন্তু কি ট্যাক্স দিস ? তুই তো এক পয়সাও ঠেকাস না। দেওয়া উচিত ; কিন্তু দিস না। কিন্তু আমি দিই। তোরা অনেকেই এক পয়সাও দিস না বলেই যারা দেয় তাদের ঘাড়ে গিলোটিন পড়ে। তোরাও কম ক্রিমিনাল নোস।

আমার মালিক বছরে চুরি-টুরি করেও, গড়ে পাঁচ-সাত লাখ ট্যাক্স দেয়—তার বদলে তোর দিল্লিওয়ালারা কী দেয় তাকে ? আমরাই বা কী দিই ? অসম্মান আর চোর অপবাদ ছাড়া ? আমার মালিকের অবস্থাও আমারই মতো। খ্যাপা কুকুরের মতো যাকে কাছে পায়, তাকেই কামড়াতে যায়! এত টাকা গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে গরিবদের জন্যে কি করল শালারা এত বছর, বল তো ? গরিব তো আরও গরিব হয়েছে। যারা ট্যাক্স দেয় তারাও ট্যাক্স নিয়মিত দিলে হাতে হ্যারিকেন ছাড়া আর কিছু যে থাকে না কারও হাতেই। আমরা সব নপুংসক হয়ে গেছি, বুঝলি। রিয়্যাল নপুংসক। ভোট পাওয়ার জন্যে আর গদিতে থাকার জন্যে মানুষগুলো কী ফেরেববাজিই না করে! পুরো জাতটার আত্মসম্মান, শুভাশুভবোধ, ডিসিপ্লিন, নৈতিক চরিত্র সবই কমপ্লিটলি নষ্ট করে দিল এই নেতাগুলো।

রাজীব চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন গলায় বলল, তোর কোনো ট্র্যাংকুলাইজার খাওয়া উচিত। মানে, সেডেটিভস। তুই দেখছি, একেবারেই মেন্টাল কেস হয়ে যাচ্ছিস।

—আমি ? হ্যাঁ হচ্ছি। অন্যরা যে কেন এখনও হচ্ছে না, তা ভেবেও অবাক লাগে আমার। সব জেনেও, কেন যে হচ্ছে না ? সর্বনাশের আসন পেতে পুরো জাতটা বসে বসে নিজের নিজের স্বার্থপরতার ভাত খুঁটে খাচ্ছে। এমন ভাতে পেচ্ছাপ করে দিতে ইচ্ছে করে আমার। দুস শালা ! যত্ত সব ....।

একটা অশ্লীল-গাল দিল মনু।

তিন

ওরা যখন বাংলোর গেটে পৌঁছোল, তখন দেখল তিন-চারজন পুলিশ অফিসার বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। দুপুর বারোটা হবে তখন। আর কিছু রাইফেলধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। একটা পুলিশের জিপ আর ভ্যানও দেখল।

রাজীব চাপা গলায় বলল, দেখলি তো। ভৈরবীর অভিশাপ ! এখন কী হবে কে জানে ? কে জানে ভৈরব অথবা ভৈরবীই হয়তো টেলিপ্যাথি করে পুলিশকে খবর দিয়েছে!

মনু বলল, বাজে কথা এখন রাখ।

গলা নামিয়ে বলল, সকালে বাথরুমের পেছনের পুকুরে একটা উনিশ কুড়ি বছরের আদিবাসী মেয়ে ন্যাংটো হয়ে চান করছিল তার ছবি তুলছিলাম যখন, তোর ক্যামেরা দিয়ে তখন চৌকিদারটা দেখেছিল। ওই বোধহয় গিয়ে খবর দিয়েছে। অ্যারেস্ট করতে এসেছে আমাদের।

তারপর নিজেই বলল, কী অবস্থা দ্যাখ। কত লোক খুন হয়ে যাচ্ছে, কত মেয়ে রেপ্‌ড হয়ে হাপিস হয়ে যাচ্ছে সে-সবের কোনোই কিনারা হচ্ছে না, আর দূর থেকে একটা মেয়ের ফোটো তোলার জন্যে ফোর্সের বহর দ্যাখ।

রাজীব বলল, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এই রকম ছোট্ট জায়গায় এত পুলিশ ! তোকে ধরতে নিশ্চয়ই আসেনি। অন্য কোনো ব্যাপারট্যাপার হবে। ডাকাতি টাকাতি হয়েছে হয়তো। নয়তো নকশাল ছেলেরা কিছু করেছে বোধ হয়। জায়গাটা তো লুকিয়ে থাকার পক্ষে আইডিয়াল।

মনু সংক্ষিপ্ত চাপা গলায় বলল, আর কথা নয়।

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে বারান্দার কাছে পৌঁছোল।

একজন অফিসার বললেন, রিজার্ভেশান আছে আপনাদের ?

না। নেই।

মনু বলল, সপ্রতিভ ওড়িয়াতে।

মনু রিজার্ভেশন নেই একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ অফিসারদের বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কেন এসেছেন ?

দারোগা ভদ্রলোক বললেন, আসলে আমার উপরওয়ালা এসেছেন একটা মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেশানে— কিন্তু এখানে ওঁদের বসিয়ে যে খাওয়াই এমন ভদ্রগোছের একটা জায়গা পর্যন্ত নেই ! তাই আমরা এসেছিলাম এই বাংলোতে লাঞ্চ করতে। যখন ....

মনু বলল, আসুন বসুন। আমাদের সঙ্গে কোনো মহিলা-টহিলা নেই—অসুবিধা কিসের ? নিশ্চই খাবেন।

বলে, সকলকেই আদর করে ভিতরে বসাল।

বাঙালি বাবুর মুখে এমন চমৎকার ওড়িয়া শুনে এবং মনুর ভদ্র ব্যবহারে ভদ্রলোকেরা খুবই খুশি হলেন। ওঁরা যথার্থই ভদ্রলোক। পুলিশ অথচ এমন ভদ্রলোক বড়ো একটা দেখা যায় না। হয়তো পুলিশের কাজটাই এমন যে, কিছুদিন চাকরি করার পর ভদ্রতাটা একটা ফালতু অপব্যয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

ওঁরা দুজন, মানে, দারোগা আর সার্কল-ইন্‌স্পেকটার খেতে বসলেন ভিতরে। ছোটো দারোগা বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছিলেন। তিনি খাওয়াদাওয়ার তদারকি করতে লাগলেন। কনস্টেবলরা খাবার বয়ে নিয়ে এল।

এমন সময় সার্কল ইন্‌স্পেকটার ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন— আপনারা খেয়েছেন ?

রাজু ইংরিজিতে বলল, না, না, আমাদের জন্য ভাববেন না। আমাদের খাবার এসে যাবে।

কোত্থেকে ? এখানে কি হোটেল আছে ?

দারোগা নিজের থালার ভাত থেকে হাত উঠিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আছে তো ! মনু বলল।

আমরা অলরেডি খাবার অর্ডার করে দিয়েছি।

ছোটো দারোগা হেসে ফেললেন।

বললেন, শুনি, কী খাবার ?

মনু বলল, মুগের ডাল, কন্দমূল ভাজা আর—

তারপর একটু থেমে বলল, ভাত।

সার্কল ইন্‌স্পেকটারও পাত থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন।

বললেন, আপনারাও আমাদের সঙ্গে না খেলে আমরাই খাই কী করে ? আপনারা আমাদের অতিথি।

ভীষণ লজ্জায় পড়ল ওরা দু বন্ধু। কিন্তু ওঁরা কোনো কথাই শুনলেন না। ওদের জনেও খাবার এল। ফাইন চালের ভাত চমৎকার মুগের ডাল, অমৃতভাণ্ড, মানে পেঁপের তরকারি, আলু ভাজা, পাহাড়ি নদীর ছোটো মাছের স্বাদু ঝোল। এবং পায়েস।

লজ্জিত মুখে খেতে খেতে রাজু ভাবছিল, ভগবান কার কপালে যে কোথায় কী রকমের খাওয়া রেঁধে রাখেন তা ভগবানই জানেন।

রাজু এই ওড়িয়া পুলিশ অফিসারদের ভদ্রতা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছিল। মনু ওকে বহুদিন ওড়িয়া সংস্কৃতি, সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিকিৎসা শাস্ত্র, গান, ওড়িশি নাচ, ওড়িশি ফিলিগ্রি ও তাঁতের কাজ-এর গল্প করে এসেছে এবং চিরদিন জোরের সঙ্গে বলেছে যে, ওড়িশার একজন

গড়পড়তা ওড়িয়া একজন গড়পড়তা বাঙালির চেয়ে অনেক ভদ্র। আজকে নিজের চোখে পুলিশের কাছে এই ব্যবহার পেয়ে কথাটার সত্যতা বুঝতে পারল রাজু। মন খুশিতে, কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। স্বার্থ অথবা ভয় ছাড়া, আজকাল কেউ কারো সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে এ কথা যে ভাবাই যায় না।

খেতে খেতে রাজু বলল, আপনাদের সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাবেন ? আমরা কখনও মার্ডার দেখিনি।

ওঁরা সকলেই রাজুর কথায় ভাত-মুখে হেসে উঠলেন।

বললেন, আপনি ভাগ্যবান। মার্ডার না-দেখাই ভালো। আর দেখলেও যা ঝামেলা। সাক্ষী হওয়ার শাস্তি, যে মার্ডার করেছে, তার শাস্তির চেয়েও বোধ হয় বেশি।

বড় দারোগা সার্কল ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে চাইছেন।

সার্কল ইন্‌স্পেকটার রাজুকে বললেন, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। তা ছাড়া, আপনার সঙ্গে ক্যামেরা আছে—আমাদের কাজে লাগতে পারে, মার্ডারের স্পটটার ছবি তুলতে এভিডেন্স যদি কিছু থাকে, তারও ছবি তুলতে।

মনু বলল, চমৎকার। তবে আমার বন্ধু ছবি তুললে একটাও উঠবে না, এইই যা। আমাকেই ছবি তুলতে হবে।

দারোগা বললেন, যেই-ই তুলুন। ছবি উঠলেই হল।

মনু শুধোল, পলিটিকাল মার্ডার ? মার্ডারের হদিস পেলেন ? মার্ডার হয়েছে কে ?

এমন সময় বাইরে কনস্টেবলরা একসঙ্গে কি যেন বলাবলি করে উঠল এবং ক্যাঁচোর-কোঁচোর শব্দ করতে করতে একটা গোরুর গাড়ি এসে বাংলোর কম্পাউন্ডে ঢুকল।

সার্কল ইন্‌স্পেকটার আর বড়ো দারোগার চোখে কথা হল।

দারোগা বললেন, ওই দেখুন, লাশ এসে গেছে।

রাজুর পেটের মধ্যেটা গুলিয়ে উঠল। ও আর খেতে পারল না। গোরুর গাড়ির গা-চুঁইয়ে রক্ত পড়ছিল নিচে ফোঁটা-ফোঁটা। মাদুর আর দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি লাশ।

দারোগা বললেন, চলুন দেখবেন।

এমনভাবে বললেন, যেন কোনো সুন্দর কিছু দেখতে অনুরোধ করছেন। কোনো হরিণশিশু। অথবা হলুদবসন্ত পাখি।

রাজুর পা দুটিকে কে যেন অ্যারালডাইট দিয়ে বাংলোর ঘরের মেঝেতে সেঁটে দিল। মনু কিন্তু বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে।

দারোগা মৃতের মুখের উপরে যে কাপড় চাপা ছিল তা কনস্টেবলদের খুলে দিতে বললেন।

মনু ছবি তুলল। ঘরে বসেই, জানালা দিয়ে দেখল রাজু।

ভাবল, মনুটা পারেও। ওর মধ্যে বীভৎসাতা, নৃশংসতার অনেক সুপ্ত বীজ লুকোনো আছে। কোনোদিন ও নিজেও কাউকে খুন করলে রাজু অন্তত অবাক হবে না।

সার্কল ইন্‌স্পেকটার বাথরুমে হাত ধুতে গেলেন।

ফিরে এলে, রাজু জিজ্ঞেস করল, কখন হয়েছে?

সকাল বেলা। সাতটার সময়।

কেন ?

ধান নিয়ে। এই যে ভাত খেলেন লাল চালের, এর স্বাদ বড়ো মিষ্টি। ধান কাটছিল ছেলেটা। ওরই খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা অনেকে মিলে একসঙ্গে মেরেছে। ওর ভাই আর বাবাকেও হয়তো মারত— তারা বেঁচে গেছে।

খুনিদের ধরা যাবে ?

ধরতে হয়নি। যে আসল খুনি, খাঁড়া দিয়ে যে বারবার কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছে, সে নিজেই খুন করে রক্তমাখা খাঁড়া হাতে এসে থানায় খুনের খবর দিয়েছে, এবং কবুল করেছে যে, সে-ই খুনি। এই আদিবাসীরা অন্যরকম। আমাদের মতো নয়। ওরা মারতে ভয় পায় না মরতেও না। মিথ্যেও কম বলে। অনেকে তো একেবারেই বলে না।

সত্যি ?

অবাক হয়ে রাজু বলল।

হ্যাঁ!

লোকটা কি খুব বড়োলোক ? জোতদার-টোতদার ?

ফুঃ। দু এক গুঁঠ জমি ছিল কিনা তাই-ই সন্দেহ। যারা মেরেছে, এবং যাকে মেরেছে সকলেরই সমান অবস্থা। যে জমিতে ধান কাটা হচ্ছিল সেই জমি ওদের পূর্বপুরুষের জমি। ওই জমিটুকুর মালিককানা নিয়েই গোলমাল।

আপন জ্যাঠতুতো ভাই হয়ে .... ধানের জন্যে .....

রাজু জলল।

বাইরে, মনু বিভিন্ন দিক থেকে মৃতের ছবি তুলছিল।

সার্কল ইন্‌স্পেকটার রাজুর কথা শুনে হাসলেন। বললেন, ধান বড় দামি। সকালে বেরিয়েছিলেন আপনারা, চারধারে ধানখেত দেখেননি ? এখানে চারদিকেই তো পাহাড় আর ধানখেত। পাকা ধানের রং নজর করে দেখবেন—কেমন লাল—একেবারে রক্তের মতো লাল। শুধু ওড়িশা কেন আমাদের সব রাজ্যের ধানেই রক্ত মাখানো থাকে। বলেই, ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

রাজু অবাক হয়ে তাকাল সার্কল ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে।

ভদ্রলোককে দেখলে মনে হয় অধ্যাপক। কোনোরকম নেশা নেই। সিগারেট নয়, পান না, অন্য বড় নেশা তো নয়ই এমনকী চাও নাকি খান না।

কেন খান না, জিজ্ঞেস করাতে বললেন, পুলিশের চাকরি বড়ো প্রলোভনের চাকরি। এই চাকরিতে বহাল থেকে এদেশে যা কিছু চাইলেই সহজে পাওয়া যায় তাই আমার বাবা এই চাকরিতে ঢোকার আগে তাঁর গা-ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, কোনো নেশা করতে পারব না। পান থেকে সিগারেট থেকে তাস তাস থেকে মদ, মদ থেকে মেয়েমানুষ—নেশা একটা থেকে অন্যটাতে গড়িয়ে যায়—আর তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষও গড়াতে থাকে নিজের অজান্তে।

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, বাবার কথা মেনেই চলি। এ চাকরি সত্যিই বড়ো প্রলোভনের। নিজের পা একবার টলে গেলে অন্যদের শাসন করব কী করে ?

শ্রদ্ধাভরা চোখে রাজু, নন্দনকুমার নন্দ, হাতিঝোড়ার সার্কল ইন্‌স্পেকটার অফ পুলিশ-এর দিকে চেয়ে রইল।

মনে মনে বলল, মনুটা মিছিমিছিই রাগারাগি করে মরে। যে দেশে এমন পুলিশ অফিসার আছে, সে দেশের ভবিষ্যৎ এখনও নিশ্চয়ই আছে। এত হতাশ হবার মতো এখনও কিছুই হয়নি।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল রাজু।

গোরুর গাড়ি আবার ক্যাঁচোর কোঁচোর করতে করতে বাংলোর হাতা ছেড়ে চলে গেল। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল এবং খালি গায়ে ধুতি মালকোঁচা-মেরে পরা একটি দুবলা কালো-কোলো ছেলে। এর চোখে জল নেই, কিন্তু দৃষ্টি উদভ্রান্ত।

মনু আর বড় দারোগা ফিরে এল ঘরে।

মনু নিজেই যেন পুলিশ অফিসার এমনভাবে রাজুকে বলল, লাশ চলে গেল লাশ-কাটা ঘরে, হাতিঝোড়ায়।

হাতিঝোড়া কতদূর ? এখান থেকে ?

পাঁচকিলোমিটার। বললেন বড়ো দারোগা, চাঁদবাবু।

রাজু শুধোল, সঙ্গে সঙ্গে গেল, ছেলেটি কে ?

বড়ো দারোগা বললেন, ও ভিস্তিমের ছোটো ভাই।

সার্কল ইন্‌স্পেকটার বললেন, এবার যাওয়া যাক।

বড়ো দারোগা আর সার্কল ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রাজু আর মনুও উঠল জিপে।

রাজু ছোটো গল্প ও কবিতা লেখে এ কথা মনু ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছিল ওঁদের। নিয়মিত নানা লিটল ম্যাগাজিনে এবং বড়ো কাগজেও দু একবার, রাজুর লেখা যে ছাপা হয় এবং হয়েছে এ কথাও জানাতে ভোলেনি।

তাতে রাজুর ইজ্জত জিপে ওঠার পর থেকে আরও বেড়ে গেল। একজন গড়পড়তা ওড়িয়াও কতখানি সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং সাহিত্যপ্রেমিক তা এঁদের এই ব্যবহারে আরও গভীরভাবে বুঝতে পাবল রাজু।

ছেলেটার নাম কী ? মানে লাশটার ?

লাশের নাম হয় না। চাঁদবাবু হেসে বললেন। লাশের নাম লাশ। লাশের ঠিকানাও হয় না, কী স্যর, হয় ?

নন্দবাবু বললেন, নাম হয় না, তবে ঠিকানা হয় ; লাশ-কাটা ঘর। চাঁদবাবু বললেন, যখন বেঁচে ছিল ছেলেটা তখন ওর নাম ছিল সুরাই।

সুরাই ?

মনু স্বগতোক্তি করল।

আদিবাসী ?

হ্যাঁ। কোল্‌হো।

আর যে মেরেছে ? তার নাম ?

কে মেরেছে তা তো আদালত বলবেন। এবং আদৌ মেরেছে কি না তাও। আমরা শুধু আপাতদৃষ্টির কারবারী। চাঁদবাবুর হেফাজতে যারা নিজেরাই ধরা দিয়েছে এবং যাদের ধরা হয়েছে তারা সকলে মিলে অনেকজন।

কজন সবসুদ্ধ চাঁদবাবু ?

সাতজন স্যার।

তাদের নাম কী ?

সুরা, সিথা, সামা ওরফে নান্ধু, লক্ষ্মণ, ওরফে হোডিং, বানিয়া ওরফে পাগা, তুরী ওরফে কান্‌কা, আর মকর।

ওরা সকলেই জাতে কোল্‌হো ?

সকলেই। একই পরিবারের লোক তো সব।

নন্দবাবু বললেন।

তারপর বললেন, ওদের সকলেরই ঠাকুরদার বাবা এক।

ঠাকুরদার বাবার নাম কী ছিল, চাঁদবাবু ?

ঠাকুরদার বাবার নাম সুরা নায়েক। সুরা নায়েকের অনেক ছেলেমেয়েই ছিল, কিন্তু যে জমির টুকরোটুকুর নিয়ে সুরাই খুন হল, সেই জমি পড়ে ছিল সুরা নায়েকের দুই ছেলে মোহান্তি আর সালাই-এর বংশধরদের ভাগে। জমি টুকরো হতে হতে এখন এদের এক-একজনের হাতে দু-এক গুঠ করে আছে। এই জমিতে কতটুকুই বা ধান হয় ?

এইটুকু জমির জন্যে খুন করল ? রাজু বলল। ইসস্ ......

মনু রাজুকে ধমকে বলল, তুই চুপ কর তো। থাকিস সাউথ ক্যালকাটায়, বাবার বাড়ি আছে, বাড়ি-গাড়িওয়ালা লোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিস, তুই কি বুঝবি রে এসবের ? জয়নগরের জমিদার!

রাজু চটে গেল। বলল তুইও হঠাৎ করে থেকে এমন জনদরদি নেতা হয়ে গেলি গুজরাটি ব্যবসাদারের ট্যাক্স-ফাঁকি দিইয়ে আর বুর্জোয়ার মেয়ের সঙ্গে এনগেজড হয়ে ?

চাঁদবাবু মোটাসোটা মানুষ। ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে! ভারি ছেলেমানুষ তো আপনারা।

মনু বলল, মানুষের জন্যে মানুষের দরদ থাকে বুকের মধ্যে। গরিবের জন্যে যেটুকু দরদ আমার বুকে আছে আছে তা ছেলেবেলায় গরিবি দেখেছি বলে ; গরিব কাকে বলে, তা জানি বলে। মানুষ নিজে সচ্ছল অথবা কোটিপতি হলেই বুঝি তা গরিবের প্রতি দরদি হতে বাধা থাকে ? তাহলে তো চিত্তরঞ্জন দাশের দেশসেবা করার এক্তিয়ার ছিল না। লেখাপড়া শিখে এমন বোকা বোকা কথা বলিস না তুই, সত্যিই রাগ ধরে যায়।

তুইও কি কমিউনিস্ট ? কিছুই বলার নেই তাহলে। তুইও যদি .....

রাজু বলল।

তুই একটা স্টুপিড্।

রেগে গিয়ে মনু বলল।

চাঁদবাবু আর নন্দবাবু দুজনেই বাংলা পুরোপুরি বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না।

চাঁদবাবু বললেন, যে হেল্লা সে হেল্লা এব্বে আপনমান ....

নন্দবাবু বললেন, ইয়েস ইয়েস। এনাফ ইজ এনাফ।

মনু আর রাজীব দুজনেই রাগে এবং এঁদের সামনে রাগরাগি করার লজ্জায় চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

জিপটা চলছিল পিচের রাস্তা ধরে। বাঁদিকে একটা পাহাড়ের রেঞ্জ। নাম গুড্ডুংগিরিঘাটি। পানিপাঁই রেঞ্জ ছেড়ে এসেছে ওরা। আর এদিকে বিড়ু থানা।

এবার জিপ পাকা রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে কাঁচা লালমাটির রাস্তাতে ঢুকল। পিলগাঁও বলে একটা সুন্দর সাঁওতাল গ্রামের মধ্যে দিয়ে এসে বিড়ু গ্রামে পড়ল।

রাজু বলল, এ কি ! বিড়ু গ্রামটা এখানে আর বিড়ুর ডাকবাংলো আর থানা অত দূরে।

হ্যাঁ। চাঁদবাবু বললেন। আগে হয়তো এই অঞ্চলে শুধু বিড়ু গ্রামটিই ছিল। তাই পুরো জায়গারই ওই নাম হয়েছে।

বিড়ু গ্রাম পেরিয়ে এসে ওরা আবার ফাঁকা জায়গাতে পড়ল। দুধারে ঢেউখেলানো ধানখেত। পাকা লাল ধান ফলে আছে সারা খেতে। সুরাই নামের একটা ছেলে ধানের ক্ষেতে তার রক্ত ঢেলে সেই রক্তকে আরও গাঢ় করে দিয়ে গেছে আজ সকালে। শুধু যে জুড়য়া গ্রামে ওরা আছে, সেখানেই নয় ; সারা ভারতবর্ষে, আসলে ভারতবর্ষের সব রাজ্যের গ্রামে খেতে খেতে এই সুরাই-এর মতো অনেক অনেক অজানা লোক তাদের মুখের রক্তে, বুকের রক্তে, তাদের ভালোবাসায়, ক্রোধে, আশায়, হতাশায় দীর্ঘশ্বাসে ধানের রং লাল করে দিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে গেছে যুগের পর যুগ। তার খবর কখনও রাখেনি রাজুরা। মার্কারি আর হ্যালোজেন ভেপারের আলোজ্বলা ঝলমলে শহরে, খাবার ঘরে ডাইনিং টেবলে বসে ফেলে ছড়িয়ে ওরা ভাত খায়। খিদে না থাকলেও খায়। খিদে বাড়াবার জন্যে ডাক্তার দেখায়। সকালে খবরের কাগজে ছোটো একটি খবর "ধানকাটার হাঙ্গামাতে একজন খুন" ওদের কখনও বিচলিত করে না। পরক্ষণেই ভুলে যায়। ওদের কাছে কিছুমাত্র তাৎপর্য নেই সে খবরের।

রাজু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বুকের ভিতরটা কেমন মুচড়ে উঠল। একটা অব্যক্ত চাপা ব্যথা—কিসের জন্যে, ঠিক কাদের জন্যে ও জানে না, কিন্তু ব্যথাটা যে সত্যি তা সে অনুভব করে এবং সেই হঠাৎ ব্যথাটা তার মধ্যে ঘুমিয়ে-থাকা সুখী মানুষটাকে একটা ভীষণ ধাক্কা দিয়ে যায়।

মনু একটা সিগারেট ধরিয়ে আরেকটা চাঁদবাবুকে দিয়ে ডানদিকের ধানখেতে তাকিয়েছিল। ওর চোখের দৃষ্টি উদাস। রাজু একবার চোখ ফিরিয়ে দেখল। রাজুর মনে হল, সবসময় ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, মনুকে অনেকদিন ও এমন শান্ত এবং সমাহিত দেখেনি।

ধুত। এবারের বেরোনোটাই মাঠে মারা গেল। খুনখারাপি, রক্তটক্ত, দুঃখ-অভাব— এসব রাজুর একেবারেই বরদাস্ত হয় বা। নিজের জীবনেই কতরকমের প্রবলেম আছে। *নিজের যন্ত্রণায় নিজে জড়িয়ে থেকে ও এসব অজানা, অচেনা, গ্রাম-পাহাড়ের লোকের ফালতু ঝুটঝামেলায়* না-ফাঁসলেই ভালো করত। ও একটু লেখেটেখে বলে, ওর মনটা খুবই নরম। কারো দুঃখই ওর দেখতে ভালো লাগে না। নিজের দুঃখও নয়। তাই বছরের এই সাতটি দিন একটু দুঃখ ভুলতে এসে ....

মনু সার্কল-ইন্‌স্পেকটার নন্দবাবুকে জিজ্ঞে করল— এক গুঁঠে কত জমি ? মানে, কত গুঁঠে এক একর জমি হয় ?

জবাবটা দিলেন দারোগা চাঁদবাবু। বললেন, জমির হিসেব বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তবে এখানে হিসেব মোটামুটি এই রকম। মানে একর থেকে যদি শুরু করেন।

তা-ই যদি করি ?

রাজু বলল।

তাহলে ষোলো বিশ্বে এক গুঠ।

বিশ্ব ? রাজু অবাক হয়ে চাঁদুবাবুকে থামিয়ে দিল।

হ্যাঁ, বিশ্ব। আমাদের ওড়িশাতে বিশ্ব হচ্ছে জমির সবচেয়ে ছোটো মাপ। আপনাদের কি ? ওয়েস্টবেঙ্গলে ?

ছটাক।

মনু বলল, সিগারেটটা ফেলে দিয়ে।

রাজু বলল, কী আশ্চর্য। বিশ্ব। কত ছোটো বিশ্ব। কী ভীষণ ছোটো। মনু বলল, আরম্ভ হল কবির কবিত্ব। এই একমুঠো বিশ্বর জন্যেই সুরাই বলে ছেলেটা আজ সকালে খুন হয়ে গেল—। স্টপ দিস রাজু। প্লিজ স্টপ দিস। আই অ্যাম বিয়্যালি গেটিং ওয়ার্কড আপ।

তারপর চাঁদবাবুর দিকে ফিরে বলল, বলুন চাঁদবাবু, কি বলছিলেন ?

হ্যাঁ। যা বলছিলাম ; একশো ডেসিমেলে এক একর। উনসত্তর ডেসিমেলে এক মান।

মান ?

রাজু বলল।

মানে, এক মান জমি না থাকলে মানী হওয়া যায় না— অল্প-স্বল্প মানীও হওয়া যায় না, না ?

স্টপ ইয়োর বাবলিং, উ্য স্পয়েল্ড চাইল্ড।

মনু আবার ধমকে বলল রাজুকে।

বলেই বলল, বলুন, বলুন তো চাঁদবাবু যা বলছিলেন।

এবার নন্দবাবু বললেন, উনসত্তর ডেসিমেলে এক মান। তিন ডেসিমেলে এক গুঠা। আর এক গুঁঠে ষোলো বিশ্ব। বিশ্ব।

মনু কি বলতে যাচ্ছিল রাজুকে, এমন সময় চাঁদবাবু বললেন, ওই যে দূরে বাঁদিকে গ্রামটা দেখছেন, ওই গ্রামেই আমরা যাব।

মনু স্বগতোক্তি করল, জুড়ুয়া।

হ্যাঁ।

ওই হচ্ছে জুড়ুয়া। আরও একটু এগিয়ে গেলে ছোট জুড়ুয়া।

রাজু বলল, আচ্ছা, ওই যে ছেলেটা, সরি, লাশটা ; ওর বিয়ে হয়েছিল। ছেলে-মেয়ে আছে ?

নন্দবাবু আর চাঁদবাবু দুজনেই চুপ করে রইলেন।

একটু পরে চাঁদবাবু বললেন, ছেলে-মেয়ে নেই কিছু। তবে বিয়ে হয়েছিল। চারদিন আগে।

কী বললেন ? মনু কামারের হাতুড়ি-পড়া জ্বলন্ত লোহার ফুলকির মতো ছিটকে উঠে বসল।

নন্দবাবু কনফার্ম করলেন। বললেন, ইয়েস। দ্যাটস অ ফ্যাক্ট। জিপটা জুড়ুয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকে আবার ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল। ছোটো গ্রাম একটি।

রাজু বলল, এই গ্রামে কি শুধু কোল্‌হোরাই থাকে ?

না, না। কোল্‌হো আছে, মুর্মু আছে, আদিবাসী নয় এমনও অনেক আছে। ওড়িয়া।

মনু বলল, এ গ্রামের সবচেয়ে বড়োলোক কে ?

তিনি সবদিক দিয়ে বড়ো। এই অঞ্চলের নামী লোক তিনি।

কে ?

রাজু শুধোল।

উনি একসময় এম.পি ছিলেন।

বলেন কি ? এই রকম গ্রামে এম.পি!

রাজু অবাক গলায় বলল।

চাঁদবাবু বললেন, এই আপনাদের বড়ো শহরে লোকদের দোষ! এম.পি, এম.এল.এ কি সব শহর থেকেই হবে ? আসল দেশটা তো শহরের বাইরেই। অথচ আপনারা শহরের লোকেরা, সেই দেশটারই কোনো খবর রাখেন।

মনু বলল, উনি কোথায় থাকেন ? দিল্লিতে ? না ভুবনেশ্বরে ?

চাঁদবাবু বললেন না, না। উনি এখানেই থাকেন এখন। একসময় দিল্লিতে থাকতেন।

মনু বলল, এইখানে এই গ্রামে ? এই গ্রামে ওঁর মতো বড়ো লোক থাকতে সুরাই-এর মতো অত গরিব একটা লোক খুন হয়ে গেল ? ভারি আশ্চর্য তো! উনি আটকাতে পাললেন না ?

নন্দবাবু, চাঁদবাবুকে জিজ্ঞেস কললেন, আপনাকে কি উনি কোনো কিছু বলেছেন ? স্টেটমেন্ট দিয়েছেন কোনো ?

না স্যর! আমি যখন মার্ডারের খবর পেয়ে এখানে এসে, অন্যান্য অ্যাকিউজডকে অ্যারেস্ট করে, ডেডবডি গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে আবার বিড়ুতে ফিরে যাই, তার মধ্যে উনি একবারও আসেন নি। আমার মতো দারোগার পক্ষে কি একজন এক্স-এম.পির বাড়ি গিয়ে নিজে থেকে ডিপোজিশান নেওয়া ঠিক হত ? স্যার, ওঁরা হলেন গিয়ে কত বড়ো লোক ! আর আমরা চুনোপুঁটি! উনি ইচ্ছে করলে হয়তো কালই ওই অপরাধে আমাকে বদলি করিয়ে দেবেন কোনো বাজে জায়গায়। আপনি তো জানেন, আমার স্ত্রীর শরীর কী খারাপ যাচ্ছে। বিপদ হয়ে যেত। তা ছাড়া, ওঁকে এই মার্ডারের মধ্যে টানারই বা দরকার কী ?

নন্দবাবু একটু ভেবে বললেন, তা অবশ্য ঠিক। উনি তো খুব ওয়েল কানেক্টেড বলেই শুনেছি আর তেমন না হলে কি আর এম.পি হতে পারেন কখনো ? দিল্লির মসনদে কি আলতু-ফালতু লোক যেতে পারে ? এই ডামাডোলে তো এম.পি-রাই রাজা। তাঁরাই তো আসল লোক।

কোনো মানুষই এমনি-এমনি বড়ো হয় না জীবনে। গুণ থাকা চাই।

চাইটুকু বলে, একটু থেমে, রাজুর দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কি বলেন ?

কারেক্ট।

রাজু বলল গুণ না থাকলে, ডেডিকেশান না থাকলে, কেউ নেতা হতে পারে ?

মনু বলল, নন্‌সেন্স! আমি যাঁর কথা হচ্ছে তাঁকে দেখিনি, জানি না, কিন্তু আমি অনেক এম.পিদের জানতাম এবং জানি! বাট ফর দ্যা পলিটিকস ইন দিস রেচেড কান্ট্রি, সাম অফ দেম উড হ্যাভ বিন স্টাভিং। মেনি অফ দেম আর ইন্‌কেপেবল অফ আর্নিং আ লিভিং।

মনুর এই সাংঘাতিক কথায় জিপসুদ্ধু লোক ঠান্ডা মেরে গেল। রাজু সুদ্ধ। যা-তা বলে ছেলেটা!

মনু আবার স্বগতোক্তি করল, ইয়েস! ইনকেপেবল অফ আর্নিং ইভিন অ লিভিং। মাসে দুশো টাকার যোগ্যতাও ....

কনস্টেবল জিপটাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঝাঁকড়া আমগাছের নিচে দাঁড় করাল।

নন্দবাবু নেমে বললেন কিন্তু প্রত্যেক এম.পি-ই একরকম নন। এখনও কিছু ভালো লোক আছেন, তাই দেশটা চলছে কোনোক্রমে।

মনু বলল, একটা কথা জিজ্ঞেসই করা হয়নি। ওই এম.পি কোন পার্টির ?

উনি ছিলেন কংগ্রেসেরই।

মনু বলল, কোন কংগ্রেস ? ইউ, ভি, ডাব্লু, এক্স, ওয়াই, জেড ? আই, জে, কে, এল, এম, এন, ও, পি ? হুইচ ?

নন্দবাবু রাজুর দিকে চেয়ে বললেন, মনুবাবু কি কমিউনিস্ট নাকি ? কংগ্রেসের উপর ভীষণ রাগ দেখছি।

রাজু বলল, ও যে কী তা ও নিজেই জানে না। এটুকু বলতে পারি যে, ওর মাথার গোলমাল আছে।

রাজু তারপর বলল, তোর জেলে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোর প্রাণও যেতে পারে মনু। সাবধানে থাকিস।

মনু বলল, দূর দূর! জেলে ভয় দেখাস না আমাকে। প্রাণের ভয়ও দেখাস না। আমি বাঙালির বাচ্চা। ঠিক-বেঠিক জানি না। সেদিনও ওই দুবলা-পাতলা বাচ্চা- নকশাল ছেলেগুলো ভুল লোকদের মেরেও প্রমাণ করে দিয়ে গেছে আবারও যে, বাঙালি এখনও মরে যায়নি। বাঙালি নিভেও যায়নি। আগুন তুষ-চাপা হয়ে আছে শুধু।

তুই ভুলে যাচ্ছিস যে, এটা বাংলা নয়— যাঁরা তোকে এখানে নিয়ে এসেছেন তাঁদের সামনে বাঙালি-বাঙালি বলে চ্যাঁচাচ্ছিস কেন ? তোর কি কোনো কমনসেন্সও নেই ? চাপাগলায় রাজু বলল।

রাজু আর মনুর কথাবার্তার আর এগোল না। গ্রামের লোকেরা তিন-চারটে চৌপাই বের করে দিল। তার একটাতে বসে পড়ে রাজু মনুকে বলল, তোরা যা মার্ডারের স্পট দেখতে। আমি ওর মধ্যে নেই।

মনু বলল, ঠিক আছে। ক্যামেরাটা দে।

জিপের পিছন পিছন একটা ভ্যান আসছিল। চাঁদবাবু ভ্যানের কনস্টেবলদের বললেন, একটা লিস্ট দিয়ে যে, সেই লিস্টে যাদের নাম আছে— তাদের সবাইকে এই নিমগাছতলায় জিপের সামনে হাজির করতে। ডিপোজিশান নেবেন উনি ফিরে এসে।

নন্দবাবু বললেন, চালস্তু।

নন্দবাবু, চাঁদবাবু, ছোটো-দারোগা এবং মনু রাস্তা ধরে কিছুটা দূর হেঁটে গিয়ে পথের পাশে কিন্তু ধানখেতের মধ্যে একটা কুয়োর পাশ দিয়ে বাঁদিকে ধানখেতে নেমে গেলেন।

কনস্টেবলরা কেউ কেউ গাড়ি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রইল, সাহেবদের সঙ্গী হিসেবে রাজুকে সম্মান দেখিয়ে। অন্যরা গেল সাক্ষীদের ধরে আনতে।

এখন হেমন্ত। ভর দুপুরের রোদটা মিষ্টি মিষ্টি লাগছে। নিমগাছের ডালপালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে রোদের টুকরো-টাকরা এসে পড়েছে নিচে।

রাজু চৌপাইয়ে বসে সামনে তাকিয়ে দেখল প্রায় অদিগন্ত ধান খেতে। সত্যিই রক্তের মতোই লালরঙা পাকা লাল ধানে খেত ভরে আছে। দিগন্তরেখা আকাশে মেশেনি। মিশেছে গুড্ডুংগিরি-ঘাটি রেঞ্জে—আর হাতিঝোড়া আর বিড়ুর মধ্যের পিচ রাস্তার ওপারে। কী আশ্চর্য সুন্দর উদার প্রকৃতি এখানে। কী শান্তি! পিছনের ঝোপঝাড়ে ঘুঘু ডাকছে। মেয়েরা পথ দিয়ে যাচ্ছে-আসছে।

একটি মেয়েকে বড়ো চোখে ধরল রাজুর। এমন ফিল্মস্টারের মতো ফিগার আর প্রদীপ শিখার মতো মুখশ্রী নিয়ে মেয়েটি এখানে ? ধবধবে ফরসা রং রোদে পুড়ে মরুভূমির সাপের গায়ের রঙের মতো উজ্জ্বল বাদামি হয়েছে। টিকোলো নাক, টানা-টানা চোখ, চাবুকের মতো চিবুক। যেমন দিঘল তেমনই ব্যক্তিত্বসম্পন্না। যেন কোনো মিশরীয় রাজকুমারী— কে বলবে, কোন্ অভিশাপে সে ঘুঁটেকুড়ানি হয়ে জন্মেছে এই জুড়ুয়া গ্রামে ? কে জানে তার বাবা কেমন দেখতে ছিল ? বাবা সুন্দর ছিল, না মা সুন্দরী ? তার বাবাই তার সত্যিকারের জন্মদাতা কী না ?

বসে বসে ভাবছিল রাজু, কী সুন্দর আবহাওয়া, কী চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। যে জীবিকা ও বেছে নিয়েছে তাতে এবং ওর রোজগারের সামান্যতায় কলকাতায় ও নগণ্য ; অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এখানের মতো ছোট্ট কোনো জায়গায় এসে বসবাস করলে ও নিজের অস্তিত্ব ফিরে পেত, এমনভাবে হারিয়ে যেত না। শুক্লা তাকে হেয়জ্ঞান করলেও এই মেয়েটি হয়তো করত না। তার যা সঞ্চয় আছে, তার দাম কলকাতাতে কানাকড়ি হলেও এখানে তা দিয়েই ও ছোটোখাটো সম্রাজ্য গড়তে পারত। এদেরই দুঃখ-সুখের, ভড়ং হিসেবে নয়, মনে-প্রাণে একজন হয়ে গিয়ে ; বাকি জীবন এদেরই জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। তাদের ছেলে কিংবা মেয়ে, পৌষের সকালে মাটির দাওয়ার সামনের গোবরলেপা ঝকঝকে তকতকে উঠোনে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত। ধানের গোলা থেকে ধানের গন্ধ উঠত। গোরুর গায়ের গন্ধ তার স্ত্রীর পায়ের গন্ধ— পাউডার অথবা পারফ্যুমের মেকি গন্ধ নয়— সত্যিকারের গায়ের গন্ধ, যে-গন্ধে প্রত্যেকে নারীই স্বতন্ত্র ; অথচ যে গন্ধ, যে-সমাজে ওর বাস সেই সমাজের নারীদের শরীর থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে, সেই গন্ধ খুঁজে পেত।

হেড-কনস্টেবল ছেলেটি ভারি সুন্দর দেখতে এবং সপ্রতিভ। ধবধবে ফরসা রং, লম্বা, চমৎকার ফিগার, চওড়া হাড়ের সুগঠিত হাত-পা নিয়ে সবসময় সজাগ। সে এসে রাজুর হাতে একটি কাগজ দিল। বলল, স্যার, আপনি একটু দাগ দিয়ে যাবেন— এ বংশতালিকা থেকে কে কে এল তা দেখে। অন্য সাক্ষীরাও এসে যাবে এক্ষুণি।

বংশতালিকা ?

রাজু অবাক হয়ে তাকাল।

হ্যাঁ। সুরাই আর সুরাইকে যারা মেরেছে তারা তো একই জাত, একই তাদের পূর্ব-পুরুষ।

রাজু ভাবছিল বসে বসে, ভাইই ভইকে মারে এদেশে। চিরদিনই মেরে এসেছে। সে রক্ত-সূত্রের ভাই-ই হোক আর ব্যবহারিক সূত্রের ভাই-ই হোক। অন্ধের মতো ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান মানুষ। কে যে তাদের আসল শত্রু, তার খোঁজ না নিয়ে-ভাইয়ে হানাহানি করে মরে চিরদিন। কিন্তু এই খুন, যে-হয়েছে এবং যারা করেছে, তাদের আসল শত্রুকে এই গ্রামেরই কোনো ক্ষমতাশালী লোক ? যে, বুভুক্ষু পুরুষ আর নারীদের জীবন-যৌবন নিয়ে দাবাখেলার দানের মতো দান দিচ্ছে ? কে সে ? তেমন লোক তো সব গ্রামেই আছে ভারতবর্ষের। কিন্তু সেই সব লোকরাই কি তাদের আসল শত্রু ? তারা চিহ্নিত হচ্ছে না কেন ? শাস্তি পাচ্ছে নাই বা কেন ?

রাজু ভাবছিল।

আসল শত্রু, এই সুরাইদের বুকের মধ্যের ভীরুতা। এদের জন্মগত সংস্কার, এদের অন্যায় অত্যাচার মেনে জন্ম-জন্মান্তরের আশ্চর্য, সীমাহীন, ক্ষমতার অযোগ্য সহনশীলতা।

রাজুর মনে হল, সুরাই বোধহয় মনোজের মতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। অদৃশ্য শিকারি যখন বাঘকে গুলি করে, তখন গুলি-খাওয়া বাঘ গর্জন করে উঠে শরীরের যে-জায়গায় গুলিজনিত যন্ত্রণা, সেই জায়গাটিকেই যন্ত্রচালিতের মতো কামড়ে ধরে মুহূর্তের মধ্যে শরীর বেঁকিয়ে। সাহসী সরল বাঘ ; চতুর ভীরু, আত্মগোপনকারী ইতর শিকারির অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারে না। সে, বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারে না; আড়ালে লুকিয়ে থেকে, চোরের মতো কেউ এমন আত্মসম্মান-জ্ঞানহীনতায় কাউকে আঘাত করতে পারে।

এই সুরারাও বোধহয় বাঘেরই মতো। তাদের সরল বুদ্ধিতে তারা তাদের সমষ্টির শরীরকেই মহাক্রোধে কামড়ে ছিঁড়ে নিতে গিয়ে তারা নিজেরাই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় আত্মসম্মানজ্ঞানহীন, চতুর ইতর শিকারি আড়ালে বসে হাসে বুভুক্ষু সুরাই-এর রক্তে লালহওয়া ধানের চালের ভাত খেয়ে গোবদা হয়। যে বড়ো লোক ছিল, সে আরও বড়োলোক হয় এমনি করে। আর যে গরিব ছিল, সে আরও গরিব।

গ্রামের লোকেরা পুলিশ-সাহেবদের জন্যে দুটি দড়ির খাটিয়া এনে বড়ো নিমগাছটার ছায়ায় পেতে দিয়েছিল। তারই একটার উপর বসেছিল রাজু। পিছনে কারো বাড়ি থেকে মুরগি ডাকছিল। ঘুঘু ডাকছিল আরও দূর থেকে। একদল মেয়ে নীরব শোভাযাত্রা করে গোবর নিয়ে, কাস্তে নিয়ে, খালি খাতে ওর সামনের পথ দিয়ে একবার যাচ্ছিল আর একবার আসছিল। তার মধ্যে সেই মেয়েটিও ছিল। লজ্জার মাথা খেয়ে রাজু অপলকে মেয়েটির দিকে চাইছিল, যতবারই সে কাছে আসছিল। এবারে তার মাথায় গোবরের ঝুড়ি। আহা রে! শহরের বড়োলোকের বিটিরা যদি ঘুঁটেকুড়োনির নিরাভরণ রূপ দেখতে পেত, তাহলে তারা লজ্জায় মধ্য কলকাতার দোকানে গিয়ে চুল-ছাঁটা আর চুল-বাঁধা আর ভুরু-তোলা আর হাত-পায়ের রোম তোলা সব বন্ধ করে দিত।

হঠাৎ রাজুর মনে হল, শুক্লার সৌন্দর্য তো মালটি-স্টোরিড বস্তিলালিত বাড়ির ফ্যাকাশে মেকি সৌন্দর্য। মিথ্যা মাটির রং-রস-রূপ-গন্ধ কিছুই নেই তার মধ্যে।

এ কথাটা মনে হতেই হঠাৎ একটা নাড়া খেল রাজু। নিজের বুকের মধ্যে অন্য একটা বুক, নিজের মনের মধ্যে অন্য একটা মন হঠাৎ ভাস্বর, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। আবিষ্কার করল সে, তার আসল সত্তাকে। হুলো বেড়াল যেমন নিজের বাচ্চার ঘাড় কামড়ে ধরে ঘাড় মটকায় এক ঝটকায়, তেমন করেই তার পুরোনো, নরম তুলতুলে মেকি-সত্তাকে সুরাই নামক এক অপরিচিত যুবকের মৃত্যু কোনো অদৃশ্য হুলো বেড়ালেরই মতো হঠাৎ কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে নতুন প্রাণ দিল যেন।

রাজু, এই গ্রামীণ জীবনের, ধানের জন্যে এমন খুনোখুনির কথা কখনো সখনো কাগজে পড়েছে বটে, কিন্তু এ, স্বরূপ সম্বন্ধে কোনোই স্পষ্ট ধারণা ছিল না তার।

হতবাক হয়ে বসে ছিল ও হেমন্তের দুপুরের মিষ্টি রোদে রক্তের রঙে লাল ধানখেতের ঢেউ পেরিয়ে দূরের আবছা কালো আর নীল গুড্ডুং গিরিঘাটির পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে ঐ দিকে চেয়ে। থাকতে থাকতে চশমার আড়ালে ওর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল।

রাজুরা জাতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ মানেই দ্বিজ। উপবীত ধারণের সময় তাদের নতুন করে জন্ম হয়। রাজুর মনে হল আজ ও তৃতীয়বার জন্মাল। ত্রিজ হল!

হেড কনস্টেবল ডাকল,-স্যার!

ভাবনার ঘোর ভেঙে রাজু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও ভাই! কাগজটা দাও! বলে, কাগজটা মেলে ধরল খাটিয়ার উপর। তারপর পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে কলম বের করল। চশমাটা মুছে নিল।

প্রকাণ্ড বংশতালিকাটা পুরো মেলে ধরে চোখ বুলোতে লাগল তার উপর।

চার

মনু, সার্কল ইন্‌স্পেকটার এবং ও.সির সঙ্গে কুয়োর পাশ দিয়ে ধানখেতে নেমে ওঁদের সঙ্গে আগে আগে চলতে লাগল। ওর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। কটকে মামাবাড়িতে থাকাকালীন মামাদের জমিজমা ছিল ঢেন্‌কানলের কাছে সেখানে যেত প্রতিবছর পরীক্ষার পরের ছুটিতে। বড়োমামার বন্দুক দিয়ে একবার ঢেন্‌কানলের জঙ্গলে একটা ছোটো খুরান্টি হরিণ মেরেছিল মনু। মাউস-ডিয়ার! মামার তৈলাতে রাতে হাতিও আসত। বন্দুকের আওয়াজ করতে হত রাত জেগে বসে—আছাড়ি পটকাও ফাটাতে হত।

মনু বলল, এখানে হাতির উপদ্রব নেই?

নেই আবার? চাঁদবাবু বললেন। তবে হাতি বেশি গুড্ডুংগিরি ঘাটি আর বিড়ুর দিকে। জুরুয়া গ্রামটা বেশ ভিতরে বলে হাতি এত দূর বড়ো একটা আসে না। আমাদের যদি আজ ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়, তবে পথেই হয়তো হাতি পড়বে। সেটা পড়লেই মুশকিল। গতবছর এক সন্ধেবেলায় সাইকেল করে থানা থেকে বাড়ি যাচ্ছিলাম—ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল থানাতে এবং বাড়িতেও বাড়ির কাছাকাছি প্রায় এসে গেছি, এমন সময় হাতিটা আপনারা যে বাংলোতে আছেন মনে হল যেন সেই বাংলোর মধ্যে থেকেই দৌড়ে এল।

নন্দবাবু উৎসুক হয়ে বললেন, তারপর কী হল?

তারপর আর কি, আমি তো সাইকেল ফেলে সঙ্গে সঙ্গে চম্পট। কিন্তু সাইকেলটা একটা লাটুর মতো ছোটো করে পাকিয়ে গোল করে রেখে গেছিল রাস্তায়।

চাঁদবাবুর বড়ো নাদুস-নুদুস ভুঁড়ি কিন্তু বেশ ফিট আছে। খুব জোর হাঁটতে পারেন। জীবনীশক্তিতেও ভরপুর।

মন ভাবছিল, জীবনীশক্তি ব্যাপারটা আলাদা। রোগা মোটা সুপুরুস কুপুরুষ কোনো কিছুর উপরই তা নির্ভর করে না।

নন্দবাবু অধ্যাপকেরই মতো। চালচলন, কথাবার্তা। ছিপছিপে, সুন্দর ফিগার। মাথার সামনের দিকে টাক, তীক্ষ্ণ নাক, মিষ্টি মুখশ্রী।

আগে আগে চলে চাঁদুবাবু তাদের অনেকক্ষণ হাঁটিয়ে এনে একটা ছোটো খেতে পৌঁছোলেন। খেতটা লম্বা-চওড়াতে সামান্যই। কিছু কাটা ধান পড়ে রয়েছে খেতের মধ্যে। এক জায়গায় জমি লাল হয়ে রয়েছে রক্তে। অসময়ে বৃষ্টি হওয়াতে জমি তখনও ভিজে ছিল খেতের মধ্যে নিচু জায়গাতে। সেই ভেজা জায়গায় রক্ত জমে একটা ছোটো পুকুরের মতো হয়ে রয়েছে।

মনু একটা ছবি তুলল রাজুর, ক্যামেরা দিয়ে। শখ করে কালার্ড ফিল্ম পুরেছিল রাজু। ভাবেনি, মানুষের রক্তের ছবি তুলবে। এদিকে আকাশে মেঘ জমেছে একটু একটু। কে জান, উঠবে কিনা ছবি।

ওঁদের পিছনে পিছনে দুজন কনস্টেবল এসেছিল। খেতটার গায়েই একটা গাছ ছিল। ছোটো। কিছু ইতস্তত কালো পাথর এখানে ওখানে ছড়ানো ছিল, একফালি উঁচু জায়গায়। ওই জায়গাটা পাথুরে বলে বোধহয় চাষ হয় না সেখানে।

চাঁদবাবু নন্দবাবুকে বললেন, দেখুন স্যার, এইখানে সুরাই আর ওর বাবা দুনা ধান কাটছিল। বাড়ির মেয়েরাও, মানে সুরাই-এর মা, সুরাইয়ের চারদিনের পুরোনো বউ, সালাই-এর বউ সকলেই ধান কাটছিল। মেয়েরা আর সালাই বাড়ি গেছিল পোকাল খেতে আর সুরাই ও সুরাইয়ের বাবার জন্যে পোকাল নিয়ে আসতে। ঠিক সেই সময়ই সুরা, সিথা নাদ্ধু, মাকড়, তুরী, হোড়িং আর পাগা দু দলে ভাগ হয়ে, একদল কুয়োর পাশ দিয়ে আর অন্যদল গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে খেতে ঢুকে, সাইড থেকে ওদের অ্যাটাক করে।

নন্দবাবু বললেন, সুরাইয়ের অন্য ভাই তখন কোথায় ছিল?

ও তো এখানে থাকে না। হাতিঝোড় না বাদমা, কোথায় যেন কাজ করে।

তারপর? নন্দবাবু শুধোলেন।

তারপর ওরা খেতের মধ্যে গুঁড়ি মেরে মেরে আসতে থাকে। খেতের মধ্যে আলোড়ন দেখে বাপ-ব্যাটা দুজনেই বিপদ বুঝে দৌড়ে পালায়। কিন্তু সুরার দল কুয়োর সামনে সুরাইকে ধরে ফেলে। বাপ দুনা দৌড়ে বাড়ি পালায়। ওদের রাগটা হয়তো সুরাইয়ের উপরেই বেশি ছিল।

তারপর? সুরাইকে ওরা হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে আল দিয়ে এই এতখানি নিয়ে আসে। যেখানে ওরা ধান কাটছিল।

সুরাইকে সুরা বলে : এবার বল তুই কার বাপের জমিতে ধান কাটছিলি?

সুরাই চেঁচিয়ে বলে : তোর বাপের জমিতে নয় রে, তোর বাপের জমিতে নয়।

ততক্ষণে ওদের অন্য দলও সেখানে পৌঁছে যায়। সুরা তার হাতের খাঁড়া দিয়ে সুরাইকে ঘাড়ে কোপাতে থাকে। অনেক কোপ মারলে তবে সুরাই নিস্তব্ধ হয়। অন্যদের মধ্যে একজন ওর গলাতে কাছ থেকে পরপর দুটি তীর ছোঁড়ে।

সুরাইয়ের বাবা বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে ছোটো ছেলে সালাইকে খবর দেয় যে, ওরা বোধহয় সুরাইকে মেরেই ফেলল এতক্ষণে।

সালাই দাদাকে বাঁচাতে প্রাণপণে দৌড়ে আসে। তখনও সুরাই মরেনি। সুরাই তার ভাইকে আসতে দেখে চিৎকার করে বলে, 'পালিয়ে যা, পালিয়ে যা, ওরা তোকেও কেটে ফেলবে। আমি চললাম রে। ডাম্বইকে বলিস। বাবাকে বলিস।'

ডাম্বই কে? নন্দবাবু শুধোলেন।

ডাম্বই, ওরফে কুনকি; সুরাইয়ের বউ। গান্ধর্বমতে বিয়ে করে অন্য গ্রাম থেকে চার দিন আগে সুরাই নিয়ে এসেছিল ওর বউ ডাম্বইকে এ গ্রামে। ধান কাটতে সাহায্য হবে বলে। একজোড়া হাতের দাম যে অনেক।

মনু ভাবছিল, বড়োলোকের মেয়ে মালতী প্রায়ই বলে, বিয়ের পর ওরা ওড়িশার গোপালপুর-অন-সিতে ওবেরয়ের পাম-বিচ হোটেলে হানিমুন করতে আসবে। এখানেও সুরাই আর ডাম্বইয়ের হানিমুনে কিন্তু অনেক চাঁদ ছিল। আজ অথবা কালই বোধহয় পূর্ণিমা। কিন্তু চাঁদের দিকে তাকাবার সময় এই মানুষগুলোর নেই; নতুন বউকে সোহাগ করারও নয়। ধানের স্বপ্নই ওদের একমাত্র স্বপ্ন। একজোড়া হাত দিয়ে ওরা ধান কাটে, গোবর বয়, গোরু দোয়—সেই হাত সোহাগভরে বউয়ের বুকে রাখার সময় কোথায় ওদের? ওদের চাঁদে মধু নেই, রক্ত আছে, বড়োই তেতো চাঁদ সে!

মনুর মাথার মধ্যে যে রাগের পোকাগুলো থিকথিক করে সেই পোকাগুলো আবার জেগে উঠল। কে যেন কানের কাছে বলল, "মিস্টার পারেখ, প্লিজ ডোন্ট টক অফ ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইন ডেল্লি। পিপল উইল কসিডার উ্য টু বি আ ফ্রড। আর টোটাল ফ্রড।"

দেশ স্বাধীন হবার পঁয়ত্রিশ বছর পরও—এই মহান গণতন্ত্রের ধারক ও বাহকদের মুখে এই কথা!

রাগের পোকাগুলো লাফাতে লাগল। মনে হল, মনুর মাথার মধ্যে শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবে।

নন্দবাবু আবার শুধোলেন, ওয়্যার দে সোবার? দ্যা অ্যাকিউজড?

না স্যার। ওরা সকাল থেকেই হাঁড়িয়া খাচ্ছিল। ভাইকে মারার মতো মনের জোর, হাতের জোর বোধহয় ওদের ছিল না। তাই বোধহয় নিজেদের ইচ্ছা করে উত্তেজিত করছিল ওরা সকাল থেকে—যাতে ওদের বিবেক, ওদের ভালোবাসা, ওদের শুভাশুভজ্ঞান সব লোপ পেয়ে যায়।

মনু বলল, কে ওদের হাঁড়িয়া খেতে পয়সা দিয়েছিল? আমার মনে হচ্ছে, এই মার্ডারের পিছনে অন্য কারও হাত আছে—যে হাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে লেলিয়ে দেয়, যে হাত গরিবের বিরুদ্ধে গরিবকে উত্তেজিত করে তুলে নিজেদের হাত শক্ত করে, স্বার্থ জোরদার করে।

নন্দবাবু বিরক্ত গলায় বললেন, প্লিজ কিপ কোয়াইট। আমরা আমাদের কাজ করছি, খুব দায়িত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনি আপনার মতামত আপনার গলার মধ্যে চেপে রাখুন। বক্তৃতা করার সময় বা জায়গা এটা নয়। আপনার মতামত বাইরে আনবেন না। আমরা এসব শুনতে চাই না। আমরা পুলিশের অতি সামান্য সব কর্মচারী। কলমের এক খোঁচায় আমাদের চাকরি যেতে পারে, যায়ও। আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন। আপনারা কলকাতা শহরের বড়োলোকবাবু। আপনাদের এসব শখের দরদ দিয়ে কি এদের কোনো সত্যিকারের উপকার হবে? মিছিমিছি কেন আমাদের কাজে ব্যাঘাত করছেন?

মনু বলল, সরি।

বলেই, চুপ করে গেল।

বুঝল যে, এই সামান্য সার্কল ইন্‌স্পেকটার আর দারোগার ক্ষমতা সত্যিই কতটুকু। নিজেদের কাজ নিয়মমাফিক করা ছাড়া আর কী-বা বেচারারা করতে পারেন? তার মালিক মিস্টার পারেখের মতো, তার নিজেরই মতো, এঁরাও হয়তো বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু নিরুপায়। ছেলে-পেলে আছে, বউ আছে, চাকরি গেলে মনুর মতোই না খেয়ে থাকতে হবে এঁদেরও।

সুরাই আর সুরারা একটা জাত। আর ওরা সকলে অন্য একটা জাত। বউ-বাচ্চার কথা ভেবে, চাকরির কথা ভেবে ওদের চুপ করেই থাকতে হয়; হবে।

মাথার মধ্যে রাগের পোকাগুলো আবার ধেই ধেই করে নাচতে থাকে।

মনু জানে না যে, প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে কি ভাবছিল সুরাই? সুরাই নিশ্চয়ই জানত যে, ওর আসল শত্রু ওর হাড়িয়া-খাওয়া ছেলেবেলার খেলার-সাথি সমবয়সি ভাইয়েরা নয়। আসল শত্রু অন্য কেউ। সুরাই কি জানত সেই শত্রুকে?

মনুর খুব জানতে ইচ্ছে করছিল সেই লোকটা কে বা কারা? কিন্তু জেনেই বা কী করবে? খুন করবে তাদের? কিছুই করতে পারবে না, জানে ও। শুধু মাথার মধ্যের পোকাগুলোর নাচ আরও জোর হবে, শিরা আরও দপদপ করবে।

শালপাতায় মুড়ে, সুরাই-এ রক্ত নিয়ে আসতে বলে দিলেন চাঁদবাবু কনস্টেবলদের দু-তিন জায়গায় আলাদা করে। কেস-এ লাগবে—প্রমাণ হিসেবে সুরাই-এর রক্তে তখনও চুপচাপ ভেজা কয়েক আঁটি কাটা ধানও নিয়ে আসতে বললেন উনি।

তারপর গ্রামের দিকেই ফিরে চললেন, ওঁরা সকলে। ওঁদের পিছনে পিছনে চলল, অপরাধীর মতো শোকাহত, নিরুপায়, রুদ্ধক্রোধ মনু!

পুলিশের লোকদের এসবে অভ্যাস হয়ে যায় বোধ হয়। খুন, বলাৎকার, রক্ত, অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার এসব দেখে দেখে তাঁদের মনে আর কোনো তাপ-উত্তাপ থাকে না। ডাক্তারদের যেমন অসুখে-বিসুখে, ব্যবসাদারদের যেমন ব্যবসার অন্তর্নিহিত, দুঃখময়, নিরুপায় বিবেকহীনতায় পুলিশদেরও তেমনই।

খররোদে যেমন খেতের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, তেমনিই দুর্নীতি আর স্বার্থপরতার রোদে বিবেক প্রতিনিয়ত বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে এ দেশ থেকে। বিবেকের জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এখন খরা; বড়ো দারুণ খরা।

কুয়োর পাশ দিয়ে গিয়ে লাল মাটির কাঁচা রাস্তায় পড়ে ওরা জিপের দিকে চলল।

দূর থেকেই দেখা গেল স্ত্রী-পুরুষ ও ছোটো ছেলেমেয়েদের বেশ একটা জটলা হয়েছে নিমগাছতলায়।

চাঁদবাবু বললেন, সাক্ষীরা বোধহয় এসে গেছে।

ভালো। নন্দবাবু বললেন।

মনু বলল, গ্রামে এত বড়ো একজন মান্যগণ্য লোক থাকতে তাঁকেই আপনারা ডাকলেন না? তাঁর মতামতের দামই তো সবচেয়ে বেশি। উনি নিশ্চয়ই আসল ঘটনাটা কী, কে এই খুনের পিছনে তা আপনাদের বলতে পারতেন। এটা আপনারা ঠিক করলেন না কিন্তু।

নন্দবাবু বললেন, আমরা কি করব না করব তা আমাদেরই করতে দিন। আপনাকে সঙ্গে এনে দেখছি, আমাদের কাজ করাই মুশকিল হল।

চাঁদবাবু বললেন, অত বড়ো মানী লোককে আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের কিছু বলতে যাওয়া শোভন নয়। তাঁকে বিরক্ত করাও শোভন নয়। সকালে মার্ডারের খবর পেয়ে যখন এসেছিলাম তখন উনি গ্রামে ছিলেন, কিন্তু আসেননি! দেখি, যদি বিকেলে আসেন। উনি নিজে কিছু বললে তবেই তা শোনা যাবে। আমাদের পক্ষে কিছু জিজ্ঞেস করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়? এটা আপনাদের কাজ নয়?

চাঁদবাবু বললেন, সত্যিই আপনি বাড়াবাড়ি করছেন।

নন্দবাবু বললেন আমাদের বলছেন কেন? আমাদের বলা সহজ বলে? কার কি করা উচিত সে কথা আপনারা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কি ভুবেনশ্বরে কি দিল্লিতে গিয়ে বলেন না কেন? সকলের যা করা উচিত প্রত্যেকেই কি তা করছে? আমাদের নিয়ে পড়লেন কেন হঠাৎ আপনি?

রাজু দূর থেকে দেখতে পেল, ওরা সকলে ধানখেত থেকে উঠে রাস্তায় এসে পড়ল।

দুপুর এইমাত্র মরে গেল। এখন বিকেল। সুরাইও মরে গেছে। মরা রোদ চারপাশে।

ভিড়ের মধ্যে একটি নোংরা নীল শাড়িপরা কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়েকে দেখিয়ে হেড কনস্টেবল বলল, এই যে স্যর! ওই হচ্ছে সুরাইএর বউ।

রাজু ভালো করে তাকিয়ে দেখল। কান্নায় চোখ লাল হয়ে আছে। রাজু জানে, চোখদুটি বেশিক্ষণ লাল থাকবে না। কাঁদার সময় কোথায় ওদের? মূক, মূঢ়, ভাষাহীন, প্রতিবাদহীন গোরুছাগলের মতো একদল স্ত্রী-পুরুষ বোবার মতো দাঁড়িয়ে-বসে আছে নিমগাছ তলায়। বাচ্চাগুলো ঘং ঘং করে কাশছে, নাক দিয়ে সর্দি গড়াচ্ছে।

কনস্টেবল একজন বয়স্কা মেয়েকে দেখিয়ে বলল, ওই সুরাই-এর মা।

সেও একটা ভীষণ নোংরা কালো শাড়ি পরে একটি শিকনিগড়ানো বাচ্চাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য! তার চোখে একটুও জল নেই। সে-যে আগেও কেঁদেছে এমনও মনে হল না চোখ দেখে। দুটি চোখ শুকনো, খটখটে। চোখে জ্বালাও নেই, রাগ নেই, অভিমান নেই, শুধু নির্লিপ্তি আছে—ভাগ্যের হাতে বিনাবাক্যে নিজেদের সবকিছু সঁপে দেওয়ার সাক্ষী যেন চোখ দুটি।

হঠাৎই রাজুর কয়েকটি লাইন মনে পড়ে গেল। 'A single spark can start a prairie fire...our force although small at present, will grow rapidly.' কিন্তু এমন কোনো আগুন কি আছে যে, এই অদাহ্য জড়বুদ্ধিদের জ্বালাতে পারে? কে সেই আগুন জ্বালাবে? রাজু? মনু?

অপদার্থ! তারা, অপদার্থ একেবারে।

একসময় অনেকই পড়াশোনা করত রাজু। কত লোকের লেখা যে, হঠাৎ কোথা থেকে পরিযায়ী পাখিদের মতো একে একে স্মৃতির দাঁড়ে এসে বসতে লাগল এই অসময়ে, অস্থানে; ঝাঁকে ঝাঁকে। হঠাৎ। তারা যে তার মস্তিষ্কে, তার অবচেতনে এমন দৃঢ়মূল হয়ে এতদিন ছিল; থাকবে, তা কখনও মনে হয়নি রাজুর। ও সেইসব কথাকে ভুলে গেছিল ক্যাডবারি চকোলেট, দার্জিলিং-এর চা, ডেইন্টি-ক্রিম বিস্কুট, আর ব্রয়লার চিকেন বিক্রি করতে করতে।

অবাক হয়ে গেল ও। ও তাদের ভুলে গেছিল, কিন্তু তারা ভোলেনি তাকে।

ওঁরা এসে গেলেন। চাঁদবাবু, নন্দবাবু ছোটো-দারোগা সকলেই খাটিয়াতে বসলেন। মনুও বসল! মনুর চোখ-মুখ কেমন উদভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে।

চাঁদবাবু কাগজ-কলম বের করলেন। হেড কনস্টেবলকে বললেন, ডাকো, সাইকেল-সারাই-এর দোকানিকে।

খালি গায়ে, গামছা পরা একটা কালো-কোলো রোগা, মাঝবয়সি লোক এসে উবু হয়ে বসল দারোগাবাবুর সামনে, নিমগাছতলাতে।

তোর নাম?

নাম বলল।

বাবার নাম?

বাবার নাম বলল।

সকালে তোর দোকান খোলা ছিল?

ছিল।

তুই কোন লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছিলি?

না বাবু। আমি গরিব লোক। আমি কিছু দেখিনি।

চাঁদবাবু বললেন, দ্যাখ তুই গরিব লোক, যেমন জিজ্ঞেস করছি তেমন জবাব দে, যাতে কেসের সুবিধা হয়। তুই তো আর খুন করিসনি। আর যারা করেছে তারা তো নিজেরাই কবুল করেছে যে, খুন তারা করেছে। তারা তো সব হাজতে। ভয় কি তোর? যারা খুন করেছে, তারা বলেছে যে, তুই ওদের দেখেছিস। আর তুই বলছিস দেখিসনি।

একটু থেমে বললেন, থানায় নিয়ে গিয়ে এমন পেটান পেটাব যে, বাপ বাপ করে সব বলবি। ভালো চাস তো ঠিক ঠিক জবাব দে।

হ্যাঁ বাবু।

কারা তোর দোকানের সামনে দিয়ে দৌড়ে গেছিল? ক-টার সময়?

না বাবু। আমার ঘড়ি নেই বাবু।

তুই দেখিসনি কিছু?

না বাবু।

আবার না বাবু।

ধমকে বললেন চাঁদবাবু।

হ্যাঁ বাবু।

কি, হ্যাঁ বাবু!

না বাবু।

দ্যাখ, তোর কপালে দুঃখ আছে। তোর কপালে অশেষ দুঃখ আছে—এ—এ—এ...

হ্যাঁ বাবু।

তা বুঝিস?

হ্যাঁ বাবু।

কারা দৌড়ে গেছিল?

আমি ওসব দেখি না বাবু। আমি মাথা নীচু করে সাইকেলের টিউব সারাচ্ছিলাম। সাইকেলের টিউব ছাড়া আমি আর কিছু দেখিনি বাবু।

ঠিক আছে। তুই এবার চুপ কর। প্রশ্ন আর উত্তরগুলো আমি নিজেই লিখে নিচ্ছি—তুই তারপর একটা টিপসই দিয়ে দিবি। না দিলে তোকে থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হব আমি।

হ্যাঁ বাবু।

কি, হ্যাঁ বাবু?

থানায় নিয়ে যাবেন না বাবু।

যা বলছি, তাই কর। তাহলে নিয়ে যাব না।

হ্যাঁ বাবু।

মনুর মনে পড়ে গেল ইনকামট্যাক্স থেকে তার মনিবের অফিসে আর বাড়িতে একবার রেইড হয়েছিল। এমার্জেন্সির সময়, দিল্লির টেলিফোনিক ইনস্ট্রাকশনে। দিল্লির এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের এক মিটিংয়ে তার রগচটা মনিব গভর্নমেন্টের পলিসির যাচ্ছে তাই সমালোচনা করেছিলেন বলে। সেই সময় ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের লোকেরা যেমন জবরদস্তি ডিপোজিশান নিয়েছিলেন অফিস এবং বাড়ির বিভিন্ন মানুষদের কাছ থেকে, তার সঙ্গে পুলিশের এই প্রক্রিয়ার কোনোই তফাত নেই।

সুরাই খুন হয়েছে। কেন খুন হয়েছে, খুনের পিছনে গূঢ় কারণ কী? কাদের অদৃশ্য হাত সেই খুন করিয়েছে? এসব সাংঘাতিক ব্যাপারের মধ্যে ঢোকার ইচ্ছা এঁদের আদৌ নেই। যাদের কেউ রক্ষক নেই, তাদের কাছেই গায়ের জোর খাটানো চলে—কেওকেটাদের কিছু বলা মানেই তো সাপের গর্তে হাত ঢোকানো।

চাঁদবাবু বলছিলেন, তাঁর ছেলেমেয়েরা সকলেই ছোটো। আগামী বছর প্রোমোশনের বোর্ড—কোন তালেবর লোক কোথায় কি ল্যাগিয়ে দেবে। ব্যস-স-স, প্রোমোশন তো দূরের কথা, চাকরি নিয়েই টানাটানি। এদেশের আইন হচ্ছে সুরা, সুরাইদের জন্যে। ওঁর মতো, রক্ষকহীন ছোটো আমলাদের জন্যে। ওড়িশা তো শুধু একটি রাজ্য মাত্র। সারা ভারতবর্ষেই এই অলিখিত আইন চালু। যাদের কাছে প্রচুর দুনম্বর টাকা আছে তারা দু নম্বরি তিন নম্বরি সব অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে। কাঁচা টাকা যাদের নেই, তাদের কপালে অশেষ দুঃখ।

চাঁদবাবু এক মনে ডিপোজিশান লিখতে লাগলেন। প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই। মিনিট দশেক ধরে লিখলেন।

তারপর সাইকেল মেরামতির দোকানির দিকে চেয়ে বললেন, কান খুলে শোন, আমি কি প্রশ্ন করেছি আর তুই কি জবাব দিয়েছিস। শুনে টিপসই দিয়ে দে। পরে আবার বলিস না যে, জোর করে লিখিয়ে নিয়েছি। কিরে ব্যাটা? বলবি নাকি?

হ্যাঁ বাবু। না বাবু।

তারপর চাঁদবাবু পর পর প্রশ্ন আর উত্তরগুলো পড়ে গেলেন।

কেসটাকে শক্ত করতে হবে তো। এই-ই তাঁদের কাজ। কেস শক্ত করে বেঁধে দাও, তারপর বাঁধন খোলবার হয় তো আদালত খুলবে পয়সার জোর থাকে তো কেস লড়বে। না থাকলে, জেলে পচে মরবে। কি করার?

মনুর মালিকের যিনি ইনকামট্যাক্স অফিসার, তিনিও এই কথাই বলেন। বলেন, আরে মশাই ধরবার লোক আমি একা। আমি ভালো করে তেড়েফুঁড়ে জুড়ে দিচ্ছি—ছাড়াবার হলে উপরে গিয়ে ছেড়ে যাবে। অ্যাপিলেট অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার আছে। দরকার হলে কমিশনারের কাছে রিভিশান পিটিশান নিয়ে যেতে পারেন। তারপর আছে ট্রাইবুন্যাল। তারপর হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, ছাড়িয়ে আনুন না। আমার কি?

মনু বলেছিল তা বলে ন্যায়-অন্যায় কিছু নেই—অ্যাসেসমেন্ট হবে ফেয়ার-অ্যাসেসমেন্ট। তা না হয়, যা আপনি মেনে নেওয়া উচিত বলে মানেন, তাও জুড়ে দেবেন। এ কেমন হল?

আরে মশাই, আমি কি আপনার ভালো করতে গিয়ে নিজের নাক কাটব? দু-দুটো অডিট আছে। এ.জি অডিট আর রেভিন্যু অডিট। অডিট নোটের আবার কোনো মাথামুণ্ডুই নেই। অডিট

অবজেকশান হলেই হল। সামনের বছর আমার প্রোমোশান ডিউ। এই সময়ে আমার পক্ষে কোনো ঝুঁকি নেওয়াই সম্ভব নয়। আনুন না, উপরে গিয়ে ছাড়িয়ে আনুন। আপনাকে ফেয়ারনেস, জাস্টিস দেখাতে গিয়ে কি শেষে প্রোমোশানটা হাতছাড়া হয়ে যাবে? বেশ কথা বলছেন তো আপনি। শেষে ঘুষ খেয়েছি বলে বদনাম রটবে?

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলেন : আজকাল অনেস্ট লোকদের কোনো সাহস দেখাবার দিন নেই সারা দেশে! মশাই, সাহস যারা দেখাবে, তারা সাহসের দাম গুণে নেবে কান মলে আপনার ঠেঙ্গে। নিজের স্বার্থ ছাড়া সাহস দেখায় এমন বুদ্ধু লোক গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এখন কড়ে-আঙুলে গোনা যায়। হ্যাঁ! এক্কেরেই কড়ে-আঙুলে। যা করলাম, এই অর্ডারই মাথায় করে ধন্য ধন্য বলে নিয়ে যান।

তিন লাখ টাকা তো যোগ করে দিলেন। মাথায় করে নিয়ে যাব? মনু উষ্মার সঙ্গে বলেছিল চুরি করেনি আপনার মালিক?

তা করেছে। কিন্তু তার বেশিটাই তো খরচা হয়ে যায় নানান জায়গায় দিতে-থুতে। না দিলে কি কোনো কাজ হয়? তাছাড়া আপনি তো চুরি ধরেননি—অন্ধকারে ঠুকে দিলেন—আ শট ইন দ্য ডার্ক। ডেমোক্র্যাটিক ক্যান্ট্রিতে ট্যাক্স-পেয়ারদের কি এইভাবে ট্রিট করা উচিত? যাদের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় দেশ চলছে, তাদের কি একটু ভালোভাবে ট্রিট করা যায় না?

যান তো মশাই! মেলা ফ্যাচোর ফ্যাচোর করবেন না। দিতে-থুতে হয়, তাতো আপনি নিজেই বললেন। আমাকে যখন কিছু দেন-থোননি—আমি যখন ও লাইনের নই, তখন আমাকে এত তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন কেন? কোনো এম.পি ধরুন, কিছু মাল ছাড়ুন তাকে। এসব বক্তৃতা তিনি আপনার হয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে করবেন। নয়তো, বলুন যে আপনার মালিক সলিড পোলিটিক্যাল ব্যাকিং-এর জোরে—আমার প্রোমোশন আটকালে গাড়ি পার করিয়ে দেবেন। ছিঁড়ে ফেলছি আপনার অর্ডার—ফের নতুন করে লিখে দিচ্ছি। মশাই, যস্মিন দেশে যদাচারঃ। ছেলেমানুষ. আপনাকে কি বলব, কিছু না-বুঝেই একগাদা কথা বলেন। যান, আসুন এবারে।

পরে, ঠান্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখেছিল মনু। সত্যিই তো। উনি ওঁরা নিজের কথা ভাববেন বইকী। চাঁদসাহেব যেমন ভাবছেন। গভর্নমেন্ট সারভেন্টদের মধ্যে যাদের পোলিটিক্যাল ব্যাকিং অথবা পয়সার জোর নেই, তাদের অতিকষ্টে নিজের চেয়ারটিকে কোনোক্রমে পিঠে-বেঁধে প্রোমোশনের বেড়া ডিঙিয়ে ক্লিন রিটায়ারমেন্টের বৈতরনি পার করানো ছাড়া উপায় কি?

সকলেই নিরুপায়।

সুরাইয়ের মা, বউ, যারা খুন করেছে, সুরাদের তারা প্রত্যেকে, চাঁদসাহেব, মনু নিজে, এই সাইকেল-মেরামতির দোকানের মালিক, গামছা-পরা মাঝবয়সি সাক্ষী, মনুর কোম্পানির ইনকামট্যাক্স অফিসার প্রত্যেকেই যার যার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরুপায়। যার পোলিটিক্যাল ব্যাকিং নেই, তার কিছুই নেই। যার দু নম্বর টাকা নেই, তারও কিছুই নেই। আর যাদের এই দুইয়ের কিছুমাত্র নেই সে নিঃস্ব।

চাঁদ সাহেব বললেন, নে। এবার টিপসই লাগা তো।

বলেই, বললেন, অ্যাইরে! স্ট্যাম্প-প্যাড তো থানায় ফেলে এসেছি। কই রে? কার বাড়ি কাজল আছে? কাজলদানিটা নিয়ে আয় তো!

কাজলদানি আনতে দৌড়োল একটি ছোটো মেয়ে।

এমন সময় সমবেত নারী পুরুষ শিশু মধ্যে থেকে চাপা, অস্ফুট শব্দ শোনা গেল কয়েকটা। একটু আলোড়ন উঠল। গভীর জলের তলায় ছোটো মাছের দলে হাঙর পড়লে যেমন হয়।

সম্ভ্রমসূচক?

তাই-ই হবে।

দেখা গেল, সমবেত স্ত্রী, পুরুষ, শিশুর পোশাকের মলিন ছেঁড়া-খোঁড়া পটভূমিতে একেবারেই বেমানান ধপধপে ইস্ত্রি-করা সাদা ট্রাউজার, তার উপরে সুন্দর একটি স্ট্রাইপড টেরিলিনের হাওয়াইন শার্ট এবং পায়ে দামি চটি পরে একজন সৌম্যদর্শন, ফরসা, মাঝারি আকারের সুপুরুষ ভদ্রলোক এদিকে আসছেন, হেঁটে; গ্রামের ভিতর থেকে।

নন্দবাবু বললেন, এক্স-এম.পি বাবু আসছেন। যার কথা হচ্ছিল।

ওঁকে দেখে দারোগা ও সার্কল ইন্সপেকটার উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

চমৎকার ইংরেজিতে ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, কতক্ষণ হল এসেছেন আপনারা?

ইংরেজি তো ভালো বলবেনই। ভালো ইংরেজি বলতে না পারলে, ভালো বক্তৃতা না দিতে পারলে কি জনগণের নেতা হওয়া যায়? আমাদের নেতারা তো সায়েব-মেমই প্রায়।

উনি গ্রেসফুলি আসন নিলেন একটি নতুন খাটিয়াতে। দুঃখ করে বললেন, এত বছর এই গ্রামে আছেন; তবে এমন ঘটনা গ্রামে এই প্রথম।

সার্কল ইন্স্পেকটার বললেন, ঘটনার সময় আপনি কি গ্রামে ছিলেন স্যার?

ছিলাম। ছিলাম। তবে দুঃখটা এই যে, ঘটনা ঘটার আগে আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না যে, কি ঘটতে চলেছে, তাহলে বন্দুক নিয়ে এসে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে মার্ডারটা নিশ্চয়ই বন্ধ করে দিতে পারতাম। সেটুকু মরাল কারেজ আমার কাছে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর যখন খবরটা পেলাম, তখন মনটা এমনই খারাপ লাগল যে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। তারপর কি ঘটেছে না ঘটেছে তার কিছুই আমি জানি না।

পাশে-বসা মনু একবার চকিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল।

রাজু ওর হাতের উপর হাত রাখল। ওকে ঠান্ডা করার জন্যে।

মনু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, সিগারেটের প্যাকেট বের করে দেশলাইয়ের বাক্সর উপরে সিগারেট ঠুকে ঠুকে রাগটা ঠান্ডা করে ধরাল একটা।

তারপর অন্য দিকেই মুখ ফিরিয়ে, জোরে ধোঁয়া ছাড়ল। যেন সিগারেটের ধোঁয়া দিয়েই এদেশীয় অনাচারের গোয়ালের মশা তাড়াবে ও।

চাঁদবাবু বললেন, দুনম্বর সাক্ষী কোথায়?

ছেলেটা তো এখানেই ছিল। গেল কোথায়?

হেড কনস্টেবল বলল।

দেখা গেল, একটি ছেলে গ্রামের দিক থেকে হেঁটে আসছে।

চাঁদবাবু ডাকলেন, তাড়াতাড়ি আয়।

এক্স-এম.পিকে নন্দবাবু বললেন, স্যার, যা শুনলাম, তা কি সত্যি? সুরাইয়ের বসন্ত হয়েছিল, সেই কারণে ভিনদেশি রোগ গ্রামে বয়ে নিয়ে আসার অপরাধে ওকে নাকি আপনারা গাঁ-সুদ্ধ লোক বয়কট করে একঘরে করে রেখেছিলেন? আপনাদের মতো এত লেখাপড়া জানা মান্যগণ্য লোক থাকতেও এযুগে এই গ্রামে অবিশ্বাস্য এমন ঘটনা ঘটল কি করে? আমার তো একথা বিশ্বাসই হচ্ছে না।

এক্স-এ.পি বাবু মুখ খুললেন। চমৎকার সাদা দাঁত। হাঙরেরই মতো। ও দাঁতে কিছু কামড়ে নিলে শব্দ হয় না একটুও। দারুণ স্বাস্থ্য। চেহারাটাও খুবই সম্ভ্রান্ত। দেখলেই মনে সম্ভ্রম জাগে। আস্তে আস্তে ভেবে ভেবে, খুব বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেন।

বললেন, এ গ্রামের কথা আর বলবেন না। সব আন-এডুকেটেড সুপারস্টিসাস লোকজন। এদের কথা না-বলাই ভালো। এরা মানুষ নয়, জানোয়ার।

হঠাৎ মনু ফস করে একগাল হেসে বলে বসল, এটা কি বলছেন স্যার? আপনি কি তাহলে জানোয়ারের ভোট পেয়েই পার্লামেন্টে গেছিলেন?

মনুর কথায় ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। মুখটা মুহূর্তের জন্যে লাল হয়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে ভালো করে মনুকে দেখলেন। পরক্ষণেই মনুর হাসি মনুকে ফেরত দিয়ে বললেন, ভালোই বলেছেন। কিন্তু মশায়ের পরিচয়টা জানা হল না।

এবার নন্দবাবু আর চাঁদবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, ওঁরা কলকাতার লোক, ইনভেস্টিগেশান দেখতে আমাদের সঙ্গে এসেছেন। বিড়ুতে বেড়াতে এসেছেন।

এক্স-এমপি তখনও ওঁর হাসিটা মুখে পাউডারের প্রলেপের মতো মাখিয়ে রেখেই বললেন, ও কলকাতার লোক!

অফিশিয়াল এনকোয়ারিতে এসেছেন ওঁরা। ওঁদের সঙ্গে না আসাই উচিত ছিল আপনাদের।

চাঁদবাবু মনুর দিকে ফিরে বললেন, কেমন? এখন স্যারের মুখেই শুনলেন যা শোনার। আপনি যদি আর কোনো কথা বলেন তাহলে...

মনুও হঠাৎ ভোল পালটে ঝানু রাজনৈতিক নেতার মতো ফার্স্টরেট অভিনেতা হয়ে গিয়ে বিনয়ে গলে দারুণ এক হাসি হাসল।

বলল, সরি, সরি।

তারপর এক্স-এম.পি বাবুকে বলল, আই অ্যাপোলোজাইজ টু উ্য স্যার। আমি কিন্তু কিছুই বলিনি আপনাকে। আপনি যা বলেছিলেন, সেই কথাটারই ক্ল্যারিফিকেশান চেয়েছিলাম।

এক্স-এম.পি বাবু হাসি হাসি মুখে মনুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

মুখে কিছু বললেন না।

সুরাইয়ের বউ ডাম্বই যেমন করে মাটিতে উবু হয়ে বসেছিল, তেমন করেই বসে রইল। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, সময়, কাল, স্থান এসবের কোনো-কিছুরই কোনো মানে নেই আর ওর কাছে। এই 'জানোয়ার'দের কাছে।

রাজু জিজ্ঞেস করল, এক্স-এম.পি বাবুকে, সুরাইয়ের বউয়ের কী হবে? মাত্র চারদিন হল নাকি বিয়ে হয়েছে?

উনি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজুকে দেখে নিয়ে দার্শনিকের গলায় বললেন, ওদের আবার কী হবে? যদি পেটে ছেলে-মেয়ে এসে থাকে, তা খালাস হয়ে গেলেই অন্য কাউকে বিয়ে করবে। যদি না এসে থাকে, তাহলে কালও বিয়ে করতে পারে। গান্ধর্বমতে তো বিয়ে! অসুবিধার কি? তাছাড়া এখানে বাড়িতে বসে বসে তো আর কেউই খেতে পায় না। স্ত্রীপুরুষ সকলকেই কাজ করতে হয়। সকলেই স্বনির্ভর; তাই স্বাধীন। কিছুই হবে না। সবই ঠিকই হয়ে যাবে। কাল থেকে কাজেও লাগবে।

আয় রে পিলা, আয়। দু নম্বর সাক্ষীকে ডাকলেন চাঁদসাহেব।

ছেলেটার বয়স হবে তেরো-চৌদ্দ। দেখে মনে হল, হয়তো স্কুলেও গেছে-টেছে কিছুদিন। চাঁদসাহেব যা জিজ্ঞেস করলেন তার পটাপট জবাব দিয়ে গেল সে। কিন্তু তার সাক্ষ্য দেবার ধরন দেখে মনে হল, সে যেন সুরাইকে যারা খুন করেছে তাদের ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন জেল হলে খুবই বেশি হয়। এত বেশি সপ্রতিভ সাক্ষ্য, প্রশ্নের আগেই উত্তর যে, সন্দেহ হল কেউ আগে-ভাগেই তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছে।

চাঁদবাবু ছেলেটাকে কাছে বসিয়ে বললেন, ছেলে, তুই তো খুব চালাক-চতুর আছিস। কোন ক্লাস অবধি পড়েছিস?

ছেলেটি বলল, অষ্টম ফেল।

বাঃ বাঃ, তাহলে অনেকই তো পড়েছিস রে। দাঁড়া, তোর জবানবন্দিটা লিখে ফেলি তাড়াতাড়ি। তারপর সই করে দিয়েই তোর ছুটি।

বলেই, বললেন, অ্যাই সেরেছে। সাইকেলের দোকানির জবানবন্দির যে একজনও সাক্ষী রাখিনি। ডাক-ডাক ব্যাটাকে—যা বাবা, ডেকে আন তোরা কেউ।

কনস্টেবলদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন চাঁদুবাবু।

একজন কনস্টেবল চলে গেলে, শুধোলেন সাক্ষী হবে কে রে? ডাক ওই বুড়োকে।

অন্য কনস্টেবল ডাকল তাকে।

বুড়ো মতো লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ বোবার মতো সব দেখছিল, শুনছিল। তাকে ডাকতেই সে বলল, আমি বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাপ্পা সাবধান করে দিয়েছিল যে, কোনোরকম কাগজ বা চিরকুটে কখনও যেন টিপসই না দিই। ওই করে করেই তো আমার বাপ্পার জমিজমা সব বেহাত হয়ে গেছিল। আমার এক বিশ্বও জমি নেই। সইটইয়ের মধ্যে আমি যাব না।

চাঁদবাবু বললেন, তোর বাপ্পার তো জমিই বেহাত হয়েছিল শুধু। একটা টিপসই না দিলে তোর হাতটাই যে বেহাত হয়ে যাবে রে গাধা। কোথাকার বেজন্মা রে তুই! দারোগার সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় তাও শিখিসনি? সেটা বুঝি তোর বাপ্পা তোকে শিখিয়ে যায়নি?

এক্স-এম.পি বাবু ইংরেজিতে বললেন, আরে যাচ্ছে তাই, যাচ্ছে তাই; সব আন এডুকেটেড অপদার্থ!

বুড়ো তবুও দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগাবাবু বললেন, কি হল? থানায় যাবি? গেছিস কখনও থানায় আগে? যাসনি নিশ্চয়ই। চল একবার বেড়িয়েই আসবি।

হ্যাঁ বাবু। চলুন যাব।

কী বললি?

থানায় যাবি? থানায় কেন নিয়ে যায় মানুষকে জানিস?

না। জানি না। তবে জানব তো নিয়ে গেলে। সুরাকে জিজ্ঞেস করব, কেন ওরা মারতে গেল সুরাইকে। এই গ্রামে কখনও ভাইয়ের রক্ত খায়নি অন্য ভাইয়ে।

কোনো দুর্বোধ্য কারণে মনে হল হঠাৎই চাঁদ দারোগার আত্মবিশ্বাস ফেঁসে গেল। এই চাঁদবাবু কিন্তু, যে উদারমনস্ক মানুষটি ডাকবাংলোয় বসে আদর আপ্যায়ন করে রাজু আর মনুকে দুপুরের খাওয়া খাইয়েছিলেন, তিনি নন। যিনি ইংরেজি জানা এক্স-এম.পি বাবুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন; তিনিও নন। এখনকার মানুষটি সহায়-সম্বলহীন গরিবদের সঙ্গে অন্য ব্যবহার করেন। এক জায়গায় ভদ্র, বিনয়ী, নম্র মানুষ; অন্য জায়গায় শার্দূল শাবকের মতো তেজোময়।

কিছুক্ষণ হাঁ করে বুড়োর দিকে তাকিয়ে থেকে দারোগা সমবেত জনমণ্ডলীকে হাঁদার মতো মুখে শুধোলেন, বাপ্পালো বাপ্পা! এ লোকটা কে রে?

এ লোকটা সুরাই-এর গুরু।

একজন কনস্টেবল বলল।

সুরাই-এর গুরু?

বলিস কি রে! তাই মুখে দেখছি খুবই বড়ো বড়ো কথা! চল শড়া থানাতে। তোর বিষদাঁত ওপড়াব আজ।

এক্স-এম.পি বাবু আস্তে আস্তে ইংরেজিতে বললেন হাসি হাসি মুখে, একে একটু শিক্ষা দিন তো ভালো করে। ও সুরাইকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসত!

হ্যাঁ?

হাসতে হাসতেই বললেন এক্স-এম.পি। হ্যাঁ।

মনের মধ্যে আর পেটের মধ্যে যাই-ই থাক, মুখে হাসি না থাকলে নেতা হওয়া যায় না ভারতবর্ষে।

ভাবছিল, মনু।

উনি আবার বললেন, এই গ্রামে এই দুটিই ঔদ্ধত্যের ঝাড় ছিল। একটি গেছে। এইটি আছে। তবে এর বিষদাঁত প্রায় ভেঙে এসেছে। বয়সও হল অনেক।

রাজু এক্স-এম.পি বাবুকে শুধোল, রুট অফ ইমপার্টিনেন্স কেন বলছেন—মানে ঔদ্ধত্যের ঝাড়? সুরাই কি খুব উদ্ধত ছিল?

সুরাই কাউকেই কেয়ার করত না এ গ্রামে। এমনকী আমি নিজে সামনে দিয়ে গেলেও উঠে দাঁড়াত না, নমস্কার করত না; বলব কি, আমার সামনে বিড়িও খেত। আমি অবশ্য তাতে কিছুই মনে করতাম না। আমার এডুকেশান আছে। ক্ষমা আছে। তাছাড়া, এ গ্রামের সবাই আমার ছেলে-মেয়ে, মা-বোন।

নন্দবাবু বললেন, বিড়ি খাওয়াটা আপনি নিশ্চয়ই অপরাধের মধ্যে ধরবেন না। ওরা তো এমনিতেই সকলের সামনে বিড়ি খায়, হাঁড়িয়া খায়, এ তো আর মিডল ক্লাস এডুকেটেড সোসাইটি নয়—এদের ওসব মানামানির বালাই নেই। বাবার সামনেই বিড়ি খায় তা আর বাইরের লোক।

এক্স-এম.পি বাবু বললেন, ওর বাপ তো একটা আধন্যাংটা হাভাতে মানুষ—আমি কি ওর বাপের চেয়েও বড়ো নয়? তবে আমি জীবনে অনেক সম্মানই পেয়েছি। সুরাই সম্মান দেখাল কি দেখাল না, তা নিয়ে কখনও আমার যায় আসেনি।

রাজু চেয়ে দেখল মনুর দিকে।

মনুর কান বোধ হয় এদিকে একেবারেই নেই। ও চেয়ে আছে দূরে, উদ্দেশ্যহীনভাবে। লাল ধানের খেত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যতদূর চোখ যায় সামনে, আর ধানখেতের পর নীল ধুঁয়ো ধুঁয়ো গুড়ুংগিরি পাহাড় শ্রেণি। মনু গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবছে।

এক্স-এম.পি আবার বললেন যে, সুরাই যত উদ্ধত ছিল আজ না কাল ও কারও না কারও হাতে মরতই। এ গ্রামেরই। আমার না হয় অশেষ ক্ষমা, অসীম সহ্যশক্তি; সকলের তো আর তা নয়। সকলেই তো আর এখানে এডুকেটেড নয়।

একটু থেমে উনি আবার বললেন, গ্রামে একটা খুন হয়ে গেল, খুবই দুঃখের কথা; কিন্তু দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। এটা আমার কথা নয়, গ্রামের সক্কলেই তাই বলছে। সকলের মুখেই একই কথা।

রাজু চেয়ে দেখল যারা ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের কারও মুখেই কোনো কথা নেই। কোনো দৈব-অভিশাপে সকলেই বোবা হয়ে গেছে।

রাজুর মনে হল, এক্স-এম.পির কথাটা সত্যি। যে-সুরাই খুন হল, তার শান্ত নীরব মা একটা শিকনি-পড়া বাচ্চাকে কোলে নিয়ে, বাচ্চাটির ওজনে একধারে বেঁকে গিয়ে সেই তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সদ্যপুত্রহারা মা, যার ছেলেকে কোপ দিয়ে দিয়ে কাটা হয়েছে কয়েক ঘণ্টা আগে, যে মা তার ছেলের রক্তাক্ত বীভৎস মৃতদেহ দেখেছে তার চোখে একটুও জল নেই। মুখে বিলাপ নেই। ছেলেটা হয়তো সত্যিই এমন ছিল যে, তার মাও বেঁচে গেছে সেই হাড়জ্বালানো ছেলের মৃত্যুতে!

দুজন কনস্টেবল রক্তে-ভেজা কয়েক আঁটি ধানগাছ এবং শালপাতার মোটা দু-তিনটি দোনাতে করে সুরাই-এর থকথকে জমা-রক্ত মুড়ে নিয়ে এসে রাখল। সুরাই এর রক্ত এতক্ষণ তার মিষ্টি ধানের খেতের ধানকে আরও লাল করে জমে ছিল। এখন, যে-পথের ধুলোয় পা ফেলে সে

লক্ষবার যাওয়া-আসা করেছে, শিশুকালে যে পথের লাল ধুলো খিধের জ্বালায় মুঠো মুঠো মুখে পুরেছে, যে পথে সুরাই, পাগা, হোডিং সকলের সঙ্গে খেলা করেছে একই সঙ্গে সেই পথই তার রক্তে ভিজে উঠল।

ঠিক সেই সময় সুরাই-এর মা দৌড়ে এসে দাঁড়াল ধানের আঁটি-গুলোর সামনে।

সকলেই ওর এই হঠাৎ দৌড়ে আসায় চমকে উঠে সুরাই-এর মায়ের দিকে তাকাল।

রাজু ভাবল, এক্ষুনি আছাড় খেয়ে পড়বে হতভাগিণী ওই বীভৎস দৃশ্য দেখে। মনে মনে রাজু নিজেকে সেই করুণ দৃশ্যের অসহায় সাক্ষী হবার জন্যে তৈরিও করছিল।

কিন্তু সুরাই-এর মা দৌড়ে এসে চাঁদবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে চাঁদবাবুকে বলল, বাবু, অতগুলো আঁটিই কি তোমাদের দরকারে লাগবে? রক্ত তো সবগুলোতেই লেগে আছে—একটা আঁটি নিয়ে গেলেই কি হত না? অন্য আঁটিগুলোতে যে অনেক ধান আছে! বাকিগুলো আমাকে দিয়ে দাও বাবু। অত ধান নষ্ট কোরো না।

আরে! রক্ত লেগে আছে তোর ছেলের, সেই ধান...?

হ্যাঁ বাবু। সেই ধান। পাকা ধান তো এমনিতেই লাল। রক্তে কিছু হবে না।

চাঁদবাবু হেসে ফেললেন।

রাজু চমকে উঠল, উনি হাসতে পারলেন বলে।

চাঁদবাবু হেসে, কনস্টেবলদের বললেন, তাই করো হে। একটা আঁটি তোমরা ভ্যানে তুলে নিয়ে বাকিগুলো ওখানেই রেখে দাও।

তারপর নন্দবাবুর দিকে মুখে ঘুরিয়ে হেসে বললেন, এখানে সত্যিই ধান খুব দামি! আশ্চর্য দেশ। কী বলে স্যাব? একটা আঁটিই নিয়ে যাই?

নন্দবাবু মানুষটি ঠিক পুলিশ-পুলিশ নন। একটু নরম প্রকৃতির মুখ নিচু করেই বললেন, আপনি যা ভালো মনে করেন। যদি এক আঁটিতেই হয়, তবে তাই-ই করুন। কেস ডায়ারি তো আপনিই পাঠাবেন আমার কাছে।

এক্স-এম.পি বললেন, ফিশফিশ করে মনুকে, নাউ ড্যু সি ইন ইয়োর ওন আইজ, ওয়্যার আই রং ইন কলিং দেম অ্যানিম্যালস?

মনু ওঁর দিকে অনেকক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

কোনোই জবাব দিল না।

সার্কল ইন্‌স্পেকটার নন্দবাবু ঘড়ি দেখলেন।

বেলা পড়ে আসছিল নিমগাছের ছায়াটা একেবারে সোজা, ঋজু হয়ে পড়েছিল পথে, যখন রাজুরা আসে। আস্তে আস্তে ছায়াটা ঝুঁকতে আরম্ভ করেছে পুবে। লম্বা হতেও শুরু করেছে।

চাঁদবাবুও ঘড়ি দেখলেন।

বললেন, আর বেশিক্ষণ নেই স্যার। প্রায় সেরে এনেছি। আপনাকে এককাপ চা খাইয়ে, দিন থাকতে থাকতেই বিড়ু থানা থেকে রওনা করিয়ে দেব।

নন্দবাবু বললেন, চা তো আমি খাই না। আপনি তো জানেন।

তারপর বললেন, কাজ এগোন। হাত-চালান তাড়াতাড়ি।

অ্যাই বুড়ো। সেই বুড়োটা গেল কোথায়?

চাঁদবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন।

নন্দবাবু বললেন, ছেড়ে দিন ওকে। এনি উইটনেস উইল ড্যু। উইটনেসের ডিপোজিশানের উইটনেস তো! এনি ওয়ান প্রেজেন্ট হিয়ার ক্যান সাইন অ্যাজ উইটনেস।

ওকে স্যার!

বললেন চাঁদবাবু।

তারপর অন্য একজন লোককে ডেকে নিয়ে সই করিয়ে নিলেন সাইকেলের দোকানি আর ছেলেটির ডিপোজিশানে। ওদেরগুলো সই করানোর পর ডাক দিলেন সুরাই-এর বউকে। মেয়েটা যেন অনন্তকাল ধরে বসেই থাকত উবু হয়ে, কখন দারোগাবাবুর ডাক আসে তার প্রতীক্ষায়।

ডাক পড়তেই উবু-হয়ে বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে দারোগার সামনে এসে আবার উবু হয়ে বসল।

চান করেনি। বোধহয় খায়ও নি। নোংরা শাড়ি, একটা ভীষণ নোংরা শায়া বেরিয়ে আছে শাড়ির নিচে। চোখে এখন জল-টল নেই; কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে, একটু আগেও ছিল। দু হাঁটুর উপর থুতনি রেখে সুরাই-এর বউ, ডাম্বই যার নাম, আর অন্য নাম কুনকি, চাঁদ দারোগার মুখে তাকিয়েছিল।

নাম কী তোমার?

নাম বলল।

স্বামীর নাম কি? সুরাই?

দারোগাবাবু শুধোলেন।

হ্যাঁ। বলল ও। মুখ নিচু করেই।

তোমার বিয়ে হয়েছে?

মাথা নাড়ল ডাম্বই।

কবে?

ডাম্বই চুপ করে রইল।

হঠাৎই দু চোখে বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। কী কারণে এতক্ষণ সে-ধারা যে আটকে ছিল, মনুর বোধগম্য হল না।

দারোগাবাবু অত্যন্ত কনসিডারেশান দেখিয়ে বললেন, আরে কাঁদাকাঁদির কি আছে? যার যাবার সে তো গেছেই, আবার বিয়ে করে নিবি। দেশে, বরের অভাব কি রে মেয়ে? জোয়ান না পেলে, বুড়ো পাবি; পাবিই পাবি।

বলেই, হেসে সকলের দিকে তাকলেন।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন।

কিন্তু যারা জটলা করে দাঁড়িয়েছিল তারা কেউই হাসল না।

রাজুর মনে হচ্ছিল, এই গ্রাম থেকে, এই ডাম্বই-এর মুখ থেকে সুরাই-এর মায়ের মুখ থেকে, কে বা কারা যেন হাসিকে ডাকাতি করে নিয়ে চিরদিনের মতো পালিয়ে গেছে। হাসি যেটুকু আছে, তা শুধু আছে এক্স-এম.পির মুখে। সব সময়েই আছে। প্রলেপের মতো লেগে।

অন্য কেউ না-হাসলেও দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলরা হেসে উঠল দারোগার রসিকতা শুনে। কুতকুত করে। দারোগাকে খুশি করার জন্যে।

সংসারে স্নেহ, আর চাকরিতে হাসি, সততই নিম্নমুখী; ভাবল রাজু।

নন্দবাবু বললেন, প্লিজ প্রসিড। উই আর অলরেডি লেট।

দারোগা কোলের উপর ডায়ারি বিছিয়ে নিয়ে লিখতে লিখতে বললেন, হুঁ-উ-উ তাহলে মাত্র চারদিন হল বিয়ে হয়েছে তোর?

ডাম্বই থুতনিতে রাখা মুখটা এপাশ-ওপাশ করে জানাল, হ্যাঁ।

তোর মাথা নাড়া দেখে তো আমি কিছুই বুঝছি না রে। দু একটা কথাটথা বল।

গলাটা পরিষ্কার করে ডাম্বই বলল, হ্যাঁ।

কতই বা বয়স হবে মেয়েটির? বেশি হলে কুড়ি একুশ। মেরে কেটে বাইশ! ভাবছিল রাজু।

তারপরই দারোগাবাবু বললেন, তোকে এই চারদিনের মধ্যে সুরাই একদিনও করেছিল?

ডাম্বই অবাক বিস্ময়ে মুখটা তুলল জড়ো-করা দু-হাঁটুর উপর থেকে। তারপর ওই ভাবেই তাকিয়ে রইল দারোগার দিকে। ডাম্বইয়ের ডানপাশে তার শাশুড়ি, অমনিভাবেই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল শিকনি-পড়া বাচ্চা কোলে নিয়ে। তার মুখেও কোনো ভাবান্তর হল না প্রশ্ন শুনে।

হঠাৎ—প্রশ্নটার মানে, প্রথম বোঝেনি রাজু। অথবা মনুও। গ্রামের এতজন স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর সামনে কেউ যে সদ্য-বিধবা একটা মেয়েকে এমন প্রশ্ন করতে পারে, একথা বিশ্বাস করতেও সময় লাগছিল। বোধ হয়, সার্কল-ইন্‌স্পেকটার নন্দবাবুও অন্যমনস্ক ছিলেন। তিনিও নিশ্চয় খেয়াল করেননি।

দারোগাবাবুর প্রশ্ন শুনে, উধাও-হাসি গ্রামের হাসিটি এক্স-এম.পির মুখে আরও একটু উজ্জ্বল হল। প্রদীপ শিখার মতো কাঁপতে থাকল।

দারোগা চাঁদবাবু আবারও বললেন, কী হল? তোকে করলে তো আর অন্য মেয়ের জানার কথা নয়। আমারও জানার কথা নয়। চারদিন বিয়ে হয়েছে আর একদিনও করলি না? কী রে? শরীর খারাপ ছিল?

আঃ। সার্কল-ইন্‌স্পেকটার নন্দবাবু জোরে চেঁচিয়ে উঠে ইন্টারাপ্ট করলেন দারোগাকে।

রেগে বললেন, হাউ ডাজ ইট কনসার্ন ইউ? টু হোয়াট রেলেভেন্স...?

দারোগা লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না স্যার। ইন্টারকোর্স হলে, প্রেগন্যান্ট হতে পারে। কোর্টে হয়তো ডিফেন্ডেন্টের উকিল জজসায়েবের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিতে পারেন। তাই ফ্যাক্টটা রেকর্ড করে রাখছিলাম।

সার্কল-ইন্‌স্পেকটার রেগে বললেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট টু আস্ক দ্যাট গার্ল দ্যাট এমবারাসিং কোয়েশ্চেন ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ভারচুয়ালি দ্যা হোল ভিলেজ!... আই রিয়্যালি ডোন্ট নো...!

এক্স-এম.পিও বেশিরভাগ ইংরিজিতেই কথা বলছিলেন। প্রথমত, গ্রামের কেউই ওঁর কথা বুঝতে পারবে না। পরে, যা সত্যি-সত্যি বলেছিলেন, তার ঠিক উলটোটা বলেছেন বলে ওদের বোঝাতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এখন নিজের ইংরেজির চর্চা বিশেষ নেই। মরচে ধরে যাচ্ছে ইংরিজিতে। একটু ঝালিয়ে নেওয়াও হচ্ছে।

এক্স-এম.পি সার্কল-ইন্‌স্পেকটারকে বললেন, বাট আই লাইক দিস চ্যাপ। দিস ও. সি অফ ইয়োরস। হি নোজ হাউ টু ইন্টারোগেট অ্যান্ড হাউ টু ইনভেস্টিগেট আ কেস।

রাজুর মনে হল চাঁদবাবু এক্স-এম.পি-র সার্টিফিকেটের জন্যে লালায়িত নন। লোকটাকে হয়তো পছন্দও করেন না বিশেষ। চাঁদ দারোগা মানুষ খারাপ নন, তবে একটু ক্রুড। পুলিশের চাকরিতে নিলর্জ্জতা ও ক্রুডনেস একটা গুণ বিশেষ। যা কাজ ওঁদের, তাতে লজ্জা থাকলে, বেশি সফিস্টিকেশান থাকলে, কাজ করাই সম্ভব হত না। খারাপ মানুষ হওয়ার চেয়ে ক্রুড মানুষ হওয়া অনেক ভালো।

ভাবলু রাজু।

ডাম্বই ইংরিজি-টিংরিজি তো বোঝে না, তবে ওর সম্বন্ধেই যে আলোচনা হচ্ছে তা বুঝতে পেরে গুলি-খাওয়া হরিণীর চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকল। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকই ওড়িয়া জানে। যদিও ওদের সকলেরই আলাদা আলাদা ভাষা আছে। সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, মুর্মু, আরও কত কি।

দারোগা মেয়েটিকে বললেন, সকাল থেকে কি কি ঘটনা ঘটেছিল সব বল একে একে।

ডাম্বই নিচুস্বরে, খুব আস্তে আস্তে এমনভাবে বাক্যগুলোকে ভেঙে টুকরো করে করে, থেমে থেকে শব্দগুলো বলছিল, মনে হচ্ছিল ও যেন ওর জিভের হাতুড়ি দিয়ে একটা নিরেট দুঃস্বপ্নকে আস্তে আস্তে ভেঙে টুকরো করছিল।

ডাম্বই যা বলল, তা মোটামুটি ঘটনার বিবরণের সঙ্গে মিলল।

ডাম্বই-এর পর সুরাইয়ের মায়ের পালা।

সুরাইয়ের মা ওইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সব প্রশ্নের উত্তর দিল। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হল যে, মৃত্যু নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের ভদ্রলোকি শোক করার মতো অবসর বা অবকাশ তাদের কারোরই নেই।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হতেই সে বলল তাহলে ওই আঁটিগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি।

আঁটিগুলো পথের উপর পড়েই ছিল। সুরাইয়ের মা মুহূর্তে শিকনিপড়া বাচ্চাটাকে ডাম্বইয়ের কোলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে তিন-চার আঁটি রক্তমাখা ধান নিজের কাঁধে তুলে নিল। পিছন দিকে ধানের শীষ চুঁইয়ে টুপ টুপ করে রক্ত পড়তে লাগল পথের ধুলোয়

রাজু, মনুর হাতে হাত রাখল। নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ওরা।

এনকোয়ারি, ইনভেস্টিগেশান সব শেষ হল। এবার ওঠার পালা। রাজু ও মনু ওঁদের সঙ্গে জিপে উঠল। কনস্টেবলরা ভ্যানে।

এক্স.এম.পি হাত তুলে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন সকলকে।

নেতারা বড়ো সুন্দরভাবে নমস্কার করতে জানেন। নমস্কারের বিনম্র ভঙ্গিতে, সততা, সেবা এবং আত্মত্যাগের প্রতিশ্রুতি যেন ঝর্নার মতো, ঝরে ঝরে পড়ে। বড়ো সুন্দর লাগে দেখতে।

মনু ভাবছিল, নেতা হওয়া কি সোজা কথা! কত গুণ থাকলে, তবেই মানুষ নেতা হয়। এম.পি হয়। চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না—কে যেন বলেছিলেন?

বিবেকানন্দ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বিবেকানন্দই তো!

মনুর মনে পড়ে গেল বিবেকানন্দই তো বলেছিলেন যে, আমাকে পাঁচটি ছেলে দাও, সৎ, পবিত্র, যারা মরতে ভয় পায় না—আমি সারা দেশের চেহারা পালটে দেব। ঠিক এই কথা না হলেও এরকমই কিছু বলেছিলেন। পাঁচটি ছেলে!

মনু ভাবছিল, এত কোটির দেশে মাত্র পাঁচটি ছেলে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলে কোথায়? সবই তো রাজুদের মতো, মনুদের মতো। সুরাই যদি বেঁচে থাকত এবং বিবেকানন্দ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো সুরাই তার বেপরোয়া, স্বাধীনচেতা ও সাহসী স্বভাবের সেই পাঁচটির মধ্যে একটি ছেলে হতে পারত। কিন্তু আজকাল ওরকম ছেলেদের বাঁচতে দেওয়া হয় না। গ্রামে অথবা শহরে এক বা একাধিক অদৃশ্য এবং অতিদীর্ঘ প্রচণ্ড শক্তিশালী হাত তাদের গলা টিপে ধরে, তারপর শেষ করে দেয়। এখন সাহস; জীবনের, সমাজের; যে-কোনো ক্ষেত্রেই সাহস এবং সত্যবাদিতা এবং সততাও একটা ন্যক্কারজনক মূর্খামি বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে। নিঃস্বার্থ সাহসের সুন্দর সব নিষ্কলুষ পরিযায়ী পাখিরা ঝাঁক বেঁধে এক শীতে উড়ে গেছিল এ দেশ থেকে। ফিরে আসেনি। আর বোধ হয় ফিরবে না।

মনু, হঠাৎ ঘণ্টাখানেক থেকে বড়ো ডিপ্রেশান ফিল করছে। মাথায় রাগের পোকাগুলো এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাগ যখন ম্যালিগনান্ট টিউমারের মতো হয়ে ওঠে—তখন সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে থাকে বলে, সে যে আছে, তাই-ই বোঝা যায় না বোধহয় কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর যখন টিউমারটা বার্স্ট করে, তখন রক্ত, রক্ত; চারধারে রক্ত—নাক দিয়ে, কান দিয়ে, মুখ দিয়ে রক্তে রক্তে রক্তারক্তি হয়ে যায়।

জিপটা স্টার্ট করবে ড্রাইভার, এমন সময় সুরাইয়ের মা আবার দৌড়ে এসে চাঁদবাবুকে বলল, বাবু বাবু, যে-খেতে সুরাই ধান কাটছিল সেই খেতের ধানটা আমরা কাল সকালে কেটে নিতে পাবি তো?

সার্কল-ইন্সপেক্টার নন্দবাবু বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ। কেটে নিস।

এক্স-এম-পি বললেন, বাঃ, তা কী করে হয়? জমির মালিকানার প্রশ্ন নিয়ে গ্রামে মার্ডার হয়ে গেল। কোর্টে যে মামলা তুলবে সুরাইয়ের বিরোধীপক্ষ; কোর্ট থেকে সে প্রশ্নের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তার ধান কাটবে কি করে এরা? অন্য পক্ষও তো বলতে পারে যে, কাটব। আপনি কি চান এ নিয়ে আরও মার্ডার হোক?

নন্দবাবু একটু বিরক্তিমাখা গলায় বললেন, তাহলে কি কোর্টের ফয়সালা না হওয়া অবধি জমি পড়ে থাকবে? ধান ঝরে যাবে? হাতিতে খেয়ে যাবে?

বাঃ। তো কেন? এই গ্রামে কি মাতব্বর নেই? আমি আছি কী করতে? আমি সুরাইয়ের মা, বউ, ভাইয়ের বউ, বাপ দুনা এবং সুরা, হোড়িং, পাগা ইত্যাদিদের মা-বউদের দিয়ে ধান কাটিয়ে আমার গোলায় তুলে রাখব। যবে কোর্টে জমি কার সে প্রশ্নের ফয়সালা হবে, তখন যার জমি তাদের ওই পরিমাণ ধান মেপে ফেরত দেব আমার গোলা থেকে।

সুরাইয়ের মা, যার চোখে ছেলের মৃত্যুতে এক ফোঁটাও জল ছিল না সে কাঁধে ছেলের রক্তমাখা ধানের আঁটি নিয়ে, যে-আঁটিগুলো থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল তখনও টুপ টুপ করে মাটিতে, হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। চোখে একেবারে জলের বন্যা এল।

বলল, মরে যাব বাবু, একেবারেই মরে যাব।

নন্দবাবুর একটা পা জিপের বাইরের পাদানিতে রাখা ছিল—সেই জুতো-পরা পায়ের উপর বার বার মাথা ঠুকে সুরাইয়ের মা বলছিল, সুরাই তো বেঁচে গেছে মরে গিয়ে; আব আমরা, উঃ আমরা...

সার্কল-ইন্স্পেকটার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন।

এক্স-এম.পির একজোড়া চোখ বাঘের চোখের মতো সার্কল ইন্স্পেকটার নন্দবাবুর চোখের উপর স্থির হয়ে রইল।

নেতাদের চোখে সম্মোহনের ক্ষমতাও থাকে। এই প্রথম দেখল মনু। দুজনের কারও চোখেই পাতা পড়ল না প্রায় দীর্ঘ তিরিশ সেকেন্ড।

তারপর, যা অবধারিত, যা চিরদিনই ঘটে এসেছে এই দেশের গ্রামে গ্রামে, তাই ঘটল। বিচার হেরে গেল অবিচারের কাছে।

সার্কল ইন্স্পেকটার বললেন, ধান কেটো না কেউই।

ড্রাইভার জোরে জিপের অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। জিপের চাকায় লাল ধুলোর মেঘ উড়ল। আব সেই মেঘের মধ্যে সুরাইয়ের মা, ছেলের রক্তমাখা ধানের আঁটি কাঁধে কাঁদতে কাঁদতে চুল উড়িয়ে, আঁচল উড়িয়ে, ঝুলে-পড়া শুকনো স্তন দুলিয়ে জিপের পিছনে পিছনে দৌড়ে এল কিছুটা। তারপর পথের উপরই পড়ে গেল।

রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে এসে, মনু পিছন ফিরে দেখল, জিপের চাকায়-ওড়া লাল-ধুলো পরতে পরতে উড়ে গিয়ে থিতু হয়ে বসেছে লাল ধানের খেতে খেতে। পশ্চিমাকাশে বিদায়ী সূর্যের লাল ধুলোর লাল আর পাকা ধানের লাল সুরাইয়ের রক্তের লালের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে।

রাজু বলল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম চাটুজ্যে কোথায় যেন লিখে ছিলেন রে, 'আইন? সে তো তামাশা মাত্র! বড়োলোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিতে পারে।'

মনু বলল, ঠিক মনে নেই। বোধ হয় কমলাকান্তের দপ্তরে।

সার্কল ইন্স্পেকটার নন্দবাবু চুপ করে বসেছিলেন। নিথর; অনড়। জিজ্ঞেস করলেন, বঙ্কিমবাবু কত বছর আগে একথা লিখেছিলেন?

রাজু বলল, অনেকদিন আগে। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুই কতবছর হয়ে গেল! কিন্তু, দিন কিছুই বদলায়নি।

নাঃ। কিছুই বদলায়নি। নন্দবাবু বললেন।

তারপর মাথার টুপিটা খুলে কোলের উপর রেখে স্বগতোক্তির মতো বললেন, মাঝে মাঝে মনে হয়, চাকরি ছেড়ে দিই। কিন্তু খাব কি? ভালো লাগে না।

বিড়ুগ্রাম ছাড়িয়ে পিচ রাস্তায় আসতে আসতে সন্ধে হয়ে গেল। একটু এগোতেই গুড়ুংগিরির ঘাটি থেকে নেমে একদল হাতি রাস্তা পেরুচ্ছে দেখা গেল।

জিপটা নিরাপদ দূরত্বে থাকতেই থামিয়ে দিল ড্রাইভার। হাতিগুলো রাস্তা পার হয়ে বাঁ দিকের ধানখেতের দিকে নেমে গেল।

চাঁদবাবু বললেন, যাক আপনাদের হাতি দেখা হয়ে গেল। কলকাতা থেকে, রাউরকেল্লা থেকে, ওয়াইল্ড লাইফে ইন্টারেস্টেড সব বড়ো ঘরের বাবু-বিবিরা হাতি দেখতে আসেন প্রায়ই। না-দেখতে পেলে কী আপসোসই না করেন! বড়ো বড়ো শহরের লোকদের ব্যাপারই আলাদা। আমরা হাতিকে ভয় পাই; ওঁরা ভালোবাসেন।

বলেই, বললেন, আচ্ছা, শুনেছি কলকাতায় নাকি একটা অ্যানিম্যালস লাভার্স সোসাইটি আছে?

সত্যি?

রাজু অস্ফুটে বলল, আছে।

চাঁদবাবু বললেন, বড়ো শহরের লোকদের বুকের দরদই আলাদা। পথের কুকুরের শোকেও তাঁদের চোখে জল আসে। তারপরই বললেন, কখনও যাইনি কলকাতা। একবার যাবার ইচ্ছে আছে।

মনু বোধ হয় চাঁদবাবুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। ও জিজ্ঞেস করল, একটা হাতি এক রাতে কত ধান খায়?

চাঁদবাবু বললেন, কে জানে? এক এক রাতে খেত-কে-খেত সাবড়ে দেয়। চার পেয়ে, দুপেয়ে কতরকমের হাতিই আছে এই সব গ্রামে-গঞ্জে, জঙ্গল-পাহাড়ে। কত ধান কে খায় তার হিসাব আর কে করেছে বলুন। আমরা সব হাতিদেরই এড়িয়ে চলি।

কয়েকদিন থাকবে বলেই তো এসেছিল ওরা। জায়গাটা বড়ো ভালোও লেগে গেছিল। কিন্তু সব কেমন তেতো হয়ে গেল। আচমকা ঘুষি খেয়ে মুখের মধ্যে দাঁত ভেঙে গেলে, রক্ত জমে যায় যখন, যখন কথা বলা যায় না, জিভ রক্তে জড়িয়ে যায়; তেমনি এক অদ্ভুত অসাড়তা বোধ করছিল মনু। কথা বলতে পারছিল না।

রাজু বলল, সকালের বাসটা কখন ছাড়ে?

ভোর ছটায়। একেবারে কাঁটায় কাঁটায়!

আমরা কাল ভোরে উঠেই চলে যাব ভাবছি।

কালই যাবেন? থাকুন না দিন কয়েক। এখানের জল খুব ভালো। মুরগি খুব শস্তা। আর এখানের চাল বড়ো মিষ্টি, বলেইছি তো। খেলেনও তো আপনারা দুপুরে। থেকে যান কটা দিন! আপনাদের মতো শিক্ষিত, কালচার্ড, লেখক-টেখক তো এখানে আসেন না। থাকলে, আমাদের খুব ভালো লাগত। তাসটাস খেলা যেত।

অন্যমনস্ক গলায় রাজু বলল, দেখি...কী করি...

থানায় নেমে ওরা বাইরে কাঠের চেয়ারে বসল। সামনে একটা কাঠের টেবল। চাঁদবাবু তাড়াতাড়ি করতে বললেন একজন কনস্টেবলকে। নন্দবাবু এখুনি চলে যাবেন তাঁর হেড-কোয়ার্টার্সে।

চাঁদবাবু একজনকে বললেন, অ্যাকিউজডদের একবার নিয়ে আয়। বড়ো সাহেব দেখে যান।

এখানে কয়েদঘর আছে? রাজু শুধোল।

কয়েদঘর? ফুঃ।

এখানে থাকার ঘরই নেই। থানা! নামেই থানা। আসলে এটা কনস্টেবলদের কোয়ার্টার। চুরি ডাকাতি-স্মাগলিংয়ের জায়গা বলে পিচ রাস্তায় যে চেক-পোস্ট আছে তারই দেখাশোনার সুবিধের জন্য এখানে থানা করা হয়েছে। একটা জিপ পর্যন্ত নেই ও সি-র। মোটরসাইকেলও নেই। সাইকেল নিয়েই ঘোরাঘুরি করি। তেমন বিশেষ দরকার হলে কারও মোটরসাইকেলের পেছনে চড়ে যাই। একজনের মোটরসাইকেল আছে এখানে। উড বি এম.এল.এ তিনি। তাঁর শরণাপন্ন হতে হয়

ময়নাতদন্তের পর সুরাইয়ের লাশ কি গ্রামে নিয়ে যাবে সুরাইয়ের ভাই?

রাজু জিজ্ঞেস করল।

কি করে? লাশ-কাটা ঘরে ময়না তদন্ত শেষ হতে হতে তো কাল বিকেল হয়ে যাবে। লাশ বয়ে নিয়ে গোরুরগাড়ি পৌঁছোবেই হয়তো আজ রাতে। কম পথ তো নয়। ডাক্তার থাকবেন কিনা তারও ঠিক নেই। কালকে রবিবার। হয়তো শ্বশুরবাড়ি যাবেন রাউরকেল্লাতে। তাহলে তো পরশু হয়ে যাবে। তাছাড়া, কাটা-ছেঁড়া, ফোলা-ফাঁপা দুর্গন্ধ লাশ যখন ফেরত পাবে ও, তখন আর জুরুয়াতে নিয়ে আসার অবস্থা থাকবে না। ওখানেই কোন নদীর পাড়ে জ্বালিয়ে দেবে। তারপর ফিরে যাবে গ্রামে। গরিবের লাশ। ওরা কি আর ফুলের পাহাড় করে পয়সা ছিটিয়ে প্রোসেশান করে শ্মশানে যায়? জন্মায় ইঁদুরের মতো, মরেও ইঁদুরের মতো।

দুজন কনস্টেবল রাইফেল নিয়ে দাঁড়াল দুপাশে। এবার অভিযুক্ত সাতজন আসবে।

রাজু বলল, ওরা কিছু খেয়েছে সকাল থেকে?

কী আবার খাবে? বাড়িতে কি রোজ পোলাও মাংস খায়, না শ্বশুরবাড়ি এসেছে! সকালে পোকাল তো নিশ্চয়ই খেয়েছিল। তারপর হাঁড়িয়া। হাঁড়িয়া খেয়ে নিজেদের বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে তবে না ভাইকে মেরেছে। রাগে মাথায় মারে, তাও বোঝা যায়। এ তো ডেলিবারেট, প্ল্যানড মার্ডার।

থানায় ওদের কিছু খেতে দেওয়া হয়নি?

হবে হবে। তা নিয়ে আপনাদের চিন্তা নেই।

রাজু বলল, আমি গিয়ে ওদের দেখতে পারি একটু। কখনও মার্ডার দেখিনি। মার্ডারারও না। কেমনভাবে থাকে ওরা থানাতে একটু দেখতাম!

চাঁদবাবু হাসলেন।

বললেন, দেখবেন তো। এখানেই আসছে ওরা। তারপর অ্যাপোলজিটিক্যালি বললেন, এখানে তো হাজত নেই। একটা ছোটো ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ অবস্থায় সাতজন সকাল থেকে আছে, হেগে-মুতে একশা করে রেখেছে—দুর্গন্ধে কাছে যেতে পারবেন না। বমিও করেছে দুজনে। রক্ত দেখে বমি করেছে। শালাদের ন্যাকামি দেখে গা জ্বলে। খুনই বা করা কেন? আবার যাকে খুন করলি, তার রক্ত দেখে বমিই বা করা কেন? সুরা তো খালি বলছে, এ আমরা কী করলাম! নিজের ভাইকে এমন করে কুপিয়ে কাটলাম! পাগলের মতো করছে ওরা।

বলতে বলতেই ওরা সাতজন এসে লাইন করে দাঁড়াল।

রাজু ভেবেছিল, মার্ডারার মানে, ভীষণ-দর্শন গোঁফওয়ালা লাল লাল চোখের কতগুলো ডাকাতকে দেখবে। কিন্তু তাদের সামনে যারা এসে খালি গায়ে ছিটের আন্ডারওয়ার পরা অবস্থায় দাঁড়াল, তাদের হাড়-জিরজিরে চেহারা, পেট ঢুকে গেছে পিঠের মধ্যে—চোখেমুখে উদভ্রান্ত, দিশেহারা ভাব।

মনু ওদের দিকে চেয়ে বলল, তোমরা খুন করলে কেন ভাই সুরাইকে? সুরাই তো তোমাদেরই...

সুরা, যে প্রধান আসামী; সে দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

মনে হল, এই মুখ ওর কাউকে আর দেখানোর ইচ্ছা নেই। সে সবচেয়ে আগে এসে ধরা দিয়েছিল। খুনের খবরও তো দারোগা ওর কাছেই প্রথম পান।

অন্য একজন বলল, আমরা নই, আমরা নই হাঁড়িয়ার নেশা... আর অন্য একজন...আমরা কী করলাম আমরা জানি না।

মনু সোজা হয়ে বসে দারোগাকে বলল, মনে হচ্ছে, ওরা কিছু বলতে চাইছে, যেন বলতে চাইছে; ওদের দিয়ে কাজটা করানো হয়েছে—ওদের উত্তেজিত করেছিল অন্য কেউ...

সার্কল ইন্‌স্পেকটার মুখ নামিয়ে বসেছিলেন।

হঠাৎ বললেন, ওদের ভিতরে নিয়ে যাও। যত্ত সব উলটো-পালটা কথা! নিজে হাতে খুন করে এসে এখন...

রাজু বলল, আপনাদের কি উচিত নয়, যে-লোকের হাত এই মার্ডারের পেছনে আছে, তাকে সামনে আনা। মার্ডার অ্যাবেট করাও তো মার্ডারের মতোই অপরাধ!

চাঁদবাবু হাসলেন, বললেন, চা খান। এখানের দুধ খুব ভালো। চা দারুণ হয়। আপনি দেখছি, ইন্ডিয়ান পেনাল কোডও জানেন।

রাজু আবার বলল, আমি কিছু টাকা দিতে পারি ওদের? একটু চা-টা খাওয়ানোর জন্যে?

সার্কল ইন্সপেক্টরের চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

বললেন, না। পারেন না। আইন নেই। আপনারা বড়ো শহরের লোক। গরিবদের জন্যে আপনাদের খুবই দরদ। থ্যাংক ট্যু। ইটস ভেরী কাইন্ড অফ ট্যু।

এবার আমরা উঠি। বাংলোয় গিয়ে চান-টান করি।

হঠাৎই উঠে পড়ে চাঁদবাবু বললেন, হ্যাঁ! এবারে আপনারা আসুন। আমাদের রিপোর্ট টিপোর্ট তৈরি করতে হবে। আপনাদের সারাদিনটা নষ্টই হল বলতে গেলে।

রাজু উঁকি মেরে দেখল, টেবলের উপর খোলা আছে কেস ডায়ারির খাতা।

Schedule XL VII–form no. 120 Pm form no. 8

CASE DIARY

(Rule 104) 32

Police Station................ District...................First Information Report no...................of 19................ Case diary no................Sec..................no........
Date and Place of occurance...
Date (with hour) on Record of Investigation Which action was taken and place visited.

রাজু জানে যে, ওরা চলে গেলেই কেস-ডায়ারির খাতা ভরে উঠবে অনেক ইংরিজি শব্দে। তাতে লেখা হবে, সাতজন সাংঘাতিক চরিত্রের খুনি এক গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে, সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সজ্ঞানে এবং ঠান্ডা মাথায় সুরাই নামক একজন লোককে ধানকাটা এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধে নৃশংসভাবে খুন করেছে। অতএব, এই সাংঘাতিক ও বিপদজ্জনক অভিযুক্তদের যেন কিছুতেই জামিনে খালাস না করা হয়। বিচারাধীন বন্দি হিসেবে ওদের যেন পুলিশের হেফাজতেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে অন্তত তিন মাস রাখা হয় দায়রায় সোপর্দর আগে, ইত্যাদি...

এমন সময় লাল ধুলো উড়িয়ে ভটর ভটর শব্দ করে একটা লাল রঙের মোটর সাইকেল এসে

থামল থানার সামনে। মুখে বসন্তের দাগ, অতি কুৎসিত একজন কুচকুচে কালো মোষের মতো লোক ধবধবে ধুতি আর শার্ট পরে মোটর সাইকেলের চাবি হাতে করে এলেন।

চাঁদবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, ইনিই সেই উড বি এম.এল.এ। যাঁর কথা বলছিলাম।

উড বি এম.এল.এ বললেন, খবর সব শুনেই এলাম। জুরুয়ার মুরব্বি তো ভারি বুদ্ধিমান। এখন বিনা পয়সায় খুনি আর অভিযুক্তদের সকলের মেয়ে-বউমাকে দিয়ে নিজের খেতে কয়েক বছর কাজ করিয়ে নেবে--প্রায় নিখরচায়। একবেলা পোকাল দেবে হয়তো খেতে। আর মেয়ে-বউদের মধ্যে যার ডাগর, তাদের মধ্যে পছন্দসই কাউকে কাউকে নিয়ে শোবেও। বেড়ে আছে তোমাদের জুরুয়ার বাঘ।

এতখানি বলে যাবার পরই, রাজু আর মনুর দিকে চোখ পড়াতে থেমে গিয়ে বললেন, এঁদের পরিচয় তো পেলাম না!

এঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন। আমাদের সঙ্গে গেছিলেন জুরুয়াতে।

উড বি.এম.এল.এ বললেন, অ!

তারপর বললেন, খবর পেলাম যে, জুরুয়ার মাতব্বর ওদের জামিনের জন্যে চেষ্টা করার জন্যে চেষ্টা করার জন্যে কালই যাবে সদরে।

সার্কল ইন্‌স্পেকটার বললেন, এই কেসে কখনও জামিন হয়? মেইন মার্ডারাররা নিজেরা সারেন্ডার করেছে এসে। কনফেস করেছে। প্রত্যেকেরই ফাঁসি, না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে। এই কেসে, বেল হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আপনি কীসের পুলিশ-অফিসার মশাই! এ কথা কি সেই মাতব্বর নিজেও জানেন না?

ধমক দিয়ে বললেন উড বি এম. এল. এ।

তারপর বললেন, জামিন করাবার চেষ্টা একটা চাল মাত্র। ওই লোকগুলোর বউ-মা-মেয়েদের যতটুকু সামান্য জমি আছে তাও জলের দামে নিজের কাছে বিক্রি করিয়ে, দুধেল গাই, জবরদস্ত ষাঁড় সবকিছু হাতবদল করে নিয়ে সেই টাকা নিয়ে মাতব্বর জামিনের নাম করে শহরে যাবে। মদ খাবে, মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করবে। তারপর ফিরে এসে গম্ভীর মুখে বলবে যে, অনেকই চেষ্টা করল; কিন্তু কিছুই করা গেল না।

ইসস...বলে উঠল রাজু অনবধানে।

চাঁদসাহেব বললেন, আপনারা উঠবেন না? এরপর চান করলে জ্বর ধববে যে। ঠান্ডা পড়েছে বেশ।

হঠাৎই মনুর, খালিগায়ে ছিটের আন্ডারওয়ার-পরা লোকগুলোর কথা মনে হল। খোলা গাড়িতে করে পাহাড় জঙ্গলের হাওয়ার মধ্যে ওরা আজ রাতেই যাবে অনেক মাইল দূরে সদরের থানায়।

ওরা এবার উঠল। কারণ, ওরা আরও বেশিক্ষণ থাকলে সকলের পক্ষেই অস্বস্তির কারণ হবে।

রাজু ও মনু নমস্কার করে বাংলোর দিকে চলল।

রাজু শুধোল মনুকে, এই উড বি এম.এল.এ কোন পার্টির?

কে জানে? ছাড় তো ওদের কথা।

বিরক্তিভরা গলায় বলল রাজু।

অনেকটা গিয়ে রাজু বলল, মনু, ছেলেবেলায় 'আংকল টমস কেবিন' পড়েছিলি?

হুঁ।

তাহলে পড়েছিলি!

হুঁ।

ওরা কেউ আর কোনো কথা বলল না। প্রায়ান্ধকার পথে হাঁটতে লাগল।

পাঁচ

দুজনেরই চান হয়ে গেছিল। বারান্দায় বসেছিল ওরা। চাঁদটা উঠছে, তবে এখনও পরিষ্কার হয়নি আলো। তিনদিকের কাছিমপেঠা ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলোকে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসোরাস বলে মনে হচ্ছে।

প্রাগৈতিহাসিক?

হ্যাঁ। সম্পূর্ণই প্রাগৈতিহাসিক!

এই আসল, গ্রামীণ; গরিব ভারতবর্ষ এখনও প্রাগৈতিহাসিক যুগেই রয়ে গেছে। আমেরিকার তুলোর চাষের কৃষ্ণাঙ্গ দাসেদের মতো, বাংলোর নীলকুঠির অত্যাচারিত চাষিদেরই মতো, যারা ভারতবর্ষের নিরানব্বই ভাগ, যারা জাতের মেরুদণ্ড, গ্রাম পাহাড় জঙ্গলের এই সরল, সিধে-সাদা, বড়ো ভালো, রক্ষকহীন মানুষগুলোর জীবনে ইতিহাস থেমেই আছে। কে জানে? আরও কতদিন থেকে থাকবে?

চাঁদের আলো আস্তে আস্তে জোর হচ্ছে।

কী বলবে ভেবে না পেয়ে মনু বলল, রাম কিন্তু আছে। একটু খাবি নাকি?

দুসস...স কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

চৌকিদার এসে বলল, চেকপোস্টের পাশের হোটেলে ডিমের ঝোল আর ভাতের অর্ডার করে এসেছে ও।

ভাত? মনু অস্ফুটে বলল।

ভাত কথাটা উচ্চারণ করতে, কানে শুনতেও কেমন অপরাধী অপরাধী মনে হল।

হ্যাঁ বাবু। এখানের ভাত খেতে কোথা-কোথা থেকে লোকে আসে। এখানের ধান যে বড়ো মিষ্টি!

আমি ভাত খাব না। কিছুই খাব না। খিদে নেই।

তারপর রাজুকে বলল, তুই? তুই খা! আমার সঙ্গে তোর কি?

নাঃ। আমিও খাব না।

ভাত না খাস, তো অন্য কিছু খা তুই।

চৌকিদার অবাক হল। বলল, তাহলে কী খাবেন?

আমরা কিছুই খাব না। ওরা দুজনেই সমস্বরে বলল।

আমাদের জন্যে একটু চা নিয়ে এসো তো। একেবারে গরম।

তাহলে কী হবে? খাওয়ার যে অর্ডার করে দিয়েছি। পয়সা নেবে যে! চৌকিদার বলল।

তা হোক। পয়সা না হয় দিয়ে দেব আমরা। তুমি খেয়ে নিয়ো।

তাহলে তাড়াতাড়ি যাই বাবু। এখুনি হাতি নামবে। ধান পাকার সময় এখন—হাতিরাও এই মিষ্টি ধানের খোঁজ রাখে। কত দূর দূর পাহাড় থেকে আসে ওরা। পানিপাঁই রেঞ্জ, গুরংগিরির ঘাটি থেকে। শুনছেন না? হুঃ হাঃ হুঃ হাঃ আরম্ভ হয়ে গেছে চারিদিকে।

হুঃ হাঃ টা কী ব্যাপার?

রাজু শুধোল।

হাতি তাড়ানোর জন্যে খেতে খেতে চাষিরা শব্দ করছে, মাচানে বসে।

হুঃ হাঃ হুঃ হাঃ করলেই হাতিরা কি চলে যায় ধান না-খেয়ে?

বুড়ো চৌকিদার ফোকলা দাঁতে হাসল।

বলল, হাতি কি যায়? এক একটা হাতির পেটে কত ধরে জানেন? এক একটা ধানের গোলা পুরো একা খেয়েও সাধ মেটে না যেন ওদের। হাতি শুধু খায়ই না, হাতি খায়, তছনছ করে, মাচান

ভেঙে ফেলে। কখনো সখনো বিরক্ত হলে, ওদের স্বার্থে লাগলে, লোকও মেরে ফেলে। হুঃ-হাঃ করা খেত-জাগানিদের কাজ, তাইই করে। হাতির কাজ ধান খাওয়া, হাতি ধান খায়; খেয়েই যায়, হাতিদের কোনো লাজ-লজ্জা ভয়-ডর কিছুই নেই বাবু।

রাজু অন্যমনস্ক বলল, তাইই...

তারপর বলল, তাহলে তুমি যাও, দেরি করো না আর...

চাঁদের আলোয় পাহাড়শ্রেণি, পাহাড়তলি, উপত্যকা এবং যা-কিছু দৃশ্যমান সবই কানায় কানায় জোয়ারের জলের মতো ভরে উঠছে আস্তে আস্তে। চারদিক কেমন অপার্থিব দেখাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে আছে বলে বিশ্বাসই হচ্ছে না রাজুর।

চারদিক থেকে হঠাৎ হুঃ হাঃ, হুঃ হাঃ, হুঃ হাঃ শব্দে থমথমে নির্জন পাহাড়ি পরিবেশ চমকে ওঠে। ক্রমশ জোর হতে লাগল শব্দগুলো। একটা একটা টি টি পাখি একা একা চমকে চমকে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

রাজু জিজ্ঞেস করল, কী পাখি রে ওটা? কী অদ্ভুত ডাক!

মনু বলল, ঢেনকানলের জঙ্গলে দেখেছিলাম ছেলেবেলায়। ওদের নাম, ডিড উ্য ডু ইট।

কী বললি?

বলেই, রাজু সোজা হয়ে উঠে বসল।

বললামই তো। ডিড উ্য ডু ইট।

মনু কেটে কেটে নামটা উচ্চারণ করতে চাইল, অথচ কেবলই জিভটা জড়িয়ে আসতে লাগল।

রাজুর মস্তিষ্কের কোষে কোষে একলা, ভীত, চকিত পাখির ডাকটা ক্রমশই জোর হতে থাকল। জোর হতে হতে ওর মাথার মধ্যে স্টিরিয়োফোনিক শব্দের মতো বাজতে লাগল। কে যেন একটা দ্রুতগতি শব্দের মারাত্মাক সাপকে তার মস্তিষ্কের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে বলে মনে হল ওর—শব্দটাকে থামাতে চাইল, ধামাচাপা দিতে চাইল, গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইল রাজু; কিন্তু শব্দটা, শব্দটা...

পাখিটা ডাকতে ডাকতে ওদের একেবারে সামনে, বাংলোর হাতার উপর চলে এসে ক্রমাগতই ঘুরতে লাগল। লম্বা লম্বা পা-দুটো বিচ্ছিরিভাবে ঝুলতে ঝুলতে দুলতে থাকল তার শরীরের নীচে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

পাখিটা, মনুকে, রাজুকে এবং যেন এই বিরাট দেশের সমস্ত শিক্ষিত, সুখী, আত্মবিস্মৃত, কাপুরুষ ঘুমন্ত মানুষদের বুকের মধ্যে একটা দারুণ শীতার্ত, গা-ছমছম সুরার রক্তে-ভেজা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে লাগল বারবার তপ্ত তীরের মতো,...

২

দুর্গাপুরের ডি.ভি.সি ব্যারাজ জল ছেড়েছে জোর আজ সকাল থেকে। কাল বিকেলে লাল ফ্ল্যাগ তুলে দিয়েছিল উয়্যার-এর উপরে। তোড়ে নেমেছে, লাল ঘোলা জল দামোদরের বুক বেয়ে। দ্বিজপদ ও কেদার নীলরঙা নাইলনের বাঁধ-জালটা চরের বুকের ছড়িয়ে দিয়েছে শুকুবার জন্যে। আজ বুঝি আর জাল ফেলা যাবে না। রোজগারপাতি হবে না কিছুই।

অ্যানিকাটের সামনে একটা চোরা ঘূর্ণি আছে। গত বছর ওপারের বেলোমা গাঁ থেকে দুটো ছেলে ধান নিয়ে আসছিল চাকতেঁতুলের ধানভাঙা কলে ভাঙবে বলে। হঠাৎ এই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে নৌকোসুদ্ধ তলিয়ে যায়। তারপর থেকেই ওই জায়গাটা বাঁচিয়ে চলে জেলেরা।

গামছা-পরা উদলা-গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো পোলো আর খ্যাপলা জাল নিয়ে অ্যানিকাটের ঠিক নীচে যেখানে কংক্রিটের বেঁটে বেঁটে থামগুলো আছে জলের তোড় রোখার জন্য, সেখানে অন্যান্য দিন ঝাঁপাঝাঁপি করে বেড়ায়। কখনও সোনাট্যাংরা, চিংড়ি বা বাটা পেলেও পায়। কিন্তু আজ নদীর চেহারা দেখে তারাও আর এমুখো হয়নি; রোড্ডিয়ার মোরাম-ঢালা পথে মেহগনি গাছগুলোর নীচে দল বেঁধে ডাংগুলি খেলছে।

পরেশ গুপ্তের দেশ ছিল উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে। গোলাপজলের নামি জায়গা। হলে কী হয়, গত তিরিশ বছর সে পশ্চিমবঙ্গে এই পানাগড়-বর্ধমান রোড্ডিয়ার আশেপাশেই। খড়ে-ছাওড়া ঘর বানিয়েছে একটা ক্যানালের বাঁধের পাশে। চা-সিগারেট বিক্রি করে। মাছ কেনে, জেলেদের কাছ থেকে—কিছু লাভ করে, ছেড়ে দেয় শহর থেকে গাড়ি-চড়ে আসা বাবুদের কাছে। ভালো দামেই বিকোয় মাছ। শহরের দামেই প্রায় বলতে গেলে। যেহেতু আড়, চিতল, কালবোসগুলো নড়াচড়া করে; বাবুরা চেগে যান।

বলেন, টাটকা তো! শহরে যে মাছ পাই, তা তো বরফচাপা।

আজকাল টাটকা মাছেও গন্ধ হয়। কোক ওভেনের জল মেশে দামোদরে। নদীর জলে গন্ধ, মাছে গন্ধ। কত্ত সব কলকারখানা হয়ে গেছে নদীর উত্তরে। জলে হরজাই বিষ পড়ে। গরমের সময় বা শেষ শীতে, জল কমে গেলে, মাছ সব বিষে মরে গিয়ে ভেসে ওঠে। বড়ো বড়ো রুপোলি চিতল—ল্যাজে হলুদ-কালো বুটি দেওয়া। দেখলেও চোখে জল আসে। রোদ পোয়াতে পোয়াতে নদীর বুক বেয়ে, ফুলে ওঠা মরা মাছগুলো তখন ভেসে যায় দক্ষিণের চরের শেয়ালদের খোরাক হয়ে। শালা শেয়ালদের খাটা-খাটনি নেই। দিব্যি আছে। মাছ খাচ্ছে, গান গাইছে; বাচ্চা বিয়োচ্ছে।

পরেশ বসে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। দোকানে খরিদ্দার নেই। একটু আগে রোড্ডিয়ার বাংলো থেকে মাছ কিনতে এসে মাছ না-পেয়ে এক বাবু কিছুক্ষণ বসেছিলেন। চা চেয়েছিলেন। সঙ্গে দুটো লেড়ো বিস্কুট। বলেছিলেন, ছেলেবেলায় লংকার গুঁড়ো-মাখা লাল লাল ঝাল লেড়ো পাওয়া যেত। এখন ছেলেবেলারই মতো ছেলেবেলার সব ভালোলাগার জিনিসগুলোও হারিয়ে গেছে একেবারে।

পরেশ বলেছিল, সত্যি কথা। সব কিছু ভালো জিনিসই হারিয়ে গেছে দুনিয়া থেকে। তারপর দূরের টিপকলের জল এনে চা করে দিয়েছিল বাবুকে। নদীর জলেও গন্ধ। মরার কোক-ওভেন এদের সকলকে মেরে তবে ছাড়বে।

চা খেয়ে, বাবু চারধারের ছিনিক-বিউটির তারিফ করে চলে গেছে।

পরেশের কালো-ভুটিয়া কুকুরি লক্ষ্মী খড়ের চালার বাইরে ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল নদীর হাওয়ায়। ক-দিন থেকে রোদ নেই। মেঘ করে আছে সব সময়। কখনও বাড়ে, কখনও কমে বৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে। বেশ হিমহিম ভাব। নদীর হুহু হাওয়ায় ঘুম আসে। লক্ষ্মী আরামে ঘুমোয় মেঘের ছাতার নীচে।

হঠাৎ ভুক-ভুক করে ওঠে লক্ষ্মী। পরেশ চোখ তুলে তাকায়। বিড়িটাতে শেষ টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে। সনাতন আসছে। সনাতন আঁকুড়া।

ছেলেটাকে এড়িয়ে চলতে চায় পরেশ, কিন্তু ভালোবাসার ভান করে।

সনাতন প্রায় ছ-ফিটের মতন লম্বা। কালবোসের মতো গায়ের রং। কিন্তু তাতে পানকৌড়ির জেল্লা। চ্যাটালো বুক। বুকে কোনো ভাঁজ নেই। অথচ চওড়া বিরাট। কাঁধ থেকে মাথাকে তফাত করেছে একটা লম্বা গলা। শীতের নদীতে উড়ে-আসা বিদেশি হাঁসের গলার মতো। পরনে লুঙি, গায়ে গেঞ্জির উপর পাঞ্জাবি।

পার্টি করে সনাতন। এবারে এদিকে পঞ্চায়েত ইলেকশনে কমোনিস্টোরাই ছিট নিয়েছে সবচেয়ে বেশি।

পরেশ ভাবে, সনাতন ছেলে ভালো। রাগি একটু বটেক—তবে সোজা। পরেশ ওকে ভয় পায়, কারণ পরেশ ব্যাবসাদার। মুনাফা উঠিয়ে, ও খায়। যদিও ও ভোট দেয় বাবুদেরই। তাতে সনাতনের খুশি হওয়ারই কথা। পার্টি-করা ছোঁড়ারা অনেকেই নিজের নিজের ধান্দায় সকলকে চোখ রাঙিয়ে বেড়ায়। এর টুপি ওকে পরায়। কিন্তু সনাতন অন্যরকম। এরকম ছেলে যে দলই পাবে, সে দলের মান প্রতিপত্তি বাড়বে বলেই পরেশের বিশ্বাস।

এখন সনাতনও মাছের কেনা-বেচা করে একটু-আধটু। এর আগে ও পানাগড়ের মিলিটারি ক্যাম্পে একজন এম.ই.এস-এর ঠিকাদারের কাছে রাজমিস্ত্রির কাজ করত। তখন পেত, দিনে আট টাকা। ওখানে টিকে থাকলে, আরও বেশিই পেত আজকে। সেই বাবু একদিন মাছ কিনতে এসে বলে গেল, এখন মিস্ত্রিরা নাকি দিনে চোদ্দো টাকা পাচ্ছে।

সনাতনের লোভ নেই টাকার। পেট চললেই হল কোনোক্রমে। টাকা রোজগারের চেয়েও বড়ো কিছু করার আছে ওর। মা-বাবা হারানো আত্মীয়-স্বজনহীন সনাতন অনেক কিছুই ভাবে। সব অন্য রকম ভাবনা।

সনাতন পরেশের দোকানে ঢুকল। ঢুকে, মাচায় বসল।

কেউ কোনো কথা বলল না। মাচা থেকে খাতাটা তুলে নিল সনাতন। খাতায় মাছের হিসেব দেখল। তারপর খাতাটা নামিয়ে রাখল।

পরেশ বলল, চা হবে নাকি?

সনাতন বলল, তুমি খাবে তো হোক।

আমি ও এই-ই খেনু।

তালে থাক।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। বাইরে লক্ষ্মী খচ খচ করে নখ দিয়ে গা চুলকাচ্ছে, তার শব্দ কানে এল। মেছো-চিলের তীক্ষ্ণ স্বর জলের উপর দুবার কেঁপেই স্থির হয়ে গেল।

পরেশ বলল, পালা এগোল কদ্দুর?

সনাতন খুশি হল। হেসে ফেলল।

বলল, দুর—র। সবে ভূমিকেটা হল। এখুনি কী। ই সব তাড়ার কাজ লয় গো।

ভূমিকে, হল কেমন? পরেশ একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে শুধোল। যেন পালাটালাতে পরেশের বড়োই উৎসাহ।

সনাতন বলল, ভূমিকার আর ভালোমন্দর কী? আসল পালাতে আসি আগে। অনেক সময় লাগবে। এমন পালা আগে লেখা হয় লাই। এ দেশে কেউ লেখে লাই।

পরেশ সনাতনকে খুশি করার জন্যে বলল, তা তো বটেই। পালা লেখা কী ইয়ার্কি-কথা। তো তাড়াতাড়ি শেষ করলে এখানে সামনের পুজোয়, কি কাহেবা-মানার বেহুলা লখিন্দরের মেলায় মাঘ মাসে, নয় তো নিদেন চাক-তেঁতুলের গাজনের সময় পাবলিককে শুনিয়ে দেওয়া যাবেক। তুমি তড়িঘড়ি লিখে ফ্যালো না—তারপর পালা যাতে হয় তা আমরা দেখবু।

সনাতন বলল, এ পালা শুধু এ গ্রামের জন্যেই লয় গো পরেশদাদা! আগে ছাপাব এটাকে—তারপর গ্রামে গ্রামে সকলে করবে এ পালা। খেলা লয় এ। লতুল পালা। জনগণের পালা।

ছাপাবে? বলে, পরেশ গুপ্ত নড়ে-চড়ে বসল।

তারপর বলল, ছাপাবার খরচ জোগাড় হবে কুত্থেকে?

সনাতন হাসল। বলল, মাছের কেনা বেচা করছি কেন তালে?

পরেশ কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, তালে হবে।

কিন্তু কান চুলকোতে চুলকোতেই পরেশের সন্দেহ হল যে, সনাতন পালা লিখলেও, ছাপাবার টাকার জোগাড় করতে পারবে না।

আসলে সনাতন তো বেশি পড়াশুনা করেনি। বারাজের উপর যে পাথরের ফলকটা আছে ইংরিজিতে, সেই ফলকটাকে একদিন পরেশ পড়তে পেরেছিল। জোরে জোরে। "রোন্ডীয়া উয়্যার। ওপেনড বাই স্যার জন অ্যান্ডারসন, গভর্নর অফ বেঙ্গল, সেকেন্ড সেপ্টেম্বর, নাইনটিন থার্টি থ্রি।" পড়ে শুনিয়েছিল সনাতনকে।

সনাতন ইংরিজি জানে না, বাংলা ও তথৈবচ। পরেশ জানে, ইংরিজি লা জানলি, না বিদ্বেন হওয়া যায়; লা লেতা।

পরেশ গাজিপুরের স্কুলে পড়েছিল ফাইভ-ক্লাস অবধি। আর সনাতন পড়াশুনা করেছিল গাঁয়ের পাঠশালে; সামান্যই।

সনাতন বলল, কে কত পড়া-লেখা করল সেইটাই বড়ো লয় গো পরেশদা বুঝলে? কে মানুষ কেমন? কার বলার কী আছে? সেইটিই হতিছে আসল কথা। পড়াশুনা করেও মানুষ অমানুষ হয়।

পরেশ ও সনাতন অদ্ভুত বাংলা বলে। গাজিপুরী উর্দুমিশ্রিত হিন্দির সঙ্গে রাঢ় বাংলার ভাষাকে আতপ চাল আর সোনামুগের ডালের খিচুড়ির মতো মিশিয়ে ফেলেছিল পরেশ।

সনাতনের ভাষাটাও বহু জায়গায় থাকতে থাকতে মিশ্র হয়ে গেছে।

পরেশ বলল, কথাটা ঠিকই বলছু তুমি। আসল হচ্ছে গিয়ে ভালোবাসা; লভ। যদি দিশকে তুমি ভালোবাসো, তবে সেই দিশের পালা তুমার দিশের কাচে উতরোবেকই গো, উতরোবেক। ভিতরে মাল লাগে বুজুছো গো! বিদ্যে ধুয়ে কী হয়?

সনাতন উত্তর দিল না। চুপ করে বসে নদীর দিকে চেয়ে রইল। ওর বুকের মধ্যে রক্ত, বর্ষার দামোদরের জলের মতো ছলাক ছলাক করে ঘুরপাক খেতে লাগল।

মনে মনে সনাতন বলল, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক পরেশদা।

আজ যেহেতু কোনো জেলেই জাল ফেলল না, মাছের আশা নেই। মাছ না উঠলে পাইকার, খুচরো খরিদ্দার, ফোতোপুর, কাহেবামানা, ওপারের বেলোমা, দূর দূর গ্রামের কোনো জায়গা থেকেই লোক আসবে না মাছের খোঁজে। সুতরাং পরেশের দোকানে চা-সিগারেট যে আজ আর বিক্রি হবে সে আশা কম। ঝাঁপ বন্ধ করল পরেশ। বলল, ঘরকে যাবু। তু কুথাকে যাবি রে সনাতন?

সনাতন বলল, এই একটু ঘুরে-ঘারেই ফিরে যাব।

ঝাঁপ বন্ধ করল পরেশ। তালাটা লাগাল। তারপর রোন্ডীয়ার দিকে পা চালাল। ওর কালো

কুকুর, লক্ষ্মী; পিছন পিছন চলতে লাগল মোরামের উপর খচখচ আওয়াজ তুলে। বাঁধের কাছে এসে যেখানে বড়ো বড়ো কালো পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অশ্বত্থ আর সেগুনের চারা গজিয়ে উঠেছে সেখানটাতে একটু ভালো করে দেখে নিল পরেশ।

ক্ষতি করে না কখনও সাপগুলো। কিন্তু গরম আর বর্ষার দিনে মাঝ-পথে জুড়ে শুয়ে থাকে। বড়ো বড়ো সাপ। চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড়, গোখরো। বানের জল যখন পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে ঢুকে পড়ে তখন বেরিয়ে পড়ে উপরে। অন্ধকার নেমে এলেই নেমে যায় নদীতে। মাছ ধরে খায়।

সনাতন পরেশের ঝাঁপ-বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বাঁদিকে চলে গেছে ক্যানালের পাশের বাঁধের পাড়ে পাড়ে মোরাম ঢালা পথটা বর্ধমানের দিকে। এপথে যায়নি কখনও সে বর্ধমানে। কানালের ওপাশে হৈ দূ—রে কেয়ারি-করা বাগান ঘেরা বাংলোটা। পানাগড়ের মিলিটারি সাহেবরা মাঝে-মাঝে পিকনিকে আসেন। মাথার উপর লাল আলো জ্বালিয়ে বিগ্রেডিয়ার, কর্নেল সাহেবদের গাড়িগুলো ভিড় করে মাঝে মাঝে।

ক্যানালের পাশেই বাউড়িদের খড়ের ঘরগুলো। ওরা থাকতো চাকতেঁতুলে। দু বছর আগে বাউড়িপাড়ায় এক নাম-না-জানা পোকার উপদ্রবে মারা যায় অনেক লোক। সে পোকা চোখে দেখেনি কেউ। "কামড়াল, রে কামড়াল" : বলতে বলতেই যাকে কামড়াল, সে মৃত্যুর গায়ে ঢলে পড়ে। ওরা তাই গাঁ ছেড়ে এসে ক্যানালের ধারে নিজেদের ঘর বানিয়ে নিয়েছে। চাকতেঁতুলে মা মনসা আর কালী মায়ের থান আছে। বাউডিরা নাকি গোরু কেটেছিল সেই থানে। এই দোষে মায়েরা পোকা পাঠিয়ে ওদের শাস্তি দেন।

নদী থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছে। সনাতনের ঘাড় সমান বড়ো বড়ো চুলগুলো এলোমলো হয়ে যাচ্ছে। সনাতন নদীর চরের দিকে এগোয়। ও বুঝতে পারে যে, আসলে ও কবি, লেখক। টাকাপয়সা, মাছ-পাইকার এমনকী পার্টিও বুঝি ওর আসল ঠাঁই লয়। ওর বুকেব ভিতব অন্য একটা মানুষ বাস কবে। জনগণের কত দুঃখু দুর্দশা—কত কষ্ট মানুষের—দেশে লতুল দিন আনতে হবে—পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে লতুল কথা শোনাতে হবে মানুষগুলোকে।

চরে নেমে এল সনাতন। বাঁয়ে পবনমাধুর পোড়ো অশ্রমটা। নিম, তেঁতুল, আমলকী বেলের ভিড় মধ্যিখানে। চারপাশে দু মানুষ সামন করবীর বেড়া। পবন সাধু মবে গেছে। মায়ের মন্দির ছিল মাটির; তাও পড়ে গেছে। তবু এখনও গাঁয়ের লোকে মায়ের থানের দিকে পা দেয় না,—অন্য দিক দিয়ে পবন সাধুর আশ্রমে ঢোকে।

এখন জমজমাট আশ্রম বেলোমাতে। নদী পাড়ে। উত্তরপ্রদেশ থেকে সাধুরা এসে সিখানে আশ্রম বানিয়েছে। খেয়া পারাপার করে, মেয়েপুরুষে যায়। জেলেরাও ঘুরে আসে সময় পেলে।

সনাতন নিজেই নিজেকে বলে, আচ্ছা ভগমান নাকী লাই? পঞ্চাযেত ইলেকশানে একজন বড়ো-পার্টি-লিডার বক্তিমে দিতে এসে সনাতনকে বলেছিলেন কমোনিস্টোরা ভগবান মানে লা। মানুষই হল গিয়ে ভগমান। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে লাই।

কিন্তু এই গাঁ-গঞ্জের লোকগুলান যে ভগমান ভগমান করে পাগল। এদের ভালো করে বুঝাতে হবেক। বুঝাতে হবেক যে, ভগমানে আর কমোনিস্টোদের মধ্যে কোনো বিরোধ লাই। এসব বুঝাবে সনাতন ওর পালাতে। পালার মতো একটো পালা লিখবে সে বটেক।

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। লাল পাল তুলে বেলোমার দিকে খেয়া নৌকো সাবধানে নদী পার হয়ে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ-মেঘালির খেলা। ঘোমটা পরা, ঘোমটা খোলা। খেয়া নৌকোয় হাঁড়িকুঁড়ি, হাঁস-মুরগি, মাটির জালা নিয়ে বেলোমার মেয়ে-মরদরা হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে। আজ হাট ছিল।

সনাতনের এই হাটের কথায় মনে পড়ল কথাটা। এই হাটটা আগে ছিল রোন্ডীয়াতে। কিছুদিন হল প্রতি হাটের দিন কতগুলো লোক এসে মদ খেয়ে হামলা করত। কখনও মেয়েদের হালকা

বেইজ্জতিও করত। ঝুটঝামেলা। এই গাঁ-গঞ্জের মানুষগুলো বড়োই থাডকেলাশ শান্তিপ্রিয়—। কোথায় ঝামেলাবাজদের টাইট করবে, তা লয়। ওখানে হাটই বসাবে না ঠিক করল সকলে মিলে। কী শান্তি, কী শান্তি। শেষে হাট গিয়ে বসল অন্য জায়গায়, যেখানে ধান-ভানা কল, আটাভাঙ্গা চাকী—একেবারে হাটের মধ্যিখানেই ওদের কল হল। রথ দেখা কলা-বেচা ফিট। ফোর-পাইস রোজগার হল গিয়ে। আর সেদিন থেকে হামলা-করা মানুষগুলোও কুথায় জানি মেজিকের মতোই অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই সকলই বড়োলোকদিগের চক্রান্ত।

হঠাৎ একটা ঘুঘু ডেকে উঠল। ভিজে ঘুঘু বড়ো কড়া করুণ ডাকে। চারধারে বালি, বালিয়াড়ি সোঁতা। শরবন আর কাশিয়া, নরম কালচে সবুজ—কী টান টান—বৃষ্টিভেজা ঘুঘুর ডাক হঠাৎ সনাতনের বুকের মধ্যে যেন ছুরি বসিয়ে দিল একটা—হ্যান্ডেল অব্দি।

হঠাৎ, হঠাৎই সোনামণির কথা মনে পড়ে গেল সনাতনের। চাকতেঁতুলের সোনামণি। বড়ো মন্দ-মধুর মেয়ে সে। আজই না সকালে দেখা হল হাটে! হলই তো মানিক! একবার দেখায় কী ভরে মন? না কী মন ভরার? গাছ কোমর করে শাড়ি পরে হাটের মাঝে তার ভাইয়ের পাশে মাটিতে বসেছিল বুকের কাছে পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে দু হাত দিয়ে দু-পা জড়িয়ে। আশপাশ সাল সাল নিমগাছ, আঁশফল গাছ, তালের সারি। একপাশে পুকুর। মধ্যে সোনামণি। কত লোকজন হই-হই, শাকসবজি, বেলোয়াড়ি চুড়ি, রিবন ফিতে, তরল আলতা, সোহাগি সিঁদুর, তার মাঝে সনাতনের সোনামণি।

হাটে কতরকম গন্ধ। গুড়ের গন্ধ, গোরুর গায়ের গন্ধ, চালের গন্ধ, হাঁস মুরগির গন্ধ, মানুষের ঘামের গন্ধ—কালো কালো চকচকে সব মানুষ যারা শরীর খাটিয়ে খায় রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে; যারা সনাতনের আসল বাংলাদেশ তাদের সকলের সব গন্ধ মিলে নেশা ধরিয়ে দেয় সনাতনকে। তার মধ্যে সোনামণি।

সন্যতন চরের মধ্যে কাশিয়ার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাওয়ায় মুখ রেখে বলে, সোনামণি রে, সোনামণি, তোর বুকের খাঁজে কেমন গন্ধ রে মেয়ে!

তারপর হাত নেড়ে বলে, একদিন তুই আমার হবি, হবি; হবিই। সেদিন তোর সব গন্ধ নিব দু নাক ভরে। তোকে এমন আদর করব না, তুই দেখিস তখন। তুই আমার বউ। তুই দেখিস, তোর সঙ্গে ওই বড়োলোক লিমাই-এর বিয়ে হবেক লাই। আমি পালাকার, একদিন আমি পার্টির লিডার হবু। আমার কথা মানবে, শুনবে দশ-বিশটা গাঁয়ের লোক—সেদিন তোর বুকটাক হাতে নিয়ে পিথিবীটাকে আমি। আমার হাতে লিব, হাঁ! দেখিস তুই।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা বহুদিন থেকে এসে চরে খড়ের ঘর করে রয়েছে। পাট লাগিয়েছে ওরা। তরমুজ করে, খেরো বোনে। চরে যা যা হয়, সব। জল খুব বাড়লে কখনও কখনও আগে থাকতে বাড়ি ঘর তুলে নিয়ে বাঁধে গিয়ে থাকে দিনকয়। আবার জল নামলেই নেমে আসে।

ডানদিকে নদীটা চলে গেছে। ধূ-ধূ বালির চর। সোনামণির অদেখা ঊরুর রং বোধহয় এই সোনালি বালির মতোই হবে। ভাবে সনাতন। একমুঠো বালি তুলে নিয়ে গালে ঘষে। মুখে ঢুকে যায় কিছু। বলে থুঃ থুঃ।

তারপরই বলে, তোকে বলিনি কখনও সোনামণি। তুই আমার সোনামণি। তারপর নিজের মনেই বলে, ভালোবাসায় বড়ো দুঃখু রে। তার কথা নদী শোনে, হাওয়া শোনে।

নদীটা কোথায় গেছে? এই চরের মধ্যে হু-হু হাওয়ায় দাঁড়িয়ে একথা প্রায়ই ভাবে সনাতন। শুনেছে, ভাগীরথীতে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু কোথায়? কত দূরে! দুজনে কী মিলে এক হয়ে গেছে। দামোদর তো' লদ, আর ভাগীরথী লদী। লদ আর লদী মিলনে কী এক হয়ে যায়?

মনে মনে জিগেস করে সনাতন, কীরে সোনা? জানিস তুই? লদ-লদীর মিলন?

কতদিন ইচ্ছে করেছে একটা ডিঙি নৌকো নে দাঁড় বেয়ে একা একা চলে যায় দক্ষিণে।—লদী যতদুর যায়—ততদুর। দুপাশের চর, গ্রাম, গাছগাছালি, দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে। সনাতনের যে পালা লিখতে হবে! দেশের জন্যে, গরিবদের জন্যে পালা। পালাকারের কী মিথ্যে সাজিয়ে চলে? তার পেত্যেক কথাটি সত্যি হওয়া চাই, তার কাছের মেয়ে-পুরুষের মনের সুখ-দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, তাদের বুঝে, তাদের সঙ্গে কেঁদে, হেসে, মার খেয়ে অপমান সয়ে, তবেই না তাদের বাঁচার পথের হদিস দিবে সনাতন।

সনাতন ভাবে, ও লিখবেই। এদেশে এমন পালা আব কেউ লেখেনি কখনও। বুর্জো বাবুদের প্রেম-ভালোবাসা জয়-পরাজয় লিয়ে লয়—জনগণের পালা লিখবে সনাতন আঁকুড়া একটো।

এবার চর ভেঙে বাঁধের পাশের পথে উঠে এল সনাতন। এদিকে অনেক লাল ভ্যারেণ্ডার গাছ। কী সুন্দর লাগে ছোটো ছোটো গাছগুলোকে। পাতাবাহারেব মতো। কী চিকন উজ্জ্বল লাল আর কালো আর ফলসারঙা পাতাগুলো।

সোনামণির বুকের রং ফলসা। একদিন হাটে সনাতন দেখেছিল। সোনামণি বসে হাঁসের ডিম বিক্রি করছিল—সনাতন দাঁড়িয়ে দর করতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ে গেছিল হলুদ ছিটের ঢিলে ব্লাউজের ফাঁকে।

সনাতন একটা লাল ভ্যারেণ্ডার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চোখে বুলাল। বাঁধে উঠে এল সনাতন। ওপাশে বাউড়িদের বস্তি। ছোটো ছোটো স্বপ্নের মতো খড়ের ঘরগুলো। ক্যানালপারে একটাই সাঁই-বাবলা গাছ। তার পাশে খালি গায়ে, লাল শাড়ি পেঁচিয়ে কুনই উঁচিয়ে, টেনে টেনে, কালো সাপের মতো চুল আঁচড়াচ্ছে বাউড়ি বউ কাঠের কাঁকই দিয়ে শেষ বিকেলে।

থমকে গেল কবি সনাতন।

সামনে দামোদরের বর্ষার লাল ঘোলা জল বয়ে চলেছে ক্যানাল দিয়ে। তার পাশে বাঁধ। বেওয়ারিশ বেসামাল বাতাসে বারিষভেজা মেছো-বকের ডানায় বাস। চারপাশে চুপচাপ চাপচাপ ফিকে সবুজ। বাউড়ি মেয়ের কোমর সমান চুল উড়ছে হাওয়ার। উড়ছে সাঁইবাবলার পাতা। কালো মেয়ের লাল শাড়ির আঁচল উড়ছে পত পত করে।

চমকে গেল সনাতন। মেঘলা আকাশের পটভূমিতে সেই দুঃখী, দিন-কামিন বাউড়ি মেয়ের চুল-এলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্ত ভঙ্গিটা আর হাওয়ায়-ওড়া তার উদ্ধত গর্বিত লাল আঁচল সনাতনকে যেন কোন অনাগত দিনের স্পষ্ট আভাস দিল।

সনাতন নিরুচ্চারে বলল, বোন, আর কিছুদিন কষ্ট কর তুমরা—তারপর দ্যাখো। আমরা সবাই বড়োলোক হব। ভালো খাব, ভালো থাকব; ভালো পরব। বাউড়ি বোন; তুমি দ্যাখো। নতুন পালা লিখছি আমি। আমার লাম সনাতন। শুনে লাও গো তোমরা সকলে সনাতন আঁকুড়া আমার লাম।

এখন রাত গভীর। একবার চাঁদ বেরুল। বেরিয়েই ডুবে গেল পাতলা মেঘের আড়ালে। বড়ো জোরে জল চলেছে আজ বিকেল থেকেই। সনাতন ছেলেবেলা থেকে এমনটি দেখেনি। দূরে দামোদরের জল, চর; কাশিয়া আর শরবনের ভিড় এখন আর আলাদাই করা যাচ্ছে না। মেঘের পর্দা ভেদ করে ফিকে একটা রুপোলি অস্পষ্ট আভা রোস্তীয়ার রাতের প্রকৃতিকে মুড়ে রেখেছে। সমুদ্রের ঢেউ এর মতো অ্যানিকাটের জলের আওয়াজ ঘুমন্ত গ্রামের খড়ের ঘরগুলোতে হামলে পড়ছে।

সনাতন তক্তপোশের উপর সোজা হয়ে বসল। লণ্ঠনটা সামনে করে। তারপর খাতাটা আর একবার বের করল। বের করেই পাতা ওলটাল।

জনগণের পালা

লেখক : শ্রীযুক্ত সনাতন আঁকুড়া

ভূমিকা

যে দেশে গরিব চিরজিবন অত্যাচারীত, মানুষ মানুষের সম্যান পেল না সে দেশেরই কবী আমি। বড়োলোকেরা গরিবকে কাজে বেবহ্যার করার পর যে দেশে লাথ মারে যে দেশে ট্যাকা আর বিদ্দার মুল্ল এক, সেই দেশেরই আমি পালাকার।

লা, লা হে গ্রামবাসি, এপালা গাজনের মেলার তরে লয়, লয় এ লখীন্দর-বেহুলার উতসবের জন্নেও।

এ পালা লিরবধী-কালের পালা।

সনাতন আঁকুড়া চীরদিন বাঁচবে না হয়ত, হয়ত সে লিচিহ্নই হবে টাকাওয়ালা মানুষের চক্কান্তে কোনোদিন, কিন্তুক শত শত সনাতন জলম লিবে এই লদিতিরে, এই রোন্ডীয়ায়

সনাতন চীরদিন থাকবে না। লাই বা থাকল সে। তার পালা, তার গান, গাঁয়ে গাঁয়ে, রোন্ডীয়ায়, চাক্ তেঁতুলে, ফোতোপুরে, কাহেবা-মানায় আর বেলোমায়ও সকলেরই মুখে মুখে ঘুরবে লিশ্চয়। আকাশ-প্রদীপ দিবে মা-বোনেরা সনাতন আঁকুড়ার লামে—সেদিল এক সনাতন-এর ঠেঙ্গে হাজার সনাতন জলম লিবে। জলম লিবে লিরবধী।

এইই প্রার্থনা কর‍্যে লিবেদক জনগণ-সেবক

সনাতন আঁকুড়া।

—ইতি ঊনত্রিশে ভাদ্র, তেরোশ পঁচাশী সন,

মোকাম, রোন্ডীয়া, জিলা বর্দ্ধমান

ভূমিকার ওজস্বী ভাষাতে সনাতন নিজে পরম প্রীত হল। যে-কোনো ভালো কাজ করার পর, তা সমাপ্তির পর—যেমন যে, তা করে তার বড়োই ভালো লাগে, সনাতনেরও তেমনই ভালো লাগল। অনেকক্ষণ সনাতন খড়ের দেওয়ালকাটা জানালা দিয়ে বাইরে দূরের প্রায়ান্ধকার নদীর দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে থাকতে থাকতে অনেক কথাই মনে এল সনাতনের। উদাস হয়ে গেল।

আজই সকালে লদীর চরে কেদার আর দ্বিজপদদের মাছ ধরার লীল রাঙা লাইলনের জালটা শুকোতে দেওয়া ছিল, দেখেছে। জালটা বাধ-জাল। দাম নেছিল চার হাজার ন'শ টাকা। কিন্তু আগের সপ্তাহে ওই জালটে দিয়ে এক বারেই আঠারশো টাকার মাছ ধরেছিল ওরা।

কেদাররা সমবায় করেছে একটা। এ শালার দেশে এত কামড়া-কামড়ি খেউ-খেই যে নিজেরা নিজেদের ভালোটা বোঝে কই? তাই-ই যদি বুঝত তবে কী আর এমন হত!

লোকগুলো সব কুঁড়েও বড়ো। একবেলা পেলে, তাইই-ভালো, পেট মাদিয়ে খেয়ে লিযে লদীর হাওয়ায় গুঁড়িসুঁড়ি ঘুম লাগাবে। আর পচেষ্টা ছাড়া, মেহনত ছাড়া, কোনো দিশ কী বড়ো হয়? চিনে কী হল? বাশিয়ায় কী হল? তারা কী এমলি এমলিই সব লায়েক হয়ে গেল নাকি? না-খাটলি কিছু হয়? কুঁড়ের জাতের খালি ঘুম আর যার যার মেয়েছেলের উপর হামলে পরে বাচ্চার ইনজেকশান ঢুকোনো। শালারা যেন শুয়োর। মাল লাই, সম্মাল লাই, এক মুঠো ভাতের জন্যি লিজেরে বিকিয়ে দিয়ে দিব্যি পরমানন্দে পাঁকের মধ্যে, ময়লার মধ্যে বড়োলোকগুলার পা-চেটে দিন গুজরাচ্ছে। এক মুঠো খেছে আর লিজ লিজ পরিবারকে গুঁতুচ্ছে। লিজেরা বড়োলোক হবে যে, সেসব কোনো

ধান্দাই লাই গো ইদের। ইদের হবেটা কী। এই ইদের জল্যেই তো পালাটা লেখা। যদি পরিবর্তল হয়; আসে।

দ্বিজপদরা সমবায়ের টাকা দিয়ে লাইলনের জাল, ফাতনা এটা সেটা কেনে। ওইটেই আসল কথা। ক্যাপিটল। যার ক্যাপিটল লাই তার লাইলন-জালও লাই। আর এই ক্যাপিটল, যে-পরিশ্রমে বসে বসেই ডিম পাড়ে। সুদ, খাতির, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা। টাকা। অনেক টাকার পর ক্ষমতা। ক্ষমতার পর আরও ক্ষমতা।

হঠাৎ পুটুর পুটুর পুটুর পুটুর শব্দে রাতের গাঁয়ের আকাশ ভরে ওঠে। পানাগড়ের পথের দিক থেকে আসে আওয়াজটা। সনাতন ভাবে যে, এত রাতে কি মণ্ডলদের ট্যারেকটর চলছে? দিশা পায় না আওয়াজটা কিসের?

মণ্ডলরা বড়োলোক। পাকা দালান, আটাকল, জাঁতাকল, পুকুর, ধান জমি আবার ট্যারেকটর। ঘণ্টা প্রতি চল্লিশ টাকা ভাড়া খাটায়। এক সনের ভাড়ায় মেসিনটার পুরো দামই উঠিয়ে নেওয়ার মতলব লয় কী? সেই একই কথা—গোড়ার কথা—ক্যাপিটল। যার আছে সে রাজা : যার লাই সে ফকির। বেশির ভাগ বড়োলোকেরই তো ক্যাপিটল হলু গরীব ঠকায়ে! ন্যায্য গুণে, লোক লা-ঠকায়ে, কটা লোকে ক্যাপিটল বানায় হে?

এই ফণী মণ্ডলের, লাটসাহেব ছেলেটার সঙ্গে একদিন লেগে যাবে সনাতনের। যদিও ওর বিবেক ওকে বলে মাথা ঠান্ডা রাখতে। বলে; মাথা গরম করলে লোকে সম্মাল করবেনা সনাতন। দেশের দশের কাজ করতি হলি অনেক অপমাল অসম্মান সয়। সিটা তোমার লিজের অপমাল বলে ভাবছু কেন? সিটা জাতির অপমাল, গরীবের অপমাল। সেই অপমালের আগুনেই তো খাঁটি ওয়ার্কার জ্বলে পুড়ে সোনা হয়। খাঁটি সোনা। গিলটি লয় হে।

মাথা গরম করে না সনাতন, কিন্তু একদিন করে ফেলেছিল। হাটের মধ্যেই থাবড়া কষিয়েছিল সজনে গাছের তলায় ফণী মণ্ডলের একমাত্র ছেলের গালে।

সবজি বিক্রি করতে এসেছিল হালু দাস কাহেবা থেকে। ঢেড়স-এর দাম না কী বেশি বলেছিল, তাই সটান লাথি চালিয়ে দিল ক্যাপিটল, গরীবের পেটে। সনাতন চিতাবাগের মতো পড়ল গিয়ে তার ঘাড়ে। জনতার পতিভু সে। থাবড়ায় থাবড়ায় বাছার নরম তুলতুলে গাল দামোদরের জলের মতো লাল করি ছাড়ল। তখন তার চোখমুখের ভাবখানা কী, যেন গিলে খায়। ওদের যতেক কর্মচারী—তারা সনাতনেরই ভাই—বেরাদর চিনা-জাঁনা। সব শালা ক্যাপিটলের চাকর-দালাল শালারা। তারাই কী না তেড়ে এসে ঘিরে ধরল সনাতনকে।

কিন্তুক বুড়ো ফণী মণ্ডল? বিড়েল-তপস্বী, গলায় কণ্ঠী, রুখুসুখু চেহারা, যার একমাত্র ভগবান টাকা; সেঁ কী লা এস্যে সক্কলের সামনে তার ছেলেকে হাঁকড়ে বকল। এ কী অল্যায়। লাথ মারও কেন বাপ তুমি? তুমি কী দেশের রাজা হলে চাঁদ? এ কী বেবহার? মানুষকে মানুষ জ্ঞান লাই?

তারপর সনাতনকে আদর করে গাল টিপে পিঠে নে হাত দে বলল : যা রে সনাতন বাপ, মাথা গরম করিস লা। তুইও ত' আমার ছেল্যিই রে!

সোনামণিও সেদিন হাটে ছিল। দূর থেকে সেও সনাতনের দিকে আর পাঁচটা গাঁয়ের চাষাভুষো দিনমজুরদের সঙ্গেই চেয়ে ছিল মুগ্ধ বিস্ময়ে; সম্মানের চোখে!

সকলে বলেছিল, হ্যাঃ, সাহস রাখে বটেক ছোকরা। হাটের মাঝেই মণ্ডলের পোকে থাবড়া-কষানো চারটি কথা লা হে।

হাটের মালিক কিন্তু দৌড়ে এসে বিবেদ মিটিয়ে দেছিল। তারই হাটে কোনো ঝুটঝামেলা পছন্দ লয় তার। ঝামেলি হলে, হাট যদি আবার অন্যত্র চলে যায়? সকলেরই চিন্তা স্বার্থ।—

সেই গোড়ার কথা। ক্যাপিটল।

শব্দটা আরও জোর হচ্ছে—পুটুর পুটুর পুটুর শব্দটা যেন গ্রামময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কী

যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। দামোদরের জলের শব্দের সঙ্গে ওই শব্দটা যেন পাকাচ্ছে যাচ্ছে। একবার মনে হল যেত তার দরজার কাছেই।

সনাতন দরজা খুলে বাইরে এল। আকাশ মেঘে ঢাকা। আলো লাই—ফ্যাকাশে অন্ধকার। দুর্গাপুর থেকে কি আবারও জল ছাড়ল লাকি ওরা? চর বুঝি পুরো ডুব্যে যায়। বিষ্টি খুব হতিছে উত্তুরে—খবর পেয়েছে ওরা। চরে আছে মহিম ভাই আর নেতাই কর্মকার, আগে পেশাতি ছেল কম্মকার আর এখন চাষ করুছে খেরোর আর পাটের। শালার পেট কী জিনিস!

সনাতন ভাবল, ওদের একবার দেখে আসবে। লাল সিগন্যাল যদি না দেখে থাকে, ত' ছাগল-মুরগী বউ-মেয়ে লিয়ে সব যে রাতারাতি ভেসে যাবেক গো তারা।

হাতে লণ্ঠনটা নিয়ে নিল সনাতন। আঁধার রাত, এখন মা-মনসার পূজারীরা সব বেরুবে। সনাতন জানে, ওরা কিছু করবে না সনাতনকে। পতি-বছর কাহেবা-মানার বেহুলা-লখিন্দরের মেলায় গান বাঁধে সনাতন। সাপের ভয় করে না সে।

হু হু করি হাওয়া আসছিল নদী থিক্যে। লণ্ঠনের আলোটা কাঁপে খালি। বাঁধের উপর দিয়ে চলল সনাতন—বাঁধ থেকে চরে নামবে সেই লাল ভ্যারেণ্ডার জঙ্গলের মধ্যি দিয়ে, ভাবরির পাশে, পাশে, পবন সাধুর আশ্রম পেরিয়ে নেতাই আর মহিমকে দেখতে।

ওমাঃ জল যে বাঁধের গায়ে গায়ে! ছল ছল করে, খলখল করে লক্ষ লক্ষ সাপের মতো যায়।

আবার শুনতে পেল সেই পুটুর পুটুর পুটুর পুটুর শব্দটা।

ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় হে! শব্দ কিসের?

সনাতন দাঁড়িয়ে পড়ে চারধার দেখে। আবার যে কান-খোঁচায় শব্দটা, পুটু—পুটুর পুটুর—। কোথাও কোনো আলো লাই, অল্য আওয়াজ লাই—। বাউড়ি পাড়ার মেয়ে-মরদ ঘুমে বেহুঁশ। দূ-রে চাকতেঁতুলেও আলো লাই। শুধু মেঘে ঢ্যকা আকাশ আর জলের গজ্জন। লদীর—ক্যানালের। আব হাওয়ার শাসানি।

থমকে দাঁড়াল সনাতন। চর ডুবান দিচ্ছে। জলে ভর্যে গেছে যে একেবারে!

সনাতন বুক ভর্যে দম লিয়ে ডাকে : নেমাই! অ মহিম!

সাড়া লাই।

সনাতন জানে যে, এ বাঁধ ভাঙ্গা লদীর কম্মো লয়। সাহেবদিগের বাঁধ এ। সিমেন্টে কাদা মেশাতনি তখল পাব্‌লিকের কাজে। ফাঁকি দে, সারতে পারত না কেউ। এখন তো চুরি; খালি চুরি। পুকুর চুরি।

হঠাৎ সনাতন আবিষ্কার করে, বাঁধের তলা থেকেও যেন মাটি সরি যাতুছে। সনাতন ভয় পায়। সনাতন পিছন ফিরে দৌড়ে যায়।

জীবনে এই প্রথম সনাতন ভয় পায়।

আবার শব্দটা ফিরে আসে—পুটুর পুটুর পুটুর পুটুর। পবন সাধুর আশ্রমে কী দৈত্য-দানো এসে ভিড় জমালো? জলের ভয়ে কিছু ভাবারও সময় লাই সনতানের। এদিকে লদী, ওদিকে ক্যানাল। ভেসে গেলে সনাতন মিলবে গিয়ে সেই ভাগীরথীতে। মিলন হবেক লদ, লদী আর পালাকাবেব।

প্রায় বাঁধটা পেরিয়ে এসেছে সনাতন। আবার ও শুনল, পুটুর পুটুর—এবার যেন কাছেই। লদীর শব্দে আর হাওয়ার গুমড়ানিতে কী শোনার জো আছে কিছু?

আসানসোল থেকে আসা ভাড়া-করা লোক দুটো, বাঁধের পাশে ভাববি আর লাল ভ্যারেণ্ডাব ঝোপের আড়ালে মোটরবাইকটাকে শুইয়ে রেখে ওত পেতে রইল।

সনাতন যখন একেবারে বাঁধের মুখে, তখন দুজনেই একসঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সনাতন বাধা দেওয়ার আগেই, একজন পেটে আর একজন বুকে রিভলবার দিয়ে গুলি করল সনাতনকে।

গুলির শব্দও জলের গুমগুমানিতে মিলে গেল।

জানল না কেউ। গুম গুম গুম শব্দ করে নিরন্তর অসংখ্য রিভলবারের গুলির মতোই নদীর শব্দ জলজ অন্ধকারে উৎসারিত হয়ে মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে উড়ে যেতে লাগল।

সনাতন, মা রে! বলে পড়ে গেল।

অস্ফুটে বলল, ভগমান।

লণ্ঠনটা উলটে পড়ে, নিবে গেল।

তার মা মরেছিল সনাতনের বয়স একে। মানুষ তবু মরার সময় মাকেই ডাকে। ভগমানকেও। কমোনিস্টোরাও ডাকে।

সনাতনের টানটান শরীরটা লাল হয়ে গেল তাজা রক্তে—তার সোনামণির বুকের রঙের মতো ফলসা-রঙা আর লালচে তার লালভ্যারেণ্ডার ভালোবাসার ঝোপে পড়ে রইল গরম টাটকা রক্তে উত্তপ্ত, কিন্তু মৃত সনাতন।

লোক দুটো ফিরে যাচ্ছিল মোটরবাইকের দিকে। হঠাৎ কী মনে হওয়ায় ফিরে এসে দুজনে মিলে লাথি মেরে সনাতনের মৃত শরীরটাকে নদীর জলে ফেলে দিল। এত শব্দের মধ্যে সনাতনের জলে পড়ার শব্দটা শুনতেও পেল না ওরা।

তারপরই দৌড়ে ফিরে গিয়ে মোটরবাইক স্টার্ট করে চলে গেল।

পুটুর-পুটুর-পুটুর আওয়াজটা হাওয়ার সঙ্গে আবার উড়তে লাগল। লতুন-পালা লেখা হল না সনাতনের। শেষের যাত্রায় ভেসে চলল সে তার সাধের লদী বেয়ে। এ লদীর ধারের যে, গাঁ-গঞ্জে, গাছগাছালি দেখা হয় লাই কখনও, এবার সকলই দিখে লিবে সে।

সূর্য ওঠার অনেক আগেই তিন গাঁয়ের লোক এসে নদীর পারে পৌঁছোল—। দেখে খুশি হল যে, জল নেমে গেছে। এতদিনের বাঁধ—চিরদিন তাদের বিশ্বাসের দাম দিয়েছে। ওরা জানে, এ বাঁধ কখনও ভাঙবে না।

কাল রাতে নাকি ইরিগেশান ডিপার্টের দুজন লোক এসেছিল মোটরসাইকেলে বাঁধের অবস্থা দেখতে। কাদের মুখ থেকে বা কার মুখ থেকে কথাটা রটল তা কেউই জানল না। তবে পুটু-পুটুর শব্দটা কেউ কেউ শুনেছিল। তাই সকলেই কথাটা। বিশ্বাস করল।

সনাতন তখনও চিত হয়ে ভেসে যাচ্ছিল ভাগীরথীর দিকে।

তার বড়ো বড়ো চুল, সুন্দ টান-টান ফরসা শরীর—যেন সুন্দর চিতল মাছ একটা—কোক ওভেনের বিষে মরে ভেসে চলেছে।

সূর্য তখনও ওঠেনি। সোনামণি তার মায়ের পাশে মাটির ঘরের মেঝেতে মাদুরের উপর উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল! দুটো হাত জোড়া করে দুই উরুর মাঝে রেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছিল সোনামণি। তার খোলা চুল পিঠময় ছড়িয়ে ছিল।

একটা ভাসাকাঠের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় চিত হয়ে ভেসে যাওয়া সনাতনের শবটা উলটে গেল।

তখন উপুড় হয়ে ভেসে চলল টান টান।

ঘুমের মধ্যে কী যেন বিড়বিড় করতে করতে সোনামণি হঠাৎ চিত হয়ে শুল। মাথার বালিশটাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে। চেপে ধরল ভীষণ জোরে। তারপর ঘুমের মধ্যেই এক সুন্দর সলজ্জ স্বপ্নে ভেসে চলল। এমন স্বপ্ন সোনামণি আগে দেখেনি কখনও।

যখন সূর্য উঠল নদীর উপরে—লাল টকটকে একটা সূর্য—তখন পালাকার সনাতন আঁকুড়া দেখতেও পেল না যে, সমস্ত ভোরের নদী কেমন লাল হয়ে উঠেছে লতুল সূর্যের উষ্ণ লাল আলোয়।

✸

এক নম্বর হারামি, ক্যাপিটল। ফণী মণ্ডল পাকা-বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে হুঁকো খাচ্ছিল দূরের নদীর দিকে চেয়ে।

আসল হারামি ক্যাপিটল!

তার নাদুস-নুদুস আতু-আতু ছেলেটা দৌড়ে এসে বলল, জানো বাবা, সনাতন হারিয়ে গেছে। বলছে, সকলে।

একটু থেমে দোতলায় দৌড়ে ওঠার কারণে দম নিয়ে আবার বলল, বলছে না কী, তারে নদীতে নেছে। নেব্বে না? এত সাহস? ভগমান কী নেই? এত্ত সাহস? হাটের মধ্যে আমাকে থাপ্পড় মারা।

ঠান্ডা-মেজাজের ক্যাপিটল ফণী মণ্ডলের রক্ত হঠাৎ মাথায় চলে গেল। সে তার নতুন বউমার সামনেই ছেলের পেটে এক লাথি মারলো, কোঁত করে।

মুখে বলল, ভাগ। শালা, কুকুরের বাচ্চা।

পিতৃ-অন্নে লালিত-পালিত, দামড়া, পরনির্ভর, আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন ছেলেটা কী কারণে লাথি খেল তা বুঝতে পর্যন্ত না-পেরে ভ্যাবাচাকা মেরে আড়ালে গিয়েই তার বউ-এর বাতাবি-বুকে কেঁদে পড়ল।

ক্যাপিটলের বাচ্চা, খোদ ক্যাপিটল ফণী মণ্ডলের উদ্দেশে দাঁত কিড়মড়ি করল।

তারপর ভেলি গুড়ের মস্ত আড়তদারের মেয়ে, তার উনিশ বছরের করমচা করমচা গন্ধের বউকেই শাসিয়ে বলল : শালার ফণেকে শেখাব আমি। দেখ, মান্তু! আমি একদিন ঠিক কমোনিস্টো হয়ে যাব। ক্যাপিটলের দ্যদ হব।

বুঝবে সেদিন কুকুরের বাচ্চার বাপ।

বড়ো বড়ো চুলওয়ালা মাথা ও কাটা কাটা পুরুষালি মুখ সমেত সুন্দর দীর্ঘকায় সনাতনকে দামোদর একটা দুরন্ত মোড় নেবার সময় সোনালি নরম ভিজে বালিতে ছুঁড়ে দিয়ে গেল!

একদল শকুন নতুল-পালার পালাকারকে লক্ষ্য করছিল। চক্রাকারে উড়তে উড়তে আসছিল মৃতদেহটার উপরে উপরে। অনেকক্ষণ ধরে। পালাকারের জীবনের যাত্রা শেষ হতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল শরীরটার উপর।

শকুনগুলো এবার চুলচেরা বিচার করবে সনাতনের দোষ-গুণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের।

শালডুংরি

সেই প্রথম সকাল থেকেই ছুলোয়া শিকার হচ্ছে। তিনটি ছুলোয়া হয়ে গেছে। বাকি আছে একটি। সূর্য এখন ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। সঙ্গে খাবারজল ফুরিয়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে। প্রচণ্ড।

শেষ ছুলোয়া এক্ষুনি আরম্ভ হল। এই ছুলোয়া শেষ হতে হতে রাত নেমে যাবে।

আমরা তিনজন পঁচাত্তর গজ দূরে দূরে বসে আছি পাহাড়টার মাথায়। সামনের মালভূমির ঘন বনের অন্য প্রান্ত থেকে ছুলোয়া করে আসছে গুরবার দল। ছুলোয়ার দলে সবসুদ্ধ জনা তিরিশেক আছে ওরা। সকলেই ক্লান্ত। হয়তো আমাদের চেয়ে বেশিই। তবে, উৎফুল্ল। কারণ, ইতিমধ্যেই শুয়োর মারা পড়েছে তিনটি। তার মধ্যে একটি খুবই বড়ো। প্রকাণ্ড দাঁতওয়ালা। তাছাড়া একটি শম্বরও। একটি চিতাবাঘ। আর দুটি ময়ূরী এবং একটি শজারুও। শুয়োরের মাংস গুরবাদের বড়োই প্রিয়। আর শম্বর তো উপত্যকার তিনটি গাঁয়ের মানুষে ভাগাভাগি, কাড়াকাড়ি করেই খাবে। ন-মাসে ছ-মাসে প্রোটিন বলতে তো ওদের এইটুকুই জোটে। দূর-দূরান্ত থেকে ওরা ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সব সারি বেঁধে পাহাড় নদী পেরিয়ে হেঁটে আসবে শালপাতার দোনায় করে একটু আঁজলা-ভরা মাংস নিয়ে যাবে বলে। রান্না করবে শুধু নুন দিয়েই। শুধু একটু নোনা হলেই ওদের মনে হবে খাচ্ছে বড়োলোকদের খাবার। ভাত। তাও ন-মাসে ছ-মাসে। পরমানন্দে।

লবণ আর জীবন, দুঃখে সুখে এদের কাছে সমার্থক।

গুরবা বলেছিল যে, আমরা মালভূমির যে-প্রান্তে বসে আছি তার পশ্চিমের উপত্যকায় নাকি এক বাঙালিবাবু থাকেন। "বহত পড়ে লিখে।" উনি শিকার করতেই নাকি এসেছিলেন এই অঞ্চলে। গুরবা তখনও জন্মায়ইনি। ওর বাবার কাছেই শুনেছে ও সেই বাঙালিবাবুর আসার গল্প। বাকিটা ওর নিজেরই জানা কথা। তারপর এই বন-পাহাড়কে ভালোবেসে সেই বাঙালিবাবু এই জঙ্গলেই নাকি থেকে যান। ইচ্ছে করেই জংলি হয়ে যান। বিয়েও করেন স্থানীয় একটি মুণ্ডা মেয়েকে। মুন্ডা ভাষাও বলেন মুণ্ডাদেরই মতো। তাঁর একটি ছেলেও আছে। একমাত্র সন্তান। তবে তাঁর স্ত্রী মানে সেই মুন্ডা মেয়েটি মারা গেছেন বছর পনেরো হল। শঙ্খচূড় সাপের কামড়ে।

গুরবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই বাঙালিবাবু খান কি? মানে, কি করেন? চলে কিসে তাঁর?

গুরবা বলেছিল, উনি তো আর আপনাদের মতো শহুরে বড়োলোক বাবু নন! সেই বাবু যে আমাদের মতোই হয়ে গেছেন। পুরোপুরি 'বাবু' আর নেই। আমরা যেমন থাকি, আমরা যা খাই, আমরা যা করি; জীবিকার জন্যে তিনিও তাই-ই খান, তাই-ই করেন। আমাদের থেকে তাঁকে এখন আর বিশেষ আলাদা করা যায় না।

কত বছর হল আছেন বাঙালিবাবু?

ঠিক বলতে পারব না।

বলেছিল গুরবা, তবে আমার বাবা আজকে মারা গেছেন কুড়ি বছর। বাবার মুখে শুনেছি, বাবার যখন পনেরো বছর বয়স, যে বছরে প্রচণ্ড খরা হয়েছিল আবার বর্ষাও হয়েছিল একেবারে পৃথিবী-ভাসানো, সেই বছরেই বাঙালিবাবু প্রথম এখানে আসেন।

তোমার বাবা কত বছর বয়সে মারা যান?

যে বছর গুন্ডা হাতিটা বিসপাতিয়ার মাকে পায়ের তলায় চেপটে মারে ডুংরির উপরে, সেই বছর।

আমি হতাশ হয়ে তাকিয়েছিলাম গুরবার মুখে। সন তারিখের কোনো ধার ধানে না ওরা। বেশ আছে। সময় ওদের কাছে জব্দ হয়ে আছে। থাকে।

এবার আস্তে আস্তে ছুলোওয়ালাদের ঢাকঢোল এবং চিৎকার জোর হচ্ছে। গাছে গাছে টাঙ্গি ঠোকার ঠকঠক আওয়াজ। এই মালভূমিতে নাকি বাঘ নেই। বড়ো বাঘ নেই। চিতাবাঘও নেই। জন্তু-জানোয়ারের যাতায়াতের সব অলিগলিই গুরবা এবং তার অনুচরেরা খুঁটিয়ে দেখেছে। বাঘ নেই বলছে ওরা, তবে নাকি আছে একদল বাইসন। তাদের সরদার এতই বুড়ো হয়ে গেছে যে, তার গায়ের রং পেকে একদম বাদামি হয়ে গেছে। সরদারের মতো সরদার বটে! গুরবাদের কোনোদিন সাহসই হয়নি তাদের গাদা বন্দুক দিয়ে সেই সরদারের গায়ে গুলি করার। ওরা বলে, সরদারের গায়ে গুলি করলে মারাংবুরু চটে যাবেন।

আমার হাতে ফোর ফিফটি-ফোর হান্ড্রেড ডাবল-ব্যারেল রাইফেল। জেফ্রি, নাম্বার টু। একটু আগে ডান দিকের ব্যারেল থেকে সফট-নোজড বুলেটটি বের করে নিয়ে একটি হার্ড-নোজড বুলেট পুরে নিয়েছি। আর বাঁ-ব্যারেলে সফট-নোজড বুলেটটি আছে। সরদারের সঙ্গে যদি মোলাকাত হয়ই তাহলে সামনাসামনিই হবে না পাশাপাশি হবে, তা তো জানা নেই! বসেছি মাটিতেই। তড়িঘড়ি মাচাটাচা বাঁধা যায়নি। তাই সামনাসামনি হলে তার দু চোখের মাঝখানে হার্ড-নোজড বুলেট দিয়ে মারব বলেই ঠিক করেছি। আর পাশাপাশি তাকে পাওয়া গেলে, মানে তার ব্রড-সাইড, ঘাড়ে, অথবা উরু এবং বুকের সংযোগস্থলে সফট-নোজড বুলেট দিয়ে মেরে দেব। সফট-নোজড বুলেট বিধ্বস্ত করে দেবে তার বুক। মারাং-বুরুর ভয়ে ওরা জবুথবু হলে হোক। আমরা নই।

উত্তেজনা বাড়ছেই ক্রমশ। আমরা পুবে বসে, পশ্চিমে মুখ করে আছি। সূর্য ডুবতে এখনও কিছু দেরি। তাই হাঁকোয়া শেষ হওয়া অবধি রাইফেলে নিশানা নেওয়া মতো আলো যে অনেকই থাকবে সে বিষয়ে প্রায় নিঃসন্দেহ। পুবে বসে, পশ্চিমে মুখ করে আছি বলেই যতক্ষণ না সূর্য ঘন শালবনের আড়ালে গিয়ে উপত্যকা আর নদীর দিকে গড়িয়ে যায় ততক্ষণ আমার রাইফেলের পাল্লার মধ্যে কোনো জানোয়ার এলে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে বলে মনে হয় না। তখন বয়সও খুব কম আমাদের। হাত কারোরই খারাপ নয়। অন্তত অন্যরা তাই-ই বলতেন। নিজেদের গুণগান নিজে মুখে কী করে আর করি!

ছুলোয়া এগোচ্ছে আওয়াজও বাড়ছে। বাঘ নেই বলে কোনো স্টপারও নেই। আমরা অর্ধবৃত্তে বসে আছি। তিনজনই মাটিতে। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির আড়াল নিয়ে। একে অন্যকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে, আড়াল নিয়ে বসার আগে "কু" দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি কে কোথায় বসে আছি, যাতে পাশ থেকে একে অন্যের উপরে ভুলক্রমে কেউ গুলি না চালায়!

সময় যতই এগোচ্ছে শেষ-পৌষের কর্কশ শীত দু কাঁধের উপর তার অদৃশ্য শীতল থাবা দুখানিই যেন ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বসিয়ে দিচ্ছে। কান দুটো ঠান্ডা হয়ে আসছে। শিরশির করছে ডগা। হাতের আঙুলের হাড়গুলো একটু উষ্ণতা খুঁজছে।

একঝাঁক বন-মোরগ দিনের শেষ-আলোয় যেন লাল-সোনালি রঙের আবির ছুড়ে দিয়ে 'কঁক-কঁকিয়ে' মালভূমির মধ্যে থেকে কিছুটা দ্রুতপায়ে দৌড়ে এসে, তারপর কিছুটা উড়েই মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল আমার বাঁ পাশ দিয়ে।

শেষ ছুলোয়ায় সেই বাইসনের দলের সরদার ছাড়া আর কোনো কিছুকেই গুলি করব না এমনই ঠিক করে নিয়েছিলাম আমরা।

হঠাৎই একটা মাদি কোটরা হরিণ হিস্টিরিয়া-রোগিণীর মতো হিক্কা তুলে ডাকতে ডাকতে আমার প্রায় তিরিশ-চল্লিশ গজ নীচের পাহাড়ের মধ্যে একটি জঙ্গলাবৃত ফাটল বেয়ে মালভূমির দিকে তরতরিয়ে নেমে গেল। বোধ হয় আমাকে দেখেই তার এই ভয়। ভাবলাম আমি। অনড় হয়ে বসে থাকা সত্ত্বেও সে দেখে ফেলল কী করে আমাকে?

তার মানে, ভালো আড়াল নিয়ে বসা হয়নি।

গুরবার ছুলোয়াকারীর দল মনে হয় একেবারে কাছে চলে এসেছে। ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে একটু পরেই মালকোঁচা-মারা ধুতি আর রঙিন মলিন শার্ট পরা তাদের রুখুসুখু চেহারাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ছুলোয়াওলাদের নানা রকম সম্মিলিত আওয়াজে মালভূমির চতুর্দিকের বন গমগম করে উঠছে। পাহাড়তলির মন থেকেও সহস্র পাখির বেলাশেষের উত্তেজিত চিৎকার, ছুলোয়াওয়ালাদের মিশ্র আওয়াজের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে মাথার মধ্যে একেবারে ধাঁধা ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠিক সেই সময়ই, প্রচণ্ড উত্তেজনা এবং প্রত্যাশার মধ্যে বাইসনের সরদার নয়, একটি ছোটোখাটো গোবেচারি খরগোশ কান উঁচু করে লাফাতে লাফাতে আমাদের সামনে বেরিয়ে গুরবা এবং তার সঙ্গীদের সমস্ত আয়োজনকে পণ্ড করে এবং আমাদের সকলের ঠোঁটেই হাসির আভাস ফুটিয়ে বড়ো বড়ো ঘাসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। একেই বলে অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স!

আরও একটু দেখলাম, ধৈর্য ধরে। কারণ, অসম্ভবকে সম্ভব করেই হঠাৎ বাঘ বা চিতা ছুলোয়ার ঠিক শেষ মুহূর্তেই ছুলোয়াওয়ালাদের পায়ের একেবারে সামনাসামনি আসে। অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে চমকে দেয়।

আমরা দাঁড়িয়ে উঠে একত্রিত হতেই গুরবা তার বিফলতার কষ্টকে অস্বীকার করতে চেয়ে তামাক আর চুটটা খাওয়া দাঁত বের করে হেসে বলল, 'শাল্লা, খারহা! মানহুশ!'

মানে, শালা খরগোশ। এবং অত্যন্তই অপয়া। খরগোশ বেরুলে আর কোনো জানোয়ার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। শিকারের ব্যাপারে এক-এক জায়গায় জংলিদের এক এক রকম কুসংস্কার থাকেই।

শুভেন শুধোল, বাংলোতে পৌঁছোতে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে শর্টকাট হবে রে গুরবা?

হাঁকাওয়ালারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কেউ চুটটা খাচ্ছিল, কেউ বা দু হাতে খইনি ডলছিল! তারই মধ্যে গুরবা বলল, সব রাস্তাই সমান। তবে, যতটুকু আলো আছে এতে পাকদণ্ডি দিয়ে জোরে খুব তাড়াতাড়ি যদি আমরা নেমে যেতে পারি তাহলে বাংলোয় পৌঁছে যাব অন্ধকার হবার ঠিক পরপরই। ওরা পরে আস্তে আস্তে শিকারগুলো বয়ে নিয়ে আসবে মশাল জ্বেলে, বাংলোয়।

শুভেন বলল, অন্য শিকার বাংলোয় আনবার দরকার নেই। খালি চিতাটা এবং একটা ময়ূর যেন বাংলোয় নিয়ে আসে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, চলো। বহুদিন পর আজকে ময়ূরের বার-বি-কিউ খাওয়াব তোদের। আমি যতক্ষণ তোদের খাবার তৈরি করব, ততক্ষণে তুই আর জ্যোতি মিলে চিতাটাকে স্কিনিং করে ফ্যাল।

জ্যোতি বলল, এটাকে মাদ্রাজের ভ্যান-ইনজেন অ্যান্ড ভ্যান-ইন-জেন-এই পাঠাব ভাবছি, ট্যানিং করাবার জন্য।

চিতাটা জ্যোতিই মেরেছিল। ওরই ট্রফি। সুতরাং ও যেখানে খুশি ট্যান করাতে চায়, করাক। আমি বললাম, মনে মনে।

কিন্তু শুভেন বলল, আমাদের কলকাতার পুরোনো "কাথবার্টসন অ্যান্ড হার্পার" কী দোষ করল?

বললাম, বুড়ো ফ্লেডিয়ানসাহেব তো মারা গেছেন। এখন কি আর সেই পুরোন কাথবার্টসন হার্পার আছে?

তাতে কী! শুভেন বলল। ছেলেরাও ইকুয়ালি ভালো। তাছাড়া হালদারবাবু ওঁদের পুরোনো ম্যানেজার তো আছেনই! কলকাতায়ই নিয়ে চল। কোথায় ম্যাড্রাজ পাঠাবি, শুঁটকি মাছের গন্ধ হয়ে যাবে তোর চিতার চামড়ায়।

শুভেন নিমরাজি হয়ে বলল, দেখি।

গুরবার কথামতোই পাকদণ্ডি ধরে ও আগে আগে চলল।

এক ফার্লং মতো গিয়েই পাকদণ্ডিটা পাহাড় পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উপত্যকায় গিয়ে নেমেছে। যেখানে আমাদের ডেরা। ফরেস্ট-বাংলো।

এক ফার্লং পথও আমরা যাইনি ঠিক সেই সময়ই দীর্ঘদেহী, একমাথা সাদা-চুল এবং মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফওয়ালা, মালকোঁচা-পরা ধুতি এবং তার উপর ইস্ত্রিবিহীন সাজিমাটি দিয়ে কাচা বুক-খোলা শার্ট পরা খালি পায়ের এক মুন্ডা বৃদ্ধ যেন আকাশ থেকে হঠাৎই পথে পড়ে আমাদের পথে জুড়ে দাঁড়িয়ে ডান হাতটি উপরে তুললেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

তারপরই মুন্ডারি ভাষায় আমাদের বললেন, দাঁড়াও!

গুরবা খুবই ঘাবড়ে গেল মনে হল।

অস্ফুটে, ভয়ার্ত গলায় বলল, বাঙালিবাবু!

ওর ভাবগতিক দেখে মনে হল নিরস্ত্র অবস্থায় বড়ো বাঘের সামনে পড়লেও ও এত ঘাবড়াত না।

কিন্তু সেই ভৌতিক মানুষটির মুখে রাগ ছিল না।

মুন্ডারি ভাষায় দু একটা শব্দই আমি জানি কিন্তু কথাবার্তা চালাবার মতো ভালো জানি না। তাই গুরবাকে বললাম, জিজ্ঞেস করো তো এগিয়ে গিয়ে উনি কেন আমাদের রাস্তা আটকালেন?

গুরবা ওঁর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মুন্ডারি ভাষাতে কী সব বলল। কিন্তু বুঝলাম শুধু শেষের বাক্যটিই : বাঙালিবাবু!

বাঙালিবাবু পরিষ্কার বাংলায় খুবই বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনারা বাঙালি?

শুভেন থতোমতো খেয়ে বললে, হ্যাঁ।

ছিঃ! ছিঃ শিক্ষিত লোক হয়ে আপনারা শিকার করেন? কোন অধিকারে বনের পশু-পাখি মারেন আপনারা?

জ্যোতি একটু উদ্ধত প্রকৃতির এবং খর-মেজাজের মানুষ। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দেওয়া পারমিটের অধিকারেই।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট পারমিট দেবার কে?

ঠোঁটকাটা জ্যোতি বলল, তা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

বাঙালিবাবু জ্যোতির কথায় উত্তর না দিয়ে আমাকে বললেন, আপনারা এই তিনজনেই এসেছেন?

জ্যোতি কথা কেড়ে বলল, হঠাৎ এই প্রশ্ন? তিনজনই কি যথেষ্ট নই?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম না না আমাদের আর এক বন্ধু ম্যাকলাস্কিও আছে। সে স্কটসম্যান। কাল রাতে মাচা থেকে নামবার সময় পায়ে চোট পাওয়াতে আজ আসতে পারেনি। বাংলোতেই আছে।

জ্যোতি বলল, রোদে ইজিচেয়ার পেতে ঠ্যাং তুলে নভেল পড়েছে সারাদিন।

জ্যোতির তাচ্ছিল্যকে সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য করেই উনি বললেন, সঙ্গে সাহেবও আছে? তবে তো আর কথাই নেই। আপনাদের আর ছোঁয় কে? সাহেবি আমলেও সাহেবদের এত প্রতিপত্তি ছিল না এই দেশে, দেশ স্বাধীন হবার পর এখন যেমন হয়েছে। বাঙালির মতো এমন সাহেব-চাটা জাতও তো আর নেই! এত বছরেও ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স কাটাতে পারল না তারা।

জ্যোতি বলল, অন্ধকার হয়ে আসছে, আমাদের তাড়া আছে, এখুনি না নামলে সময় মতো বাংলোয় পৌঁছোতে পারব না। সঙ্গে একটা টর্চও নেই। রাত হয়ে যাবে যে, তা তো ভাবিনি।

কোন বাংলোয় উঠেছ? এখানে তো বাংলো আছে দুটি।

বৃদ্ধ তুমি করে বলাতে জ্যোতির বোধ হয় আত্মাভিমানে লাগল। রাগের গলায় বলল, শালডুংরি।

ও।

তারপর স্বগতোক্তির মতোই বললেন, অনেকদিন বাংলায় কথা বলিনি শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে।

তারপরই বললেন আবার, কতদিন থাকা হবে?

জ্যোতিই কথা বলছিল আমাদের হয়ে। ও বলল, আমরা পরশুদিনই চলে যাব।

তারপর আমাকে দেখিয়ে বলল, আমাদের বন্ধু সত্যেন থাকবে আরও দশ দিন। একাই। ওর একটু লেখাটেখার বাতিক আছে তো। রাইটিং-বাগও কামড়ায়নি এমন বাঙালি তো কমই! আসলে এই কাব্যিরোগেই খেল তো জাতটাকে!

তাই-ই। বাঃ। বাঃ। তাহলে তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়েই যাবে একদিন না একদিন টিগেরিয়া অথবা চাঙ্গোলার হাটে। তখনই কথা হবে। এখন তবে শিকার করা ছেড়ে দাও। আমিও একসময় অনেক শিকার করেছি। কিন্তু বড়োই অপরাধ বোধ করি এখন। তাছাড়া পাপও লাগে। পাপ যে লাগে, তা এখন বুঝবে না, পরে বুঝবে।

জ্যোতি বলল, ভেবে দেখব আপনার কথা। এখন চলি।

বলেই গুরবাকে সামনে ঠেলে দিয়ে নিজেও এগিয়ে গিয়ে পাকদণ্ডি দিয়ে নামতে লাগল।

আমার খুবই খারাপ লাগল। শত হলেও বৃদ্ধ মানুষ, এবং আর যাই হোক মানুষটি নিশ্চয়ই খুব ইন্টারেস্টিং। নাহলে আমাদেরই মতো যৌবনে একদিন শিকার করতে এসে এই রকম জঙ্গলে জংলি মেয়ে বিয়ে করে নিজেও জংলি হয়ে গিয়ে এমন করে থেকে যেতে পারতেন না। অসাধারণ কোনো প্রকৃতি এবং দৃঢ়তাও তাঁর মধ্যে না থাকলে এই ব্যাপার সম্ভবই হত না। অসাধারণত্ব মানেই বিরাটত্ব নয়। বা মহত্ত্ব নয়। সাধারণ্যের ব্যতিক্রম হলেই তা হয় অসাধারণ। এইসব মানুষ সম্বন্ধে জানতে ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। ব্যতিক্রমী মানুষ তো বেশি নেই। ক্রমশই তাদের সংখ্যা কমে আসছে। জ্যোতির উপর এজন্যে খুবই রাগ হল। যে তরুণরা তারুণ্য গর্বে বার্ধক্যকে অপমান করে তাদের যাই-ই হোক শিক্ষিত বলে আমি অন্তত মানতে রাজি নই।

ওরা সবাই এগিয়ে গিয়েছিল। ওদের দিকে যেতে যেতেই বৃদ্ধকে বললাম, কিছুটা জ্যোতির দোষস্খালনের জন্যও; আমি আপনার কাছে আসব একদিন।

আমি কোথায় থাকি তুমি কি জানো?

উনি আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন।

গুরবাকে নিয়ে আসব। ও নিশ্চয়ই জানে।

হ্যাঁ, গুরবা তো জানেই। এসো। তুমি লেখক শুনে খুবই ভালো লাগল। আমিও লেখক ছিলাম একদিন। তবে আমার লেখা কোথাও ছাপা হয়নি।

তখন আর কথা বলার সময় ছিল না। দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছিল। টুপি না থাকায় মনে হচ্ছিল মাথার উপর কেউ যেন বরফের চাঁই বসিয়ে দিয়েছে। রাইফেলটা দুকাঁধের উপর ফেলে দু হাতে সেটা লাঠির মতো ধরে বড়ো বড়ো পা ফেলে আমি জ্যোতিদের অনুসরণ করলাম। অন্য কিছুই বলার সময় ছিল না। কোনো বিদায়-সম্ভাষণও নয়। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার যেমন মিশে যায় তেমন করেই বৃদ্ধ মিশে গেলেন অন্ধকারে। আমি দ্রুত নামতে লাগলাম শীতসন্ধ্যার পথপাশের পুটুসের ঝাড়ের তীব্র-কটুগন্ধী পাকদণ্ডি বেয়ে।

যে বড়ো মদ্দা বাঘটি মারার জন্যে আমরা গত সাতদিন অনেকেই চেষ্টা করলাম, মাচায় বসে, জিপে ঘুরে, হাঁকোয়া করে সেই বাঘ মারতে পারা তো দূরস্থান, তাকে একবার চোখে দেখাও দেখা হল না। আমাদের সকলেরই মন খারাপ ছিল সেই কারণে।

গুরবা বলেছিল, এই বাঘের নাম চান্দা-রাজা। একে যদি কেউ মারতে পারে তাকে চাঁদের বরপুত্র হতে হবে। এর "জান" নাকি নরম হয়ে আসে শুধুমাত্র পূর্ণিমার রাতেই। সেই রকম কোনো উজলা রাতে একে কায়দা করতে পারলে তবেই সে শিকারি চান্দা-রাজাকে পাবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করতে পারে।

দীর্ঘদিন বনে-জঙ্গলে থাকাতে মানুষদের মনে কত রকমের সু এবং কু-সংস্কারই যে জন্মে যায়।

শুনেছিলাম, মায়ের কাছে যে, আমার জন্মস্থানে চন্দ্র আছে। কিন্তু কেন যেন আমার সেই চান্দা-রাজার প্রতি আর কোনো ঔৎসুক্যই রইল না। আজ লাঞ্চের পরেই জিপ নিয়ে ওরা সকলেই চলে যাবে। ট্রেন ধরবে রায়পুর থেকে।

অথচ সেই বৃদ্ধ বাঙালিবাবুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই কেন যেন চান্দা-রাজার উপব আমার আর কোনো আকর্ষণই আর নেই। মনের মধ্যে চান্দা-রাজার জায়গা কেড়ে নিয়েছেন সেই বৃদ্ধ। মন কেবলই বলছে, এই বুড়োর মধ্যে অনেক গল্প, অনেক রহস্য জড়িয়ে আছে। মধ্যপ্রদেশের এই জঙ্গলে এ জীবনে আর কখনও আসব কি না তারও কোনো ঠিক নেই। চান্দা-রাজা অথবা সূর্য-রাজা আরও অনেক জঙ্গলেও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু এই মানুষটির রহস্য ভেদ এখানে না করে গেলে আর কখনও করা হয়ে উঠবে না।

কাল বিকেলে ম্যাকলাস্কি আর শুভেন যখন চান্দা-রাজারই আশায় মাচায় বসতে যাচ্ছিল জিপে করে, পথে নাকি ওই বাঙালিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওদের। উনি হাট করে ফিরছিলেন। কথাও হয়েছে তাঁর ওদের সঙ্গে। ম্যাকলাস্কি তো এখনও উত্তেজিতই হয়ে রয়েছে। চান্দা-রাজার সঙ্গে দেখা হলেও বোধ হয় সে এতখানি উত্তেজিত হত না। সে এবং শুভেন যা বলল, তা সত্যিই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। সেই বাঙালিবাবু নাকি স্কটল্যান্ডের ম্যাকলাস্কিকে "হ্যাগেস"-এর গান পর্যন্ত শুনিয়ে দিয়েছেন। সে বুড়ো নাকি ইংল্যান্ডে তো বটেই, স্কটল্যান্ডেও বেশ কিছুদিন ছিলেন। ওঁর যৌবনে। সেই সময়ের খুব কম ভারতীয়ই ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতেন বা স্কটল্যান্ড দেখেছিলেন। পেশায় নাকি ছিলেন পদার্থবিদ। ট্রম্বের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের গোড়াপত্তনের ব্যাপারে জওহরলাল

নেহরু নাকি হোমি ভাবা সাহেবের উপর সমস্ত দায়িত্ব দেবার আগে এই বাঙালিবাবুকেই অনুরোধ করেছিলেন ভারতের অ্যাটমিক কমিশনের ভার নেবার জন্যে।

আমার কিন্তু বিশ্বাস হল না শুনে। যে মানুষ প্রথম আলাপেই নিজের সম্বন্ধে এত কথা বলেন, সে মানুষ সম্ভবত জাল। দু নম্বর। আজকালকার অধিকাংশ শিক্ষিতদের মতো। যাদের শিক্ষা শুধু অক্ষর পরিচয়েই এসে থেমে গেছে।

ম্যাকলাস্কি বলল, এত সুন্দর অকসোনিয়ান অ্যাকসেন্টের ইংরিজি সে খুব কম ভারতীয়র মুখেই শুনেছে। আমাদের সকলের ইংরিজিতেই নাকি দেশজ টানটুন থাকেই। যা আমাদের কানে লাগে না, ওদের কানে ঠিকই ধরা পড়ে!

শুভেনও যেন মত পালটেছে। বলছিল, এ বড়ো রহস্যময় বুড়ো। রোদবৃষ্টিতে পোড়া চেহারায় সেই বৃদ্ধ যে গুরবার বাবা কি জ্যাঠা নয় এই কথা বিশ্বাসও করা যায় না। পায়ে জুতো নেই, পরনে হাঁটুর উপর তোলা মোটা ধুতি আর হাট থেকে কেনা ছিটের জামা, বোতামবিহীন। এলোমেলো সাদা চুল-দাড়ি। এই বুড়ো হয় পাগল, নয় শয়তান।

লাঞ্চের পর ওরা সকলেই চলে গেল। ওদের রায়পুর স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ড্রাইভার যুগলপ্রসাদ আবার জিপ নিয়ে ফিরে আসবে।

আমার হাতে একটা বড়ো লেখা ছিল। সম্পাদকের সনির্বন্ধ অনুরোধে তা শেষ করে নিয়ে যেতে হবে কলকাতায় ফেরার আগে। এখান থেকে ফিরেই জমা দিতে হবে দপ্তরে। কলকাতায় ওদের সঙ্গে ফিরে গেলে লেখাটা শেষ করতে অনেক বেগ পেতে হত। কলকাতায় শান্তিতে, বিনা উপদ্রবে কিছু করারই জো নেই। তাই-ই থেকে যাওয়া। আমার ছুটিও শেষ হতে বাকি ছিল এখনও দু সপ্তাহ। থাকতে তাই অসুবিধেও ছিল না কোনো।

বিকেলবেলায় বাংলোর বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে, চেয়ারের দুটো লম্বা হাতলে দু পা তুলে দিয়ে সাতপুরা পর্বতমালার উঁচু এবড়োখেবড়ো পাঁচিল যেখানে মেঘের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। একটা ক্রেস্টেড ইগল ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে সেই পাহাড় ছাড়িয়ে শীতের বিকেলের নির্মেঘ আকাশের নীল চাঁদোয়া ফুঁড়ে যেন কোনো অন্য গ্রহের দিকে উড়ে যাওয়ার চক্রান্ত করছিল। বাংলোর চারপাশ থেকে তিতির ডাকছিল চিঁহা-চিঁহা-চিঁহা করে। বাংলোর হাতার সামনের কাঁটাতারের পাশে ঘর হয়ে গজিয়ে-ওঠা ল্যান্টানা ঝোপের নিচে নিচে সেভেন-সিস্টারস পাখিরা নড়েচড়ে, সরে সরে তাদের কর্কশ ডাক ডেকে পরিবেশের নিথর নিস্তব্ধতাকে বারে বারে চমকে দিচ্ছিল। চৌকিদারের বউ কুয়ো থেকে জল তুলছিল। লাটাখাম্বার আওয়াজ উঠছিল ক্যাঁচোর-কোঁচোর। বাংলোর পেছনে শালডুংরি বস্তি থেকে কোন মা তার 'দুখিয়া' নামের শিশুসন্তানকে দূরে উপত্যকার দিকে চেয়ে বারেবারে উদ্বিগ্ন ডাকছিল। বোধ হয়, সে ছাগল চরাতে গেছে, বনের গভীরে।

বাংলোর বারান্দার সামনে, রোজই ক্যাম্প-ফায়ার হয়েছে সন্ধের পর এই ক-দিন। সেখানে ময়ূরের বার কি-কিউ, কোটরা হরিণের কাবাব এই সব বানিয়েছে শুভেন। আজ কাঠ কিছু কম পড়ে গেছে। এতদিন বাজে-পুড়ে যাওয়া একটা মস্ত হলদু গাছের গুঁড়ি আমাদের উত্তাপ জুগিয়েছে। সে-ও আজ সকালে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত।

চৌকিদার পেছনের জঙ্গলে মরা গাছের ডাল কাটতে গেছে রাতের আগুনের জন্যে। তার টাঙ্গির কোপের খটাখট আওয়াজ বাংলোর প্রাচীন দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার তারই দিকে। বুমেরাং-এর মতো।

একটু পরেই রোদ পড়ে যাবে। উষ্ণতা মরে গিয়ে ঝুপ করে শীতার্ত অন্ধকার নেমে আসবে অদৃশ্য অতিকায় বাদুড়ের মতো আদিগন্ত ডানা মেলে। বনপথের দু পাশের লাল-ধুলোমাথা গাছগাছালি, ঝোপঝাড় এক বিনি-পয়সার মৃত্তিকাগন্ধী আতরে গন্ধবতী হবে। এই রকম রাতে, এই

রকম বাংলোর বারান্দায় বসে আগুনের ফুটফাট স্বগতোক্তির মধ্যে সেই বাঙালিবাবুর মতো কোনো মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে বড়ো সাধ যায় আমার।

কাল সকালে লেখালেখি সেরে, চান করে নিয়ে নাস্তা খেয়ে গুরবাকে নিয়ে আমি যাবই তাঁর কাছে।

বলেও রেখেছি গুরবাকে।

বাড়িটা অতি সাধারণ, সামান্য। যেমন আর দশজন মুণ্ডাদের বাড়ি হয়। তফাত এইটুকুই যে, বাড়িব চারপাশে শৌখিন গাছগাছালি, যা এই বন পাহাড়ের জংলি গাছপালা নয়, তা-ও অনেক আছে। বড়োও হয়েছে বেশ তারা। অনেকদিন আগে লাগানো জ্যাকারান্ডা, আকাশমণি বা আফ্রিকান টিউলিপ, কেসিয়া নড্যুলাস, সোনাঝুরি, অমলতাস, দুটি ইউক্যালিপটাস, একটি সজনেগাছ, একটি কাঠালিচাঁপা, এবং দুটি কদম। কদম অবশ্য এই জঙ্গলেও হয়। জঙ্গলে বেলও হয়।

তবে এরা মানুষের হাতে সযত্ন-বর্ধিত। জঙ্গলের নয়। এককালে যেখানে একটি তোরণের মতো করা ছিল বোগেনভিলিয়া এবং বুনো জুঁইয়ের তলা দিয়ে, যে তোরণের নিচ দিয়ে বাড়ির উঠানে ঢুকতে হত, এখন তা অনেকটাই বিস্রস্ত, এলোমেলো।

উঠোন মধ্যিখানে। তিনটি ঘর তিন পাশে। ঘরগুলির মাটির দেওয়ালে বনজ রং দিয়ে আঁকিবুকি করা। রং এখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

লক্ষ্মী শুধুমাত্র কুলুঙ্গির মধ্যেই থাকেন না। যে বাড়ির লক্ষ্মী চলে যায় সে বাড়ির সামগ্রিক চেহারাতেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ বাড়িরও তেমনই। গেট দিয়ে ঢুকতেই মনে হল এই বাড়ি কোনো লক্ষ্মী নারীর পরশ পেয়েছিল একসময়। সেই নারীই ছিল লক্ষ্মীর দূতী। নারীহীন বাড়িতে লক্ষ্মী যদি থেকেও যান, তবুও সে বাড়িকে বড়োই হতশ্রী ঠেকে চোখে।

উঠোনে দাঁড়িয়েই গুরবা ডাক ছাড়ল ''বাঙালিবাবু'' বলে।

ডানদিকের ঘর থেকে একজন সদ্য যুবক বেরিয়ে এল।

তার পরনে লাল রঙের ব্যাংলনের গেঞ্জি। নিচে জিনসের ট্রাউজার, পায়ে টায়ারসোলের চটি। মাথায় বাবরি চুলের শেষ প্রান্তে গেঁথে-রাখা ক্যাটকেটে হলুদ-রঙা প্লাস্টিকের একটি কাঁকই। তার হাবভাব বেশ উদ্ধত। দেখে মনে হল, বয়সে আমার চেয়ে সে অনেকটাই ছোটো হবে। তবে আদিবাসীদের সুস্বাস্থ্যর কারণে তাদের প্রায়ই বয়সের চেয়ে কমবয়সি মনে হয়। ছেলেটি কৈফিয়ত চাইবার গলায় গুরবাকে কী যেন বলল, ওদেরই ভাষায়। আমরা আসাতে সে যে খুশি হয়নি তা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল চোখের ভঙ্গিতে এবং ঠিক সেই সময়ই ঘর থেকে সেই বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। গুরবার বাঙালিবাবু। হাতজোড় করে বাঙালি কায়দায় বললেন, নমস্কার! নমস্কার! এসো ভাই এসো। উঠোনেই বসি। কি বলো? রোদ তো এখন মিষ্টিই লাগে। এই রোদ আর হাওয়া আর জল ছাড়া আর তো কিছুই নেই আমাদের এখানে। কিন্তু পনেরো দিন থাকো, কলকাতায় আর ফিরতেই ইচ্ছা করবে না।

বলেই, দুটি শালকাঠের তক্তার উপর পেরেক মেরে বানানো একটি টুল ঘরের ভেতর থেকে টেনে এনে আমাকে বসতে দিলেন।

ঠিক সেই সময়ই সেই যুবক উদ্ধত ভঙ্গিতে বৃদ্ধকে কী যেন বলল।

বৃদ্ধ ওদিকে মুখ পর্যন্ত না ফিরিয়ে উত্তেজনাহীন নির্বিকার গলায় জবাব দিলেন।

নিরুত্তরে সেই উদ্ধত যুবক চলে গেল গেট পেরিয়ে গ্রামের দিকে। একটু পরই তার লাল-রঙা ব্যাংলনের গেঞ্জি হারিয়ে গেল শীতের ধূলিমলিন সবুজ হিজিবিজি জঙ্গলের গভীরে।

বৃদ্ধ বললেন, ভেবেছিলাম আজ চাঙ্গোলার হাটেই দেখা হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে বিকেলে। তা না, ভালোই হল, তুমি নিজেই এলে বাড়ি বয়ে।

আমি এরপর ওঁকে নিয়ে পড়লাম। যে কারণে আসা। আমার উৎসুক প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ যা বললেন ধীরে ধীরে, তাতে আমার মন ভরল না। ভেবেছিলাম, শহরের লেখাপড়া জানা সচ্ছল মানুষ আমি, আমার এই জংলি, গরিব, অসহায়, একাকী বৃদ্ধের প্রতি এই অস্বাভাবিক ঔৎসুক্য ওঁকে গর্বিতই করবে। কিন্তু মনে হল "গর্ব" নামক অনুভূতিটি এই বৃদ্ধের মস্তিষ্ক ছেড়ে চলে গেছে বহু বছর হল।

বৃদ্ধ বললেন, খুব নিচু স্বরে · এই পৃথিবীতে বড়ো বেশি কথা হয়। তাই না? যার নিরানব্বই ভাগই বলা না হলেও মানুষের কোনোই ক্ষতি ছিল না। বয়সও হয়েছে বিরাশি। অনেকই অপ্রয়োজনীয় অবান্তর কথা বলেছি এই এক জীবনে। এত বাজে কথা বলার নিজেকে এখন সব সময়ই ধিক্কার দিই। বলেছি বেশি, শুনেছি কম। তাই যে কটা দিন বাকি আছে; সে কটা দিন একটু ভাবতে চাই, শুনতে চাই। মানুষের মনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এই জঙ্গলের, পাহাড়ের, ঘনান্ধকার রাতের কি বলার আছে সেই সব। তুমি তো শিকারি সত্যেন। এদের কথা কখনও কি শুনতে চেয়েছ? বনে জঙ্গলে তো ঘুরলে অনেকই তুমি?

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম।

বৃদ্ধ নিজের ঘরে গেলেন, ফিরে এলেন হাতে একটা মলিন, ছিন্ন, মোটা অ্যালবাম নিয়ে। অ্যালবামটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, চা খাবে তো?

তারপর আমার জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বললেন, আমি তিরিশ বছর আগে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। তবে তুমি আসতে পারো ভেবে, কালই বিকেলে বস্তি থেকে একটু চা এনে রেখেছিলাম। তুমি বাসো, আমি চা করে আনছি তোমার জন্যে। অবশ্য নামেই চা। গরম জলেরই নামান্তর।

আমাকে আপত্তি করার কোনো সুযোগ না দিয়েই সেই বৃদ্ধ নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। বুঝলাম, ঘরেরই মধ্যে একপাশে রান্নাবান্না করেন।

ফিরে এসে, নিজে ঘরের দাওয়াতে বসে, মুখটি জঙ্গলের দিকে ফিরিয়ে বললেন, ছবিরা কথা বলে, জানো!

কথাটা আমাকেই বললেন, না জঙ্গলকেই, তা বোঝা গেল না।

আবারও বললেন, এ অ্যালবামে তোমার অনেক প্রশ্নেরই উত্তর ছবি হয়ে ফুটে আছে। এর পরও যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে শুধু সেটুকুই শুধিয়ো।

বৃদ্ধ, আমাকে এবং বোধহয় জঙ্গলকেও একই সঙ্গে বললেন আবার।

অ্যালবামের প্রথম পাতাটি খুলেই আমি একেবারেই চমকে গেলাম। একজন পুরোদস্তুর সাহেবি মানুষ, ব্রিচেস-পরা। পায়ে যোধপুরী শিকারের বুট। উপরে শুটিং-জ্যাকেট। জ্যাকেটের বুকের দুদিকে রাইফেলের গুলি রাখার খাঁজ কাটা পকেট। মাথায় অলিভ-গ্রিন রঙের গরম কাপড়ের "বেরে" ক্যাপ। মুখে পাইপ। সেই পাইপের কাছের মসৃণতা ফোটোতে এখনও উজ্জ্বল। খুব উচ্চ

বর্ণের পাইপ। মনে হল, ডানহিল। কাঁধে, ঝকঝকে নীলাভ-কালো রং করা ব্যারেলের রাইফেল। অস্ট্রিয়ান, ইংলিশ বা জার্মান। দীর্ঘদেহী, সুগঠিত সুঠাম সাহেব সুপুরুষ।

ছবিগুলির মধ্যে একটি ছবি বোধহয় গরমের সময় তোলা। খাকি শর্টস পরা, পায়ে পাতলা রাবার সোলের শিকার করার জুতো, গায়ে সাফারি-শার্ট, হাতে ডাবল-ব্যারেল, হেভি-বোরের রাইফেল। পায়ের কাছে একজোড়া কেঁদো বাঘ মরে পড়ে আছে। জঙ্গলেরই ভেতরে তোলা ছবি।

অ্যালবামের পরের পাতাটি জুড়ে একজন অসামান্য জংলি রূপসী। নিমফুল আর করৌঞ্জের তেল-মাখা মসৃণ-মুখের দীর্ঘদেহী সুতনুকার, এক মুন্ডা যুবতীর ছবি। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি তো নয়, যে বসন্ত বেজেছে নবীনা অমলতাস গাছে। তার পরের পাতাতেই তাঁরই, প্রায়-বিবস্ত্র ছবি। গ্রীষ্মের শুকিয়ে যাওয়া সাদা বালির নদীরেখার বুকে পত্রহীন জঙ্গলের পটভূমিতে দাঁড়ানো। কটিদেশে ফুলের ঝালর। উন্মুক্ত, উদ্‌বেল স্তনদ্বয়। মুখে, পবিত্র বনবালার স্নিগ্ধ বৈশাখী ভোরের মতো হাসি ছাড়া আর কোনোই প্রসাধন নেই। আর তার পরের পাতাতে এই বাড়িটিরই একটি ছবি।

বাড়িটি তখন আরও অনেকই সুন্দর ছিল।

তারও পরে পাতায় উঠোনে হামাগুড়ি-দেওয়া একটি উলঙ্গ শিশুর ছবি তোলা হয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গিমায়। আরও পরে, অ্যালবামের প্রায় শেষে বৃদ্ধের যৌবনকালের ছবি কিন্তু তিনি তখন দ্বিজ। জনমে দ্বিজ নয়, জীবনে দ্বিজ। খালি পা, খালি গা; কোমরে মালকোঁচা-মারা মোটা ধুতি পরে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে যাচ্ছেন।

আরও পরে অ্যালবামের শেষের দিকে সেই যুবক-যুবতীর যখন প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে পৌঁছেছেন, তখনকার দিনের কিছু ছবি। শিশু তখন কিশোর।

তারপরে আর কোনোই ছবি নেই। সব পাতাই ফাঁকা।

আমার মনও ফাঁকা হয়ে গেল। বৃদ্ধর প্রতি, কেন জানি না, এক ধরনের শ্রদ্ধামিশ্রিত গভীর বিস্ময় জন্মাল।

গ্লাসে করে চা নিয়ে উনি বাইরে এলেন। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে আমি গুরবাকে বললাম, আর একটা গ্লাস আনো, তোমাকে চা দিই। উনি বললেন, না, না, না, তুমি দেবে কেন? আমাদেরও বানিয়েছি। আস্ত গ্লাস একটাই ছিল, তাই আগে এনে দিলাম অতিথিকে। আমরা জংলি লোক, তাই ফুটোফাটাতেই চলে যাবে আমাদের। তোমারই খাতিরে আজ আমিও খাব।

ঘরে গিয়ে দুটো অতি কম দামি, ফাটা এবং নীলাভ কাচের গ্লাস এনে একটা গুরবাকে দিয়ে এবং একটা নিজে নিয়ে তাঁর ঘরের দাওয়ার খুঁটিতে আবারও হেলান দিয়ে বসে পা দুটো বুকের কাছে জড়ো করে বৃদ্ধ চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, আ-হঃ! অনেকই বছর পরে চা খেলাম। বুঝলে সত্যেন!

শব্দ করে চা-খাওয়া সাহেবি কেতায় বেজায় অসভ্যতা। এককালের পুরোদস্তুর সাহেব এই বৃদ্ধ যে পুরোপুরিই জংলি হয়ে উঠেছেন তাতে আমার সন্দেহ রইল না কোনোই।

আমিও গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম, চা তো খেলেই পারেন।

বৃদ্ধ হাসিমুখে বললেন, অপ্রয়োজনীয় বিলাস আর কিছুই রাখিনি এখন তবে যা কিছুই আমি একদিন ছেড়ে দিয়েছিলাম একে একে; আমার ইংরেজি জানা গর্ব, সাহেবি পোশাক, নানা নেশার বিলাসিতা সবই ফিরে আসছে আমার একমাত্র বংশধরের মধ্যে। যদিও ও শিক্ষার আলোর মুখ পর্যন্ত দেখেনি এবং দেখবে বলে মনেও হয় না। তবু এই ফালতু ইংরিজিয়ানার অনুষঙ্গুলো ওর মধ্যে পুরোপুরি সোচ্চার এবং প্রবল দেখতে পাই।

"অনুষঙ্গ" ও "সোচ্চার" শব্দ দুটিতে চমকে উঠলাম আমি। বৃদ্ধ যে বাংলা ভালোই জানেন সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। সাধারণ বাংলা জানা লোকে এইসব শব্দ ব্যবহার করেন না।

অন্যমনস্ক গলায় বৃদ্ধ বললেন, আমার জীবনটা বৃথাই হয়ে গেল। যে বিশ্বাসে ভর করে আমার সব প্রাপ্তিকেই তথাকথিত অপ্রাপ্তিতে পর্যবসিত করেছিলাম সেই সব অপ্রাপ্তিরই কামড়ে আমার একমাত্র সন্তানের শরীরমন বুঝি জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। আমি এক সময়ে যা ছিলাম, তার সবটুকু বিলীন করেই অন্য-আমি হয়ে উঠেছিলাম, আমার ছেলে আমার ফেলে-দেওয়া জীবনকেই অনেক বেশি দামি বলে মনে করল।

আমি চুপ করে রইলাম বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে।

পরে শুধোলাম, কেন?

নিচু গলায় উনি বললেন, আমি হেরে গেছি, ভাই। হেরে গেছি নিজের রক্তের কাছে, আত্মজের কাছে, এখন আমার বাঁচা-মরা দুই-ই সমান।

আপনি যা বলতে চাইছেন তার পুরোটা না হলেও হয়ত তার কিছুটা বুঝেছি। কিন্তু আপনিই বা এত অভিমানী কেন? ওদের, মানে, এই নতুন প্রজন্মকে একটু বুঝিয়ে বললেই তো পারেন। অভিমান করে থেকে লাভ কি?

অভিমান?

শব্দটা উচ্চারণ করেই বৃদ্ধ হেসে ফেললেন।

বড়ই করুণ সে হাসি।

বললেন, "অভিমান" শব্দটা আজ অচল হয়ে গেছে। আজকের মানুষদের অভিধানে "অভিমান" বলে কোন শব্দ আর নেই। অভিমান তো অন্তর্জগতেরই ব্যাপার। এদের অন্তর্জগৎ বলেই কিছু নেই। "অন্তর্মুখিনতা" শব্দটাকেও ওরা ভয় পায়।

কথা কেটে আমি বললাম, এটা বোধহয় আপনি বেশি বলছেন। অন্তর্জগৎ ছাড়া কি মানুষ হয়? অন্তর্জগতের স্বরূপ, সে তো যুগে যুগে পালটে যায়ই। এইই যা। আগেও পালটেছে, ভবিষ্যতেও পালটাবে।

বৃদ্ধ যেন নিজের মনেই বললেন, আমি তো অতি সামান্য একজন মানুষ। আমি একা। আমার ভাবনাও আমার একার। আমার জীবনদর্শন বাতিল হয়ে গেছে। তাছাড়া এখন সেনাইলই হয়ে গেছি হয়তো। আমার জ্ঞানও তামাদি হয়ে গেছে। আমার সাধ্য কী যে আমি ওদের বা তোমাদের বাঁচাই? বোঝাই? যারা মরবে বলে পণ করেছে, তাদের বাঁচানো যে বড্ডই কঠিন।

চায়ের গ্লাস নামিয়ে রেখে বললাম, আমি কিন্তু এই কথা মানি না। আপনি বাবা! যদি বুঝিয়ে ছেলেকে বলেন, ছেলে বুঝবে না? আপনার ওই বয়সে যে বুদ্ধি ছিল তার চেয়ে ওদের বুদ্ধি যে অনেকেই বেশি এই কথা কি আপনি অস্বীকার করেন?

বৃদ্ধ আবারও হেসে বললেন, বলেইছি তো। অনেক বেশি কথা বলা হয়ে গেছে। যে-কথা অন্যে শোনে না, শুনতে চায় না সেই কথা বলে নিজেকে এই বয়সে আর ছোটো করা কেন?

না, না, আপনি বলুন, আমি শুনবো।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, তুমি শুনবে সত্যেন? জানো তুমি আমি না, কুয়াশা হয়ে গেছি। জানো, কুয়াশারই মত আমি সিক্ত, বিস্তৃত, অস্পষ্ট হয়ে গেছি। তোমরা যেমন আমার মধ্যে অন্য 'আমি'কে দেখতে পাও না, তেমনি আমিও পাই না তোমাদের অন্য সত্তাকে দেখতে।

আমি চুপ করে রইলাম। কোনো মানুষ যে নিজেকে কুয়াশার সঙ্গে তুলনা করতে পারেন এমন উপমার কথা ভাবিনি।

উনি বললেন, তোমাদের প্রজন্ম হচ্ছে বিদ্যুতের প্রজন্ম। তোমরা অনেকই বোঝো। তোমরা দপ করে জ্বলে উঠে ঝুপ করে নিভে যাও। জানো সত্যেন, আমার অনেক কিছুই বলার ছিল, অনেক কিছু করারও। কিন্তু আমি কিছু করিও নি, করবও না। কারণ আমার দুটি জীবন। ব্রাহ্মণ না হলেও আমি দ্বিজ। যে-জীবন ছেড়ে এসে আমি এই জীবনে প্রবেশ করেছিলাম সেই পুরোনো জীবন এবং

এই নতুন জীবন এই দুই জীবনই আমাকে পুরোপুরি স্থিতপ্রজ্ঞ করে দিয়েছে। আমি স্থির জেনেছি যে, যে-জানা একজন মানুষ নিজের চোখ দিয়ে না জানে, না জানে তার সমস্ত জীবনের অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে, সেই জানা অন্যজন যত বড়ো পণ্ডিতই হোন না কেন, তিনি কখনই জানতে পারেন না। আমি কুয়াশা। হ্যাঁ, কুয়াশাই আমি! তোমরা বিদ্যুৎ। তোমরা আমাকে বুঝবে না। শত চেষ্টা করলেও না। না, সত্যেন।

আমি ভাবছিলাম, পৃথিবীর সব বৃদ্ধরাই বোধ হয় একই রকম কথা বলেন। কথা বলব না বলে, বড়ো বেশিই কথা বলেন। জ্ঞান দেব না বলে, সব সময়েই জ্ঞান দেন। পৃথিবীর সব শীত তাঁদের লোলমচর্ম-ভাঁজ পড়া ন্যুব্জ শরীরে এসে বাসা বাঁধে। তাঁদের হাড়ের খোঁদলে-খোঁদলে কুয়াশারই মতো জমে যায় শীত। তাঁরা কুয়াশার মতোই অস্পষ্ট। তবে 'কুয়াশা' শব্দটাকে যে এমন ভাবে ব্যবহার করা যায়, আমি নিজে একটু লেখালেখি করা সত্ত্বেও কোনোদিনও ভাবিনি। এই বাঙালি-বাবুর বাঙলা ভাষাতে রীতিমতো অভিনবত্ব আছে!

স্বল্প অভিজ্ঞতাতেও স্থির জানা ছিল যে তর্কে, বৃদ্ধ, নারী এবং কেতাবি কমিউনিস্টদের সঙ্গে খুব কমই জেতা যায়। তাই প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললাম, আপনি বলছিলেন না যে, আপনিও লেখালেখি করতেন এক সময়ে?

বোগেনভেলিয়া এবং প্যাশান-ফ্লাওয়ারের তোরণ পেরিয়ে তাঁর চোখদুটি দূর পাহাড়ে নিবদ্ধ করে বললেন, হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু সেই আমিও তামাদি হয়ে গেছি। আমি যা লিখেছি, সে সবকে লেখা বলে না। আমার কথারই মতো, সেই লেখাও তোমাদের মনে আর পৌঁছোবে না। পৃথিবী এতই দ্রুত ছুটে চলেছে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে যে, আমার ওই ঢিমেতালের লেখা পড়ার মতো মনও তোমাদের প্রজন্মে কারোই আর অবশিষ্ট নেই।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উনি বললেন, জানো সত্যেন, এই পৃথিবী সৃষ্টি হতে লেগেছিল বহু কোটি বছর। ভাবলে দুঃখ হয় যে, বিধাতার শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষ, যার উপর ভার ছিল এই পৃথিবীকে ফুল-ফলন্ত, সুখ-ভরন্ত করে রাখার, সেই অহং-সর্বস্ব মানুষই এই পৃথিবীকে কত স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রলয়ের দিকে প্রচণ্ড বেগে টেনে নিয়ে এল। এই ধ্বংসের গতি দুর্বার। একে প্রতিহত করার কোনো উপায়ই নেই। চারদিকে তাকিয়েই এ কথা বুঝতে পারি। সব কিছুই এখন আওতার বাইরে চলে গেছে, যাচ্ছে।

বলেই, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি।

এবারও কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলাম আমি। বুড়ো মানুষের একই প্যানপ্যানানি ভালো লাগছিল না আর।

বললাম, আপনি কী লিখতেন? কোথায় ছাপা হত সেই সব লেখা?

ছাপা তো কোথাও হয়নি। আগেই বলেছি তোমাকে। তাছাড়া ছাপানোর জন্যে লিখিওনি আমি। যা-কিছুই ছাপা হয় তার সবই কি ছাপার যোগ্য? এই জাল পৃথিবীতে হয়তো উলটোটাই সত্যি।

বৃদ্ধ আবারও হাসলেন। পবিত্র, উদার, কলুষহীন হাসি।

হঠাৎ গুরবা বলল, অনেক দেরি হল, এবার উঠুন সাহেব।

মনে হল ওরও অসহ্য ঠেকছিল বৃদ্ধের এই নিরন্তর বকবকানি। কথা বলার লোক পান না বলেই বৃদ্ধরা কাউকে একবার পেলে ছাড়েন না আর!

আমি লজ্জিত হলাম। বললাম, চলো, এই উঠছি।

ভাবছিলাম, এই বৃদ্ধ হয়তো উন্মাদই। এবং বড়োই বিভ্রান্তকর। খুবই গোলমেলে। আমার বুকের মধ্যে এতদিন ধরে তিলতিল করে জমিয়ে তোলা সব বিশ্বাস, ভাবনা, ধারণা, সব কিছুকেই তছনছ করে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত এই মানুষটির মধ্যে আমি লক্ষ্য করছিলাম। তবু জানি না কেন, এই শীতের রোদ্দের মধ্যে জঙ্গলের গভীরের মাটির বাড়ির বনজ গন্ধ-ভরা উঠোনে

পেরেক-মারা তক্তার টুলের উপর বসে এই মানুষটির কথা শুনতে আমি যেন বেশ সম্মোহিতও হয়ে গেছিলাম। একঘেয়েমির মধ্যেও এক ধরনের সম্মোহনী শক্তি, ঘুমপাড়ানি ভাব থাকেই। আদিবাসীদের গানেরই মতো।

কুয়াশা!

বেশ কথাটা। মনে মনে বললাম।

তারপর উঠলাম।

বললাম, উঠি আজকে।

বৃদ্ধও মাটির দাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতজোড় করে বললেন, আচ্ছা ভাই, আবারও এসো। আছ কদিন?

তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, বহুদিন পর তোমার মতো একজন মানুষের দেখা পেলাম। মানে, একজন প্রাণীর। যাকে আমারই ভাষায় এত কথা বলা গেল। কথা, সব কথা, সকলে বোঝে না। সকলকে সব বলতে যাওয়াটাও মূর্খামি।

তার মানে? আপনি এই সব কথা অন্য কাউকেও বলেছেন এর আগে?

নিশ্চয়ই। সব সময়েই তো বলি। তবে মানুষের অবয়বের প্রাণীকে বলিনি কখনও এত কথা। গাছকে বলি, আকাশকে বলি, নদীকে বলি, পাহাড়কে বলি। মুখ আমার বন্ধই থাকে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছি তো। সে তো জন্মাবধি, মৃত্যুর ক্ষণ অবধি তার কাজ করেই চলেছে। মানুষের মস্তিষ্কে তো বিশ্রাম কাকে বলে জানে না। ভাবনার ক্ষরণে তো কোনোই বিরাম নেই। যদি নেই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলারও। সত্যি! অন্য মানুষের সঙ্গে নিজের মাতৃভাষায় এত কথা বহু বছর বলিনি। হয়তো তুমি বিরক্ত হলে। বৃদ্ধরা সত্যিই বড়ো বেশি কথা বলে। তবে যদি কখনো "টাইম কিল" করার প্রয়োজন ঘটে, তখন এই বৃদ্ধের কথাগুলি ভাবতে ভাবতে তোমার সময়কে খুন করো।

গুরবা আবারও তাড়া দিল।

বলল, বড়ি দের হো গেল সাহাব।

তুম যাতে কাহে নেহি? ম্যায় ক্যা আওরত হুঁ, যো জংগল মে খো যায়েগা? তুম আগে বাড়ো, দোপেহরকা খানেপিনেকো ইন্তেজাম করনেকো বোলো চৌকিদারকো। ম্যায় আ রহা হ্যায়।'

জি সাব।

বলেই, গুরবা বড়ো বড়ো পা ফেলে এবং বোধ হয় হাঁফ ছেড়েও, সেই বোগেনভেলিয়া আর প্যাশন-ফ্লাওয়ারের তোরণের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে জঙ্গলের বাঁকে মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ও চলে যেতেই আমি বৃদ্ধকে বললাম, আপনার কাছে একটি জিনিস চাইতে পারি?

বৃদ্ধ বিস্ময়ভরে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমি তোমাকে দিতে পারি এমন কি আছে আমার ভাই? বড়ো অবাক করলে!

আপনার সেই ডায়ারির কথা বলেছিলেন। ডায়ারিটা একটু পড়তে দেবেন?

বৃদ্ধ আবারও হাসলেন।

বললেন, পড়তে দেব? শুধু পড়তে কেন? ও জঞ্জাল রেখেই বা কি হবে? তোমাকে একেবারেই দিয়ে দেব। কোনো সম্পত্তির ওপরেই আমার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই। তবে আমার বাংলা হাতের লেখা বড়োই খারাপ। কাটাকুটি, আঁকিবুকি অনেকেই আছে তাতে। আমার আঁকা ছবি। চাণ্ডোলার হাট থেকে কত বছর আগে কেনা কাগজ। সেই কাগজও অতি জঘন্য। ফাউন্টেন পেনের কালিও তো ছিল না এখানে। বড়ি-গোলা কালিতে আমার ফাউন্টেন পেনটি ডুবিয়ে লেখা। তাছাড়া, এত বছরে সেই কালির রঙও ফিকে হয়ে লালচে হয়ে গেছে। জানি না, পড়তে পারবে কি না আদৌ। একটু দাঁড়াও। আমি নিয়ে আসছি।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কদিন আছ এখানে তা বললে না তো সত্যেন?

আগামী শনিবার সকালে নাস্তা করে জিপেই চলে যাব। নইলে, জিপটা ফাঁকা যাবে। ড্রাইভারও এতখানি পথ একা।

ও। তবে তো আছই ক'দিন। ডায়ারিটা তোমার পড়া হয়ে গেলে তুমি আমাকে ফেরতও দিয়ে যেতে পারো, যদি মনে করো, তোমার কাছে বোঝা হবে। আর ইচ্ছে করলে, তুমি নিয়েও যেতে পারো। তবে অবশ্য এ কথা ঠিক, আজকে আমি ইচ্ছে করলেও এ ডায়ারিতে যা লিখেছিলাম, তেমন লেখা লিখতে পারব না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি কি থোরার "ওয়াল্ডেন" বইটা পড়েছ? থোরো এক সময় "ওয়াল্ডেন" নামের একটা মস্তবড়ো ঝিলের পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একেবারেই একা অনেকদিন ছিলেন। তাঁর সেই ডায়ারিটার নামই "ওয়াল্ডেন"। আমার ডায়ারিও ইংরিজিতে লিখলে এবং বিদেশের কোনো ভালো প্রকাশক পেলে হয়তো "ওয়াল্ডেন"র মতো কোনো পৃথিবীখ্যাত বই হতে পারত। হয়নি যে, সেই কারণে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ আমি এই ডায়ারিতে যা লিখেছি তা আজকের পাঠকদের, মানে তোমাদের ভালো লাগার কথা নয়। সময় বদলে গেছে, মানুষ বদলে গেছে, মানুষের জীবন দর্শন বদলে গেছে। তবু, কি জানি? পড়ে দ্যাখো। কেমন লাগল, তা জানালে খুব খুশি হব। তোমার এখন যেমন বয়স, তখন আমার বয়সও সেরকম ছিল। অন্য প্রজন্মের একজন মানুষের চোখ...দিয়ে...যদিও প্রশংসার কাঙাল নই আমি।

চিঠি কেন? এখানেই পড়ে, নিজেই এসে আপনাকে জানিয়ে যাব কেমন লাগল।

বৃদ্ধ বললেন, না, না। মুখে জানিয়ো না। চিঠিই লিখো।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

ভালো বা মন্দ, কোনো বিশেষ কথা কাউকে মুখে বলা যায় না। বলা উচিতও নয়। কারণ, কথার পিঠে কথা ওঠে। কারণ, যাকে তা বলা হচ্ছে তার মুখের অভিব্যক্তি এবং কথায় ও প্রতিক্রিয়ায় সব কথা সঠিক বলে ওঠা হয় না। চিঠিই ভালো। তোমাকে কেউ বাধা দেবে না, আমাকে মূর্খ বললে, পাগল বললে, তুমি ইনটারপ্টেড হবে না। চিঠিই হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা। হয়তো ছবি আঁকা বা গানগাওয়ার চেয়েও বড়ো তা। চিঠিতে আমরা একে অন্যকে যে ভাবে ছুঁতে পারি অন্য কিছুতেই তেমন পারি না। এমনকী...

আমি বললাম, কি?

এমনকী, হয়তো সঙ্গমেও না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বৃদ্ধের আধুনিকতায়।

উনি বললেন, চিঠির কোনোই বিকল্প নেই। এটি পড়ে যা তোমার মনে হয় নির্দ্বিধায় তা আমাকে চিঠিতেই জানিয়ো। আমার কাছে যা ফসিল হয়ে গেছে তা থেকে তুমি হয়তো দু-এক গাছি মৃতপ্রায় লাল-হয়ে-যাওয়া ঘাস খুঁটে নিলেও নিতে পারো। আসল কথাটা হচ্ছে, কমিউনিকেশন। চল্লিশ বছর তো মস্তই ব্যবধান!

আমাকে পড়তে দিন। আগে কিছুই বলবেন না। আমি বায়াসড হয়ে যাব।

ঠিক বলেছ।

বলেই বললেন, একটু দাঁড়াও ভাই। নিয়ে আসি ভেতরে থেকে।

বৃদ্ধ ভিতরে চলে গেলেন মাথা ঝুঁকিয়ে মাটির-দাওয়া পেরিয়ে শনে ছাওয়া ঘরের অন্ধকার অভ্যন্তরে।

উঠোনের পাশে একটি বড়ো কুচিলা বা নাক্সভোমিকা গাছ ছিল। তার মগডালে বসে একজোড়া বড়কি-ধনেশ হ্যাঁক হ্যাঁক হঁক হঁক করে কথা বলছিল। এই পাখিগুলো বড়ো শব্দ করে।

যেখানেই থাকে। আফ্রিকার জলহস্তীরা যেমন। এই পাখি আর ওই জানোয়ারের সঙ্গে পৃথিবীর সব মানুষদের বড়োই মিল।

বৃদ্ধ ঘর থেকে আবার কুঁজো হয়ে বেরিয়ে এলেন। একটি বাঁশের চাঁচ দিয়ে তৈরি চারকোনা খাঁচা নিয়ে। সেটা নিয়ে এসে, আমি যে কাঠের টুলে বসেছিলাম, তার উপর রেখে বললেন, একটু দাঁড়াও ভাই, দড়ি দিয়ে বেঁধে দিই। এটাকে নেবে কি করে?

বললাম, কিছু করতে হবে না। আমি বগলদাবা করেই নিয়ে যাব।

তা না হয় যেয়ো, একটু দাঁড়াও। ধুলোটা ঝেড়ে দিই অন্তত।

সত্যি খাঁচাটিকে বগলদাবা করে ওঁকে নমস্কার করে বললাম, যাই।

বৃদ্ধ বললেন, 'যাই' বলতে নেই! এসো।
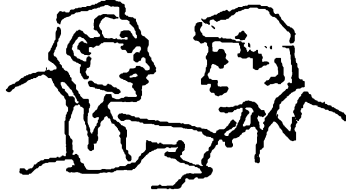
দুপুরবেলা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে উঠলাম। বিকেলে চা খেয়ে বাংলো থেকে কিছুটা গিয়েই নদীরেখা ধরে হাঁটতে গেলাম। শীতের দুপুরে ঘুমিয়ে গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ করছিল।

শীতের পাহাড়ি নদীর রূপই আলাদা। সাদা বালি, কালো পাথর, দুপাশের ঝুঁকে-পড়া ঘন সবুজ গাছগাছালির মধ্যে স্বচ্ছ জলধারা মৃদু গুঞ্জনে বয়ে চলেছে। এঁকে-বেঁকে গেছে নদী। প্রতি বাঁকেই বৈচিত্র্য।

কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই বালিতে 'চান্দা-রাজা'র পায়ের দাগ দেখলাম। একটু এগোতেই দেখলাম, যে-পাহাড়ে আমরা সেদিন ছুলোয়া করেছিলাম সেই পাহাড় থেকেই নেমে আসা একটি জানোয়ার-চলা পাকদণ্ডি পথ নদীটিকে পেরিয়ে বিপরীত দিকের প্রান্তরে চলে গেছে। এদিকে হয়তো কখনও ক্লিয়ার-ফেলিং হয়ে থাকবে। চমৎকার ঘাসি প্রান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। কানহা-কিসলির জঙ্গলে যেমন আছে। যে জায়গাতে জানোয়ারচলা পথটি নদী পেরিয়েছে, ঠিক সেইখানেই নদীর পাশে, প্রান্তরেরর দিকে একটি মস্ত অশ্বত্থ গাছ। এই গাছে বিকেলে অথবা চাঁদনি রাতে একটু ধৈর্য ধরে বসলেই, নদী পেরিয়ে চান্দা-রাজা যখন প্রান্তরে ঢুকবে অথবা প্রান্তর থেকে ফিরবে তখন তাকে সহজেই কবজা করা যেত। তার বাঁচার কোনো পথই থাকত না। আমার চলে-যাওয়া বন্ধুদের কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। 'চান্দা-রাজা'র জন্যে ওরা কম কষ্ট করেনি।

কিন্তু বৃদ্ধ বাঙালিবাবুর সঙ্গে আজ সকালে দেখা ও কথা হওয়ার পর থেকেই শিকার থেকে আমার নিজের মনটা সরে আসতে চাইছে। অবশ্য রাতারাতিই সুবোধ হতে পারব না যে, তা জানি। তবুও বৃদ্ধের কথা যে আমাকে দারুণভাবে বিচলিত করেছে, মানে তাঁর শিকার-বিরোধিতার কথা; তাও অস্বীকার করতে পারি না।

ওই অশ্বত্থ গাছে উঠে বসলে হয়তো আজই সন্ধের আগে চান্দা-রাজাকে দেখা যেত। যদি শিকার না-ও করি, 'চান্দা-রাজা'র মতো একটি বাঘকে চোখে দেখাও কম কথা নয়। ভাবলাম, এখানে তো আছি আরও কদিন। বসব, না হয় রাইফেল ছাড়াই এসে। কিন্তু আজ নয়। আমার মন পড়ে আছে বাঙালিবাবুর ডায়ারির দিকে। কী এক আশ্চর্য টান যে অনুভব করছি তা বলার নয়।

সন্ধে লাগার আগেই বাংলোতে ফিরে হ্যাজাকটি সামনে রেখে সেই ডায়ারি পড়া আরম্ভ করব ঠিক করলাম।

বাংলোতে ফিরতেই চৌকিদার এবং গুরবা বলল, রাতে কি রান্না হবে?

বললাম, খিচুড়ি বানাও। মুগের ডালের ভুনি-খিচুড়ি। সঙ্গে আলু ও ডিমভাজা। আরও বললাম ওদের যে, খানা লাগাবার অন্তত পনেরো মিনিট আগে আমাকে বলে দেবে।

ওদের এ কথা বলেই, ধড়া-চুড়ো ছেড়ে পায়জামা, গরম-পাঞ্জাবি, গরম জহরকোট আর শাল গায়ে দিয়ে এসে বসলাম টেবলে। তারপর খুললাম সেই ডায়ারির প্রথম পাতা।

... ...

কী জানি! কোন ভাগ্যলিপি আমাকে এই শালডুংরিতে টেনে নিয়ে এল। এত বছর ধরে যা কিছুকেই দামি বলে মনে করেছিলাম তার সবকিছুকেই ছেড়ে আসতে হল কার অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে!

ওরা সকলেই চলে গেছে। আমি রয়ে গেলাম। পেছন থেকে কে বা কেউ যেন আমায় তীব্রভাবে আকর্ষণ করে আমাকে এখানে রেখে দিল। সে কে বা কারা, কে জানে?

এতদিন, দেশে ও বিদেশে তো শুধু এগিয়ে চলার তাগিদ নিয়েই বেঁচে ছিলাম। পশ্চিমের শিক্ষার মূল কথাও তো তাই-ই। কিন্তু কী যে হয়ে গেল...

—সেদিন নদীর বালিতে পূর্ণিমা রাতে হনসোকে আদর করলাম।

নারী-শরীরের স্বাদ তো এই প্রথম নয়। দেশে থাকতে অবশ্য কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি। বিদেশেই প্রথম হয়েছিল। তারপর একাধিকবার সাদা শরীর। কিন্তু রাতপাখির ডাকের মধ্যে, আমার দেশের মাটিতে, আমার দেশের মেয়েকে আদর করার মধ্যে দিয়ে মনে হল যেন আমি শুধু আমার দেশকেই নয়, সমস্ত বিশ্বকেই আবিষ্কার এবং উপলব্ধি করছি। মিলন যাদের কাছে নিছকই শারীরিক আনন্দ, মনের গভীর অভিব্যক্তি নয়, তারা বোধহয় মনুষ্যপদবাচ্য এখনও হয়ে ওঠেনি।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনম সামান্যমেতাৎ পশুভিঃ নরানাং।

ধর্মহি তেষাম অধিকো বিশেষোঃ ধর্মেণা হীনা পশুভিসমানাঃ।"

হিতোপদেশের কথা।

মানুষের সঙ্গে পশুকে শুধুমাত্র মানুষের ধর্মই পৃথক করে রেখেছে। নইলে মানুষ আর পশু অনেক ব্যাপারেই সমান।

হনসো ফিশ ফিশ করে কথা বলছিল।

কথা নয় ঠিক, স্বগতোক্তি।

সব মানুষই চরম দুঃখে অথবা আনন্দে যেমন করে কথা বলে...

মন্থর হাওয়াতে কত নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ভাসছিল। বন-জ্যোৎস্নায় বিভিন্ন গাছের বিচিত্র ছায়ারা কেমন এক মোহাবরণ সৃষ্টি করেছিল। আমি নদীর বালিরেখা ধরে বহু দূর অবধি, যেখানে নদীটা বাঁক নিয়েছে সেই বাঁকের দিকে চেয়ে ছিলাম। একটি পাথরে হেলান দিয়ে আধো শুয়ে।

অত দূরে চোখ স্পষ্ট কিছুই দেখে না। বন-জ্যোৎস্না, বনছায়া, ঈষৎআন্দোলিত করৌঞ্জ এর ঝাড়, সব মিলিয়ে ওই নদীর বাঁকটিকে ভারি রহস্যময় করে তুলেছিল।

হনসো আমার কোলে মাথা রেখে টানটান হয়ে শুয়েছিল আদর খাবার পর। এই বনেরই মতো, বনের মেয়েদেরও মধ্যে যেন রহস্যের শেষ নেই। নিরাবরণ, দুধলি আলো আর কাঁপা-কাঁপা ছায়ার আল্পনা খুবই কাছে-থাকা তার শরীরটিকেও বড়ো দূরের করে তুলেছিল। ওর শরীরের স্পর্শ পাওয়া সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল ও যেন নদীর ওই দূর বাঁকেরই মতো রহস্যময়। কোনোদিনও বোধহয় পুরোপুরি ও মন অথবা শরীর দুইয়ের কোনোটিকেই জানা হবে না। ছোঁওয়া যাবে না।

আসলে, যা কিছুই প্রকৃত সৌন্দর্যের ধারক এবং বাহক তা বোধহয় এই রকমই হয়। রহস্যময়তাই বোধহয় সব সৌন্দর্যের মূল রহস্য।

এডগার অ্যালান পো রিয়ালিজমকে সহ্যই করতে পারতেন না। পোর কাছে আর্ট ছিল—"ওনলি বিউটি। অ্যান্ড ট্রু বিউটি অলওয়েজ কনটেইনড অ্যান এলিমেন্ট অফ স্ট্রেঞ্জনেস অর ভেগনেস।"

কোথায় যেন পড়েছিলাম, ইংল্যান্ডে থাকতেই, যে চার্লস ব্যোদলেয়ারের মতো বড়ো স্বতন্ত্র ফরাসি কবিও বলেছিলেন : "এডগার অ্যালান পো ওজ আ সেইন্ট।"

যে রহস্যময়তার কথা আমি বলছি, যে সৌন্দর্যময় রহস্যময়তা সেদিন রাতে একটি যুবতী শরীরের চারিয়ে দেওয়া সুখের সঙ্গে আমার শরীর এবং মনের মধ্যেও অশেষ আশ্লেষে চারিয়ে গেছিল, তা বুঝি মুনি-ঋষিদেরই অনুভবের। আমার মতো সাধারণ একজন মানুষেব বহু জীবনই কেটে যাবে এই ভয়ঙ্কর সুন্দর রহস্যময়তার গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত সত্তাকে জানতে।

সকালে বেড়িয়ে এইমাত্র ফিরলাম।

হনসো আমার ঘুম ভাঙার অনেকই আগে উঠে পড়ে। তার পর আমাকে ওঠায়। চা-খাওয়ার মতো সামান্য শখটিও কী নিঃশব্দে মরে গেল। আমার চারপাশেই এখন অনেকই রকম অভ্যেসের কঙ্কালগুলি স্তূপীকৃত হয়ে গেছে। কঙ্কাল না দেখলে হয়তো অভ্যেসগুলির অপ্রয়োজনীয়তা এমন করে প্রতীয়মানও হত না।

তবে, চা পাওয়া গেলে খাওয়া চলতও হয়তো। নেশা বা কোনও কিছুর অভ্যাস খারাপ নিশ্চয়ই। কিন্তু এই সব সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি রকমের কাঠিন্যও আমার পছন্দ নয়। আমি যে কোনো নেশাকেই পেতে পারি। পেয়েও ছিলাম অনেক নেশাকে। কিন্তু কোনো নেশা আমাকে পেয়ে বসবে এটা হওয়ার নয়। যখন নেশা করতামও অনেকই রকমের, তখনও জানতাম যে যেমন করে ধরেছি তেমন করেই হঠাৎই ছেড়ে দেব। তবে এত তাড়াতাড়ি যে তা করব তা আগে জানা ছিল না।

জীবনটা একেবারেই বদলে গেল। যে জীবনের প্রার্থনা ছিল তা পেয়েও ছিলাম। গায়ে ভালোদোকানেবানানো অর্ডারি জামারই মতো তা বেমানানও হয়নি। কাঁধ থেকে গোড়ালি, আমার কলার থেকে ট্রাউজারের ফোল্ড অবধি মাপ সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু রাতারাতি আমি মানুষটাই সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় জামাগুলি সব ঢিলে হয়ে গেল। ফেলে দিতে হল তাদের।

শুধু আমারই নয়, এই বনে-পাহাড়ে আজ তিন মাস থাকার পর হনসোদেরই একজন হয়ে যাবার পর আমি বুঝতে পারি যে, আমাদের মতো শহুরে শিক্ষিত মানুষেরা যে-জীবনের কামনা করি শিশুকাল থেকে, যার জন্যে প্রাণপাত করি, দেশে-বিদেশে জ্ঞানার্জনের জন্যে দৌড়োই, সেই ফাঁপানো-ফোলানো জীবনের কিছুমাত্রই দরকার ছিল না একজন মেদহীন ঋজু, এবং সৎ-মানসিকতার সরল স্বভাব ও সহজ অভ্যাসের মানুষের।

কিন্তু আমি যা বুঝেছি, তা অন্যাকে বোঝাই কী করে?

দরকারই বা কি? নিজে যা বুঝল, তাই-ই বুঝল।

একজন মানুষ অন্য মানুষকে এই সব গভীর ব্যাপারে কিছু বোঝাতে পারে না। ভোট চাইবার জন্যে, যশ চাইবার জন্যে, বক্তৃতাবাজি বা ভিক্ষা চাইবার জন্যে ভণ্ডামি-সর্বস্ব কাকুতি তো এ নয়! নিজের ভেতর থেকে বোঝার তাগিদ না এলে, সময় উপস্থিত না হলে, এই সব বোঝাবুঝি নিয়ে ধস্তাধস্তি করে লাভও হয় না। কিছু কেউ বা জীবনের শেষে পৌঁছে জীবনটা তার প্রার্থিত জীবনের মাপ-মতো হল কী হল না তার খোঁজ করার প্রয়োজন অনুভব করে। অনেকে বা অনেক জীবন

পেরিয়ে এসেও তার প্রয়োজন বোধ করে না। প্রত্যেক মানুষের রকম ও প্রকৃতিই যে আলাদা! যে যেমন, তাকে তেমন থাকতে দেওয়াই বোধ হয় ভালো।

এ সব জিনিসে তাড়াহুড়ো করতে নেই। করা উচিতও নয়।

নিজের নিজস্বতাকে, জীবনের সাহসিকতাকে, ঈশ্বর-বোধকে এক জীবনে যদি জানা না যায়, উপলব্ধি করা না যায়, তবে নাই বা গেল। যা সময় লাগে, দিতে হবেই। ভাত-ফোটার সময়েরই মতো।

সব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো বা শর্টকার্ট চলে না।

আজ গেছিলাম বিরহী গ্রামে। ওখানে বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে বিন্দিয়া নদীর পাশে একটি তালাও খোঁড়া হচ্ছে। শালডুংরির অনেকেই গেছে দিনমজুরি করবে বলে।

হনসোও যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ছ মাস হল গর্ভবতী হয়েছে। আমিই যেতে দিই নি। যে ক'বছর আমার পুঁজি ট্যাঁকে, সে ক-বছর ওকে একটু আরাম দিই। তারপরে দেখা যাবে।

দুপুরের অবসরে ওরা সবাই নদীর পারে বসে খাচ্ছিল। সকলেই বাড়ি থেকে ভাত নিয়ে এসেছে। কেউ একটু তরকারি, কেউ বা শুধুই নুন। শালপাতা ছিঁড়ে দোনা বানিয়ে তাতেই ঢেলে খেল ভাত। তার পর নদীতে জল খেল। খাওয়াদাওয়ার পর গাছতলায় সকলেই মিনিট পনেরো গড়িয়ে নিল মেয়ে-পুরুষ। চুটটা খেল কেউ কেউ। তার পর আবার কোদাল গাঁইতি হাতে নিয়ে লেগে পড়ল।

ওদের দেখে ভাবছিলাম যে, ওদেররই মতো পৃথিবীর সব মানুষের জীবনযাত্রাই খুব সরল সহজ হওয়ার কথা ছিল। হয়তো এরকম সুখের হবারও কথা ছিল। মানুষ নিজেই দিনে দিনে তাকে বড়ো গোলমেলে করে তুলে, নিষ্প্রয়োজনের প্রয়োজনের আধিক্য মুড়ে ফেলে এখন তার নিচে চাপা পড়ে মরছে।

প্রকৃতি, পশুপাখিরই মতো, মানুষকেও তার জীবনধারণের সমস্ত মূল উপাদান দিয়ে রেখেছিলেন। অন্য সব প্রাণীরই কুলিয়ে গেল, শুধু মাত্র মানুষেরই কুলোল না তাতে। নিত্যনতুন চাহিদায় ভাবনাহীন, গতি-সর্বস্ব এক জীবনকে সে আঁকড়ে ধরল। আধুনিক, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী, হাজার আরামে অভ্যস্ত শহরবাসী আধুনিক মানুষের মুক্তির কোনো উপায়ই বোধহয় আর নেই। সে থামবে শুধুমাত্র নিজের ধ্বংস সম্পূর্ণ হলেই। সর্বনাশ নিশ্চিন্ত হলে। এই আত্মহত্যাকামী, পণ্ডিতম্মন্য মূর্খদের অন্যে যে বাঁচাবে, এমন হবার জো-ও নেই। নিজের মৃত্যুকে সে নিজেই আহ্বান করে এনেছে। আলিঙ্গন করছে মৃত্যুকেই, জীবন মনে করে।

আমি জানি, এসব কথা বলতে গেলে কলকাতায় আমার শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে উন্মাদ বলবে। বলবে, হনসো নাম্নী মুন্ডা মেয়েটি আমার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছে। কেউ বা বলবে, দানোতে পেয়েছে আমাকে। কী করে আমি বোঝাব ওদের যে আমি যে আজ বিশ্বাস করে হাসিমুখে এই জঙ্গলের জীবনকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলাম, ওরা অথবা ওদের বংশধরেরা সকলেই আজ থেকে পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর বছর পরে এই জীবনকেই গ্রহণ করবে বাধ্য হয়ে, কাঁদতে কাঁদতে।

সময়ই বলবে, আমিই ঠিক, না ওরা।

কাল মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দাওয়াতে এসে বসলাম। কাকজ্যোৎস্নায় ছমছম করছে বন পাহাড়। কোকিল ডাকছে মুহুর্মুহু। পিউকাঁহা পাখিও। ঝিরঝিরে বাতাসে শুকনো পাতারা ইতস্তত উড়ে বেড়াবে একটু পরে।

মাঝরাতে হাওয়া থাকে না। কেমন একটা থম-মারা ভাব। এখনও রাতে শিশির পড়ে এখানে। ঝরা পাতারাও এখন ভারী। রোদ ওঠার পরে এবং বিশেষ করে দুপুরের দিকে এরা আবার ভারশূন্য হয়ে বনের বুকে মচমচানি আওয়াজ তুলে পাথরে পাথরে ছুটে বেড়াবে। হাওয়াতে নয়, এই স্তব্ধ আবহাওয়াতে মহুয়া আর করৌঞ্জের গন্ধও থম মেরে আছে। গন্ধ উড়লে একরকম, আর স্থির থাকলে অন্য রকম। বনের গভীর যাঁরা না থেকেছেন তাঁরা এসব জানবেন না।

আকাশ-ভরা তারা ঝকঝক করছে চৈত্রের মধ্য-রাত্রির আকাশে। মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক রাতপাখি, হেরন, তাদের গভীর গলার ওয়াক ওয়াক ডাক ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের ঘাড়ের কেশর চকচক করছে চাঁদের আলোয়।

রবীন্দ্রনাথের সেই একটা গান ছিল না। "ওদের কথায় ধাঁধা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি, তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।" এখন এমন মুহূর্তে ওই গানটির কথা মনে হয় আমার।

তাঁকে বুঝতে হলে, অন্তরে উপলব্ধি করতে হলে মন্দিরে মসজিদে গির্জেতে ঘোরাঘুরির দরকার কি? যে বোঝে, সে তাঁকে এমনি সহজ করেই বোঝে। দাপিয়ে বেড়াতে হয় না পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। সমাহিত, শান্ত না করতে পারলে নিজেকে, তাঁকে বোঝার কোনো উপায়ই নেই। ঘোলা জলে তো প্রতিবিম্ব পড়ে না। জল থিতোলে তবেই তা স্বচ্ছ হয়। স্বচ্ছ মন, স্বচ্ছ কলুষহীন মানসিকতা ছাড়া ঈশ্বর-বোধ তো সম্ভব না।

আমার লাইব্রেরির সব বই পরশু এসে পৌঁছেছে এখানে। সুরেশ ওয়াগনে লোড করে দিয়েছিল বি. এন. আর-এর ট্রেনে। রায়পুর স্টেশন থেকে ট্রাক ভাড়া করে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এনেছি এখানে। মাটির ঘরে কাঠের তাকে দুদিন ধরে সব বইগুলি গুছিয়েছি। এখানে বড়ো উই আছে। ওরা বলে দীমক। বইগুলো সব কেটে না দেয় উইয়ে।

বই ছাড়া, চোখ ছাড়া বেঁচে থাকার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারি না।

সেদিন পড়ছিলাম, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, তাঁর পুত্রবধূকে লেখা, শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে দেখা হওয়ার পর উনিশশো আটাশ সনের মে মাসে লেখা। ভারি ভালো লাগল পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"স্থির করেছি, এবার ফিরে গিয়ে অরবিন্দ ঘোষের মতো সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করব। কেবল প্রতি বুধবারে সাধারণকে দর্শন দেব। বাকি ছ-দিন চুপচাপ নিজের নিঃশব্দ নির্জন শান্তি অবলম্বন করে গভীরের মধ্যে তলিয়ে থাকব—অরবিন্দকে দেখে আমার ভারী ভালো লাগল। বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিকমতো পাবার এই ঠিক উপায়।...

ঠিক করেছি এখন থেকে দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্ন থাকব। কারও সঙ্গে কোনো কারণেই দেখা করব না, কেবল বুধবার দিনে নিজেকে প্রকাশ করা যাবে। আত্মীয়দের চিঠি ছাড়া চিঠি পড়ব না। গভীরভাবে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়ে থাকব। যদি লেখা জমে আসে তো লিখব। পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করে আমার মনে হল আমারও কিছু দিন এই রকম তপস্যার খুব দরকার। নইলে ভিতরকার আলো ক্রমশই কমে আসবে। প্রতিদিন যা-তা কাজ করে যা-তা কথা বলে মনটা বাজে আবর্জনায় ঢাকা পড়ে যায়। নিজেকে দেখতেই পাইনে..."

এই রকমই একটা কথা পড়েছিলাম আঁদ্রে মরোয়ার (মালরো নয়), একটি বইয়ে। বইটির নাম ছিল "দ্যা আর্ট অফ লিভিং"। তাতে মরোয়া বলেছিলেন যে, যারা কাজের লোক, যাদের জীবনে

কোনো বিশেষ ব্রত আছে তাদের এ বাবদে নিষ্ঠুর হতেই হবে। চিঠি লিখে, ফোন করে, বাড়িতে এসে যে সব লোক বিরক্ত করে, কাজের বিঘ্ন ঘটায়, তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব নিতে হবে, নইলে কাজটাই হবে মাটি। এই ছোটো জীবনে নষ্ট করার মতো সময় কোথায় মানুষের?

মারোয়া ওই সময়-নষ্টকারী মানুষদের নাম দিয়েছিলেন "ক্রনোফেজেস"।

যাঁরা জননেতা, বা অভিনেতা বা জনগণের অন্য কোনো ব্যাপারের প্রতিভূ তাঁদের কথা আলাদা। কারণ তাঁরা বহির্মুখী। তাঁদের দৌড়ে যাওয়া বাইরের দিকে। আর যাঁরা আমার মতো জঙ্গলে এসে স্বেচ্ছাতে বাস করেন তাঁদের যা কিছু দৌড় তো ভিতরে ভিতরেই। অন্তর্মুখিতাই তাই তাঁদের জীবনের সব সুখের চাবিকাঠি। কে যে জীবনে কি চায়, এ সরল সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতেই জীবন পেরিয়ে যায়, চাওয়াটা তাই প্রায়শই পাওয়াতে পর্যবসিত হয়ে উঠতে পারে না।

উনিশশো উনত্রিশে, রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, (প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) কলম্বো থেকে : "দেশে গিয়ে সম্পূর্ণ নির্জনবাসের মধ্যে তলিয়ে গিযে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেব ঠিক করেছি। ছোটো ছোটো দাবীর শিলাবৃষ্টিতে আমার দেহমনের সমস্ত ডাঁটাগুলো একেবারে আলগা হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে স্থির হয়ে থাকা ছাড়া আর ওষুধ নেই। অন্তরের মধ্যে তার একান্ত প্রয়োজনও বোধ করচি..."

নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে বাইরে এলেই, একটু নির্জনতা পেলেই বোধহয় কর্মী মানুষদের মনে নতুন নতুন ভাবের আগমন ঘটে। নতুন নতুন স্বপ্ন, পরিকল্পনা, প্রত্যয় শিকড় পায়। তবে দেখা যায় ফিরে যাওয়ার পর আবারও তাঁর নিজের জীবনের দৈনন্দিনতার ঘেরাটোপে তিনি আটকে পড়ে যান। বড়ো মানুষদেরও দৈনন্দিনতার দৈন্য থাকেই। অরবিন্দও বড়ো রবীন্দ্রনাথও বড়ো তবে অরবিন্দ অন্তরের গভীরে যতখানি বড়ো রবীন্দ্রনাথ সেই গভীরে পৌঁছোতে পারেননি কারণ তিনি লেখক ছিলেন, কবি এবং গায়কও। গান কবিতা এবং লেখা শ্রোতা এবং পাঠকদের বাদ দিয়ে চলে না। অরবিন্দর সাধনা ছিল পুরোপুরিই অন্য-নিরপেক্ষ সাধনা অন্য কাউকেই তাঁর প্রয়োজন ছিল না কোনোই। তাই তিনি "ছোটো ছোটো দাবীর শিলাবৃষ্টিতে" দেহমনের ডাঁটাগুলো আলাদা হওয়া হয়তো বোধ করতে পেরেছিলেন।

কে জানি না, আমার এই বয়সেই এমন মনোভাব হল। লোকে আমাকে 'জ্যাঠা' বলতে পারেন। কিন্তু জ্যাঠা যদি একদিন হতেই হয় তবে আগে হতেই বা ক্ষতি কি?

বড়ো বড়ো মনীষীরা সকলেই কিন্তু এই নির্জনে পালিয়ে যাবার তাগিদ বোধ করেছেন। টলস্টয় বার বার চেষ্টা করে শেষে সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী এবং ছেলেদের লিখে দিয়ে চলে গেছিলেন মাটির কাছে। স্ত্রী এবং ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কে আর বৈভব ছেড়ে স্বেচ্ছায় গরিব হতে চায়? অথবা যাঁকে জড়িয়ে তাঁদের বৈভব তাঁকে গরিব হতে দিয়ে চায়? এক সকালে স্ত্রীকে একটি ছোটো চিঠি লিখে চলে গেছিলেন টলস্টয়। সাধরণ চাষির জীবন বেছে নিয়েছিলেন। নিজে হাতে খেতের কাজ করতেন।

আমি কোনোদিক দিয়েই বড়ো নই। বড়ো হবার কোনো সম্ভাবনাও আমার নেই। শুধু অনেক বড়ো মানুষের মানসিকতার সঙ্গে একাত্মবোধ করি। এই পর্যন্ত। শুধু মানসিক একাত্মতা থাকলেই বড়োর সমকক্ষ হওয়া যায় না।

এই নিস্তব্ধ সুগন্ধি রাতে একা বসে কত কী ভাবতে ইচ্ছে যায়! ঘরের মধ্যে আমার গর্ভিনী আদিবাসী স্ত্রী পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার গায়ে এই সুগন্ধি ধরিত্রীর গন্ধ। তার বাহুমূলের, উরুসন্ধির গন্ধে আমি আমার দেশের যুগযুগান্তরের মাটির গন্ধ পাচ্ছি, সোঁদা সোঁদা। মাটি যেমন করে মাটিতে জন্মায়, জীবন যেমন করে মৃত্যুতে মাটি হয়ে জায়মান হয়, তেমনি মৃত্তিকাগ জীবনই আমি কামনা করি।

ন্যুট হামসন-এর "গ্রোথ অফ দ্যা সয়েল" বইয়ে যে বিদ্যুৎ আর কুয়াশার কথা আছে আমি তেমনই কুয়াশা হয়ে যেতে চাই। বিদ্যুৎ-এর মধ্যে ত্রস্ততা আছে। হঠাৎ চমক আছে, প্রচণ্ড শক্তি তার মধ্যে চকিতে জ্বলে উঠেই নিভে যায় কিন্তু বিদ্যুৎ নিজের ইচ্ছেতে চমকে উঠতে পারে না। সে পর-ইচ্ছাধীন। আমি কুয়াশা হতে চাই। সবকিছুকে মুড়ে, পক্ষপুটে ঢেকে নিয়ে, স্পষ্টতার দৈন্য অস্পষ্টতার ঐশ্বর্যে মাখামাখি করে কোনো জাপানি শিল্পীর ওয়াশের কাজের ছবিরই আবেশের মতো, জীবনকে একটি মুর্শিদাবাদী আতরগন্ধী বালাপোশেরই মতো অশ্লেষে গায়ে জড়িয়ে কাটাতে চাই আমার বাকি জীবন। এই জীবনের উষ্ণতা, শৈত্য, হতাশা এবং সারল্য সবকিছুই আমার পরবর্তী প্রজন্মকে, আমার উত্তরসূরিদের যেন ছুঁয়ে যায়। আমি যা ছেড়ে এসে যা পেয়েছি, ওরা যেন সেই ছেড়ে-আসাকে মুর্খামি বলে না ভেবে আমাকে আমার স্বকীয়তা এবং সাহসের জন্যে একদিন সাধুবাদ দেয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, ওরা যেন এই জীবনে সম্পৃক্ত হতে পারে। এই জীবনের নীরব আশীর্বাদ, এই রাতের স্নিগ্ধ শান্তি যেন ওদের ধন্য এবং স্নিগ্ধ করে। ওরা যে সময়ের পৃথিবীতে বাস করবে সে পৃথিবীর জ্বালা আরও অনেকই বেশি হবে আজকের পৃথিবী থেকে। ওরা যেন প্রকৃত সুখ কি এবং কোথায় তা বুঝতে ভুল না করে।

মার্গারেটের কথা আজ সকাল থেকেই খুব মনে পড়ছে।

আজ ওর জন্মদিন। ওখানে থাকলে মিডেক্স-এর ওদের বাড়ির পার্টিতে যেতাম রাতে। দুপুরে ওকে নিয়ে কোথাও লাঞ্চ খেতাম।

মার্গারেট খুবই দুঃখ পেয়েছিল। অথচ দুঃখ কিন্তু আমি দিতে চাইনি। ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না আমার সঙ্গে কলকাতায় আসা এবং থাকা। ওর মনে আমার প্রতি ভালোবাসাটা এমন তীব্র ছিল না যে, ওর নিজের নিজস্বতা এবং ওর স্বজাতির সমস্ত স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরিই ভারতীয় হয়ে বাকি জীবন কলকাতাতেই কাটাতে পারত।

আমার বেলাতেও সে কথা প্রযোজ্য ছিল। যে সব ভারতীয় মেমসাহেবের ভালোবাসা পেয়েই নিজেদের কৃতার্থ বলে মনে করেন এবং নিজের কৃষ্টি, ভাষা, সাহিত্য, নিজের সমস্ত নিজস্বতাই বিসর্জন দিতে রাজি থাকেন তাঁকে নিয়ে ঘর করার জন্যে, আমি তাঁদের দলে নই। একজন নারীর জন্যে আমার স্বদেশ ও স্বকীয়তা আমি ছাড়তে রাজি ছিলাম না। মার্গারেটও তেমন মানসিকতার ছিল না। এবং ছিল না বলেই ওকে আমি সম্মান করতাম। সে-ও হয়তো সম্মান করত আমাকে ওরই মতো করে।

যা বললাম, তা অবশ্য সাধারণদের কথা। অসাধারণ মানুষেরা এই সাধারণ নিয়মে পড়েন না। তাঁরা একে অন্যের প্রতিবন্ধক হন না বরং পরিপূরক হন। আমি ও মার্গারেট সাধারণ মানুষ বলেই পারিনি তেমন ঝুঁকি নিতে।

এখানে হনসোকে বিয়ে করে এই গহন জঙ্গলের মধ্যে ঘর বাঁধার পরে মার্গারেটকে চিঠি লিখেছিলাম আমার সুখানুভূতি এবং এই নতুন জীবনের কথা জানিয়ে। ওকে যে মনে পড়ে, সে কথাও জানিয়ে।

ওকে লিখেছিলাম যে,

"যে কারণে তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধা হল না সেই কারণটাকেই অতিক্রম করে যেতে পেরে ভারি আত্মস্থ, সমাহিত বোধ করছি এখন আমি। ভালো করলাম কী খারাপ, তা জানি না।

শুধু মাত্র ভালো-থাকা, ভালো-খাওয়া, ভালো-পরা, অন্য সব মানুষই যা করে, তা করার একঘেয়েমি ও কামনা থেকে নিজেকে এই অসময়ের বানপ্রস্থে নির্লিপ্তির সঙ্গে নিয়োজিত করে ভারি একটা আনন্দ বোধ করছি, যেমনটা লন্ডনে বা কলকাতায় থাকলেও বোধ হয় কখনও বোধ করতাম না।

তোমার সঙ্গে আমার সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, জীবনযাত্রা-গত যতটুকু অমিল ছিল, হনসোর সঙ্গে হয়তো তার চেয়েও অনেকই বেশি অমিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে প্রকৃতির সান্নিধ্য। আমাদের দেশের অরণ্য-পর্বতের সৌন্দর্য, ভারতীয় প্রকৃতির গহন গভীর রহস্যময় স্বরাট ব্যক্তিত্বের স্বরূপ তোমাদের দেশে বসে তোমরা ভাবতে পর্যন্ত পারো না। আমাদের মুনি-ঋষি, দার্শনিকেরা হাজার হাজার বছর আগেও কেন যে বনে বা পাহাড়ে আসতেন তাঁদের "বোধির" জন্যে, জীবনের মানে খোঁজার জন্যে, দিক ঠিক করার জন্যে, তা এমন পরিবেশে না এলে, বেশ কিছুদিন না থাকলে, বোঝা পর্যন্ত যায় না। আধ্যাত্মিকতাই বলো, আত্মনির্ভরতাই বলো, আর আত্মার স্বরূপ, নিজস্বতার স্বরূপকে আবিষ্কার ও যথার্থরূপে তাকে অনুভব ও উপলব্ধির কথাই বলো, এমন নির্জনে না এলে তা বোঝা আদৌ সম্ভব নয়।

কিসের জোরে যে, তোমার বেলায় যা করতে পারিনি, তা হনসোর বেলাতে অতি সহজেই করতে পারলাম সে কথা তুমি এখানে এসে যদি কটা দিনও কাটিয়ে যাও তাহলেও বুঝতে পারবে। হনসো তো তোমার চেয়েও অনেকই বেশি বিজাতীয় আমার কাছে। তোমার সঙ্গে আমার মন ও শরীর অনেক সহজে সব কিছুই চালাচালি করতে পারত। শিক্ষা, ভাষা, রুচি এবং মানসিকতার মিলও ছিল। সমতা ছিল অনেকই বেশি, অনেকই ব্যাপারে। শরীরে এবং মনে আমরা আদর্শ দম্পতি হতে পারতাম। পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো তাই-ই প্রমাণ করেছিল। কিন্তু তবুও আমরা হইনি। তুমি পারোনি ইংল্যান্ড ছাড়তে, আমি পারিনি দেশ ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে।

পাহাড়-অরণ্যের কোনো দেশভেদ নেই। জাত মানে না সে। মানুষের, সব দেশের সব কালের বিশ্বমানবের মুক্তি নিয়ে সে কোটি কোটি বছর ধরে বসে আছে আমাদেরই আসার প্রতীক্ষায়।

তুমি এলে না, তাই পেলে না।

রবীন্দ্রনাথের সেই গানেরই মতো যেন বিশ্বমানবকে নীরবে ডাক দিয়ে বলছে এই প্রকৃতি বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি,

আয়, আয় রে ফিরে আয়।

পুরোন ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি বসিবি নিরালায়, আয়, আয় রে ফিরে আয়।

মার্গারেট, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি একা অথবা যদি বিয়ে করো, তোমার স্বামী সমেতও এখানে বেড়িয়ে যেয়ো অবশ্যই একবার। যদি আসো, তবে তুমি শুধু আমার দেশকে নয়, শাশ্বত পৃথিবীকে, যুগযুগান্ত ধরে বিশ্ব মানবের প্রার্থিত প্রকৃত ধনকেই হৃদয়ে অনুভব করবে। এই প্রেম, আমার তোমার প্রেমের চেয়ে অনেক বড়ো। অনেক, অনেকই বড়ো। সমস্ত প্রেমের পরম পরিপ্লুতি এরই মধ্যে।

শিকার আমি নিজে ছেড়ে দিয়েছি একেবারেই। হনসোদের আনুষ্ঠানিক যে সব বিশেষ শিকার-যাত্রা হয়, বিশেষ বিশেষ পরবের দিনে, তাতে অবশ্য যোগ দিই। তবে তীর-ধনুক নিয়েই। কিন্তু তুমি বা তোমার স্বামী শিকার করতে চাইলে আমার আপত্তি নেই।

অন্যেরা যখন শুটিং-ব্লক রিজার্ভ করে বন-বাংলোতে থেকে শিকার করতে পারেন, তোমরাও তেমনি পারবে যদি চাও। সব বন্দোবস্তই আমি করে দেব। কিন্তু আমি তাতে অংশ নেব না। বিশ্বাস করো, শিশুকাল থেকে শিকার করছি, শিকারে নিরাসক্তি এসেছে। পরম ভোগের পর যে নিরাসক্তি আসে সেটাই প্রকৃত নিরাসক্তি। জীবনের সব ক্ষেত্রেই বোধহয় এ কথা প্রযোজ্য। আমি প্রায় নিশ্চিত এ ব্যাপারে। যতক্ষণ ভোগ না পুরো হয়, ততদিন নির্লিপ্তি কাকে যে বলে, তার ধারণা পর্যন্ত করা যায় না।

শুনে হয়তো অবাক হচ্ছ তুমি যে, এসব বিশেষ পরবের দিনেও আমি তীর-ধনুক বা বল্লম নিয়েই শিকার করতে যাই। এখন আমার মনে হয়, আধুনিক বন্দুক রাইফেল, অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতিরই মতো মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের পার্সোনাল "শিভালরি" নষ্ট করে দিয়েছে। কন্টিনেন্টে হলিডেতে গিয়ে স্পেনের আলটামিরার গুহাগুলিতে আমরা যেমন ছবি দেখেছিলাম প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের আঁকা, তাতে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র অতিকায় সব পশুদের মোকাবিলার দৃশ্যই তো আঁকা ছিল। কি? ছিল না? আমাদের এই আধুনিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এই আমরা বিজ্ঞানকে যতই বড়ো করে তুলছি এবং তুলেছি, অবশ্যম্ভাবী, অপ্রতিবোধ্য সর্বগ্রাসীই হচ্ছে তার প্রভাব আমাদের উপরে। মানুষ হিসাবে আমরা ততই ছোটো হয়ে যাচ্ছি, দুর্বল হয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত, শারীরিক ও মানসিক ভাবে। অ্যারিথমেটিক্যাল প্রগ্রেশানে আমরা ছোটো হচ্ছি, কিন্তু এক শ্লাঘা সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে জিয়োমেট্রিক প্রগ্রেশানে আমাদের মাথার মধ্যে গ্যালপিং গ্রোথের টিউমারের মতোই বড়ো হচ্ছে। এই শ্লাঘার টিউমার শিগগিরই আমাদের মতো আধুনিক বিজ্ঞানসর্বস্ব মানুষের মস্তিষ্ক দীর্ণ করে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। মানুষের অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন মস্তিষ্কের বদলে, যে-সব ক্ষমতার পূর্ণ মূল্যায়ন পর্যন্ত হয়নি এখনও, প্রোগ্রামঠাসা কম্পিউটারে মানুষ তার নিজস্বতাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেবে।

মানুষের মতো এমন মূর্খ, দাম্ভিক, অপরিণামদর্শী জানোয়ার বিধাতা আর গড়েনই নি।

বার্ট্রান্ড রাসেল তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর একটি লেখাতে বলেছিলেন যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুল্যাশনের পর, যন্ত্রের উপরে পৌনঃপুনিকতার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মানুষ তার মস্তিষ্ককে মানবিক ক্রিয়াকাণ্ডে লাগাতে পারবে।

কত বছর আগে তিনি ওই কথা বলেছিলেন! অথচ দ্যাখো, আজকে ঠিক তার উলটোটাই হল। কোথায় যে চলেছি আমরা, এই তথাকথিত জ্ঞান-ঋদ্ধ, সর্বজ্ঞ আধুনিক মানুষেরা, তা বোঝার ক্ষমতাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি।

শিকার করি, অথচ বন্দুক-রাইফেল সঙ্গে নিই না যে, কেন তার পেছনে আমার নিজস্ব যুক্তি আরও আছে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের "দ্যা ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্যা সি'তে হেমিংওয়ে এই ব্যাপারটার চমৎকার ব্যাখা দিয়েছেন। ব্যাখা হিসেবে নয়। তাঁর দীর্ঘদিনের পাহাড় জঙ্গল-সমুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে যা তিনি শিখেছিলেন তাই-ই ব্যক্ত করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে।

"দ্যা ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্যা সি'র বুড়ো সান্টিয়াগোর চরিত্রটির কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে কোনোই ঝগড়া ছিল না। সান্টিয়াগোর মনোভাব, অ্যাটিচ্যুড ছিল সমর্পণের, "রেসিগনেশন"এর। সান্টিয়াগো সমুদ্রের প্রমত্ততাতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই অতিকায় মাছটির কাছে হেরে যাবে যে, এ কথা যেন মেনে নিয়েই তার ছোটো ডিঙি নিয়ে সেই মাছটির সঙ্গে টক্কর দিতে যেত। সমুদ্রের স্বগতোক্তি শুনতে শুনতে সে খুঁজে বেড়াত।

কাকে?

তার প্রতিদ্বন্দ্বী মাছটিকে?

নাকি নিজেকেই?

প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধে নোনা-গন্ধ আদিগন্ত জলরাশির মধ্যে ছোটো ডিঙিতে ভাসমান থেকে সি-গাল আর টার্নদের বিধুর আধিভৌতিক চিৎকারে প্রকৃতির বিরাটত্বকে না মেনে যে উপায়ও নেই কোনো মানুষের। সেই বুড়োর মস্তিষ্কে এক মুহূর্তের জন্যেও এমন ভাবনা আসেনি যে, তার অনুষঙ্গ, তার পরিবেশের তুলনায় সে নিজে কোনো অংশেই বড়ো। এমন কি সান্টিয়াগো নিজেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই মাছটি থেকে বড়ো বলে কখনও মনে করেনি। মাছটিকে যে বরাবর "ব্রাদার" বলে সম্বোধন করেছে। সেই মাছটিকে সান্টিয়াগো একদিন ধরতে পেরেছিল যদিও, তবুও তিলেকের জন্যেও মাছটি যে তার থেকে কোনো অংশে নিকৃষ্ট এমন ভাবনা তার মাথায় কখনই আসেনি।

তোমার মনে থাকতে পারে মার্গারেট, সান্টিয়াগো যেখানে বলছে, "ম্যান ইজ নট মাচ বিসাইড দ্যা গ্রেট বার্ডস এন্ড বিস্টস।"

যে-সব সময়ে সান্টিয়াগো নিজেকে মাছটার চেয়ে বড়ো বলে উল্লেখ করেছে সেখানেও সে বলছে : "আই অ্যাম ওনলি বেটার দ্যান হিম থ্রু ট্রিকারি"।

আমিও যে বাঘের চেয়ে বাইসনের চেয়ে, হাতি বা বুনো মোষের চেয়ে শক্তিশালী তার সবটাই থ্রু ট্রিকারি।

জীবনের একটা সময়ে পৌঁছে "ট্রিকারি" মাত্রকেই "মকারি" বলে মনে হয় হয়তো সকলেরই। আমার যেমন হচ্ছে। মার্গারেট, একদিনও সমস্ত পৃথিবী জানতে পাবে যে, মানুষের এই শ্লাঘা, এই বিজ্ঞানসর্বস্ব, আরাম ও বিলাসসর্বস্ব কর্তৃত্ব অন্য সব প্রাণী এবং প্রকৃতিরও উপরে, এই সবই "থ্রু ট্রিকারি"।

জানি না, তুমি হয়তো আমার চিঠি পড়ে হাসছ। যেমন করে তুমি বলতে আমাকে, হাইড পার্কের প্রাচীন গাছের ছায়ায় পার্কের বেঞ্চে বসে আমার কাঁধে হাত রেখে, তেমন করেই : "অ্যা রিয়্যাল ম্যাডক্যাপ"। তোমার দুই ঠোঁটের কোনায় আর গালে সেই স্নিগ্ধ হাসির আভাস ফুটে উঠেছে নিশ্চয়ই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

মার্গারেট, আমি যাই-ই তোমাকে লিখি না কেন, তা যত্ন করে কোনো ভল্টে রেখে দিয়ো। যা বলছি তাতে হেসো না একটুও।

সত্যদ্রষ্টাদের কথা তার সমসাময়িক কোনো মানুষই বুঝতে পারে না। তারা চিরদিনেরই পাগল। প্লাটো, সক্রেটিস, স্পিনোজা, কনফ্যুসিয়াস, টলস্টয়, রাসেল—ওঁদের সকলেরই জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে টিটকিরি, গালমন্দ, ইটপাটকেল অথবা বিষ জুটেছিল। তাই বলে তাঁদের বলে-যাওয়া-কথা কিছু মিথ্যে হয়নি। যাঁরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়ে ভাবেন, তাঁদের ভাবনার কথা বুঝতে পারা তাঁদের সময়ের সাধারণ মানুষ্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কোনোদিনও সম্ভব হয়নি। আমাকে দাম্ভিক ভেবো না। আমি শুধু অন্য কালের, সর্বদেশের। আমি বিশ্ব-মানবের প্রকৃত মুক্তির কথা বলছি বার বার। তোমরা না বুঝলে ক্ষতি তোমাদেরই। যখন বুঝবে তখন আমি থাকব না। ভবিষ্যতের পৃথিবীর মানুষেরা আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে দেশে দেশে আমার মূর্তি গড়বে। এই পরিহাস প্রত্যেক দূরদ্রষ্টার ঠিকুজি। সম-সময়ের হাতে এই নিগ্রহ, সমসাময়িকদের চোখে এই তুচ্ছতা, ঘৃণা, জীবনে তারা শুধু অপমান আর অসম্মানই পায়।

মার্গারেট! কে বলতে পারে যে, তোমার নাতিরা অথবা পুতিরা তোমার সঙ্গে আমার কোনো সময়ে যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এই নিয়ে গর্বিত হবে না? তোমাকে লেখা আমার এই চিঠিগুলির একটি বিক্রি করেও তারা কোটিপতি হবে না?

হেসো না সুইটি পাই। হেসো না। ভবিষ্যৎ যে বর্তমানের কোন ধূলিকণার মধ্যে নিহিত, সুপ্ত থাকে, তা কে জানে? ভবিষ্যতের কথা শুধুমাত্র ভবিষ্যৎই জানে। তবে মার্গারেট, যদি এখানে তুমি একবার আসো, এসে আমার এই সার্বিক পরিবর্তনটা দেখে যাও, তবে খুবই ভালো লাগবে আমার। তোমারও ভালো লাগবে।

যেদিন মার্গারেট আমাকে হিথরো এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এসেছিল সেদিন মনে খুবই কষ্ট হয়েছিল। ওর মতো মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার সব সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে চলে আসতে ভিতরে জোরও কম লাগেনি। কষ্ট হয়তো ওরও কম হয়নি। কিন্তু কেন জানি না, এখন মনে হয়, বিয়ে হয়নি বলেই আমাদের দুজনের মধ্যের এই ভালোবাসার সম্পর্কটি চিরদিনই থেকে যাবে। যখনি একে-অন্যকে প্রয়োজন হবে, দুজনে দুজনকে কাছে পাব আমরা। মনের কাছে।

ভালোবাসাতে শরীরের ভূমিকা আর কতটুকু? মনই তো আসল। ভালো যে বাসতে জানে, সে-ই একথা জানে।

বিবাহিত জীবন হচ্ছে ক্যাকটাই আর বিবাহ-বন্ধনহীন প্রেম হচ্ছে মৌসুমী ফুল। নরম, চোখ-জুড়োনো রঙের। যদিও প্রায়শ গন্ধহীন।

গ্রীষ্মের রাতগুলি ভারি সুন্দর। রাতের কথা শুধু রাতের বেলাতেই বলা চলে। এমন অনেক ভাবনা আছে যা দিনের বেলা ভাবাই যায় না।

রাতের কত রকম আছে। মিথ্যে রাত, সত্যি রাত, তরল রাত, বর্ষার রাত, অন্ধকার রাত, চাঁদের রাত। এত রকমের রাত, অথচ প্রত্যেক রাতের সৌন্দর্যই আলাদা আলাদা। ভাবনাই আলাদা আলাদা তাদের বক্তব্য, ভাষাও তাই।

এমন এমন রাতে আমি একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। হনসো ভয় পায়। বলে, সাপ আছে। নানারকম দানো এবং প্রেত আছে। জিনপরীরা আছে।

সত্যিই এসব আছে কি না জানি না। সাপ-বিছে বাঘ-বাইসন অবশ্য আছেই। বনের রাতের মধ্যে কী যে আছে আর কী যে নেই তা আমি কেন হয়তো কেউই জানে না।

শিক্ষিত, শহুরে মানুষেরা হয়তো বলবেন, আলো, নেই, পিচ-রাস্তা নেই, নানারকম জন্তু-জানোয়ার, তাই রাতের বেলা বনে-জঙ্গলে কেউ ঘরের বাইরে বেরোয় না। কিন্তু শুধু এই সবই নয়। কারণ আরও আছে।

লক্ষ্য করেছিলাম আগেও যখন শিকারে আসতাম, এবং এখন তো করছিই যে বন-জঙ্গল এবং বন-জঙ্গলের কাছাকাছি সমস্ত এলাকাতেই অলিখিত সান্ধ্য-আইন জারি করা আছে। সূর্যের সঙ্গেই সকলের জীবন বাঁধা। যে জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার একেবারেই নেই সেখানেও জংলি মানুষেরা

সন্ধের পর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বেরোয় না। এই ভয় সংস্কারজাত? না এর পেছনে অন্য কিছু আছে, তা খুব জানতে ইচ্ছে করে।

সে সব মুন্ডা যুবক দিনের বেলা তীর-ধনুক হাতে যমের গুহার মধ্যে ঢুকে যেতেও পিছপা হয় না তারাই রাত নামলেই কেঁচো।

জানি না, আমি এখানে থাকতে থাকতেই হয়তো এই 'শালডুংরি'তেও বিজলি আলো এসে যাবে। তখন হয়তো রাতে আর দিনে তফাতই থাকবে না কোনো। কলকাতা বা লানডানেরই মতো। কিন্তু সেই শালডুংরি এই শালডুংরি থাকবে?

এই রাতের টহলে মনের মধ্যে নানা কথা ওঠে। অন্ধকার পাহাড়তলির ঘন জঙ্গলের মধ্যে পায়ের তলায় শুকনো পাতা মচমচিয়ে ভেঙে অন্ধকারতর কোনো জানোয়ার আমাকে চমকে দিয়ে ছুটে চলে যায়। আড়াল থেকে আমাকে দেখে। কখনও তারার আলোর আভাতে জানোয়ারদের ভুতুড়ে চোখ ঝলসে ওঠে এক লহমার জন্যে। দুঃস্বপ্নে দেখা অবাস্তব ভয়ংকর জন্তুর চোখেরই মতো। মাংসাশীদের চোখ লালচে দেখায়। আর তৃণভোজীদের সবজে। সাধারণত।

প্রথম প্রথম ভয় পেতাম। ভয়ের বাসাই যে অজ্ঞানতার বুকের কোরকে। যেখানে জানার শেষ, সেখানেই ভয়ের শুরু। এখন অনেকই রাতে একা একা ঘুরে ঘুরে জানোয়ারদের চেহারা না দেখেও শুধুমাত্র আওয়াজ শুনেই মোটামুটি বলতে পারি কোন জানোয়ার।

কেন জানি না, এই নির্জন, ভাবগম্ভীর পরমা প্রকৃতি, আমার এবং সব মানুষের প্রকৃত মা, আসল প্রেমিকা, আমার মধ্যে কেবলই ঈশ্বর বোধের ব্যাপারটাকে নাড়া দেন। ভোগ-বিলাসের দফা-রফা তো নিজের হাতেই করলাম। আমার বয়সি যুবকের এমন আরণ্যক জীবন বরণ করা, প্রাকৃত নারীকে বিয়ে করা, এ সবই তো অন্য দেশ হলে খবরের মতো খবর হত। রিপোর্টাররা, ফোটোগ্রাফাররা আর টিভির মানুষেরা মেলা বসিয়ে দিত এখানে। এই জীবন বেছে নেওয়াটাই যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার। আমার নিজেরও কাছে।

মাঝে মাঝেই মাটির দেওয়ালে কাঠের খোঁটাতে টাঙানো হাট-থেকে কেনা হলুদকাঠের ফ্রেমের মধ্যে বসানো পেছনে লাল পারা-লাগানো শস্তার আয়নাতে নিজের মুখ দেখি। আর ভাবি, সেই আমিই তো?

সেই আমিই কি?

কিন্তু এই বয়সেই আমার মতো একজন বিলেতফেরত নব্য-যুবকের মনে ঈশ্বরবোধ জন্মানো কি সুস্থতার লক্ষণ? আগে তো জানতাম অনেক পাপটাপ করার পরই পাপ-শোধনের জন্যে বৃদ্ধ বয়সের জড়ি-বুটি এই ঈশ্বর-বোধ। তাই-ই তো জেনে এসেছিলেন এতদিন। ভাবতাম, "ঈশ্বর" বা "গুরু" এসব তো নিচুস্তরের মানসিকতার বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অথবা গ্রামের মেয়েদেরই জন্যে। আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা তো তাই বলেন গলার শিরা ফুলিয়ে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঝগড়া করে কখনও জেতা যায় না বরং গলায় গার্গেল করতে হয় রাতে। হয়ই! শুধুমাত্র গলার জোরেই এমন দেশসেবার কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না! তাই কমিউনিজম, বিজ্ঞানের জগৎ আর ঈশ্বর কখনও সহাবস্থান করতে পারেন না। এই কথাতেই বিশ্বাস করতাম।

কিন্তু এখানে এসে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল! আজকাল আমি যেন কার অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। আকাশ হতে হঠাৎ খসে যাওয়া তারার উজ্জ্বল সবুজ ক্রম-বিলীয়মান রেখাটিকে ক্ষণিকের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে ভাবি যে, খসে-যাওয়া তারাটি আমাদের এই পৃথিবী থেকে কত কোটি গুণ বড়ো ছিল? কত কোটি আলোক-বর্ষ দূরে ছিল তা কে জানে? কে এই অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্রকে ধরে রেখেছেন? কার অঙ্গুলিহেলনে এই ব্রহ্মাণ্ডর ক্রিয়াকর্ম চালিত হচ্ছে? বিজ্ঞান তো অনেকেই জেনেছে। কিন্তু সেই সবই তো নিছক আবিষ্কারই। সব তো

ছিলই। উদ্ভাবন কি করেছে বিজ্ঞান? কি? যা-কিছুই ছিল, সেই সব কিছুকেই তার জিজ্ঞাসা, তার জিগীষা, তার অদম্য অনুসন্ধিৎসার আলো ফেলে চিরে চিরে দেখেছে, প্রতিমুহূর্তে দেখছে মানুষ। এইমাত্র। যা-কিছুই ছিল, আছে, সেই সমস্ত বস্তুর শবব্যচ্ছেদে কোনোরকম ত্রুটিই নেই। জীবন?

জীবন কি তৈরি করতে পারবে মানুষ? গর্ভ তৈরি করেছে কিন্তু বীর্য?

কোনোদিন হয়তো টেস্ট-টিউবে বেবি হবে। কোথাও কোথাও হচ্ছেও। কিন্তু তা জীবনের বিকল্প নিশ্চয়ই নয়। কী করে কী হয়, তা তো অনেকই জানলাম কিন্তু কে যে করান এসব তা জানা হল কই?

অতলান্ত সমুদ্রের গহন ঘনকৃষ্ণতলে যে 'হাইওয়ে' আছে, আছে 'এসকালেটর' যাতে একবার গিয়ে পৌঁছোতে পারলে দুর্বার গতিতে হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে গিয়ে তিন-সমুদ্রের মাছেরা পৌঁছোয় নিমেষে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে, পৌঁছে যায় অতলান্ত থেকে উচ্চতায় তা তো আমরা জানিই! কিন্তু কে এই সব রাজপথ আর সিবট বানিয়ে রেখেছেন জলের তলাতে? একরত্তি পাখি বা একচিলতে প্রজাপতির মধ্যে কে এত গান দিয়েছেন? জীবন এবং মৃত্যুর বিচিত্র নিয়মকানুন লক্ষ লক্ষ রকম পশু-পাখি পোকা-মাকড় মাছ সরীসৃপের জন্যে আলাদা করে বানিয়েছেন কে?

কে তিনি? তিনিই কি বিজ্ঞান? না কি?

আমার বোধহয় মস্তিষ্কে-বিকৃতি ঘটে যাচ্ছে। অথবা ইতিমধ্যেই গেছে। এব পরে সভ্যজগতে আমাকে আর ফিরিয়ে নেবে না কেউই। এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনই আমার সমস্ত অধীত-বিদ্যা, অঢেল অর্থব্যয়ে অর্জিত তাবৎ জ্ঞান এবং অন্য সমস্ত কিছু প্রাপ্তিকেই মাটি করে আমাকে হাত ধরে পেছনে নিয়ে গিয়ে একেবারে স্টার্টিং-পয়েন্টে পৌঁছে দিল। আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত একজন যুবক, প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলের আদিবাসী মানুষ বনে গেলাম।

সংস্কারাচ্ছন্ন কি?

আমার মুক্তি নেই আর।

সেদিন কলকাতায় একজনের কাছে বিখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা কটি চিঠি পড়ছিলাম। চিঠিগুলি হযতো কখনও ছাপাও হবে। 'আরণ্যক' কেই সম্বোধন করে লেখা। 'আরণ্যক' যে কে, তা রহস্যই থাক। বিনোদবিহারীও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে কোনোদিনও তা প্রকাশ করবেন না। এই প্রচারের যুগে এমন আড়ালে থাকতে চাওয়া মানুষেরাও বড়ো বিরল হয়ে যাচ্ছেন।

উনি লিখেছেন . ''আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে আমারও হয়। তাতে কিছুক্ষণের আনন্দ নিশ্চয়ই হবে কিন্তু মনের যে গভীর শূন্যতা আপনি ও আমি অনুভব করছি, সেই শূন্যতা আবার ফিরে আসবে।

কিছুদিন আগেই চিঠিগুলি পড়ছিলাম। চিঠির শেষ অংশে লেখা আছে . ''তুমি যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমান। কিন্তু এ কথাও জানবে ঈশ্বর ছাড়া উপায় নেই। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষের সাধকরা বহু পথ দেখিয়ে গেছেন। ধ্যান, কর্ম, ভক্তি এই তিন মূল সত্য থেকে নিজের পথ খুঁজে নিতে হয়।"

কিন্তু পথ খোঁজবার শক্তি কোথায়? আপনি কি সেই শক্তি পেয়েছেন?

অন্য চিঠিতে লিখেছেন :

''যাঁরা আমাদের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো, তাঁরা সকলেই ঈশ্বর এবং মঙ্গল এক করে উপলব্ধি করেছেন। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ মেন্টালওয়ার্লড-এর গণ্ডির বাইরে প্রায়ই যেতে পারে না। এ বিষয়ে আমি ছবি আঁকতে গিয়ে বুঝেছি।

এক্সট্রিম মেন্টাল-শক (লাঞ্ছনা, অপমান, কাম ইত্যাদি) এর প্রভাবে আমাদের মনের যে একরকম বৈরাগ্য ভাব জন্মে বা তীব্রভাবে আমরা কোনো কোনো বিষয়বস্তুতে আকৃষ্ট হই, তখন একরকমের মুক্তি অনুভব করি। সৃষ্টিক্ষমতা যদি না থাকে, তাহলে এই অবস্থা থেকেই আমরা একটা অন্ধকার জগতে গিয়ে পৌঁছোই (মানসিক নরক)। অলৌকিক অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে আসলে নির্জনবাস ও জনতার মধ্যে বাস করার মধ্যে অভিজ্ঞতার পথে জমিন-আশমান তফাত রাখে (আপনি ঠিকই লিখেছিলেন, নির্জনতা কখনও আমাদের শূন্যহাতে ফেরায় না)।

লেখাপড়া, ছবি আঁকা সবই নির্জনতার অবদান। বাইরে নির্জনতা থাকলেও মনের মধ্যে ভিড় জমে ওঠে। বাইরেও নির্জন, মনের ভেতরেও নির্জন—একেই বোধ হয় শান্তি বলে। ...এরপরই ঈশ্বর আছেন না নেই, সৌন্দর্য আছে না নেই এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন থাকতে পারে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে সর্বশক্তিমান আমাদের ভালোমন্দের হর্তাকর্তা ভগবানকে আমি দেখিওনি, বুঝিওনি। আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করি। অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটে। যুক্তির পথ উপলব্ধির পথ দুটি ভিন্ন। যুক্তির পথে ছবি আঁকতে পারিনি। ছবি আঁকার জন্যেই উপলব্ধির পথ অনুসরণ করতে হয়েছে।

"একলা এসেছি এ ভবে
একা যেতে হবে চলে"...

এই ছড়াটি আজকাল খুব মনে পড়ে। অজানা পথে একা চলবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি, এবং সেই পথেই দিনে দিনে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এগোচ্ছি। পথের শেষে কার সঙ্গে দেখা হবে। ঈশ্বর? নিয়তি? না অসীম শূন্যতা?"

অন্য একটি চিঠিতে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় আরণ্যককে লিখেছেন :

"তলায় পাঁক, মাঝখানে জল, ওপরে পানা এই হল মোটামুটি আমাদেব জীবন। কোনো রকম করে পানা সরাতে পারলে একটু সূর্যের আলো পড়ে, সেই হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। পাহাড়, সমুদ্র তারায় ভরা অন্ধকার রাতের কথা মনে হলে পানাপুকুর থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। মুক্তি হয়তো হবে না, তবু বৃদ্ধ বয়সের পরম সম্পদ এই অভিজ্ঞতা; যা আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে জানিয়ে দিচ্ছে যে আরও কিছু আছে। যৌবন হল অ্যাকশন আর বার্ধক্য হল কনটেমপ্লেশন। এই সত্যটি জানতে অনেকদিন লাগল।"

এই চিঠিগুলি পড়েও আমি কম বিপদে পড়িনি। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো ক্ষণজন্মা শিল্পীর মতে যখন "অ্যাকশনে"র সময় তখনই আমি "কনটেমপ্লেশনে"র দিকে ঝুঁকেছি। এও বোধ হয় আমার অকালপক্কতার আরেক দিক।

কাউকে বুঝিয়ে বলতেও পারি না। বললে কেউ বিশ্বাসও করবেন না। একলা বনপথে হাঁটতে হাঁটতে আমি যেন কারও করতলের ছোঁয়া অনুভব করি আমার মাথার উপরে।

কার ছোঁয়া! আমার পরলোকগতা মায়ের?...

না কি...

ঈশ্বরবোধের, ভালোবাসার, নানা রকম আছে। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন আমার সঙ্গে মার্গারেটের একরকম ভালোবাসা ছিল। সে ভালোবাসা এখন অন্যরকম হয়েছে। আবার হনসোর সঙ্গে একরকমের ভালোবাসা। আমার সদ্য-স্ফুটিত ঈশ্বরবোধও অন্য এক ধরনের ভালোবাসাই!

মনে হয়, অধিকাংশ ভালোবাসাই বোধ হয় কিছু না কিছু চাযই বদলে। যে-ভালোবাসা কিছুই চায় না, বদলে কেবল দিতেই চায়, তাই-ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা।

সাম্প্রতিক অতীতে মার্টিন লুথার কিং এই ব্যাপারটাকে সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। ভালোবাসাকে উনি তিনরকম ভাবে ভাগ করেছিলেন। ওঁর সম্বন্ধে মিসেস কোরেটা কিং-এ লেখা একটি বইতে এ কথা পড়লাম। ওই তিনটি ভাগ ছিল এই রকম।

১। EROS : "দ্য সোওল'স ইয়ার্নিং ফর দ্যা ডেজায়ার, দ্যা এস্থেটিক, অর রোমান্টিক লাভ।"

২। PHILIA : "রেসিপ্রোকাল লাভ।"

৩। AGAPE . "ডিস্টিংক্ট লাভ, নট ফর ওয়ানস ওউন গুড বাট ফবে দ্যা গুড অফ ওয়ানস ওউন নেবার, নট উইক অর প্যাসিভ বাট লাভ ইন অ্যাকশান।"

এই AGAPE থিমটি মার্টিন লুথার কিং তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'পিলগ্রিমেজ টু নন-ভায়োলেন্স'-এ পল্লবিত করেছেন খুবই ভালো করে।

আর একটি বই পড়লাম, ওঁরই লেখা—'স্ট্রেংথ অফ লাভ।' "থ্রি ডায়েমেনশানস অফ কমপ্লিট লাইফ"-এ উনি তিন রকমের ভালোবাসা অথবা চিন্তার কথা বলেছেন। প্রথমত, নিজের ভালোর চিন্তা, দ্বিতীয়ত, অন্যদের ভালোর চিন্তা, তৃতীয়ত, "কনসার্ন ফব দ্যাট ইটার্নাল বিয়িং হু ইজ দ্যা সোর্স অর গ্রাউন্ড অফ ওল রিয়ালিটি।"

মার্টিন লুথার কিং-এর বড়ো উদ্বেগ ছিল তাঁদের জন্যে "ফর দোজ হু লিভ অ্যাজ দো দেয়ার ইজ নো গড।"

উনি বারবারই সেই হতভাগ্য সব মানুষদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা চিরদিন "ম্যান-সেন্টারড" পৃথিবীতেই বাস করেন, তাঁর নিজস্ব ওজস্বী ভাযাতে তিনি তাঁদেরই উদ্দেশে বলেছেন :

"You can never see the me that makes me me, And I can never see the you that makers you you. That invisible something we call personality is beyond our physical gaze."

"যাঁরা আমাদের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো তাঁরা সকলেই ঈশ্বর এবং মঙ্গল এক করে উপলব্ধি করেছেন।"

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ঠিক এই কথাই, মানে কিং-এর কথাই বলেছিলেন।

বড়ো বড়ো মানুষদের লেখা বই পড়ে এবং কথা শুনে আমার মন কেবলই বলে . কেউ নিশ্চয়ই আছেন, যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছেন, এই কোটি কোটি নক্ষত্রনিচয়কে

পরিচালন করছেন। শালডুংরিতে না এলে, না থাকলে এই কথা হয়তো কোনোদিন উপলব্ধি করতেই পারতাম না।

"নির্জনতা সত্যিই কখনও আমাদের শূন্যহাতে ফেরায় না।"

আমিও এই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে আরম্ভ করেছি।

আমি জানি, আমার বন্ধুরা, আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে মূর্খ অথবা পাগল বলবেন কিন্তু আমি নিরুপায়। মনে যা হয়, তাই-ই বলি, লিখি।

ডায়ারিতে তো কোনো মানুষ মিথ্যে লেখে না।

আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা আমার নামে ছড়া কাটবেন জানি। কিন্তু খাদ্যবস্তুর সংস্থান করার, নিপীড়িত জনগণের জাগতিক ভালোর চেষ্টা করার পরও ভালো করার বাকি আরও কিছু থেকে যায়, মানুষ ইঁদুর বা কুকুর নয় বলেই। মানুষ, মানুষ বলেই। আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা সে কথা স্বীকার করুন আর নাই করুন।

বিন্দিয়া নদীর মধ্যে একটি দহ মতো আছে। আমাদের কুঁড়ে থেকে দুমাইল মতো দূরে। ঠিক সেখানেই বাঁকও নিয়েছে নদীটা। বৈশাখের প্রথমেই তাপ খর হয়েছে। নদীর জল কমে আসছে। দহটিতেও জল কমছে। কোনো সময়ে কোনো শিকারি মস্ত একটা মাচা বানিয়েছিল এই দহর উপরে। কত বছর আগে, তা কে জানে! তবে মাচাটি এমনই শক্ত যে আরও বহু বছর অটুট থাকবে তা।

স্থানীয় লোকের মুখে শুনেছি ভোপালের নবাবদের কেউ কেউ এবং নবাব পতৌদিও একবার শিকারে এসেছিলেন। পতৌদিরা ভোপালের নবাবের জামাই। সেই নবাবের পরের প্রজন্মই "টাইগার"। মেয়ের ঘরে নাতি। ছেলেটি হয়তো কালে বড়ো ক্রিকেটার হবে। ইংল্যান্ডে নানা কাউন্টি ম্যাচে ওকে উৎসাহী দর্শক হিসেবে এবং কখনও কখনও খেলোয়াড় হিসেবেও দেখতে পেতাম। ক্রিকেটারের চোখ ছিল ছেলেটির। শিকারিদের পরিবারের ছেলের চোখের দৃষ্টি সচরাচর তীক্ষ্ণ ও ব্যাপ্ত হয়। ওর চোখটি তখনও ইংল্যান্ডেই মোটর দুর্ঘটনাতে নষ্ট হয়ে যায়নি।

নদীর উপরে সেই মাচাটিতে কোনো কোনো দিন বিকেলে এসে বসি আমি। নানা বড়ো-ছোটো জানোয়ার, মাংসাশী ও নিরামিষাশী, পাখি, প্রজাপতি এবং বিচিত্র-বর্ণের সাপেরা সব জল খেতে আসে বিকেলে। জল অবশ্য এখনও জঙ্গলের নানা জায়গাতে আছে। এই দহটি প্রায় দশ বর্গ-মাইলের মধ্যে একমাত্র জলের জায়গা হয়ে উঠবে আর মাসখানেক পর। জ্যৈষ্ঠ মাসে। তখন এখানে আসাই বিপজ্জনক হবে খালি হাতে রাতে অথবা সন্ধের পর থেকে। হাতি, বাইসন, বুনো মোষ, বাঘ, বারাশিঙা, শম্বর, শজারু, চিতা, চিত্রল হরিণ, কৃষ্ণসার, কুটরা, খরগোশ, বুনো-কুকুর, শেয়াল, হায়না, বেজি, ময়ুর, মুরগি, তিতির, বটের এবং আরও অসংখ্য পাখি ও সাপে ও প্রজাপতিতে সরগরম হয়ে উঠবে এই জায়গা।

খালি হাতেই তো আসি। হাত এখন আমার সবদিক দিয়েই খালি। বন্দুক, রাইফেল, টাকাপয়সা, পরিচিত, বল; কিছুই রাখিনি হাতে। এমনকী আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী পাইপটি পর্যন্ত নয়। শূন্যহাতে না এলে যে কিছু পাওয়া যায় না। হাত শূন্য না থাকলে, আজেবাজে অপ্রয়োজনীয় বস্তুতে ভরা থাকলে করপুটে তাঁর দান গ্রহণ করব কী করে? "শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে।"

শূন্যতাই তো পূর্ণতার তীর্থপথের একমাত্র পাথেয়।

এইখানে এলে, নানারকম জানোয়ার পাখি দেখলে, বনের এবং নদীর চরিত্রকে নিজের মধ্যে অনুভব করলে কত কীই যে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠে চোখের সামনে কী বলব!

ছোটো ছোটো পাখি আসে, তাদের ছোটো ছোটো ঠোঁটে করে জল খায়, ঘাড় পেছনে হেলিয়ে সেই জল গেলে, ছোটো গোল গোল উজ্জ্বল চোখে ত্রস্ততার সঙ্গে তাকায়। সাপ আসে বুকে হেঁটে।

বালির সঙ্গে শরীর মিলিয়ে জিভ বের করে জল খায়। সাপের খাদ্য পাখি পাখির-ডিম, ইঁদুর, ছোটো ছোটো প্রাণী, পোকামাকড়। ময়ূরের খাদ্য সাপ। ময়ূর দেখলেই সাপ ভয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় নিমেষে। চিতাবাঘ আবার ময়ূরের যম। বড়ো বাঘও ময়ূর খায়। ময়ূর ওদের দেখলেই কেঁয়া কেঁয়া করে বড়ো বড়ো ডাক ডাকে আর মস্ত ল্যাজ ঝটপটিয়ে ভারী শরীর নিয়ে মাটি ছেড়ে ওপরে ওঠে। চিতা আর বাঘের যম হল বুনো কুকুর। বুনো কুকুরের দল এলে তারা সেই জঙ্গল ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে।

প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন এক ধরনের ভারসাম্য দেখি যে, তা বলার নয়। যিনি জীব সৃষ্টি করেছেন তিনিই তাদের খাদ্য-সংস্থান করে পাঠিয়েছেন। সৃষ্টিতে একমাত্র মানুষের মতো ধূর্ত, লোভী, কাণ্ডজ্ঞানহীন জানোয়ার ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীরই কোনো নালিশ নেই বিধাতার কাছে। বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা, রক্তারক্তি দেখে প্রাণীজগতে, বনজগতে যে "বনের আইনপ্রযোজ্য" একথা আমরা আকছারই বলি। কিন্তু বনের আইন যে শহরের আইনের চেয়ে অনেকই ন্যায্য, অনেকই উদার এ কথাটা বোঝার মতো সময় বা মানসিকতা বোধ হয় আমাদের মতো তথাকথিত শিক্ষিতের নেই।

সাপে ব্যাং গেলে, বাঘে বারাশিঙা মেরে খায়, বুনো কুকুরে বাইসনের বাচ্চা বা হাতির বাচ্চাকে ছিঁড়ে খায় এসব চোখে দেখতে বীভৎস লাগে, কানে শুনলে মন বড়ো অশান্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই যখন পুলকভরে পাখি ডেকে ওঠে, মৃদু হাওয়ায় পাতারা আন্দোলিত হয়, আলোছায়ার নিরন্তর খেলা চলে, বেলাশেষের শান্ত ছবি আর বিধুর ভাব বন থেকে উঠে এসে মনে পৌঁছোয়, মনের গভীরে সেঁধিয়ে যায়, তখন মনে হয় এমন তীর্থযাত্রা কি আর হয়!

এক জীবনে হেঁটে হেঁটে, ট্রেনে চড়ে, প্লেনে চড়ে কটি জায়গাতে আর যাওয়া যায়! মানসিকতায় যে প্রকৃত যাত্রী, যে যাত্রার মানে জানে, তার চলা অবিরত। ভিতরে ভিতরে। আমাদের মনের মধ্যে যে এক বিরাট, আদি, অশেষ পৃথিবী, এতে ভ্রমণের আনন্দ যদি একবার আবিষ্কার করে মন, তাহলে তার সেই মনের তলায় সরষে নিয়ে সে অনুক্ষণই ঘুরে বেড়ায়। পায়ে পায়ে আর কতটুকু যাওয়া। এক শরীরে, এক জীবনে! মনে মনে যাওয়াই তো আসল যাওয়া। মানুষের যাওয়া।

কিছু মানুষ আছে, মানুষের শরীরের মানুষ, অতি স্থূল চরিত্রর মানুষ, যাদের মধ্যে অনেকই অতৃপ্ত কামনা-বাসনা-খিদে জমে আছে। তারা অনেক দেশ 'ফোরেন ট্যাওর'কেই দারুণ বাঁচা বলে মনে করে। তাদের মনুষ্যত্ব, আসলে সম্পূর্ণতা পায়নি। আরও অনেকবার ইঁদুর-বাদুড় হয়ে জন্মে তবে তাদের এই স্বচ্ছ স্নিগ্ধ মানসিকতায় পৌঁছোতে হবে। অথচ এই কলিকালের রকম-সকম এমনই যে ওই ধরনের লাঙ্গুল-হীন হনুমানেরাই এই ধরাধাম দাপিয়ে হুম-হাম করে ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে অনুক্ষণ। এরা জানে না তাদের আসল চরিত্রের কথা, তাদের মানসিকতার প্রকৃত স্তরের কথা। তারা জানে না, জলের উপরে শোলাই ভাসে, শিলা ভাসে না।

এই ধরনের মানুষদের প্রতি আমি এক ধরনের অনুকম্পা বোধ করি। প্রার্থনা করি, যেন তারা একদিন হৃদয়ে উপলব্ধি করে যে, যাকিছুই তারা ভ্রান্তির চরম বলে জেনে গেল তা যে ভ্রান্তি নয়, ভ্রান্তির প্রহসন, তা যেন তাদের জীবদ্দশাতেই তারা জেনে যায়। তাতে তাদের এই আশ্রয়ে, সুদীর্ঘ অবস্থান হ্রস্ব হবে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের যা শেষ এবং পরম গন্তব্য তাতে পৌঁছোতে কম সময় লাগবে।

এই নির্জনে সারাদিনই কথা বলি। কথা কাটি। কথা লিখি। কথা মুছে দিই লেখা হলে। ছায়াচ্ছন্ন নদীর গেরুয়া বালির উপরে। কখনও কথা উড়িয়ে দিই পুলকভরে ঝরা-পাতার সঙ্গে। সারাটা দিন কথারই মধ্যে বাস করি কিন্তু শব্দ হয় না কোনো। মুখ ফাঁক করতে হয় না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মশায় একবার একটি কথা বলেছিলেন আমার এক লেখক বন্ধুকে। বন্ধু বলেছিল, যতটুকুই লেখালেখি করি, বড়ো কাটাকুটি হয়। উনি তাতে হেসে বলেছিলেন, হোক না। কাটাকুটি হয় না কোন লেখকের? যা কিছুই কেউ বোঝাতে চান, বলতে চান, তা একইবারে স্বচ্ছন্দে সাবলীল বাক্যে যিনি প্রকাশ করতে পারেন তিনি তো মহামানব!

তারপর হেসে বলেছিলেন, কেউ মনে কাটে আর কেউ লিখে কাটে। কাটে সকলেই। কাটাকুটির আরেক নামই তো সৃষ্টি।

তাই আমিও অনুক্ষণ কাটাকুটি করে যাই। এ অন্য কাটাকুটি। ইঁদুরের কাটাকুটি নয়। ভাবনাহীন ভাবনা দিয়ে, অবলীলায় পাতা ভরিয়ে দিয়ে, সম্পাদকের হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দিয়ে তাঁর হাত থেকে চেক পাবার পর নিজের ব্যাংকের চেক কাটা নয় এ। এ কাটাকুটি অন্য কাটাকুটি। প্রেমেনবাবুর ভাষায় যে কাটাকুটির অন্য নাম সৃষ্টি।

লিখি, কাটি, ছিঁড়ি, আবার লিখি। ভারি আনন্দে আছি। সত্যিই বলছি।

বিনোদবিহারীবাবু ঠিকই লিখেছিলেন : "নির্জনতা আমাদের কখনও শূন্য হাতে ফেরায় না।"

তাই-ই হয়তো নির্জনে এলে, দেব-দেউলে এলে শূন্য হাতেই আসতে হয়।

আজ পয়লা বৈশাখ। কলকাতায় থাকলে হয়তো বোঝা যেত। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন দিশি নববর্ষকে তেমন করে উপভোগ করা যায়নি। এখানে প্রকৃতির দিকে চেয়ে গাছে গাছে কিশলয়ের কচিকলাপাতা সবুজের সমারোহে নববর্ষকে অন্তরের অন্তঃস্তলে অনুভব করছি।

হনসোর দাদার মেয়ের অসুখ হয়েছে শুনে গুটিগাংড়ার দিকে যাচ্ছিলাম। পেটে অসহ্য ব্যথা। টোটকা-টাটকিতে সারছে না। কালই হাটে দেখা হয়েছিল হনসোর ভাইয়ের সঙ্গে। শুধু মিট্টি তেল কিনতে এসেছিল সে এতখানি পথ পেরিয়ে। বলছিল, মেয়েটি নাকি খুব অসুস্থ। মিশনের হাসপাতালে ভর্তি করাবে দু-একদিনের মধ্যেই। চার ঘণ্টা হাঁটাপথ ওদের গ্রাম গুটিংগাড়া শালডুংরি থেকে।

সকালে নাস্তা করেই বেরিয়েছিলাম গত বুধবার। গুটিংগাড়া যাব বলে। ওখানে হনসোর ভাইঝির খবর নিয়ে একেবারে হাট করে ফিরে আসব এমনই ইচ্ছে ছিল।

মেয়েটির খোঁজ নিয়ে সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসতে বলেছিল হানসো।

পথে একটি নদী পড়ে। নাম তার বড়ঝোড়া। ভারি সুন্দর সাদা প্রস্তরময় ভূমির উপর দিয়ে বয়ে গেছে সর্পিল রেখায়। নদীটি যেখানে বাঁক নিয়েছে মহুয়াগড়-এর দিকে, সেখানে একটি হ্রদের মতো সৃষ্টি হয়েছে। সেই হ্রদের ঠিক পাশেই মাথা উঁচু মস্ত পাহাড়। তাতে বিরাট বিরাট গুহা। এইসব গুহাতে নাকি ভালুক থাকে অনেকই। হনসো বলেছিল একদিন। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় এবং গুহাগুলো দেখে মনে হল যে, থাকাই স্বাভাবিক। এই জায়গাটা লোকে একা তাই পার হতে চায় না

সহজে, দিনের বেলাতেও। দলে গেলেও টাঙ্গি বা বর্শা নিয়ে চলে। এই ভালুক বড়োই বদমেজাজি জানোয়ার। বেশি বাঁশ আর ঝাঁটিজঙ্গল এদিকে। মাঝে মাঝে দু-একটি শাল আছে। দলছাড়া।

নদীটা সবে পেরিয়েছি, পেরিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি একজন পাদরিসাহেব আসছেন স্থানীয় কয়েকজন মুন্ডার সঙ্গে। পাদরিসাহেবের চেহারা দেখে মনে হল বিদেশি তো বটেই তবে "কন্টিনেন্টের" লোক। ইংরেজ আইরিশ বা স্কটসম্যান স্কট নন।

বললাম, গুড মর্নিং।

বিদেশে থাকার এইসব বদভ্যাস ছাড়েনি এখনও আমাকে পুরোপুরি। আমরা ভারতীয়রাও "গুড-মর্নিং" "গুড-ইভনিং" বলি বটে. তবে চোখের ভাষাতে বলি, মুখে বলি না। চোখে ভঙ্গিতেই যা বোঝবার তা বোঝাই। মুখে বেশি কথা যারা বলে, তারা বোঝায় না অত কিছু। দম-দেওয়া কলের মেশিনের মতোই বলে। কথারই কথা। অন্তরের সঙ্গে যোগ থাকে না সেই সব কথার। তাছাড়া এক এক দেশের এক এক রকমের রীতিনীতি, সহবত। ভারতীয়দের যে সাহেব হতেই হবে কেন তার কোনো মানে বুঝি না আমি। ইংরেজরা দুশো বছর দেশ শাসন করে এই শিক্ষাতেই আমাদের শিক্ষিত করে গেছে যে, যা-কিছু ইংরেজি তাই-ই ভালো। তাদের ভাষা, তাদের আদবকায়দা, খানাপিনা সব। এই নষ্ট করে দেওয়া ভারতীয়ত্বর মেরামতি কতদিনে সম্পূর্ণ হবে এবং কে বা কারা তা করবে আজ জানা নেই।

বিদেশি আমার চোখের ভাষা বুঝবেন না তাইই বলেছিলাম, গুড মর্নিং

পাদরিও বললেন, গুড মর্নিং।

দাঁড়িয়ে কিছু কথা হল অল্পক্ষণ। হয়তো আমার ইংরেজি উচ্চারণ শুনে একটু অবাক হয়ে থাকবেন। আমার ইংরেজিটি হিন্দি বা বাংলারজি নয়। এখনও নয়। তবে হয়তো হয়ে যাবে কিছু দিন পরে।

বললেন, আসবেন একদিন চার্চ-এ। গল্প করা যাবে। এই ভালুগাড়ার চার্চ অনেকদিনের।

বললাম, আসব।

পাদরিসাহেব এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই আবেকদল মানুষের সঙ্গে দেখা হল। ওদের কাছে ওই ফাদারের নাম জিজ্ঞেস করতে ওরা বলল, ফাদাব ভিটার উইধাস। নাম শুনে মনে হল, জার্মান।

কেন জানি না, কিছু কিছু মানুষ থাকে যাঁদের দেখলেই মন খুশি হয। দেখেই মনে হয যে, এঁরা ভালো মানুষ। আর কিছু লোককে প্রথমবার দেখলেই বুকে ব্যথা করে, কথা বলতে ইচ্ছে করে না তাদের সঙ্গে। মনে হয়, দিনটাই, সপ্তাহটাই খারাপ যাবে। ফাদার উইধাসকে স্থানীয় লোকেরা ডাকে "উধো ফাদার" বলে। উধো ফাদারকে বেশ ভালো লেগে গেল।

আমাদের ডেরা থেকে এই গির্জেতে হেঁটে আসতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো লাগে। পরে একদিন এসে আলাপ করে যাব ওঁর সঙ্গে। এতদিন ওঁর সঙ্গে দেখা যে কেন হয়নি জানি না। হাটে, মিশনের লোকজনকে দেখেছি। অন্য দু-একজন ফাদারকেও। তাঁদের চেহারা দেখে মনে হয়েছে গতজন্মে অনেক পাপ ছিল তাই-ই স্খালন করছেন এ জন্মে পাদরি বনে। ওই পাদরিদের মধ্যে একজনকে দেখে মনে হয় রীতিমতো কুচুটে, কুটিল; ঝগড়াটে।

হনসোর দাদার বাড়ি গিয়ে দেখি মেয়েটি আধঘণ্টা আগেই মারা গেছে। আজই সকালে ওরা হাসপাতালে নিয়ে আসত।
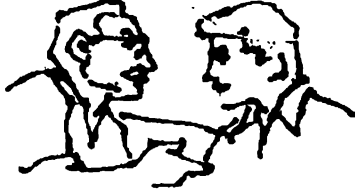
হনসো মা হবে। আমি বাবা।

হনসো বলেছিল গ্রামের দাইমাই সব কিছু করবে। কিন্তু আমার পুরো ভরসা হয়নি। পুরোপুরি আদিবাসী হয়ে উঠতে পারিনি এখনও। এখনও আমার মধ্যে কিছু মেকি বাকি আছে। ভান আছে, অবিশ্বাস আছে। প্রশ্নাতীত বিশ্বাস ছাড়া পুরোপুরি কোনো কিছুই পাওয়া ভারি কঠিন। তাছাড়া আদিম পৃথিবীর আদিম অধিবাসী হনসোরা। বাঙালি জাতের ইতিহাস তো ওদের মতো পুরোনো নয়। সত্যি সত্যিই ওদের মতো হয়ে উঠতে ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া আমার অনেকই সময় লাগবে।

অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম এবারে মিশনের ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলার দরকার।

মিশনের একটি চমৎকার হাসপাতালে আছে। তবে ছোটো। মাত্র আটটি বেড। ফিমেল ওয়ার্ডও হাসপাতালটি ভালুগাড়ার চার্চ-এর কম্পাউন্ডের মধ্যেই। হনসো যাই বলুক, ভাবলাম, ফাদার উইধাস-এর সঙ্গে ভালো করে আলাপও হবে। আর হনসোর ডেলিভারির ব্যাপারটা সম্বন্ধেও আলোচনা করে আসা যাবে। যদিও ওই হাসপাতালে মুখ্যত ক্রিশ্চানদেরই চিকিৎসা হয়। তবে আশা ছিল, আমি বললে ফাদার উইধাস হয়তো রাজি হবেন।

ডেরা থেকে বেরুবার সময় ছলোছলো চোখে হনসো বলল, তুমি হাসপাতালে যাচ্ছ যাও কিন্তু আমি ওখানে ভর্তি হব না। মরে গেলেও পরপুরুষকে আমি "ন্যাংটো" দেখাতে পারব না। এক তুমিই দেখেছ সবকিছু। তুমিই প্রথম। তুমিই শেষ। দাইমাই আমার যা করার করবে। তোমার ছেলে বলে বিশেষ কি? তার কি ল্যাজ থাকবে?

এক একটি শব্দ প্রয়োগভেদে ব্যবহারভেদে কতই না বিভিন্নতা পায়! হনসো 'ন্যাংটো' বা 'নাঙ্গা' বোঝাতে অন্য কিছুকে বোঝাচ্ছিল আসলে।

আমার হাসি পেল।

বললাম, ঘুরে আসতে দোষ কি? ফাদারের সঙ্গে কথা বললেই তো আর...

ও বলল, ওখানে একজনও মেয়ে ডাক্তার নেই। আমি মরে গেলেও যাবও না কিন্তু...

ঠিক আছে।

বলে, আমি বেরিয়ে পড়লাম।

ওদের উধো ফাদার যে এমন ইন্টারেস্টিং এবং পণ্ডিত মানুষ তা সেদিন ভালুগাড়াতে না গেলে জানাই হত না। দীর্ঘদেহী, সৌম্যদর্শন, সাদা পোশাকের সেই ফাদার বসে ছিলেন অফিসে। ওঁর অফিসের টেবলের সামনে কিছুক্ষণ বসে থেকেই বোঝা গেল যে অফিসে বসেও তাঁকে প্রচুর কাজ করতে হয়।

আমি যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে, আমাকে উলটোদিকের চেয়ারে বসতে বলেছিলেন। ওই চেয়ারে বসেই লক্ষ্য করলাম যে, ফাদারের পিছনের দেওয়ালে একজন মোটাসোটা কালো জোব্বা পরা কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা, চশমা-পরা একজন ফাদারের মস্ত ফোটো। নিচে, বড়ো বড়ো করে লেখা আছে, ফাদার জে. বি. হফফম্যান, এস. জে।

আমার চোখ এ দিকে পড়াতে ফাদার উইধাস বললেন, এই যে মানুষটির ফোটোটি দেখছেন এঁকে মুন্ডারা তাদের ভগবান সিংবোঙারই মতো মনে করে। ফাদার হফফম্যানের যা অবদান তার তুলনা নেই।

আমি শুধোলাম, আপনি কি জার্মান, ফাদার?

ফাদার উইধাস বললেন, জার্মান যে, তা তো নাম শুনেই বুঝতে পারছেন। কিন্তু আমি সুইস-জার্মান। আপনি কি কখনও কন্টিনেন্টে গেছেন?

আমি মাথা হেলালাম।

তবে তো জানেনই যে সুইটজারল্যান্ডের পিঁও গিরিবর্ত্মর এক পাশের মানুষ জার্মান-স্পিকিং আর অন্য পাশের মানুষ ফ্রেঞ্চ-স্পিকিং। সুইটজারল্যান্ডের তো নিজস্ব ভাষা বলতে কিছু নেই।

হেসে বললাম, জানি।

কাজ শেষ করে উঠে ফাদার বললেন, চলো তোমাকে আমাদের হাসপাতাল, ডেয়ারি ফার্ম, পোলট্রি সব ঘুরিয়ে দেখাই!

বলেই বললেন, "নট টু কনভার্ট ড্যু। বাট টু ইমপ্রেস ড্যু বাউট আওয়ার অ্যাকটিভিটিস।"

বললাম, আমাকে কনভার্ট করতে পারবেন না ইচ্ছে করলেও। আমি যে খাঁটি ভারতীয়। আপনাদের অনেক কিছু ভালো জিনিস নিতে রাজিও ছিলাম যখন সাগরপারে ছিলাম কিন্তু ধর্ম নেব কোন দুঃখে। হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মর মধ্যে যারা একবার প্রবেশ করেছে, মানে সত্যিই গভীরে, আমি শুধুমাত্র রিচুয়ালস এই বিশ্বাসী, মন্দিরের দেওয়ালে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মাথা-কোটা ধার্মিকদের কথা বলছি না। ধর্ম যাদের হৃদয়ের সত্যিই গভীরে পৌঁছেছে, যাদের "ধারণ" করেছে (ধর্ম মানেই তো যাহা ধারণ করে) তারা তোমাদের ধর্মর দিকে নিজের ধর্ম ছেড়ে খামোকা ঝুঁকতে যাবেই বা কেন? তাছাড়া, সব ধর্মই তো এক।

ফাদার উইধাস আমার চোখে চোখ দুটি রেখে হেসে বললেন, তোমার বক্তব্য আরও প্রাঞ্জল করো।

আমি বললাম, আদিবাসীদের নিজেদের জীবনযাত্রা অক্ষুণ্ণ রেখেও তোমরা তাদের অনেক ভালো করতে পারতে। কিন্তু পশ্চিমি দুনিয়ার তোমাদের দোষই হচ্ছে এই যে, তোমরা যেটাকে ভালো বলে জানো, তার চেয়েও ভালো যে কিছুমাত্রই থাকতে পারে তা তোমরা আদৌ মানতে পারো না। মিনারাল-ওয়াটার, কমোড, বেসিন, টেবল-চেয়ারে খাওয়া সেই সবকেও তোমরা ভারতীয় জীবনে অপরিহার্য করে তুলেছ কিন্তু...

ফাদার উইধাস হাসছিলেন।

এবারে জোরে জোরে। বললেন, মনে হচ্ছে, এই অঞ্চলে এতদিনে আমার সত্যিকারের একজন অ্যাডভার্সারি এল। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে আমার সুখ হবে বলে মনে হচ্ছে। অনেক ঝগড়ার মুখ চেয়ে থাকব আজ থেকে।

আমিও হেসে বললাম, ঝগড়া না করলে, নিজেকে বিতর্ক আর প্রতিরোধের সামনে দাঁড় না করালে বার বার, মানুষ ঈশ্বরের যে "গিফটপ্যাক"-এ মোড়া অবস্থায় এই পৃথিবীতে আসে সেই মোড়ক না-খোলা অবস্থাতেই তো কফিনে ফিরে যেতে হয় তাকে। সে যে আদৌ মানুষ অথবা কোন ধরনের মানুষ তাই তো জানবার উপায় না কোনো তার নিজেরও।

ফাদার আবারও হাসলেন।

বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পেলাম। আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না আমাকে। রোজ না পারেন একদিন অন্তর একদিন আসবেন। আমাদের দুজনের কাছেই দুজনের শেখার হয়তো অনেক কিছুই থাকতে পারে।

শেখাশেখির কথা কেন? আমি বললাম। খারাপ ছাত্র বলেই কিছু শেখার কথা উঠলেই পালাতে ইচ্ছে করে।

উনি হাসলেন।

ফাদার উইধাস সব জায়গাই হাসপাতাল, ক্রেশ, লাইব্রেরি সব ঘুরিয়ে দেখালেন।

যে কোন গির্জার মধ্যে গেলেই ভারি ভালো লাগে আমার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক করছে সবকিছু। আমার মা বলতেন, "পরিচ্ছন্নতার আরেক নামই হচ্ছে লক্ষ্মী।"

খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু হিন্দুদের বেশিরভাগ মন্দির এবং মন্দিরের পরিবেশ মোটেই তুলনীয় নয় কোনো গির্জার সঙ্গে, অন্তত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে। ধর্মস্থান, স্কুল, হাসপাতাল, বাজার, হাট এই সব দেখেই এক একটা জাতের চরিত্র, মানসিকতা এবং জীবনযাত্রার রকম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

হনসোর কথা বলতেই বললেন, একদিন নিয়ে আসবেন। আমাদের ডাক্তার আছেন ফাদার ডাফ। উনিও জার্মান। দেখিয়ে গেলে ভালো হবে। এবং তার পরও রেগুলার চেক-আপ এর জন্যে আসতে হবে।

তারপর বললেন, আমাদের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধাই নেই। অসুবিধা হয়তো আপনার স্ত্রীরই হবে। অনেক মেয়েরাই লেডি ডাক্তার না থাকাতে এখানে আসতে চান না। অনেক দিন থেকেই চেষ্টা চলছে। একজন লেডি ডাক্তার নান আসবেন পরের বছর। বেলজিয়াম থেকে! পরের বছর যদি তোমার আবার সন্তান হয় তখন কোনোই অসুবিধা হবে না।

আমি হাসলাম।

তারপর উনি মিশনের লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন। লাইব্রেরিটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এই লাইব্রেরির লোভেই আমাকে বার বার আসতে হবে এখানে।

একটি বই তুলে দিলেন আমার হাতে ফাদার উইধাস। বললেন আপনি মুন্ডা মেয়ে বিয়ে করে স্বেচ্ছায় এই জংলি জীবন বেছে নিয়েছেন। কিন্তু মুন্ডাদের জীবনযাত্রা তাদের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি জানতে চান তবে এই বইটি পড়বেন। তাড়া নেই কোনো। আপনার সময়মতো পড়ে আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন। এক মাস রাখতে পারেন বইটি। যাঁর ফোটো দেখলেন আমার অফিসঘরে সেই ফাদার হফফম্যান সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারবেন। ফাদার পি. পনেট, রাইট রেভারেন্ড হান্স, ফাদার ডিনি ইত্যাদি অনেকের লেখা প্রবন্ধই এতে আছে।

ফাদার হফফম্যান সম্বন্ধে জেনে আমার লাভ কি হবে?

আমি বললাম। উনি বললেন, কোনো বই-ই কেউ সরাসরি লাভের জন্যে পড়ে না। বই হচ্ছে জঙ্গলের সুঁড়িপথ। কোন সুঁড়িপথ যে কোন পথিককে কোন আলোতে পৌঁছে দেয় তা কি আগে থাকতে বলা যায়?

বাঃ!

আমি বললাম।

তারপর ফাদার উইধাসকে ধন্যবাদ দিয়ে বইটি নিয়ে চলে এলাম।

কালকে কালবৈশাখীর মতো ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল। লক্ষ্য করছি প্রতিটি ঋতু পরিবর্তনের আগে বনে-জঙ্গলে একচোট ঝড়-বৃষ্টির পরই নতুন ঋতু আসে। কাল বিকেল থেকেই শুরু হয়েছে ঝড়-বৃষ্টি। এখনও তার জের কমেনি। ঘর থেকে বেরোনেই যাচ্ছে না। তাই লণ্ঠনের আলোতে ফাদার উইধাসের দেওয়া বইটি নিয়ে বসলাম।

ফাদার হফফম্যান উনিশশো আটাশ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। মারা যান অবশ্য জার্মানির্তেই। জার্মানির সঙ্গে যখন ইংল্যান্ডের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে তখন শত্রুর দেশের লোক বলে তাঁকে ডিপোর্ট করা হয় এদেশ থেকে। কলকাতার বন্দরে যে জাহাজে চড়িয়ে তাঁকে ফেরত পাঠানো হচ্ছিল সেই জাহাজে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে পাঠান জাহাজের ক্যাপটেনের কাছে। ক্যাপটেনকে বলা হয় যে, এই বন্দি সাধারণ মানুষ নন। তাঁর সঙ্গে যেন চমৎকার ব্যবহার করা হয় এবং যতদিন না জাহাজ জার্মানিতে পৌঁছোচ্ছে ততদিন ফাদার হফম্যানের যেন কোনোরকম অসুবিধা না হয় তা যেন অবশ্যই দেখা হয়।

সাঁইত্রিশ বছর টানা ভারতের ছোটোনাগপুরেই ছিলেন ফাদার হফফম্যান। সাঁইত্রিশটি বছর একই জায়গায়। মাঝে মাত্র একবার দেশে গেছিলেন হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে। আঠারোশো সাতাত্তরে কুড়ি বছরের এক নবীন যুবক ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপোস্টোলিক ভিকারিয়েট-এ যোগ দেন। বেলজিয়ান ফাদারদের অধীনে ছিল তখন ওই অঞ্চলের পুরোটাই। বিহারের ছোটোনাগপুরের মালভূমিও তখন ওই পশ্চিমবঙ্গীয় ভিকারিয়টের অধীনে ছিল। পুরো সাঁইত্রিশ বছরই যে তিনি মিশনারি হিসেবে কাজ করেছিলেন তা অবশ্য নয়। সতেরো বছর শিক্ষানবিশ ছিলেন। "অ্যাসেটিক এবং ইনটেলেকচুয়াল" শিক্ষা পেয়েছিলেন। বাকি কুড়ি বছর অ্যাপোস্টোলেটের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দুটি যুগ একজন মানুষের জীবনে এমন কিছু দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু মাত্র আটান্ন বছর বয়সে তিনি যখন ভারতের মাটি ছেড়ে চলে যান তার আগেই যা কাজ তিনি একা হাতে করে গেছিলেন আদিবাসীদের জন্যে, তার কোনো তুলনা নেই। মুন্ডাদের সভ্যতার উপরে ওই সময়েরই মধ্যে উনি সম্পূর্ণ এনসাইক্লোপিডিয়া লিখে যান। মুন্ডাদের জীবনের কোনো দিকই তাতে বাদ দেননি। মুন্ডা ছাড়াও অন্যান্য আদিবাসীদের জন্যেও ঋণ-পাওয়ার সুযোগ-সুবিধা, সমবায়-বিপণি ইত্যাদি অনেক কিছুই তিনি করে যান।

যদিও নিজের দেশে অনামা-অখ্যাত অবস্থাতেই মারা যান তিনি, কিন্তু এদেশে ব্রিটিশ অফিসার, মিশনারি এবং আদিবাসীদের কাছে তিনি যে সম্মানের আসনে বসেছিলেন এবং আজও আছেন তার কোনোই তুলনা নেই।

উনি জার্মান হলেও, ব্রিটিশ শাসকরা তাঁকে নিঃশর্তে বিশ্বাস করতেন। ছোটোনাগপুরের

আদিবাসীদের জন্যে উনি যা করেছিলেন তার স্বীকৃতি হিসেবে উনিশশো তেরো খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে "কাইজার-ই-হিন্দ" খেতাবও দেন।

স্যার জাস্টিস টি. এস. ম্যাকফার্সন, সি. আই. ই., আই. সি. এস. ওই মানপত্রে লিখেছিলেন, "দেয়ার ইজ নো ডাউট দ্যাট হিজ লিঙ্গুইস্টিক স্টাডিজ অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়ার্ক হ্যাড রেন্ডারড কাউন্টলেস সার্ভিসেস টু হিজ কলিগস ইন ছোটোনাগপুর। আই অ্যাম সার্টেন দ্যাট হিজ মনুমেন্টাল ওয়ার্ক অন দ্যা মুন্ডাজ উইল অ্যাট্রাক্ট দ্যা অ্যাটেনশন অফ দ্যা স্কলারস অফ দ্যা হোল ওয়ার্লড, হোয়াইলস্ট ইন অ্যাগ্রারিয়ান ম্যাটারস হিজ কনট্রিব্যুশান টু আগ্রারিয়ান লেজিসলেশান রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন দ্যা ছোটোনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট মনুমেন্টাম অ্যারেপেরেনিয়াম।"

মুন্ডাদের গ্রামে একজন করে পাহান থাকেন। পাহানই যেন ঈশ্বরে প্রতিভু। সমস্ত সামাজিক ও ধার্মিক ক্রিয়াকাণ্ডতে তাঁদের মতই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য বলে পরিগণিত হত।

বিহারের রাঁচির কাছে মুরহু আর রাঁচির মধ্যে খুঁটি বলে একটি সুন্দর জায়গা আছে। যে রাস্তা খুঁটি হয়ে মুরহু চলে গেছে সেই রাস্তাই পৌঁছেছে গিয়ে চাঁইবাসাতে, টেবো ঘাট হয়ে। ওই অঞ্চলেই ছিল বীরসা মুন্ডার বাস। বীরসা মুন্ডার 'উলগুলান' বা বিদ্রোহের মুলই ছিল 'খুঁটকাট্টি' নিয়ে। মুন্ডাদের গ্রামগুলিকেও খুঁটকাট্টি বলা হত। গোত্র, জাত বা গোষ্ঠীকে মুন্ডারা বলে 'কিলি'। খুঁট মানে উত্তরাধিকারও বটে।

হফফম্যান সাহেবের লেখাতে এই 'খুট' আর 'কিলি' নিয়ে বোধহয় একটু ধোঁয়াশা ছিল। এক একটি 'কিলি'র আলাদা আলাদা কবর স্থান ছিল। তাদের বলা হত 'সাসানডিরি'। 'কিলি' নয়, প্রত্যেকটি খুঁটেরই বুনো জমির সংস্কার এবং তা বসবাসযোগ্য করার ব্যাপারে, নতুন বসতি স্থাপনের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা ছিল। হফফম্যান সাহেবের পরবর্তী পণ্ডিতরাই এই সত্য পরে প্রতিবিম্বিত করেন। হফফম্যান সাহেব নিজে মিশনারি ছিলেন বলে 'পাহান'দের সম্বন্ধে ওঁর বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল এবং হয়তো ওই ঔৎসুক্যবশেই 'পাহান'দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার একটি বিশেষ ইচ্ছে ওঁর অবচেতনে কাজ করছিল।

যে 'খুট' আদিম অরণ্যর যতখানি জায়গা সংস্কার করে, চাষবাস ও বসবাসযোগ্য করে নিতে পারত ততখানি জমিই সেই বিশেষ খুঁট-এর দখলে থাকত। কোনো বিশেষ গ্রামের সবচেয়ে ক্ষমতাবানরা ছিল খুঁটকাট্টিদারেরা। তাদের প্রজা থাকত কিছু। আর থাকত ভূমিহীন শ্রমিক বা 'রাওতরা'। তাছাড়াও সমাজে প্রয়োজনীয় নানা জাতও থাকত একটি খুঁট-এ। যেমন কুমোর নাপিত ইত্যাদি।

হফফম্যান সাহেব 'পাহান'দের সকলের চেয়ে বড়ো বলে বলেছেন। কিন্তু পাহানদের সম্বন্ধে *অন্যত্র পড়েছি তাতে মনে হয় না যে তিনি ঠিক কথা বলেছিলেন।*

মুন্ডারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেই ছড়িয়ে আছে। শুধু বিহারের ছোটনাগপুরেই নয়। বিহার, ওড়িশাতে, পশ্চিমবঙ্গের কিছু জায়গাতে, মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও তাদের বাস। নর্মদার তীরের মান্দলার উত্তরে বসবাসকারী মুন্ডাদের নিয়ে অনেক মুন্ডাতত্ত্ববিদ যথেষ্ট কাজ করেছেন। তার মধ্যে ফাদার স্টিফেন ফুকস-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনি কাজ শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। হয়তো ওই অঞ্চলের গোন্দ ও ভূমিহারদের উপরে তাঁর কাজ কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিতও হবে ভবিষ্যতে। আমাদের এই বিশাল বিচিত্র সুন্দর দেশের আদিবাসীদের বৈচিত্র্য যত তাদের মিলও তত। এই মধ্যপ্রদেশের মুন্ডা এবং গোন্দরা অত্যন্তই সুন্দর তাদের চেহারায়। দীর্ঘাকৃতি, চিকন, কাটাকাটা নাক মুখের দিঘল চোখের। হনসোর মতো সুন্দরী মেয়ে তো আমি সাগরপারর কম দেশেই দেখেছি। তার ত্বকের উজ্জ্বলতা, তার শরীরের বাঁধন ছাপানো উপচে-পড়া সৌন্দর্যের সঙ্গে সাগরপারের মেয়েদের মহার্ঘ্য সাজপোশাক, দুর্মূল্য সুরভি এবং প্রসাধন বাদ দিয়ে তাদের প্রায় অর্ধনগ্ন করে হনসোর পাশে দাঁড় করালে তাদের অনেকেই লজ্জায় অধোবদন হবে।

না। আমার কোনো অনুশোচনা নেই পরিতাপ নেই বিন্দুমাত্র। যে দেশের মানুষ আমি, সেই দেশের ধুলো, সেই দেশের বন-বনানী, পাহাড়-উপত্যকা, প্রান্তর-নদীরই মতো তার নারীও আমাকে মুগ্ধ করেছে। আর অন্তর থেকে আমি বার বার জঙ্গলের একলা পথে হাঁটতে হাঁটতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে উঠি 'এমন দেশটি কোথায়ও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি'। সব দিক দিয়েই এমন দেশ আর হয় না। যদি স্বাধীন হওয়া এই মাতৃভূমির নেতারা এই দেশকে আমারই মতো ভালোবাসেন এবং ঠিক পথে চালিত করেন তবে এদেশে সোনা ফলবে। একদিন এদেশের পথঘাট সোনা হয়ে উঠবে।

এই খুঁটকাট্টি ব্যাপারটি কিন্তু এদিকে নেই। বিহারের পালামৌ, রোহটাস এবং ওড়িশার খন্দমালেই এই প্রথার চল ছিল। তাছাড়া, সব খুঁটকাট্টিদারই যে আদিবাসী এমনও নয় ওসব অঞ্চলে। 'জোর যার জমি তার' সহজ এই নিয়মে অনেক অনাদিবাসীরাও খুঁটকাট্টিদার হয়ে উঠেছিলেন।

মুন্ডারা এক একটি এলাকাকে বলে 'ডিসুম'। বীরসা মুন্ডার 'উলগুলান'র পরই 'খুঁটি' সাবডিভিশানের পত্তন করেন ইংরেজরা। এর এলাকা ছিল ছোটোনাগপুরের দক্ষিণ-পূর্বের পোরাহাট এবং বুণ্ডু পর্যন্ত। আজকেও ওই সব অঞ্চলে নিশ্চয়ই নিশ্ছিদ্র বন থাকার কথা, যে বনই আদিবাসীদের সমস্ত রকম সামাজিক, লৌকিক, অর্থনৈতিক এবং ধার্মিক ব্যবস্থার গোড়া।

কোনোদিন যদি কোনো দুষ্টবুদ্ধি রাজনৈতিক নেতা অথবা স্বার্থান্ধ, নীতিবোধহীন, গরিবের উপর অত্যাচারী অসৎ শাসকদের অদূরদর্শিতা এই সরল আদিবাসীদের উত্তেজিত করে তুলে তাদের জীবনেরই সমার্থক বনকে বিনাশ করতে উদ্বুদ্ধ করায় তার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই থাকবে না। বন শুধু আদিবাসীদেরই নয়, আমাদেরও 'অন্য মা'।

বন নিধন আর মাতৃহত্যা সমান পাপ। একদিন এই নব্য পৃথিবীর বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞ ভোগ্যপণ্যবিলাসী সংস্কৃতিতে ন্যুজ মানুষেরা হয়তো মাতৃহত্যাও করবে। পৃথিবীর আয়ু আর বেশি নেই। এই সুন্দরী মুমূর্ষু নারীকে আমাদের সেবায় যত্নে যদি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তাহলে আমাদেরও বাঁচার আর কোনো পথই থাকবে না।

আমি তো এই বন এবং বনকন্যাকে ভালোবেসেই অন্য এক শস্তা আরামের জীবন ছেড়ে এখানে চলে এলাম। আমার দেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে অন্য কেউই কি এসব বিষয় নিয়ে ভাবছেন না? জানতে ইচ্ছে করে।

বৈশাখের প্রথমের মতো এত সুন্দরী, প্রকৃতিকে আমি খুব কম সময়েই দেখি বোধ হয় না। না অন্য কোনো ঋতুতেই সে এতখানি সুন্দরী নয়। ভোগী এবং যোগী যেন একাসনেই বসেন বনে পাহাড়ে, প্রান্তরের আনাচে কানাচে। পলাশ, শিমুল, কুসুম, ফুলদাওয়াই,পিলাবিবি, কৃষ্ণচূড়া, নানা জাতের আকাসিয়া, জাকারান্ডারা যেমন লাল গোলাপি গাঢ় লাল, বেগনি ও ফিকে বেগনির আভায় আভায় আভাসিত করে দিগন্তরেখা, তেমনি আবার পাতা-ঝরা বনে বনে পাতা খসে গিয়ে পাতা গজায় নতুন। কত তাদের রঙের বাহার। সবুজ আর লালের যে কত রকম হয় পৃথিবীর কোনো শিল্পীই হয়ত ভাবতে পর্যন্ত পারেন না।

বিধাতার মতো শিল্পী তো আর দেখলাম না।

আমাদের পর্ণকুটিরের পাশের পথে একটি পেয়ারা গাছ আছে। কে কবে লাগিয়েছিল জানা নেই। তার একটি পাতাও এখন অবশিষ্ট নেই। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় যখন আকাশে কত সব বিচিত্র রঙের নরম নিঃশব্দ হোরিখেলা চলে তখন আমি আমাদের মাটির ঘরের দাওয়াতে বসে সেই পত্রহীন গাছের ঊর্ধ্ববাহু নিপুণ ডালপালাগুলিকে আকাশের পটভূমিতে লক্ষ্য করি আর মুগ্ধ হয়ে যাই। কী যে সব অসামান্য ছবি ফুটে ওঠে। কী দারুণ সব ফ্রেমিং। ভাবা যায় না। যিনি একটি পত্রশূন্য গাছ এবং মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে দেওয়া নির্মেঘ আকাশের পটভূমি নিয়ে এমন এমন সব আসামান্য ছবি আঁকেন তিনিই যে রঙের গুরু সে বিষয়ে মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। মাঝে মাঝেই ঈশ্বরের কাছে সত্যিই বড়ো কৃতজ্ঞ বোধ করি। আমাকে দেখার চোখ দিয়েছিলেন বলে, ভাবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন বলে এবং আপাত-তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে অসামান্যকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন বলে।

যখন ইংল্যান্ড থেকে কন্টিনেন্টে গেছিলাম, সঙ্গে আমার ইংরেজ বান্ধবী মার্গারেট ছিল আমরা সুইটজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইটালি, স্পেন, হল্যান্ড, জার্মানি ইত্যাদি ঘুরে বেলজিয়াম পৌঁছে অস্টেন্ড থেকে বোট ধরে ডোভার হয়ে ফিরেছিলাম। বান্ধবীর মনের সঙ্গ, তার শরীরের সান্নিধ্য, তার শরীরমনের আনাচেকানাচে আঁতিপাঁতি করে কত কীই যে খুঁজলাম রুদ্ধ-দুয়ার ঘরে অথবা উন্মুক্ত বাইরে। মার্গারেটের দুটি গজদন্ত ছিল। হাসলে গালে টোল পড়ত। শরীরের অনুপাতে স্তন দুটি ছোটো ছিল। ছোটো স্তনের নারীদের কামবোধ বেশি থাকে। জানি না। আমি যাদের দেখেছি তাদের কথাই বলতে পারি শুধু। আমার ধারণা অমূলকও হতে পারে। ও তখন বলত, এর পরের বারের ছুটিতে আমরা স্টেটস-এ যাব। তার পরের বার হাওয়াই। তার পরের বার বাহামা। তার পরের বার জাপান।

আমার আদর খেতে খেতে অথবা আমাকে আদর-করা ওকে এবং হুনসোকে দেখেও এখন আমার মনে হয় যে খাজুরাহ কোনারকের দেশের শহুরে শিক্ষিত মেয়েরা আদর খেতেই জানে শুধু আদর করতে বোধহয় তেমন জানে না। তাদের আশৈশব শিক্ষা, সংযম, সংস্কার হয়তো তাদের বাধা দেয়। এবং তাদের সঙ্গীদের তারা জীবনের এক পরম নমনীয়, সুন্দর ক্ষেত্রে বঞ্চিত করে রাখে। হুনসোকে দেখে আমার তাই-ই মনে হয়।

আমি উত্তর দিতাম না মার্গারেট-এর কথাতে। মাথা নেড়ে গাঢ় স্বরে বলতাম, বেশ! বেশ!

ওকে বলে লাভ হত না কিছু। তাই-ই বলতাম না।

এই ছোট্ট একটি জীবনে, শরীরে কত জায়গাতেই বা যাওয়া সম্ভব? কত দেশে? কতজন নারীর শরীরে?

মানুষ এবং পশুপাখিকে বিধাতা এই সীমাতেই বেঁধে রেখেছেন। সুদুর সাইবেরিয়া বা অস্ট্রেলিয়া থেকে যেসব পরিযায়ী পাখি প্রতি বছর ভারতে আসে তারা আবার সাইবেরিয়া বা অস্ট্রেলিয়াতেই ফিরে যায়। লক্ষ লক্ষ মাছের এক একটি ঝাঁক শীতল জলের সমুদ্র থেকে সমুদ্রের জলের গভীরে যেসব হাইওয়ে আছে, আছে যে সব 'মুভিং স্টেয়ারস' 'এসকালেটরস', তাতে করে অবিশ্বাস্য দ্রুত বেগে পৌঁছে যায় কোনো উষ্ণ সাগরে, মিলনের জন্যে, ডিম ছাড়ার জন্যে। এই সবই শরীর দিয়ে যাওয়া। কিন্তু শুধুমাত্র মানুষকেই মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। তবু যাত্রা, মনের গন্তব্য এবং মনের গতিতে কোনো বাঁধ নেই, বাধা নেই। কোনো হিন্দুস্থানি ওস্তাদের কণ্ঠসংগীতের 'তারা'র সপাট তানের মতো সে কখনও অতি দ্রুতপক্ষ আবার সাগরবেলার একাকী সাদা সি-গালের ক্ষীণ স্বরের মতো সে কখনো 'উদারা'য় অবস্থান করে। মুহূর্তের মধ্যে মানুষ যেখানে খুশি যেতে পারে, যে কোনো মানসিক ভাবনার রাজ্যে। তার যাত্রাপথে, গতিপথে, কোনো 'সাউন্ডব্যারিয়ার' নেই। আলোর গতি এক সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল আর মনের গতির কোনো মাপই নির্ধারণ করা যায় না। হয়তো যাবেও না কোনোদিন। এই মুহূর্তে সে প্রেমে, চাঁদে, পরমুহূর্তে সে সমরে, সূর্যে; আবার ক্ষণপরে সে বৈরাগ্যে, মন্দুলে। এক জীবনে শরীর নিয়ে হাজার জায়গায় দৌড়ে না বেড়িয়ে মনকে যে দৌড় করিয়ে বেড়োায় তার মানবজীবনই সার্থক। যারা এ কথাটাই বোঝে না তাদের জ্ঞানে এখনও ঘাটতি আছে বলতে হবে।

এই পাতা-ঝরা পাতা-গড়ার খেলা যখন বাইরেরা প্রকৃতিতে দেখি, তখন ঘরে বসে সেই সব মানুষেরই লেখা পড়ি আমি। মানুষের মতো মানুষ যাঁবা। সর্বকালের সেরা সাহিত্যিক, দার্শনিক সব।

দর্শনেরও কত ভাগ আছে। রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক দর্শন, সমাজ-সম্বন্ধীয় দর্শন, অধ্যাত্ম-দর্শন। সাহিত্যেরও তো কত রূপ! সত্যিকারের সর্বকালীয় বড়ো সাহিত্যিকদের লেখার সঙ্গে যখন সর্বকালীয় বড়ো দার্শনিকদের লেখার তুলনা করি তখন একটা কথা আমার কাছে বার বার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বরবোধকে লক্ষ্য করি। তা তিনি এমার্সনই হন বা স্পিনোজাই হন, আব্রাহাম লিঙ্কন বা মার্টিন লুথার কিং-ই হন, গান্ধিই হন কী বিবেকানন্দই হন বা টলস্টয় কিংবা রবীন্দ্রনাথই। অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে, যাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব, ভালোত্ব (ভালোত্বর ভান নয়) এবং অধ্যাত্মবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর এক জীবনে হওয়ার মতো কিছুই হয়ে না ওঠা হয় না। "দাগ রেখে যাওয়া" সেই সব মানুষের পক্ষে অসম্ভবই হয়। পৃথিবীর ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস তাই-ই বলে।

বড়ো হওয়ারও অনেকগুলি স্তর থাকে বোধহয়। বিভিন্ন স্তরে, জীবনের বিভিন্ন পারঙ্গমতার ক্ষেত্রে অসংখ্য গুণী ব্যক্তি যে-কোনো সময়েই থাকেন। কিন্তু যাঁরা মানবজাতির,সর্বকালের সর্বদেশের চিরকালীন সম্পদ হয়ে বেঁচে আছেন আমাদের বুকে মহাকালের পরীক্ষা পাশ করে, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে এই অধ্যাত্মবোধকে আমি অনুভব করি। মিছিমিছি ছুটোছুটি না করে রবীন্দ্রনাথ বা শ্রীঅরবিন্দ বা বিনোদবিহারীরই মতো থিতু হওয়ারই আরেক নাম পরম গতিশীলতা।

"বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে বাহির পথে গেলি/আয়, আয়রে ফিরে আয়/ পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি/ বসিবি নিরালায়, আয় রে ফিরে আয়।" রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে বারেবারে।

আমি অতি সাধারণ মানুষ। নিজের সম্বন্ধে আমার কোনো মিথ্যে শ্লাঘা, অভিমান বা অহং নেই। আমার মনে হয়, যাঁরাই আমাদের পূর্বসুরিদের রেখে-যাওয়া জ্ঞানের সামান্য ধূলিকণাও একবার আঙুলে মেখেছেন তাঁদের কারো মধ্যেই প্রচারের প্রবৃত্তি থাকে না। যাঁরা নিজেদের চরিত্রের প্রকৃতি এবং ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ তাঁরাই নিজকালে, নিজকাঁধে দামামা তুলে নিরন্তর বাজিয়ে বেড়ান। সেই সব তথাকথিত 'বিখ্যাত' ও 'গুণী' মানুষেরা ভুলে যান যে, কাল নিরবধি। পৃথিবীর সর্বশক্তিমান প্রবলতর কোনো মিডিয়াই কোনো মানুষকে প্রকৃত অমরত্ব দিতে পারে না। যাঁরা এইভাবে অমর হবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান মৃত্যু অবধি, তাঁদের বংশধরেরা পরে দুঃখের সঙ্গে দেখেন যে তাঁদেরই পিতা পিতামহের কবর খোঁড়া হচ্ছে। কোনো কোনো সময়ে আক্ষরিক অর্থে এবং কোনো কোনো সময়ে প্রতীকী অর্থে এই কবর খোঁড়া হয়।

কোনো দেশের, কোনো কালের পাঠক এবং ভাবুক মানুষেরা কখনোই এত বোকা হন না সত্যকে, শাশ্বতকে, প্রকৃত গুণকে তাঁরা অস্বীকার করবেন। দীর্ঘ জীবন এবং মিডিয়ার দামামা কোনো মানুষকেই অমরত্ব দিতে পারে না। "শতায়ু" হওয়ার কামনা যখন আমরা করি কারো জন্যে, তখন আক্ষরিক অর্থে যতটা না করি তার চেয়ে অনেকই বেশি করি তার কীর্তি যেন তার মৃত্যুর পর শতবর্ষ অম্লান থাকে, এই ভেবেই।

শালডুংরি বাকি জীবন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে কী ভালো যে করেছি। আমার এই একটামাত্র জীবনকে ধীরেসুস্থে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করব। দৌড়োনো নয় কোনো জাগতিক উন্নতির জন্যে প্রতিযোগিতা নয় কারো সঙ্গে, ঈর্ষা নয় কারো প্রতি, শুধু ঈশ্বরের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা আমার পূর্বসূরিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে কী সুন্দর অনাড়ম্বর, সাধারণ, নিরুদ্বেগ হবে এই জীবন। ডিগ্রির দম্ভ নয়, মিথ্যা-শিক্ষার আস্ফালন নয়, প্রতিবেশীর চেয়ে ভাগ্যবান হওয়ার নোংরা গর্ব নয়. আমার আমিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে আমার শুধু আমারই বা কেন, পৃথিবীর সব মানুষেরই শিকড় খোঁজার চেষ্টা করে যাব বাকি কদিন।

ঈশ্বরের কৃপা হলে, এই গভীর অরণ্য-পাহাড়ে বেষ্টিত ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরে এই জংলি আমাকে আমারই কোনো উত্তরসূরি আবিষ্কার করবে। ঠিকই আবিষ্কার করবে। না না, প্রচারের কথা বলছি না, ভাবছিও না। আত্মপ্রচার নীচের ধর্ম। আমার ভাব-ভাবনা যদি এ পৃথিবীর অন্য একজনও মানুষের কাজে আসে, তার জীবনকে সার্থকতর, সুন্দরতর করে তুলতে সাহায্য করে তাহলেই আমার এই অগতানুগতিক জীবন সার্থক হবে। নিজের জীবন দিয়ে অন্যের আনন্দের সুখের এবং শান্তির জন্যে কিছুমাত্রও যদি না করে যাওয়া যায়, তাহলে মানুষ হয়ে না জন্মে তো শুয়োর হয়ে জন্মালেই ভালো ছিল। শুধু আমার জীবনই নয়, কোনো মানুষের জীবনই তো নষ্ট করার নয়।

"বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত সুমধুর/ দ্রব জীবন ঝরিবে ঝরঝর নির্ঝর তব পায়ে/ বাজাও তুমি কবি....."

অনেকদিন স্পিনোজা পড়িনি। আমার ভারি ভালো লাগে।

ষোলো শো শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। তাঁর চিন্তা ভাবনা, তাঁর দর্শন এই বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়ানো মানুষকেও কত নতুন এবং আশ্চর্য ভাবনাতে উদ্দীপিত করে।

তখন পৃথিবীতে অবশ্য অনেক বেশি শান্তি ছিল, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল, সেলসম্যান, দালাল, বিজ্ঞাপন আর মিডিয়ার মানুষরা তখন সদম্ভে দাপিয়ে বেড়াত না পৃথিবীময়। ক্ষমতার লোভ, যেনতেনপ্রকারেণ অর্জিত যশের লোভ, তাবৎ পৃথিবীর উপরে কোনো বিশেষ দেশের একাধিপত্য করার লোভ, মানুষকে, দেশের পর দেশকে এমন করে নষ্ট করেনি। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল মানুষের। ধর্মভীরু ছিল মানুষ। আর ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে অগভীর মনুষ্যেতর তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী ঠাট্টা করে। তারা বলে ধর্ম আর কুসংস্কার এক কথা। তারা বোঝে না ধর্ম আর রিচুয়ালস, সকাল সন্ধ্যা নিয়মের বেড়াজাল, পুজোর আচার-উপকরণ এক নয়। ধর্ম ছাড়া, ঈশ্বরবোধ ছাড়া, মানুষ অমানুষ হয়ে ওঠে। যা, আজ হয়েছে।

প্রত্যেক ধর্মেরই দুটি স্তর থাকে। সে ধর্ম হিন্দু মুসলমান, শিখ বা খ্রিস্ট যে ধর্মই হোক না কেন। সাধারণ মানসিকতার আপামর জনসাধারণের কাছে ধর্ম হচ্ছে এক "বাইন্ডিং ফোর্স"। সাধারণের পক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা সম্ভব নয়। তাই তাদের জন্যে একসময়ে হিন্দুধর্মের প্রচারকরা অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক বিরাটত্বের পটভূমিকাতে মন্দির বানিয়েছিলেন। সমুদ্রপারে পুরী, মরুভূমির মধ্যে হিংলাজ, তুষারবৃত গিরিশিখরের উপরে কেদারনাথ, বদরীনাথ। বহমান উত্তরবাহিনী গঙ্গার তীরে বিশ্বনাথের মন্দির অসি ও বরুণার বারাণসীতে। দামাল ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের পাহাড়ে কামাখ্যা। প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য ও বিরাটত্বের সামনে এসে দাঁড়ালেই সাধারণ মানুষের মনে, সে যে অতি দীনাতিদীন, সে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, এই ভাবটি জাগরুক হয়।

একমাত্র বিনয় এবং হিউমিলিটিই মানুষকে আত্মিক উত্তরণের পথে পৌঁছে দিতে পারে। আজকের দাম্ভিক, মূর্খ, নীচ, স্বার্থ-পরায়ণ, দ্বেষ ও ঈর্ষার জর্জরিত মানুষ তাই ধর্ম কি ও কেন তা ভুলে যেতে বসেছে। শুধু তাই নয়, "ধর্ম একটি কুসংস্কার" এ কথাও সদর্পে ঘোষণা করছে।

খ্রিস্টান ন্যূহ নৌকো বানিয়েছিলেন গ্রেট ডিল্যুজের সময়। পৃথিবী পাপের ভারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তখন। প্রলয়ংকরী বন্যায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সব মানুষ ও প্রাণী তাই ন্যূহ তাঁর নৌকোতে উভয়লিঙ্গের এক-একটি করে প্রাণী তুলে নৌকো ভাসিয়েছিলেন সৃষ্টি রক্ষা করতে। হয়তো সেই দিনের দিকেই আবারও এগোচ্ছি আমরা। বর্তমান পৃথিবীর মানুষদেব মানসিকতা দেখে তুলসীদাস, এবং অন্যান্য ভারতীয় সন্তদের লেখাতে যে "কলিযুগের" বর্ণনা আছে, তা হুবহু মিলে যায়।

জানোয়ারের কোনো ধর্মের প্রয়োজন হয় না। ধর্মবোধ এক বিশেষ উচ্চ মানসিক অবস্থা। মানুষের ধর্মই জানোয়ারের সঙ্গে মানুষকে আলাদা করে চিহ্নিত করে। এই ধর্ম মানবিক ধর্ম। সব ধর্মের মুলই হচ্ছে সে কথা।

বুদ্ধদেব বলেছেন : "মানুষের মনের প্রকৃতি হচ্ছে এক ঘন ঝোপের মতো। তার মধ্যে প্রবেশ করা এবং তাকে ভেদ করা বড়ো কঠিন। কিন্তু তুলনাতে জানোয়ারদের প্রকৃতি অনেক সহজ। তাদের বোঝাও সহজতর। তবু সাধারণভাবে মানব প্রকৃতিকে আমরা মোটামুটি চারভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথম ভাগে পড়ছে সেই সব মানুয, যারা ভুল শিক্ষার কারণে অনেক কিছুই করে, যা তাদের দুঃখই ডেকে আনে।

দ্বিতীয় ভাগে পড়ছে তারা, যারা তাদের নিষ্ঠুরতার দ্বারা, তাদের চৌর্যবৃত্তি দ্বারা, তাদের হনন করার প্রবৃত্তি অথবা অন্যান্য নানা নির্দয় কাজের দ্বারা অন্যদের কষ্ট দেয়।

তৃতীয় ভাগে পড়ে তারা, যারা নিজেদের কষ্টের মধ্যে দিয়ে অন্যদের কষ্ট ডেকে আনে। তাদেব নিজেদের সঙ্গে অন্যদেরও দুর্দশার মধ্যে ফেলে।

আর চতুর্থ ভাগ হচ্ছে তারা, যারা নিজেরা দুঃখী হয় না এবং অন্যদেরও সুখী করে তোলে, বাঁচায় কষ্টের হাত থেকে।"

এই চতুর্থ শ্রেণির মানুষেরাই বুদ্ধদেবের বাণী শিরোধার্য করে, লোভের রাগের আর মূর্খামির শিকার হয় না কখনই। তারা শান্তিতে বাঁচে। দয়া আর প্রজ্ঞা নিয়ে। তারা চৌর্যবৃত্তি অথবা হননবৃত্তির আশ্রয় নেয় না।

এই চৌর্যবৃত্তি বা হননবৃত্তি শুধু আক্ষরিক অর্থেই নয়। মানুষ চুরি করে ক্ষমতাবান হতে পারে, যশস্বী হতে পারে। অন্যের ভালোত্বকে, নির্মল চরিত্রকে হনন করতে পারে, তাও চুরি করে।

সেই চুরি এবং সেই হত্যা আক্ষরিক অর্থর চৌর্যবৃত্তি বা হননবৃত্তির চেয়ে কোনো অংশেই কম নিন্দনীয় নয়। অথচ এইসব চোর আর খুনিতেই পৃথিবী ভরে গেছে এখন।

আমার মনে হয়, আমি এই রকম চরিত্রের মানুষদের মুখ দেখেই তাদের বুঝতে পারি। তারা বাহ্যিক চেহারাতে সুন্দরই হোক কী কুৎসিতই হোক, ফরসাই হোক কি কালোই হোক তারা কাছে এলেই আমার দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। এই সব চোর ও খুনিরা অন্যের চোখে সোজা করে চাইতে পর্যন্ত পারে না। তারা যেখানেই থাকে সেখানেরই পরিমণ্ডলে এক অদৃশ্য কু-তরঙ্গ ওঠে। আর ভালো মানুষ, মানে এই চতুর্থ শ্রেণিরা মানুষেরা যেখানেই যায়, যার সঙ্গেই ক্ষণিক মেলামেশা করে, সেই স্থানে এবং সেই মানুষের মনে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

ধম্মপদ-এর পাঁচ নম্বর শ্লোকে আছে যে "ঘৃণাকে কখনওই ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না এই পৃথিবীতে। শুধু ভালোবাসা দিয়েই ঘৃণাকে অপসারিত করা যায়। এই হচ্ছে সুপ্রাচীন নিয়ম।"

তেষট্টি নম্বর শ্লোকে আছে যে "যে বোকা নিজেকে বোকা বলে জানে সে শুধুমাত্র সেই কারণেই বিজ্ঞ। যে বোকা নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবে সেই হচ্ছে আসল বোকা।"

একশো তিন নম্বর শ্লোকে আছে "যদিও কেউ হাজার রণক্ষেত্রে জেতে, হাজার মানুষকে পরাভূত করে, তবুও যে নিজেকে জয় করতে পারে তার সঙ্গে তুলনায় জয়ী বলেই বিবেচিত নয়।"

অন্য কথাতে এসে গেলাম। স্পিনোজারর কথা থেকে। এই সব প্রসঙ্গে একবার এলে, এতে এত পথ, এত মত যে পথ হারিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় একটুও।

সাধারণ মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরকে কল্পনা করতে বিগ্রহের দরকার হয়, ধর্মীয় আচারে পাণ্ডাব বা পুরোহিতের সাহায্যে প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে মানুষ এক বিশেষ মানসিক উচ্চতাকে নিজেকে উন্নত করতে পেরেছে, তার পক্ষে মসজিদে, বাড়িতে বাবংবার নমাজ পড়া অথবা উপোস করে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করার প্রয়োজন হয় না। আকাশে, বাতাসে, বনে, পাহাড়ে, দ্রুতধাবমানা নদীর দিকে চেয়েই তার ঈশ্বরকে সে প্রত্যক্ষ করতে পারে, হৃদয়ের মাঝে অনুভব করতে পারে সহজে। শিক্ষিত, উচ্চকোটির মানুষের কাছে এই ঈশ্বরের কোনো বিশেষ অবয়ব নেই। প্রত্যেক জীবনের মধ্যেই তিনি থাকেন। অন্তত থাকার চেষ্টা করেন। তিনিই শুভবোধ, ন্যায়, সততা ইত্যাদির সংজ্ঞা।

যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন না বলেন, তাঁরা এই সব বৃত্তিকেই মানেন না।

ঈশ্বরের বাস মসজিদে, মন্দিরে বা গির্জাতে নয়, তা মানুষের মনে।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ পি. ই. এন কংগ্রেসের এক বক্তৃতাকে বলেছিলেন, "প্রকৃত ধর্মকে আমরা কখনও বাইরে থেকে পাই না, বই পড়ে বা শিক্ষকের কাছে পাঠ নিয়ে। প্রকৃত ধর্ম বাধাবন্ধের ধর্ম নয়, নিয়মবন্ধতা নয়, অভ্যাস নয়। সে ধর্ম প্রত্যেক মানুষের আত্মার আকুতি, যে

আকুতি খুলে যায়, জড়িয়ে রাখা গালচের মতো নিজেরই অন্তরের অভ্যন্তরে। সেই ধর্ম তার জীবনের রক্তকণিকা দিয়ে তৈরি করে নিয়েই পেতে হয়।"

এত কথা এসে পড়ছে কারণ ফাদার উইধাস-এর সঙ্গে এই সব নিয়ে সেদিন আলোচনা হল বলে এখনও টাটকা টাটকা মনে আছে।

খ্রিস্টান মিশনারিদের মধ্যে সকলেই ফাদার হফফম্যান নন। ফাদার উইধাসও নন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ধর্ম সম্বন্ধেও কোনো স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ধারণা নেই, অনেক টিকিওয়ালা ধর্মান্ধ পণ্ডিত বা দাড়িওয়ালা মোল্লারই মতো। গায়ের চামড়া সাদা হলেই মানুষ কিছু অন্য রকম হয়ে যায় না। এই সব সাদা-চামড়া মিশনারিদের কাছে ধর্ম আর বাইবেলের বাণী সমার্থক, যেমন অনেকের কাছে কোরান বা গীতাই হচ্ছে ধর্ম।

আমার মুখে জৈন ধর্ম, জরথুস্ট্রের কথা, বুদ্ধদেবের এবং মহম্মদের এবং আরো অনেকের কথা শুনে ফাদার উইধাস খুব আগ্রহভরে আলোচনা করেছিলেন।

আমি যখন উঠে আসব তখন কুটুস করে বললেন যে, তোমরা বলো যে, মানে তোমাদের শাস্ত্র বলে যে, 'রিলিজিয়ন ইজ আ বাইন্ডিং ফোর্স'। তাই কি? তোমাদের হিন্দুধর্ম কি এখনও তাই আছে? কিছু মনে কোরো না। কোনো লক্ষণ তো দেখি না।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। কিন্তু আগেই বলেছি যে, এই ধারণ-শক্তি সাধারণের জন্যে। "ধর্ম" কথাটার মানে হচ্ছে "যা ধারণ করে।" সংস্কৃত শব্দ তো!

উনি বললেন, এখানকার হিন্দুদের দেখে মনেই হয় না যে, তোমাদের দেশে হিন্দুধর্ম বলে কিছু আছে। খ্রিস্টানরা প্রতি রবিবারে গির্জায় আসে প্রার্থনা করতে। মুসলমানরা প্রতিদিনই নমাজ পড়ে, শুক্কুরবারের তো পড়েই। তোমরা তো নিয়মিত ভাবে তোমাদের বত্রিশ কোটি দেবতার কোনো দেবতাকেই স্মরণ করো না। করো না, তা ঠিক নয়, করো, যখন মেয়ের পরীক্ষা আসে, স্বামীর দুরারোগ্য অসুখ হয়, তখনই।

আমি হেসে বললাম, কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু যাকে ধর্ম বলে অভিহিত করছ তা রিচুয়ালসই মাত্র। আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মান্ধতা দেখতে হলে তো বলতে হয় মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি ধার্মিক। কথাটা ঠিক নয়। হিন্দুধর্মও যে গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেয়নি বা এখনও দেয় না তা অস্বীকার করব না কিন্তু শিক্ষিত হিন্দুদের এক বিরাট অংশই এই রিচুয়ালস মানাতে আর বিশ্বাস করে না। অনেকেই বলে যে, আমরা ধর্মও মানি না। কিন্তু সে তারা অতি—সপ্রতিভতা বশে বলে। ধর্ম কাকে যে বলে সেটুকু জ্ঞানও ফালতু, ফাঁকা ইংরিজি শিক্ষার দম্ভ তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে দেয়নি। তারপর বলেছিলাম, তোমাকে আমি একটা কথা বলব ফাদার। অনেকদিন আগে বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাটে আমার সঙ্গে একজন অ্যামেরিকান দার্শনিকের আলাপ হয়। ভদ্রলোকের হিন্দুধর্ম ও নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান ছিল। বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, ভদ্রলোককে আজ তুমি যে প্রশ্ন আমাকে করলে, আমিও ঠিক সেই প্রশ্নই করেছিলাম।

কী বললেন উনি?

উনি বললেন যে, হিন্দুধর্ম বড়োই গভীর। গয়ার ফল্গু নদীরই মতো তার চলন অন্তঃসলিলা। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। অন্য অনেক ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম তুলনীয়ও নয়।

তারপরই হেসে বলেছিলেন সেই আমেরিকান দার্শনিক : "You have to scratch a Hindu to find Hinduism in him."

ফাদার উইধাস অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন।

তার পরে বলেছিলেন, কথাটা ভাববার মতো।
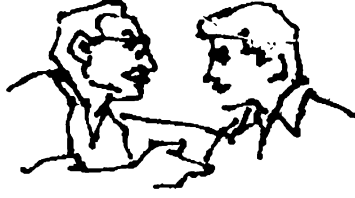
রাত অনেকই হল। একদল জংলি কুকুর কোনো শম্বর বা বারাশিঙাকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে নদী পারের জঙ্গলে। মুখ দিয়ে একরম কুঁই-কুঁই আওয়াজ করে এই সময়ে কুকুরগুলো।

মেঘ জমেছিল পশ্চিমের আকাশে বিকেল থেকেই। মেঘের মাদল বাজছে দ্রিমি-দ্রিমি-দ্রিম-দ্রিম। ঝরে পড়বে বলে সাজছে আকাশ। আমার ঘুমন্ত, পরমাসুন্দরী স্ত্রী কালকেউটের মতো মসৃণ কালো অনাবৃত শরীরের ওপর লন্ঠনের আলো-আঁধারি তাকে বড়ো রহস্যময়ী করে তুলেছে। সে পেছন ফিরে শুয়ে আছে। মাটির দেওয়াল সাজিমাটি দিয়ে রাঙানো। সেই দেওয়ালে তার শরীরের ছায়া পড়েছে। মনে হচ্ছে, অজন্তার গুহা-গাত্রেরই কোনো ছবি।

লন্ঠনটার ফিতে কমিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে দিলাম। তারপর হনসোর পাশে গিয়ে ওর ঢেউ-খেলানো কোমরে হাত রেখে শুয়ে পড়লাম। আঃ! যেন গ্রীষ্মবনের কোনো ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকা, সবুজ অন্ধকারে ঢাকা। ও জেগে গেল তারপর আমার হাতটিকে টেনে নিয়ে ওর মসৃণ চিকন উরুসন্ধিতে রেখে আবারও ঘুমিয়ে পড়লো। তার শরীরের পরম-রতনকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে সারা রাত এমনই নীরব আদেশ করল যেন।

ভাবছিলাম, এই মেয়েরা এক আশ্চর্য সৃষ্টি বিধাতার। ইংল্যান্ডে, ইউরোপের জাপানের, থাইল্যান্ডের এবং আরো কতো দেশের কত শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণাঙ্গিনি, পীতাঙ্গিনি, জলপাইরঙা শরীরের নারীর সঙ্গে সহবাস করলাম কিন্তু আমার এই হনসোর কোনো তুলনা নেই। ও যেন পৃথিবীর আদিমতর রমণী। জীবনানন্দর কবিতার লাইন থেকে উঠে এসেছে। ব্যাবিলনেও ছিল যেন ও কোনো সময়ে, ছিল কায়রোতেও।

নারীশরীর সম্বন্ধে যে সব পুরুষের কৌতূহল পরিপূর্ণভাবে নিবৃত্ত না হয়, তার পক্ষে বোধহয় কাম আর প্রেমের মধ্যে কী এবং কতটুকু তফাত তা বোঝা সম্ভব নয়। ভোগীরাই একমাত্র প্রকৃত ত্যাগী হতে পারে, যখন সে তা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

আমার শরীরজাত বাসনা-কামনাতে এখন আর কোনো এলোমেলোমি নেই। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখারই মতো সে সমাহিত। যেমন আমার মন।

অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছা করে আমার। কিন্তু লেখা তখনই সার্থক যখন পাঠক-পাঠিকা তা পড়েন। তার রস আস্বাদন করেন। পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছোতে না পারলে পাণ্ডিত্যের দার্ঢ্য আর দম্ভ দিয়ে লাভ কি? আবার যে লেখক পাঠক-পাঠিকার প্রশংসা পাবার জন্যে নিজেকে নিলামে চড়ান তাঁর লেখকত্বও তো মাটি। পাঠক-পাঠিকারা লেখকের অতি সম্মানিত মানুষ কিন্তু লেখকের নিজস্বতা ও প্রকৃত বক্তব্যকে বিকিয়ে দিয়ে জনপ্রিয় হবার জন্যে দৌড়ে-বেড়ানো—লেখকেরা লেখক আদৌ নন। বিশ্বাসতাড়িত হয়ে, গভীরতা থেকে উঠে এসে যদি কলম আঁচড় কাটা শুরু করে, লেখক যদি না-লিখে না-পারেন তখনই লেখা হয়। প্রকাশকের হুকুমে বা নিজের তড়িঘড়ি

অর্থোপার্জনের তাগিদে যে লেখা, সে লেখা থাকে না। মিডিয়া, সেই লেখককে মইয়ের উপরে তুলে তার মুখে যত শক্তিশালী আলোই ফেলে রাখুন না কেন!

এই সব ভেবেটেবেই কোনোদিন লেখক হবার বাসনা বা সাহসও আমার হবে না।

লেখক বেঁচে থাকেন পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে। তাই-ই তাঁর চিরদিনের নীড়। তাঁর মহোত্তর অবলম্বন। এ কথা বোধহয় স্বদেশ-বিদেশের বেশির ভাগ লেখকই বোঝেন না। টাকা রোজগারই যদি করতে হবে টাকা রোজগারের হুল্লোড় পড়ে গেছে ইংল্যান্ডে অ্যামেরিকাতে এখন? টাকা হয়েছে অনেক লেখকেরই অঢেল। এখানে ভিলা, ওখানে কটেজ, সমুদ্রে বেড়ানোর বোট, কিন্তু পাঠকের সম্মান তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। একজন চিত্রতারকা বা ফুটবলার বা ক্রিকেটারের সঙ্গে একজন লেখককে আগে একাসনে কখনোই বসানো হত না। সারা পৃথিবীর অর্থগৃধ্নু কিছু লেখকরাই তাঁদের হঠকারী অপরিণামদর্শিতায় সমস্ত লেখকদেরই এই ধুলো-কাদায় টেনে নামিয়েছেন। এটা পরম দুঃখের।

আমার এই ডাইয়ারি তো ছাপা হবে না কোথাও। অন্য একজনের হাতেও পড়বে কি না তাও জানি না। হনসো তো পড়তে পারে না। ওদের নিজেদের ভাষাও তো মুখেরই ভাষা। হরফ তো নেই ওদের। ফাদার হফফম্যান অনেকেই কিছু কাজ করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে হো, মুন্ডা, গোন্দ এই সব আদিবাসী ভাষায় বিশেষ তফাত নেই তাই এই তিন ভাষাভাষীরাই উপকৃত ওঁর কাছে।

ঘুম আসছিল না। ভাবছিলাম, ছেলে বা মেয়ে যেই আসুক, সে কেমন হবে কে জানে? সে যদি পড়াশুনো না করতে চায়। আমার 'জিন'ই যে তার মধ্যে আসবে তা কে বলতে পারে? হয়তো হনসোর বাবার 'জিনই' আসবে। সেই বৃদ্ধ কেবলই বসে থাকেন, চুটটা টানেন আর মহুয়া খান। প্রথম যৌবন থেকেই নাকি তাই-ই করে আসছেন। হনসোর জন্ম দেওয়ার পর কষ্ট করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আর একবারের জন্যেও নাকি সহবাস করেননি। অদ্ভুত মানুষ বটে।

হনসো হাসতে হাসতে বলেছিল কোনোরকম নড়াচড়ার মধ্যেই উনি নেই।

হনসো মা চলে গেছিলেন অন্য একজনের সঙ্গে। তখন যৌবনের শরীর। বুনো কুকুরেরই মতো। খুবলে খেতে চায় অন্যকে। তারপর শরীরের সাধ মিটে গেলে আবার ফিরে এসেছিলেন হনসো বাবারই কাছে।

মানুষের জীবনে মনই যে আসল, শরীর কিছুই নয়, এই কথাটা হনসোর মা আজকে জেনেছেন যৌবনের জ্বালা প্রশমিত করে। কিন্তু অনেক শিক্ষিত মানুষকে জানি, যাঁরা এসব কথা না জেনেই, এসব বোধের শরিক না হয়েই না জেনেই চলে গেলেন। মৃত্যুদিন পর্যন্ত পাগল' শেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করে গেলেন চড়ুই পাখির ক্ষমতা নিয়ে। কী যে চিত্তির।

হনসোর বাবা মানুষটিকে আমার ভারি ভালো লাগে। দু-কানে পেতলের মাকড়ি। তীক্ষ্ণ নাক। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুটি চোখ। সাধারণত কথা বলেন চোখ দিয়েই বেশি, মুখ দিয়ে কম। সব সময়ই হাসছেন, না হেসে। গরমে খালি-গা। শীতে, নানা রঙের সুতোর কাজ করা পাতলা লেপের জামা। সকাল থেকে রাত অবধি গাঁয়ের মস্ত শালগাছের হেলান দিয়ে বসে মহুয়া খাচ্ছেন আর চুটটা টানছেন। সব সময়ই শিশুরা ঘিরে আছে তাঁকে।

গাঁয়ের লোকেরাই সকলে মিলে ওঁর মহুয়া আর চুটা সাপ্লাই করে। ওরা বলে, উনি গাঁয়ের মাঙ্গলিক। যেন. টোটেম। অধিষ্ঠাত্রী দেবতারই মতো। কোনো প্রাচীন মহীরুহর মতো।

বুড়ো বলছি বটে কিন্তু শিশুদের সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকাতে আর তাদের গল্প বলাতে তাঁর শৈশব রয়ে গেছে যেন এখনও। কোনো দাবিই নেই কারো উপরে। অন্যনির্ভর হয়ে বাঁচার কারণে কোনো গ্লানিও নেই। যেন শাক্যসিংহ বোধিলাভের জন্যে বসে রয়েছেন তরুমূলে।

একটা জীবন, মাত্র একটাই জীবন কি? জানি না, এখনও নিঃসন্দেহ নই আমি। যদি মেনেই নিই যে, একটামাত্র জীবন, তবু সেই একটা মাত্র জীবনেও কত ভাবে বাঁচা যায়! অবাক। হনসোর বাবাকে দেখে।

অনেকদিন যাওয়া হয়নি ওঁর কাছে। বিয়ের আগে আমিও বসে গল্প শুনতাম শিশুদের সঙ্গে। একদিন যাব। খুব ভালো লাগে ওঁর কাছে থাকতে। মনটা এক গভীর অনাবিল প্রসন্নতায় ভরে যায়। বড়ো ভালো আত্মার মানুষ।

আজ পঁচিশ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে রবীন্দ্রনাথকে কখনও দেখিনি। কখনও দেখিনি বললে অবশ্য ভুল হবে। দেখেছি আবার দেখিওনি।

আমি তখন খড়্গাপুরে গেছি আমাদের পাড়ার বন্ধু যতীনদের মামাবাড়িতে বেড়াতে। স্কুলের পরীক্ষার পরে। তারই সঙ্গে। যতীনের মামা রেলে কাজ করতেন। স্টেশনের কাছেই ছিল তাঁর কোয়ার্টার। তখন খড়্গাপুরে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মহা রবরবা। যতীন, যতীনের মামাতো ভাই, আমাদেরই সমবয়সি পতে আর আমি প্রায়ই স্টেশনে বেড়াতে যেতাম।

একদিন সকালের জলখাবার খেয়ে স্টেশনে গিয়ে দেখি হই হই পড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ কোথাও যাচ্ছেন। খড়্গাপুরের উপর দিয়ে যে ট্রেনে তিনি যাচ্ছেন সেই ট্রেন যাবে। একদল মহিলা ও পুরুষ মালা-টালা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রবীন্দ্রনাথকে দেবেন বলে। তখনও রবীন্দ্রনাথকে নামেই চিনি। তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হইনি। তবু যে বয়সে, ডাইনোসর অথবা গন্ডার, রম্যাঁ রঁলা অথবা শোপেনহাউয়োর-এর সম্বন্ধে এক ধরনের হুজুগ এবং ধোঁয়াশা-ভরা ঔৎসুক্য ছিল। সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রতিও সেই রকমই এক ভাসা-ভাসা ঔৎসুক্য ছিল। তা বেশি নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের ট্রেন আসার কথা শুনে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম একটু।

ট্রেন এল যথাসময়ে। তখন চার ফিটের কম উচ্চতার আমরা দুজনে নানা মানুষের ভিড়ে তাঁব কাছে গিয়ে পৌঁছোতেই পারলাম না। রবীন্দ্রনাথের মুখও দেখতে পেলাম না। দেখতে পেয়েছিলাম শুধু তাঁর বাঁ হাতখানি। হালকা নীল অথবা সবুজ রঙা ভারী কাপড়ে তৈরি জোব্বার হাতায় মোড়া। হাতখানি রাখা ছিল ফার্স্ট-ক্লাসের কামরার জানালার উপরে। ধবধবে ফরসা বড়ো বড়ো এবং মোটা মোটা আঙুলগুলি। এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তাঁর চেহারা, চেহারা নয়, হাতখানি দেখেই মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ প্রথিতযশা কবি না হয়ে প্রথিতযশা কুস্তিগিরও হতে পারতেন।

ফার্স্ট-ক্লাসের কামরা জানলাতে রাখা সেই হাতখানি গেঁথে গেছিল কিশোর মনের মধ্যে।

সাহিত্য আমা প্রিয় বিষয়। সে কারণে পরবর্তী জবীনে রবীন্দ্রনাথ আমার মনে অনেকখানি জায়গাই জুড়ে বসেছিলেন। এবং যতদিন বাঁচি থাকবেনও। তবে আজ পেছন ফিরে চাইলে মনে হয়, জমিদার এবং ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথকে বড়ো করতে গিয়ে আমরা অন্যান্য বাঙালিদের ন্যায্য সম্মান থেকে বঞ্চিত নাও করতে পারতাম।

আমাদের দেশের সাধারণ এবং হয়তো অসাধারণ মানুষেরাও ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এবং কলেরাতে যেমন চিরদিনই মরেছেন তার চেয়ে একটুও কম মরেননি অন্ধ নায়ক-পুজোর হিড়িকে এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব নায়ক, সাধারণ্যের চোখে দেবতা হয়ে থেকেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মূর্তি এমনকী ব্যক্তিপূজোরও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই দ্বৈত-মনের ব্যাপারটা আমি কোনোদিনই ঠিক বুঝিনি। গুরুবাদকে নস্যাৎ করে অনেকেই নিজেরা গুরুদেব হয়ে উঠেছিলেন এবং তা হয়ে উঠতে একটুও লজ্জিত হননি। ভারতীয় চরিত্রে ভণ্ডামির শিকড় মনে হয় বড়ো গভীরেই প্রোথিত হয়ে আছে। পথের মানুষেরা তো সাধারণ! তাঁদের তাবৎ অধীত জ্ঞান নিয়েও জনরণ্যের পূজা কুড়িয়েছেন নিজেরাই মূর্তি বনে গিয়ে। অথচ সাকার ঈশ্বরে তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল না। এ কথা ভাবলে আশ্চর্য হই।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তো ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী। পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর শুধু অনীহাই ছিল না একধরনের সূক্ষ্ম অনুকম্পাও ছিল। ব্রাহ্মধর্মকে বড়ো করতে গিয়ে অজানিতে ও হয়তো অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হিন্দুধর্মকে তিনি ছোটোও করেছেন অনেক সময়ে। পৌত্তলিকতা ব্যাপারটা সাহেবদের কাছে যেমন ঘৃণার, রেনেসাঁর বাঙালিবাবুদের কাছেও •ই-ই। অথচ হিন্দুধর্মের সবটাই নির্লজ্জ ব্রাহ্মণদের এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণদের বিভিন্ন নিম্নবর্ণের মানুষের উপর অত্যাচারে, নানা আচার অনুষ্ঠানের বদ্ধতায় এবং হিন্দুধর্মের বহিঃপ্রকাশের সাধারণ সংকীর্ণতা মধ্যে আদৌ সীমিত নয়।

এই কথাটা স্বামী বিবেকানন্দ যেমন স্পষ্ট করে বলেছেন তেমন স্পষ্ট করে আর কোনও ভারতীয়ই হয়তো বলেননি। স্বামী বিবেকানন্দর মতো বড়ো সমাজতান্ত্রিক, মানবিক, উদার, হিন্দুধর্মের সার-অনুসন্ধানকারী মানুষ সম্ভবত ভারতে হয়তো আর হননি। ওঁর চেয়ে বড়ো কমিউনিস্টও হয়তো কেউ ছিলেন না। ছিলেন না কেউ ওঁর চেয়ে বড়ো প্রেমিকও। তাঁর ধর্ম ছিল মানুষের ধর্ম। তাঁর দৃষ্টি ছিল অনাবিল। তাঁর প্রেম ছিল সর্বমানবের প্রতি। সর্বধর্মের প্রতি। তাঁর ইংরিজি ও বাংলার জ্ঞানও ছিল অপরিসীম। অথচ তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো বড়োলোকের ছেলে ছিলেন না। "বড়ো" হওয়া তাঁর পক্ষে অনেকই বেশি কষ্টসাধ্য ছিল।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। এত কথা শুধু এই জন্যেই বলা যে বাংলার রবীন্দ্রনাথ বা মহাত্মা গান্ধি বা সুভাষ বোস বা জওহরলাল নেহরু বা সাম্প্রতিকালের সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে যত নাচানাচি করেছেন এবং এখনও করছেন, তার সিকিভাগও যদি স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে করতেন তবে আজ এই দেশের এবং বাংলার চেহারা হয়তো একেবারেই অন্যরকম হত। এখানে ভঙ্গি চিরদিনই সারল্যর উপরে জয়ী হয়ে এসেছে। এখানে সবজি ও মাছের বাজারে চিরদিনই ওজনে চুরি যেমন ছিল তেমনই চুরি ছিল মানের ও গুণের বাজারেও। সেই চুরি বন্ধ করার চেষ্টা করেননি কোনো ক্রেতাই। আর বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বিক্রেতারা তো চিরদিনই ভেবেছেন গুণ ও মানের ব্যাপার বোকারা আর কী বুঝবে। যারা চিরদিন নৈবেদ্য সাজিয়ে এনে মানুষরূপী দেবতার পায়ে তা উজাড় করে দিয়েই খুশি হয়েছে, গুরুর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে, তাদের পুজো গ্রহণ করেই চিরদিন তাঁরা ধন্য করেছেন সেই আপামর গুণগ্রাহীদেরই।

ওই মানুষটিকেই ভারতের অবাঙালিরা কিন্তু প্রথমদিন থেকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন তাঁদের হৃদয়ে, বাঙালিরা তাঁদের মিথ্যে উচ্চম্মন্যতায় এবং কিছুটা ইংরেজি সাহিত্য, জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হওয়ার কারণেও স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর যোগ্য সম্মান দেননি। দিলে, আজ বাঙালি জাতি হিসেবে একেবারেই অন্যরকম হত হয়তো। তার গরিমা রাখার জায়গা থাকত না। "কর্মযোগ" কাকে বলে তা হৃদয়ে উপলব্ধি করলে, কুঁড়ে, শ্রমবিমুখ, অনিয়মানুবর্তী এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রজাতি হিসেবে আজকে তার এমন বদনাম হত না।

অবশ্য এসব আমারই একান্ত ধারণা। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তও হতে পারে। নগরসভ্যতার, পশ্চিমি দুনিয়ার সমস্ত সুখ-আহ্লাদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এই বনবাসে এসেছিলাম বলেই হয়তো আমি একাধিক যুগ ও কালের অনেক ব্যাপার, অনেক ঘটনা সম্পূর্ণ অন্য প্রেক্ষিতে, আলোতে, আভাসিত ও আলোকিত দেখতে পাই। লানডানএ বা কলকাতাতে থাকলে নিরন্তর জাগতিক প্রাপ্তির পেছনে দৌড়ে সেই সব উপলব্ধি করার ক্ষমতা থেকেও হয়তো বঞ্চিত হতাম। স্বামী বিবেকানন্দের সব কথা বাঙালি জানলে, জানতে আগ্রহী হলে, সাহিত্য সঙ্গীত চলচ্চিত্র ইত্যাদিকে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনের উপরে স্থান দিতেন না। আধ্যাত্মিক জীবন সবচেয়ে উপরে। অন্য সমস্ত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জগৎ দাঁড়িয়ে আছে অধ্যাত্মবোধেরই ভিত্তির উপরে। এই মূল ও সহজ কথাটাই যেন শিক্ষিত বাঙালিরা কোনোদিনও বোঝার চেষ্টা করলেন না।

আধুনিক বুদ্ধিজীবী এবং বিশেষ করে ইংরিজি-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। বুদ্ধিজীবীদের যে বড়ো অংশ কমিউনিস্ট, তাঁরা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নাস্তিকতার মধ্যে শুধু জ্ঞানের গরিমাই নয়, শ্লাঘার কারণও খোঁজেন।

সেদিন ফাদার উইথাসের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে সত্যিই খুব আনন্দ পেলাম। আস্তিকতা ব্যাপারটা সকলের সঙ্গে আলোচনার নয়। এই প্রকৃতির বিরাটত্বের মধ্যে বাস না করলে, এর অমোঘতাকে হৃদয়ে না জানলে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণাও আমার হত না। আমিও অবহেলায় নগরভিত্তিক সবজান্তাদের মতো নাস্তিকতা নিয়ে হয়তো গর্বিতই বোধ করতাম।

আসলে ঈশ্বরবোধ আর শুভাশুভ বা ন্যায়-অন্যায় বোধ যে সমার্থক, ঈশ্বরবোধের অভাব যে মানুষকে পশুতেই পর্যবসিত করে এই কথাটা উপলব্ধির। যুক্তি দিয়ে প্রমাণের নয়।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরবোধের যে কোনোই বিরোধ নেই তা আমি স্পষ্ট বুঝি। বিজ্ঞান কোনো কিছুই উদ্ভাবন করেনি। করবেও না। যা কিছুই ছিল তাকেই তা আবিষ্কার করেছে মাত্র। মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তৃত হয়েছে মানুষ ততই সমস্ত বিজ্ঞানের আদি যে শক্তি, তাকে ভুলেই শুধু যায়নি, তাকে অস্বীকার পর্যন্ত করেছে তার পরম নির্বুদ্ধি-নির্ভর ঔদ্ধত্যে। এটা পরম লজ্জা ও ক্ষোভের ঘটনা বলেই মনে হয়।

স্বামীজি আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতাতে বলেছিলেন :

''Science is nothing but the finding of unity. As soon as science would reach perfect unity,it would stop from further progress, because it would reach the goal. Thus chemısty could not progress further when ıt would dıscover one element out of which all others could be made.''

ঠিক এই ভাবেই স্বামীজি হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসী পশ্চিমিদের বুঝিয়েছিলেন '' Physics would stop when ıt would be able to fulfil its services in discoverıng one energy of which all the others are but manifestations,and the science of religion becomes perfect when it would discover Him who is one life in a universe of death.....

All Science is bound to come to this conclusion in the long run. Manifestation, and not creation, is the word of scicnce to day, andthe Hindu is only glad that what he has been chershing in his bosom for ages is going to be taught ın more forcible language and with further light from the latest conclusions of Science.''

তবে একথা ঠিক যে, নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করা সাধারণ মানের মনের মানুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিভিন্ন মানুষের মানসিকতার স্তর তো আর এক হতে পারে না। যাদের পক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করা সম্ভব নয়, তাদের জন্যেই অগণ্য মূর্তি, মূর্তি-পুজো।

আমার মনে হয় যে, হিন্দুদের অধিকাংশ ধর্মস্থান, মন্দির এবং বিগ্রহই যে অসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং প্রায়শই দুর্গম স্থানে অবস্থিত, তার কারণ হিন্দুধর্ম, প্রত্যেক মানুষ বিশেষ করে সাধারণদের মানসিকতার প্রতিও অত্যন্ত সম্মান পোষণ করে। সমুদ্রের পারে এসে দাঁড়ালে যে কোনো মানুষেরই মনে অসীম সম্বন্ধে, আদি ও অনন্ত সম্বন্ধে এক ধরনের বোধ জাগরূক হয়। যেমন হয় সুউচ্চ তুষারবৃত গিরিশৃঙ্গ গিয়ে পৌঁছোলে। অথবা গভীর অরণ্যানি বেষ্টিত দুর্গম স্থানের মন্দির বা বিগ্রহের সামনে উপস্থিত হলে।

হিন্দুদের প্রত্যেকটি ধর্মস্থানেব অবস্থানের পেছনে হয়তো সুচিন্তা ও সুপরিকল্পনা আছে। মানুষই যে সবজান্তা এবং সেই যে সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক ও পরিচারক নয় এই কথাটা মনের মধ্যে প্রাকৃতিক বিরাটত্বের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক মানুষেরই মনে হতে বাধ্য। যিনি নাস্তিক তাঁর মনেও আলোড়ন ওঠা স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষদের মনে ঈশ্বরের বোধ জাগানোর জন্যেই হয়তো এই রকম জায়গাতে মন্দির এবং মন্দিরের ভেতরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা। কারণ, সেই সাধারণদের কাছে বিগ্রহই যে ঈশ্বর।

যাঁদের মানসিকতার স্তর এই সব সাধারণের মানসিকতার স্তরের চেয়ে উঁচুমানের, তাঁরা সৃষ্টির মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বরকে সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। পশ্চিমি দুনিয়ার মানুষ এবং অধুনা দিশি বুদ্ধিজীবীরা পৌত্তলিকতাকে দূষণীয় বলে মনে করেন হয়তো এই কারণেই যে, এই মানসিকতার স্তরের বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাঁদের কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই। ববীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বলেছেন .

> ''ওদের কথায় ধাঁধাঁ লাগে তোমার কথা আমি বুঝি
> তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি।''

আকাশ বাতাসে সোজাসুজি ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার মানসিকতা সকলের থাকে না। কিন্তু থাকে না বলেই যাদের তা নেই তাদের মধ্যে এই মানসিক উচ্চতা আশা করাটাও অন্যায়। হিন্দুধর্মই বোধ হয় একমাত্র ধর্ম যেখানে এমন দ্বিস্তর বোধের কথাকে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনো ধর্মেই বোধহয় এই সচেতনতা দেখা যায় না।

স্বামীজি বলেছিলেন :

''One thing I mudt tell you. Idolatory in India does not mean anything horrible. It is not the mother of harlots. On the other hand, it is the attempt of undeveloped minds to grasp high spiritual truths.''

এত কথা বললাম বলে একথা কারোই ভাবা উচিত হয় যে মূর্তিপুজো যিনিই করেন তিনিই দ্বিস্তরের মধ্যে নিম্নস্তরের। তেমন যে হতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণও তো মা কালীর মূর্তিকেই পুজো করতেন। তাই বলে কি একথা কেউ বলবেন যে, তাঁর মানসিক স্তরটি নিম্নমানের ছিল? উচ্চস্তরের বহু মানুষই মূর্তি পুজো করে থাকেন। কিন্তু সামনে কোনো দেব না দেবীর মূর্তি না থাকলেও তাঁদের সাধনার কোনো হেরফের হত না।

বৌদ্ধ অথবা জৈনরা ঈশ্বরের উপাসক নন। বুদ্ধদেব এবং মহাবীর, দুই ঈশ্বরের অবতারকেই তাঁরা পুজো করেন। কিন্তু তাঁদের ধর্মের সমস্ত বেগই সঞ্চারিত হচ্ছে এক মহান সত্যে কেন্দ্রবিন্দুতে, যে কেন্দ্রবিন্দু সমস্ত ধর্মেরই মূল বক্তব্য, মানুষকে উত্তীর্ণ করা, মানুষের উত্তরণ সম্পূর্ণ করে তাকে অন্য এক উচ্চতাতে ঠেলে তোলা। যে উচ্চতায় পৌঁছোনোর মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব নিহিত আছে। বৌদ্ধ এবং জৈনরা ঈশ্বরের জাতকের পূজারী, জনকের নন। কিন্তু জাতকের পুজোর মধ্যে দিয়েই তাঁদেব জনকের কাছে পৌঁছোনো।

হিন্দুধর্মের গুণগানের সঙ্গে সঙ্গে তার দোষের কথাও বলা দরকার। হিন্দুধর্মের অবশ্য কোনো দোষ নেই। দোষ, উচ্চবর্ণের যে সব মানুষ এই ধর্ম পরিচালনের মূলে ছিলেন তাঁদের। বর্ণাশ্রম প্রথা সৃষ্টি হয়েছিল সমাজের হিতার্থেই। কিন্তু ধর্ম কখনও মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদের কথা বলেনি। ব্রাহ্মণ উপবীত ধারণ করলেই কেউ হন না। ব্রাহ্মণ হতে হয়, আচারে আচরণে। মনের উচ্চতায়। নিম্নবর্ণের মানুষদের ওপরে ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র তাঁর বর্ণের উচ্চতার দম্ভের কারণে এবং আজও করছে তার সঙ্গে জার্মানদের ইহুদি নির্যাতনের তুলনা করা চলে।

বাংলাদেশে যত মুসলমান আছেন তাঁদের মস্ত বড়ো একটি অংশই আগে হিন্দু ছিলেন। উচ্চবর্ণের অকথ্য অত্যাচারে তাঁদের মানুষের মর্যাদা না দেওয়াতে তাঁরা ধীরে ধীরে মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়ে গেছেন। আজও উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে নিম্নবর্ণর হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার চলছে তা কোনো সভ্যদেশের পক্ষে অভাবনীয়। অবশ্য আমরা আদৌ সভ্য কি না সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। অথচ এই উত্তরপ্রদেশের আর বিহারের মানুষেরাই লোকসভায় ও কেন্দ্রে সরকারে প্রধানতম আসন ও প্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রেখে এসেছেন প্রথম থেকে। তাঁদের ন্যায্য কারণেই লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত।

যে ধর্ম মানুষকে মানুষের মর্যাদা না দেয়, সে ধর্মের অন্য সব গুণ নস্যাৎ হয়ে যায়। বিবেকানন্দর দেশে জন্মেও এতদিন পরেও যে এই জিনিস চলছে এদেশে তা এই দেশের হিন্দুদের মস্ত বড়ো কলঙ্ক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

এখনও যদি শিক্ষা সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে আর কবে হবে?

কাল নদীর উপরের সেই বড়ো গাছের মাচায় গিয়ে বসেছিলাম দুপুর বেলায়। গ্রীষ্মের যে দাবদাহ তা অরণ্য-গভীরে না থাকলে অনুভব করা যায় না। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ঘাস, লতা, ফুল, পাতা যেন এক অনন্ত তৃষ্ণায় জ্বলতে থাকে, তীব্র অকরুণ রোদে ঝলসে যেতে থাকে। অথচ যেদিন প্রথম বর্ষা নামে, সেই এক রাতের বৃষ্টিতে, যখন অগণ্য গাছে গাছে কিশলয় আসে, অঙ্কুরিত সবুজ, তখনই যেন জীবনমরণের প্রকৃত মানে বোঝা যায়। "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহদহন জাগে" এই কথার তাৎপর্য হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করা যায়।

এখন বহুদূর অবধি নজর চলে জঙ্গলে। নিঃশব্দে কারও পক্ষেই চলাচল করা সম্ভব হয় না ঝরাপাতার জন্যে। সে বুনো ইঁদুর আর সাপই হোক কী বাঘই হোক। এখন নয়নের ভূমিকা নেয় শ্রাবণ। শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়েই দেখাদেখি এখন।

এক ফালি জলরেখা চলেছে কোনোক্রমে এই তৃষ্ণার রাজত্বে প্রাণ জাগিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্বচ্ছ শরীরে বয়ে। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতি, পোকা, ছোটো

ছোটো পাখি, নানারঙা সাপ আসতে থাকে উড়ে, পায়ে হেঁটে। বিভিন্ন তাদের তৃষ্ণা নিবারণের কায়দা। তারপরে আসে অপেক্ষাকৃত বড়োরা। খরগোশ, শজারু ছোটো জাতের হরিণেরা, কোটরা (বার্কিং-ডিয়ার) মাউস-ডিয়ার, শেয়াল, হায়না, খাটাস। তারপর আসে চিতল হরিণেরা, শম্বরেরা, চৌশিঙা, বারাশিঙা, চিংকারা, কৃষ্ণসারেরা। তারও পর বুনোমোষ, বাইসন, গাউর। তারপর চিতারা এবং বাঘ। হাতির এতটুকু জলে চলে না। মোষদের বাইসনেদেরও না। তারা জলে-কাদায় বসে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু এই সব অঞ্চলে হাতি নেই। বাঘও তাই। তাই দূরে কোথাও বেশি জল যেখানে আছে সেখানের কাছাকাছি তারা থাকে।

বিষমাখানো তীর আর ধনুক নিয়ে আমি বসে আছি আজ। জানোয়ার শিকারের জন্যে নয়, জানোয়ারেরও অধম যে-সব মানুষ এমন নিরুপায় পশুপাখিদের ভরা-গ্রীষ্মে জলের পাশে মারে, তাদের মারার জন্যে।

গতকাল একটি বড়ো বারাশিঙাকে মেরেছিল এক শিকারি। লেখাপড়া জানা সরকারি অফিসার। হেভি রাইফেল দিয়ে। তাই দুপুর বাড়ার সঙ্গেই সঙ্গে আমি মাচা ছেড়ে মগডালে উঠে বসে আছি যতটুকু পাতার আড়াল পাই এই চাঁর গাছে, তারই আড়ালে লুকিয়ে।

তখন বেলা চারটে। গুটগুট করে জিপের শব্দ শোনা গেল দূর থেকে। ফার্স্ট-সেকেন্ড গিয়ারে তারা পাহাড়ি পথে আসছে।

জিপের এ জিনের আওয়াজ শুনে আমি বলতে পারি কোন গিয়ারে চলছে জিপ। থামল এসে কাছাকাছি। রাস্তার উপরে। তারপর নেমে এলো দু জন খাকি পোশাকপরা মানুষ। তাদের দু জনের হাতেই বন্দুক, দোনলা। তারা শিক্ষিত বটে কিন্তু সে শিক্ষা সার্টিফিকেটে এসেই শেষ হয়ে গেছে।

বনবিভাগ বা পুলিশের অফিসারর বলে মনে হল। তাদের কাছে আমার আত্মপ্রকাশ করা মানেই মৃত্যু। যারা মৃত্যুর দূত, তাদের শুধু মৃত্যু দিয়েই মোকাবিলা করা যায়। করা উচিতও। এখানে কোনো মধ্যপন্থা নেই। আমাদের ধর্মীয় বা শাস্ত্রীয় বা বিবেকগত কোনো বাধাও নেই। যে চোরা, ধর্মের কাহিনি শোনে না, যে শঠ সাধুতা বোঝে না, যে সশস্ত্র মানুষ বিবেচনা হারিয়েছে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা দোষের নয়।

আমি শুধু প্রার্থনা করেছিলাম যে, আজ যেন পশু-পাখিরা দেখে ফেলে এই ভীরু ব্যাধদের। এবং পালিয়ে যায় সময় মতো। আমার যেন মারতে না হয় এদের।

জিপে আরও কেউ আছে কি না জানি না। তবে যদি কেউ থেকেও থাকে সে জিপে বসে এই গাছের মাচা বা পাতার আড়ালে থাকা আমাকে দেখতে নিশ্চয়ই পাচ্ছে না।

শিকারিরা পায়ে পায়ে হেঁটে আসতেই তাদের দেখে ফেলল একটি ময়ূর তার তীক্ষ্ণ চোখে। তীব্র কর্কশ স্বরে সে কেঁয়া কেঁয়া করে ডেকে সমস্ত বনের প্রাণীদের সাবধান করে দিল। তার দিকেই একজন বন্দুক উচাঁল। তা দেখে অন্যজন তার বন্দুকের নল টেনে নামিয়ে দিল। বলল, পাল্লার মধ্যে নেই। তাছাড়া প্রথমেই ময়ূর মেরে কি হবে। কত কী মারতে চাস? সাধ মিটিয়ে মার আজকে। তারপর ভোপালে ফিরে গিয়ে তোর বউ-এর কাছে হিরো বনিস।

কিন্তু সেই আনাড়ি ও পেটুক লোকটি বলল, ময়ূরের মাংস তো খুব ভালো খেতে। বেস্ট হোয়াইট মিট ইন দ্যা ওয়ার্লড।

বলেই, তার অভিজ্ঞ সঙ্গীর বারণ সত্ত্বেও সে বন্দুক দেগে দিল। ময়ূরটি মরল না। কিন্তু গাছ থেকে আহত হয়ে নীচে পড়ে গেল। পড়ে যেতেই রংরুট শিকারি ময়ূর ধরার জন্যে দৌড়ে গেল। গুলি লেগেছিল ময়ূরের পায়ে। বেচারির পক্ষে বাঁচা এমনি মুশকিল হত যদি এই শিকারির হাতে বেঁচেও যেত এ যাত্রা।

সঙ্গী বারণ করল তাকে, তবু সে শুনল না।

এদিকে গুলির আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জঙ্গল জেগে উঠল। নানারকম পাখি, বাঁদর, কোটরা হরিণ ডেকে উঠল। শিকারি, এবড়োখেবড়ো নদীর মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যেতেই আছাড় খেল এবং দড়াম করে তার হাতে-ধরা বন্দুক ফায়ার হয়ে গেল। লোকটি যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। নিজের বাঁদিকের ব্যারেলের গুলি লাগল তারই বুকে। তার সঙ্গী কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই উলটোদিকে ফিরে ডাকল, হরবনস! হরবনস! জলদি আও।

ডাকতেই দেখলাম, একজন খাকি পোশাক পরা ড্রাইভার দৌড়ে আসছে একটি টিলা টপকে। কাছে আসতেই নীচের লোকটি বলল, খতরা বন গ্যয়া। ছোটোবাবুকো গোলি লাগ গ্যয়া।

দুজনে ধরাধরি করে ওরা রক্তাক্ত এবং প্রায়মৃত সঙ্গীকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল জিপের দিকে।

জিপের আওয়াজ মরে যেতেই নেমে ময়ূরটির খোঁজে গেলাম। কী হল তার তাই দেখতে। পা যদি ভেঙে গিয়ে তাকে তবে আজ রাতেই সে খাদ্য হবে কোনো মাংসাশী জানোয়ারের। ময়ূরের মাংসের উপর লোভ অনেকেরই। বাঘ-চিতারও কম নয়। গাছটার নীচে গিয়ে রক্ত দেখলাম না কিন্তু ডানা ঝাপটাঝাপটির চিহ্ন আছে। একটু শুকনো মাটিতে এগোতেই সামান্য রক্তের ফোঁটা পেলাম। কিছুটা দূর তা অনুসরণ করে এগোতেই দেখি একটি ছোটো টিলা মতো জায়গায় উঠে বসে আছে সে। আমার দিকে তার পেছন। মস্ত লেজখানি ঝুলছে পেছনে। যতখানি পারি নিঃশব্দে ঘুরে একটু এগিয়ে গিয়ে। যেখান থেকে তার সামনেটা কোনাকুনি দেখা যায় এমন জায়গাতে পৌঁছে ভালো করে দেখলাম তার ডান পায়ের পাতার একটি নখ ছররা গুলিতে খসে গেছে। বুঝলাম, এখন যন্ত্রণার জন্যে সে গাছে উঠে বসতে পারছে না তবে আজই রাতে প্রাণভয়ে হয়তো বসতে পারবে। নইলে বড়ো গাছের কোনো নিরাপদ মোটা ডালে আশ্রয় নেবে। প্রকৃতিই তার এই ক্ষত সারিয়ে দেবেন কয়েকদিনের মধ্যেই।

যখন ফিরছি, তখন শুনি আবারও জিপের শব্দ। তখন নিজের প্রাণ ভয়ে আমি শাখামৃগের মতো তরতরিয়ে উপরে উঠলাম সেই মাচায়। তার পরে আরও উপরের ডালে। ওই গাছ ছাড়া অন্য কোথাওই পাতা ছিল না লুকিয়ে থাকার মতো। ওই ন্যাড়া গ্রীষ্মবনে অন্যত্র যাওয়ারও উপায় ছিল না কোনো। এই জিপটি এল অন্যদিক থেকে। প্রায় একই জায়গায় দাঁড়াল জিপটি। তিন শিকারি নেমে এলেন। এঁদের একজনের হাতে রাইফেল, দুজনের হাতে বন্দুক। এদের দেখে চিনতে ভুল হল না যে ওঁরা পুলিশের লোক। একজন বোধ হয় দারোগা গোছের ছিলেন। দুজন তাঁর অধস্তন কর্মচারী। দারোগাবাবু বেশ মোটা-সোটা। বললেন, গাছে চড়তে পারবেন না। হাতে রাইফেল আছে সুতরাং পাশের টিলার উপরে উঠে মোটা একটা মহুয়া গাছে পিঠ দিয়ে বসবেন। খাকি পোশাকে অনড় হয়ে বসলে জানোয়ারদের চোখে নাও পড়তে পারেন। অধস্তন কর্মচারীরা এই প্রস্তাবে সায় দেওয়াতে তাঁরা দুজন মাচায় উঠে এলেন এবং উনি মহুয়া গাছের গোড়ায় বসলেন দু-পা দুদিকে ছড়িয়ে।

এদিকে বেলা পড়ে আসছে। কত পশুপাখিই যে এই বিপত্তির ফলে জলে আসতে পারছে না তার অনুমান করে আমার কষ্ট হতে লাগল। এমন সময় বড়োবাবু বললেন, বাঘ ইয়া শোনচিতোয়া ছোড়কর অউর কুছ নেহি।

একজন বললেন, ভাল আপকো পিছুসে নোচনে আনেসে ক্যা কিজিয়েগা হজৌর?

বড়োবাবু বললেন, ভাল কুছ না করেগা।

ওঁরা চুপ করতেই একদল চিতল হরিণ এল হুড়মুড় করে। বড়োবাবুর নিষেধ সত্ত্বেও মাচা থেকে একজন মেরে দিলেন একটি মাদি হরিণকে। ধপাস করে পড়ে গেল হরিণটি।

বড়বাবু গাছতলাতে বসেই ধমক দিয়ে উঠলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি প্রকাণ্ড ভাল্লুক মহুয়া গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে বড়োবাবুর সঙ্গে কুস্তি লড়তে লেগে গেল।

ভাল্লুকের কবলে যাঁরা পড়েছেন জঙ্গলে তাঁরাই একমাত্র জানেন ভাল্লুক কী জিনিস। এই জানোয়ারই একমাত্র জানোয়ার বিনা প্ররোচনায় মানুষকে আক্রমণ করে এবং তার নাক চিবুক চোখ খুবলে নেয়। ভাল্লুকের হাতে পড়েও বেঁচে-ওঠা মানুষের মতো বীভৎস দর্শন মানুষ খুব কমই হয়।

বড়োবাবুর রাইফেলটি ডান দিকে শোয়ানো ছিল উরুর উপরে। প্রথমেই ভাল্লুক তার ডান পায়ের অ-খেলোয়াড় সুলভ এক লাথিতে রাইফেলকে ছিটকে ফেলে দিল। দূরে বড়োবাবু গাঁক গাঁক করে আওয়াজ করে 'আমি খেলব না' গোছের কিছু একটা বলতে গেলেন কিন্তু উনি না খেললে কি হয় মনে হল, ভাল্লুক খেলবেই!

জঙ্গুলে জায়গার দারোগা! রোজ রোজ মোরগা-আন্ডা-পাঁঠা-হরিণ-ঘি খেয়ে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। ভালুক সচরাচর মানুষের মাংস খায় না। কিন্তু না খেলে কি হয়, সুযোগ ঘটলেই সে মানুষের মাংস দিয়ে লুচির মতো খেলে। বড়োবাবুর ভুঁড়ির অর্ধেক বাইরে বেরিয়ে এল নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধু। একবার আমার ইচ্ছে হল মারি এক বিষের-তীর ভাল্লুকটাকে, বড়োবাবুকে বাঁচাতে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল মানুষটার চেহারা দেখেই মনে হয় অনেক অন্যায় সে করেছে এবং আজ বিকেলেই যে নতুন অন্যায় করতে এসেছিল তার শাস্তি হওয়া দরকার।

ততক্ষণে শাগরেদরা গাছ থেকে নেমে ওদিকে দৌড়ে গেছে। কিন্তু গুলি করতে পারছে না পাছে বড়োবাবুর গায়ে গুলি লেগে যায় এই ভয়ে। তবে ভাল্লুকটাই ওদের দেখে ফাটা কাঁটালের মতো বড়োবাবুকে ফেলে রেখে ওদের দিকে দৌড়ে এল এবং সেটাই হল তার কাল। দুই শিকারি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে-ওঠা ভাল্লুকের বুকে একই সঙ্গে গুলি করল।

মরণোন্মুখ মানুষ যেমন কাঁদে তেমন করে কাঁদতে কাঁদতে ভাল্লুকটি পড়ে গিয়ে দু হাত জড়ো করে যেন ভগবানকে কী বলতে লাগল।

শিকারিরা তার দিকে আর না চেয়ে দু-খণ্ড বড়োবাবুকে কোনোরকমে জোড়া দিয়ে তুলে নাড়িভুঁড়ি ছড়াতে ছড়াতে পাহাড় টপকে জিপের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

একদিনের মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে মনে করে ওরা অদৃশ্য হতেই আমি গাছ থেকে নেমে নিঃশব্দে আমার ডেরার দিকে পা বাড়ালাম। মনে হয় না, আজ আর কেউ জানোয়ারদের পিপাসার পথে বাধা হবে বলে। তবে আজকের অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে আমি ঠিক করলাম আগামীকাল আরও তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে মাচার উপরে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকব।

হনসো আমাকে রোজই মানা করত। বলত, সন্ধেবেলায় একা বাড়ি থাকতে মন খারাপ করে। অথচ ওর শারীরিক অবস্থার কারণে ওকে নিয়ে গাছে চড়াও সম্ভব ছিল না। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমি পরদিনও বেরোলাম।

সূরজা বলে আমাদের বস্তিরই একটি ছেলে ছিল। দূরের জঙ্গলে বিড়িপাতার ঠিকাদারের ক্যাপ কাটত। তার সঙ্গে নাকি হনসোর প্রেম ছিল। অনেকেই বলত। হনসো বলত, দূরর, মেয়ের সঙ্গে আবার কোনো মেয়ের প্রেম হয় নাকি।

আমি যখন বেরুচ্ছি হাতে তীর-ধনুক নিয়ে তখন সূরজা এসে হাজির। সবে ফিরছে ক্যাপ থেকে। হাতে লাল ফুলের ঝাড় আর মহুয়ার বোতল। ও তল্লাটে বোধহয় হাট ছিল আজ। আমি হেসে বললাম হনসোকে, এই তো! একা থাকতে ভয় পাচ্ছিলি, তোর বন্ধু এসে গেল। মহুয়া খা, গল্প কর। আমি এলে গান-নাচ করব'খন তিনজনে মিলে। আমার জন্যেও রাখিস মহুয়া একটু!'

হনসোর মুখ দেখে মনে হল ও বারণ করছে আমাকে যেতে। আর সুরজার মুখ দেখে মনে হল ও আসবার আগেই হাট থেকে ভালোরকম মহুয়া খেয়ে এসেছে।

আমার মন পড়েছিল ওই নদীতে। হেসে বললাম হনসোকে, এই গেলাম আর এলাম।

সেদিন কিন্তু কোনো ঘটনা ঘটল না। সারা দুপুরই অনেক পাখি, সাপ প্রজাপতি, ইঁদুর, খরগোশ জল খেল। একবার মনে হল যেন একটা জিপের আওয়াজ পেলাম। কিন্তু না। জিপটা ভালুগাড়ার দিকে চলে গেল। বোধহয় মিশনের জিপ হবে।

সেদিন ঠিকই করেছিলাম যে সন্ধের আগেই ফিরে যাব। হনসো কখনোই আমার কোনো ইচ্ছাতে বাধা দেয় না। কোনোরকম বিধিনিষেধ আরোপ করে না আমার গতিবিধিতে। কিন্তু আজই যখন প্রথম নিষেধ করল আমার সেটা মানা উচিত।

বিকেল তিনটে নাগাদ একটি জিপের আওয়াজ পেলাম। এই নয় যে, এই জলে শুধু জিপ আরূঢ় শিকারিরাই আসে। স্থানীয় তীর-ধনুক এবং বেপাশী গাদাবন্দুক-ওয়ালারাও কম আসে না। কিন্তু তারা সকলেই আমার কথা মানে। আসলে তারা আজকের খাটো ধুতিপরা খালি গায়ের মানুষটাকেই আগে পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাকে পাইপমুখে এখানে দেখেছে। ওদের অনেকেরই মধ্যে এখনও আমার সাহেবের "ইমেজটা" জাজ্বল্যমান আছে। তাই আমি যে পছন্দ করি না কেউ গ্রীষ্মের সময় তৃষিত পশুপাখি সরীসৃপদের জলের কাছে মারুক তা ওরা জানত। গাদা বন্দুকের শব্দ শোনাই যায়। কিন্তু রাতের বেলা কেউ যদি তীরধনুক দিয়ে কোনো জানোয়ার মেরে তা রাতারাতি পাচার করে দেয় নিজের গ্রামে তা জানার কোনো উপায় নেই।

এই কথাটা ভাবলে আমার কষ্ট হয় যে-স্বাধীনতার পরেও সাহেব-প্রীতি আমাদের গেল না বরং আরও বেশি করেই জাঁকিয়ে বসল। ইংরেজরা চলে গিয়ে আমাদের আরও বেশি পরাধীন করে রেখে গেল। ওর চেয়ে হয়তো স্বাধীনতা না আসাও ভালো ছিল। যে জাত নিজেদের স্বাধীনতার যোগ্য করে তুলতে পারেনি তাদের স্বাধীনতা চাওয়াই উচিত নয়। যে নদী তার জলধারা অব্যাহত থাকবে কী না সে সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়, তার উচিত নয় তার বুকে বাঁধ বাঁধতে বলা জলাধারের এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে। জলের প্রাচুর্য, সময়ানুগতা এবং যাতে তার জোগান অব্যাহত থাকে তা যেমন বাঁধ-প্রত্যাশী নদীর সুনিশ্চিত করা দরকার, স্বাধীনতাকামী কোনো জাতির পক্ষেও তার চারিত্রিক কাঠামোর ঋজুতা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধেও সুনিশ্চিত হওয়া দরকার।

হনসোর বাবার মুখে শুনি যে, ইংরেজ আমলে এই বনের মধ্যে বনসংক্রান্ত আইনকানুন অনেক বেশি কঠোরতার সঙ্গে পালিত হত। সরকারি নিয়মকানুন এবং খাকি উর্দি পরা সরকারি নগণ্য কর্মচারীকেও মানুষ মান্য করত। প্রশাসনের কাঠামো অনেকই বেশি মজবুত ছিল। এবং যা হনসোর বাবা জানেন না, সে কথা হচ্ছে এই যে একথা শুধু বনের আইনকানুনের বেলাতেই নয়, সমস্ত আইনকানুনের বেলাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য। আইন, এই স্বাধীন দেশে প্রকৃতই তামাশা হয়ে গেছে। আইনকানুনের রকমও হচ্ছে সুকুমার রায়ের শিবঠাকুরের আপন দেশের মতোই সব্বোনেশে। সরষের মধ্যে ভূত ঢুকে গেছে। শুধু তা নয়, মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সব জায়গাতে। তা সে পাকিস্তানই হোক, শ্রীলঙ্কাই হোক। ভারতীয় ভূখণ্ডের মানুষেরা যে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের যোগ্য করে তুলতে পারেনি নিজেদের তা স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যাচ্ছে। যেখানে গণতন্ত্র চালু আছে সেখানেও আছে তা, একনায়কত্বেরই রকমফের হয়ে। জনগণ যাদের নির্বাচন করে পাঠাচ্ছেন তাঁদের ভাগ্যের ও ভবিষ্যৎ-এর নিয়ন্ত্রক করে, তাঁরা গোরু-ছাগলের মতো ব্যবহার করে চলেছেন জনগণের সঙ্গে। জনগণ-এরই নাম করে জনগণ-এর সর্বনাশ করছেন। ফলে, এই অশিক্ষিত বা তথাকথিত শিক্ষিত প্রতিনিধিদের সীমাহীন লোভ, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, এবং লজ্জাহীনতার কারণে

গণতন্ত্র এক প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে। আর যেখানে একনায়কত্ব আছে, সেখানে তা আছে অত্যন্ত নগ্নভাবেই লাজ-লজ্জার কোনোরকম বালাই না রেখে।

জিপটা এসে থামল। তারপরে একটু সময়ের পর যাঁরা এসে রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হলেন তাঁরা সেদিনেরই দুজন। বড়ো দারোগা ছিলেন না। তিনি যেভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন তাতে তাঁর বাঁচার কথাও ছিল না। তবে তিনি বেঁচে নিশ্চয়ই আছেন নইলে তাঁর চ্যালারা আজই আসতে পারতেন না, বড়োসাহেবকে দাহ করার জন্যে শ্মশানেই থাকতে হত এখন।

এ লোক দুটি দেখতে যেমন পুলিশ পুলিশ, তাদের মুখেও নিষ্ঠুরতার ছাপ। তারা এসে বসার সঙ্গে সঙ্গেই একটি মাদি শম্বর এসে পৌঁছোল জলে। মুহূর্তের বিলম্ব না করে ওঁদের মধ্যে একজন একগুলিতে তাকে প্রায় জলধারার উপর ধরাশায়ী করল। গুলিটা করেছিল খুব ভালো। একেবারে কানে। শহরটা সামান্যক্ষণ হাত-পা ছুড়ে স্থির হয়ে গেল। রক্ত মিশে গেল জলধারার সঙ্গে। লাল, খয়েরি, গোলাপি নানারঙের খেলা চলতে লাগল সাদা জলের বুকে।

তার একটু পরেই একটি মস্ত ময়াল সাপ, পাহাড়ি পাইথন, আস্তে আস্তে তার বিরাট শরীরকে টেনে টেনে নদীর উলটো পার থেকে জলের মুখ নামাল এবং জল খেতে লাগল। তাকে প্রথম দেখা যাওয়া এবং তার জলে এসে পৌঁছোনোর মধ্যে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় কাটল। জল যখন সে খাচ্ছে দ্বিতীয় পুলিশ মুহূর্তের মধ্যে নিশানা নিয়ে তার মাথায় গুলি করল। বোধহয় এল. জি দিয়ে। জলের তীরবর্তী গ্রীষ্মের দাবদাহে দগ্ধ জঙ্গলকে লণ্ডভণ্ড করে একবার কুণ্ডলী পাকিয়ে আরেকবার কুণ্ডলী ছাড়িয়ে ওই বিশাল সাপ প্রলয় উপস্থিত করল। কিন্তু মিনিট দশেক পরে সব শান্ত হল। সে মরে যাবার পরও তার শরীরের পেশিতে তরঙ্গ খেলতে লাগল।

লোকগুলো শুধু নিষ্ঠুরই নয়, সাংঘাতিকও। এদের নিশানা অব্যর্থ, দয়ামায়া বলতে কিছুমাত্র নেই, এবং এদের লোভের কোনো সীমা নেই। কিন্তু এরা শিকাবি আদৌ নয়। শিকারি, আমিও একসময়ে ছিলাম। এদের পশু বা প্রাণী সম্বন্ধে কোনো ভালোবাসা তো দূরস্থান কোনো জ্ঞানও নেই। এরা শুধু ট্রিগার টানতে শিখেছে। টিগ্রার-হ্যাপি ম্যানিয়াকস এদের সর্বগ্রাসী লোভ অচিরেই এই সুন্দর জঙ্গলের সব জানোয়ারই যে শেষ করে দেবে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না।

একজন বলল, সাপের চামড়াটার দাম কত হবে?

অন্যজন বলল, কাসিমা মিঞা দেখলে না দাম বলবে!

ক-মন মাংস হবে শম্বরটার?

তা হবে দেড় মনের বেশি।

সাপের চামড়া ছাড়াতে এবং শম্বরটা কাটাকুটি করতে লোকও লাগবে সময়ও লাগবে।

দুজনের মধ্যে যাকে অভিজ্ঞ বেশি বলে মনে হল, সে বলল।

তুই চলে যা থানাতে জিপ নিয়ে। চারজন কনস্টেবল নিয়ে আয়। পেট্রোম্যাক্স, টাঙ্গি, ঝুড়ি, বস্তা সব। পেছনের একটা রাং দিতে হবে রেঞ্জার সাহেবকে, মনে রাখিস। সাপের চামড়ার কথাটা বলব না। তাড়াতাড়ি যা। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবি। সন্ধেবেলা এখানে ভারী জানোয়ারেরা আসবে। খতরনাক হয়ে যাবে এ জায়গা।

তুমিও চলো না।

পাগল! শেয়াল, হায়না, শকুন কত ঝুট-ঝামেলা আছে না! দুজনেই চলে গেলে ফিরে এসে দেখব ভোঁ-ভোঁ। তার চেয়ে আমি থাকি। এর পরেও যদি আরও কোনো পিয়াস-লাগা জানোয়ার আসে তো তাকেও ধড়কে দেব। যা। দেরি করিস না।

এদের কথাবার্তা, চেহারা, মনোভাব আমাকে বড়ো ঘৃণাতে ভরে দিল। আমি ঠিকই করে ফেললাম যে একজন চলে গেলে অন্যজনকে আমি বিষের তীর মেরে শেষ করে দেব। এদের কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা খুবই দরকার। পুলিশের এবং বনবিভাগের আমলারা যেখানে যোগসাজশ করে সমস্ত প্রাণী ও পাখি নির্মূল করার ষড়যন্ত্র করেছে, সেখানে এমন কিছু না করলেই নয়। যারা যে ভাষা বোঝে তাদের সেই ভাষাতেই শিক্ষা দিতে হয়। তাছাড়া উপায় নেই।

দ্বিতীয় লোকটি নেমে গেলে প্রথম লোকটিও নামল। দুজনকে মারা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ ওদের নিশানা এমনই নির্ভুল এবং বন্দুক-চালনাতে এরা এমনই দক্ষ যে একটি তীর মেরে অন্য তীর ধনুকে লাগাবার আগেই অন্যজন আমাকে গুলি করে পাকা ফলের মতো গাছ থেকে ফেলে দেবে।

দ্বিতীয় লোকটি সুঁড়িপথ ধরে বনের বড়ো রাস্তার দিকে চলে গেল। প্রথম লোকটি বলল, টর্চও আনিস দুটো। আর হুইস্কির একটা বোতল, হুতম শাহুর দোকান থেকে। যদি না দিতে চায় তো বলবি কাল ওর মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে আসব। হারামির বাড় বেড়েছে বড়ো। পরশুদিনে গাঁইগুই করছিল।

ঠিক আছে।

বলে দ্বিতীয় লোকটি চলে গেল।

প্রথমজন গাছ থেকে নেমে চারধারে দেখল ভালো করে। একবার উপরেও চাইল। আমি পাতার মধ্যে একেবারে ফ্রিজ করে গেলাম। তবুও মনে হল লোকটা দেখতে পেল আমাকে। কিন্তু চোখ নামিয়ে নিল। এবং নদীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সোজা নয়, এঁকেবেঁকে। হঠাৎ তাকে লক্ষ্য করে আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। দেখি, সে গাছটার বাঁদিকে গিয়ে আমার অবস্থানের দিকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পরই সে দ্রুত বন্দুক ওঠাতে লাগল আমার দিকে লক্ষ্য করে।

আমি তো মারতেই এসেছিলাম। তবু যারা খুনি নয়, মানুষ হিসেবে খারাপ নয়, তাদের পক্ষে অন্য একজন মানুষকে মারতে হাত ওঠে না, সে মানুষ যতই খারাপ হোক না কেন! কিন্তু এখন আমার প্রাণ-সংশয়। আমিও মুহূর্তের মধ্যে নিজের অবস্থান প্রকাশ করে দিয়ে বাঁ হাতে ধনুকটা ধরে ডান হাত দিয়ে ছিল টেনে তীর ছুড়লাম। সে ধনুক দিয়ে শুধু মানুষই মারা হবে সেই ধনুক লম্বাচওড়া হয় না। তীর ছুড়েই আমি ইচ্ছে করে হড়কে ডাল বেয়ে সরসর করে এক ঝটকায় অনেকখানি নীচে নেমে এলাম। ততক্ষণে তীর গিয়ে বিঁধেছে তার ডান বুকে আর গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। যেখানে আমি ছিলাম সেখানেই ঠিক গিয়ে লেগেছে। দ্বিতীয় ব্যারেলটিও ফায়ার করবে কিনা কে জানে? পরক্ষণেই মনে পড়ল যে এই লোকটিই ময়াল সাপকে গুলি করেছিল এবং গুলি করার পর বন্দুক আর রি-লোড করেনি। করলেও, সে হয়তো গুলি আর করতে পারতও না। সে ততক্ষণে ঢলে পড়েছিল বাঁ-কাঁতে। বুকে হাত দিয়ে তীরটা টেনে বের করার চেষ্টা করল একবার, কিন্তু "হেল" এর বিষ মাখাবার জন্যে তীরের ফলা এমন ভাবে আমি নিজেই বানাতাম বাড়িতে যে, সে তীর সহজে ঢোকে কিন্তু ঢুকলে আর বেরোয় না।

গাছতলায় নেমেই এক হাতে তীরধনুক আর এক হাতে আমার চটি নিয়ে আমি লোকটার কাছে গিয়ে তাকে লাথি মেরে উলটে দিলাম যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে গাছটার দিক থেকে তাকে কেউ তীর মেরেছিল। তীরটা যে কোণে ঢুকেছিল বুকে সেই কোণ, অর্থাৎ তীর আসতে পারে এমন উচ্চতাসম্পন্ন একটা গাছ নদীর উলটো পারে দেখে আমি লোকটার সামনে দিকটা সেদিকে করে দিলাম। লোকটার হাতে তখনও বন্দুক ধরা ছিল। চোখ দুটো খোলা। আমাকে দেখছিল বিস্ময় আর অবিশ্বাসের চোখে। ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও আমাকে চেনে এ তল্লাটের সকলেই।

লোকটা বলল, জল।

আমি নদীতে গিয়ে, যেখানে জল শম্বরের রক্তে দূষিত নয়, সেখান থেকে আঁজলা ভরে এবং আমার ধুতির খুঁট ভিজিয়ে জল নিয়ে এসে লোকটার মুখে দিলাম। একটু জল খেলও সে। তার পরই তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল এবং মাথাটা ডানদিকে কাত হয়ে গেল।

একজন মানুষ খুন করলাম কিন্তু আমার একটুও দুঃখ হল না। মানুষটাকে মানুষ বলে গণ্য করিনি আমি, তাই।

তীরটা আমি ওর বুক থেকে খুলে নিতে পারতাম। তার সময় ছিল। কিন্তু খুললাম না এই ভয়ে যে আমার হাতের ছাপ পড়বে ওর জামায়। ভালো কাজ যে করে তাকেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

তার পরই আমি সরে এলাম অকুস্থল থেকে। আমার কুঁড়েতে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে এল। পৌঁছে দেখি, সূরজা চলে গেছে এবং হনসো অত্যন্ত ভীত-চকিত হয়ে আমার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে সে বলল না স্পষ্ট করে কিছু কিন্তু আমি বুঝলাম যে সূরজা মত্ত অবস্থাতে ওর উপরে জোর করেছিল বা কবতে চেয়েছিল। হনসো কিন্তু তার নিজের কারণের চেয়েও আমার জন্যে বেশি ভীত ছিল।

সূরজা নাকি যাওয়ার সময় হনসোকে বলে গেছে যে ও পুলিশে এবং বনবিভাগে খবর দেবে যে আমি জলের পাশে গিয়ে রোজ বসি এবং নিঃশব্দে শিকার করি।

সরল হনসো তাতে বলেছিল যে, আমার স্বামী শিকার করবে কেন, শিকার তো ছেড়েই দিয়েছে এবং আমরা নিরামিষাশী। সূরজা বলেছে যে তার সঙ্গে থানার জানাশোনা আছে। হনসো যে তাকে ফিরিয়ে দিল তার বদলা সে নেবেই।

হনসো খুবই ভয় পেয়েছিল। অপরিচিতের অসভ্যতা অসহ্য নাও হতে পারে কিন্তু একদিন যে প্রেমিক ছিল যে যদি জন্তুর মতো ব্যবহার করে তবে বুক ভেঙে যাওয়ারই কথা।

একবার বলল, গাঁওবুড়ার কাছে নালিশ করবে। হোক না সূরজা অন্য গাঁয়ের লোক। তাকে উচিত সাজা দেওয়াবে।

আমি শান্ত করলাম হনসোকে। হনসো কী করে জানবে যে, আমি কিছুক্ষণ আগে পুলিশেরই একজন জঙ্গলের আইন-ভাঙা মানুষকে খুন করে এসেছি বিষের তীর দিয়ে। তীর বা ধনুক তারা অবশ্য পাবে না কারণ এমনই বে-জায়গার একটি টিলার মধ্যে একটি গুহার পাশের গাছের ফোকরে আমি সেগুলো লুকিয়ে রাখতাম যে কারোই সাধ্য নেই তা বের করে। হেল গাছের ফল থেকে বিষ তৈরি করতাম নিজেরই জঙ্গলের গভীরে। তীর শুধু বানাতাম বাড়িতে। ধনুকও ছিল বড়ো। কিন্তু বিষের তীরের ছোটো ফলা এবং ছোটো ধনুক বাড়িতে ছিল না। হনসোও ওই ছোটো তীরের ফলার কথা জানত না।

সত্যি কথা বলতে কী, হনসো গর্ভবতী হওয়ার পর থেকেই, বন্দুক রাইফেলগুলো না থাকাতে আমি এক ধরনের অসহায়তা বোধ করতাম। পুঁজি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুঁজি রক্ষা করার এক তীব্র তাগিদও বোধহয় জন্মায় মনের মধ্যে। নইলে স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ছেড়ে হনসোর গর্ভে আমার শিশু আসার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র আমি কেন অমন তীরধনুকের দিকে ঝুঁকলাম? নিজের জন্যে কোনো ভয় আমার ছিল না। কোনোদিনই না। হনসোর জন্যে, হনসোর অনাগত শিশুর কারণে আমার মন এক অননুভূতপূর্ব অনুভূতি জাগল। অবশ্য যখন ওই বিষের তীরের কথা ভেবেছিলাম তখন ভাবিনি একবারও যে, জঙ্গলের বাসিন্দা পশুপাখিদের রক্ষার্থেই তা আমাকে ব্যবহার করতে হবে।

পরদিন হাট ছিল। শালডুংরিতেই। সকালবেলা বসে হনসো একটা ফর্দ করে দিল। বলল, আজ ও হাটে যাবে না। গতকাল ঠিক কি যে ঘটেছিল তা হনসোই জানে কিন্তু ভারি মনমরা হয়ে ছিল কাল থেকেই।

আমাকে বলল, ওর শরীর ভালো নেই তাই যাবে না।

বনবালাদের মনের কথা তারাই জানে। সুরজা কি আসবে আজ ওর কাছে আমার অনুপস্থিতিতে? এমন গর্ভিনী নারীর পক্ষে উত্তেজনা এবং অনিচ্ছায় সহবাস করা কি ভালো হবে? বিপজ্জনক হবে না তো? আর সুরজার সঙ্গেই যদি সে আজ সঙ্গম করবে তবে আমাকে বিয়েই বা করল কেন? সুরজাকে তো সে আমার চেয়ে অনেকদিন আগে থেকেই চিনত! তাছাড়া স্বামী হিসেবে আমিও তো ফ্যালনা ছিলাম না। হনসোর জন্যে আমিও তো কম কিছু ছাড়িনি জীবনে। বনের ছায়ায় এই বনবালার কাছে নিজেকে পুরোপুরি বুনোরই মতো আমার শিক্ষা ঐতিহ্য, সংস্কার সবকিছুকে, আমার দম্ভ ও গর্বকে বিসর্জন দিয়ে সমস্ত নাগরিক নির্মোক ছিঁড়ে ফেলেই তো নিবেদন করছিলাম। আমার এই সমর্পণে তো কোনো মিথ্যা বা ফাঁকি ছিল না! তবে? হনসো? কেন?

হাটে সকলের মুখেই এক আলোচনা। গোপনে কোনো ডাকাতের দল এসে ডেরা বেঁধেছে জঙ্গলে। গতকাল নদীর কাছে একজন পুলিশকে বিষের তীর দিয়ে মেরেছে তারা। এস-পি-সাহেব আসছেন। ক্যাম্প করে থাকবেন শালডুংরিতে। সারাদিনে তদন্ত করে যা করার করবেন।

গ্রামে গঞ্জে পুলিশের যা করার, মানে, নিরপরাধ অসহায় কতগুলো মানুষকে ধরে বেধড়ক পিটিয়ে মিথ্যে জবানবন্দি জোর করে নেওয়া, তাই করবে।

ফাদার উইধাসও এসেছিলেন হাটে। গল্পে গল্পে দেরি হয়ে গেল। পুলিশ-খুনের প্রসঙ্গও উঠল। যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সন্ধে হবহব। কাছে এসেই দেখতে পেলাম একটি জিপ চলে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে আমার বাড়ির সামনে থেকে বনের মধ্যে দিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে পথ বানিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়বে বলে! বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বুঝলাম যে আসবার সময়ও তারা ওই ভাবেই এসেছিল। গ্রামের মূল রাস্তা দিয়ে আমার বাড়িতে আসতে হলেও অবশ্য ঝোপঝাড় ভেঙেই আসতে হত কিন্তু জিপটিকে গ্রামের লোকে দেখতে পেত। এরা এসেছে জঙ্গলের গভীরের সেই রাস্তা দিয়ে, যে রাস্তা দিয়ে ওদেরই কেউ কেউ জলের কাছের মাচায় বসত গিয়ে।

আমি ডাকলাম, হনসো।

কোনো সাড়া পেলাম না।

ঘরে ঢুকে দেখি, হনসো অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভিজে গেছে তার শাড়ি, দুই পা, মেঝে। তার মুখে-চোখে, দুই স্তনে বুনো কুকুরের চেয়েও হিংস্র আইনরক্ষক মানুষদের নখ আর দাঁতের দাগ।

একটু পরই সন্ধে হয়ে যাবে। তখন হনসোকে এ অবস্থাতে একা রেখেও যাওয়া যাবে না। আমি দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ওকে পিঠে তুলে নিয়ে সোজা ছুটলাম হাটের দিকে। হাট, বাড়ি থেকে পাকদণ্ডি হয়ে বেশি দূর নয়। হাট-ফিরতি দু একজন আতঙ্কিত মানুষ প্রশ্ন করল। সঙ্গও নিল দু-তিনজন। কেউ উৎকট ঔৎসুক্যে, কেউ আন্তরিক সমবেদনায়। কিন্তু আমি উত্তর করার জন্যে দাঁড়ালাম না একবারও। হাটে যখন গিয়ে পৌঁছোলাম তখন দেখি ভালুগাড়ার মিশনের সাদা ভ্যানটা ছাড়ছে। আমার চিৎকারে ফাদার উইধাস ড্রাইভারকে দাঁড়াতে বললেন।

হাসপাতালে মেয়ে ডাক্তার তো ছিলেন না। তবে মেয়ে নার্স ছিলেন। ডাক্তার আর নার্সেরা হনসোকে দেখে পরীক্ষা করে বললেন অনেকে মিলে তাকে অনেকক্ষণ ধরে ধর্ষণ করেছে। গর্ভপাত এখুনি না করলে হনসোর নিজের জীবন নিয়েও যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। বন্ড সই করিয়ে ওঁরা যা করবার করলেন।

হনসোর জ্ঞান আসামাত্রই হাসপাতাল আর পুরুষ ডাক্তার দেখে কান্না জুড়ে দিল। ফাদার উইধাসই বললেন যে একজন নার্স এবং ওষুধপত্র সব দিয়ে গাড়িতে করে আমি ওঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার সঙ্গে। কিন্তু ব্যাপারটাকে এমনভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। মেট্রনও যাবেন প্রতিদিন যতদিন রুগি সম্পূর্ণ ভালো না হয়ে ওঠেন।

ফাদার, হনসোর ব্যাপারে হাসপাতালের একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বললেন। তারপর বললেন, চলুন আপনার স্ত্রীকে নামিয়ে দিয়ে ওই গাড়ি নিয়েই আমরা থানাতে যাই। ডায়ারি তো করতে হবে। এফ আই আর! নার্স থাকবেন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে।

বললাম, থানায় ডায়ারি করে লাভ হবে না। আই. জি-সাহেবকে আমি চিনতাম। যখন তিনি ডি.আই.জি ছিলেন। ভোপালে একটা চিঠি যদি পৌঁছোতে পারেন তাহলে আমি লিখে দিতে পারি। কাজ হবে। আর একটা চিঠি দিতে হবে চিফ-কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টকে। গরমের বাকি দিন-কটা যাতে এই জলের জায়গাতে আর্মড-পাহারার বন্দোবস্ত করেন।

বললাম বটে, কিন্তু জানতাম তা সম্ভব নয়! সম্ভব যদি হয়ও তো বড়ো জোর স্থানীয় থানাকেই ভার দেওয়া হবে। অথবা সদরের থানাকে রক্ষকই যদি ভক্ষক হন তবে কী আর করার!

হনসোকে নামিয়ে দিয়ে থানায় যখন গেলাম আমরা তখন দারোগা ছিলেন না। থাকবেন না জানতাম। আমি ঠান্ডা মাথায় এফ. আই. আর লেখালাম। ফাদার উইধাসও যা বলার বললেন। ইতিমধ্যে পুলিশ খুনের কিনারা করতে এস. পি-সাহেব এসে হাজির। বাচ্চা ছেলে। আই.পি.এস। ফাদার উইধাস ওঁকে আমার পরিচয় দিলেন এবং আমার স্ত্রীর প্রতি পুলিশ কী ব্যবহার করছে তাও বললেন।

এস.পি পট্টনায়কসাহেব ওড়িয়া। সব শুনে এতই রেগে গেলেন তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের উপর যে বললেন, নো ওয়ান্ডার দ্যাট দে উইল বি কিলড লাইক দিস। ওয়ান বাই ওয়ান। আ পুলিশ ফোর্স উইদাউট মরালিটি হ্যাজ নো ওয়ে অফ সারভাইভাল।

বলেই, ডি.আই.জি সাহেবের সঙ্গে ওয়ারলেসে কথা বলার জন্য লাইন চাইলেন।

তখন আমি বললাম যে বর্তমান আই.জিকে আমি চিনি। তাঁর সঙ্গে কি কথা বলতে পারি একটু?

এস.পি বললেন, নিশ্চয়ই। তবে ডি.আই.জি সাহেবকে বলে তার পরই বলুন। আই অ্যাম টু স্মল আ ফ্রাই।

আই-জির সঙ্গে কথা হয়ে গেলে উনি ডি.আই.জিকে যা বলার বললেন। তারপর এস.পি অনেকক্ষণ কথা বললেন ডি.আই.জির সঙ্গে। ডি.আই.জি বললেন, তিনি পরশুদিন আসছেন নিজে।

এস.পি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্ত্রী, আমার লোকাল স্টাফদের আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড করালে চিনতে পাববেন?

হয়তো পারবেন। যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠলে।

তার আগে যদি কারও নাম বলেন তাহলে আপনি সেই নাম আমাকে জানিয়ে যাবেন। এই থানার সব কনস্টেবল ও সিপাইদের গাঁয়ের সকলেই মুখ চেনে। আপনার ঘরের সামনে দুজন আর্মড গার্ড থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা।

আমি বললাম, তার দরকার হবে না। আপনি এখানে এসেছেন এটাই দুষ্কৃতকারীদের মনে যথেষ্ট ভয়ের উদ্রেক করবে।

এবার আমরা উঠব। আমার স্ত্রীর জন্যে উদ্‌বেগ আছে।

এস.পি পট্টনায়ক বললেন, নিশ্চয়ই। আপনারা আর দেরি করবেন না।

গাড়িতে ওঠার আগে আমি বললাম, আই.জি সাহেবকে বলবেন যে চিফ-কনসার্ভেটর

সাহেবকে যেন বলেন এখানের বন-বিভাগ ঢেলে সাজাতে। যেখানে পুলিশ অফিসার খুন হলেন সেখানে বন-বিভাগের অবিলম্বে উচিত নিজেদের আর্মড-উইং গড়ে তোলা।

পট্টনায়ক ছেলেমানুষ হলে কী হয়। বললেন, সেই আর্মড গার্ডেরাও যে আমার পুলিশেরই মতো জানোয়ার নিধন করবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? ভূত যে সরষের মধ্যেই ঢুকে গেছে কী না।

পট্টনায়ককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমরা ফিরলাম।

ফাদার উইধাস ফেরার পথে গম্ভীরমুখে বললেন, রিয়্যালি ইয়োর কান্ট্রি ইজ ভেরি স্ট্রেঞ্জ। তোমার মতো লোকও এদেশে থাকে, তোমার গর্ভিণী স্ত্রীকে দল বেঁধে ধর্ষণ করার মতো পুলিশও থাকে, আবার পট্টনায়কের মতো ইয়াং পুলিশ অফিসারও থাকে।

আমি বললাম, ফাদার উইধাসও থাকেন।

ফাদার বললেন, কিন্তু মাইন্ড উ্য! উনি কিন্তু তুমি যে আই. জি-কে চেনো তা না জেনেই অত্যন্ত কড়াভাবে ব্যাপারটা হ্যান্ডল করতে লেগে পড়েছিলেন।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই।

ইন্ডিয়াতে যতদিন পট্টনায়কদের মতো ডায়রেক্ট রিক্রুট অফিসারেরা আসতে থাকবে তোমাদের কোনোই চিন্তা নেই। নতুন স্বাধীনতা পাবার পর বেশ কিছুদিন টিথিং-ট্রাবল তো থাকবেই। সব দেশেই থাকে। ইতিহাস তাই-ই বলে।

তা ঠিক, তবে সেটা কতদিন থাকে সেইটেই বড়ো কথা। আর পট্টনায়েকের মতো আই.পি.এস, আই.এ.এস, আই.আর.এস-রা তো শোভাযাত্রা করে আসছেন না। লুটমারের রাজত্ব চলছে, দেশে। সামনে যে কী নৈরাজ্য অপেক্ষা করে আছে তা ভাবলেই আতঙ্কিত হই। আমি বললাম।

হনসো আজ সকাল থেকেই ভালো। দুদিন হয়ে গেল। দুপুরের দিকে আজ ভাতও খেল। এ কদিন শকড থাকায় কিছুই খেতে চাইছিল না। ফেনাভাত। আমি রেঁধেছিলাম। সারা শরীরে কালসিটে। এখনও প্রচণ্ড ব্যথা শরীরের সর্বত্র এবং অলিগলিতেও।

দুপুরেই আমি নার্সকে সঙ্গে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এলাম। হনসোর ব্যথাটা শরীরের চেয়ে মনে ছিল অনেক বেশি। যে মেয়ে প্রথমবার গর্ভিণী হয় এবং তার গর্ভপাত করাতে হয় গণধর্ষণে তার ব্যথা সমব্যাথী ছাড়া কেই বা বুঝবে!

আইডেন্টিফিকেশান প্যারেডের কথা বলাতে হনসো লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

বলল, তুমি কি পাগল? ওদের আমি আবারও দেখলে অজ্ঞানই হয়ে যাব!

তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, আমি তখন উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছিলাম। আর জিপটা হাতির মতো মড়মড় শব্দ করে ডালপালা ভেঙে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। সূরজা এসে বলল, পুলিশ তোর বাড়ি খুঁজে দেখতে এসেছে।

কেন?

কাল পুলিশ খুন হয়েছে বিষের তীরে। সারা বস্তীর সব ঘর কাল তল্লাশি হয়েছে। দুজনকে ধরেও নিয়ে গেছে। এখন তোর বাড়ি দেখবে। তোর মরদ কোথায়?

আমি বললাম, জানিস না আজ হাট। তুই কোন শহরের বাবু রে!

ইতিমধ্যে চারজন পুলিশ এসে ঢুকল। আমাকে বলল, ফাঁকা ঘরে 'সিরাচ' করার নিয়ম নেই, আমাকে ঘরে থাকতে হবে। যেই না ঘরে গেছি, অমনি আমাকে মেঝের মাদুরে পেড়ে ফেলে—

বলেই, হনসো কেঁদে উঠল।

একেকজনের শেষ হয়, অন্যজন ঢোকে। বাকিরা উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। চারজনে সবসুদ্ধ প্রায় একঘণ্টা। তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি শুধু বড়হাদেওকে ডাকছি প্রাণপণে। ওরা বেরিয়ে গেল যখন, তখন সুরজা আমার সাঙাত বলল ওদের, আমার জন্যে একটু দাঁড়াও। বলেই সে-ও এসে—! হায় রে! যতটুকু জ্ঞান ছিল তখুনি তো তা চলে গেল।

পরদিন ডি.আই.জি সাহেব আমাকে নিতে জিপ পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলেন হনসোর জন্যে ফুল, শাড়ি, আই.জি সাহেবের হয়ে এবং ক্ষমাভিক্ষাও। উনিও বললেন, আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের কথা।

আমি নিজ চোখে জিপটাকে যেতে দেখেছিলাম। নম্বরও আমার জানা ছিল না। কিন্তু পুলিশ মারা যাওয়াতে সেদিন সকালেই অন্য একটি জিপও এসেছিল। কোন জিপের আরোহী তারা ছিল তা আমার জানার কথা নয়। তাছাড়া, যারা আমার হনসোকে নির্যাতন করেছে তাদের আদালতের প্রহসনের হাতে ছেড়ে দিতে আমার মন চাইছিল না। সব পুলিশ অফিসারই নিখিল পট্টনায়কের মতো নয়। যত অপরাধই তাদের সহকর্মীরা করুক না কেন, তাদের বাঁচিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন সকলেই। বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই বলে গেছিলেন কোনকালে—"আইন! সে তো তামাশা মাত্র! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া যে তামাশা দেখিতে পারে", তা আজকেও সত্যি।

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি বললাম, আমার স্ত্রী তো এখনও অসুস্থ আর স্বাভাবিক কারণে বড়োই লজ্জা পাচ্ছেন আবারও সেই বুনো কুকুরদের মুখোমুখি হতে। আপনি যদি আমার একটা উপকার করেন তো খুব ভালো হয়।

কি?

এখানে যে সব পুলিশ আছে তাদের ফোটো, যদি পাঠিয়ে দেন—

উনি বললেন, ভালো কথা। আমি সেদিন পুলিশের যত লোক এখানে ছিল তাদের সকলের ছবিই তুলিয়ে দেব। আপনি পরশু পেয়ে যাবেন ফোটো।
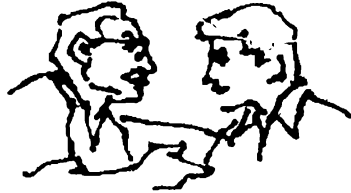
হনসো শারীরিকভাবে আগের চেয়ে ভালো কিন্তু তার মনে যে আঘাত লেগেছে তা সারতে বহু সময় লাগবে। ভেবেছিলাম, আমাদের সন্তান আসবে। আমার মনে যত না সাধ-আহ্লাদ, নারী হিসেবে হনসোর মনে তার চেয়ে অনেকই বেশি ছিল। আর ছিল কল্পনা। শিশুকাল থেকে তার মনে মনে যে সব ছবি এঁকেছিল সে, সে সব ধুয়ে-মুছে একাকার হয়ে গেল!

এখন রাত অনেক। হনসো ঘুমোচ্ছে। আমি বারান্দায় বসে আছি। বাইরের তারাভরা আকাশের নীচে দামাল বাগালের মতো গরম হাওয়াটা যেন মস্ত এক মোষের দলকে নিয়ে ধুলো আর ঝরাপাতা আর ঝোপঝাড় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বনে-পাহাড়ে। তারারাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে তাদের আলোড়নে।

আমার মন ভারি খারাপ হয়ে ছিল। এই আমার দেশ!

দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু স্বাধীনতার একটুও যোগ্য বোধহয় হইনি আমরা। স্বাধীনতার যোগ্যতা না থাকলে পড়ে-পাওয়া স্বাধীনতা খোওয়া যাবে। যে স্বাধীনতার বুকের রক্তে না অর্জন করা যায়, সেই স্বাধীনতা থাকে না। তাকে রাখা ভারি মুশকিল। গণতন্ত্র তখনই একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে যখন তার প্রত্যেকটি ভোটদাতা শিক্ষায় এবং সচেতনায় তার দায়িত্ব এবং অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ সজাগ হয়। নইলে হাত-তোলা মানুষের ভিড়ই বাড়ে শুধু। পার্টির নেতারা যদি সৎ না হয়, বিবেকসম্পন্ন না হয়, যদি ভণ্ড এবং স্বার্থপর হয়, দেশের চেয়েও তাদের দল এবং ইজম যদি বড়ো হয়, তবে এই এত বড়ো দেশটারও এক বা দু যুগের মধ্যে সার্বিক সর্বনাশ হয়ে যাবে। পুলিশদের হনসোকে গণধর্ষণ সেই দুর্যোগেরই সূচক। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার।

কাল থেকেই ভাবছি, এই দেশকে আর দেশের মানুষদের ভালোবেসে ইংল্যান্ড থেকে ফিবে শিকারে এসে এখানেই থেকে গিয়ে আদৌ ভালো করেছিলাম কি না। হনসোকে নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যাব কি যাব না সেই চিন্তাও বারবার ফিরে ফিরে আসছে। কিন্তু চোরের উপরে রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো বোকামিও তো আর নেই! এই দেশের অবস্থা অচিরে এমনই দাঁড়াবে যখন গরিবের এবং বড়োলোকেরও উপর সমান অত্যাচার চলবে স্বল্প কিছু গদি-আসীন নিম্নস্তরের ক্ষমতাবান মানুষের দ্বারা। তারা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, শুধুমাত্র ভোট পাওয়ার জন্যে, নানান ছলাকলায় এই দেশের সমস্ত মানুষের সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনবে। তখনও যদি আমি এবং আমার মতো নগণ্য মানুষেরা চোখ বুজে থাকি, বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে যাই, তবে যা অবশ্যম্ভাবী তাই-ই ঘটবে। এই দেশ তো নেতাদেরই নয়, দেশতো আমাদের প্রত্যেকেরই। দেশের ভালোর জন্যে আমরা যদি যখন যা করণীয় তা না করি তাহলে আমরাও তো কর্তব্যভ্রষ্ট হব। "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে"

গরম হাওয়াতে দু চোখ আমার জ্বালা করতে লাগল।

শুধু গরম হাওয়াতেই কি?

দারোগাকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। হাটে গিয়ে শুনলাম। আজ ডি.আই.জি সাহেব দুটি নয় চারটি গ্রুপের ফোটো পাঠালেন, পোস্টকার্ড সাইজে এনলার্জ করে। যে পুলিশ তা নিয়ে এসেছিল তার ছবিও তার মধ্যে ছিল। আমি তাকে বললাম যে, বিকেলে আমি নিজে গিয়ে থানায় নতুন দারোগার সঙ্গে ফোটোগুলি নিয়ে দেখা করব।

হনসোকে ছবিগুলি দেখাতে হনসো দেখতে চাইল না। তার মুখের আর বুকের খুবই কাছে নেমে-আসা যে কামার্ত মুখগুলি তার সারা জীবনের আতঙ্ক হয়ে থাকবে সেই মুখগুলিকে দেখতে কারই বা ভালো লাগে! তবুও আমার পীড়াপীড়িতে সে বারান্দায় বসে আলোর মধ্যে বার বার দেখল ফোটোগুলি। তিনজনকে শনাক্ত করতে পারল সে। সূরজা ছাড়া। আরেকজনকে পারল না। হনসো বলল, তখন আমার চোখ খোলার ক্ষমতা ছিল না। তবে লোকটা ভীষণ মোটা আর ভারী ছিল। সূরজাকে চিনি তো! তাই চোখ-বোজা থাকলেও চিনতে অসুবিধা হয়নি। তারপর হনসো বলল, জানো ও এরকম ছিল না, শহরের কারখানাতে গিয়েই ওর এরকম অবস্থা হল। কত বদলে গেছে মানুষটা!

সূরজা ছাড়া অন্য তিনজনকে আমি খুব ভালো করে দেখলাম। বার বার দেখলাম। তবুও তাদের মুখগুলি আমার মনে গেঁথে বসল না।

যদিও হনসো শনাক্ত করেছিল সকলকেই, একজনকে ছাড়া; তবু আমার নিজের শনাক্ত করা হয়নি বলে, বিকেলে গিয়ে আমি নতুন দারোগাকে বললাম যে, আমার স্ত্রী এখনও একজনকেও শনাক্ত করতে পারছেন না। সময় লাগবে আরও, যাঁদের ফোটো পাঠিয়েছেন ডি.আই.জি সাহেব তাঁদের সকলেই কি এখনও এখানেই আছেন?

এই দারোগা খুবই ভদ্র এবং শিক্ষিত। শুনলাম, কবিতা-টবিতাও লেখেন নাকি!

উনি বললেন যে, চারজন তো মান্দলা থেকে এসেছিল, তারা ফিরে গেছে। বাকিরা এখনও এখানেই আছে।

আমি আরও দুদিন সময় চেয়ে নিলাম ওঁর কাছ থেকে।

তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমি এস.পি সাহেবকে জানিয়ে দেব, উনি ডি.আই.জি সাহেবকে জানাবেন।

বাড়ি ফিরে এলাম ফোটোগুলি নিয়ে। আমি ঠিক করলাম যে দুদিন পরও আমি গিয়ে ওই এক কথাই বলব দারোগাকে। বলব যে, আমার স্ত্রী একজনকেও শনাক্ত করতে পারেননি! শনাক্ত করতে পেরেছে বললে এদেশীয় আইনের হাস্যকর লজ্জাকর এক গোলোকধাঁধার জগতে প্রবেশ করতে হবে আমাকে এবং হনসোকেও। সাবডিভিশানের, ডিস্ট্রিক্টের, তারপর রাজ্যের কোর্ট এবং তারপরে হয়তো দীর্ঘ দুই যুগ ধরে। এবং তার পরেও হয়তো প্রকৃত আসামিরা ছাড়াই পেয়ে যাবে, যদি তাদের পয়সা ও মুরুব্বির জোর থাকে। তা আমি হতে দেব না। যে-দেশে আইন তামাশাই হয়ে আছে, সে দেশে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া আদৌ অপরাধের নয়। ওই মানুষগুলিকে একে একে আমার মনের মধ্যে গেঁথে নেব। তারপর আমার নিজস্ব ভঙ্গিতে আমি তাদের প্রত্যেককে শাস্তি দেব। যেমন যেমন শাস্তি তাদের প্রাপ্য। এমনভাবে দেব যাতে আমি নিজে এই আইনি নাগপাশে বাঁধা না পড়ি। তাদের কারও চোখ উপড়ে নেব আমি, কারও মেরুদণ্ড ভেঙে দেব, কারও বা প্রাণও নেব। সূরজার তো নেবই। এই শাস্তি এমনভাবেই দিতে হবে যাতে আইনের অক্ষম হাত, যে হাত দুর্বলকে বাঁচাতে পারে না, শুধু সবলেরই সহায়ক হয়, সেই হাত আমাকে স্পর্শও না করতে পারে।

পশু-শিকার তো ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিনই। এবার মনুষ্যেতর কিছু মানুষকে শিকার করব রয়ে-সয়ে, ধীরে-সুস্থে। যতক্ষণ না এই প্রতিশোধ নেওয়া আমার সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন হনসোকে আমি গর্ভবতী করব না। এই ঘৃণ্য জন্তুদের রক্তে স্নান করে এই অন্যায়ের প্রতিকার করার পরই আমরা নতুন করে আমাদের উত্তরসূরির কথা ভাবব।

আমার প্রথম শিকার হবে সূরজা। তার প্রাণ নেব আমি। তারপর যথাযথ শাস্তি দেব অন্যদের

একে একে। চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেছিলেন যে, "ইফ ট্যু পে ইভিল উইথ গুড হোয়াট ড্যু পে গুড উইথ?"

আই উইল পে ইভিল উইথ ইভিল। অবলা বনবালা নীরবে অত্যাচার সয়েছে তাই আমি সেই অত্যাচারীদের ছেড়ে দেব এই আইনের হাতে, আইনরক্ষকদের হাতে, তা হবে না। যে দেশে দুর্বলকে, নারীকে রক্ষা করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয় না সেই দেশে দুর্বল এবং নারীর নিজেকেই নিজেদের রক্ষা করতে হবে।

ধর্ষিতা শুধু হনসোই হয়নি, ধর্ষিতা হয়েছে এই দেশ সম্বন্ধে আমার সমস্ত উচ্চ ধারণা, হয়েছে আমার মাতৃভূমির, স্বাধীন মাতৃভূমিতে মানুষের মতো মানুষ হয়ে, সরল সুন্দর আড়ম্বরহীন গ্রামীণ মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্নও।

বাড়ি ফিরলে হনসো বলল, চিনিয়ে দিয়ে এলে? কী হবে এখন? ওরা যদি আবারও কিছু করে। তোমার উপর প্রতিশোধ নেয়?

আমি বললাম, সেই ভয়েই তো তুমি যে শনাক্ত করেছ এ কথা বলতেই পারলাম না দারোগাকে।

তবে? যদি ওরা আবার আসে?

আমি হেসে বললাম, আসবে না। ওদের বিচার হবে জব্বলপুর বা রায়পুর বা ভোপাল বা দিল্লিতে নয়, বিচার হয়ে ওপরের কোর্টে!

হনসো জঙ্গলের দিকে চেয়ে বলল, বড়হাদের বুঝি মিটিং বসাবেন ওদের শাস্তি দেবার জন্যে?

বসাবেন।

আমি বললাম।

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

বাঁচালে তুমি আমাকে।

হনসো বলল।

আমি কিছু না বলে ওর ডান হাতটি নিজের হাতে নিয়ে চাপ দিলাম একটু।

বললাম, আমি না বাঁচালে, তোমায় বাঁচাবে কে?

শালডুংরি বাংলোর চৌকিদার হঠাৎ আমার পিছন থেকে ডাকল, স্যার!

আমি চমকে উঠে, প্রায় হার্টফেল করেই মরছিলাম একটু হলে। আমি! মানে, বাঙালিবাবু নই আমি সত্যেন। মধ্যপ্রদেশের শালডুংরিতে শিকার করতে আসা সর্বজ্ঞ কিন্তু অজ্ঞ মনের শিকারি।

সে বলল, খনা লাগা দিয়া সাব। রাত ইগারা বাজ রহা হ্যায়।

স্বপ্নভঙ্গ হল যেন আমার। এক আশ্চর্য আদিম জগতে চলে গেছিলাম আমি। যেখানে এককালীন সাহেব শিকারি আর আজকের জংলি হয়ে যাওয়া বাঙালিবাবু আর হনসোরা বাস করেন।

ভাবছিলাম, বনে-জঙ্গলে তো আমিও অনেকই ঘুরেছি কৈশোরকাল থেকে কিন্তু সেই আরণ্যক জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে আংশিক ধারণাও আমার গড়ে ওঠেনি, গড়ে ওঠেনি এই দেশের ভেতরকার সুন্দর এবং অসুন্দর অন্তরের প্রকৃতি সম্বন্ধে, এই দেশের আত্মার মুক্তির এবং উপায় সম্বন্ধেও।

আমার কলমটি দিয়ে বাঙালিবাবুর ডায়ারির ওই পাতাটিতে একটি পেজমার্ক দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ঠেলে। তারপর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে বারান্দায় এলাম। বাইরে খুবই শীত। নদীতীরে নীল কুয়াশা। টিটি পাখি ডেকে ফিরছে প্রায় জমে-যাওয়া নদীর উপরে চক্রাকারে। ফেউ ডাকছে নদীর ওপার থেকে ফির্চ-চ ফিচঁ-চ করে। শেয়ালে কি বাঘ দেখেছে? সঙ্গে সঙ্গে একটি বার্কিং-ডিয়ার ডেকে উঠল ব্বাক ব্বাক করে। খানখান হয়ে গেল বনজ নিস্তব্ধতা। নদীর উপরের জলজ হিমেল নিস্তব্ধতাও।

আমি বললাম, মনে মনে, আমিও দেখেছি। এক বাঘকে। এ এক অন্য বাঘ। বাঙালিবাবু!

আজ সারারাত না হয় জেগেই থাকব। এর পরের অংশটুকু না পড়ে শেষ না করতে পারলে ঘুম কিছুতেই আসবে না।